ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

প্রথম পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

- অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
- অধ্যাপক ড. এ. টি. এম. সামছুজ্জোহা

অক্ষর-পত্র
প্রকাশনী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সিলেবাসের আলোকে রচিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাসের আলোকে
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

প্রথম পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনা

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
বিএ (অনার্স) ২য় শ্রেণিতে ১ম, এমএ ১ম শ্রেণিতে ১ম,
পিএইচডি
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ডীন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. এ. টি. এম. সামছুজ্জোহা
বিএ (অনার্স) ১ম শ্রেণিতে ১ম, এমএ ১ম শ্রেণিতে ১ম,
পিএইচডি
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
৪৩, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা

প্রকাশনা
অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
৪৩, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা ১২১৭
ফোন: ০৯৬৬৬-৭৮৭৯৮০
ই-মেইল: info@akkharpatra.com
ওয়েবসাইট: www.akkharpatra.com
ফেসবুক: facebook.com/AkkharPatraProkashoni

© লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পরিবেশনা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৩৮/৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন: ০২-৯৫১১৭২৭, ০১৩১৩৭৭০৯৫৭

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৩
দ্বাদশ সংস্করণ : আগস্ট ২০২৫

গবেষণা : ইতিহাস দপ্তর
গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ

পণ্য ব্যবস্থাপনা
ও সমন্বয় : সাবিকুন নাহার আনিকা

প্রচ্ছদ : মানব

গ্রাফিক্স : নকশা দপ্তর

অঙ্কন : অঙ্কন দপ্তর

অঙ্গসজ্জা : প্রি-প্রেস দপ্তর

বর্ণবিন্যাস : অক্ষর-পত্র কম্পিউটার সিস্টেমস

মুদ্রণ ও বাঁধাই : বারতোপা প্রিন্টার্স লি.

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি নির্ধারিত
সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য (MRP):
৩৩০.০০ (তিন শ ত্রিশ) টাকা

ঘরে বসে বই পেতে অর্ডার করুন
pbs.com.bd
অথবা কল/হোয়াটসঅ্যাপ করুন
01313 770 770

ভূমিকা

ইতিহাস কালের প্রতিচ্ছবি, যুগ-যুগান্তরের সাক্ষী ও মানবসভ্যতার আলেখ্য। ইতিহাসের দর্পণেই আমরা অতীতকে প্রত্যক্ষ করি, বর্তমানকে গড়ি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করি। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি মূলত ইতিহাসেরই একটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র। এটি একদিকে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সংযোগ ঘটায় অন্যদিকে অতীত ঐতিহ্যের অনুসন্ধান এবং এর প্রতি সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল হতে অনুপ্রাণিত করে।

বর্তমান শিক্ষাক্রমে পূর্বের ইসলামের ইতিহাস বিষয়টিকে 'ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' নামকরণ করে এর বিষয়বস্তুতে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ইসলামের মহান মানবতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, উদার মনোভাব, পরমতসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, নারীর প্রতি সম্মানবোধ, দেশপ্রেম ইত্যাদি গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রস্তুতির সুবিধার্থে বর্তমান পুস্তকে বংশতালিকা, মানচিত্র এবং মাস্টার ট্রেইনারদের লিখিত সৃজনশীল প্রশ্নাবলি সংযোজন করা হয়েছে। সৃজনশীল পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হচ্ছে ক্লাসেই গ্রুপ করে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ তৈরি করে শিক্ষককে দেখানো। এক্ষেত্রে সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়গণ যেন শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন তার জন্য প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি পাঠে 'কাজ' ও 'পাঠ মূল্যায়ন' সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া বইটি রচনা করতে দেশি-বিদেশি সম্মানিত লেখকের বইয়ের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এজন্য তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রইল। অনেক ক্ষেত্রে ইন্টারনেটেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বইটি মুদ্রিত হয়েছে এবং মুদ্রণের ব্যাপারে বর্ণবিন্যাস থেকে শুরু করে সম্পাদনা পর্যন্ত যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এরপরও যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায় তাহলে তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রাখি। বইটির মানোন্নয়নে যেকোনো প্রকার গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। পরিশেষে, যাদের জন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সেসব শিক্ষার্থী যদি বইটির দ্বারা উপকৃত হয়, তাহলে আমাদের এ চেষ্টা সার্থক হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য রইল শুভেচ্ছা ও শুভকামনা এবং প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান [০১৭৪৯৩৫৮৩৫২] | অধ্যাপক ড. এ. টি. এম. সামছুজ্জোহা [০১৬৭৮১৪২৯২৪]

বইটির বৈশিষ্ট্য

- ✓ প্রতিটি অধ্যায়ের পাঠভিত্তিক উপস্থাপন
- ✓ শিখনফলের আলোকে প্রতিটি বিষয়বস্তুর সহজ উপস্থাপন
- ✓ প্রতিটি পাঠের শেষে 'পাঠ মূল্যায়ন' সংযোজন
- ✓ পাঠভিত্তিক জেনে রাখো, বাড়ির কাজ, দলীয় ও একক কাজ সংযোজন
- ✓ ঐতিহাসিক বংশতালিকা রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন
- ✓ মানচিত্রের মাধ্যমে সহজবোধ্যভাবে ইতিহাস উপস্থাপন
- ✓ ইতিহাসের উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা ও সময় ছক আকারে উপস্থাপন
- ✓ অধ্যায়ভিত্তিক প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা সংযোজন
- ✓ অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক জ্ঞান, অনুধাবন ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সংযোজন
- ✓ অনুশীলনীতে সৃজনশীল প্রশ্নের পাশাপাশি সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন সংযোজন
- ✓ বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংযোজন

পাঠ্যসূচি

প্রথম অধ্যায়: প্রাক-ইসলামি আরব (১৫ পিরিয়ড)

প্রাচীন আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং অধিবাসীদের জীবন-জীবিকায় এর প্রভাব; প্রাচীন সভ্যতা: মিসরীয়, সুমেরীয়, হিব্রু, গ্রিক ও রোমান; ইসলামপূর্ব যুগে আরবের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়: হযরত মুহাম্মদ (স) (২৫ পিরিয়ড)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বাল্যজীবন, মক্কাজীবন ও নবুয়ত প্রাপ্তি; হিযরত: কারণ ও গুরুত্ব; মদিনা সনদ ও এর গুরুত্ব; প্রাথমিক যুদ্ধসমূহ: বদর, উহুদ ও খন্দক; হুদায়বিয়ার সন্ধি ও এর ফলাফল; মক্কাবিজয় ও শান্তিনীতি; বিদায় হজ ও বিদায় হজের ভাষণ; মহানবি (স)-এর সংস্কারসমূহ; মহানবি (স)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব।

তৃতীয় অধ্যায়: খুলাফায়ে রাশেদিন (২৫ পিরিয়ড)

খুলাফায়ে রাশেদিন: নির্বাচন নীতি; হযরত আবু বকর (রা): প্রাথমিক সমস্যাসমূহ, পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত, চরিত্র ও কৃতিত্ব; হযরত ওমর (রা): খিলাফতের সম্প্রসারণ, শাসনব্যবস্থা, চরিত্র ও কৃতিত্ব; হযরত ওসমান (রা): শাসন কার্যাবলি, অভিযোগসমূহ, হত্যার কারণ, ফলাফল, চরিত্র ও কৃতিত্ব; হযরত আলী (রা): গৃহযুদ্ধ, শিয়া ও খারেজি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, চরিত্র ও কৃতিত্ব; খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসন ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থ অধ্যায়: উমাইয়া খিলাফত (২৫ পিরিয়ড)

উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা; মুয়াবিয়া (রা): সামরিক অভিযান, শাসন ব্যবস্থা, চরিত্র ও কৃতিত্ব; ইয়াজিদ ও ইমাম হুসাইন (রা): কারবালার যুদ্ধ ও গুরুত্ব; আবদুল মালিক: উমাইয়া শাসন পুনর্গঠন ও সুদৃঢ়ীকরণ, শাসন নীতি ও সংস্কার, চরিত্র ও কৃতিত্ব; ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক: খিলাফত সম্প্রসারণ, চরিত্র ও কৃতিত্ব; উমর বিন আব্দুল আজিজ: শাসন নীতি, সংস্কার, চরিত্র ও কৃতিত্ব; উমাইয়া খিলাফতের ক্রমাবনতি ও পতন; উমাইয়া আমলের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য; উমাইয়া আমলের শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা।

পঞ্চম অধ্যায়: আব্বাসি খিলাফত (৩০ পিরিয়ড)

আব্বাসি আন্দোলন: আবুল আব্বাস-আস-সাফফাহ, আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা; আবু জাফর আল মনসুর: আব্বাসি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা, শাসন সুদৃঢ়ীকরণ, চরিত্র ও কৃতিত্ব; খলিফা হারুন অর রশিদ: অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, চরিত্র ও কৃতিত্ব; বার্মাকিদের উত্থান, অবদান ও পতন; আল আমিন ও আল মামুনের গৃহযুদ্ধ: কারণ ও ফলাফল; আল মামুন: শাসননীতি, বাইতুল হিকমা ও জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চা; বুয়াইদ ও সেলজুক: উত্থান, কার্যাবলি, অবদান; ক্রুসেড: কারণ ও ফলাফল, সালাহউদ্দিন আইয়ুবির কৃতিত্ব; আব্বাসি খিলাফতের ক্রমাবনতি ও পতন; আব্বাসি আমলের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য; আব্বাসি আমলের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা।

ষষ্ঠ অধ্যায়: স্পেনে উমাইয়া শাসন (১০ পিরিয়ড)

মুসলমানদের স্পেন বিজয়; স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা: আব্দুর রহমান আদ দাখিল; দ্বিতীয় আব্দুর রহমান ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ; তৃতীয় আব্দুর রহমান: খিলাফত প্রতিষ্ঠা, স্পেনের শ্রেষ্ঠ উমাইয়া শাসক; স্পেনে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশ।

সপ্তম অধ্যায়: উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত (১০ পিরিয়ড)

ফাতেমি আন্দোলন: উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমিদের উত্থান; ফাতেমি খিলাফত: উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা; ফাতেমি খলিফা: আল মুইজ, আল আজিজ ও আল হাকিম; ফাতেমিদের ক্রমাবনতি ও পতন; উত্তর আফ্রিকায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ: আল আজহার মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল হিকমা।

মানবণ্টন

সৃজনশীল প্রশ্ন: ৭০ নম্বর	
মোট ১১টি প্রশ্ন থাকবে। ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের পূর্ণমান ১০।	১০ ×৭ = ৭০
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ৩০ নম্বর	
মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ১।	১ ×৩০ = ৩০
মোট	১০০

মানবণ্টন পরিবর্তনশীল; এর সাথে প্রশ্নের ধরনের তেমন সম্পর্ক নেই। মানবণ্টনের আপডেট দেখতে ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে টাইপ করো—
akkharpatra.com/hsc/ishmdn25.pdf

সূচিপত্র

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়: প্রাক-ইসলামি আরব	**১-৬২**
প্রাক-ইসলামি আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য	২
প্রাক-ইসলামি আরবের আবহাওয়া, উৎপন্ন দ্রব্য ও জীবজন্তু	৫
আরবের অধিবাসীদের জীবনাচরণে ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের প্রভাব	৭
প্রাচীন সভ্যতা	১১
মিসরীয় সভ্যতা	১৩
সভ্যতায় মিসরীয়দের অবদান	১৬
সুমেরীয় সভ্যতা	২০
ব্যাবিলনীয় এবং হিব্রু সভ্যতা	২৩
গ্রিক সভ্যতা	২৭
রোমান সভ্যতা	৩২
আইয়ামে জাহেলিয়া এবং প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক অবস্থা	৩৫
প্রাক-ইসলামি আরবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা	৩৮
প্রাক-ইসলামি আরবের ধর্মীয় অবস্থা	৪১
প্রাক-ইসলামি আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা	৪৩
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৪৫
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৪৮
অনুশীলনী	৫৭
দ্বিতীয় অধ্যায়: হযরত মুহাম্মদ (স)	**৬৩-১৩০**
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাল্য ও মক্কা জীবন (৫৭০-৬২২ খ্রি.)	৬৪
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত লাভ (৬১০ খ্রি.) এবং মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরত (৬১৫ খ্রি.)	৬৭
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদিনায় হিজরত, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং মদিনা জীবন (৬২২-৬৩২ খ্রি.)	৭১
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদিনা সনদ ও এর গুরুত্ব (৬২২ খ্রি.)	৭৪
বদরের যুদ্ধ (১৩ মার্চ, ৬২৪ খ্রি.): কারণ, ঘটনা ও ফলাফল	৭৭
উহুদের যুদ্ধ (২১ মার্চ, ৬২৫ খ্রি.): কারণ ও ঘটনা	৮১
উহুদের যুদ্ধের ফলাফল ও মুসলমানদের পরাজয়ের কারণসমূহ	৮৩
খন্দকের যুদ্ধ (মার্চ ও এপ্রিল, ৬২৭ খ্রি.): কারণ, ঘটনা ও ফলাফল	৮৫
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক	৮৮
হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬২৮ খ্রি.) এবং এর গুরুত্ব	৯১
মক্কা বিজয় (৬৩০ খ্রি.) এবং এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৯৫
মক্কা বিজয় পরবর্তী অভিযানসমূহ	৯৭
বিদায় হজ (৬৩২ খ্রি.)	৯৯
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার	১০১
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার	১০৪
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চারিত্রিক গুণাবলি	১০৬
ইসলামি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ	১০৮
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	১১১
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	১১৪
অনুশীলনী	১২১
তৃতীয় অধ্যায়: খুলাফায়ে রাশেদিন	**১৩১-২১২**
খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন নীতি	১৩২
হযরত আবু বকর (রা)-এর পরিচয়, প্রাথমিক জীবন, খিলাফত লাভ ও প্রাথমিক সমস্যাসমূহ (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)	১৩৪
হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় সংঘটিত রিদ্দা যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল	১৩৬

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে পারসিক ও রোমানদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত	১৪০
ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা)-এর অবদান এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	১৪২
হযরত ওমর (রা)-এর পরিচয়, প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) এবং পারস্যে খিলাফত সম্প্রসারণ	১৪৪
বাইজান্টাইন অঞ্চলে হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত সম্প্রসারণ	১৪৮
ইসলামের সেবায় সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদের অবদান	১৫২
হযরত ওমর (রা)-এর কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা	১৫৪
হযরত ওমর (রা)-এর প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা	১৫৭
হযরত ওমর (রা)-এর দিউয়ান ও রাজস্ব প্রশাসন	১৫৯
হযরত ওমর (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব	১৬২
হযরত ওসমান (রা)-এর পরিচয়, খিলাফত লাভ ও এর সম্প্রসারণ (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)	১৬৫
হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ ও এর যথার্থতা নিরূপণ	১৬৮
খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যার কারণ, ঘটনা ও ফলাফল	১৭১
খলিফা ওসমান (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব	১৭৪
হযরত আলি (রা)-এর প্রাথমিক জীবন, খিলাফত লাভ ও প্রাথমিক সমস্যাসমূহ (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)	১৭৬
হযরত আলি (রা)-এর সময় সংঘটিত জামাল/উষ্ট্রের যুদ্ধ বা ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ (৬৫৬ খ্রি.)	১৭৮
হযরত আলি (রা) ও আমির মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্ব এবং সিফফিনের যুদ্ধ (৬৫৭ খ্রি.)	১৮১
শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাদের মতবাদ	১৮৪
খারেজি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাদের মতবাদ	১৮৬
হযরত আলি (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব	১৮৯
খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসন নীতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা	১৯১

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	১৯৪
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	১৯৭
অনুশীলনী	২০৩
চতুর্থ অধ্যায়: উমাইয়া খিলাফত	**২১৩-২৯৬**
উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা (৬৬১ খ্রি.)	২১৪
আমির মুয়াবিয়ার পরিচয় ও তার সামরিক অভিযান (৬৬১-৬৮০ খ্রি.)	২১৬
খলিফা মুয়াবিয়ার শাসন ব্যবস্থা	২১৯
খলিফা মুয়াবিয়ার চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং ইসলামের সেবায় আমর ইবনুল আসের অবদান	২২১
ইয়াজিদ (৬৮০-৬৮৩ খ্রি.) এবং ইমাম হুসাইনের পরিচয় ও তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণ	২২৪
কারবালার যুদ্ধ (৬৮০ খ্রি.) এবং পরবর্তী ইতিহাসে এর প্রভাব ও গুরুত্ব	২২৬
খলিফা আবদুল মালিকের সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ীকরণ ও সম্প্রসারণ	২৩০
খলিফা আবদুল মালিকের শাসন নীতি ও সংস্কার	২৩৩
খলিফা আব্দুল মালিকের চরিত্র ও কৃতিত্ব	২৩৫
খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক: সিংহাসনে আরোহণ, প্রাথমিক কার্যাবলি ও খিলাফত সম্প্রসারণ (৭০৫-৭১৫ খ্রি.)	২৩৭
খিলাফত সম্প্রসারণে খলিফা আল-ওয়ালিদের অভিযানসমূহ	২৩৯
উমাইয়াদের স্পেন বিজয় (৭১১ খ্রি.)	২৪৩
খলিফা আল-ওয়ালিদের চরিত্র ও কৃতিত্ব	২৪৬
হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জীবন ও কর্ম	২৪৯
খলিফা সুলায়মানের জীবন ও কর্ম (৭১৫-৭১৭ খ্রি.)	২৫১
খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের ক্ষমতা লাভ এবং তার শাসন নীতি ও সংস্কারসমূহ (৭১৭-৭২০ খ্রি.)	২৫৩
খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের চরিত্র ও কৃতিত্ব	২৫৬

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসন নীতির সমালোচনা এবং উমাইয়া বংশের পতনে তার দায়বদ্ধতা	২৫৮
খলিফা হিশামের শাসন নীতি, চরিত্র ও কৃতিত্ব (৭২৪-৭৪৩ খ্রি.) এবং পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ	২৬০
উমাইয়া খিলাফতের পতনের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল	২৬৩
উমাইয়া শাসনামলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা	২৬৭
উমাইয়া প্রশাসন ব্যবস্থা	২৭০
উমাইয়া যুগে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা	২৭৩
উমাইয়া আমলের শিল্প ও স্থাপত্য	২৭৬
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	২৭৯
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	২৮১
অনুশীলনী	২৮৮
পঞ্চম অধ্যায়: আব্বাসি খিলাফত	**২৯৭-৩৮৮**
আব্বাসিদের পরিচয়, আব্বাসি আন্দোলন এবং আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা (৭৫০ খ্রি.)	২৯৮
আবুল আব্বাস আস-সাফফাহর পরিচয়, চরিত্র ও কৃতিত্ব (৭৫০-৭৫৪ খ্রি.)	৩০২
খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের পরিচয়, চরিত্র ও কৃতিত্ব (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)	৩০৪
শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবু জাফর আল মনসুর	৩০৮
খলিফা আল মাহদী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.) এবং আল হাদীর (৭৮৫-৭৮৬ খ্রি.) পরিচয় ও কৃতিত্ব	৩১০
খলিফা হারুন-অর-রশীদের অভ্যন্তরীণ নীতি (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)	৩১৩
খলিফা হারুন-অর-রশীদের বৈদেশিক নীতি	৩১৫
খলিফা হারুন-অর-রশীদের চরিত্র ও কৃতিত্ব	৩১৭
বার্মাকিদের পরিচয়, উত্থান ও পতন	৩১৯
খলিফা আমিন এবং মামুনের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ	৩২২

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
খলিফা আব্দুল্লাহ আল মামুন: শাসন নীতি, বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)	৩২৫
খলিফা আব্দুল্লাহ আল মামুনের চরিত্র ও কৃতিত্ব	৩২৮
আব্বাসি খলিফা আল মুতাসিমের সিংহাসনে আরোহণ ও কৃতিত্ব (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)	৩৩০
বুয়াইয়াদের পরিচয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের অবদান (৯৪৫-১০৫৫ খ্রি.)	৩৩২
বুয়াইয়া সুলতান আজদুদ্দৌলাহর কৃতিত্ব (৯৬৭-৯৮৩ খ্রি.) ও বুয়াইয়াদের পতন (১০৫৫ খ্রি.)	৩৩৫
আব্বাসি খিলাফতে সেলজুক তুর্কিদের উত্থান ও কার্যাবলি (১০৫৫-১১৯৪ খ্রি.)	৩৩৭
সুলতান আল্প-আরসালানের পরিচয় ও কৃতিত্ব (১০৬৩-১০৭২ খ্রি.)	৩৩৯
সেলজুক সুলতান মালিক শাহের পরিচয় ও কৃতিত্ব (১০৭২-১০৯২ খ্রি.)	৩৪১
আব্বাসি খিলাফতে সেলজুক সুলতানদের অবদান ও তাদের পতন	৩৪৩
ক্রুসেড: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল (১০৯৫-১২৯১ খ্রি.)	৩৪৬
সালাহউদ্দিন আইয়ুবির পরিচয়, চরিত্র ও কৃতিত্ব (১১৭৪-১১৯৩ খ্রি.)	৩৫১
আব্বাসি খিলাফতের পতন ও এর ফলাফল	৩৫৪
আব্বাসিদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা	৩৫৬
আব্বাসি শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য	৩৫৮
আব্বাসি শাসনামলে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা	৩৬০
আব্বাসি শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা	৩৬৩
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৩৬৭
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৩৬৯
অনুশীলনী	৩৭৯

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায়: স্পেনে উমাইয়া শাসন	**৩৮৯-৪৩০**
মুসলমানদের স্পেন বিজয় (৭১১ খ্রি.) : কারণ ও ঘটনা	৩৯০
স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা ও খিলাফত যুগ (৭৫৬-১৪৯২ খ্রি.)	৩৯২
আবদুর রহমান আদ-দাখিল : পরিচয় ও ক্ষমতায় আরোহণ (৭৫৬-৭৮৮ খ্রি.)	৩৯৪
আবদুর রহমান আদ-দাখিলের কৃতিত্ব ও চরিত্র	৩৯৬
আবদুর রহমান আল-ওয়াসাত (৮২২-৮৫২ খ্রি.)	৩৯৮
স্পেনের জাতীয়তাবাদী নেতা উমর বিন হাফসুন (৮৬০-৯১৭ খ্রি.)	৪০১
তৃতীয় আবদুর রহমান (৯১২-৯৬১ খ্রি.)	৪০৩
সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে তৃতীয় আবদুর রহমানের কৃতিত্ব	৪০৫
স্পেনে মুসলিম শাসনের পতন	৪০৮
স্পেনের কর্ডোভায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ	৪১১
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৪১৪
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৪১৭
অনুশীলনী	৪২৩

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
সপ্তম অধ্যায়: উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত	**৪৩১-৪৬৭**
ফাতেমিদের পরিচয় এবং উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ধাপ	৪৩২
ফাতেমি আন্দোলন এবং উত্তর আফ্রিকায় তাদের খিলাফত প্রতিষ্ঠা (৯০৯ খ্রি.)	৪৩৪
উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর পরিচয় ও কার্যাবলি (৯০৯-৯৩৪ খ্রি.)	৪৩৬
খলিফা আল-মুইজ: ক্ষমতা গ্রহণ, প্রাথমিক সমস্যা ও গৃহীত পদক্ষেপ (৯৫২-৯৭৫ খ্রি.)	৪৩৮
আল-মুইজের কৃতিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	৪৪০
খলিফা আল-আজিজের ক্ষমতা গ্রহণ ও কার্যাবলি (৯৭৫-৯৯৬ খ্রি.)	৪৪২
খলিফা আল-আজিজের চরিত্র ও কৃতিত্ব	৪৪৪
খলিফা আল-হাকিম (৯৯৬-১০২১ খ্রি.)	৪৪৬
ফাতেমি খিলাফতের পতন (১১৭১ খ্রি.)	৪৪৯
ফাতেমিদের সময় উত্তর আফ্রিকা এবং মিসরে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ	৪৫১
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৪৫৩
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৪৫৫
অনুশীলনী	৪৬০

সহায়ক গ্রন্থসমূহ	**৪৬৮**
পরিশিষ্ট	**৪৬৯-৪৯৬**
বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র	৪৬৯

১

প্রাক-ইসলামি আরব

Pre-Islamic Arabia

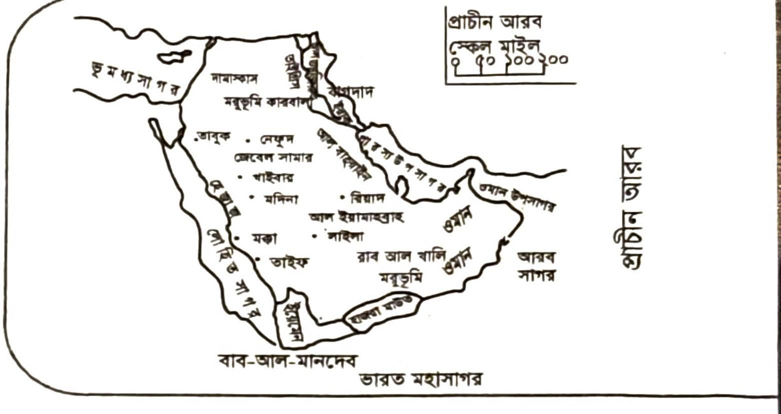
প্রাচীন আরব
স্কেল মাইল
০ ৫০ ১০০ ২০০
ভূমধ্যসাগর
দামাস্কাস
মরুভূমি কারবালা
বাগদাদ
তাবুক
নেফুদ
জেবেল সামার
খাইবার
মদিনা
রিয়াদ
আল ইয়ামামাহ্‌ব্রাহ
লাইলা
মক্কা
তাইফ
রাব আল খালি মরুভূমি
পারস্য উপসাগর
ওমান উপসাগর
ওমান
আরব সাগর
লোহিত সাগর
হাজরা মাউত
বাব-আল-মানদেব
ভারত মহাসাগর
প্রাচীন আরব

প্রধান প্রধান শব্দ

- জাজিরাতুল আরব
- আসাবিয়া
- বেদুইন
- সভ্যতা
- সেমেটিক
- হায়ারোগ্লিফিক
- পিরামিড
- কিউনিফর্ম
- হাম্মুরাবি কোড
- নগররাষ্ট্র
- স্টোয়িকবাদ
- কলোসিয়াম
- আইয়ামে জাহেলিয়া
- সাবায়ে মুয়াল্লাকাত

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ আরব প্রাচীনকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত। এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য দিক হলো সভ্যতার বিকাশ। আরব উপদ্বীপের উত্তর প্রান্ত ঘেঁষে বেশ কয়েকটি সমৃদ্ধ সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। এসব সভ্যতার মধ্যে রয়েছে– মেসোপটেমীয়, অ্যাসিরীয়, মিসরীয়, সুমেরীয়, হিব্রু ইত্যাদি। প্রাচীন এ সভ্যতাগুলো বিকাশের সমসাময়িককালে পার্শ্ববর্তী ভূমধ্যসাগরের উত্তরে গ্রিক ও রোমান সভ্যতার উত্থান সম্মিলিতভাবে মানবসভ্যতাকে বিশেষ সমৃদ্ধি দান করেছে। নদীকেন্দ্রিক এসব সভ্যতা কৃষি, শিল্প, সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছে। তবে ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরব দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল এবং অস্থিতিশীল। মানব মুক্তির দিশারি হযরত মুহাম্মদ (স) ইসলামের সুমহান বাণী ও উন্নত আদর্শের আলোকে এ দেশকে কেন্দ্র করে একটি সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- ইসলামপূর্ব আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু এবং অধিবাসীদের ওপর এসবের প্রভাব
- প্রাচীন সভ্যতাসমূহের বৈশিষ্ট্য এবং এগুলোর প্রভাব
- ইসলামপূর্ব যুগে আরবদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা
- প্রাক-ইসলামি আরবদের কিছু উৎকৃষ্ট গুণাবলি যেমন– সত্যবাদিতা, আতিথেয়তা, ভ্রাতৃত্ববোধ, উদার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	প্রাক-ইসলামি আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য
পাঠ ২	প্রাক-ইসলামি আরবের আবহাওয়া, উৎপন্ন দ্রব্য ও জীবজন্তু
পাঠ ৩ ও ৪	আরবের অধিবাসীদের জীবনাচরণে ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের প্রভাব
পাঠ ৫	প্রাচীন সভ্যতা
পাঠ ৬	মিসরীয় সভ্যতা
পাঠ ৭	সভ্যতায় মিসরীয়দের অবদান
পাঠ ৮	সুমেরীয় সভ্যতা
পাঠ ৯	ব্যাবিলনীয় এবং হিব্রু সভ্যতা
পাঠ ১০	গ্রিক সভ্যতা
পাঠ ১১	রোমান সভ্যতা
পাঠ ১২	আইয়ামে জাহেলিয়া এবং প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
পাঠ ১৩	প্রাক-ইসলামি আরবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা
পাঠ ১৪	প্রাক-ইসলামি আরবের ধর্মীয় অবস্থা
পাঠ ১৫	প্রাক-ইসলামি আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা

পাঠ ১

প্রাক-ইসলামি আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য
Geographical Location and Geo-Natural Features of Pre-Islamic Arabia

আরবের নামকরণ

হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র সামের নামানুসারে আরব দেশকে সেমিটিক নামে অভিহিত করা হয়। আরবরা সেমিটিক জাতিরই বংশধর। 'আরব' শব্দটি 'আরবাতুন' থেকে এসেছে, যার অর্থ বৃক্ষলতাহীন মরুভূমি। তবে 'আরব' শব্দটির উৎপত্তির বিষয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে নানা মত রয়েছে। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন হেজাজের তায়ামা প্রদেশের 'আরাবা' অঞ্চলের নাম থেকে আরব শব্দের উৎপত্তি। কেউ কেউ মনে করেন, দক্ষিণ আরবীয়দের আদি পুরুষ কাহতানের পুত্র 'ইয়ারাব'-এর নাম থেকে আরব নামের উৎপত্তি। অন্য সূত্রমতে, হিব্রু 'আবহার' (মরুভূমি) শব্দ থেকে আরব শব্দের উৎপত্তি। আবার কেউ মনে করেন, 'আরব' শব্দের আভিধানিক অর্থ বাগ্মিতা। আরবের অধিবাসীরা বাগ্মী হওয়ায় ধারণা করা হয় যে, তাদের আবাসভূমির নাম রাখা হয়েছে আরব। তবে মরুময় বৈশিষ্ট্যের কারণে ঐ অঞ্চলের আরব নামকরণের পক্ষেই অধিকাংশের মত। আরব উপদ্বীপটির তিন দিক সাগর এবং একদিক স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় আরববাসী তাদের ভাষায় একে 'জাজিরাতুল আরব' বা আরব উপদ্বীপ বলে অভিহিত করেছে।

ভৌগোলিক অবস্থান

ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি ভূমি আরব উপদ্বীপের অবস্থান এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এ উপদ্বীপের উত্তরে রয়েছে সিরিয়ার মরুভূমি, পূর্বে পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে আরব উপদ্বীপ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এদেশের মাটি পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা। তাই পবিত্র কুরআনে আরবের মক্কা-নগরীকে 'উম্মুল কুরা' বা আদি নগরী বলা হয়েছে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, আরব দেশটি কোনো এক সময়ে বৃহৎ সাহারা মরুভূমির একটি অংশ হিসেবে পরিগণিত হতো। কিন্তু কালক্রমে নীলনদ ও লোহিত সাগর দ্বারা এটি আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিখ্যাত আরব গবেষক ও ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি (Philip Khuri Hitti) আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনায় বলেন, "ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচার করলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, গোটা সিরিয়া-মেসোপটেমিয়া মরুভূমি আরবেরই অংশবিশেষ।"[১]

আরবের আয়তন ও লোকসংখ্যা: পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ আরবের আয়তন ১.২ মিলিয়ন বর্গমাইল (৩২,৩৭,৫০০ বর্গ কিলোমিটার)। ভারতীয় ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা শিবলী নোমানীর মতে, আরব উপদ্বীপের দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল ও প্রস্থ ৬০০ মাইল এবং আয়তন সর্বমোট ১২ লক্ষ বর্গমাইল। আয়তনে এটি ইউরোপের এক-চতুর্থাংশ এবং আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলীর মতে, ফ্রান্সের চরম উৎকর্ষের সময় ঐ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি যতখানি ছিল, এ বিশাল ভূখণ্ডের বিস্তৃতি প্রায় তার দ্বিগুণ। বর্তমানে (২০২৩) এ অঞ্চলের জনসংখ্যা ৯৫ মিলিয়নের মতো। *(সূত্র: Wikipedia)* মরুভূমি অঞ্চল বলে এখানে আয়তনের তুলনায় জনবসতি কম।

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমগ্র আরব উপদ্বীপ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা: (ক) মরু অঞ্চল (Arabian Desert) (খ) পাহাড়ি অঞ্চল (Arabia Petraea) এবং (গ) উর্বর অঞ্চল (Arabia Felix)। এগুলো আরবের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণে অবস্থিত।

ক. **মরু অঞ্চল:** আরবের অধিকাংশ অঞ্চল মরুময় এবং অনুর্বর। পি. কে. হিট্টির মতে, এ মরু অঞ্চল সিরিয়ার মরুভূমি ও আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি এবং গোবি মরুভূমির একটি বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র। ভূপ্রকৃতির তারতম্য অনুসারে এ মরু অঞ্চল

---

[১] "Geologically, indeed, the whole Syria-Mesopotamian desert is a part of Arabia."– Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, Macmillan, 1960, p.14

তিন ভাগে বিভক্ত। যথা: (i) আল-নুফুদ, (ii) আদ-দাহনা ও (iii) আল-হার্‌রাহ। আরবের উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত শ্বেত ও লোহিত বালুকায় পরিপূর্ণ এলাকা 'আল-নুফুদ' নামে পরিচিত। এ অঞ্চল প্রায়ই শুষ্ক থাকে, কখনও কখনও শীতকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও তা তৃণ-গুল্মাদিতে আচ্ছাদিত থাকে। ফলে মরুবাসী আরবরা নিজেদের জীবনধারণের জন্য উপযোগী হওয়ায় এ অঞ্চলে বসবাস করত। নুফুদ প্রদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণে হাজরামাউত এবং পশ্চিমে ইয়েমেন থেকে পূর্ব ওমান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল 'আদ-দাহনা' নামে পরিচিত। এ অঞ্চল খুবই উত্তপ্ত এবং বসবাসের অনুপযোগী। তবে সাময়িক বৃষ্টিপাতের ফলে জমির উর্বরতা বেড়ে গেলে বেদুইনরা এ অঞ্চলে স্বল্পকালীন বসতি গড়ে তোলে। ব্রিটিশ প্রাচ্য-ভাষাবিদ বার্ট্রান্ড থমাস (Bertrand Thomas) আল-দাহনার দক্ষিণ অঞ্চলকে 'আল-রাব আল-খালি' বা জনপদহীন অঞ্চল (No man's Land) বলে উল্লেখ করেন। আরবের মধ্য ও পশ্চিমাংশে অবস্থিত অসমতল, লাভা আচ্ছাদিত ফাটলযুক্ত প্রস্তরময় আগ্নেয়গিরি অঞ্চলকে 'আল-হার্‌রাহ' বলা হয়। অতিরিক্ত উষ্ণতা ও ভূমির অনুর্বরতার জন্য এ অঞ্চলটিও বসবাসের জন্য উপযোগী নয়।

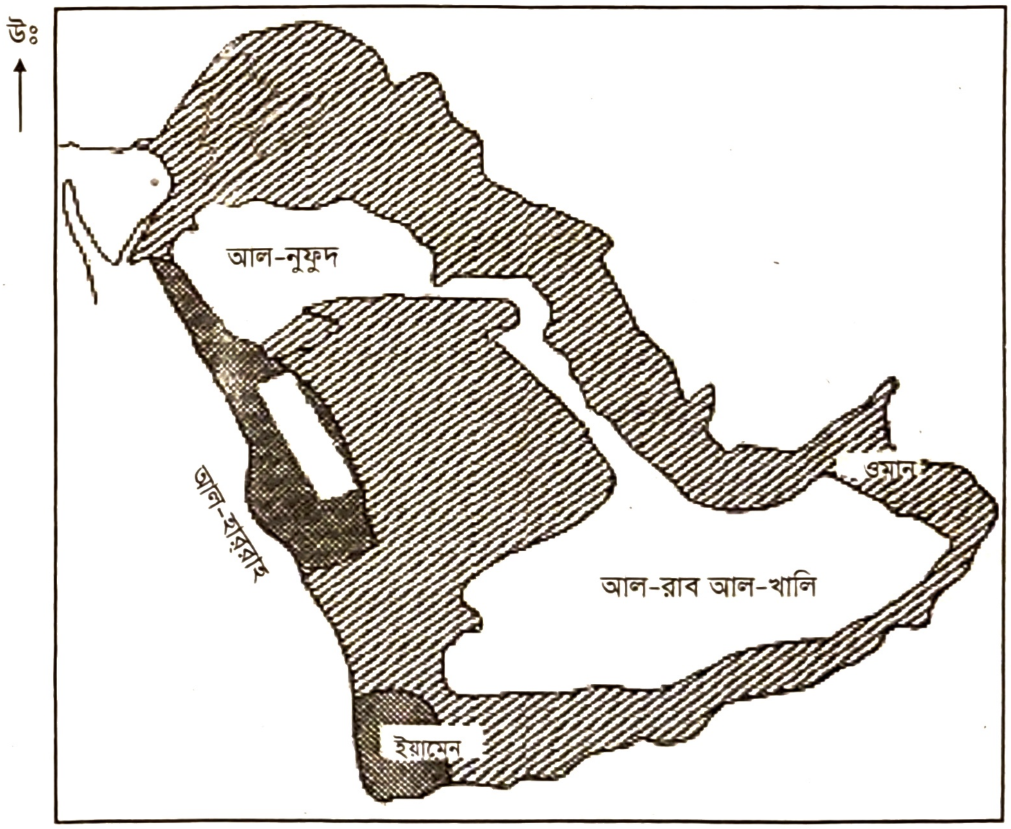

আরব ভূখন্ড (ভূপ্রকৃতি)

খ. পাহাড়ি অঞ্চল: আরবের উত্তরে নজদ ও হেজাজ এবং দক্ষিণের ওমান ও হাজরামাউত প্রদেশে অনেক পাহাড়-পর্বত ও উঁচু মালভূমি দেখা যায়। পশ্চিম দিকে লোহিত সাগরের তীরব্যাপী উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একটানা পর্বতমালাকে আরব অঞ্চলের মেরুদন্ড বলা হয়। এর পর্বতশ্রেণি উত্তর দিকে মিডিয়ানে ৯,০০০ ফুট ও দক্ষিণে আল-ইয়েমেনে ১৪,০০০ ফুট উচ্চতা স্পর্শ করেছে। ইয়েমেন প্রদেশের উচ্চ ভূখণ্ডের এ পর্বতশ্রেণিকে জাবালুল ইয়েমেন (ইয়েমেনের পাহাড়) বলে, যা প্রায় আল্পস পর্বতের প্রধান শৃঙ্গ মাউন্ট ব্ল্যাঙ্কের সমান উঁচু। লোহিত সাগর অভিমুখী পশ্চিম ঢালের পর্বতশ্রেণিটি ছোট ও খাড়া। উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশগুলো কিছুটা নিম্নভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তর-মধ্য মালভূমি নাজদ্-এর গড় উচ্চতা ২,৫০০ ফুট। এর পর্বতশ্রেণিতে শাম্‌মারা-এর লাল গ্রানাইট পাথরে সমৃদ্ধ 'আজা' নামে একটি পর্বতশ্রেণি আছে। এর উচ্চতা ৫,৫০০ ফুট। আরবের উপকূল ভাগের নিম্নভূমির পেছনে তিন দিক দিয়েই বিভিন্ন উচ্চতার পর্বতশ্রেণি রয়েছে। ওমানের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত আল-জাবাল-আল-আখদারের শীর্ষদেশের উচ্চতা ৯,৯০০ ফুট।

গ. **উর্বর অঞ্চল:** মরু ও পার্বত্য এলাকা ছাড়াও আরব ভূখণ্ডে উর্বর তৃণভূমি অঞ্চল বিদ্যমান। আরবের এ তৃণভূমি অঞ্চল কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত। যেমন– হেজাজ, ইয়েমেন, নজদ, হাজরামাউত ও ওমান। হেজাজ, নজদ মধ্য আরবে এবং ইয়েমেন, হাজরামাউত ও ওমান দক্ষিণ আরবে অবস্থিত। এ প্রদেশগুলোর মধ্যে আরবের মধ্যভাগে অবস্থিত হেজাজই হলো ইসলামের কেন্দ্রভূমি। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী হেজাজের পরিচয়ে বলেন, "হেজাজ একটি বিচ্ছিন্ন দেশ, বিশেষত মক্কার চতুর্দিকের ভূখণ্ডকেই হেজাজ বলে।"[২] মক্কা নগরী লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূল থেকে ৫০ মাইল পূর্বে এবং স্ফটিক পর্বত জাবালুল কুরা থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। হেজাজের বিখ্যাত শহর মক্কা, মদিনা ও তায়েফ শস্য-শ্যামল, ছায়া-শীতল হওয়ায় কৃষি উৎপাদন ও মানুষের বসবাস উপযোগী। হেজাজের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোও কৃষি উৎপাদনের উপযোগী হওয়ায় মানুষ ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করেছে। ইয়েমেন, হাজরামাউত ও ওমান নিয়ে দক্ষিণ আরব গঠিত। এ প্রদেশগুলোতে পাহাড়ি ও অনাবাদি অঞ্চল থাকলেও কয়েকটি উর্বর ও বিস্তৃত উপত্যকা রয়েছে। এ উর্বর ভূ-খণ্ডগুলোতে কফি, নীল, খেজুর, শাকসবজি ও বিভিন্ন ফল ও ফসলের উৎপাদন হয়ে থাকে। এর ফলে আরবের এ অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ এবং কৃষি ও বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। 'ইয়েমেন' শব্দের অর্থ সুখী বা সৌভাগ্যবান। এছাড়া এ অঞ্চলগুলো কৃষি উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, রকমারি পণ্যদ্রব্যের কেন্দ্রস্থল ও ধন-সম্পদের কেন্দ্রভূমি হওয়ায় প্রাচীনকালে একে 'সুখী আরব-ভূমি' বা 'আরবদের সৌভাগ্য' (Arabia Felix) বলা হতো।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আরব দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

২. আরবরা কোন জাতির বংশধর?

৩ 'আরব' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

৪ পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপের নাম কী?

৫. ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমগ্র আরব উপদ্বীপ কয়ভাগে বিভক্ত? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

৬. আরবের কোন অঞ্চলকে 'সুখী আরব-ভূমি' বা 'আরবদের সৌভাগ্য' বলা হয়?

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. মানচিত্র এঁকে প্রাক-ইসলামি আরবের ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করো।

২. প্রাক-ইসলামি আরবের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে একটি ছক তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

দুটি দলে ভাগ হয়ে প্রাচীন আরবের উর্বর ও অনুর্বর অঞ্চলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে উর্বর অঞ্চলে উৎপাদিত ফসলের নাম লেখো।

---

[২] Hijaz is a broken country, especially round about Mecca. – Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens,* p.2

পাঠ ২

প্রাক-ইসলামি আরবের আবহাওয়া, উৎপন্ন দ্রব্য ও জীবজন্তু
Climate, Products and Animals of Pre-Islamic Arabia

আবহাওয়া ও জলবায়ু

কিছু উপকূলীয় অঞ্চল ও জলবিধৌত উপত্যকা ছাড়া আরবের সর্বত্র আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক ও উত্তপ্ত। অভ্যন্তরীণ নদ-নদীর অভাবে উত্তপ্ত মরু অঞ্চল শুষ্ক, রুক্ষ, রৌদ্র দগ্ধ ও গাছপালা শূন্য এবং 'লু' হাওয়া প্রবাহিত এলাকা। পি. কে. হিট্টি বলেন, "পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রবেষ্টিত হলেও সেই জলরাশি এখানকার ভূমি সিক্ত করতে পারেনি। কারণ, আরব ভূমির অধিকাংশই আফ্রিকা ও এশিয়ার বৃষ্টিহীন প্রান্তর।"[৩] দক্ষিণের মহাসমুদ্র থেকে প্রাকৃতিক কারণে মেঘ ওঠে কিন্তু মরুর বালুঝড় (সাইমুম) তা শুষে নেয়। বাতাসে আর জলীয়বাষ্প অবশিষ্ট থাকে না। হেজাজ প্রদেশেও বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। হেজাজের গড় তাপমাত্রা ৭০°F। হেজাজ প্রদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত মরূদ্যানগুলো মানুষের বসবাসের উপযোগী। ওমান, হাজরামাউত প্রভৃতি অঞ্চল সমুদ্রের কাছাকাছি ও বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা হওয়ায় এখানে উর্বর ভূমির সাথে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার উপস্থিতি রয়েছে।

আরবে উৎপন্ন কৃষিপণ্য ও গাছপালা

শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়া, অনুর্বর ও লবণাক্ত ভূমির জন্য আরব উপদ্বীপে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হয় না। খেজুর আরবদের নিত্য আহার্য এবং এটিই তাদের প্রধান কৃষিপণ্য। হেজাজ প্রদেশে প্রচুর খেজুর উৎপন্ন হয়। ইয়েমেন ও কয়েকটি মরূদ্যানে গমের চাষ হয়। ঘোড়ার খাদ্য হিসেবে বার্লির চাষ করা হয়। কয়েকটি অঞ্চলে ভুট্টা এবং ওমান ও আল-হাসায় ধান চাষ হয়। তায়েফে প্রচুর আতা, ডুমুর, ডালিম, পীচ ও আঙুর ফল উৎপন্ন হয়। এছাড়া আরবে উৎপাদিত ফলের মধ্যে বেদানা, আপেল, খুবানি, কমলালেবু, কাগজিলেবু, আখ, তরমুজ ও কলা উল্লেখযোগ্য।

মুসলিম সাহিত্যিক ইবনে কুতাইবা-এর *(উয়ূন আল-আখবার, ৩য় খণ্ড)* মতে, খেজুর ও দুধ বেদুইনদের খাদ্যতালিকার প্রধান খাবার এবং উটের মাংস তাদের সবচেয়ে প্রিয়। খেজুরের রস আরবদের একটি শৌখিন পানীয়। গাঁজানো খেজুরের রস থেকে 'নাযীব' নামের উন্নতমানের মদ তৈরি হতো। এর বীজ গুঁড়া করে উটকে খাওয়ানো হয়। গাছপালাহীন আরব মরুভূমিতে খেজুর গাছের কাঠ জ্বালানি ও ঘরের ছাদ নির্মাণে ব্যবহৃত হতো। খেজুরের আঁশ শক্ত দড়ি তৈরিতে সহায়ক উপাদান হিসেবে পরিচিত। খেজুরের নানাবিধ ব্যবহার ও খেজুর গাছের উল্লিখিত গুণাবলির জন্য আরববাসী এ গাছকে 'গাছের রানি' (The Queen of the Trees) বলে থাকেন। এছাড়া আরবের গুগ্‌গুল বা ধুনাগাছ, মরু অঞ্চলে চিরহরিৎ ঝাউগাছ, বাবলা গাছ, সামাহ্ গাছ, মশলাজাতীয় কন্দ ও সোনামুখী গাছ অন্যতম।

আরবের জীবজন্তু

প্রাক-ইসলামি আরবে বাণিজ্যিক কাফেলা হিসেবে উট

ভৌগোলিক বৈচিত্র্যময় আরব উপদ্বীপে বিচিত্র জীবজন্তু ও পশুপাখির সন্ধান পাওয়া যায়। জীবজন্তুর মধ্যে চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ, খেঁকশিয়াল, হায়েনা, গিরগিটি ও সাপ প্রধান। পি. কে. হিট্টি বলেন, "উপদ্বীপের প্রাচীন কবিদের লেখায় প্রায়ই উল্লিখিত সিংহের অস্তিত্ব এখন আর নেই বললেই চলে।"[৪] আরবের গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল, ভেড়া, ছাগল ও দুম্বা অন্যতম। আরব উপদ্বীপে শিকারি পাখির মধ্যে ঈগল, বাজপাখি, বাসটার্ড ও পেঁচা অন্যতম। এছাড়া ঝুটিওয়ালা পাখি হুদহুদ, ভরতপাখি, নাইটিঙ্গেল, বুলবুল, পায়রা, তিতির পাখি এবং প্রচুর কাকও এ উপদ্বীপে দেখা যায়।

i. **আরবীয় উট:** আরবের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই উটের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উট ছাড়া মরুবাসী আরবদের জীবন কল্পনা করা যায় না। আরবে নৌ-চলাচলের উপযোগী কোনো নদ-নদী না থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান বাহন ছিল উট। বিশাল প্রতিকূল পরিবেশে মরু পাড়ি দেওয়ার জন্য উটের বিকল্প ছিল না। তাই উটকে

---

[৩] Though sandwiched between seas on the east and west, those bodies of water are too narrow to break the climatic continuity of the Africa-Asian rainless continental masses. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs,* p.17

[৪] The lion, frequently cited by the ancient poets of the peninsula, is now extinct. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs,* p.20

'মরুভূমির জাহাজ' (The Ship of the Desert) বলা হয়। পি. কে. হিট্টি বলেন, "উটের সাহায্য ছাড়া মরু অঞ্চল কখনই মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারত না। উট ছিল যাযাবরদের ধাত্রীসম, তাদের যাতায়াতের বাহন ও আদান-প্রদানের মাধ্যম।"[৫] উট আরবদের খাদ্য ও পানীয় যোগাতো এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতো। আরবরা পানি না থাকলে উটের দুধ পান করে তৃষ্ণা মেটাতো। উটের মাংস তাদের অধিক প্রিয় ও উপাদেয় খাদ্য ছিল। আরবরা উটের চামড়া দিয়ে তাঁবু ও পশম দিয়ে শীতবস্ত্র প্রস্তুত করত। উটের মল একটি উৎকৃষ্ট জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং এর মূত্র চুলের টনিক ও ওষুধরূপে ব্যবহৃত হতো। আরবের উটগুলো শীতকালে প্রায় ২৫ দিন ও গরমকালে প্রায় ৫ দিন পানি পান না করে চলতে পারে। তাই রাজ্যবিস্তার, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উট অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। পবিত্র কুরআন মজিদে উটকে আরববাসীর জন্য এক বিশেষ নেয়ামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। (সূরা আন নাহ্ল: ৫-৮) এছাড়া হযরত উমর (রা) বলেন, "উট যেখানে উন্নত, আরবরাও সেখানে উন্নত।"

ii. **আরবীয় ঘোড়া:** আরবে ঘোড়ার স্থান ছিল উটের পরেই। আরবের দ্রুতগামী তেজি ঘোড়া বিশ্ববিখ্যাত। হযরত ঈসা (আ) এর জন্মের ২০০০ বছর আগে কাসাইট (Kassites) ও হিট্টাইটরা (Hittites) এ অঞ্চলে ঘোড়া আমদানি করেছিল বলে জানা যায়। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "খ্রিষ্টীয় যুগ সূচনার আগেই সিরিয়া থেকে আরবে ঘোড়া আনা হয়েছিল এবং এখানেই ঘোড়াগুলো তাদের বংশশুচিতা অক্ষুণ্ন রেখেছিল।"[৬] ঘোড়া পালন কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল হলেও ঘোড়দৌড়, শিকার ও যুদ্ধক্ষেত্রে এর ব্যবহার ছিল। প্রফেসর হিট্টি বলেন, "ক্রুসেড আমলে বিলেতি ঘোড়া পুনরায় আরবীয় ঘোড়ার সহমিশ্রণে নুতনত্ব লাভ করে।[৬.১]

প্রাক-ইসলামি আরবের প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাচীনকালে আরব দেশের অল্প কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ পাওয়া যায়। ভূগোলবিদ আল-মুকাদ্দাসি (আহসানা-উত-তাকাসিম) ও আল-হামদানির (সিফাত-ই-জাজিরাতুল আরব) বর্ণনায় জানা যায়, প্রাচীনকালে আরবদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরের ইয়েমেন উপকূল ও কেন্দ্রীয় আরবের কয়েকটি স্থানে খাঁটি সোনা পাওয়া যেত। আরব উপদ্বীপের নাজম নামের বৃত্তাকার এলাকার সর্বত্র চুনাপাথর এবং শাম্মারা শৃঙ্গে মূল্যবান গ্রানাইট ও ব্যাসল্ট পাওয়া যেত। এছাড়া পারস্য উপসাগরের মুক্তা ও খনিজ লবণ এবং আধুনিককালে আরবদেশে আবিষ্কৃত বহু তেলের খনি আরবদের আয়ের প্রধান উৎস।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মরুভূমির বালুঝড়কে কী বলা হয়?
২. আরবের প্রধান কৃষিপণ্য কী? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
৩. আরবে খেজুরের রস থেকে তৈরি করা মদের নাম কী?
৪. কোন প্রাণীকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৫. কুরআনে কোন প্রাণীকে আরববাসীর জন্য বিশেষ নেয়ামত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে?
৬. প্রাচীন আরবে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী ছিল কোনটি?

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আরবে উৎপন্ন কৃষিপণ্য, গাছপালা এবং এ অঞ্চলের বিচিত্র জীবজন্তুর একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[৫] Without it (Camel) the desert could not be conceived of as a habitable place. The camel is the nomad's nourisher, his vehicle of transportation and his medium of exchange. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 21

[৬] From Syria it was introduced before the beginning of our era into Arabia, where it had the best opportunity to keep its blood pure and free from admixture.–Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.20

[৬.১] "During the crusade the English horse received Fresh stairs of blood through contact with the Arab." – P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 21

পাঠ ৩ ও ৪

আরবের অধিবাসীদের জীবনাচরণে ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের প্রভাব
Impact of Geographical Location and Features on the Lifestyle of the Inhabitant of Arabia

আরবের অধিবাসীদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

আরব উপদ্বীপে সর্বপ্রথম কারা বসতি স্থাপন করেছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, "পূর্ব আরবের সীমান্ত ছিল মেসোপটেমিয়ার দিকে। এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী হলো সুমেরীয় ও আক্কাদীয়রা।"[৭] সৈয়দ আমীর আলীর মতে, "প্রাচীন ক্যালডীয় জাতি যে বংশ থেকে উদ্ভূত আরবের পূর্বতন অধিবাসীরাও সেই বংশোদ্ভূত।"[৮] জার্মান ঐতিহাসিক ইউজেন ফিসার (Eugen Fischer) আরব উপদ্বীপের মানুষের লম্বা মাথা, চাপা মুখমণ্ডল, বাঁকা নাক, লম্বা দেহ পর্যবেক্ষণ করে আরবদের পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীর একটি অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। জার্মান শিক্ষাবিদ কার্ল ব্রোকেলম্যান (Carl Brokelmann) এসব পর্যবেক্ষণ করে বলেন, "এরা (আরব জাতি) ভূমধ্যসাগরীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী।"[৯] মেসোপটেমীয়, মিসরীয়, হিব্রু সভ্যতার অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান করায় এ কথা বলা যায় যে, আরব উপদ্বীপে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছিল। আরব গবেষক ও ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন আরবদের নিচে বর্ণিত ৩টি জাতিতে বিভক্ত করেছেন।

ক. আরব-ই-বায়দা (Arab-i-Baidah বা আদিম আরব): আরবের আদিম অধিবাসীদেরকে 'আরব-ই-বায়দা' বলা হয়। বায়দা বা বাদিয়া অর্থ জঙ্গাল। বাদিয়াদের বেদুইন বলে। পবিত্র কুরআন শরিফে বর্ণিত প্রখ্যাত বংশ— ১. 'আদ' (Ad) ২. 'ছামুদ' (Samud) ৩. 'তাছম' (Tasm), ৪. 'জাদীস' (Jadis) ৫. 'জারহাম' (Jarham), এবং ৬. 'আসালিকা' (Asalika) বংশ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আরবের পরবর্তী জাতিগুলোর আবির্ভাবে এ জাতিগুলো বিলুপ্ত হয়েছিল।

খ. আরব-ই-আরিবাহ্ (Arab-i-Ariabah): আরব-ই-বায়দার ধ্বংসপ্রাপ্তির পর আরব উপদ্বীপে যে জাতিগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছিল তারাই আরব-ই-আরিবাহ নামে পরিচিত। এ জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলো দক্ষিণ আরবের 'বনু কাহ্তান' (Banu Qahtan) বংশ। এরা দক্ষিণ আরব বা ইয়েমেনে বাস করত বলে এদেরকে 'হিমারীয়' বা 'ইয়েমেনীয়' নামেও অভিহিত করা হয়। ইতিহাসে এ জাতি 'আরব-ই-আরিবাহ' বা প্রকৃত আরব নামে খ্যাত। দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন ও হাজরামাউতে কাহতান গোত্রের উত্থানের মধ্য দিয়ে আরবের সত্যিকারের ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলীর মতে, ইয়েমেন ও হাজরামাউতে বসবাসকারী সেমেটিকরা হযরত নুহ (আ)-এর পুত্র সাম-এর বংশধর ছিল। সামের দুই পুত্র ছিল কাহতান ও আদনান। কাহতানের জারহাম ও ইয়ারিব নামে দুই পুত্র ছিল। জারহাম ছিলেন হেজাজের এবং ইয়ারিব ছিলেন ইয়েমেনের শাসক। এই দুই জনের মধ্যে ইয়ারিব ও তার পৌত্র আবদুস্ শামসের (ডাক নাম সাবা) (Servant of the sun) নামানুসারে এ বংশের রাজাদের 'সবীয়' বলা হতো।

গ. আরব-ই-মুস্তারিবাহ্ (Arab-i-Mustaribah): উত্তর আরবের অধিবাসীদের 'আরব-ই-মুস্তারিবাহ্' (Arabi-i-Mustaribah) বলা হয়। এ জাতির প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহিম (আ)-এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর আদনান। আদনানের দুজন বংশধর ছিলেন নিযার ও মাদার। এজন্য ইসমাঈলীয় সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের নামানুসারে আদনানীয় (Adnanites) বা নিযারীয় (Nizarites) বা মুদারীয় (Mudarites) নামেও পরিচিত। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স) আরব-ই-মুস্তারিবাহ এর অন্তর্ভুক্ত।

---

[৭] Eastern Arabia bordered on Mesopotamia. The early inhabitants of that region, the Sumerians and Akkaians. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs,* p.36

[৮] The earliest settlers are said to have been of the same stock as the ancient Chaldeans. –Ref: Syed Ameer Ali: *A Short History of the Saracens,* p.3

[৯] It is a variety of the Mediterranean race dominant in the north Africa. –Ref: Carl Brockelmann, *History of the Islamic Peoples,* p.2

অবস্থানগত দিক থেকে আরবের অধিবাসী: ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে আরবের অধিবাসীরা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত– (ক) নগরবাসী বা স্থায়ী বাসিন্দা ও (খ) মরুবাসী বেদুইন বা যাযাবর।

ক. নগরবাসী আরব বা আরবের স্থায়ী বাসিন্দা: আরবের যেসব অধিবাসী শহরে বা লোকালয়ে বসবাস করে তারাই নগরবাসী বা স্থায়ী বাসিন্দা। প্রাচীন আরবের প্রায় ২০% জনগোষ্ঠী ছিল শহরবাসী। ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের প্রধান অবলম্বন এবং এর মাধ্যমে তারা বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করত। বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের ফলে এরা ছিল মরুবাসী বেদুইনদের তুলনায় অধিকতর রুচিসম্পন্ন, মার্জিত ও সংস্কৃতিমনা। ওমান, ইয়েমেন, হাজরামাউতের উর্বর অঞ্চলে প্রথম দিকে নগর গড়ে উঠলেও কালক্রমে পানির উৎসকে কেন্দ্র করে মক্কা, মদিনা, তায়েফ, ইয়াসরিবসহ বিভিন্ন স্থানে নগর গড়ে ওঠে এবং নগরবাসী স্থায়ী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

খ. মরুবাসী বেদুইন বা যাযাবর আরব: আরবের অল্প কিছু স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া বাকি সব অধিবাসীকেই বেদুইন বলে অভিহিত করা যায়। মুহম্মদ রেজা-ই-করীমের মতে, “যাদের স্থায়ী বাসস্থান নেই তারাই বেদুইন বা যাযাবর।” সৈয়দ আমীর আলীর মতে, “মরুবাসী আরবদের বেদুইন বলা হয়।” অর্থাৎ যে সমস্ত আরব মরুপ্রান্তরকে ভালোবেসে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে তারাই বেদুইন। আরব অধিবাসীদের শতকরা ৮০% মরুভূমির বাসিন্দা (যাযাবর)। এজন্য তাদের ‘আহল-উল-বাদিয়া’ বা মরুবাসীও বলা হয়। বেদুইনরা কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে না। গৃহপালিত পশুর ঘাস ও পানির সন্ধানে তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে বেড়ায়। চলার পথে কোনো তৃণভূমি অথবা পানির সন্ধান পেলে তারা তাঁবু ফেলে। বেদুইনদের সাথে স্বার্থান্বেষী শহরবাসীর সংঘর্ষ প্রায় লেগেই থাকে। এ কলহের মূল কারণ উভয় দলের আত্মরক্ষা ও স্বার্থ সংরক্ষণের প্রাণান্ত চেষ্টা। মরুবাসী বেদুইনদের জীবনাচরণে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—

১. **উদ্দাম জীবনযাপন:** মরুবাসী বেদুইনরা বরাবরই উদ্দাম ও বেপরোয়া। পি. কে. হিট্টি বলেন, “চারিত্রিক দিক থেকে যাযাবর সম্প্রদায় অতীতে যা ছিল, ভবিষ্যতে যা হবে, এখনও ঠিক তাই রয়েছে। তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও একই রকম রয়ে গেছে। পরিবর্তন, অগ্রগতি ও বিবর্তনের নিয়ম মেনে নিতে তারা প্রস্তুত নয়।”[১০] মরুভূমির উগ্র কঠোর প্রকৃতি, পানির স্বল্পতা, অসহ্য উত্তাপ, অনুর্বরতা ও খাদ্যের অভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তারা হয়েছে উদ্দাম ও অপ্রতিরোধ্য। জীবনধারণের জন্য তারা পশুপালনের সাথে সাথে বিভিন্ন বাণিজ্য কাফেলা ও আশপাশের বসতিতে লুটতরাজ চালাত। হিট্টির মতে, “গাযওয়া (যুদ্ধ) বলে পরিগণিত লুটতরাজ ছিল বেদুইনদের অন্যতম পেশা। আলখাল্লা, কোমরবন্ধ, ফিতা দিয়ে বাঁধা শিরস্ত্রাণ তাদের প্রধান পোশাক, কিন্তু তারা জুতা ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়।”

২. **বেদুইনদের গোত্রপ্রথা:** পি. কে. হিট্টির মতে, “বেদুইন সমাজের ভিত্তি হলো গোষ্ঠীবদ্ধতা”। বেদুইনরা পরিবারবদ্ধ হয়ে তাঁবুতে বসবাস করে। এ রকম কয়েকটি তাঁবু নিয়ে গঠিত হয় একটি শিবির বা ‘হাই’ (hayy) এবং একাধিক ‘হাই’-এর সদস্যরা মিলে গঠন করে গোষ্ঠী বা ‘কওম’ (Qawm)। স্বজাতীয় কয়েকটি গোষ্ঠী একত্রিত হলে গড়ে ওঠে একেকটি উপজাতি বা ‘কাবিলা’ (Qabilah)। কাবিলা বা গোত্রের প্রধানকে ‘শেখ’ বলা হতো। বয়োজ্যেষ্ঠতা, বিজ্ঞতা, সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি গুণের ভিত্তিতে শেখ নির্বাচিত হতো। বিচারসংক্রান্ত, সামরিক ও জনকল্যাণকর কার্যাবলির ব্যাপারে শেখরা গোত্রীয় পরিষদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। প্রত্যেক বেদুইন গোত্রের একেকটি নির্দিষ্ট এলাকা ছিল যা ‘জিরা’ নামে পরিচিত। বৃষ্টিপাত বেশি হলে তারা নিজেদের ‘জিরায়’ অবস্থান করত, কিন্তু অনাবৃষ্টির কারণে চারণভূমির অভাব হলে তারা প্রতিবেশী ‘জিরায়’ যেত। পূর্বশত্রুতা না থাকলে তারা ঐ ‘জিরার’ সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন করত। এভাবেই গোত্রে গোত্রে বন্ধুত্ব স্থাপিত হতো। আবার কখনও কোনো গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে তা বংশপরম্পরায় চলতে থাকত এবং রক্তের বদলে রক্তই ছিল মরুভূমির আইন।

---

[১০] The nomad, as a type, is today what he was yesterday and what he will be tomorrow. His culture pattern has always been the same. Variation, progress, evolution, are not among the laws he readily obeys. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 23

৩. **আসাবিয়া বা গোত্রীয় চেতনা:** গোত্রীয় চেতনা, গোত্রের জন্য মমত্ববোধ ও জান-মাল উৎসর্গ করার মনোভাবকে আসাবিয়া বা 'গোত্রীয় চেতনা' বলা হয়। এ প্রেরণার মূলমন্ত্র হলো গোষ্ঠীর অন্য সদস্যদের প্রতি সীমাহীন ও নিঃশর্ত আনুগত্য। বেদুইনদের গোত্রীয় চেতনা এতই প্রবল ছিল যে তারা নিজ গোত্রবহির্ভূত সবকিছুকে বিজাতীয়, ঘৃণার পাত্র ও শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে করে; যা স্বগোত্রীয় সংহতিকে সযত্নে রক্ষা করে এবং পুরুষানুক্রমে গোত্রে গোত্রে শত্রুতা ও কলহ সঞ্জীবিত রাখে। বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন *(কিতাবুল ইবার)* -এর মতে, বিভিন্ন রাজ্যের উত্থান-পতনের মূলে আরবদের এ 'আসাবিয়াই' বিভিন্নভাবে ভূমিকা রেখেছে।

৪. **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও আতিথেয়তা:** মরুবাসী বেদুইনরা জঙ্গলে বিচরণ করা হরিণের মতো। তাই এরা আঞ্চলিকতা ও জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী নয়। পি. কে. হিট্টির মতে, "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাদের মনের এত গভীরে প্রবেশ করেছিল যে, বেদুইনরা কখনই নিজেদের আন্তর্জাতিক মানের সামাজিক জীবের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেনি।" রক্তের বদলে রক্তের নীতিতে বিশ্বাসী হলেও তারা ছিল খুবই অতিথিপরায়ণ। যত বড় শত্রুই হোক না কেন কোনো বেদুইনের ঘরে আশ্রয় নিলে আশ্রয়দাতা তাকে খুবই সমাদর করতেন।

জেনে রাখো

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) তত্ত্বে মানুষকে একজন ব্যক্তি হিসেবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মনে করা হয়, ব্যক্তি মানুষের অবাধ বিকাশ সমাজের জন্য সর্বাধিক মঙ্গলজনক। এ মতবাদের প্রবক্তারা (অ্যাডাম স্মিথ, জন স্টুয়ার্ট মিল ও হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ) মনে করেন, রাষ্ট্র বা সরকারের নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব হ্রাস করে মানুষকে ব্যক্তিগত পরিসরে তার আকাঙ্ক্ষা মতো উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা দিলেই ব্যক্তি ও সমাজজীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের চেতনাই ধীরে ধীরে গোষ্ঠী চেতনায় রূপ নেয়, যা ছিল বেদুইন সমাজের মূল ভিত্তি।

আরব জীবনে ভূপ্রকৃতির প্রভাব

আরব উপদ্বীপের বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়া এর অধিবাসীদের জীবনযাত্রায়, দৈহিক ও মানসিক গঠনে, চরিত্র রূপায়ণে, সামাজিক আচার-আচরণে, ধর্মীয় চেতনা ও রাজনৈতিক জীবন দর্শনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে আরব অধিবাসীদের জীবনাচরণেও এগুলোর নানা প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১. আরব দেশের শুষ্ক আবহাওয়া, অনাবৃষ্টি, ভূমির অনুর্বরতা, পানীয় জলের অভাব, চারণ ভূমির স্বল্পতার জন্য আরবরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করত। প্রকৃতির সাথে লড়াই করতে করতে তারা একদিকে যেমন রুক্ষ, দুঃসাহসী, দুর্ধর্ষ সৈনিক; অন্যদিকে তারা কষ্টসহিষ্ণু, কঠোর পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল হয়ে গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য মরুকে ভালোবেসে গড়ে ওঠে বেদুইন বা যাযাবর গোষ্ঠী। মরুভূমিতে অবস্থান করায় বেদুইনরা আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে বেছে নেয় শিকার, পশুপালন ও লুটপাটকে। অন্যদিকে, শহরবাসী আরবরা কৃষি ও বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেদের জীবনমানকে উন্নত করে।

২. নদ-নদী না থাকা, কৃষিযোগ্য জমির স্বল্পতা, আরবের মরূদ্যানগুলোতে জীবনধারণের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন না হওয়া প্রভৃতি কারণে বেদুইনরা পশুচারণকে জীবিকার প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে মরুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তাদের যাযাবর জীবন। তারা খাদ্যের সন্ধানে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করত। মরুময় দুর্গমপথে যাতায়াতের সময় নিরাপত্তার জন্য তারা কাফেলাবদ্ধ হয়ে চলত। এভাবে কাফেলাবদ্ধ হয়ে চলতে থাকায় তারা গোত্রবদ্ধ হয়। গোত্রবদ্ধভাবে চলতে থাকায় তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে আসাবিয়া বা গোত্রপ্রীতি।

৩. আরব দেশের তিন দিকে সাগর অন্যদিকে পাহাড়, উপত্যকা ও মরুভূমি থাকায় প্রতিকূল পরিবেশের কারণেই এ দেশটি দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি প্রভাবমুক্ত ছিল। দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির বাধা-বন্ধনহীন মুক্ত পরিবেশে বসবাসের ফলে আরব বেদুইনরা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

৪. মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশি, সাইমুম ঝড়, লু-হাওয়া প্রভৃতি ঝঞ্ঝাময় প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে একদিকে আরবদের চরিত্রে যেমন যোগ হয়েছে বর্বরতা ও নৃশংসতা, অন্যদিকে সুশীতল ও শ্যামল আবহাওয়া আরবের দক্ষিণাংশের জনগণকে করেছে মার্জিত, দয়ালু ও পরোপকারী। তাই মদিনা, ইয়েমেন ও তায়েফের অধিবাসীরা যখন শান্ত পরিবেশে চিন্তাশীল গঠনমূলক কাজ করছে; তখন মক্কা ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসীরা আত্মকলহ ও গোত্রীয় দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

জেনে রাখো

মরুভূমির উত্তপ্ত বালুঝড়কে সাইমুম বলা হয়। মরুর বালুঝড় দক্ষিণের মহাসমুদ্র থেকে প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট মেঘ শুষে নেয়। ফলে বাতাসে আর জলীয় বাষ্প থাকে না। এ কারণে মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে।

৫. ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু আরবদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভ্যাসেও প্রভাব ফেলেছিল। লু-হাওয়া এবং উত্তপ্ত বালুকামিশ্রিত আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য আরববাসী ঢিলেঢালা লম্বা আলখাল্লাজাতীয় পশমের জোব্বা ও মাথায় পাগড়ি পরিধান করে। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণে আরববাসীর খাদ্যাভ্যাসেও বৈচিত্র্য দেখা যায়।

৬. আরব উপদ্বীপের বৈচিত্র্যময় পরিবেশ ও নৈসর্গিক দৃশ্য মরুবাসী বেদুইন ও শহরবাসী আরবদের গভীর আত্মসচেতন ও কাব্যিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করে। ইসলামের আবির্ভাবের যুগেও আরবে মক্কার নিকটবর্তী স্থানে প্রতিবছর উকায মেলা বসত। মেলায় কবিতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতাকে কাবার দেয়ালে স্বর্ণকাপড়ে লিখে ঝুলিয়ে রাখা হতো। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আর. এ. নিকলসনের মতে, "ঐ সময় আরবে কবিতা শুধু গুটিকয়েক রুচিশীল লোকের বিলাসিতা ছিল না, বরং তা ছিল আরবদের সাহিত্য অনুভূতি প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম।"[১১] মূলত ভৌগোলিক পরিবেশ আরবদের মনে সুন্দরতম প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল।

৭. আরববাসীর ধর্মীয় জীবনেও ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব লক্ষণীয়। আরববাসীর এক বিশাল অংশ সূর্য, বড়গাছ, পর্বত, আগুনকে পূজা করত। তবে তাদের বিশ্বাস ধর্মীয় তেমন গভীর ছিল না বলে তারা ধর্মচর্চা থেকে দূরে থাকত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আরবের আদিম অধিবাসী কারা?
২. প্রকৃত আরব নামে খ্যাত কারা?
৩. উত্তর আরবের অধিবাসীরা কী নামে পরিচিত?
৪. মরুবাসী যাযাবরদের কী বলা হয়?
৫. বেদুইন সমাজের ভিত্তি কী ছিল?
৬. প্রাক-ইসলামি আরবের গোত্রপ্রধানকে কী বলা হতো? *[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. প্রাচীন আরব অধিবাসীদের পরিচয় সম্পর্কিত একটি ছক তৈরি করো।
২. আরব জীবনে ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[১১] In those days poetry was no luxury for the cultured few, but the sole medium of the literary expression. –Ref: R.A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs*

পাঠ ৫

প্রাচীন সভ্যতা
Ancient Civilization

পরিবর্তনীয় মানব ইতিহাসে ধাপে ধাপে যে কৃষ্টি দানা বেঁধে উঠেছে তা-ই সভ্যতা নামে পরিচিত। মানব সৃষ্টির সূচনা পর্ব থেকেই মানব সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়। সভ্যতার মাধ্যমে কোন দেশ বা অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, জীবনবোধ, ভাবনা-বিলাস ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবির ধারণা, মানব ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিশেষ কৃষ্টির উদ্ভব ঘটেছিল সেটিই সভ্যতা। বস্তুত দীর্ঘকালের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আধুনিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। মানব সভ্যতার বিকাশের এ ধারাকে ঐতিহাসিকেরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

প্রস্তর যুগ: বিশ্বের ইতিহাসে প্রস্তর যুগ (Stone Age) বলতে মানব ও তার সমাজের বিবর্তনের ধারায় একটা পর্যায়কে বোঝানো হয় যখন মানুষের ব্যবহার্য হাতিয়ার তৈরির মূল উপকরণ ছিল পাথর। প্রস্তর যুগ দুভাগে বিভক্ত। একটি পুরোপলীয় বা প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Paleolithic Age) এবং অন্যটি নব্যপ্রস্তর যুগ, নতুন পাথরের যুগ বা নবোপলীয় যুগ (Neolithic Age) হিসেবে পরিচিত।

পুরোপলীয় যুগ: পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল এখন থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে। এ সময়ের মানুষকে বলা হয় আদিম মানুষ। এরা ফসল ফলাতে ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বানাতে জানত না। তাই জীবনধারণের জন্য তাদের নির্ভর করতে হতো প্রকৃতির ওপর। প্রথম দিকে তারা গাছের বাকল, ফলমূল, লতাপাতা এবং পরে পশু-পাখির মাংস খেয়ে জীবনধারণ করত। এভাবে মানুষ শিকার করতে শেখে এবং শিকারের প্রয়োজনেই পাথর ঘষে অস্ত্র বানাতে এবং আগুন জ্বালাতে শেখে। আদি মানবের এ পর্যায়কে প্রাচীন পাথরের যুগ বা পুরোপলীয় যুগ বলা হয়।

নবোপলীয় বা প্রাগৈতিহাসিক যুগ: পুরোপলীয় যুগে মানুষ জীবনধারণের জন্য শিকারের উদ্দেশ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকে। এ পর্যায়ের শেষে এসে মানুষ কৃষির আবিষ্কার শেখে। এ সময়কে নবোপলীয় যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। কৃষির আবিষ্কার মানবসভ্যতায় ব্যাপক পরিবর্তন এনে দেয়। কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনে বিশৃঙ্খল মানুষ দলবদ্ধ হতে শুরু করে। তারা পানির প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ স্থানে সমবেত হয়ে বসবাস করতে থাকে, ফলে তাদের যাযাবর জীবনের অবসান হয় এবং গ্রামের পত্তন ঘটে। এ যুগে মানুষ পশু শিকার করতে গিয়ে পশুকে বশ করার কৌশল অবলম্বন করলে ধীরে ধীরে পশুপালনের বিকাশ ঘটে এবং এভাবে স্থায়ী ও মিলিতভাবে বসবাস, কৃষি উৎপাদন ও শিকার করতে গিয়ে নবোপলীয় যুগে সামাজিক সংগঠনের বিকাশ ঘটে। নবোপলীয় যুগে সামাজিক সংগঠন বা সমাজব্যবস্থার যাত্রা শুরু হলেও এ সময় লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার না হওয়ায় এ যুগের কোনো লিখিত তথ্য পাওয়া যায় না। তাই এ সময়কে 'প্রাগৈতিহাসিক যুগ' বলা হয়। আধুনিক ঐতিহাসিক ও গবেষকেরা এ যুগের সময়কাল ৫০,০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১০,০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ বলে মনে করেন।

সভ্যতা বা ঐতিহাসিক যুগ: প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসানের মধ্য দিয়ে সভ্যতা বা ঐতিহাসিক যুগের সূচনা ঘটে। মানবজীবনের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সব দিকই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। জার্মান দার্শনিক অসওয়ার্ড স্পেংলার মনে করেন, মানুষের উৎকর্ষ সাধিত কৃষ্টি বা সংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপ হলো সভ্যতা। টি ডব্লিউ ওয়ালব্যাঙ্ক এবং এ এম টেইলরের মতে, সভ্যতা হচ্ছে "শহরের জীবনের উন্নত মানবজীবন ব্যবস্থা এবং এর সাথে লিখন পদ্ধতি, আইন, সরকার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্মসম্পর্কীয় মার্জিত ধারণার মতো কার্যক্রম জড়িত।" *(Civilization Past and Present, P.11)* আরনল্ড টয়েনবির মতে, "মানব ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিশেষ বিশেষ কৃষ্টির উদ্ভব ঘটেছিল তাকেই সভ্যতা বলা হয়।" সভ্যতার যুগের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো— 'লিপির আবিষ্কার' এবং 'নগর সভ্যতার সৃষ্টি'। কৃষি আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে থাকে। ফলে গড়ে ওঠে গোত্র ও কৌমব্যবস্থা এবং মানুষ আয়ত্ত করে ধাতুর ব্যবহার। এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রা যেমন গতিশীল হয়, তেমনি সমাজব্যবস্থাও উন্নত হতে থাকে। এভাবে গ্রাম সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে এবং নগরসভ্যতার যাত্রা শুরু হয়। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৫০০০ থেকে নগরসভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল। কোন সভ্যতার সূচনা প্রথম হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও একটি বিষয় নিশ্চিত যে, প্রায় কাছাকাছি সময়ে নদীকে কেন্দ্র করে মিসরীয়, মেসোপটেমীয়, সিন্ধু, চৈনিক প্রভৃতি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সভ্যতা বিকাশের এ ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে যুক্ত হয়েছিল ফিনিশীয়, হিব্রু, গ্রিক, রোমান ও পারসিক প্রভৃতি সভ্যতা।

সভ্যতার উত্থানে সেমিটিক জাতির অবদান

'সেমেটিক' শব্দটি আদি বাইবেলের 'সাম' শব্দ থেকে উদ্ভূত। মনে করা হয় যে, হযরত নূহ (আ)-এর প্রথম পুত্র সামের বংশধরেরা সেমেটিক; দ্বিতীয় পুত্র হামের বংশধরেরা হ্যামিটিক (মিসরীয়) এবং তৃতীয় পুত্র ইয়াফাসের বংশধর আর্য (ভারতীয়, ইরানি) প্রভৃতি নামে পরিচিত।

সেমেটিক জাতির আদি বাসস্থান ছিল আরবভূমি। বিশ্বের প্রধান তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন এই সেমেটিক জাতিরই তিনজন অমর কৃতি সন্তান। তাঁরা হলেন ইহুদি ধর্মের প্রবর্তক মোশি বা হযরত মুসা (আ), খ্রিষ্ট ধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রিষ্ট বা হযরত ঈসা (আ) এবং ইসলাম ধর্মের সফল প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (স)।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, কোনো এক সময়ে সেমেটিক জাতিগোষ্ঠীর সবাই একই স্থানে বসবাস করত, একই ভাষায় কথা বলত, একই ধর্মে বিশ্বাস করত এবং একই সামাজিক বিধান মেনে চলত। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, অনুদার প্রকৃতি, দুঃসহ ভৌগোলিক পরিবেশ ও আর্থিক দুরবস্থার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তারা পার্শ্ববর্তী উর্বর অঞ্চলসমূহের প্রতি প্রলুব্ধ হয়। এভাবে আনুমানিক ৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সেমেটিক জাতির একটি অংশ আদি বাসভূমি আরব ত্যাগ করে টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস উপত্যকায় গিয়ে সুমেরীয় নামক সুসভ্য একটি অসেমিটিক জাতির সংস্পর্শে এসে ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় সভ্যতার উদ্ভব ঘটায়। সভ্যতার উত্থানে সেমেটিকদের অবদান ছিল নিম্নরূপ—

১. ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সেমেটিক জাতির অপর একটি শাখা সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে গিয়ে হিব্রু সভ্যতা গড়ে তোলে। সেমেটিক জাতির অন্য একটি শাখা ভূমধ্যসাগর ও লেবানন পর্বতের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে বসতি স্থাপন করে ফিনিশীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, সেমেটিক জাতির একটি শাখা (৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে) মিসরে বসতি স্থাপন করে স্থানীয় হ্যামিটিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মিলিতভাবে ইতিহাসখ্যাত মিসরীয় সভ্যতার উদ্ভব ঘটায়।

২. ৩৩১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের পারস্য বিজয়ের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে ভাবের বিনিময় ঘটে। পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ফলে এক উন্নত সভ্যতা জন্মলাভ করে। ইতিহাসে এ সভ্যতাই হেলেনীয় সভ্যতা নামে পরিচিত।

৩. ১৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিস অধিকার করে রোমানরা পূর্বোক্ত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়। সপ্তম শতাব্দীতে আরবীয় মুসলমানরা রোম ও পারস্য অধিকার করে উক্ত সভ্যতার সাথে নিজেদের সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে। ক্রুসেডের সময় এ সভ্যতা ইউরোপীয়ানদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে ইউরোপে 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের সূচনা করে। সুতরাং আধুনিক ইউরোপীয় বা বিশ্ব সভ্যতার মূলে রয়েছে এ সেমেটিক সভ্যতা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন যুগে মানুষের হাতিয়ার তৈরির মূল উপকরণ ছিল পাথর?
২. নব্যপ্রস্তর যুগের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কী? *[জাবি ২০১৬-১৭]*
৩. কোন যুগে মানুষ কৃষির আবিষ্কার শেখে?
৪. লিপির আবিষ্কার এবং নগর সভ্যতার সৃষ্টি হয় কোন যুগে?
৫. কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নগরসভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল?
৬. হযরত নূহ (আ)-এর প্রথম পুত্র সামের বংশধরেরা ইতিহাসে কী নামে পরিচিত?

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মানবসভ্যতার বিকাশের ধারাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করো।

পাঠ ৬

মিসরীয় সভ্যতা
The Egyptian Civilization

প্রাচীন মিসরের ভৌগোলিক অবস্থান: প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তিভূমি মিসরের অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বে। দেশটির উত্তরে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে বর্তমান সুদান রাষ্ট্র। এর পূর্বে দিকে লোহিত সাগর এবং পূর্ব-উত্তরে রয়েছে আরব মরুভূমি ও পশ্চিমে বর্তমান লিবিয়া। নীল নদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মিসর দুভাগে বিভক্ত- দক্ষিণাঞ্চল বা Upper Egypt, যা মিসরের আসিয়াতের নিচের উপত্যকায় অবস্থিত এবং অন্যটি উত্তরাঞ্চল বা Lower Egypt, যা ফাইয়ুম এলাকা থেকে নিম্ন অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।[১২] এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় মিসরের ভৌগোলিক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

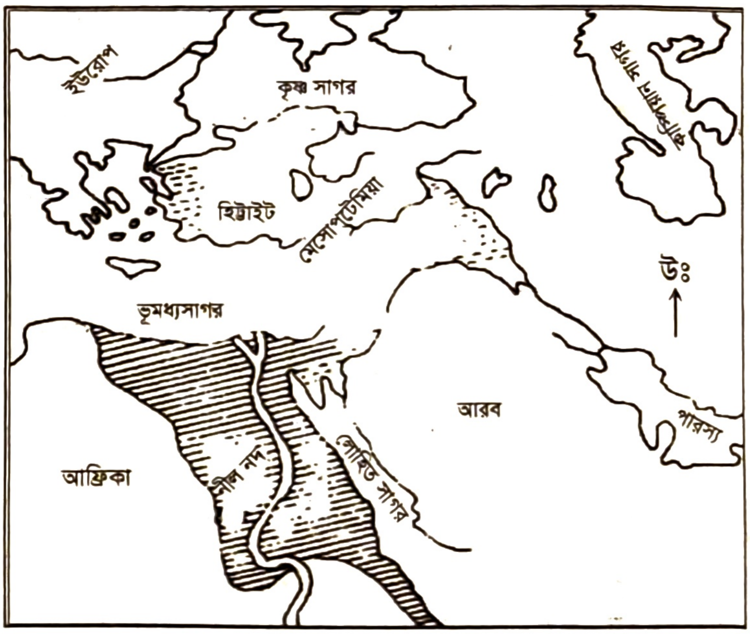

মিসরীয় সভ্যতা

মিসরীয় সভ্যতার বিকাশ ও নীল নদের অবদান: পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুতে নানা পরিবর্তনের ফলে এক সময় দিনের পর দিন বৃষ্টি হতো। ফলে নীল নদের পানি উপচে দুকূল ছাপিয়ে মানুষের কৃষি উৎপাদনসহ সব সহায়-সম্বল ভাসিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিত। তাই প্রাচীন মিসরীয়রা প্রতি বছর সংঘটিত এ বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাঁধ দেওয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। এভাবে সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে প্রাচীন মিসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, কৃষির উপকরণ, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি বিকাশের সাথে সাথে নগরের বিকাশ ঘটতে থাকে, যা মিসরকে সভ্যতার পটভূমিতে পরিণত করে।

মিসর নীল নদের দান: হোয়াংহো নদীকে চীনের দুঃখ বলা হলেও নীল নদকে মিসরের দান হিসেবে অভিহিত করা হয়। কারণ মিসরীয় সভ্যতার বিকাশে নীল নদই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পানির প্রাপ্যতা, নীল নদকে কেন্দ্র করে কৃষি উৎপাদন, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ, পশুপালনের জন্য তৃণভূমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে মিসরীয়রা নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালের শুরুতে আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট প্লাবনে নীল নদের দুকূল ছাপিয়ে যেত। এ সময় পাহাড়ি মাটি, বরফগলা পানি ও অজস্র জলজ উদ্ভিদ আবাদি জমিতে এসে পড়ত। কয়েক মাস ব্যাপী স্থায়ী (জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত) এ বন্যার সময় গাছ-গাছড়া পচে গিয়ে এবং এর সাথে জলধারায় পাহাড়ি লাল পাথুরে মাটি মিশে এক উর্বর পলিমাটির সৃষ্টি হতো। প্লাবন শেষে উর্বর পলিমাটিতে নীল নদের উভয় তীর দৈর্ঘ্যে ৬০০ মাইল এবং প্রস্থে ১০ মাইল পর্যন্ত ভরে যেত। এ উর্বর জমিতে খুব সহজেই ফসল ফলানো যেত। কৃষি উৎপাদন প্রাচীন মিসরীয়দের প্রধান জীবিকা হওয়ায় এ সময় কৃষিকে কেন্দ্র করেই বসতি স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ কৌশল, সেচব্যবস্থা ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটে। এছাড়া নীল নদের তীরে অবস্থিত সিনাই পাহাড় ও অন্যান্য পর্বতমালা এবং চুনা পাথরের পাহাড়গুলো শিল্পদ্রব্য ও অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করার জন্য মিসরবাসীকে বিভিন্ন প্রকার ধাতু সরবরাহ করেছে। এক কথায়, গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান ও নীল নদের দানের ফলে মিসরে বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। তাই গ্রিক ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস মিসরীয় সভ্যতার বিকাশে নীল নদের ভূমিকা দেখে নির্দ্বিধায় মিসরকে 'নীল নদের দান' বা 'The Gift of the Nile' বলে উল্লেখ করেছেন।

---

[১২] *মানচিত্রসূত্র: বিশ্বসভ্যতা*- এ কে এম শাহনাওয়াজ-পৃ. ৫২

প্রাচীন মিসরীয় ফারাও-এর মূর্তি

প্রাচীন মিসরের রাজনৈতিক ইতিহাস: ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে আনুমানিক ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিসরে সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল। ইউরোপীয় লিবিয়ান, এশীয় সেমেটিক ও আফ্রিকান নুবিয়ান রাজাদের সংমিশ্রণে সৃষ্ট এ সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস একটি আলোকোজ্জ্বল ঘটনা। প্রাচীন মিসরের রাজনৈতিক সময়কালকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যেমন– প্রাক-রাজবংশীয় যুগ (৫০০০-৩২০০ খ্রি.পূ.), প্রাচীন রাজবংশীয় যুগ (৩২০০-২৩০০ খ্রি. পূ.), সামন্ত যুগ (২৩০০-২১০০ খ্রি. পূ.), মধ্য রাজবংশীয় যুগ (২১০০-১৭৮৮ খ্রি.পূ.), বৈদেশিক হিক্সসদের যুগ (১৭৫০-১৫৮০ খ্রি.পূ.) এবং নতুন রাজবংশ বা সাম্রাজ্যের যুগ (১৫৮০-৫২৫ খ্রি.পূ.)।[১৩]

১. **প্রাক-রাজবংশীয় যুগ (৫০০০-৩২০০ খ্রি.পূ.):** প্রাক-রাজবংশীয় যুগে মিসর ছোট ছোট প্রায় ৪০টি নগররাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এ নগররাষ্ট্রগুলো 'নোম' নামে পরিচিত ছিল। এ সময় একটি স্থূল কনফেডারেশন থাকলেও নগররাষ্ট্রগুলো সংঘবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন মিসরীয় সাহিত্য অনুসারে ৪৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নিম্ন মিসরের 'নামার' নামে একজন বীর যোদ্ধা উচ্চ মিসর ও নিম্ন মিসরকে প্রথম বারের মতো রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনিই ছিলেন মিসরের প্রথম ফারাও, রাজা বা শাসক। পবিত্র কুরআনে তাকে ফেরাউন নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ মিসর ৮০০ বছর টিকে ছিল। এ যুগের প্রথম মিসরীয় রাজধানী ছিল হেলীয়পলিশ। এ সময় মিসরে উন্নত লাঙলের ব্যবহার, জাতীয় সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন, লিখন পদ্ধতির প্রাথমিক উদ্ভাবন, প্যাপিরাস ও কালির ব্যবহার প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজ চালু হয়।

২. **প্রাচীন রাজবংশীয় যুগ (৩২০০-২৩০০ খ্রি.পূ.):** রাজা মেনেস (Menes) মিসরে রাজবংশীয় যুগের সূচনা করেন। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ মিসরকে একত্রিত করে এ যুগের সূচনা করেন বলে তাকে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এ সময়ে ছয়টি রাজবংশ মিসরে রাজত্ব করে। প্রথম দুটি রাজবংশের রাজধানী ছিল উচ্চ মিসরের থিনিস (Thinis)। পরবর্তী রাজবংশের সময়ে থিনিস থেকে রাজধানী পরিবর্তন করে মেম্ফিস (Memphis) এ নেওয়া হয়। কারণ এ স্থানটি ছিল মিসরের কেন্দ্রভূমিতে এবং পরবর্তী পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত এটিই ছিল মিসরের রাজধানী। এ রাজবংশের রাষ্ট্রকাঠামো ছিল একনায়কতান্ত্রিক। রাজারা পরিচিত হতেন 'ফারাও' (Pharaoh) নামে। মিসরীয় 'Per-O' শব্দের অর্থ 'রাজকীয় বাড়ি' বা 'বড়বাড়ি', যা ছিল ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। তারা নিজেদের সূর্য-দেবতা 'রে' (Re) এর পুত্র মনে করতেন। এভাবে রাজা মেনেস-এর মতো অন্য রাজারাও ফারাও এর মর্যাদা লাভ করেন। ফারাও পদটি ছিল বংশানুক্রমিক এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় তিনি ছিলেন প্রধান পুরোহিত। ফারাও ছাড়াও প্রশাসনে প্রধানমন্ত্রী বা ভিজিয়ার (Vizier), কোষাধ্যক্ষ, প্রধান স্থপতি, পরিদর্শক, প্রধান বিচারপতি ও ৪২ জন ভূস্বামী ছিল।

সামন্ত যুগ (২৩০০-২১০০ খ্রি.পূ.): ২৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্রাচীন রাজবংশের পরিসমাপ্তি ঘটলে সামন্ত যুগের সূচনা হয়। মিসরের ইতিহাসে এ যুগ অনাচার, ব্যভিচার, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার যুগ হিসেবে কলঙ্কিত হয়ে আছে। এর মূলে ছিল সামন্ত রাজাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কোন্দল।

৪. **মধ্য রাজবংশীয় যুগ (২১০০-১৭৮৮ খ্রি.পূ.):** মধ্য রাজবংশীয় যুগের সূচনা হয় একাদশ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নেব্ হাপেটরা (Neb-Hapetra)। তিনি দ্বন্দ্ব-কলহ দূর করে গোটা মিসরকে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনেন। তবে সত্যিকারের পুনরুত্থান ও নবজাগরণ শুরু হয় দ্বাদশ রাজবংশের আমল থেকে, যখন মিসর ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তাই প্রাচীন মিসরের ইতিহাসে দ্বাদশ রাজবংশের আমলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ বংশের কয়েকজন বিখ্যাত ফারাও হলেন ১ম আমেনহোটেপ, ১ম সেসট্রিস, ৩য় আমেনহোটেপ প্রমুখ। মধ্যরাজবংশের সরকার পদ্ধতি পূর্বের চেয়ে দুর্বল ছিল। এ পর্যায়ে ফারাওদের ক্ষমতা হ্রাস পায় ও অভিজাতরা ক্ষমতার অধিকারী হন। জনসাধারণ তাদের যোগ্যতানুযায়ী সম্পত্তির অধিকার ও বিভিন্ন পদে নিয়োগ পেতো।

---

[১৩] *সূত্র:* ফিওদর করোভকিন- *পৃথিবীর ইতিহাস: প্রাচীন যুগ*, পৃ. ৬২

৫. **বৈদেশিক হিক্সসদের যুগ (১৭৫০-১৫৮০ খ্রি.পূ.):** মধ্য রাজবংশীয় যুগে মিসর বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়। ১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পশ্চিম এশিয়ার যাযাবর জাতি হিক্সসরা (Hyksos) মিসর দখল করে। তারা উন্নত যুদ্ধরীতি অবলম্বন করে। যুদ্ধে অস্ত্র ও ঘোড়া ব্যবহার করে। তাদের প্রভাবে মিসরে স্বৈরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী চেতনা জন্মলাভ করে।

৬. **নতুন রাজবংশ বা সাম্রাজ্যের যুগ (১৫৮০-৫২৫ খ্রি.পূ.):** বিদেশি শক্তির হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে উচ্চ মিসরের (Upper Egypt) জনগোষ্ঠী ও শাসকেরা মিলিত হয়ে হিক্সসদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললে ১৫২৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিসরীয়রা হিক্সসদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয় এবং এর মধ্য দিয়ে শুরু হয় নতুন রাজবংশ বা সাম্রাজ্যের যুগ (Age of Empire)। প্রথম আহমোজ (Ahmose-1, ১৫৮০-১৫৫৭ খ্রি. পূ.)-এর মাধ্যমে এ যুগের সূচনা হলে পরবর্তীকালে ফারাও তৃতীয় থুথমোস (Thutmose-III, ১৪৭৯-১৪৪৭ খ্রি. পূ.)-এর সময় এ সাম্রাজ্যের উন্নতি ও বিকাশের ধারা গতিশীল হয় এবং তৃতীয় আমেনহোটেপের (Amenhotep-III, ১৪১১-১৩৭৫ খ্রি. পূ.) সময় এ সাম্রাজ্য উৎকর্ষের চরম শিখরে উপনীত হয়। পরবর্তীকালে ফারাও টুটেন খামেন (Tutan Khamen), ফারাও দ্বিতীয় রামসেস (Ramases-II, ১৯৯২-১২২৫ খ্রি. পূ.) ও ফারাও তৃতীয় রামসেস (Ramases III), (১১৯৮-১১৬৭ খ্রি. পূ.)-এর পর শক্তিশালী শাসক না থাকায় পরবর্তী যুগে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। নানা পরিবর্তনের পর ৫২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পারসিকদের হাতে এ সভ্যতার চূড়ান্ত পতন ঘটে।[১৪] এ যুগে মিসরকে পঞ্চাশটির অধিক প্রশাসনিক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল।

জেনে রাখো

স্বৈরতন্ত্র বা Autocracy হচ্ছে একজনের শাসন। স্বৈরতন্ত্র বলতে কোনো বিশেষ ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতাকে বোঝায় যিনি দেশের জনগণ, সংবিধান, আইনের রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে এককভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তার একক নির্দেশনায় দেশকে শাসন করেন। এভাবে যখন রাষ্ট্রে এক ব্যক্তির ক্ষমতার মাধ্যমে সব কাজ সম্পন্ন হয় তখনই তা হয় স্বৈরশাসন। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, বা নেতা অগণতান্ত্রিক ও জোর করে ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে তার অধীনস্থ করে রাখে তাকে স্বৈরশাসক বলা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তিভূমি কী?
২. মিসর কোন মহাদেশে অবস্থিত?
৩. নীল নদ কোন দেশে অবস্থিত? */সকল বোর্ড ২০২৫/*
৪. প্রাক-রাজবংশীয় মিসরের নগররাষ্ট্রগুলো কী নামে পরিচিত ছিল?
৫. কোন রাজা সমগ্র মিসরকে একত্র করে একটি একক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলেন? */সকল বোর্ড ২০১৬/*
৬. মিসরীয় রাজারা কী নামে পরিচিত হতেন?

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. মিসরীয় সভ্যতা বিকাশে নীল নদই প্রধান ভূমিকা রেখেছে— পাঁচটি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করো।
২. মিসরীয়দের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাক্রম ছক আকারে লেখো।

---

[১৪] এ. কে. এম শাওনাওয়াজ, *বিশ্বসভ্যতা,* পৃ. ৫৮।

পাঠ ৭

সভ্যতায় মিসরীয়দের অবদান
Contribution of the Egyptian in Civilization

ধর্মীয় বিশ্বাস: প্রাচীন মিসরীয়রা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা মেনে পূজা করত। তারা বিশ্বাস করত, প্রকৃতিকে দেব-দেবীরাই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকেন। প্রাচীন মিসরীয়দের বিশ্বাস অনুসারে সূর্যের দেবতা 'রা' বা 'রে' দেব-দেবীদের রাজা। তিনি প্রধান দেবতা হিসেবে অন্য দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। একসময় 'রা' বা 'রে' নামটি রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় 'আমন' বা 'আমন রে'-তে। 'রা' ছিলেন আলো ও জীবনের আধার। এজন্য তিনি প্রধান দেবতা হিসেবে গণ্য হতেন। মিসরীয়দের আরও অনেক দেব-দেবী ছিল। এদের দুজন হলেন জীবন, মৃত্যু ও উর্বরতার দেবতা ওসিরিস এবং তার স্ত্রী আইসিস। প্রাচীন মিসরীয়রা সম্রাট বা ফারাওকে স্বর্গের প্রতিনিধি মনে করত এবং তাদের দেবতার মতোই সম্মান করত। মৃত্যুপরবর্তী জীবনে তাদের বিশ্বাস ছিল। মিসরীয়রা বিশ্বাস করত মৃত মানুষ কবরে গেলে তার দেহে আত্মা ফিরে আসে। পৃথিবীতে তারা যে পাপ বা পুণ্য করেছে, দেবতা ওসিরিসের সামনে সেগুলোর হিসাব হবে। এরপর পুণ্যবানকে সুখময় স্থানে এবং পাপীকে অন্ধকার ঘরে নিক্ষেপ করা হবে। সূর্যদেবতা 'রা' তীব্র রশ্মি দিয়ে পাপীর দেহকে ঝলসে দেবেন।

মিসরীয় সভ্যতার অবক্ষয়ের যুগে মিসরীয়দের ধর্মে নানা কুসংস্কার যুক্ত হয়। এ সময় পুরোহিতরা নিজের ও শাসকের সুবিধার জন্য ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন। এ অবস্থার অবসানের জন্য ফারাও চতুর্থ আমেনহোটেপ (শাসনকাল: ১৩৫৩-১৩৩৬ খ্রি.পূ.) এগিয়ে আসেন। তিনি মন্দির থেকে অসৎ পুরোহিতদের বের করে দেন। বহু দেবতার বদলে তিনি একমাত্র সূর্য দেবতার আরাধনার কথা প্রচার করেন। চতুর্থ আমেনহোটেপ সূর্য দেবতা 'আমন রে' বা 'রা'-এর নতুন নাম দেন 'এটন'। দেবতার নামের সাথে মিল রেখে তিনি নিজের নাম দেন 'ইখনাটন'। এভাবে ইখনাটন বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদের ধারণা দেন। তবে ফারাও টুটেন খামেন পুরোহিতদের অধিকার ফিরিয়ে দিলে মিসরীয় সমাজ আবার কুসংস্কারে ছেয়ে যায়।

স্থাপত্য শিল্পে অবদান

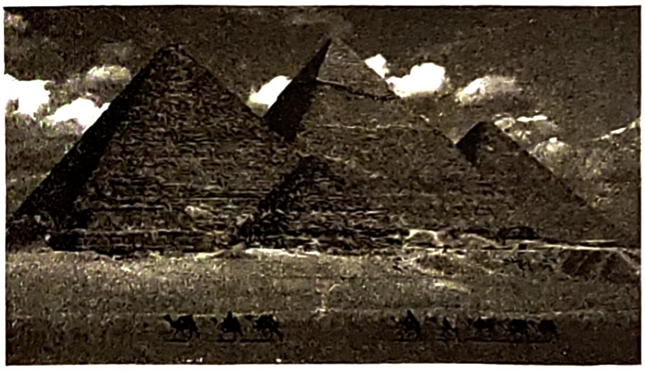
পিরামিড

পিরামিড: প্রাচীন মিসরীয়দের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়। পাথর কেটে প্রকাণ্ড সৌধ বানাতে তারা ছিল সিদ্ধহস্ত। প্রাচীন মিসরীয়দের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যিক নিদর্শন হলো পিরামিড। গ্রিক ভাষায় পিরামিড শব্দের অর্থ হলো খুব উঁচু। মিসরীয়রা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বাস করত ফারাওয়ের মৃত্যুর পর তার আত্মা স্বর্গে চলে যায় এবং সেখানে দেবতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু মৃত ফারাওয়ের শরীর পচে গেলে এক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। এজন্য তারা ফারাওয়ের মৃতদেহকে বিশেষ পদ্ধতিতে মমি করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করত। ফারাওয়ের মৃতদেহ সমাহিত করার স্থান আগে থেকেই তৈরি করে রাখা হতো।[১৫] এসব সমাধিতে দেওয়া হতো সিন্দুকভর্তি অমূল্য গহনা, বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র, মুদ্রা, দামি কাপড় প্রভৃতি। মৃত ফারাওয়ের দেহ ও মূল্যবান এসব সামগ্রীর নিরাপত্তার জন্য প্রাচীন মিসরীয়রা বড় বড় পাথরখণ্ড দিয়ে পিরামিড নির্মাণ করেছিল। পিরামিড হলো ত্রিভুজের আকৃতিতে তৈরি অতি উঁচু সমাধিসৌধ। প্রাচীন বিশ্বের বিস্ময় পিরামিডের নির্মাণশৈলী এখনও বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক প্যান্টাজেনেট সমারসেট ফ্রাই *(দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড)*-এর বর্ণনামতে, ফারাও জোসের (Djoser or

---

[১৫] *সূত্র: দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড, অনুবাদ অনীশ দাস অপু, ঢাকা: ২০০৬, পৃ. ২৫*

Zoser) সমাধিতে নির্মিত হয়েছে প্রথম পিরামিড। ইসহোটেপ নামে এক সুদক্ষ ভাস্কর এ পিরামিডটি নির্মাণ করেন। এর উচ্চতা ২০০ ফুট। মিসরে আরও অনেক পিরামিড আছে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত ১৩৫টি পিরামিড পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৭০টির বেশি কালের সাক্ষী হয়ে এখন টিকে আছে। টিকে থাকা পিরামিডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ফারাও খুফুর পিরামিড। ১৩ একর জমির ওপর নির্মিত এ পিরামিডটি ৭৫৫ ফুট ভিত্তির ওপর অবস্থিত এবং এর দৈর্ঘ্য ৪৮১ ফুট। এটি নির্মাণ করতে ১ লাখ শ্রমিকের প্রায় ২০ বছর সময় লেগেছিল। মিসরের পিরামিড সম্পর্কে প্যান্টাজেনেট সমারসেট ফ্রাই বলেন, "পিরামিড মিসরীয়দের অগ্রগতির প্রশংসাই শুধু নয়, এর সাথে জড়িত ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস।"

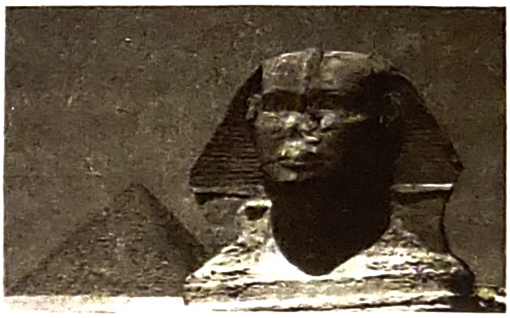
স্ফিংকস

ধর্মমন্দির: মিসরীয় সভ্যতার মধ্য ও শেষ ভাগে মিসরীয়রা পুরোহিতদের প্রভাবে অনেক বৃহৎ ও সুদৃশ্য ধর্মমন্দির নির্মাণ করেছে। মিসরের ধর্মমন্দিরগুলোর মধ্যে কার্নাক ও লুক্সরের মন্দির বিখ্যাত। এ মন্দিরগুলো খুব জাঁকজমকপূর্ণভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে নির্মিত। মন্দিরের প্রবেশপথের দু'পাশে সারি সারি স্ফিংকসের মূর্তি এবং সামনে ফারাওয়ের মূর্তি রাখা হতো। নিবস্ শহরের প্রধান ধর্মমন্দিরটির উচ্চতা ছিল ২৩ মিটার। এসব মন্দির স্থাপত্যশিল্পে মিসরীয়দের অনন্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর।

ভাস্কর্য: পিরামিড গড়ার সূত্রেই মিসরে ভাস্কর্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। বিভিন্ন সমাধিসৌধ, ধর্মমন্দির ও প্রাসাদের প্রবেশপথে ভাস্কর্য নির্মাণ করা হতো। মূর্তি খোদাই করে মন্দিরের ভেতরের দেয়াল সাজানো হতো। বড় বড় পাথর কেটে চমৎকার সব মূর্তি বানানো হতো। 'স্ফিংকস' হলো প্রাচীন মিসরীয় ভাস্কর্যের প্রধান উদাহরণ। স্ফিংসের দেহ সিংহের মতো এবং মাথা মানুষের আকৃতির। ভাস্কররা পাথর কেটে মানুষের অবিকল মূর্তিও গড়তেন। ফারাও ইখনাটন ও রানি নেফারতিতির মূর্তি এর উজ্জ্বল নিদর্শন।[১৬]

চিত্রকলা ও কারুশিল্প: মন্দিরের দেয়াল, মমি ও তার কফিনের ওপর প্রাচীন মিসরীয় চিত্রশিল্পের নিদর্শন দেখা যায়। এসব চিত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রকাশ বেশি ছিল। অষ্টাদশ রাজবংশের আমলে থিবসে নির্মিত লুক্সর মন্দিরের গায়ে অসংখ্য দেয়ালচিত্র (fresco) দেখা যায়। এছাড়া লুক্সরের মন্দিরের গায়ে লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশাও রয়েছে। প্রাচীন মিসরীয়রা কারুশিল্পেও দক্ষ ছিল। তারা স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জের সাহায্যে নানাপ্রকার তৈজসপত্র তৈরি করত। মিসরীয় কুমোররা বাহারি রঙের চমৎকার মাটির পাত্র, বয়নশিল্পীরা সুন্দর নকশা আঁকা কম্বল, পর্দা এবং কুশন তৈরিতে দক্ষ ছিল। তারা মণিরত্ন ও সুগন্ধি রাখার কৌটা, নানারকম অলংকার ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরিতেও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান

লিখন পদ্ধতি: সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলোর একটি হলো লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার। প্রাচীন মিসরীয়রা নগরসভ্যতা গড়ে তোলার সাথে সাথে এক বিশেষ ধরনের চিত্রভিত্তিক লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার করে যার নাম 'হায়ারোগ্লিফিক' (Hieroglyphic)। গ্রিক ভাষা থেকে আসা শব্দটির অর্থ 'পবিত্র লিপি।' এটি ছিল একটি লিখিত ভাষা। এ ভাষায় নানাপ্রকার দ্রব্য, প্রকৃতি ও বিষয় প্রভৃতির ছবি আঁকা থাকত। এ থেকে জিনিসগুলোর পরিচয় ও নাম জানা সম্ভব হতো।

হায়ারোগ্লিফিক

---

[১৬] *চিত্র সূত্র: পৃথিবীর ইতিহাস: প্রাচীন যুগ,* ফিওদর করোভকিন, পৃ.৬১

ফরাসি ভাষাবিদ জঁ ফ্রাঁসোয়া শাঁপোলিওঁ প্রথম অতি দুর্বোধ্য এ হায়ারোগ্লিফিকের পাঠোদ্ধার করেন। বিশ্লেষণের মাধ্যমে হায়ারোগ্লিফিক লিখন পদ্ধতির তিনটি রূপ পাওয়া যায়। যেমন— চিত্রভিত্তিক (Pictographic), অক্ষরভিত্তিক (Syllabic) এবং বর্ণভিত্তিক (Alphabatic)। প্রাচীন মিসরে তিন ধরনের লিখন পদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রথম দিকে হায়ারোগ্লিফিক (Hieroglyphic) বা চিত্রলিখন পদ্ধতি, পরবর্তী পর্যায়ে হিরাটিক (Hieratic) বা ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজে ব্যবহৃত দ্রুত লিখন পদ্ধতি এবং ডেমোটিক (Demotic), যা সামগ্রিকভাবে জনসাধারণ ব্যবহার করত। হায়ারোগ্লিফিক লিপি প্রথমে তৈজসপত্র, পাথরের ফলক এবং কবরের গায়ে খোদাই করা হতো। পরে মিসরে প্যাপিরাস কাগজ আবিষ্কৃত হলে এতে এ লিপি উৎকীর্ণ করা হয়। হায়ারোগ্লিফিক লিখন পদ্ধতিতে প্রায় ৭৫০টি চিত্রলিপি (মতান্তরে ২৪টি) ব্যবহার করা হয়েছিল।[১৬.১]

বিজ্ঞান: প্রাচীন মিসরীয়রা গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তারা শস্য উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদন খরচ, সংসারের ব্যয় নির্বাহ, কারিগরদের বিভিন্ন দ্রব্য তৈরির পরিমাণ ও সংখ্যা, মূল্যমান নির্ধারণ প্রভৃতি কাজের হিসাব নিকাশের জন্য গণনা পদ্ধতির আবিষ্কার করেছিল। এ গণনা পদ্ধতি থেকেই পরবর্তী সময়ে গণিতশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। মিসরীয়রা পাটিগণিতের সাথে সাথে জ্যামিতিও আবিষ্কার করেছিল। তারাই প্রথম যোগ, বিয়োগ, ভাগ এবং ভগ্নাংশ পদ্ধতিসহ কৌণিক আয়তক্ষেত্র ও ষড়ভুজের ব্যবহার করে। জ্যামিতিক পরিমাপের মাধ্যমেই বিশাল পিরামিডের নির্মাণ কৌশল নির্ধারিত হয়েছিল। প্রাচীন মিসরীয়রা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কৌশল উদ্ভাবনের চিন্তাভাবনার সময় লক্ষ করেছিল যে, প্রতিবছর বন্যার আগে আকাশের নির্দিষ্ট কিছু তারকা একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। ঐতিহাসিক ফিওদর করোভকিন বলেন, "এসব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই মিসরে প্রথম জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভব হয়েছিল।"[১৭] মিসরীয়রা তারকারাজির ভিত্তিতে একটি রাশিচক্র তৈরি করেছিল। তারা বর্ষপঞ্জী অর্থাৎ ক্যালেন্ডারও তৈরি করেছিল। মিসরীয়রা হিসাব করে বের করেছিল যে ৩৬৫ দিনে এক বছর হয়। তারা বছরকে মাসে এবং মাসকে ৩০ দিনে ভাগ করেছিল।

চিকিৎসা: চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রাচীন মিসরীয়রা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তারা রোগীর নাড়ি পর্যবেক্ষণ করে রোগ নির্ণয় করত। ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিসরীয় চিকিৎসকেরা রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসাপত্র দিতেন বলে জানা যায়। ধারণা করা হয়, পিরামিডের যুগে দাঁত, চোখ, পাকস্থলী ইত্যাদির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিল। মিসরীয়রাই প্রথম চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ মেটিরিয়া মেডিকা (Materia Medica) প্রণয়ন করে। শল্য চিকিৎসায় তাদের যে বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল তার প্রমাণ হলো মৃতদেহের মমি। হাজার বছরের বেশি সময় পর্যন্ত মৃতদেহের পচন ঠেকাতে সক্ষম হয়েছে মমি পদ্ধতি।

কাগজ: লিখনপদ্ধতির বিকাশের ক্ষেত্রে মিসরীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে কাগজের আবিষ্কার। তারা নীলনদের তীরে জন্মানো প্যাপিরাস নামের নলখাগড়া দিয়ে এক ধরনের কাগজ তৈরি করত। প্যাপিরাস গাছের কাণ্ডের ছাল ছাড়িয়ে পাশাপাশি রাখা হতো। একটির ওপর আর একটি ফালি রেখে রোদে শুকানো হতো। তারপর ফালিগুলোকে চাপ দিয়ে বানানো হতো কাগজ। প্যাপিরাসের একেকটি রোল লম্বায় হতো ১০ থেকে ২০ ফুটের মতো। প্যাপিরাস থেকেই কাগজের ইংরেজি 'পেপার' প্রতিশব্দটি এসেছে।

সাহিত্য: প্যাপিরাসে উৎকীর্ণ প্রাচীন মিসরীয় লিপির অর্থ উদ্ধারের পর বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হয়েছেন, প্রাচীন মিসরে উন্নত মানের সাহিত্য রচিত হয়েছিল। তবে মিসরীয় সাহিত্য মূলত দেব-দেবী ও ফারাওদের গুণকীর্তনের কাহিনি। এ সাহিত্যের নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে 'মেমফাইট ড্রামা' (Memphite Drama), 'টেল অব দ্য টু ব্রাদার্স' (Tale of the Two Brothers), 'মৃতদের পুস্তক' (Book of Dead), 'আতেনের হিম'। মিসরীয় ধর্ম ও দর্শনকে ভিত্তি করে লিখিত হওয়ায় এগুলো থেকে সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলে।

[১৬.১] *চিত্রসূত্র:* ফিওদর করোভকিন, *পৃথিবীর ইতিহাস: প্রাচীন যুগ*, পৃ. ৭৯

[১৭] *সূত্র: পৃথিবীর ইতিহাস: প্রাচীন যুগ*, অনুবাদ: হায়াৎ মামুদ, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৩, পৃ. ৭৭

দর্শন: প্রাচীন মিসরীয়দের মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় পুরোহিত ও মুনি-ঋষিদের লেখনীতে। এর একটি নিদর্শন হচ্ছে শিলালিপিরূপে পাওয়া মেমফাইট ড্রামা (Memphite Drama)। এছাড়া মিসরীয়দের দর্শনচর্চার প্রমাণ রয়েছে দার্শনিক টাহহোটেপের রচিত 'ম্যাক্সিম' (The Maxim of Ptahhotep) গ্রন্থে। এ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু নৈতিকতা। এছাড়াও এ যুগের দর্শনচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায় 'বীণাবাদকের গান' (Songs of harp player) এবং 'বাকপটু কৃষকের জবানবন্দি' (The Plea of the Eloquent Peasant) নামের শিলালিপিতে।

সমাজ ব্যবস্থা: প্রাচীন মিসরের সমাজ ব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। সমাজে নারীরা সম্পত্তির অধিকারসহ নানা রকম সুবিধা ভোগ করত। সমাজে এক স্ত্রী গ্রহণের রীতি চালু থাকলেও উপপত্নী গ্রহণের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। তারপরও মিসরীয় সমাজে মেয়েরা উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করত। যেমন ফারাও প্রথম থুথমোসের মেয়ে হাটশিপুট (Hatsheput) বা হাটাসু (Hatasu) ১৫২০–১৪৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বিশ্বের প্রথম মহিলা শাসক হিসেবে মিসরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মিসরের সমাজ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা— ১. ফারাও, রাজদরবারের গণ্যমান্য ব্যক্তি, পুরোহিত ও ভূস্বামীরা উচ্চশ্রেণি; ২.বণিক, সাহিত্যিক, কারিগর ও অন্য পেশাজীবীরা মধ্যমশ্রেণি এবং ৩. ভূমিদাস, সেবাদাস ও ক্রীতদাসরা নিম্নশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমাজে শিক্ষাগ্রহণ করার সুযোগ ছিল এবং বিদ্যালয়গুলো ছিল অবৈতনিক।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মিসরীয়দের প্রধান দেবতা কে?
২. ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা কারা?
৩. হায়ারোগ্লিফিক কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫; রাবি ২০১৬-১৭]*
৪. পিরামিড তৈরির মূল উদ্দেশ্য কী? *[সকল বোর্ড ২০১৯; ২০১৫]*
৫. ১২ মাসে ১ বছর, ৩০ দিনে ১ মাস— এ গণনারীতি কাদের দ্বারা সূচিত? *[ঢাবি ২০০৫-০৬]*
৬. 'মেমফাইট ড্রামা' কোন সভ্যতার নিদর্শন?

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. স্থাপত্য শিল্পে মিসরীয়দের অবদানের একটি চার্ট তৈরি করো।
২. মিসরীয়দের সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে ছকে উপস্থাপন করো।

গ. দলীয় কাজ

কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মিসরীয়দের অবদান সম্পর্কে দুটি স্লাইড তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৮

সুমেরীয় সভ্যতা
The Sumerian Civilization

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল আনুমানিক ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। প্রায় একই সময়ে আধুনিক ইরাকের টাইগ্রিস (দজলা) ও ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর অববাহিকায় পর্যায়ক্রমে কয়েকটি সভ্যতার উন্মেষ হয়। একই ভূখণ্ডে গড়ে ওঠায় এ সভ্যতাগুলো একত্রে 'মেসোপটেমীয় সভ্যতা' নামে পরিচিত। 'মেসোপটেমিয়া' একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। ওই অঞ্চল 'Fertile Crescent' বা 'অর্ধ চন্দ্রাকৃতি উর্বর ভূমি' বলেও পরিচিত। মেসোপটেমীয় ভূখণ্ডে যে সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, অ্যাসিরীয় সভ্যতা ও ক্যালডীয় সভ্যতা। সুমেরীয়দের আদি বাসস্থান সম্পর্কে একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, তাদের একটি দল ৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষত এলেমের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে এসে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার নিম্নাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। এদের নামানুসারে এ সভ্যতাটি সুমেরীয় নামে পরিচিত হয়। ৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কৃষি ও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ সুমের জাতি এ অঞ্চলে প্রাচীন এ সভ্যতার উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

সুমেরীয়দের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি: মেসোপটেমীয় সভ্যতাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সভ্যতা হলো সুমেরীয় সভ্যতা। কয়েকটি নগরকে কেন্দ্র করে সুমেরীয়রা সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে তাদের রাজধানী উর ছাড়াও লারমা, ইরুদু, কিশ, নিপ্পুর, লাগাস উল্লেখযোগ্য।

সুমেরীয় সভ্যতায় নগররাষ্ট্রের প্রধানদের পদবি ছিল 'পাতেশি' (Patesi)। ক্ষমতাধর পাতেশিরা ছিলেন একাধারে ধর্মযাজক, সমরনেতা ও সেচ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। সুমেরীয়দের আয়ের মূল উৎস ছিল কৃষি। কাঠের লাঙল, ধাতুর কাস্তে ও নিড়ানির ব্যবহার এবং সেচ ব্যবস্থার উদ্ভাবনের মাধ্যমে তারা উন্নত কৃষি পদ্ধতি গড়ে তোলে। ঐতিহাসিক প্যান্টাজেনেট সমারসেট ফ্রাই বলেন, "মেসোপটেমিয়ার উর্বর মাটিতে সুমেরীয়রা দক্ষতার সাথে চাষাবাদ করত। বেশ দ্রুত নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে তারা উদ্বৃত্ত উৎপাদন দিয়ে তাদের অদক্ষ প্রতিবেশীদের সাথে বাণিজ্য শুরু করেছিল।"[১৮] সুমেরীয়রা ফিলিস্তিন, ফিনিশিয়া, ক্রিট, ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ভারত, এশিয়া মাইনর ও মিসরের সাথে বাণিজ্য করত। তারা গৃহনির্মাণ, মাটির আসবাবপত্র, নৌকা তৈরি ইত্যাদি পেশায়ও নিয়োজিত ছিল। সুমেরীয় সমাজব্যবস্থা তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত ছিল। পুরোহিত, অভিজাত, বণিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে উচ্চশ্রেণি এবং চিকিৎসক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রকৌশলী, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে মধ্যশ্রেণি গঠিত হয়েছিল। নিম্নশ্রেণিতে অবস্থান ছিল ভূমিদাস ও শ্রমিকদের। সুমেরীয় সমাজে শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনায় মেয়েদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

সভ্যতায় সুমেরীয়দের অবদান

লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন: সুমেরীয়রা একটি ভিন্নধর্মী লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল। প্রথম দিকে সুমেরীয় লিপি ছিল মিসরীয়দের মতো চিত্রলিপিভিত্তিক। পরবর্তীকালে তারা নতুন লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে যা 'কিউনিফর্ম' (Cuneiform) বা কীলকাকার নামে পরিচিত। সুমেরীয়রা কাদামাটির ফলকে খাগের কলম দিয়ে কৌণিক কিছু রেখা ফুটিয়ে তুলত। চিহ্নগুলো দেখতে অনেকটা কীলক বা পেরেকের মতো। কিউনিফর্মকে বলা হয় অক্ষরভিত্তিক চিত্রলিপি। এ লিপি বাম দিক থেকে ডানে লেখা হতো। সুমেরীয় ভাষায় ৫০০-এর বেশি কীলকাকার সাংকেতিক চিহ্নের সন্ধান পাওয়া যায়। সুমেরের বিখ্যাত শহর নিপ্পুরে কিউনিফর্ম চিত্রলিপির প্রায় চার হাজার মাটির চাকতি পাওয়া গেছে।

---

[১৮] *সূত্র: দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃ. ১৬*

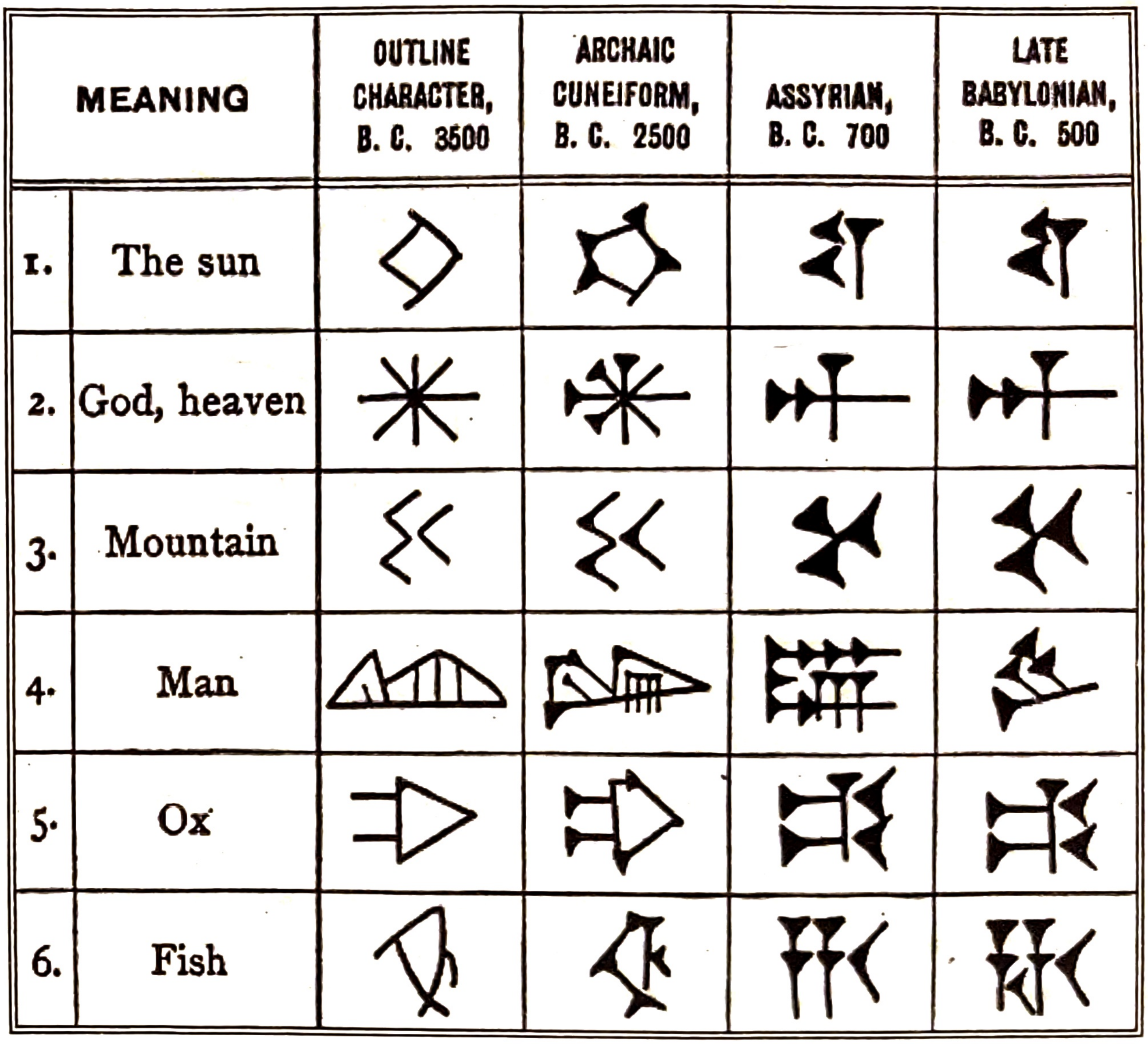
MEANING
OUTLINE CHARACTER, B. C. 3500
ARCHAIC CUNEIFORM, B. C. 2500
ASSYRIAN, B. C. 700
LATE BABYLONIAN, B. C. 500
1. The sun
2. God, heaven
3. Mountain
4. Man
5. Ox
6. Fish

কিউনিফর্ম লিপি

ধর্ম: সুমেরীয়রা বহু দেবতার পূজা করত। সুমেরীয় ধর্মবিশ্বাস মতে, ‘এনলিল’ ছিল পৃথিবীর দেবতা, ‘আলু’ আকাশ দেবতা, ‘এনকি’ পানির দেবতা, ‘শামস’ সূর্য দেবতা, ‘গান্নার’ চন্দ্র দেবতা, ‘দেবী ইনাননা’ প্রেম ও উর্বরতার এবং ‘নারগল’ ছিল প্লেগ রোগের দেবতা। সুমেরীয়দের প্রধান ধর্মমন্দিরকে বলা হতো ‘জিগুরাত’ (The Ziggurat)। তারা পরকালে বিশ্বাস করত না। সুমেরীয়দের কিছু পৌরাণিক কাহিনি যেমন: সৃষ্টিতত্ত্ব, মহাপ্লাবন পরবর্তী সময়ে ওল্ড টেস্টামেন্টে স্থান পেয়েছে।

আইন: সুশৃঙ্খল ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য সুমেরীয়রা একটি আইনকাঠামো গড়ে তুলেছিল। সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গি (Dungi) এ আইন প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি নিজেকে ‘পৃথিবীর চার অঞ্চলের নৃপতি’ (King of the four regions of the earth) উপাধি দিয়ে সুমেরীয় জাতিকে একত্রিত করেন এবং স্থানীয় প্রচলিত আইনগুলোকে সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম একটি বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করেন। সুমেরীয় আইনের ধারা ছিল খুব কঠোর প্রকৃতির। সাধারণভাবে একে বলা হয় প্রতিশোধমূলক আইন। যেমন: চোখের বদলে চোখ, হাতের বদলে হাত ইত্যাদি। ঐতিহাসিকদের মতে, ব্যাবিলনীয় সম্রাট হাম্মুরাবি ডুঙ্গির আইনকে গ্রহণ করেই হাম্মুরাবির ‘আইন সংহিতা’ বা ‘The Code of Hummurabi’ প্রণয়ন করেন।

শিল্পকলা: পাথরের স্বল্পতার কারণে সুমেরীয়রা রোদে শুকানো ইট দিয়ে ধর্মীয় মন্দির ও বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করত। সুমেরীয়রা উর শহরের মাঝখানে প্রধান ধর্মমন্দির 'জিগুরাত' নির্মাণ করেছিল। তারা পূজা করার জন্য বহু দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ করত। স্বর্ণকারেরা সোনা-রুপা ও দামি পাথর দিয়ে সুদৃশ্য গহনা, তাম্রকারেরা তামা পিটিয়ে নানারকম ধারালো অস্ত্র বানাত। সুমেরীয়রাই প্রথম কুমোরের তাক আবিষ্কার করেছিল।

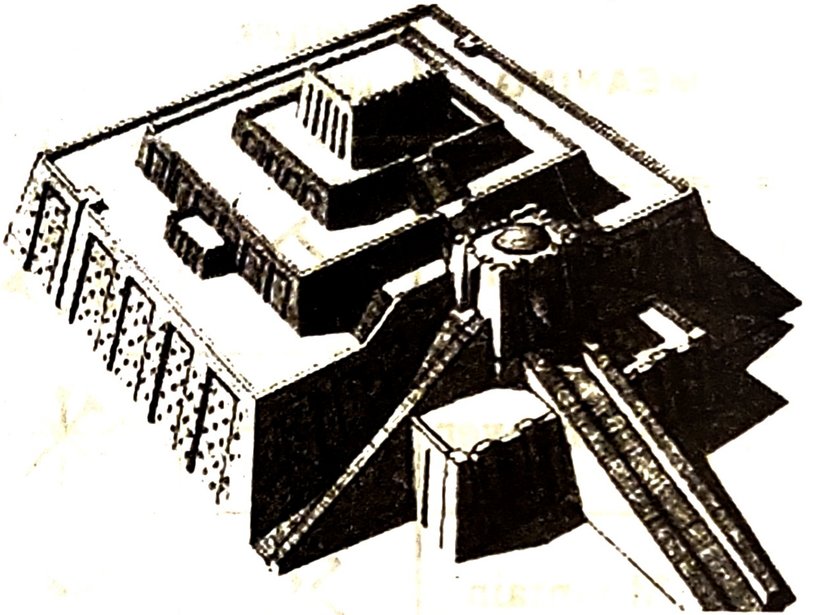

জিগুরাত মন্দির

সাহিত্য: ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রাপ্ততথ্য থেকে ধারণা করা হয়, সুমেরীয় সাহিত্য ছিল পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর। এসব কাহিনিতে প্রাচীন রাজাদের সাথে দেবতাদের সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছিল। ধর্মচিন্তার সাথেও এসব সাহিত্যের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সুমেরীয় সাহিত্যের মধ্যে বিখ্যাত ছিল 'প্লাবনের মহাকাব্য'। এছাড়া ইউরুকের কিংবদন্তির রাজা গিলগামেশকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন সুমেরে বিখ্যাত 'গিলগামেশ মহাকাব্য' লিখিত হয়েছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞান: প্রাচীন সুমেরে ধর্মকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল। ধর্মীয় উৎসবের সময় বের করতে গিয়েই তারা জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভাবন ও চর্চা করেছিল। দিনপঞ্জি আবিষ্কার তাদের প্রধান অবদান। সুমেরীয়রা চাঁদের আবর্তনের ওপর নির্ভর করে জলঘড়ি ও চন্দ্র পঞ্জিকার উদ্ভাবন করেছিল। তারা বছরকে ১২ মাসে বিভক্ত করে। এছাড়া তারা ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টায় একদিন, ৭ দিনে এক সপ্তাহ প্রভৃতি নির্ধারণ করে। এছাড়া গুণ ও ভাগ করার পদ্ধতি, ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে সুমেরীয়রা বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দজলা ও ফোরাত নদীর অববাহিকায় কোন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? *[জাবি ২০১৬-১৭]*
২. মেসোপটেমীয় সভ্যতাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সভ্যতা কোনটি?
৩. সুমেরীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম কী?
৪. কোন সভ্যতায় প্রথম 'চাকা'র ব্যবহার প্রচলন হয়? *[রাবি ২০০৮-০৯]*
৫. ডুঙ্গি কোন সভ্যতার সম্রাট ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
৬. 'প্লাবনের মহাকাব্য' কাদের সাহিত্যিক নিদর্শন?

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের একটি তালিকা তৈরি করো।
২. সভ্যতায় সুমেরীয়দের উল্লেখযোগ্য অবদানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৯

ব্যাবিলনীয় এবং হিব্রু সভ্যতা
The Babylonian and the Hebrew Civilization

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

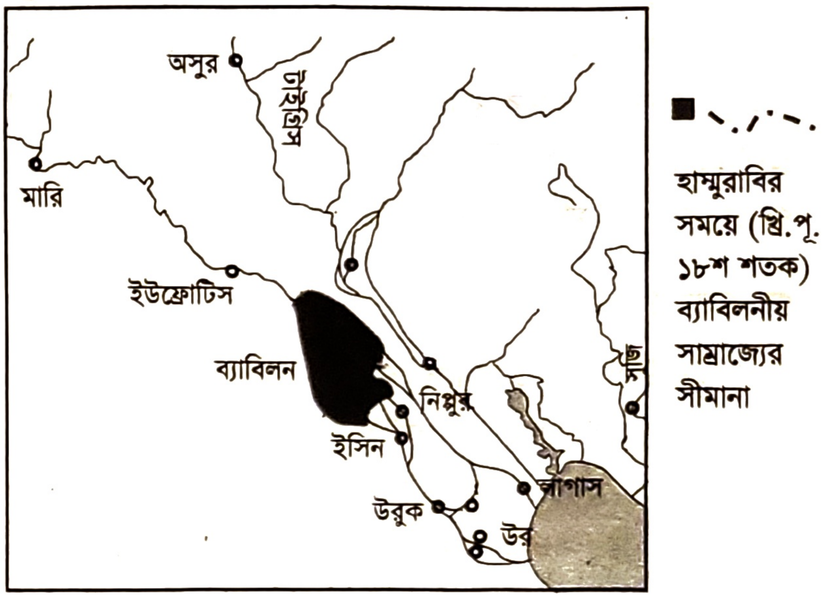
অসুর
টাইগ্রিস
মারি
ইউফ্রেটিস
ব্যাবিলন
নিপ্পুর
ইসিন
লাগাস
উরুক
উর
হাম্মুরাবির সময়ে (খ্রি.পূ. ১৮শ শতক) ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের সীমানা

মেসোপটেমিয়ায় ব্যাবিলনীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব

সুমেরীয়দের ধ্বংসস্তূপের ওপর ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সূচনা হয়েছিল ২০৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। ব্যাবিলন শব্দটি 'বাব ইল' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'দেবতার শহর' নগর। আরব ঐতিহাসিকেরা এ অঞ্চলকে 'উম্মুল বিলাদ' বা সভ্যতার জন্মভূমি নামে অভিহিত করেন। আমোরাইট নামে পরিচিত একদল সেমেটিক মানুষ এ সভ্যতাটির যাত্রা শুরু করেছিল। ব্যাবিলনের ওপর দিয়ে মেসোপটেমিয়ার প্রধান স্থলপথটি চালু থাকায় কালক্রমে এ সভ্যতার মানুষেরা বাণিজ্যিক তৎপরতায় যুক্ত হলে ব্যাবিলন মেসোপটেমিয়ার শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য নগরীতে পরিণত হয়। এ সভ্যতাটির শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন রাজা হাম্মুরাবি (খ্রি. পূ. ২১২৩-২০৮১)। তিনি 'কোড অব হাম্মুরাবি' নামে বিখ্যাত একটি আইন সংহিতা প্রণয়ন করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

নব্য-ব্যাবিলনীয়

রাজা হাম্মুরাবির মৃত্যুর মেসোপটেমীয় সভ্যতা অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ায় সামাজিক সংহতি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে অ্যাসিরীয়দের উত্থান ঘটে। পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে অ্যাসিরীয়দের পরাজিত করে সামন্তরাজা নেবুচাদনেজার মেসোপটেমীয় অঞ্চলে যে শাসনের সূচনা করেন তা 'নব্য-ব্যাবিলনীয়' নামে পরিচিত। সম্রাট নেবুচাদনেজার তার প্রিয়তমা স্ত্রীর মন রক্ষার্থে ব্যাবিলনে দেয়ালের ওপর এক মনোরম উদ্যান গড়ে তোলেন, যা 'ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান' বা 'ঝুলন্ত উদ্যান' নামে পরিচিত।

সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান

আইন সংহিতা প্রণয়ন: সম্রাট হাম্মুরাবির লেখা ৫৫টি চিঠি, তার আইন সংহিতা এবং সমকালীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষণ করে সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের নানা অবদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের প্রধান অবদান হাম্মুরাবির আইন সংহিতা প্রণয়ন। পারস্যের সিপার দুর্গে কালো সবুজ পাথরে সংকলিত এ আইন সংকলনটি পাওয়া গেছে। এ আইনে ২৮২টি ধারা ছিল, যাতে দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ ইত্যাদি কঠোর শাস্তির বিধান সম্পর্কে জানা যায়। এতে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক অপরাধ, পারিবারিক বিচার, বিবাহ, বাণিজ্যিক বিধান ইত্যাদি বিধি সংযোজিত ছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা: ব্যাবিলনীয়রা গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। গণিতে দশমিকের প্রচলন, বীজগণিতে সরল সমীকরণ, পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতে মান নির্ণয়ে তাদের অবদান ছিল। এ সময় পুরোহিতরা জিগুরাতের চূড়ায় বসে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন এবং জ্যোতির্বিদ্যার উন্নয়নে তারা ব্যাবিলনীয় পঞ্জিকা তৈরি করেছিলেন। এরাই সর্বপ্রথম চাঁদের

সাথে অন্যান্য গ্রহের সম্পর্কের ধারণা প্রদান করেছিল। ব্যাবিলন চিকিৎসাবিজ্ঞানেও উন্নত ছিল। এ সময় ব্যাবিলনে ৫৫০ প্রকারের ঔষধ পাওয়া যেত। তাদের নিজস্ব ভাষা ও ৩৫০টি ধ্বনি ছিল। তাদের সাহিত্যের বড় উদাহরণ ছিল কিউনিফর্ম লিপিতে রচিত 'গিলগামেশ' মহাকাব্য। এসব লেখা হতো মন্দিরে পুরোহিতদের সামনে।

ধর্মীয় বিশ্বাস: ব্যাবিলনীয়দের ধর্ম সুমেরীয়দের চেয়ে পরিমার্জিত ছিল। ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা ছিল 'মারডক'। দেবী 'ইস্টার' ছিলেন গাছপালা, পশু-পাখি ও মানুষের জন্মের নিয়ন্ত্রণকারী। মারডকের ভাই 'তাম্মাজ' ছিলেন এদের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। এদের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরকালের কোনো ধারণা ছিল না। ধর্মচর্চাকে কেন্দ্র করে ব্যাবিলনীয়রা সুমেরীয়দের অনুকরণে সাহিত্য রচনা করেছিল। ব্যাবিলনীয়রা মুদ্রার ব্যবহার না জানলেও তারা রোদে শুকানো ইট দিয়ে বিখ্যাত 'জিগুরাত' মন্দির তৈরি করেছিল। পিরামিডের আকৃতিতে নির্মিত এই মন্দিরের উচ্চতা ছিল ৬৫০ ফুট।

হিব্রু সভ্যতা

হিব্রু জাতির উৎপত্তি: প্রাচীনকালে সেমেটিক জাতিগোষ্ঠীর একটি শাখা বর্তমান প্যালেস্টাইনের (ফিলিস্তিন) জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল তা হিব্রু সভ্যতা নামে পরিচিত। 'হিব্রু' একটি সেমেটিক ভাষার নাম। এ ভাষায় কথা বলা মানুষেরাই হিব্রু নামে পরিচিত। প্রচলিত একটি মত অনুসারে, 'খাবিরু' (Khabiru) বা 'হাবিরু' (Habiru) নাম থেকে হিব্রু শব্দটি এসেছে। এটি হিব্রুদের শত্রুপক্ষের দেওয়া নাম, যার অর্থ বিদেশি, নিম্নবংশীয় যাযাবর। অপর মতে, 'হিব্রু' নামটি 'ইবার' (Ever) থেকে এসেছে। 'হিব্রু' অর্থ যাযাবর বা বিদেশি। হিব্রুদের কখনও কখনও ইউফ্রেটিস নদীর অপর তীর থেকে আগত জাতিগোষ্ঠীর লোক হিসেবে আখ্যা দিয়ে 'হিব্রু' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

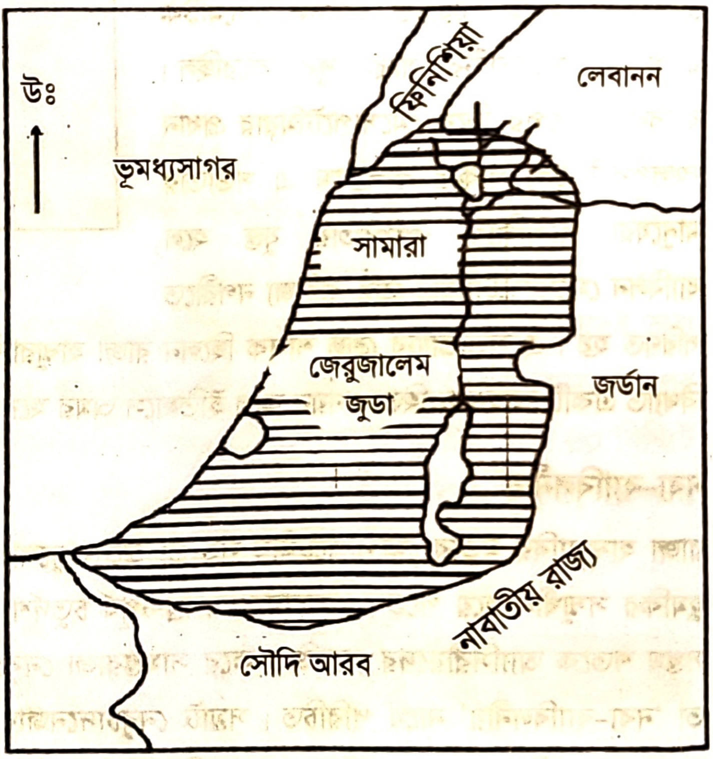

হিব্রু সভ্যতা (প্যালেস্টাইন/ফিলিস্তিন)

হিব্রু সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান: হিব্রু সভ্যতার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত প্যালেস্টাইনের অবস্থান এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমে। দেশটির উত্তরে রয়েছে প্রাচীন ফিনিশিয়া আর বর্তমান লেবানন। দক্ষিণে সৌদি আরব, পূর্বদিকে জর্ডান এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর।[১৭]

হিব্রুদের রাজনৈতিক ইতিহাস: হিব্রু সভ্যতার মানুষ হিব্রু বা ইহুদি নামে পরিচিত। তাদের আদিবাস ছিল আরব মরুভূমিতে। এরা প্রথমে সুমেরীয়দের অধীনে ছিল। তাদের নেতা আবরাহাম বা ইবরাহিম (আ) ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে অনুসারীদের নিয়ে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় (ইরাক) চলে যান। পরবর্তী সময়ে আবরাহামের বংশধর জ্যাকব বা ইয়াকুব (আ) হিব্রুদের নিয়ে প্যালেস্টাইনের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়াকুব (আ) 'ইসরাইল' নামেও পরিচিত ছিলেন এবং সে সূত্রেই তার অনুসারীরা 'ইসরাইলি' নামে পরিচিত হয়। হিব্রুরা ১৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিসরের ফারাও সম্রাটের দাসে পরিণত হয় এবং

---

[১৭] *মানচিত্রসূত্র: বিশ্বসভ্যতা,* এ কে এম শাহনাওয়াজ, পৃ. ১৫৩

দীর্ঘকাল দাসত্বের জীবন কাটায়। ১৩০০-১২৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মোজেস (Moses) বা মুসা (আ)-এর আবির্ভাব হলে এরা দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে এবং সিনাই উপদ্বীপে এসে নতুন আবাস গড়ে তোলে। হযরত মুসা (আ) হিব্রুদেরকে কেবল একত্রই করেননি, বরং একেশ্বরবাদী হিসেবে জেহোভার (Jehovah) উপাসনায় আকৃষ্ট করেন। তার মৃত্যুর পর হিব্রুরা পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরে ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে হিব্রু নেতা ডেভিড বা দাউদ (আ) হিব্রুদের সংগঠিত করেন। ডেভিডের মৃত্যুর পর তার পুত্র সলোমন (Solomon) বা সুলায়মান (আ) হিব্রুদের রাজা হন। তার রাজত্বকালে হিব্রু রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে। হিব্রুদের আবাসভূমি জেরুজালেমকে তিনি সুরম্য অট্টালিকার এক মনোরম শহরে পরিণত করেন। তবে সুলায়মান (আ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে একটি বড় উপাসনালয় নির্মাণ, যা তার নামানুসারে 'Solomon's Temple' ('বায়তুল মুকাদ্দাস' বা 'মসজিদুল আকসা') নামে পরিচিত। ৭২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে অ্যাসিরীয়রা হিব্রু সাম্রাজ্য দখল করে। এরপর ৫৮৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ক্যালডীয় রাজা নেবুচাদনেজারের জুডাহ অধিকারের মধ্য দিয়ে এ সভ্যতার পতন ঘটে।

সভ্যতায় হিব্রুদের অবদান

ধর্মীয় বিশ্বাস: হিব্রুরা বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'একেশ্বরবাদের ধারণা' প্রবর্তন করে। তাদের নবিদের মধ্যে রয়েছেন হযরত মুসা (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলায়মান (আ) প্রমুখ। তাদের মতে, দেবতা জেহোভা (Jehovah) বা ইয়াওয়েহ একমাত্র ঈশ্বর। ঐতিহাসিক বার্নস ও রাল্ফ এর মতে, হিব্রুদের ধর্ম ৪টি পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে। যথা— মুসাপূর্ব স্তর, নির্দিষ্ট দেবতায় আরাধনার স্তর, নবিদের আগমনের স্তর, নির্বাসন পরবর্তী স্তর। পরে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর নিরাকার আল্লাহর পরিবর্তে হিব্রুরা জেহোভাকে আকার বিশিষ্ট একক ঈশ্বর বলে মনে করত। হিব্রুদের ধর্মীয় গ্রন্থ 'তাওরাত' যা ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old Testament) নামে পরিচিত। এ গ্রন্থের ১০টি অনুশাসনের ভিত্তিতে তাদের নৈতিক মান নির্ধারিত হতো। এ গ্রন্থে ৮৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত লিখিত ৩৯টি পুস্তক সন্নিবেশিত হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা যেমন বর্তমানকালের ইহুদিরা মেনে চলে, তেমনি খ্রিষ্টধর্মের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের অনেক বর্ণনা এটি থেকে গৃহীত বলে গবেষকেরা মনে করেন।

আইন: হিব্রুধর্মের আইনের ধারা নিয়ে ওল্ড টেস্টামেন্টের (Old Testament) পঞ্চম পুস্তক (Book of deuteronomy) রচিত হয়েছে। তাই এই আইনকে 'ডিউটেরোনোমিক কোড' বলা হয়। সম্ভবত নবিদের উন্মেষকালে ধর্মীয়ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তখনই এ আইন সংকলিত হয়েছিল। হিব্রু আইনে দানশীলতা, উদারতা, দাসমুক্তি, বিচারক ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সুদ, ঋণ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে শাস্তি ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রয়েছে।

হিব্রু দর্শন: ওল্ড টেস্টামেন্টের 'Book of Proverbs' এবং 'Apocryphal Book of Ecclesiasticus' সহ পুরো গ্রন্থেই হিব্রু দর্শনের প্রতিফলন দেখা যায়। এ দর্শন অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি যন্ত্রবিশেষ এবং তা কোনো লক্ষ্য ছাড়াই আবর্তিত হচ্ছে। হিব্রু দর্শন মতে, মানুষ তার ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল। খ্যাতি, ধনসম্পদ, আনন্দ ইত্যাদি এক একটি ফাঁদবিশেষ এবং এগুলো মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

হিব্রু সাহিত্য: প্রাচীন হিব্রু সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ ছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টকে কেন্দ্র করেই এ সময়কার সাহিত্য বিকশিত হয়েছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টে ইহুদি রাজতন্ত্রের ঘটনা, মহাকাব্যের বিভিন্ন দিক, বিচারকর্তা ও শাসনের নাটকীয় কাহিনি, মহিলাদের অবস্থান ও চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া 'জবের পুস্তক' (The Book of Job) রাজা ডেভিডের 'সালমসের পুস্তক' (The Book of Psalms) তাদের অন্যতম সাহিত্যিক নিদর্শন।

শিল্পকলা ও স্থাপত্য: শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে হিব্রুরা অনন্য অবদান রেখেছে। জেরুজালেমে অবস্থিত 'হেরোদ' মন্দিরের স্থাপত্যে এবং ১৯৪৭ সালে আবিষ্কৃত পুঁথি 'ডেড সি স্ক্রল' (Dead Sea Scroll) বা 'মরু সাগরের দস্তাবেজ'-এ হিব্রুদের চিত্রকলার পরিচয় মেলে। এছাড়া জেরুজালেমে পাওয়া একটি চিত্রশোভিত সিল থেকে তাদের উন্নত চিত্রকলা সম্পর্কে জানা যায়।

প্রশাসন: হিব্রুরা প্রাচীনকালে একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলে। হিব্রু শাসক ডেভিড বা দাউদ (আ) একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। রাজা সলোমন (Solomon) বা সুলায়মান (আ) একটি ইহুদি সিভিল সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করেন এবং এমন কর ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, যেখানে ধনী অঞ্চলগুলোকে বেশি এবং গরিব অঞ্চলগুলোকে কম কর দিতে হতো।

ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে হিব্রুদের অবদান অনস্বীকার্য। মানব ইতিহাসে পরবর্তী সভ্যতার বিকাশে হিব্রু সভ্যতার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁর বিকাশেও হিব্রু সভ্যতার পরোক্ষ অবদান রয়েছে বলেও ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন শব্দ থেকে ব্যাবিলন শব্দের উৎপত্তি? *[রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো. ২০১৭]*

২. 'উম্মুল বিলাদ' শব্দের অর্থ কী ?

৩. ইতিহাসের প্রথম লিখিত আইনপ্রণেতা কে? *[রাবি ২০০৫-০৬]*

৪. ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান কে গড়ে তুলেছিলেন?

৫. কোন নগরীকে কেন্দ্র করে হিব্রু সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়?

৬. হিব্রুদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম কী?

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

নিচের ছকটি পূরণ করো:

ওল্ড টেস্টামেন্টের বিভিন্ন পুস্তক	পুস্তকের বর্ণনা

পাঠ ১০

গ্রিক সভ্যতা
The Greek Civilization

বর্তমান গ্রিসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গ্রিক সভ্যতার বিকাশের মধ্য দিয়েই ইউরোপের গৌরবময় ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়। এ সভ্যতা বিকাশের আগে ওই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল মিনীয় ও মাইসেনীয় সংস্কৃতি। মিনীয় সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি ছিল ইজিয়ান সাগরের ক্রিট দ্বীপ। আর গ্রিসের মাইসেনি শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মাইসেনীয় সংস্কৃতি। মাইসেনীয় সংস্কৃতির সূচনা ১৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হলেও এর বিকাশ ঘটেছিল আরও পরে অর্থাৎ ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। মাইসেনীয়রা ছিল যোদ্ধাজাতি। এ জন্য তারা একিয়ান নামে পরিচিতি লাভ করে। একিয়ানরা ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে ডোরীয় জাতিগোষ্ঠীর হামলার শিকার হয়। ডোরীয়দের আক্রমণে একসময় সমস্ত ইজিয়ান অঞ্চল একিয়ানদের হাতছাড়া হয়। ১১৫০ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ডোরীয়রা একিয়ানদের পরাজিত করে মূল গ্রিক ভূখণ্ড দখল করে নেয়। ডোরীয় ও ইজিয়ান অঞ্চলের অধিবাসীরা দীর্ঘকাল একই সাথে বসবাস করে এক নতুন জাতি ও সংস্কৃতির জন্ম দেয়। এটিই গ্রিক সভ্যতা নামে পরিচিত হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর এ মানুষেরা ৩৩৮ খ্রি.পূ. পর্যন্ত গ্রিক সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভৌগোলিক অবস্থান: ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বলকান উপদ্বীপ। এর দক্ষিণাংশে ভূমধ্যসাগর, ইজিয়ান সাগর ও আইওনিয়ান সাগরবেষ্টিত ছোট পাহাড়ি দেশ গ্রিস। ভূ-প্রকৃতি দেশটিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করেছে। যথা: দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর গ্রিস। মেসিডোনিয়ার অধিপতি দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডারের শাসনামলে (৩৩৬-৩২৩ খ্রি.পূ.) এ সভ্যতার সীমানা গ্রিস পেরিয়ে আধুনিক মিসর, প্যালেস্টাইন, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ইরান হয়ে ভারতবর্ষের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

গ্রিকদের রাজনৈতিক ইতিহাস: পুরো গ্রিক সভ্যতার সময়কাল ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে একে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: হেলেনিক যুগ ও হেলেনিস্টিক যুগ।

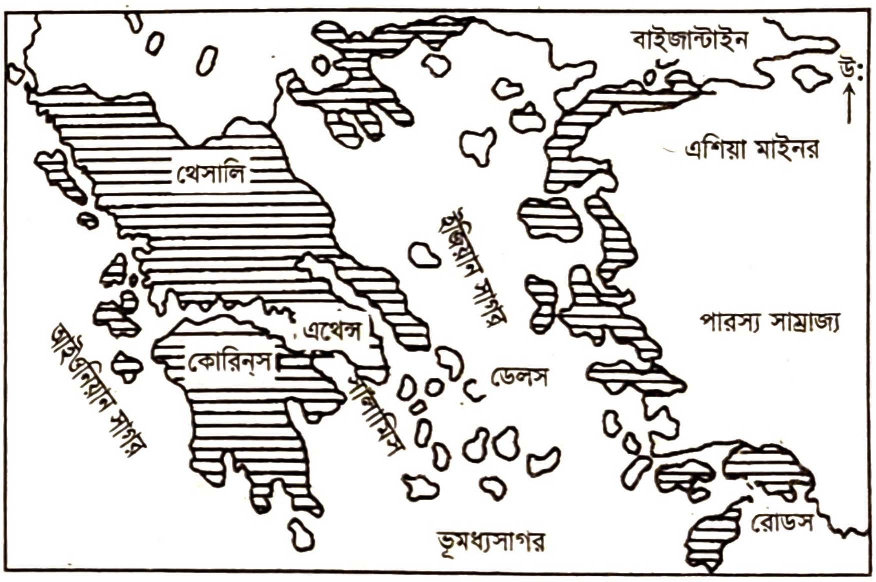

গ্রিক সভ্যতা

হেলেনিক যুগ

মাইসেনীয় সভ্যতার পতনের পর গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের ৪৫,০০০ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে একটি নতুন সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়। দেবতা ডেউকালিয়ন (Deucalion) এর পুত্র গ্রিক বীর হেলেনের নামানুসারে এটি হেলেনিক সভ্যতা নামে পরিচিতি লাভ করে। এ সভ্যতার সময়সীমা ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ৩৩৬ খ্রি.পূ. পর্যন্ত।

হোমারীয় যুগ: ১১০০ থেকে ৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত গ্রিসের ইতিহাস জানার জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না। শুধু গ্রিক মহাকবি হোমারের রচিত মহাকাব্য 'ইলিয়াড' (Illiad) ও 'ওডেসি' (Odyssey) থেকেই এ যুগের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাই গ্রিসের এ কালপর্বকে 'হোমারীয় যুগ' বলা হয়। এ যুগের গ্রিক সমাজে পুরোহিত ও অভিজাতরা উচ্চশ্রেণি এবং কৃষক, কারিগর ও দাসরা নিম্নশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে গ্রিসে গ্রাম সম্প্রদায় ভেঙে যায় এবং একেকটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একেকটি নগররাষ্ট্র। অবস্থান ও কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে এ যুগে বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টা ও গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্স।

সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টা: গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে স্পার্টার বৈশিষ্ট্য ছিল একেবারে আলাদা। ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে পেলোপনেসাস অঞ্চলের যুদ্ধোন্মাদ স্পার্টানরা মাইসেনীয়দের পরাজিত করে স্পার্টা দখল করে নিয়েছিল। শতাব্দীকাল ধরে মাইসেনীয়দের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত এ জাতি মনে-প্রাণে ছিল যুদ্ধবাজ। এজন্য তাদের শাসনাধীন স্পার্টাকে বলা হয় 'সামরিক নগররাষ্ট্র' (Military State)। স্পার্টা কার্যত ছিল একটি যুদ্ধশিবিরের মতো। স্পার্টানরা সবসময়ই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। যুদ্ধে বন্দি ব্যক্তিদের ভূমিদাস বানানো হতো। তারা 'হেলট্' (helt) নামে পরিচিত ছিল। যুদ্ধপ্রিয় স্পার্টার নারী-পুরুষ সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। প্রায় সবসময় যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় এ নগররাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে পারেনি। তাদের সংস্কৃতিও ততটা উন্নত ছিল না।

গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্স: গ্রিক সভ্যতার বিকাশে যেসব নগররাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তার মধ্যে এথেন্স প্রধান। কারণ, যুদ্ধবাজ স্পার্টার সমসাময়িক এ নগররাষ্ট্রের অধিবাসীরাই বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম রাজতন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে গণতন্ত্রের সূচনা করেছিল। সূচনালগ্নে এথেন্সে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। তবে ধীরে ধীরে এ নগররাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। ডোরীয়দের আক্রমণে এথেন্সের রাজা কড্রসের মৃত্যুর পর ক্ষমতা চলে যায় অভিজাতদের হাতে। এ সময়ের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বলা হয় অভিজাততন্ত্র। রাষ্ট্র পরিচালনায় তখন দুটি সংসদ ছিল। ১. গোত্রপ্রধানদের নিয়ে গড়া 'এপিও পেগার্স' এবং ২. সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে গঠিত সমিতি 'একলেসিয়া'।

৭ম খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি রাষ্ট্রব্যবস্থায় আবার পরিবর্তন আসে। এ সময় অর্থের মানদণ্ডে অভিজাতশ্রেণি গঠিত হতে থাকে। ফলে ৬৫০ থেকে ৬৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে শাসনকাঠামোতে দেখা দেয় নতুন পরিবর্তন। এ সময় উচ্চশ্রেণির দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিয়ে 'থেসমথেটিয়া'এবং সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে 'থাটের্স' পরিষদ গঠিত হয়। এ সময় কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি সমাজসংস্কারে এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে সালোন (Solon 640-558 B.C.), সিপিস্ট্রেটস, ক্লিসথেনিস এবং পেরিক্লিসের নাম অগ্রগণ্য। অভিজাত বংশে জন্ম নেওয়া সালোন ছিলেন সংস্কারকদের পথিকৃৎ। সালোন পরবর্তী যুগে এথেন্সের সংস্কার কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গতা এনে দেন এথেন্সের রাজা পেরিক্লিস (Pericles 494-429 B.C.)। পেরিক্লিস ৪৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ক্ষমতায় এসে এথেন্সের শাসনবস্থায় নানামুখী সংস্কার করে একে গণতান্ত্রিক রূপ দেন।

সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টা ও গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র এথেন্সের অবস্থান পাশাপাশি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এ দুটি নগররাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল। এ বৈরিতার জের ধরে তাদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এ যুদ্ধে এথেন্স ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলো নিয়ে 'ডেলিয়ান লীগ' (Delian League) এবং স্পার্টা ও তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলো গঠিত হয় 'পেলোপনেসীয় লীগ' (Peloponnesian League)। ৪৩১-৪০৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সংঘটিত এ যুদ্ধে এথেন্স পরাজিত হয়ে স্পার্টার অধীনে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে ৩৩৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এথেন্স মেসিডোনের রাজা ফিলিপের দখলে গেলে হেলেনীয় যুগের পরিসমাপ্তি হয়।

সভ্যতায় হেলেনিকদের অবদান

ধর্ম: হেলেনিক যুগে গ্রিকরা প্রকৃতি পূজা করত। বিভিন্ন দেব-দেবীতে তাদের বিশ্বাস ছিল। গ্রিকদের প্রধান দেবতা ছিলেন জিউস (আকাশ ও বজ্রের দেবতা)। তার স্ত্রী হেরা ছিলেন বাড়ির (বিবাহ ও পরিবার) দেবী। সূর্যদেবতা এপোলো জীবন ও সংগীতের দেবতা হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। চিরকুমারী এথেনা ছিলেন জ্ঞান ও বায়ুর দেবী। এছাড়া অন্যান্য গ্রিক দেব-দেবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শিকারের দেবী আর্তেমিস, দেবতার দূত হার্মিস ও প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি। জিউসের দুই ভাইও দেবতা হিসেবে বিবেচিত হতেন। এদের একজন সমুদ্র দেবতা পসেইডন ও পাতাল দেবতা হেডিস। গ্রিক পুরোহিতরা ধর্মমন্দিরকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। রাষ্ট্রের সহযোগিতা ও পুরোহিতদের প্রভাবে এ সময় গ্রিসে অনেকগুলো দৃষ্টিনন্দন মন্দির তৈরি হয়েছিল। এসব মন্দিরে অনেক সুনির্মিত মূর্তি রাখা হতো এবং প্রার্থনা ও জাঁকজমকপূর্ণ পূজা-অর্চনা চলত।

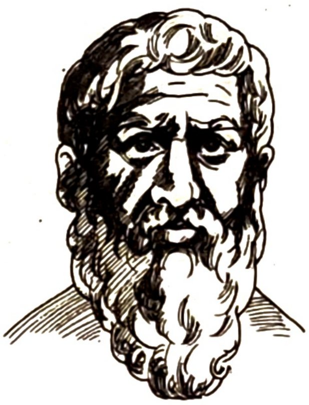

প্লেটো

দর্শন: হেলেনিকরা দর্শনচর্চার ক্ষেত্রেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। প্রকৃতির নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে গিয়ে তারা দর্শনচর্চার বিকাশ ঘটিয়েছিল। মিলোটাসের দার্শনিক থেলিস (Thales, আনু: ৬২৪-৫৪৬ খ্রি. পূ.) ৫৫৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারণ বিশ্লেষণ করেন। মানুষ ও পৃথিবীর উৎস নিয়ে ভাবতে গিয়ে এ সময় একশ্রেণির যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছিল যাদের বলা হতো ‘সোফিস্ট’ (Sophists)। এরা তরুণ সমাজের ওপর বেশ প্রভাব ফেলেছিলেন। এ ধারার সবচেয়ে খ্যাতিমান দার্শনিক ছিলেন এথেন্সের সক্রেটিস (Socrates,আনু: ৪৭০-৩৯৯ খ্রি. পূ.)। আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা ছিল তার দর্শনের প্রধান বিষয়। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর তার ছাত্র প্লেটো (Plato, ৪২৭-৩৪৭ খ্রি. পূ.) এবং প্লেটোর পর তার ছাত্র এরিস্টটল (Aristotle, ৩৮৪-৩২২ খ্রি. পূ.) দর্শনচর্চার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। প্লেটো তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘দ্য রিপাবলিক’ (The Republic) ও ‘ডায়ালগস অব সক্রেটিস’ (Dialogues of Socrates) এবং এরিস্টটল ‘দ্য পলিটিক্স’ (The Politics) গ্রন্থ রচনা করেন।

সাহিত্য: গ্রিকরা বিশ্বসাহিত্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যের নিদর্শন মহাকবি হোমারের ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডেসি’ মহাকাব্য ধ্রুপদী বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এতে গ্রিকদের হাতে এশিয়া মাইনরের ট্রয় নগরী ধ্বংস হওয়া ও পরের ঘটনাপ্রবাহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রথমদিকে গ্রিক সাহিত্যে কাল্পনিক চিন্তার প্রাধান্য ছিল। পরবর্তী সময়ে তা কমে আসে। এক পর্যায়ে সাহিত্যের বিশেষ এক ধারা হিসেবে শোকসংগীতের (Elegy) উন্মেষ হয়। শোকগীতি রচিত হতো দেশপ্রেমিক কোনো বীরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অথবা সমাজসংস্কারের লক্ষ্যে। গীতি রচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন সলোন এবং মিমনারমাস।

জেনে রাখো

বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল তার ‘Politics’ গ্রন্থে আদর্শ নগররাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি লেখেন- তার আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যকার ভারসাম্য নির্ভর করে মেধাবী ও শিক্ষিত লোকদের ওপর। এরিস্টটলকে পাশ্চাত্য দর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

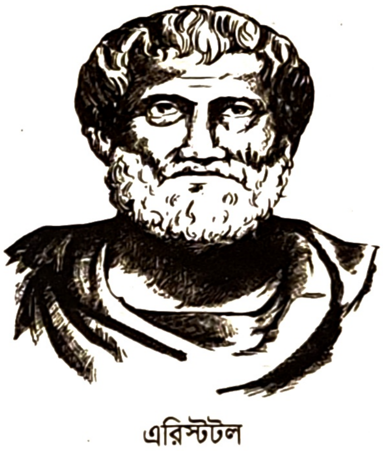

এরিস্টটল

নাটক: ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয় এবং যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হেলেনিক যুগে অনেকগুলো নাটক রচিত হয়েছিল। এ সময়কার বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন এস্কাইলাস (Aeschylus, ৫২৫-৪৫৬ খ্রি. পূ.)। তিনি ‘প্রমিথিউস বাউন্ড’ (Prometheus Bound) ও ‘আগামেনন’ (Agamemnon) নাটক রচনা করেন, যা বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এ সময়ের আরেকজন বিখ্যাত নাট্যকার হচ্ছেন সফোক্লিস (Sophocles, ৪৯৬-৪০৬ খ্রি. পূ.)। তিনি ১০০টির বেশি নাটক লিখেছিলেন। ‘এন্টিগনে’ (Antigone) ও ‘ইলেক্ট্রা’ (Electra) তার দুটি জনপ্রিয় নাটক।

ইতিহাস: ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে হেলেনীয়রা ছিল পথিকৃৎস্বরূপ। এ সময় ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাস (Herodotus, ৪৮৪-৪২৫ খ্রি. পূ.) গ্রিক-পারস্য যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘The Histories’ রচনা করেন। বস্তুত এ গ্রন্থ রচনার *মধ্য দিয়েই বিশ্ব ইতিহাস লেখা শুরু হয়। এজন্য হেরোডোটাসকে ‘ইতিহাসের জনক’ (Father of History) বলে অভিহিত* করা হয়। অপর একজন খ্যাতনামা গ্রিক ঐতিহাসিক হলেন থুকিডাইডিস (Thucydids, ৪৬০-৪০০ খ্রি. পূ.)। যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ইতিহাস রচনা করেছেন বলে তাকে ‘বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক’ বলা হয়।

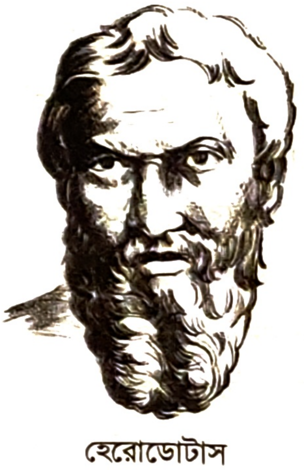

হেরোডোটাস

বিজ্ঞান: হেলেনিক যুগে গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। দার্শনিক থেলিস একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মেই সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে। গ্রিক বিজ্ঞানীরা বেশ সাফল্যের সাথে পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। গণিতবিদ পিথাগোরাস (Pythagoras, ৫৭০-৪৯৫ খ্রি. পূ.) জ্যামিতির উন্নয়নে তাৎপর্যপূণ অবদান রাখেন। পৃথিবী যে গোলাকার, তিনি তা গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেন। বিজ্ঞানী এনাক্সোগোরস (Anaxogoros, ৫০০-৪২৮ খ্রি. পূ.) প্রথম ধারণা দেন যে, সূর্য হচ্ছে একটি উত্তপ্ত ও গলিত পাথরের পিন্ড এবং চাঁদ সূর্যের আলোতেই আলোকিত হয়। হিপোক্রেটিস (Hippocrates, ৪৬০-৩৭০ খ্রি. পূ.) ছিলেন এ যুগের বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী। তিনি শারীরবিদ্যার ওপর গবেষণা করে রোগের প্রাকৃতিক কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হেলেনীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য: হেলেনিক যুগে গ্রিকরা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নির্মাণে ব্যাপক পারদর্শিতা দেখিয়েছিল। বিশাল প্রাসাদ নির্মাণে তাদের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। চারকোনা ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো চমৎকার স্তম্ভগুলো ছিল কারুকার্যখচিত। হেলেনীয় স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে গ্রিক ধর্মমন্দির, এথেন্সে দেবী এথেনার মন্দির ইত্যাদি। ধর্মীয় চিন্তার ওপর ভিত্তি করেই তখন ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। ফিদিয়াস হচ্ছেন গ্রিকদের সবচেয়ে খ্যাতিমান ভাস্কর। তিনি অপূর্ব দক্ষতায় ৭০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট দেবী এথেনার মূর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়া আইরন ছিলেন বিখ্যাত ভাস্করদের অন্যতম।

সংগীতচর্চা: ধর্মীয় উৎসবে গান গাওয়ার প্রেরণা থেকে গ্রিসে সংগীতচর্চার বিকাশ ঘটেছিল। সংগীতচর্চার কারণে গ্রিসে নানা ধরনের সংগীতকলার বিকাশ ঘটেছিল। তারা বাঁশি বাজাতে জানত এবং তাদের মধ্যে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল।

অলিম্পিক খেলা: রাজনৈতিক লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গ্রিক রাজনীতিবিদরা ৭৭৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে অলিম্পিক খেলা শুরু করেন। এক্ষেত্রে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনে সব নগররাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয় ঐক্যজোট তৈরি করা। প্রতি ৪ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এ খেলায় বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করত। ফলে এ খেলার সূত্র ধরে পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয়ে গ্রিকদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে।

হেলেনিস্টিক যুগ

গ্রিক সভ্যতায় হেলেনীয় যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে হেলেনিস্টিক যুগের যাত্রা শুরু হয়েছিল। হেলেনিস্টিক যুগের সৃষ্টিতে মহামতি আলেকজান্ডারের (Alexander, ৩৫৬-৩২৩ খ্রি. পূ.) নাম ব্যাপকভাবে জড়িয়ে থাকলেও যুগের সূচনা হয়েছিল তার বাবা মেসিডোনের শাসক দ্বিতীয় ফিলিপ (Philip-II) -এর সময়ে। সব নগররাষ্ট্র নিয়ে তিনি পারস্যের বিরুদ্ধে হেলেনীয় সংঘ (Hellenic League) গঠন করেন। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে দ্বিতীয় ফিলিপ গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হলে পুত্র আলেকজান্ডার ক্ষমতা গ্রহণ করে গ্রিক ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। তিনি হেলেনীয় সংঘের নেতা নির্বাচিত হয়ে ৩৩৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পারসিকদের পরাজিত করে এশিয়া মাইনর ও মিসরের কিছু অংশ দখল করেন। এরপর তিনি মিসরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ৩৩১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আরবেলার (Battle of Arbela) যুদ্ধে পারস্যের সম্রাট তৃতীয় দারিয়ুসকে (Darius III, ৩৮১-৩৩০ খ্রি. পূ.) পরাজিত করেন এবং সম্রাট দারিয়ুসের মৃত্যুর পর ৩৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সমগ্র পারস্য দখল করে ভারতের সীমান্ত তথা সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হন।

মহামতি আলেকজান্ডার তার লক্ষ্যকে পূরণের জন্য নতুন নৌপথ আবিষ্কার করে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যোগসূত্র জোরদার করেন। এভাবে ধীরে ধীরে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় এবং হেলেনীয় সভ্যতার সাথে পূর্বাঞ্চলীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলনে এক নতুন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। এ বিকশিত সংস্কৃতিই 'হেলেনিস্টিক সভ্যতা' (Hellenistic Civilization) নামে পরিচিত।

সভ্যতায় হেলেনিস্টিকদের অবদান

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে: হেলেনিস্টিক যুগে ভারতবর্ষ থেকে চীন, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর এবং দক্ষিণে ইথিওপিয়া পর্যন্ত গ্রিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ চালু হয়। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এ সময় জাহাজ নির্মাণ শিল্প, পোতাশ্রয় নির্মাণ, বাতিঘর নির্মাণসহ বাণিজ্য উপযোগী কাঠামো গড়ে ওঠে। এ সময় বাণিজ্যিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। জমিগুলোকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে তা অভিজাত ও কৃষকদের কাছে পত্তন দেওয়া হয়। ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতিতে হেলেনিস্টিকদের বড় অবদান তখন আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থার সূচক হিসেবে হেলেনিস্টিক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা সমগ্র মধ্য ও পশ্চিম এশিয়াব্যাপী বিস্তৃত হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকব্যবস্থাও গড়ে ওঠে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে: হেলেনিস্টিকরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর টলেমির (আলেকজান্ডারের সেনাপতি) শাসনকালে আলেকজান্দ্রিয়া নগরী বিজ্ঞানচর্চার তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এ সময় বিজ্ঞানের বিকাশে বিখ্যাত অনেক পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটেছিল। এদের মধ্যে জ্যামিতির জনক ইউক্লিড (Euclid, ৩৫০-৩০০ খ্রি. পূ.), ত্রিকোণমিতির জনক হিপার্কাস (Hipparchus, ২৬০-১২৫ খ্রি. পূ.), জ্যোতির্বিদ ও জ্যামিতজ্ঞ ইরাতোস্থিনিস (Eratosthenes, ২৭৬-১৯৫ খ্রি. পূ.), বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আর্কিমিডিস (Archimedes, ২৮৭-২১২ খ্রি. পূ.), বিজ্ঞানী ও দার্শনিক এরিস্টটল (Aristotle, ৩৮৪-৩২২ খ্রি. পূ.) ছিলেন অন্যতম। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও জ্ঞানচর্চায় হেলেনিস্টিক যুগে গণিতশাস্ত্র, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যাসহ বিজ্ঞানের নানা শাখায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

জেনে রাখো

আলেকজান্দ্রিয়া মিসরের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং এখানে মিসরের বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর অবস্থিত। এ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা আলেকজান্ডার দি গ্রেটের নামানুসারে এর নামকরণ হয় আলেকজান্দ্রিয়া। আনুমানিক ৩৩৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি এ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীনকালে এ শহরটি বাতিঘর এবং গ্রন্থাগারের জন্য বিখ্যাত ছিল। বর্তমান মিসরের বিখ্যাত গ্রন্থাগার 'বিবলিওথেকা আলেকজান্দ্রিয়া' এ শহরে অবস্থিত।

দর্শনের ক্ষেত্রে: হেলেনিস্টিক যুগে স্টোয়িকবাদ ও এপিকিউরাসবাদ বিকশিত হয়েছিল। এ যুগের বিখ্যাত দার্শনিকদের মধ্যে জেনো (Zeno, ৩৪২-২৭০ খ্রি. পূ.) ও এপিকিউরাস (Epicurus,৩৪১-২৭০ খ্রি. পূ.) ছিলেন অন্যতম। জেনো স্টোয়িক দর্শনের একজন পুরোধা হিসেবে এ মতবাদের একটি স্কুল গড়ে তুলেছিলেন। এপিকিউরাস ছিলেন এপিকিউরাসবাদের প্রবক্তা। তিনি নৈতিক চরিত্র সমুন্নত রেখে আনন্দ লাভের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত মঙ্গল লাভের জন্য মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে: হেলেনিস্টিক যুগে দেব-দেবীর আরাধনা করা হতো। টলেমি আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি চমৎকার মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এ যুগে প্রাচ্যের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা পাশ্চাত্যে প্রবেশ করলে এরই পথ ধরে খ্রিষ্টধর্মের উদ্ভব ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক কারণে গ্রিক সভ্যতার সাথে কোন দুটি সংস্কৃতির নাম জড়িত? *[চবি ২০০২-০৩]*
২. নগররাষ্ট্র স্পার্টা ও এথেন্স কোন সভ্যতার নিদর্শন?
৩. গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল কোথায়?
৪. 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসি' মহাকাব্যের রচয়িতা কে?
৫. গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস কোন বিষয়ের জনক?
৬. গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষের কোন নদীর সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন? *[রাবি ২০১২-১৩]*

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মানবসভ্যতার বিকাশে হেলেনিকদের নানা অবদানের একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ১১

রোমান সভ্যতা
The Roman Civilization

রোমান সভ্যতা প্রাচীন বিশ্বের উন্নত সভ্যতাগুলোর অন্যতম। গ্রিক সভ্যতা ম্লান হয়ে যাওয়ার আগেই রোমান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এ সভ্যতা গড়ে ওঠে মধ্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ইতালীয় ছোট শহর রোমকে কেন্দ্র করে যা বর্তমানে দেশটির রাজধানী। রোমান কিংবদন্তি অনুসারে নির্বাসিত দুই রাজপুত্র রোমিউলাস ও রোমাস সিংহাসন পুনরাধিকার করে ৭৫৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। রোমিউলাসের নামানুসারে রোম নগরীর নামকরণ হয়। এভাবে খ্রিষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে যাত্রা শুরু করে এ সভ্যতা খ্রিষ্টীয় ৪৭৬ অব্দ পর্যন্ত বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

ভৌগোলিক অবস্থান: ইতালির পশ্চিম সীমান্তের কাছে অবস্থিত শহর রোমকে কেন্দ্র করে রোমান সভ্যতা গড়ে ওঠে। এর পশ্চিমে আপেনাইন পর্বতমালা, উত্তরে আল্পস পর্বতমালা, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর এবং উত্তর-পূর্বে আড্রিয়াটিক সাগর। উত্তর-পূর্বে আড্রিয়াটিক সাগরের অপর পাশে বলকান অঞ্চল তথা মধ্য ইউরোপীয় ভূখণ্ড। রোম নগরী সাতটি পাহাড়ের ওপর ছড়িয়ে আছে। তাই এটিকে 'সাত পর্বতের নগরী' (The City of Seven Hills) বলা হয়।

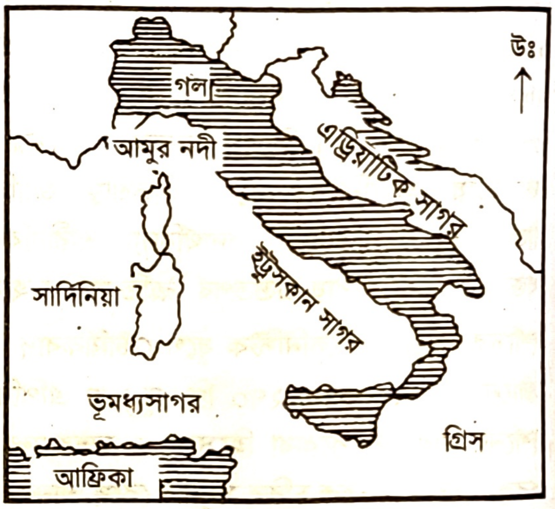

রোমান সভ্যতা

রোমানদের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস: ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীভুক্ত ইট্রুসকানরা টাইবার নদীর উত্তর দিকে অবস্থিত তুসকানি অঞ্চল দখল করে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী গ্রিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে রোমের নেতৃত্বে ইতালীয় জাতিগুলো ইট্রুসকানদের পরাজিত করে রোমান সভ্যতার সূচনা করে। রোমানরা রাজ্য শাসনে নতুন ব্যবস্থা চালু করে। দুইজন অভিজাতের হাতে রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এদের বলা হতো কনসাল (Consul)। তারা এক বছরের জন্য রোমের প্রশাসনিক, বিচারিক, সামরিকসহ সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। তবে কনসালরা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী পরিষদ সিনেটের (Senate) পরামর্শমতো শাসনকাজ চালাতেন। এক পর্যায়ে রোমানরা প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান– এ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমে অভিজাত প্যাট্রিসিয়ান ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিক, কৃষকদের নিয়ে গঠিত প্লেবিয়ানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। প্লেবিয়ানরা বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে তাদের মধ্য থেকে ১০ জন 'ট্রিবিউন' বা 'ম্যাজিস্ট্রেট' সিনেটের সদস্যপদ লাভ করে। এভাবে রোমে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে।

রোমানরা পরবর্তী সময়ে কার্থেজকে (বর্তমান আলজেরিয়ার অধীনে থাকা প্রাচীন রাজ্য) হারিয়ে পিউনিক যুদ্ধে জয়ী হয়। এ যুদ্ধ ২৬৪-১৬৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনটি পর্বে সংঘটিত হয়। রোমান শাসকেরা স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে শুরু হওয়া দাস বিদ্রোহ দমন করেন। ১১০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে মারিয়াস, সুলা, পম্পেই ও জুলিয়াস সিজার রোমের ক্ষমতা দখল করেন। তারা প্রত্যেকেই নিজস্ব পদ্ধতিতে সাম্রাজ্যের নানাবিধ সংকট সমাধানের চেষ্টা করেন। অবশেষে জুলিয়াস সিজারের নেতৃত্বে রোমে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সিজারের মৃত্যুর পর (৪৪ খ্রি.পূ.) রোমান সাম্রাজ্য অক্টোভিয়ান সিজার, মার্ক এন্টনি ও লেপিডাসের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। ইতিহাসে এটি 'ত্রয়ী শাসন' নামে পরিচিত। ক্ষমতা দখল নিয়ে এ তিন শাসকের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এতে জয়ী হন অক্টোভিয়ান সিজার। তিনি 'অগাস্টাস সিজার' উপাধি নিয়ে সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হন। তার সময়ে রোমান সাম্রাজ্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়। অগাস্টাস সিজারের পর রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। রোমের শেষ সম্রাট রোমিউলাস অগাস্টুলাসের সময় জার্মান বর্বর জাতি বারবার রোম আক্রমণ করে। রোমিউলাস এ আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

সভ্যতায় রোমানদের অবদান

ধর্ম: প্রজাতন্ত্রের যুগে রোমান ধর্মে গ্রিক ধর্মের প্রভাবই বেশি সক্রিয় ছিল। জিউসের মতোই রোমেও আকাশ দেবতা ছিলেন 'জুপিটার'। গ্রিক দেবী 'সফেনার' মতো 'মিনার্ভা' ছিলেন রোমের দেবী। গ্রিক প্রেমের দেবী 'আফ্রোদিতি' রোমে এসে হয়েছেন 'ভেনাস', গ্রিক সাগর দেবতা 'পসিডন' রোমে হয়েছেন 'নেপচুন'। সাম্রাজ্যের যুগে প্রচুর মন্দির নির্মাণ করা হয় এবং ঘটা করে ধর্মীয় উৎসব পালন করা হতো। অগাস্টাস সিজারের সময় থেকে ঈশ্বররূপে সম্রাটকে পূজা করার রীতি চালু হয়। রোমে নিজস্ব ধর্ম পালনের পাশাপাশি খ্রিষ্টধর্মের বিস্তারও চলতে থাকে। এই নতুন ধর্মে মানুষের প্রতি সম্মান বেশি দেখানো হয়েছিল। তাই অনেকেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। রাজশক্তি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে নানাভাবে বাধা দিতে থাকে। সমাজজীবনে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। অবশেষে সম্রাট কনস্ট্যান্টটাইন খ্রিষ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দিয়েছিলেন।

দর্শন: দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে রোমের সুখ্যাতি ছিল। মূলত গ্রিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে রোমান দর্শন আত্মপ্রকাশ করে। দার্শনিক লুক্রেটিয়াস ছিলেন ভোগবাদের প্রবক্তা। 'স্টোয়িকবাদ' হচ্ছে রোমের সবচেয়ে জনপ্রিয় দার্শনিক মতবাদ। স্টোয়িকবাদের উন্নয়নে রোমান ধনী সিনেক, দাস এপিকটেটাস এবং রোমান সম্রাট মার্কাস অরলিয়াস বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই দর্শনের মূলকথা হচ্ছে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সত্যবাদী হওয়ার মধ্য দিয়েই সুখলাভ করা।

সাহিত্য: সম্রাট অগাস্টাস সিজারের সময় থেকে রোমান সাহিত্যে ব্যাপক উন্নতি লক্ষ করা যায় । এ যুগের বিখ্যাত গীতিকবি ছিলেন হোরাস। কবি হিসেবে ভার্জিল (Vergil, ৭০-১৯ খ্রি.পূ.) এবং তার লেখা মহাকাব্য 'ইনিড' (Aeneid) ছিল বিশ্ববিখ্যাত। অভিদ ও লিভি এ যুগের বিখ্যাত কবি। লিভি একজন ইতিহাসবিদ হিসেবেও খ্যাতিমান। বিখ্যাত বক্তা সিসেরো গদ্যসাহিত্য রচনায় খ্যাতিমান ছিলেন। এ যুগের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হচ্ছেন প্যাট্রোনিয়াস ও এপুলিয়াস। ব্যঙ্গ কবিতার লেখক জ্যুভেনাল ও ইতিহাসবিদ টেসিটাস ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতিমান।

কলোসিয়াম নাট্যশালা

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য: স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে রোমানদের উন্নতি সাম্রাজ্যের যুগেই হয়েছিল। রোমান স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে নিজস্ব ধরন দেখা যায়। প্রধানত ইট ও কনক্রিটের স্থাপত্য তৈরি হলেও চৌকোনা পাথর ব্যবহার করা হতো। মার্বেল পাথর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো কনক্রিটের কাঠামো, ইমারতে নানারকম অলংকরণ থাকত। রোমানদের অসাধারণ কীর্তি হচ্ছে তাদের বালিসিয়াম বা স্টেডিয়াম নির্মাণ। রোমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য হচ্ছে সম্রাট হার্ডিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির 'পেনথিয়ন'। 'কলোসিয়াম' নামে রোমে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাট্যশালা তৈরি করা হয়েছিল। এর দৈর্ঘ্য ছিল ১৮৯ মিটার এবং প্রস্থ ১৫৬ মিটার। এটির মূল এলাকা ৬ একর (২৪,০০০ মি.)। ৫০ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই মঞ্চ সাধারণত গ্ল্যাডিয়েটরদের প্রতিযোগিতা এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কোনো প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহৃত হতো। এর অবস্থান রোমান ফোরামের ঠিক পশ্চিমে, যার নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ৭০ থেকে ৭২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়; এ সময় সম্রাট ভেসপাসিয়ানের রাজত্ব ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় এই স্থাপনার নির্মাণকাজ শেষ হয়েছিল ৮০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট তিতুসের রাজত্বকালে। এর আদি নাম ছিল ফ্ল্যাভিয়ান নাট্যশালা। রোমান ভাস্কর্যের উদাহরণ হিসেবে প্রচুর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেবমূর্তি, সম্রাট এবং বড় বড় কর্মকর্তাদের মূর্তি নির্মাণ করা হতো।[২০]

বিজ্ঞান: বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রোমানদের অবদান উল্লেখযোগ্য না হলেও 'বড় প্লিনী' (Pliny the Elder) নামে পরিচিত একজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েক খণ্ডে 'বিশ্বকোষ' রচনা করেছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছিলেন বিজ্ঞানী সেলসাস (Celsus)। এছাড়া ইতালিতে বসবাসকারী কয়েকজন হেলেনিস্টিক বিজ্ঞানী রোমের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে খ্যাতিমান হচ্ছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানী গ্যালেন (Gralen, ১২৯-২১৬ খ্রি.পূ.)। এছাড়া বিজ্ঞানী সোরানাস ও রুফাসের খ্যাতির কথাও জানা যায়।

---

[২০] *চিত্রসূত্র: পৃথিবীর ইতিহাস: প্রাচীন যুগ*— ফিওদর করোভকিন, পৃ.২৮২

ক্ষুদ্রশিল্প: রোমের বিশাল সাম্রাজ্যজুড়ে নানা ধরনের শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছিল। এখানে তৈরি হতো অস্ত্রশস্ত্র, ব্রোঞ্জ এবং লোহার দ্রব্যাদি এবং পশমি বস্ত্র ও মাটির পাত্র।

আইন: রোমান সভ্যতার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল আইনের ক্ষেত্রে । প্রথম দিকে রোমান আইনের কোনো লিখিত রূপ ছিল না। ৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জপাতে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলিত হয়। রোমান আইনে মানুষের প্রতি সম-অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আইনের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটে সাম্রাজ্যের যুগে। অগাস্টাস সিজার ও তার উত্তরাধিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় রোমান আইনের তিনটি শাখা বিকাশ লাভ করে। এগুলো হচ্ছে–

১. **বেসামরিক আইন:** এ আইনগুলো পালন করতে নাগরিকেরা বাধ্য ছিল। লিখিত ও অলিখিত দু প্রকার বেসামরিক আইন চালু ছিল। এর মধ্যে সিনেটের বিধানসমূহ, প্রিন্সিপ্টদের নির্দেশসমূহ, প্রিটরদের আদেশসমূহ এবং প্রচলিত রীতিনীতি সাধারণ আইন হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

২. **জনগণের আইন:** জাতি, ধর্ম, বর্ণ সব মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার জন্য এ আইন তৈরি করা হয়েছিল। এ আইনের বলে দাস প্রথাকে স্বীকৃতি দান, ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয়ের নীতি নির্ধারণ, অংশীদারিত্ব ও চুক্তির কার্যক্রম সম্পাদিত হতো।

৩. **প্রাকৃতিক আইন:** স্টোয়িক মতবাদভিত্তিক এই আইনের বক্তব্য হচ্ছে, প্রকৃতিগতভাবেই সব মানুষ সমান এবং জন্মগতভাবে লাভ করা তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করার ক্ষমতা সরকারের নেই। সিসেরো ছিলেন এই আইনের জনক।

রোমান সাম্রাজ্যের শাসন যুগে প্রচলিত আইনগুলোর ভুল সংশোধন করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সম্রাট হার্ডিয়ান। রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর পূর্ব রোমে নতুনভাবে রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সাধারণভাবে এটিকে বলা হতো 'বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য'। এ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট জাস্টিনিয়ান সম্পূর্ণ রোমান আইন সংকলন করেছিলেন।

প্রয়োজনীয়তার তারতম্য বিবেচনা করে একপর্যায়ে রোমান আইনের পুনর্বিন্যাস করা হয়। রোমান আইন দাসদের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ ছিল। এ আইন ছিল নিরপেক্ষ, উদার এবং মানবিক। এখানে বিধবা ও এতিমদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। ঐতিহাসিক মায়ার্স বলেন, আইনের ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্ব রোমান আইনের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল।[২০.১]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কার নামানুসারে রোম নগরীর নামকরণ হয়?
২. 'সাত পর্বতের নগরী' বলা হয় কোনটিকে?
৩. কার নেতৃত্বে রোমে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়?
৪. রোমের সবচেয়ে জনপ্রিয় দার্শনিক মতবাদ কোনটি?
৫. রোমে নির্মিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাট্যশালার নাম কী?
৬. কয়টি ব্রোঞ্জপাতে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলিত হয়?

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. রোমের ত্রয়ী শাসনের শাসকদের নাম ও সময়কাল ছক আকারে লেখো।
২. রোমান আইনের শ্রেণিবিভাগ করে এর ভালো দিকগুলো চিহ্নিত করো।

[২০.১] Myers: *A Short History of Ancient, Mediaval and Modern Times.*

পাঠ ১২

আইয়ামে জাহেলিয়া এবং প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক অবস্থা
Ayam al-Jahiliyyah and Political Conditions of Pre-Islamic Arabia

আইয়ামে জাহেলিয়া

সাধারণভাবে আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে মহানবি (স)-এর ইসলাম প্রচার শুরুর আগের যুগকে বোঝায়। 'আইয়াম' আরবি শব্দ। এর অর্থ যুগ, সময়, কাল প্রভৃতি। আর 'জাহেলিয়া' অর্থ অজ্ঞতা, তমসা, বর্বরতা বা কুসংস্কার। সুতরাং 'আইয়ামে জাহেলিয়া' অর্থ অজ্ঞতার যুগ বা তমসার যুগ (Age of Ignorance)। আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে সেই যুগকে বোঝায় যে সময় আরবে কোনো প্রকার কৃষ্টি, ধর্মগ্রন্থ বা সূক্ষ্ম কোনো ধর্মীয় অনুভূতি বা চেতনা ছিল না। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "সাধারণত জাহেলিয়া শব্দটি দিয়ে অজ্ঞতা বা বর্বরতার যুগকে বোঝায়, কিন্তু বাস্তবে এ শব্দটি এমন একটি সময়কে বোঝায় যখন আরবে কোনো বিধিবিধান ছিল না, কোনো অনুপ্রাণিত ধর্মপ্রচারক ছিল না, ছিল না প্রত্যাদেশ হিসেবে আসা কোনো ধর্মগ্রন্থ।"[২১] ঐতিহাসিক জে ওয়েলহাউসেন জাহেলিয়া যুগের আরবদের সম্পর্কে বলেন, "আরবদের ধর্ম ও রাজনৈতিক জীবন আদিম অবস্থায় ছিল।[২১.১] সুস্থ, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জীবন সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ ছিল। তাদের সমাজ ও ধর্মীয় অবস্থা অধঃপতনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল।"মূলত খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে ইসলামের আবির্ভাবের আগে যখন আরব উপদ্বীপে আইন-কানুন, নীতি-নৈতিকতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বুদ্ধিবৃত্তি, মানবতাবোধ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাসহ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য বিরাজ করত সেই সময়কে 'আইয়ামে জাহেলিয়া' বলা হয়। তবে হিট্টির মতে, আইয়ামে জাহেলিয়ার এ সংজ্ঞা সমগ্র আরব উপদ্বীপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা ঐ সময় দক্ষিণ আরব একটি শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এ সংজ্ঞা শুধু হেজাজ, নজদ ও নুফুদ এলাকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলের বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে পি. কে. হিট্টির প্রদত্ত মতামত গ্রহণ করাই অধিকতর ইতিহাসসম্মত।

পবিত্র কুরআনে কয়েকবার যেমন— সূরা আল-বাকারার ১৪৮, সূরা আল-মায়িদার ৫৫, সূরা আল-আহসাবের ৩৩ এবং আল-ফাতহের ২৬ নম্বর আয়াতে) আইয়ামে জাহেলিয়া সম্পর্কে উল্লেখ আছে। কিন্তু গোটা আরব উপদ্বীপে এর বিস্তৃতি ছিল কি না, সেখানে তা জানা যায় না।

আইয়ামে জাহেলিয়ার সময়কাল: আইয়ামে জাহেলিয়ার সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পর থেকে শুরু করে মহানবি (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তি পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়া বলে। আরব ঐতিহাসিকদের মতে, হযরত ঈসা (আ)-এর তিরোধানের পর থেকে ইসলামের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক আর. এ. নিকলসন ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এক শতাব্দী সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়ার সময়সীমা বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি তার এ অভিমতকে সমর্থন করে বলেন, "জাহেলিয়া যুগ একদিক থেকে আদমের (আ) সৃষ্টি থেকে শুরু করে মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কে বোঝায়। তবে বিশেষ করে এখানে এটি ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত আগের (৫১০-৬১০ খ্রি.) একশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"[২২] নিকলসন ও হিট্টির এ মতটিই আইয়ামে জাহেলিয়ার সময়সীমা সম্পর্কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত আগের সময়কেই যে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা যায় পবিত্র কুরআনেও তার ইঙ্গিত মেলে। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে, "তোমরা একটি ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তসীমায় অবস্থান করছিলে।" (আয়াত ১০৩)

---

[২১] P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.87

[২১.১] "The religion of the Arabs as well as their political life was on throughly primitive level." – Wellhausen

[২২] P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.44

সুতরাং ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কুরআনের প্রমাণ সাপেক্ষে আইয়ামে জাহেলিয়াকে একটি বর্বর, বিশৃঙ্খল, নীতি নৈতিকতাহীন সময় হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আর হযরত মুহাম্মদ (স) এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটে এবং আরবে একটি সভ্য, সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ সমাজের সূচনা হয়।

প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক অবস্থা

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও নৈরাশ্যজনক ছিল। উত্তরে বাইজান্টাইন এবং দক্ষিণে পারসিক সাসানীয় শাসিত কিছু অঞ্চল ছাড়া সমগ্র আরব উপদ্বীপ ছিল স্বাধীন। তবে সেখানে কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ ছিল না। শেখ শাসিত সমাজব্যবস্থায় আইনের শাসনের তীব্র অভাব থাকায় গোত্রীয় বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করেছিল। শহরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা ভালো থাকলেও মরুবাসী বেদুইনদের রাজনৈতিক জীবন মোটেই শান্তিপূর্ণ ছিল না।

গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা: প্রাক-ইসলামি আরবে কেন্দ্রীয় কোনো শাসনব্যবস্থা ছিল না। তাই আরবরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু করেছিল। এসব গোত্রের মধ্যে ছিল বনু বকর, বনু তাঘলিব প্রভৃতি। আরবের ভূ-প্রকৃতির তারতম্যের কারণে এর অধিবাসীদের প্রধানত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা: শহরের স্থায়ী বাসিন্দা এবং মরুবাসী যাযাবর বেদুইন। শহরবাসী আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা কিছুটা ভালো থাকলেও মরুবাসী আরবদের ক্ষেত্রে তা ছিল অরাজকতাপূর্ণ। তবে আরবরা নিজ নিজ গোত্রের নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল এবং গোত্রীয় নিয়মেই তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। তাদের সমাজজীবনেও গোত্র ছিল বিভিন্ন বিপদাপদে রক্ষাকবচ।

গোত্রপ্রীতি: গোত্রপ্রীতি ছিল বেদুইন আরবদের মূল প্রেরণা। এই প্রেরণার মূল কথা হলো গোত্রের অন্য সদস্যদের প্রতি সীমাহীন ও নিঃস্বার্থ আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ। পি. কে. হিট্টির মতে, "এ সময় সদস্যদের ওপর গোত্রের দাবি এতই প্রবল ছিল যে, গোত্রের প্রয়োজনে কোনো স্বামী তার স্ত্রীকেও ত্যাগ করতে পারত।" গোত্রের প্রতি আরবদের এ অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আনুগত্যকে 'আসাবিয়া' বা গোত্রীয় সংহতি বলা হয়।

গোত্রীয় সংঘাত: প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে পানির নহর, গবাদি পশু, তৃণভূমি, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি বিষয়সহ কিছু তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সংঘর্ষ দীর্ঘদিন ধরে চলত। একটি উটকে প্রহার করার ঘটনা নিয়ে বনু বকর ও বনু তাঘলিবের মধ্যে সংঘটিত 'বাসুসের যুদ্ধ' দীর্ঘ চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এসব গোত্রীয় কলহ 'আইয়াম আল-আরব' বা 'আরবদের দিন' নামে পরিচিত। এ যুগে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে বুয়াসের যুদ্ধ, হারবুল ফিজার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবনের মতে, 'অজ্ঞতার যুগে আরবে প্রায় ১৭,০০টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।'

গোত্রীয় জোট: মক্কার নেতৃত্বে প্রাক-ইসলামি আরবে গোত্রীয় জোট গড়ে উঠেছিল। আরব গোত্রপতিদের সাথে মক্কার ব্যবসায়ীদের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল যাকে 'ইলাফ' বলে। আরব ঐতিহাসিক বালাজুরির মতে, অনুরূপভাবে আরবের পার্শ্ববর্তী সিরিয়া, ইয়েমেন, আম্মান প্রভৃতি অঞ্চলের রাজন্যবর্গের সাথে বিভিন্ন শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় সত্যিকার অর্থেই আরবে একটি গোত্রীয় জোট বা কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শেখ বা গোত্রপ্রধান: প্রাক-ইসলামি আরবের প্রত্যেক গোত্রে একজন দলপতি থাকত। তাকে 'শেখ' বলা হতো। বয়স, বীরত্ব, বিচক্ষণতা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে শেখ মনোনয়ন করা হতো। তার কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদকাল ছিল না। নিজের কর্মদক্ষতা এবং গোত্রের নির্বাচকমণ্ডলীর সন্তুষ্টির ওপরই শেখের কর্মকাল নির্ভর করত। তবে শেখের প্রতি আনুগত্য ছিল সর্বজনীন। যুদ্ধ, সন্ধি, ব্যবসায়িক যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শেখের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। অবশ্য এসব কাজ সাধারণত তিনি একক সিদ্ধান্তে করতেন না। তিনি গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠদের নিয়ে গঠিত পরামর্শসভার সাথে আলোচনা করে তা সম্পাদন করতেন। শেখ যতদিন পরামর্শসভা বা গোত্রের বিশিষ্ট লোকদের সমর্থন পেতেন, ততদিন তিনি উক্ত পদে বহাল থাকতেন।

আল মালা বা মন্ত্রণাসভা: প্রাক-ইসলামি আরবে 'আল মালা' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন বা মন্ত্রণাসভা ছিল। এ পরিষদ মক্কার বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করত। এর উদ্দেশ্য ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, গোত্রীয় ভারসাম্য রক্ষা করা এবং মৈত্রী ও সদ্ভাব তৈরি করা। তবে এ পরিষদের কোনো নির্বাহী ক্ষমতা ছিল না। এটি কেবল পরামর্শ দিতে পারত। এর বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল—

ক. রিফাদাহ: তীর্থযাত্রীদের জন্য রসদ সরবরাহ;
খ. সিকায়াহ: তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনীয় পানীয় সরবরাহ;
গ. হিজাবা: কাবাগৃহ ঢেকে রাখার ব্যবস্থা;
ঘ. লিওয়া: যুদ্ধের সময় পতাকা বহন।

যে কক্ষে এ পরিষদের সভা বসত সেটি 'দারুন নাদওয়া' নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এটিকে কুরাইশদের সংসদ ভবন বলা যায়। গুরুত্বপূর্ণ সব সমস্যার সমাধান এখানে করা হতো। অবশ্য মক্কা নগরী ও কাবাগৃহ বিষয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য সবাই কাবাগৃহের প্রাজ্ঞণে একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন।

মক্কার পৌর সমিতি: মক্কার নাগরিক এবং তীর্থযাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য মক্কায় একটি পৌর সমিতি গঠন করা হয়েছিল। তীর্থযাত্রীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, যেকোনো গোলযোগ নিষ্পত্তি, তীর্থস্থানসমূহের পরিচ্ছন্নতা এবং তীর্থযাত্রীদের চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধা দেখাশোনার দায়িত্ব এ পৌর সমিতির ওপরই ন্যস্ত ছিল।

বিচারব্যবস্থা: সরকারকাঠামো বা শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে আরবরা পুরোপুরি অজ্ঞ থাকায় তাদের মধ্যে কোনো সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা ছিল না। আরবের সর্বত্র 'জোর যার মুল্লুক তার' (Might is Right) নীতি প্রচলিত ছিল। রক্তের বদলে রক্ত, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে Blood Money বা 'আল-দিয়াত' এর বিনিময়ে হত্যাকারী মুক্তিলাভ করতে পারত। কোনো হত্যাকারী গোত্র ত্যাগ করে পালিয়ে গেলে তাকে সমাজচ্যুত বা 'আল-তারিদ' ঘোষণা করা হতো। সমাজচ্যুত ব্যক্তি কোথাও স্থান পেত না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'আইয়ামে জাহেলিয়া' শব্দের অর্থ কী? */ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো. ২০১৯/*
২. প্রাক-ইসলামি আরবে কোন শাসনব্যবস্থা চালু ছিল?
৩. চল্লিশ বছর স্থায়ী 'বাসুসের যুদ্ধ' কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?
৪. আরব গোত্রপতিদের সাথে মক্কার ব্যবসায়ীদের স্বাক্ষরিত চুক্তিকে কী বলা হয়?
৫. প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক সংগঠনের নাম কী ছিল?
৬. কোনটিকে কুরাইশদের সংসদ ভবন বলা হতো?

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করো।
২. প্রাক-ইসলামি আরবের মন্ত্রণাসভার দপ্তরগুলোর নাম এবং কাজ ছক আকারে লেখো।

পাঠ ১৩

প্রাক-ইসলামি আরবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা
Economic and Social Conditions of Pre-Islamic Arabia

অর্থনৈতিক অবস্থা

মরুময় ও অনুর্বর আরব ছিল কৃষি কাজের অনুপযোগী। ফলে সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না। প্রাক-ইসলামি আরবের অধিবাসীরা যাযাবর আরব ও শহুরে আরব এ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। উভয়ের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল আলাদা। শহরবাসী আরবদের অর্থনৈতিক অবস্থা যাযাবরদের তুলনায় ভালো ছিল। তারা বিভিন্ন উর্বর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে স্থায়ীভাবে বসবাস করত। শহরবাসীদের জীবিকার অন্যতম উৎস ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। প্রাক-ইসলামি আরবদের জীবিকার উপায়গুলো নিচে বর্ণনা করা হলো—

পশুপালন: প্রাক-ইসলামি আরবে পশুপালন ছিল মরুবাসী বেদুইন সম্প্রদায়ের জীবিকার প্রধান উৎস। মূলত পশুর জন্য তৃণভূমি ও পানীয় জলের সন্ধানে তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিচরণ করত। শহরবাসী আরবরাও পশুপালনের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত।

লুটতরাজ: এ সময় পশুপালনের সাথে সাথে লুটতরাজও আরববাসীর একটি পেশা হিসেবে গণ্য হতো। আরব গোত্রগুলো প্রায়ই বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বণিকগোষ্ঠীকে আক্রমণ করে তাদের মালামাল লুট করত। তাদের মতে, এ দস্যুবৃত্তি ছিল ভদ্রলোকের জীবিকা।

সুদ ব্যবসা: আরবের বিভিন্ন শহরে সুদের বিনিময়ে অর্থ লেনদেনের প্রচলন ছিল। সুদ ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইহুদিদের প্রাধান্য ছিল। সময়মতো ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেত এবং সুদের দায়ে ঋণ গ্রহণকারীর পুত্র, কন্যা ও স্ত্রী সুদখোর মহাজনদের দাস-দাসীতে পরিণত হতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য: শহরবাসী আরবরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা সিরিয়া, মিসর, পারস্য ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন নগর-বন্দরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করত। ফলে বাণিজ্যের সাথে জড়িত শ্রেণির অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল। এ সময় সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে মক্কা ও মদিনা নগরীর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মদিনার সাথে ইয়েমেন ও সিরিয়ার বাণিজ্যপথের সংযুক্তি থাকায় এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মক্কার তুলনায় মদিনার প্রাকৃতিক পরিবেশ বেশ ভালো ছিল। এখানে কিছু লোক কৃষিকাজের সাথেও জড়িত ছিল। তায়েফেও কৃষিপণ্য উৎপাদন হতো বলে জানা যায়।

শিল্প: জাহেলিয়া যুগে একশ্রেণির লোক দেব-দেবীর মূর্তি তৈরির পেশায় নিয়োজিত ছিল। তারা মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণে দক্ষ ছিল। পৌত্তলিক (মূর্তিপূজারি) সমাজে তারা বেশ মর্যাদা লাভ করত। মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণশিল্পের সাথে এ সময় যুদ্ধাস্ত্র তৈরি ও নিত্যব্যবহৃত জিনিসের চাহিদা পূরণের জন্য কিছু ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ হয়েছিল। কাঠ ও পাথর খোদাই করে তারা মূর্তি, অস্ত্র, মৃৎপাত্র ইত্যাদি তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করেছিল।

সামাজিক অবস্থা

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের সামাজিক ও নৈতিক জীবন ছিল কলুষিত ও হতাশাব্যঞ্জক। তখনকার সামাজিক অবস্থার চরম অধপতন হয়েছিল। আরব সমাজব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিক হলো—

শ্রেণিবিভাজন: প্রাক-ইসলামি আরবের জনগোষ্ঠী মূলত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, যথা: ১. যাযাবর বেদুইন, ২. শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। মক্কা, মদিনা, তায়েফ প্রভৃতি শহরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শহরে স্থায়ী বাসিন্দারা উন্নত জীবনযাপন করলেও বেদুইন আরবরা সভ্য জীবনের দেখা পায়নি।

কৌলীন্য প্রথা: বংশ, বীরত্ব শৌর্যবীর্য নিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব বা গর্ব অহংকার করার রীতিই কৌলীন্য প্রথা নামে পরিচিত। আরবদের মধ্যে বংশগৌরব, বীরত্ব, শৌর্যবীর্য নিয়ে সর্বদাই দ্বন্দ্ব ও কলহ লেগে থাকত। এ সময়কার কৌলীন্য প্রথা থেকেই ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিমারীয় ও মুদারীয়দের মধ্যে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল।

অন্যায় ও অবিচার: নানা পাপাচার, কুসংস্কার, অন্যায়, অবিচার প্রাক-ইসলামি আরব সমাজকে কলুষিত করেছিল। মদপান, জুয়াখেলা, সুদ ও নারীসজ্ঞা ছিল তখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ঐতিহাসিক খোদা বকশ বলেন, "যুদ্ধ, নারী ও সুরার প্রতি আরবদের তীব্র আসক্তি ছিল এবং মহানবি (স) সমগ্র আরব দেশকে মূর্খতা, বর্বরতা ও মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত অবস্থায় পেয়েছিলেন।"[২৩]

নারীর অবস্থা: প্রাক-ইসলামি আরবে নারীর কোনো সামাজিক অবস্থান ছিল না। এস এম ইমামুদ্দিন বলেন, "আরব সমাজে নারীদের কোনো সুদৃঢ় অবস্থান ছিল না। তাদের জীবন এবং সম্মান ছিল খুবই নড়বড়ে।"[২৪] এ সময় নারীদেরকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। একাধিক স্ত্রী থাকার পরও পুরুষেরা দাসীদের উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করত। বিমাতা এবং বোনকেও বিয়ে করার প্রথা ছিল। নারীরা পণ্যদ্রব্যের মতো হাটে-বাজারে বিক্রি হতো। মৃত স্বামী, পিতা বা নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তি থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। তবে অভিজাত পরিবারে নারীর অবস্থান মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল বলে মনে হয়। আবু জেহেলের মা এবং বিবি খাদিজা দুজনই সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন।

কন্যাসন্তানদের হত্যা: প্রাক-ইসলামি আরবে কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়া ছিল অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। অনেক পিতা লজ্জার ভয়ে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। অনেকে দারিদ্র্যের ভয়ে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। বনু কুরাইশ ও বনু তামিম গোত্রের লোকেরা কন্যাসন্তানকে হত্যা করে গর্ববোধ করত।

দাস-দাসীদের করুণ অবস্থা: আরব সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। পণ্যদ্রব্যের মতো হাটে-বাজারে দাস-দাসী বিক্রি হতো। তাদের কোনো স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। দাস-দাসীদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো। দাসীদের উপপত্নী হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। তাদের জীবনমরণ, সুখ-দুঃখ প্রভুর মর্জির ওপর নির্ভর করত। প্রভুর অনুমতি ছাড়া তাদের বিয়ে করারও অধিকার ছিল না। দাস-দাসীর সন্তানের ওপর প্রভুর মালিকানা স্বীকৃত ছিল।

নৈতিক অবক্ষয়: ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরব ছিল নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ে পরিপূর্ণ। পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, আভিজাত্যের দম্ভ, নারীহরণ, চুরি, ধর্ষণ, মদপান, খুন ইত্যাদি গর্হিত কাজ সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ সময় নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করতে পারত। এস এম ইমামুদ্দিন বলেন, "এমনকি বিবাহিত মহিলারাও তাদের অতিথি এমনকি আগন্তুকের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পারত।"[২৫]

কুসংস্কার: প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে কুসংস্কার এত বেশি ছিল যে, তারা কোনো কাজ শুরু করার আগে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করত। যুদ্ধে যাওয়ার আগে তারা বীর পূর্বপুরুষদের পূজা করাসহ নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল।

---

[২৩] War, women and wine were the three absorbing passions of the Arabs. Arabia, as Muhammad found it, was steeped in ignorance, barbarism and fetishism of the worst type.– Ref: Khuda Bakhsh, *The Arab Civilization,* p.121

[২৪] Women had no distinct position in 'Arab Society'. Their lives and honour were of little consequence. –Ref: S.M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims,* Vol-1, p.XXVII

[২৫] Ref: S.M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims,* Vol-1, p.XXVII

কুসীদ প্রথা: প্রাক-ইসলামি আরবে ইহুদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কুসীদ প্রথা বা সুদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ প্রথা এতই মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ঋণ গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি সময়মতো অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে মহাজন ঋণ গ্রহণকারীর স্ত্রী অথবা পুত্র-কন্যাদের জোরপূর্বক দাসে পরিণত করতে পারত।

নৈতিক গুণাবলি: প্রাক-ইসলামি আরবে নানা বিশৃঙ্খলা ও অনৈতিক কার্যক্রম প্রচলিত থাকলেও আরবদের মধ্যে কিছু নৈতিক গুণাবলি বিদ্যমান ছিল। তাদের চরিত্রে অতিথিপরায়ণতা, তেজস্বিতা, স্বাধীনতাপ্রীতি, উদারতা, নিঃসংকোচবোধ, সাহসিকতা প্রভৃতি মহৎগুণের সমন্বয় দেখা যায়। আরবদের মতো অতিথিপরায়ণ জাতি পৃথিবীতে দুর্লভ। অতিথি চরম শত্রু হলেও তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করত না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাক-ইসলামি আরবের অধিবাসীরা কয় শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল?
২. মরুবাসী বেদুইনদের জীবিকার প্রধান উৎস কী ছিল?
৩. শহরবাসী আরবদের জীবিকার অন্যতম উৎস কী ছিল?
৪. প্রাক-ইসলামি আরবে সুদ ব্যবসায়ীদের মধ্যে কাদের প্রাধান্য ছিল?
৫. প্রাক-ইসলামি আরবে কারা পণ্যদ্রব্যের মতো হাটে-বাজারে বিক্রি হতো?
৬. আরবরা সুরা, নারী ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকত— এ কথা কে বলেছেন?

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

প্রাক-ইসলামি আরবের অর্থনৈতিক অবস্থার নানা দিক নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

প্রাক-ইসলামি আরবে নারীর অবস্থা এবং বর্তমান নারীর অবস্থান নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করো।

ঘ. বাড়ির কাজ

'এক মাস বয়সী কন্যা শিশুকে ফেলে গেলেন মা' প্রথম আলো, ২০ অক্টোবর পত্রিকায় শেষ পাতার শিরোনাম। সংবাদের গভীরে গিয়ে জানা যায়, পঞ্চগড় সদর উপজেলায় অভাবের তাড়নায় কন্যা শিশুটিকে অবস্থাপন্ন একটি বাড়ির দরজায় ফেলে রেখে যায় মা। পরে স্থানীয়রা শিশুটিকে উদ্ধার করে থানায় খবর দেয়। ঘটনার পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমাদের সমাজে কন্যা শিশুদেরকে এখনো বোঝা মনে করা হয়।

১. উদ্দীপকে প্রাক-ইসলামি আরবের কোন সামাজিক দিকটি ফুটে উঠেছে? চিহ্নিত করো।
২. উক্ত দিক ছাড়াও প্রাক-ইসলামি আরবের অন্য সামাজিক অবস্থা ছিল কলুষিত— প্রমাণ করো।

পাঠ ১৪

প্রাক-ইসলামি আরবের ধর্মীয় অবস্থা
Religious Conditions of Pre-Islamic Arabia

ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়: প্রাক-ইসলামি আরবদের ধর্মীয় অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। অধিকাংশ লোকই জড়পূজা, সৌরপূজা এবং নানা ধরনের ধর্মীয় কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুরের মতে, 'তাদের ধর্ম ছিল পৌত্তলিকতা ও বিশ্বাস ছিল আল্লাহর পরিবর্তে অদৃশ্য শক্তির কুহেলিকাপূর্ণ ভয়-ভীতিতে।' ইসলামপূর্ব আরবে প্রধানত পাঁচ প্রকার ধর্মাবলম্বী লোক বাস করত। যথা: ১. জড়বাদী বা প্রকৃতিপূজক, ২. মূর্তি উপাসক বা পৌত্তলিক, ৩. ইহুদি, ৪. খ্রিষ্টান ও ৫. হানিফ সম্প্রদায়।

১. **জড়বাদী বা প্রকৃতিপূজক:** অজ্ঞতার কারণে আরবরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় করত। তাই তারা প্রকৃতিকে খুশি করার জন্য বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির পূজা করত। কৃষিকাজে ও মরুভূমিতে বিচরণের অনুকূল পরিবেশ লাভের আশায় তারা বৃক্ষ, গুহা, কুয়া প্রভৃতির আরাধনায় লিপ্ত ছিল। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, "আরব জাতির অধিকাংশ গোত্র, বিশেষ করে মোজার বংশের অন্তর্ভুক্ত গোত্রগুলো অত্যন্ত নিম্নস্তরের জড়বস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল। ইতর প্রাণী, অশ্ব, উট, খেজুর গাছ, পর্বত, পাথর প্রভৃতি তাদের প্রধান উপাস্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[২৬]

জেনে রাখো

আল-লাত (اللات): হিশাম ইবনে আল-কালবি লিখিত কিতাব আল-আসনাম (মূর্তি সম্পর্কিত বই) থেকে জানা যায়, ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরবরা বিশ্বাস করত লাত কাবা শরিফে বাস করেন এবং সেখানেও তার একটি মূর্তি স্থাপিত ছিল।

আল-উজ্জা (العزى 'সর্বশক্তিময়ী'): আরবের উর্বরতার দেবী। যুদ্ধে রক্ষা ও জয়ের জন্য তার কাছে প্রার্থনা করা হতো। হুবাল দেবতার মতো উজ্জাকেও সমৃদ্ধি ও কল্যাণের আশায় কুরাইশরা পূজা করত।

মানাত (مناة): ভাগ্যের দেবী। মানাতের একটি মূর্তি মদিনা ও মক্কার মধ্যবর্তী কাদাদের আল-মুশাল্লালের কাছে সমুদ্রতীরে নির্মিত হয়েছিল। মক্কা ও মদিনাসহ উক্ত অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত এলাকার সবাই মানাতকে শ্রদ্ধা জানাত এবং তার জন্য নিজেদের শিশুসন্তান বলি দিত।

২. **মূর্তি উপাসক বা পৌত্তলিক:** পৌত্তলিক আরবদের প্রত্যেক গোত্র এবং অঞ্চলের নিজস্ব দেব-দেবী ছিল। তায়েফে দেবী লাত, নাখালায় দেবী উজ্জা এবং মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থান কুদায়িদে ভাগ্যদেবী মানাতের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আরববাসী এ তিন দেবীকে আল্লাহর কন্যা বলে মনে করত। প্রত্যেক গোত্র কাবাঘরে নিজস্ব দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করাকে গৌরবজনক ভাবত। এভাবে জাহেলিয়া যুগে পবিত্র কাবাঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত হয়। এগুলোর মধ্যে মনুষ্যাকৃতির মূর্তি 'হুবাল' ছিল প্রধান। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "মন্দিরসমূহে বিশেষ মূর্তি ছাড়াও প্রত্যেক পরিবারের গৃহদেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এসব গৃহদেবতার প্রতি অনুষ্ঠানাদি খুব কঠোরভাবে পালন করা হতো।"[২৭]

৩. **ইহুদি:** ইহুদিরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে জড়বাদী ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করেছিল। তারা হযরত ইবরাহিম ও একটি ভেড়ার মূর্তির পূজা করত বলে জানা যায়। তবে ইহুদিরা জেহোবাকে বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক বলে বিশ্বাস করত।

৪. **খ্রিষ্টান:** হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারী খ্রিষ্টানরা এক খোদার পরিবর্তে ত্রিত্ববাদ বা Trinity-তে বিশ্বাস করত। তাদের মতে, মরিয়ম আল্লাহর স্ত্রী এবং ঈসা (আ) আল্লাহর পুত্র। তৎকালীন আরবের রাবিয়া ও গাসসান গোত্রদ্বয় খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী ছিল।

৫. **হানিফ সম্প্রদায়:** জাহেলিয়া যুগেও আরবের অল্প কিছু লোক আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এরা হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর প্রচারিত একেশ্বরবাদের অনুসারী ছিলেন। তারা স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয় জীবনযাপন করতেন এবং কোনো প্রকার পূজায় অংশ নিতেন না। এরা 'হানিফ' নামে পরিচিত ছিল। বিবি খাদিজার চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফেল, উমাইয়া বিন আবি সালাত, জায়েদ প্রমুখ এ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

---

[২৬] *A Short History of the Saracens*, p.56

[২৭] *Ibid*, p.57

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

হজ পালন: প্রাক-ইসলামি আরবে হজ পালন একটি পুণ্যের কাজ বলে মনে করা হতো। আরববাসী কাবাঘর তাওয়াফের মাধ্যমে হজ করত। তবে এ কাজে বেশকিছু ত্রুটি ছিল। তাদের অধিকাংশই বেহায়াপনায় মগ্ন থাকত এবং নারী-পুরুষ উভয়েই উলঙ্গ হয়ে কাবার চারদিকে তাওয়াফ করত।

বিভিন্ন বিশ্বাস: জাহেলিয়া যুগে পরকাল সম্পর্কে আরবদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। কোনো কোনো গোত্রে মৃতব্যক্তির কবরের ওপর উট বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, জবাই করা পশু পরকালে মৃতব্যক্তির বাহন হিসেবে কাজ করবে। আরববাসীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভাগ্য গণনায় বিশ্বাসী ছিল। তারা মনে করত, ভাগ্যের কারণে মানবজীবনের জয়-পরাজয় সূচিত হয়। তারা দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির আশায় উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক দেবতাদের জন্য রেখে দিত।

কাবাগৃহ: মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার আগে কাবাগৃহের কারণে আরব উপদ্বীপ সমকালীন বিশ্বে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। এটি কখন নির্মিত হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না। প্রাচীন বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, হযরত আদম (আ) এটি নির্মাণ করেছিলেন। নবি হযরত নূহ (আ)-এর সময় সৃষ্ট মহাপ্লাবনের সময় এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী সময়ে হযরত ইবরাহিম (আ) ও হযরত ইসমাইল (আ) এটি পুনর্নির্মাণ করেন। পি. কে. হিট্টির বর্ণনা মতে, "নির্মাণের প্রাথমিককালে এ ঘরটির মাথায় কোনো ছাদ ছিল না এবং এটি একটি কালো উল্কাপিণ্ডের আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হতো। আর এই কালো উল্কাপিণ্ডকে ভক্তিযোগ্য বস্তুপিণ্ড হিসেবে শ্রদ্ধা করা হতো।"[২৮] ঐতিহাসিক আল-ইয়াকুবীর বর্ণনা মতে, "প্রাক-ইসলামি যুগে লোহিত সাগরের উপকূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি বাইজান্টাইন জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে পরবর্তীকালে একজন আবিসিনীয় এটি পুনর্নির্মাণ করেন। এটির চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অঞ্চলকে পবিত্র অঞ্চল (হারাম) বলে গণ্য করা হতো। এখানে বার্ষিক তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হতো এবং বিশেষভাবে কোরবানি দেওয়া হতো।"[২৯] হযরত ইসমাইল (আ)-এর কাবাগৃহ সংস্কার করার পর পরবর্তী কয়েক বছর এটি ধর্মীয় গৃহ হিসেবে সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। পরবর্তী সময়ে বনু জুরহাম ও বনু খুজাআহ গোত্রের মাধ্যমে এ গৃহে মূর্তিপূজা শুরু হয়। মূর্তিপূজাকে কেন্দ্র করে কাবাগৃহ তথা মক্কা নগরী বিখ্যাত বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রাক-ইসলামি যুগে কাবাগৃহে ৩৬০টি মূর্তির পূজা করা হতো এবং কাবার কর্তৃত্ব পাওয়ার জন্য বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হতো। এ ধারা মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত লাভের আগ পর্যন্ত চালু ছিল। মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলে কাবাগৃহে রক্ষিত মূর্তিগুলো ধ্বংস করা হয় এবং এটিকে ইসলামি সভ্যতার কিবলাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জাহেলিয়া যুগে মূর্তি পূজারিদের কী বলা হতো?
২. জাহেলিয়া যুগে পবিত্র কাবাঘরে কতটি মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল?
৩. দেবী লাত, মানাত এবং উজ্জাকে কী বলা হতো?
৪. জাহেলিয়া যুগে মনুষ্যাকৃতির মূর্তিটির নাম কী ছিল ?
৫. জাহেলিয়া যুগে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করত কারা?
৬. প্রাক-ইসলামি আরবে একেশ্বরবাদীরা কী নামে পরিচিত ছিল? *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

প্রাক-ইসলামি আরবে যেসব ধর্ম প্রচলিত ছিল তার একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[২৮] Ref: *History of the Arabs*, p.100.

[২৯] *সূত্র: তারিখ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭-১৮

পাঠ ১৫

প্রাক-ইসলামি আরবের সাংস্কৃতিক অবস্থা
Cultural Conditions of Pre-Islamic Arabia

প্রাক-ইসলামি আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা বিশৃঙ্খল হলেও তাদের সাংস্কৃতিক অবস্থান ছিল গৌরবময়। তারা অধিকাংশ নিরক্ষর ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অসাধারণ প্রতিভা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি তৎকালীন আরববিশ্বের বাইরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের পদচারণার নানা দিক নিচে উপস্থাপন করা হলো—

সাহিত্যচর্চা: প্রাক-ইসলামি যুগে আরবরা সাহিত্যচর্চায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। সাহিত্য চর্চা বিশেষ করে কাব্যচর্চার প্রতি আরবদের ছিল প্রবল আকর্ষণ। কবিতার মাধ্যমে তারা বংশ গৌরব, যুদ্ধের বিজয় কাহিনি ও নিজেদের জীবনালেখ্য লিপিবদ্ধ করে রাখত। এভাবে তারা সমৃদ্ধ সাহিত্যের অধিকারী হয়েছিল। সাহিত্য ও কাব্যচর্চার মাধ্যমে তারা নিজ দেশ ও জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে। এ সময় অনেক কাসিদা বা গীতিকাব্য (ode) রচিত হয়। নিজ বংশের গৌরবগাথা ও বিভিন্ন যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে এসব গীতিকাব্য রচিত হতো। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, "পৃথিবীতে অন্য কোনো জাতি আরবদের মতো সাহিত্যচর্চায় এত বেশি স্বতঃস্ফূর্ত একাগ্রতা প্রকাশ করেনি।" কাসিদা ছাড়াও 'সাজা' বা অন্তঃমিলযুক্ত পদ্যের কথা জানা যায়। অবশ্য কাসিদাই ছিল বেশি প্রচলিত কাব্যরীতি। তখনকার আরবদের কাব্যচর্চা সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ আর. এ. নিকলসনের (Reynold Alleyne Nicholson) মন্তব্য হলো, "সে যুগে কবিতা শুধু কিছু সংস্কৃতমনা লোকের বিলাসিতার বস্তুই ছিল না, বরং এটি ছিল তাদের সাহিত্য প্রতিভা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম।" 'দিওয়ান আল-হামাসা', 'আল-মুফাজ্জালিয়াত', 'কিতাব আল-আগানি' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে রচিত গীতিকবিতাগুলো সংকলিত আছে।

কবিতাচর্চা ও কবিতা প্রতিযোগিতা: প্রাক-ইসলামি যুগে কাব্যচর্চার প্রতি আরবদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই কবিতাচর্চা করত। তাদের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল নারী, প্রেম, বংশগৌরব, কুলজি, বীরত্বপূর্ণ কাহিনি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলি। অশ্লীল বিষয়েও কবিতা রচিত হতো। তবে বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, আরবদের কবিতায় তাদের উন্নত ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া জানা যায় তৎকালীন আরবদের দৈনন্দিন জীবন, আতিথেয়তা, বীরত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে। এজন্য প্রাক-ইসলামি যুগে রচিত কবিতাগুলোকে 'The Public Register of the Arabs' বলে অভিহিত করা হয়। পি. কে. হিট্টি বলেন, 'কাব্যপ্রীতিই ছিল বেদুইনদের সাংস্কৃতিক সম্পদ'। এ যুগের খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে ইমরুল কায়েস, তারাফা, আমর ইবনে কুলসুম, লাবিদ ইবনে রাবিয়া, আনতারা ইবনে শাদ্দাদ, হারিস ইবনে হিল্লিজা ও যুহায়ের প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে কাব্যপ্রতিভা ও সৃজনশীলতার দিক থেকে ইমরুল কায়েস ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

জেনে রাখো

ইমরুল কায়েস ষষ্ঠ শতকের আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তার পুরো নাম ইমরুল কায়েস বিন হুযর আল-কিন্দি। আরবের নজদ এলাকায় ষষ্ঠ শতকের শুরুর দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবি ভাষায় লিখিত বিখ্যাত কাব্য সংকলন সাবায়ে 'মুয়াল্লাকাত' এর শ্রেষ্ঠ কবি।

গদ্য রচনা ও প্রবাদ বাক্য: তৎকালীন আরব সমাজে গীতিকাব্যের তুলনায় গদ্য রচনা ও প্রবাদবাক্য অপ্রতুল ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত আল-হাকিমের রচনায় কিছু আরবি প্রবাদবাক্য সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছে। সে সময়ে জনপ্রিয় প্রবাদবাক্য ছিল— 'মানুষের সৌন্দর্য তার জিহ্বার বাচনশীলতার মধ্যে নিহিত।' 'বুদ্ধিমত্তা তিনটি বস্তুর ওপর রয়েছে- ফরাসিদের মগজে, চীনাদের হাতে এবং আরবদের জিহ্বায়।'

উকাজ মেলা ও সাবায়ে মুয়াল্লাকাত: প্রাক-ইসলামি আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনে উকাজ মেলার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। প্রতিবছর হজের মৌসুমে মক্কার উপকণ্ঠে অবস্থিত উকাজে এ মেলা বসত। উকাজ মেলায় স্থানীয় বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের পাশাপাশি অনেক বিদেশি পণ্য প্রদর্শিত হতো। এ মেলায় নাচগান, নানা রকম খেলাধুলা এবং ঘোড়দৌড় ও উষ্ট্রদৌড়

প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হতো। তবে মেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কাব্য প্রতিযোগিতা। কবিরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন। বিচারকদের রায়ে শ্রেষ্ঠ কবিকে পুরস্কার দেওয়া হতো। প্রতিযোগিতায় সেরা হিসেবে বিবেচিত সাতটি কবিতা সোনালি হরফে লিখে কাবাঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এরূপ সাতটি কবিতা একত্রে 'সাবায়ে মুয়াল্লাকাত' নামে পরিচিত। এগুলো প্রাচীন আরবি সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। উকাজ মেলায় আরবের গোত্রগুলো পরস্পরের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পেত। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি উকাজ মেলাকে 'Academic Franchise' বলে অভিহিত করেন। তার মতে, "ইসলামপূর্ব দিনগুলোতে উকাজ মেলা আরবে এক ধরনের মতবিনিময়ের শিক্ষায়তন বলে গণ্য হতো।"[৩০]

আরবি ভাষা: আরবি ভাষা জাহেলিয়া যুগেও খুব সমৃদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, 'ইসলামের জয় অনেকাংশে একটি ভাষার জয়; আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে একটি কেতাবেরই জয়। তিনি আরও বলেন, মধ্যযুগে বহু শতাব্দীকাল ধরে এটি (আরবি ভাষা) সভ্যজগতের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং উন্নতির একমাত্র মাধ্যম ছিল। আরবি ভাষা যে কতটা সমৃদ্ধ ছিল আল-কুরআন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সৃজনশীল প্রতিভা: প্রাক-ইসলামি যুগে আরবরা অসাধারণ সৃজনশীলতা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল। তারা প্রবাদ বাক্যে খুবই পারদর্শী ছিল এবং একশত পূর্বপুরুষদের 'কুলজি' বা দীর্ঘ বংশ পরিচয় অনায়াসে মনে রাখতে পারত। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারীদের তিন ভাগে ভাগ করা হতো। যথা- ১. খতিব বা বক্তা, ২. শায়েব বা কবি এবং ৩. নোচ্ছাব বা বিভিন্ন গোত্রের পরিচায়ক বা কুলজি বিশারদ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাক-ইসলামি আরবে গীতিকাব্যকে কী বলা হতো?
২. প্রাক-ইসলামি আরবের শ্রেষ্ঠ কবি কে ছিলেন? *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]*
৩. প্রাক-ইসলামি যুগে রচিত কবিতাগুলোকে 'The Public Register of the Arabs' বলে অভিহিত করেন কে?
৪. সাবায়ে মুয়াল্লাকাত অর্থ কী?
৫. বেদুইনদের সাংস্কৃতিক সম্পদ কী ছিল?
৬. ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি কোনটিকে 'Academic Franchise' বলে অভিহিত করেন?

উত্তরের জন্য ৪৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. প্রাক-ইসলামি আরবদের সংস্কৃতি চর্চার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো চার্টে উপস্থাপন করো।
২. প্রাক-ইসলামি আরবের গীতি কবিতার মূল বিষয়বস্তু ছকে উপস্থাপন করো।

গ. দলীয় কাজ

প্রাক-ইসলামি আরবরা উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী ছিল— দুটি দলে ভাগ হয়ে বক্তব্যটির পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দাও।

---

[৩০] The Fair of Ukaz stood in pre-Islamic day for a kind of 'Academic francaise" of Arabia. – Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 94

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ ১: ১. এশিয়া; ২. সেমিটিক; ৩. বাগ্মিতা; ৪. আরব; ৫. তিন; ৬. ইয়েমেন।
পাঠ ২: ১. সাইমুম; ২. খেজুর; ৩. নাযীব; ৪. উট; ৫. উট; ৬. ঘোড়া।
পাঠ ৩ ও ৪: ১. আরব-ই-বায়দা; ২. 'আরব-ই-আরিবাহ' জাতি; ৩. আরব-ই-মুস্তারিবাহ্; ৪. বেদুইন; ৫. গোত্রপ্রীতি; ৬. শেখ।
পাঠ ৫: ১. প্রস্তর; ২. আগুন; ৩. নবোপলীয় বা প্রাগৈতিহাসিক; ৪. সভ্যতা বা ঐতিহাসিক; ৫. আনুমানিক ৫০০০; ৬. সেমেটিক।
পাঠ ৬: ১. মিসরীয় সভ্যতা; ২. আফ্রিকা; ৩. মিসরে; ৪. নোম; ৫. মেনেস; ৬. 'ফারাও' (Pharaoh)।
পাঠ ৭: ১. সূর্যদেবতা 'রা' বা 'রে'; ২. প্রাচীন মিসরীয়রা; ৩. মিসরীয় চিত্রলিপি; ৪. মমি সংরক্ষণ; ৫. মিসরীয়দের; ৬. মিসরীয়।
পাঠ ৮: ১. মেসোপটেমীয়; ২. সুমেরীয়; ৩. কিউনিফর্ম; ৪. সুমেরীয়; ৫. সুমেরীয়; ৬. সুমেরীয়দের।
পাঠ ৯: ১. 'বাব ইল'; ২. সভ্যতার জন্মভূমি; ৩. ব্যাবিলনীয় রাজা হাম্মুরাবি; ৪. সম্রাট নেবুচাদনেজার; ৫. জেরুজালেম; ৬. ওল্ড টেস্টামেন্ট (তাওরাত)।
পাঠ ১০: ১. হেলেনিক ও হেলেনিস্টিক; ২. গ্রিক; ৩. এথেন্সে; ৪. গ্রিক মহাকবি হোমার; ৫. ইতিহাস; ৬. সিন্ধু।
পাঠ ১১: ১. রাজা রোমিউলাস; ২. রোম; ৩. জুলিয়াস সিজার; ৪. 'স্টোয়িকবাদ'; ৫. 'কলোসিয়াম'; ৬. ১২টি।
পাঠ ১২: ১. অজ্ঞতা বা তমসার যুগ; ২. গোত্রীয়; ৩. বনু বকর ও বনু তাঘলিব; ৪. ইলাফ; ৫. আল মালা; ৬. দারুন নাদওয়াকে।
পাঠ ১৩: ১. দুই; ২. পশুপালন; ৩. ব্যবসা-বাণিজ্য; ৪. ইহুদিদের; ৫. নারী ও দাসদাসী; ৬. ঐতিহাসিক খোদা বকশ।
পাঠ ১৪: ১. পৌত্তলিক; ২. ৩৬০টি; ৩. আল্লাহর কন্যা; ৪. হুবাল; ৫. খ্রিষ্টানরা; ৬. হানিফ।
পাঠ ১৫: ১.কাসিদা; ২. ইমরুল কায়েস; ৩. ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি; ৪. সাতটি ঝুলন্ত কবিতা; ৫. কাব্যপ্রীতি; ৬. উকাজ মেলাকে।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

জাজিরাতুল আরব	'জাজিরা' আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ দ্বীপ বা উপদ্বীপ। আরব একটি ভূখণ্ডের নাম। তাই জাজিরাতুল আরব বলতে আরব উপদ্বীপকে বোঝায়। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আরব দেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। মূল স্থলভাগের সাথে যুক্ত কিন্তু বেশিরভাগ অংশ সাগর দিয়ে বেষ্টিত কোনো ভূখণ্ডকে উপদ্বীপ বলা হয়। আরব ভূখণ্ডের তিন দিকে বিশাল জলরাশি এবং একদিকে বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর দিয়ে ঘেরা। এর পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং উত্তরে সিরিয়ার মরুভূমি রয়েছে। এরূপ তিনদিক জল ও একদিক স্থল দ্বারা পরিবেষ্টিত ত্রিভুজাকৃতির ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই আরব দেশকে জাজিরাতুল আরব বলা হয়।
আসাবিয়া	বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুকাদ্দিমার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাযাবর বা বেদুইন সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে 'আল-আসাবিয়া' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Social Solidarity' যাকে বাংলায় বলা হয় 'সামাজিক সংহতি' বা 'গোত্র সংহতি'। ইবনে খালদুনের মতে– রক্ত, ধর্ম, জাতীয়তা প্রভৃতির মাধ্যমে সামাজিক সংহতি গড়ে ওঠে। গোত্রপ্রীতি ছিল আরব বেদুইনদের মূল প্রেরণা। এর মূলকথা হলো গোত্রের অন্য সদস্যদের প্রতি সীমাহীন ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ।
বেদুইন	বেদুইন শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে আরবিতে প্রচলিত চলিত উপভাষা বাদায়ি (بَدَوِيٌّ) থেকে। বাদায়ি এসেছে বাদিয়া (بَادِيَة) শব্দ থেকে। সুতরাং এর ভাবগত অর্থ দাঁড়ায় যারা বাদিয়া বা মরুভূমিতে অবস্থান করছে। আরবের যাযাবর সম্প্রদায় বেদুইন নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলীর মতে, "মরুবাসী আরবদের বেদুইন বলা হয়।" অর্থাৎ শব্দের আরব যারা অস্থায়ীভাবে মরুভূমির বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে তারাই বেদুইন। বেদুইনরা কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে না। গৃহপালিত পশুর ঘাস ও পানির সন্ধানে তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে বেড়ায়। বেদুইনরা পশু লালন-পালন, শিকার, লুটতরাজ প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বেদুইনদের মধ্যে উদ্দাম জীবনযাপন, গোত্রপ্রথা, আতিথেয়তা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

সভ্যতা	সাধারণ অর্থে সভ্যতা বলতে মানবজাতির বিকশিত অবস্থাকে বোঝায়। সভ্যতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Civilization। এ শব্দটি Civis বা Civitas থেকে এসেছে, যার অর্থ নাগরিক। কোনো অঞ্চল বা অঞ্চলসমূহে যখন একটি জনগোষ্ঠী নগর তৈরি করে এক উন্নতর জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলে তখন তার অগ্রগতির সহায়ক নিয়ামক হিসেবে উদ্ভাবিত হয় লিখন পদ্ধতি, আইন, সরকার ব্যবস্থা, নবপ্রযুক্তি, শিক্ষা ও ধর্মীয় দর্শন প্রভৃতি। আর এগুলোর সম্মিলিত রূপই হচ্ছে সভ্যতা। মানবজীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করার জন্য মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম আর সৃষ্টিশীল চিন্তা-ভাবনার ফল হলো আজকের সভ্যতা।
সেমেটিক	হযরত নুহ (আ)-এর পুত্র সামের বংশধরদেরকে ইতিহাসে সেমিটিক বলা হয়। ইহুদি ধর্মের প্রবর্তক মোশি বা হযরত মুসা (আ), খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রিষ্ট বা হযরত ঈসা (আ) এবং ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এ সেমিটিক জাতিরই সন্তান। প্রাচ্যদেশ আরব ছিল সেমিটিক জাতির লীলাভূমি। পরবর্তীকালে এরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরীয়, ফিনিসীয়, মিসরীয়, হিব্রু বা ইহুদি জাতি বলে পরিচিতি লাভ করে। তাই বলা যায়, সামের বংশধর, যারা পরবর্তীকালে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তাদেরকে সেমিটিক বলা হয়।
হায়ারোগ্লিফিক	মিসরীয়দের উদ্ভাবিত লিখন পদ্ধতি 'হায়ারোগ্লিফিক' (Hieroglyphic) নামে পরিচিত। গ্রিক ভাষা থেকে আসা এ শব্দটির অর্থ 'পবিত্র লিপি।' এটি ছিল একটি লিখিত ভাষা। 'হায়ারোগ্লিফিক' লিখন পদ্ধতিতে নানা প্রকার দ্রব্যের ছবি আঁকা থাকত। এ থেকে জিনিসগুলোর পরিচয় ও নাম জানা সম্ভব হতো। প্রায় ৭৫০টি চিত্রলিপির চিহ্ন দিয়ে এ প্রাচীন মিসরীয় লিপি পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল। বিশ্লেষণের মাধ্যমে হায়ারোগ্লিফিক লিখন পদ্ধতির তিনটি রূপ পাওয়া যায়। যেমন- চিত্রভিত্তিক (Pictographic), অক্ষরভিত্তিক (Syllabic) এবং বর্ণভিত্তিক (Alphabatic)। প্রাচীন মিসরে তিন ধরনের লিখন পদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রথম দিকে হায়ারোগ্লিফিক (Hieroglyphic) বা চিত্রলিখন পদ্ধতি, পরবর্তী পর্যায়ে হিরাটিক (Hieratic) বা ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজে ব্যবহৃত দ্রুত লিখন পদ্ধতি এবং ডেমোটিক (Demotic), যা সামগ্রিকভাবে জনসাধারণ ব্যবহার করত।
পিরামিড	মিসরীয়দের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যিক নিদর্শন হলো পিরামিড। গ্রিক ভাষায় পিরামিড শব্দের অর্থ 'খুব উঁচু'। মিসরীয় রাজা-বাদশাদের মৃতদেহ মমি করে সংরক্ষণের জন্য পিরামিড তৈরি করা হয়েছিল। পাথরের তৈরি বিশাল ও ত্রিকোণাকার এ সমাধিসৌধগুলো মূলত ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই নির্মাণ করা হয়। ২০০৮ সাল পর্যন্ত ১৩৫টি পিরামিডের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ৭০টি কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। পিরামিডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও উঁচু হলো নীল নদের মরুময় গিজা অঞ্চলে অবস্থিত বিখ্যাত ফারাও খুফুর পিরামিড।
মেসোপটেমিয়া	'মেসোপটেমিয়া' একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। আনুমানিক ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আধুনিক ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় পর্যায়ক্রমে কয়েকটি সভ্যতার উন্মেষ হয়। একই ভূখণ্ডে গড়ে ওঠায় এ সভ্যতাগুলো একত্রে 'মেসোপটেমীয় সভ্যতা' নামে পরিচিত। ওই অঞ্চল 'Fertile Crescent' বা 'অর্ধ চন্দ্রাকৃতি উর্বর ভূমি' বলেও পরিচিত। মেসোপটেমীয় ভূখণ্ডে যে সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, অ্যাসিরীয় সভ্যতা ও ক্যালডীয় সভ্যতা।
কিউনিফর্ম	সুমেরীয়দের উদ্ভাবিত লিখন পদ্ধতি ইতিহাসে কীলকাকার বা কিউনিফর্ম নামে পরিচিত। প্রথম দিকে সুমেরীয় লিপি ছিল মিসরীয়দের মতো চিত্রলিপিভিত্তিক। পরবর্তীকালে নিজেদের লেখাকে গতিশীল করতে তারা নতুন লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে যা 'কিউনিফর্ম' (Cuneiform) বা কীলকাকার নামে পরিচিত। সুমেরীয়রা কাদামাটির প্লেটে খাগের কলম (Reed Pen) দিয়ে কৌণিক কিছু রেখা ফুটিয়ে তুলত। খাঁজকাটা চিহ্নগুলো দেখতে অনেকটা তীরের মতো। কিউনিফর্মকে বলা হয় অক্ষরভিত্তিক চিত্রলিপি। এ লিপি বামদিক থেকে ডানদিকে লেখা হতো। সুমেরের বিখ্যাত শহর নিপ্পুরে সুমেরীয় এ কীলকাকার চিত্রলিপির প্রায় চার হাজার মাটির চাকতি পাওয়া গেছে।
হাম্মুরাবি কোড	ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হাম্মুরাবি (Hummurabi) প্রণীত আইন সংহিতাই 'হাম্মুরাবি কোড (The code of Hummurabi) নামে পরিচিত। সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনবিধি অনুসারে তিনি এ আইন কাঠামো তৈরি করেন। এ আইন সংহিতা ছিল প্রতিশোধমূলক। এতে মোট ২৮২টি ধারা ছিল। হাম্মুরাবির এ আইনে 'দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, মাথার বদলে মাথা প্রভৃতি নিষ্ঠুর বিধান ছিল। সামাজিক অপরাধ ছাড়াও পারিবারিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতিমালা এ আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার এ আইন সংহিতা পরবর্তী সময়ে রোমান আইন ও পাশ্চাত্যের আইন-কানুনকে প্রভাবিত করেছে।
নগররাষ্ট্র	প্রাচীন গ্রিসে নগররাষ্ট্র ধারণাটির উদ্ভব ঘটে। এখানে একেকটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একেকটি নগররাষ্ট্র। গ্রিসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগররাষ্ট্র হলো স্পার্টা ও এথেন্স। স্পার্টা কার্যত ছিল একটি যুদ্ধশিবিরের মতো। স্পার্টানরা সবসময়ই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। যুদ্ধে বন্দি ব্যক্তিদের ভূমিদাস বানানো হতো। তারা 'হেলট' (Helt) নামে পরিচিত ছিল। যুদ্ধপ্রিয় স্পার্টার নারী-পুরুষ সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। অপরদিকে গ্রিক সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল নগররাষ্ট্র এথেন্স। কারণ, যুদ্ধবাজ স্পার্টার সমসাময়িক এ নগররাষ্ট্রের অধিবাসীরাই বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম রাজতন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে গণতন্ত্রের সূচনা করেছিল।

স্টোয়িকবাদ	প্রাচীন রোমের সবচেয়ে জনপ্রিয় দার্শনিক মতবাদ হলো 'স্টোয়িকবাদ'। স্টোয়িকবাদের উন্নয়নে তিনজন ব্যক্তিত্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদের একজন ছিলেন ধনী রোমান 'সিনেক'। অন্যজন 'এপিকটেটাস'। তিনি ছিলেন দাস এবং শেষ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন রোমান সম্রাট 'মার্কাস অরলিয়াস'। এই দর্শনের মূলকথা হচ্ছে- সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সত্যবাদী হওয়ার মধ্য দিয়েই সুখলাভ করা।
কলোসিয়াম	কলোসিয়াম ইতালির রোম শহরে অবস্থিত একটি বৃহৎ উপবৃত্তাকার ছাদবিহীন মঞ্চ। এটি ১৮৯ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫৬ মিটার চওড়া। এটির মূল এলাকা ৬ একর (২৪,০০০ মি.)। বাইরের দেয়ালের উচ্চতা হলো ৪৮ মিটার, ঘের মূলত ৫৪৫ মিটার। এর কেন্দ্রীয় রণভূমি একটি উপবৃত্তাকার এলাকা যা ৮৭ মিটার (২৮৭ ফুট) লম্বা এবং ৫৫ মিটার (১৮০ ফুট) চওড়া এবং একটি ৫ মিটার (১৫ ফুট) উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ৫০ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই মঞ্চ সাধারণত গ্ল্যাডিয়েটরদের প্রতিযোগিতা এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কোনো প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহৃত হতো। এর অবস্থান রোমান ফোরামের ঠিক পশ্চিমে, যার নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ৭০ থেকে ৭২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়; এ সময় সম্রাট ভেসপাসিয়ানের রাজত্ব ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় এই স্থাপনার নির্মাণকাজ শেষ হয়েছিল ৮০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট তিতুসের রাজত্বকালে। এর আদি নাম ছিল ফ্ল্যাভিয়ান নাট্যশালা।
আইয়ামে জাহেলিয়া	'আইয়ামে জাহেলিয়া' আরবি শব্দ। 'আইয়াম' অর্থ যুগ এবং 'জাহেলিয়া' অর্থ তমসা, অজ্ঞতা, বর্বরতা বা কুসংস্কার। মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের আগের প্রায় একশ বছর সময়কালকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়। এ সময় আরবের মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার নৈতিকতা, সততা, দায়িত্বজ্ঞান ও শালীনতা ছিল না। অন্যায়-অনাচারে সমাজ নিমজ্জিত ছিল। এ জন্য এ সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকারের যুগ বলা হয়।
সাবায়ে মুয়াল্লাকাত	সাবায়ে মুয়াল্লাকাত অর্থ 'সপ্ত ঝুলন্ত' কবিতা। প্রতি বছর মক্কার অদূরে উকাজের বার্ষিক মেলায় কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। উকাজের বাৎসরিক সাহিত্য সম্মেলনে সাতটি কবিতা পুরস্কৃত হতো। সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ করে এ কবিতাগুলো পবিত্র কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। এ কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু ছিল প্রেম, যুদ্ধবিগ্রহ, বীরত্বপূর্ণ কাহিনি, বংশ গৌরব, আরব সমাজের আতিথেয়তা, স্বাধীনতা ইত্যাদি। এ কবিতাগুলোই হলো সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা।

▶ একনজরে প্রাচীন সভ্যতাগুলোর সময় এবং অবদান

বিভিন্ন সভ্যতা	উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব	অবদান/কৃতিত্ব
মিসরীয় সভ্যতা (৫০০০–৫২৫ খ্রি. পূ.)	**শাসক:** মেনেস, আহমোজ, আমেনহোটেপ, টুটেন খামেন, রামসেস	পিরামিড নির্মাণ, মমি তৈরি, হায়ারোগ্লিফিক লিপির উদ্ভাবন, প্যাপিরাস কাগজ উদ্ভাবন
সুমেরীয় সভ্যতা (৪০০০–৩০০০ খ্রি.পূ.)	**শাসক:** ডুঙ্গি	আইন কাঠামো গঠন, কিউনিফর্ম লিপির উদ্ভাবন, জলঘড়ি আবিষ্কার, চন্দ্রপঞ্জিকার উদ্ভাবন
ব্যাবিলনীয় সভ্যতা (২০৫০-৫৩৯ খ্রি.পূ.)	**শাসক:** হাম্মুরাবি	হাম্মুরাবি কোড বা আইন সংহিতা প্রণয়ন
হিব্রু সভ্যতা (১৮০০–৫৮৬ খ্রি.পূ.)	মূলত ধর্মভিত্তিক সভ্যতা। উল্লেখযোগ্য প্রচারক– আব্রাহাম বা ইব্রাহিম (আ), মোজেস বা মুসা (আ), ডেভিড বা দাউদ (আ), সলোমন বা সুলায়মান (আ)	একেশ্বরবাদের ধারণার প্রবর্তন
গ্রিক সভ্যতা (২০০০–১৪৬ খ্রি.পূ. আনুমানিক)	**শাসক:** সলোন, পেরিক্লিস, ক্লিসথিনিস **দার্শনিক:** সক্রেটিস, প্লেটো, থেলিস, এরিস্টটল, জোনো, এপিকিউরাস **বিজ্ঞানী:** ইউক্লিড, হিপার্কাস, ইরাতোস্থিনিস, আর্কিমিডিস	নগররাষ্ট্রের উদ্ভব, দর্শনের বিকাশ, গণতন্ত্র, বর্ণমালার ব্যবহার, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন
রোমান সভ্যতা (৭৫৩ খ্রি.পূ.–৪৭৬ খ্রি.পূ.)	**দার্শনিক:** সিমিরো, লুক্রেটিয়াস, মার্কাস, অরেলিয়াস **বিজ্ঞানী:** বড় প্লিনি, সেলসাস, গ্যালেন, সোরানাস ও রুফাস।	কলোসিয়াম নাট্যশালা তৈরি, রোমান আইন সংকলন, অস্ত্রশস্ত্র, পশমি বস্ত্র উদ্ভাবন

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ প্রাক-ইসলামি আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু এবং অধিবাসীদের ওপর এসবের প্রভাব

প্রশ্ন-১. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ কোনটি?
উত্তর: পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ হলো আরব উপদ্বীপ।

প্রশ্ন-২. 'জাজিরাতুল আরব' অর্থ কী?
[সি. বো., ব. বো. ২০২১; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]
উত্তর: 'জাজিরাতুল আরব' অর্থ আরব উপদ্বীপ।

প্রশ্ন-৩. আরব উপদ্বীপ কোন মহাদেশে অবস্থিত?
উত্তর: আরব উপদ্বীপ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত।

প্রশ্ন-৪. আরব উপদ্বীপের আয়তন কত?
উত্তর: আরব উপদ্বীপের আয়তন ১০,২৭,০০০ বর্গমাইল বা ২৬,৫৮,৭৮১ বর্গ কি.মি.।

প্রশ্ন-৫. আরব শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর: আরব শব্দটির অর্থ 'বাগ্মিতা'।

প্রশ্ন-৬. 'আরবাতুন' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: 'আরবাতুন' শব্দের অর্থ বৃক্ষলতাহীন মরুভূমি।

প্রশ্ন-৭. আরবের ভূপ্রকৃতির তারতম্য অনুসারে আরব অধিবাসীদের কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়?
উত্তর: আরবের ভূপ্রকৃতির তারতম্য অনুসারে আরব অধিবাসীদের দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রশ্ন-৮. উত্তর আরবের অধিবাসীদের কী বলা হয়?
উত্তর: উত্তর আরবের অধিবাসীদের 'আরব-ই-মুস্তারিবাহ' বলা হয়।

প্রশ্ন-৯. বায়দা বা বাদিয়া অর্থ কী?
উত্তর: বায়দা বা বাদিয়া অর্থ জঙ্গল।

প্রশ্ন-১০. বেদুইন কাদের বলা হয়?
[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]
উত্তর: প্রাক-ইসলামি যুগের যাযাবর আরব জাতিকেই বেদুইন বলা হয়।

প্রশ্ন-১১. বেদুইন সমাজের ভিত্তি কী?
উত্তর: বেদুইন সমাজের ভিত্তি হলো গোষ্ঠীবন্ধতা।

প্রশ্ন-১২. বেদুইনদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কী ছিল?
উত্তর: বেদুইনদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন পশুপালন।

প্রশ্ন-১৩. আসাবিয়া কী?
উত্তর: গোত্রীয় চেতনা তথা নিজ গোত্রের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, মমত্ববোধ বা গোত্রের জন্য জান-মাল উৎসর্গ করার মনোভাবই হলো আসাবিয়া।

প্রশ্ন-১৪. প্রাক-ইসলামি আরবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান বাহন ছিল কী?
উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান বাহন ছিল উট।

প্রশ্ন-১৫. The Ship of the Desert কোন প্রাণীকে বলা হয়?
উত্তর: উটকে The Ship of the Desert বলা হয়।

প্রশ্ন-১৬. 'আরবদের সৌভাগ্য' বলা হতো কোন অঞ্চলকে?
উত্তর: আরব উপদ্বীপের উর্বর দক্ষিণ অঞ্চল ইয়েমনকে আরবদের সৌভাগ্য বলা হতো।

প্রশ্ন-১৭. 'ইয়েমেন' শব্দের অর্থ কী? *[ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯; সকল বোর্ড ২০১৬]*
উত্তর: 'ইয়েমেন' শব্দের অর্থ সুখী বা সৌভাগ্যবান।

প্রশ্ন-১৮. সাইমুম কী?
উত্তর: মরুভূমির উত্তপ্ত বালুঝড়কে সাইমুম বলা হয়।

প্রশ্ন-১৯. প্রাক-ইসলামি যুগে আরববাসীর প্রধান খাদ্য কী ছিল?
[সকল বোর্ড ২০১৫]
উত্তর: প্রাক-ইসলামি যুগে আরববাসীর প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর।

প্রশ্ন-২০. গাছের রানি বলা হয় কোন গাছকে?
উত্তর: গাছের রানি বলা হয় খেজুর গাছকে।

■ প্রাচীন সভ্যতাসমূহের বৈশিষ্ট্য এবং এগুলোর প্রভাব

প্রশ্ন-২১. সভ্যতা কী?
উত্তর: মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আচার আচরণ-কার্যাবলি বিকশিত হয়ে যে সামষ্টিক রূপ লাভ করেছে তাই সভ্যতা।

প্রশ্ন-২২. কখন নগর সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়?
উত্তর: সভ্যতার যুগে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ থেকে নগর সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়।

প্রশ্ন-২৩. বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা কোনটি?
উত্তর: বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা হলো মিসরীয় সভ্যতা।

প্রশ্ন-২৪. মিসরকে কীসের দেশ বলা হয়?
[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]
উত্তর: মিসরকে পিরামিডের দেশ বলা হয়।

প্রশ্ন-২৫. মিসর কোন মহাদেশে অবস্থিত?
উত্তর: মিসর আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

প্রশ্ন-২৬. 'ফারাও' কোন রাজাদের উপাধি ছিল?
[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]
উত্তর: মিসরীয় রাজাদের উপাধি ছিল 'ফারাও'।

প্রশ্ন-২৭. কে মিসরে একেশ্বরবাদের প্রচলন করেন?
উত্তর: চতুর্থ আমেনহোটেপ বা ফারাও ইখনাটন মিসরে একেশ্বরবাদের প্রচলন করেন।

প্রশ্ন-২৮. প্যাপিরাস কী? */ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; ঢাকা বোর্ড ২০১৭/*

উত্তর: প্যাপিরাস হলো নীলনদের তীরে জন্মানো এক ধরনের নলখাগড়া জাতীয় ঘাস বা উদ্ভিদ, যা দিয়ে মিসরীয়রা কাগজ তৈরি করত।

প্রশ্ন-২৯. মিসরীয় লিখন পদ্ধতির নাম কী? */ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২; সি. বো., ব. বো. ২০২১/*

উত্তর: মিসরীয় লিখন পদ্ধতির নাম হায়ারোগ্লিফিক।

প্রশ্ন-৩০. 'হায়ারোগ্লিফিক' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: হায়ারোগ্লিফিক' শব্দের অর্থ পবিত্র লিপি।

প্রশ্ন-৩১. পিরামিড কী? */ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯/*

উত্তর: ফারাওদের মৃতদেহ মমি করে এর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রাচীন মিসরীয়রা পাথর কেটে কেটে ত্রিভুজাকৃতির প্রকাণ্ড যে সৌধ নির্মাণ করত তাই পিরামিড।

প্রশ্ন-৩২. মিসরকে নীল নদের দান কে বলেছেন? */ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮/*

উত্তর: ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস মিসরকে 'নীল নদের দান' (The Gift of the Nile) বলেছেন।

প্রশ্ন-৩৩. হেরোডোটাস কোন দেশের ঐতিহাসিক?

উত্তর: হেরোডোটাস গ্রিসের ঐতিহাসিক।

প্রশ্ন-৩৪. সর্ববৃহৎ পিরামিডের নাম কী? */ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯/*

উত্তর: সর্ববৃহৎ পিরামিডের নাম ফারাও খুফুর পিরামিড।

প্রশ্ন-৩৫. কাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়?

উত্তর: মিসরীয়দের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়।

প্রশ্ন-৩৬. মেমফিস কী? */সকল বোর্ড ২০১৫/*

উত্তর: মেমফিস কায়রো থেকে ২০ কি.মি. দক্ষিণে নীলনদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি শহর। এটি প্রাচীন মিসরের রাজধানী ছিল।

প্রশ্ন-৩৭. 'Memphite Drama' কোন সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন?

উত্তর: 'Memphite Drama' মিসরীয় সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন।

প্রশ্ন-৩৮. কোথায় মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?

উত্তর: টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন-৩৯. টাইগ্রিস নদীর অপর নাম কী?

উত্তর: টাইগ্রিস নদীর অপর নাম দজলা।

প্রশ্ন-৪০. 'মেসোপটেমিয়া' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?

উত্তর: 'মেসোপটেমিয়া' শব্দটি গ্রিক ভাষার শব্দ।

প্রশ্ন-৪১. 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি।

প্রশ্ন-৪২. সুমেরীয় কারা?

উত্তর: সুমেরীয়রা ইরাকের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এলেমের পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসী, যারা পরবর্তী সময়ে মেসোপটেমীয় অঞ্চলে এসে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

প্রশ্ন-৪৩. কোন অঞ্চলে সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল? */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩/*

উত্তর: মেসোপটেমীয় অঞ্চলে সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

প্রশ্ন-৪৪. ডুঙ্গি কে ছিলেন?

উত্তর: ডুঙ্গি ছিলেন সুমেরীয় সম্রাট।

প্রশ্ন-৪৫. সুমেরীয়দের ধর্মমন্দিরকে কী বলা হতো?

উত্তর: সুমেরীয়দের ধর্মমন্দিরকে 'জিগুরাত' বলা হতো।

প্রশ্ন-৪৬. হিব্রু সভ্যতা বর্তমানে কোন স্থানে গড়ে উঠেছিল?

উত্তর: বর্তমান প্যালেস্টাইনের (ফিলিস্তিন) জেরুজালেম নগরীতে হিব্রু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন-৪৭. ব্যাবিলনীয়দের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের নাম কী?

উত্তর: ব্যাবিলনীয়দের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের নাম হাম্মুরাবি।

প্রশ্ন-৪৮. কোন শব্দ থেকে ব্যাবিলন শব্দের উৎপত্তি? */রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো. ২০১৭/*

উত্তর: 'বাব ইল' শব্দ থেকে ব্যাবিলন শব্দের উৎপত্তি।

প্রশ্ন-৪৯. 'ব্যাবিলন' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: 'ব্যাবিলন' শব্দের অর্থ দেবতার নগর।

প্রশ্ন-৫০. হিব্রুদের ধর্মীয় গ্রন্থ কী নামে পরিচিত?

উত্তর: হিব্রুদের ধর্মীয় গ্রন্থ 'তাওরাত' বা ওল্ড টেস্টামেন্ট নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৫১. বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Histories' কার রচিত?

উত্তর: বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Histories' ইতিহাসের জনক হেরোডোটাসের রচিত।

প্রশ্ন-৫২. 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসি' মহাকাব্যের লেখক কে?

উত্তর: 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসি' মহাকাব্যের লেখক গ্রিক মহাকবি হোমার।

প্রশ্ন-৫৩. 'প্রমিথিউস বাউন্ড' নাটকটি কার লেখা?

উত্তর: 'প্রমিথিউস বাউন্ড' নাটকটি বিখ্যাত গ্রিক নাট্যকার এস্কাইলাসের লেখা।

প্রশ্ন-৫৪. 'The Politics' গ্রন্থের লেখক কে?

উত্তর: 'The Politics' গ্রন্থের লেখক গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল।

প্রশ্ন-৫৫. 'The Republic' গ্রন্থের লেখক কে?

উত্তর: 'The Republic' গ্রন্থের লেখক গ্রিক দার্শনিক প্লেটো।

প্রশ্ন-৫৬. ইতিহাসের জনক কে? */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১/*

উত্তর: গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ইতিহাসের জনক।

প্রশ্ন-৫৭. রোমান কারা?

উত্তর: টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত ছোট শহর রোমের অধিবাসীদের বলা হয় রোমান।

প্রশ্ন-৫৮. ত্রয়ী শাসন কী?

উত্তর: সম্রাট জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৪ অব্দ) পর রোম সাম্রাজ্য অক্টোভিয়ান সিজার, মার্ক এন্থোনি ও লেপিডাসের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, যা ইতিহাসে 'ত্রয়ী শাসন' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৫৯. স্টোয়িকবাদ কী?
উত্তর: রোমের সবচেয়ে জনপ্রিয় দার্শনিক মতবাদ হলো 'স্টোয়িকবাদ'।

প্রশ্ন-৬০. রোমে নির্মিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাট্যশালার নাম কী?
উত্তর: রোমে নির্মিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাট্যশালার নাম 'কলোসিয়াম'।

প্রশ্ন-৬১. জ্যাকোবের অপর নাম কী?
উত্তর: জ্যাকোবের অপর নাম ইসরাইল।

■ প্রাক-ইসলামি আরবের আরবদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

প্রশ্ন-৬২. জাহেলিয়া যুগ কী?
উত্তর: হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের আগে আরবের প্রায় একশ বছর সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকার যুগ বলা হয়।

প্রশ্ন-৬৩. 'আইয়াম' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: 'আইয়াম' শব্দের অর্থ যুগ।

প্রশ্ন-৬৪. জাহেলিয়া শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*
উত্তর: জাহেলিয়া শব্দের অর্থ অজ্ঞতা, অন্ধকার বা তমসা।

প্রশ্ন-৬৫. আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ কী?
[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো. ২০১৯]
উত্তর: আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ অজ্ঞতা বা অন্ধকারের যুগ।

প্রশ্ন-৬৬. মালা কী? *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১; ঢাকা বোর্ড ২০১৭]*
উত্তর: মালা হলো প্রাক-ইসলামি আরবের একটি রাজনৈতিক সংগঠন বা মন্ত্রণাসভা।

প্রশ্ন-৬৭. 'আল-মালা' নামে আখ্যায়িত পরিষদের সভাকক্ষকে কী বলা হতো?
উত্তর: 'আল-মালা' নামে আখ্যায়িত পরিষদের সভাকক্ষকে 'দারুণ নাদওয়া' বলা হতো।

প্রশ্ন-৬৮. আইয়াম আল-আরব কী?
উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবের গোত্রীয় দ্বন্দ্ব সংঘাতকে আইয়াম আল-আরব বা আরবের দিন বলা হতো।

প্রশ্ন-৬৯. কাকে 'শেখ' বলা হতো?
[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩]
উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবের গোত্রপ্রধানকে 'শেখ' বলা হতো।

প্রশ্ন-৭০. কোন মৌসুমে উকাজ মেলা বসত?
উত্তর: প্রতিবছর হজ মৌসুমে উকাজ মেলা বসত।

প্রশ্ন-৭১. প্রাক-ইসলামি আরবে আরবি কবিতাকে কী বলে অভিহিত করা হয়?
উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবে আরবি কবিতাকে 'The Public Register of the Arabs' বলে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন-৭২. গীতিকাব্যকে আরবিতে কী বলা হয়?
উত্তর: গীতিকাব্যকে আরবিতে কাসিদা বলা হয়।

প্রশ্ন-৭৩. 'সাবায়ে মুয়াল্লাকাত' কী? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]*
উত্তর: উকাজ মেলার কবিতা প্রতিযোগতায় সেরা হিসেবে বিবেচিত সাতটি কবিতাকে কাবাঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো, যা 'সাবায়ে মুয়াল্লাকাত' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৭৪. মুয়াল্লাক বলা হতো কাদেরকে?
উত্তর: প্রাক-ইসলামি যুগে আরব কবিদের মধ্যে যশস্বী সাতটি ঝুলন্ত গীতিকাব্যের রচয়িতাগণকে মুয়াল্লাক বলা হতো।

প্রশ্ন-৭৫. প্রাক-ইসলামি আরবের শ্রেষ্ঠ কবি কে ছিলেন?
[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]
উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ইমরুল কায়েস।

প্রশ্ন-৭৬. প্রাক-ইসলামি আরবের একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের নাম কী? *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*
উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবের একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের নাম 'হানিফ'।

প্রশ্ন-৭৭. ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী কারা?
উত্তর: খ্রিষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. আরব দেশের নামকরণ হয়েছে কীভাবে?
উত্তর: মরুময় বৈশিষ্ট্য এবং ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে আরব দেশটির নামকরণ হয়েছে।

আরব শব্দটি 'আরাবাতুন' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ বৃক্ষলতাহীন মরুভূমি। কেউ কেউ মনে করে করেন, প্রাচীন হেজাজের তায়ামা প্রদেশের 'আরাবা' অঞ্চলের নাম থেকে আরব শব্দটি এসেছে। অন্য সূত্র মতে, হিব্রু শব্দ 'আবহার' (মরুভূমি) শব্দ থেকে আরব শব্দের উৎপত্তি। কারও কারও মতে, আরব শব্দের অর্থ বাগ্মিতা। আর আরববাসী ছিল বাগ্মিতায় বিশেষভাবে দক্ষ। তাই ধারণা করা হয় বাগ্মি মানুষের আবাসভূমির নাম রাখা হয়েছে আরব। তবে মরুময় বৈশিষ্ট্যের কারণেই ওই অঞ্চলের নাম আরব হয়েছে বলে অধিকাংশের মত।

প্রশ্ন-২. আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: আরব উপদ্বীপ ভৌগোলিকভাবে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

আরব উপদ্বীপ তিন দিকে পানি এবং একদিকে মরুভূমি দিয়ে বেষ্টিত। এর উত্তরে সিরিয়া মরুভূমি, পূর্বে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এটি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে প্রাচীন মানচিত্র অনুযায়ী এটি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বলে বিবেচিত হতো।

প্রশ্ন-৩. জাজিরাতুল আরব বলতে কী বোঝ? */ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২; ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১; রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো. ২০১৭/*

উত্তর: জাজিরাতুল আরব বলতে আরব ভূখণ্ডকে বোঝায়।

'জাজিরা' আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ দ্বীপ বা উপদ্বীপ। আরব একটি ভূখণ্ডের নাম। তাই জাজিরাতুল আরব অর্থ আরব উপদ্বীপকে বোঝায়। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আরব দেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। মূল স্থল ভাগের সাথে যুক্ত কিন্তু বেশিরভাগ অংশ সাগর দিয়ে বেষ্টিত কোনো ভূখণ্ডকে উপদ্বীপ বলা হয়। আরব ভূখণ্ডের তিন দিকে বিশাল জলরাশি এবং একদিকে বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর দিয়ে ঘেরা। এর পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং উত্তরে সিরিয়ার মরুভূমি রয়েছে। এরূপ তিনদিক জল ও একদিক স্থল দ্বারা পরিবেষ্টিত ত্রিভুজাকৃতির ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই আরব দেশকে জাজিরাতুল আরব বলা হয়।

প্রশ্ন-৪. আরব দেশের জলবায়ু কোন প্রকৃতির? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আরবের জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক ও উত্তপ্ত।

তিনদিক জল দ্বারা বেষ্টিত হলেও আরবে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজমান। কারণ এখানকার অধিকাংশ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। তবে সমুদ্র নিকটবর্তী ও বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা ওমান ও হাজরামাউতে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার উপস্থিতি রয়েছে।

প্রশ্ন-৫. ইয়ামেনকে সুখী আরব ভূমি বলা হয় কেন?

উত্তর: কৃষি উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রকমারি পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় প্রাচীনকালে ইয়ামেনকে 'সুখী আরব ভূমি' বা সৌভাগ্য আরব নামে অভিহিত করা হতো।

দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন, হাজরামাইত ও ওমানে অনেক উর্বর ও বিস্তৃত উপত্যকা ছিল। এ উর্বর ভূখণ্ডগুলোতে কফি, নীল, খেজুর, শাকসবজি ও বিভিন্ন ফল ও ফসলের উৎপাদন হতো। এছাড়া ধান, গমন, বার্লি, ভুট্টা, আতা, ডুমুর, পীচ ও আঙ্গুর এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এর ফলে আরবের এ অঞ্চল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রশ্ন-৬. প্রাক-ইসলামি আরবে খেজুর গাছকে 'রানি বৃক্ষ' বলা হতো কেন?

উত্তর: বিভিন্ন উপকারিতার জন্য খেজুর বৃক্ষকে 'রানি বৃক্ষ' বলা হয়।

খেজুর ছিল তৎকালীন আরববাসীর প্রধান খাদ্য। খেজুর গাছের রস তাদের প্রিয় পানীয়। আরবে গৃহনির্মাণের কাজে, মাদুর ও দড়ি তৈরি, জ্বালানি কাঠরূপে এবং বিভিন্ন কাজে খেজুর গাছ ব্যবহার করা হতো। এজন্যই খেজুর গাছকে তারা 'রানি বৃক্ষ' নামে ডাকত।

প্রশ্ন-৭. উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩; ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; সকল বোর্ড ২০২১; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯; ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮; সকল বোর্ড ২০১৬/*

উত্তর: মরু অঞ্চলে চলাচলের উপযোগী বাহন হওয়ায় উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

আরবের অধিকাংশ অঞ্চলই মরুময়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে উত্তপ্ত মরুঅঞ্চলে উট ছিল চলাচলের একমাত্র উপযোগী প্রাণী। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় মরুময় আরবে এটি ছিল সর্বাধিক গৃহপালিত প্রাণী। মরুবাসী আরবরা খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ, যোগাযোগ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান বাহন হিসেবে উট ব্যবহার করত। তাই একে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

প্রশ্ন-৮. প্রাক-ইসলামি আরবে বাণিজ্যিক কাফেলা হিসেবে উট কেন উল্লেখযোগ্য?

উত্তর: প্রতিকূল মরু অঞ্চলে উট একমাত্র বাহন হওয়ায় প্রাক-ইসলামি আরবে বাণিজ্যিক কাফেলা হিসেবে এ প্রাণীটি উল্লেখযোগ্য ছিল।

উট একটি কষ্টসহিষ্ণু প্রাণী। উট ছাড়া মরুবাসী আরবদের জীবন অকল্পনীয়। আরবে নৌ-চলাচলের উপযোগী কোনো নদ-নদী না থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান বাহন ছিল উট। শীতকালে প্রায় ২৫ দিন ও গরমকালে প্রায় ১৫ দিন কোনো পানি পান না করে চলতে পারায় রাজ্যবিস্তার, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও উট অগ্রণী ভূমিকা পালন করত।

প্রশ্ন-৯. বেদুইন কারা? ব্যাখ্যা করো। */ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫/*

উত্তর: আরবের যেসব অধিবাসী কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস না করে মরুভূমির এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরেফিরে বসবাস করত তাদেরকে বেদুইন বলা হয়।

আরব অধিবাসীদের অধিকাংশই স্বাধীনচেতা, বেপরোয়া ও দুর্ধর্ষ মরুবাসী বেদুইন। সমাজের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে শহরে বসবাস করার পরিবর্তে বেদুইনরা জীবনযাপনের জন্য মরুভূমির সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। তাদের গৃহ ছিল তাঁবু, খাবার ছিল উটের মাংস, পানীয় ছিল উট ও ছাগলের দুধ এবং প্রধান জীবিকা ছিল লুটতরাজ ও শিকার। তাই বলা যায়, মরুপ্রান্তরে পশু চারণভূমির সন্ধানে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী আরবরাই বেদুইন নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-১০. আসাবিয়া কী? ব্যাখ্যা করো।

/দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩/

উত্তর: আসাবিয়া হলো গোত্রীয় চেতনা, যা আরবদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

আসাবিয়ার মূলমন্ত্র ছিল গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতি সীমাহীন ও নিঃশর্ত আনুগত্য। আরবদের মধ্যে গোত্রীয় চেতনা এতই প্রবল ছিল যে, তারা নিজ গোত্র বহির্ভূত সবকিছুকেই বিজাতীয় ঘৃণার পাত্র ও শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে করত। নিজ নিজ গোত্রের প্রতি এ মমত্ববোধ ও গোত্রের জন্য জান-মাল উৎসর্গ করার চেতনাই আসাবিয়া বা গোত্রীয় চেতনা। এ চেতনায় কারণেই আরবরা নিজ গোত্রের কোনো হত্যার প্রতিশোধ নিতে সবাই ঐক্যবদ্ধ হতো।

প্রশ্ন-১১. সভ্যতা বলতে কী বোঝ?

উত্তর: সভ্যতা বলতে মানবগোষ্ঠীর অবস্থান ও কার্যকলাপের একটি সুসংহত ও ইতিবাচক অবস্থাকে বোঝায়।

মানবজীবন গতিশীল, প্রাণবন্ত ও পরিবর্তনশীল। মানবজাতির ইতিহাসের বিভিন্ন সময় উন্নতি ঘটেছে। মানবজাতির বিকাশের ইতিহাসই হলো সভ্যতা। ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। অর্থাৎ মানবসভ্যতা মানুষেরই ধারাবাহিক ইতিহাস।

প্রশ্ন-১২. সভ্যতার যুগ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসানের পর যে যুগের সূচনা ঘটে তাই সভ্যতার যুগ বা ঐতিহাসিক যুগ নামে পরিচিত।

মানব ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিশেষ বিশেষ কৃষ্টির উদ্ভব ঘটেছিল তাকেই সভ্যতা বলা হয়। আর সভ্যতার যুগের সূচনা ঘটেছিল লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার ও নগর সভ্যতার বিকাশের মাধ্যমে। লিখন পদ্ধতির প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল চিত্রলিখন বা Pictogram পদ্ধতি। লিখন পদ্ধতির উন্নতি এবং কৃষি আবিষ্কারের ধারাবাহিকতায় প্রায় কাছাকাছি সময়ে নদীকে কেন্দ্র করে মিসরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

প্রশ্ন-১৩. রাজা মেনেস ফেরাউনের মর্যাদা লাভ করেন কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

উত্তর: উত্তর ও দক্ষিণ মিসরকে একত্রিত করার মাধ্যমে রাজা মেনেস ফেরাউনের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

প্রাক-রাজবংশ যুগাবসানের পর মিসর উত্তর মিসর এবং দক্ষিণ মিসর এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে এ দু'অংশকে একত্র করে মেনেস তার শাসক নিযুক্ত হন। তার রাজধানী স্থাপিত হয় মেমফিস শহরে। মিসরীয় রাজা-বাদশাহদের ফেরাউন বলা হতো। এভাবে রাজা মেনেস ফেরাউনের মর্যাদা লাভ করেন।

প্রশ্ন-১৪. মিসরকে নীল নদের দান বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫; ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯; সকল বোর্ড ২০১৮]

উত্তর: মিসরীয় সভ্যতার বিকাশে নীল নদের ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিল বলে মিসরকে নীল নদের দান বলা হয়।

মিসরীয় সভ্যতার সূচনাকারী লোকেরা পানির প্রাপ্যতা, কৃষি উৎপাদন, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ, পশু পালনের জন্য তৃণভূমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালের বন্যায় নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে পলি জমা হতো, যার ফলে জমির উর্বর শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হতো। এভাবে কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে মিসরীয় সভ্যতা সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। তাই গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিসরের উৎকর্ষ দেখে মিসরকে 'নীল নদের দান' বা 'The Gift of the Nile' বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন-১৫. প্যাপিরাস বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২; সি. বো., ব. বো. ২০২১]

উত্তর: প্যাপিরাস বলতে এক ধরনের নলখাগড়া জাতীয় ঘাস বা উদ্ভিদকে বোঝায়, যার মাধ্যমে মিসরীয়রা কাগজ আবিষ্কার করে।

নীল নদের তীরে নলখাগড়া জাতীয় এক ধরনের ঘাস জন্মাত। মিসরীয়রা এগুলো দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে এক উন্নতমানের কাগজ আবিষ্কার করে। এক্ষেত্রে প্যাপিরাস গাছের কাণ্ডের ছাল ছড়িয়ে পাশাপাশি রাখা হতো। একটির ওপর আর একটির ফালি রেখে রোদে শুকানো হতো। তারপর ফালিগুলোকে চাপ দিয়ে বানানো হতো প্যাপিরাসের কাগজ। প্যাপিরাস যত ইচ্ছা লম্বা করা যেত।

প্রশ্ন-১৬. 'হায়ারোগ্লিফিক' বা মিসরীয় লিখন পদ্ধতি কী? ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯; রা. বো., ব. বো., চ. বো., কু. বো. ২০১৮; ঢাকা বোর্ড ২০১৭]*

উত্তর: মিসরীয়দের উদ্ভাবিত লিখন পদ্ধতি 'হায়ারোগ্লিফিক' নামে পরিচিত।

'হায়ারোগ্লিফিক' একটি গ্রিক শব্দ, যার অর্থ পবিত্র লিপি। 'হায়ারোগ্লিফিক' লিখন পদ্ধতিতে নানা প্রকার দ্রব্যের ছবি আঁকা থাকত। এ থেকে জিনিসগুলোর পরিচয় ও নাম জানা সম্ভব হতো। হায়ারোগ্লিফিক লিপি প্রথমে তৈজসপত্রে, ফলক এবং কবরে মৃতের পরিচয়ের ফলক আকারে গায়ে খোদাই করা হতো। পরে প্যাপিরাস কাগজ আবিষ্কৃত হলে, এতে এ লিপি উৎকীর্ণ করা হয়। প্রায় ৭৫০টি চিত্রলিপির চিহ্ন দিয়ে এ প্রাচীন মিসরীয় লিপি পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল। আর এসব চিত্রলিপিই হায়ারোগ্লিফিক নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-১৭. মিসরীয়দের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয় কেন?

উত্তর: স্থাপত্যশিল্পে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য মিসরীয়দের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়।

মিসরীয়দের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যিক নিদর্শন হলো তাদের তৈরি পিরামিড। তাদের নির্মিত পিরামিডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ফারাও খুফুর পিরামিড। এছাড়া পাথর কেটে প্রকাণ্ড সৌধ বানাতে তারা ছিল সিদ্ধহস্ত। তারা বড় বড় পাথর কেটে চমৎকার মূর্তি বানাত। স্ফিংকস, ইখনাটন ও রানি নেফারতিতির মূর্তি এগুলোর অন্যতম। এসব অসাধারণ স্থাপত্য নির্মাণের জন্যই মিসরীয়রা ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

প্রশ্ন-১৮. পিরামিড কী? বর্ণনা করো।

উত্তর: পিরামিড হলো মিসরীয়দের নির্মিত পাথরের তৈরি বিশাল ও ত্রিকোণাকার সমাধিসৌধ।

মিসরীয়দের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যিক নিদর্শন হলো পিরামিড। গ্রিক ভাষায় পিরামিড শব্দের অর্থ 'খুব উঁচু'। মিসরীয় রাজা-বাদশাদের মৃতদেহ মমি করে সংরক্ষণের জন্য পিরামিড তৈরি করা হয়েছিল। মূলত ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই এগুলো নির্মাণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৮০টির বেশি পিরামিডের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ৭০টির বেশি কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। পিরামিডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও উঁচু হলো নীলনদের মরুময় গিজা অঞ্চলে অবস্থিত বিখ্যাত ফারাও খুফুর পিরামিড।

প্রশ্ন-১৯. জ্ঞান-বিজ্ঞানে মিসরীয়দের অবদান ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন, ক্যালেন্ডার তৈরি, গণিতশাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মিসরীয়দের অবদান অপরিসীম।

মিসরীয়রা 'হায়ারোগ্লিফিক' নামে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে সভ্যতায় নতুন মাত্রা যোগ করে। প্রাচীন মিসরীয় কৃষকেরা দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশের জন্য গণনা পদ্ধতি থেকে গণিতশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটায়। তারা বর্ষপঞ্জিকা অর্থাৎ ক্যালেন্ডার তৈরি করেছিল এবং তারাই হিসেব করে বের করেছিল ৩৬৫ দিনে এক বছর। এ ছাড়া তারা বছরকে মাসে এবং মাসকে ৩০ দিনে ভাগ করেছিল। মিসরীয়রাই সর্বপ্রথম প্যাপিরাস নামে উন্নত মানের কাগজ আবিষ্কার করে। মিসরীয় সাহিত্য এদের ধর্ম ও দর্শনকে ভিত্তি করে লিখিত হওয়ায় তা সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে।

প্রশ্ন-২০. অর্ধচন্দ্রাকার উর্বর ভূমি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: অর্ধচন্দ্রাকার উর্বর ভূমি বলতে প্রাচীন মেসোপটেমীয় অঞ্চলকে বোঝায়।

'মেসোপটেমিয়া' একটি গ্রিক শব্দ, যার অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল মেসোপটেমিয়া নামে পরিচিত। এ অঞ্চলটি নদীকেন্দ্রিক হওয়ায় উর্বর ছিল। মূলত উর্বরতা ও অর্ধচন্দ্রের মতো আকৃতির কারণে আমেরিকান ভূগোলবিদ ব্রেসটেট (James Henry Breasted) এ অঞ্চলকে Fertile Crescent বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি উর্বর ভূমি বলে আখ্যায়িত করেন।

প্রশ্ন-২১. সুমেরীয় সভ্যতা সম্পর্কে কী জানো? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: মেসোপটেমীয় সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সভ্যতা হলো সুমেরীয় সভ্যতা।

কয়েকটি নগরকে কেন্দ্র করে সুমেরীয়রা সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে তাদের রাজধানী উর ছাড়াও উরুক, লারমা, ইরুদু, কিশ, লাগাম উল্লেখযোগ্য। সেচ ব্যবস্থার উদ্ভাবন, কাঠের লাঙ্গল, ধাতু নির্মিত কাস্তে, নিড়ানির ব্যবহার দ্বারা সুমেরীয়রা উন্নত কৃষি পদ্ধতি গড়ে তোলে। এছাড়া তারা ফিলিস্তিন, ভারত, এশিয়া মাইনর ও মিসরের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। কৃষি ও বাণিজ্য ছাড়াও বাড়িঘর নির্মাণ শিল্প, মাটির আসবাবপত্র তৈরি, নৌকা তৈরি ইত্যাদি পেশায়ও সুমেরীয়রা নিয়োজিত ছিল।

প্রশ্ন-২২. কিউনিফর্ম বলতে কী বোঝায়?

[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]

উত্তর: কিউনিফর্ম বা কীলকাকার বলতে সুমেরীয়দের উদ্ভাবিত লিখন পদ্ধতিকে বোঝায়।

প্রথম দিকে সুমেরীয় লিপি ছিল মিসরীয়দের মতো চিত্রলিপিভিত্তিক। পরবর্তীকালে নিজেদের লেখাকে গতিশীল করতে তারা নতুন লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে যা 'কিউনিফর্ম' (Cuneiform) বা কীলকাকার নামে পরিচিত। সুমেরীয়রা কাদামাটির প্লেটে খাগের কলম (Reed Pen) দিয়ে কৌণিক কিছু রেখা ফুটিয়ে তুলতো। খাঁজকাটা চিহ্নগুলো দেখতে অনেকটা তীরের মতো। কিউনিফর্মকে বলা হতো অক্ষরভিত্তিক চিত্রলিপি। এ লিপি বামদিক থেকে ডানদিকে লেখা হতো। সুমেরের বিখ্যাত শহর নিপ্পুরে সুমেরীয় এ কীলকাকার চিত্রলিপির প্রায় চার হাজার মাটির চাকতি পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন-২৩. সুমেরীয় আইনকে প্রতিশোধমূলক আইন বলা হয় কেন?

উত্তর: অপরাধের সমান শাস্তির বিধান থাকায় সুমেরীয় আইনকে প্রতিশোধমূলক আইন বলা হয়।

সুশৃঙ্খল ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য সুমেরীয়রা একটি আইনকাঠামো গড়ে তুলেছিল। সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গি (Dungi) এ আইন প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি নিজেকে 'পৃথিবীর চার অঞ্চলের নৃপতি' (King of the four regions of the earth) উপাধি দিয়ে সুমেরীয় জাতিকে একত্রিত করেন এবং স্থানীয় প্রচলিত আইনগুলোকে সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম একটি বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করেন। সুমেরীয় আইনের ধারা ছিল খুব কঠোর প্রকৃতির। যেমন: চোখের বদলে চোখ, হাতের বদলে হাত ইত্যাদি।

প্রশ্ন-২৪. রাজা হাম্মুরাবি বিখ্যাত কেন?

উত্তর: রাজা হাম্মুরাবি 'হাম্বুরাবি কোড' বা 'আইন সংহিতা' প্রণয়ন করে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন রাজা হাম্মুরাবি। তিনি সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গির রচিত আইন একটি কাঠামোতে সংকলন করেন। তার সংকলিত প্রতিশোধমূলক এ আইনে ২৮২টি ধারা ছিল। হাম্মুরাবির এই আইনে 'চোখের বদলে চোখ', 'দাঁতের বদলে দাঁত', 'মাথার বদলে মাথা' নেওয়ার মতো নিষ্ঠুর বিধান সন্নিবেশিত ছিল। তার এই আইন সংহিতা ইতিহাসে তাকে অমর ও বিখ্যাত করে রেখেছে।

প্রশ্ন-২৫. হিব্রু বা ইহুদি নামে পরিচিত কারা? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সভ্যতার জনগণ হিব্রু বা ইহুদি নামে পরিচিত।

হিব্রুদের আদিবাস ছিল আরব মরুভূমিতে। এরা প্রথমে সুমেরীয়দের অধীনে বসবাস শুরু করে। এরপর হিব্রু নেতা আব্রাহাম বা ইবরাহিম (আ) ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তার অনুসারীদের নিয়ে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় চলে যান। পরবর্তীকালে আব্রাহামের পুত্র জ্যাকব বা ইয়াকুব (আ) হিব্রুদের নিয়ে প্যালেস্টাইনের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন-২৬. প্যালেস্টাইন বা ইসরাইল রাষ্ট্রকে 'দুগ্ধ ও মধুর' দেশ নামে অভিহিত করা হয়েছে কেন?

উত্তর: প্যালেস্টাইন বা ইসরাইল রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির জন্য এটিকে 'দুগ্ধ ও মধুর' দেশ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্যালেস্টাইনের পার্শ্ববর্তী আরব দেশ ছিল উত্তপ্ত ও মরুময়। আরবের তুলনায় প্যালেস্টাইন ছিল খুবই সমৃদ্ধিশালী দেশ। এ কারণে আরবীয়দের কাছে প্যালেস্টাইন স্বর্গস্বরূপ মনে হতো বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। সম্ভবত এ কারণেই প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকে 'দুগ্ধ ও মধুর' দেশ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন-২৭. হিব্রুদের সাহিত্যিক বিকাশ কীরূপ ছিল?

উত্তর: হিব্রুদের সাহিত্যিক বিকাশ ছিল বেশ সমৃদ্ধ।

ইহুদিদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্টকে কেন্দ্র করেই হিব্রু সাহিত্য বিকশিত হয়েছিল। এ গ্রন্থে ইহুদি রাজতন্ত্রের ঘটনা, মহাকাব্যের বিভিন্ন দিক, বিচারকর্তা ও শাসকের নাটকীয় কাহিনি, নারীদের অবস্থান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া 'জবের পুস্তক' এবং রাজা ডেভিডের 'সলমসের পুস্তক' হিব্রুদের অন্যতম সাহিত্যিক নিদর্শন ছিল।

প্রশ্ন-২৮. হেলেনিস্টিক সভ্যতার অগ্রযাত্রায় কোন বিখ্যাত বীর অবদান রেখেছেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: হেলেনিস্টিক সভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিখ্যাত গ্রিক বীর আলেকজান্ডার অবদান রেখেছেন।

মহামতি আলেকজান্ডার হেলেনীয় সভ্যতার সাথে পূর্বাঞ্চলীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়ে এক নতুন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটান, যা 'হেলেনিস্টিক সভ্যতা' নামে পরিচিত। তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে (৩৩৩ খ্রি.পূ.) বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত হেলেনীয় সংঘের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি তিনি সাম্রাজ্যকে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে আসেন। নতুন নৌপথ আবিষ্কার করে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। হেলেনিস্টিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা, যেমন-গণিত, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি ব্যাপক উন্নতি লাভ করে।

প্রশ্ন-২৯. নগররাষ্ট্র এথেন্সে কীভাবে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে?

উত্তর: রাজতন্ত্রের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নগররাষ্ট্র এথেন্সে সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়।

এথেন্সে নগররাষ্ট্রের সূচনালগ্নে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ সময় কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। এরা হলেন— সালোন, সিপিস্ট্রেটস, ক্লিসথেনিস এবং পেরিক্লিস। তবে সংস্কার কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গতা দেন রাজা পেরিক্লিস। তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নানামুখী সংস্কার সাধন করে জনগণকে প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগের অংশ করে নিয়ে ইতিহাসে আনুষ্ঠানিকভাবে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু করেন।

প্রশ্ন-৩০. প্রাচীন গ্রিসে কীভাবে অলিম্পিক খেলার যাত্রা শুরু হয়েছিল?

উত্তর: রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রাচীন গ্রিসে অলিম্পিক খেলার যাত্রা শুরু হয়েছিল।

গ্রিক রাজনীতিবিদরা ৭৭৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে অলিম্পিক খেলা শুরু করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সব নগর রাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয় ঐক্যজোট তৈরি করা। প্রতি ৪ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এ খেলায় বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করত। ফলে এ খেলার সূত্র ধরে পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয়ে গ্রিকদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল। এভাবে প্রাচীন গ্রিসে অলিম্পিক খেলা শুরু হয়েছিল।

প্রশ্ন-৩১. নগররাষ্ট্র বলতে কী বোঝ?

উত্তর: নগররাষ্ট্র বলতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রকে বোঝায়, যা একটি শহর এবং এর ওপর নির্ভরশীল কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত।

নগররাষ্ট্র সাধারণত আয়তনে ছোট হয় এবং এর লোকসংখ্যা কম থাকে। ইতিহাসে রোম, এথেন্স, কার্থেজ এবং রেনেসাঁর সময় গঠিত ইটালিয়ান ছোট শহরগুলো ছিল নগররাষ্ট্র। আধুনিককালে লুক্সেমবার্গ, মোনাকো, ভ্যাটিকান সিটি, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নগররাষ্ট্র শব্দটি প্রযোজ্য।

প্রশ্ন-৩২. রোমান আইনের প্রকৃতি কীরূপ ছিল?

উত্তর: আইনের ক্ষেত্রে রোমান সভ্যতার বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে।

৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জপাতে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলিত হয়। এ আইনে মানুষের প্রতি সম-অধিকারের কথা বলা হয়েছে। অগাস্টাস সিজার ও তার উত্তরাধিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় রোমান আইনের তিনটি শাখা বিকাশ লাভ করে। এর মধ্যে বেসামরিক আইনগুলো মেনে চলতে নাগরিকরা বাধ্য ছিল। জনগণের আইন মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। আর প্রাকৃতিক আইনেও মানুষের সম-অধিকারের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ রোমান আইনে মানুষের অধিকার রক্ষার প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন-৩৩. দর্শন শাস্ত্রে রোমানদের অগ্রগতি কীরূপ ছিল?

উত্তর: রোমানদের দার্শনিক মতবাদ তৎকালীন বিশ্বে দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছিল।

রোমের সবচেয়ে জনপ্রিয় দার্শনিক মতবাদ হচ্ছে 'স্টোয়িকবাদ'। এ মতবাদের উন্নয়নে তিনজন ব্যক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদের একজন ছিলেন সম্পদশালী সিনেক। অন্য দুইজন হলেন দাস এপিকটেটাস এবং রোমান সম্রাট মার্কাস অরলিয়াস। তাদের দর্শনের মূলকথা হচ্ছে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সত্যবাদী হওয়ার মধ্য দিয়েই সুখ লাভ করা। তখন এ মতবাদ সমাজে বেশ সুখ্যাতি পেয়েছিল এবং অগ্রগতি লাভ করেছিল।

প্রশ্ন-৩৪. আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

[রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো. ২০১৭]

উত্তর: আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে প্রাক-ইসলামি আরবের অরাজক ও বিশৃঙ্খল সময়কে বোঝায়।

'আইয়ামে জাহেলিয়া' আরবি শব্দ। 'আইয়াম' অর্থ যুগ এবং 'জাহেলিয়া' অর্থ তমসা, অজ্ঞতা, বর্বরতা বা কুসংস্কার। মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভের আগের প্রায় একশ বছর সময়কে (৫১০-৬১০ খ্রি.) আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়। এ সময় আরবের মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার নৈতিকতা, সততা, দায়িত্বজ্ঞান ও শালীনতা ছিল না। অন্যায়-অনাচারে সমাজ নিমজ্জিত ছিল। এ জন্য এ সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকারের যুগ বলা হয়।

প্রশ্ন-৩৫. প্রাক-ইসলামি আরবের সামাজিক অবস্থা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল চরম হতাশাপূর্ণ।

প্রাক-ইসলামি আরবে মানুষ মুর্খতা, বর্বরতা ও প্রকৃতি পূজায় মগ্ন ছিল। সমাজে কৌলীন্য প্রথা বিরাজমান ছিল। ফলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে থাকত। এ যুগে অন্যায়-অনাচার, পাপাচার, সুরা পান, জুয়া খেলা, সুদপ্রথা মানুষের জীবনকে কলুষিত করেছিল। মানবতা ছিল ভূলুণ্ঠিত, সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না, লজ্জার কারণে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে তারা কুণ্ঠাবোধ করত না। নারী ছিল ভোগ্যপণ্য মাত্র। এ সমাজে দাস-দাসীদের পণ্যের মতো হাটে-বাজারে বিক্রি করা হতো। তাদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো। এ সমাজে নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ঘটেছিল।

প্রশ্ন-৩৬. জাহেলি যুগে কন্যাসন্তানকে কেন জীবন্ত কবর দেওয়া হতো?

উত্তর: জাহেলি যুগে নারীদের কোনো সামাজিক মূল্য ছিল না বলে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো।

জাহেলি যুগে আরব সমাজে সবচেয়ে জঘন্য প্রথা ছিল নবজাতক কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া। কারণ কন্যাসন্তানের জন্মকে তারা অভিশপ্ত ও লজ্জাকর মনে করত। কন্যার জন্ম সংবাদ দেওয়া হলে তাদের চেহারা লজ্জায় কালো হয়ে যেত। এটা তাদের কাছে ছিল এক চরম লজ্জার ব্যাপার। অনেক পিতা এ চরম লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য, আবার অনেকে দারিদ্র্যের ভয়ে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিত।

প্রশ্ন-৩৭. প্রাক-ইসলামি আরবে কীরূপ শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবে গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

প্রাক-ইসলামি আরবে কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ ছিল না। গোত্রীয় শাসনব্যবস্থাই ছিল মরুবাসী বেদুইনদের রাজনৈতিক জীবন এবং তাদের সামাজিক জীবনের রক্ষাকবজ। প্রত্যেক গোত্রে একজন করে দলপতি থাকত। তাকে শেখ বলা হতো। আর গোত্রের লোকেরা তাদের 'শেখ' বা গোত্রপতির প্রতি অনুগত থাকতেন। এছাড়া 'আল-মালা' বা মন্ত্রণাসভা নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন মক্কার বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করত।

প্রশ্ন-৩৮. আল-মালা কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক সংগঠনকে 'আল-মালা' বা মন্ত্রণাসভা বলা হয়।

মক্কার কুরাইশ গোত্রপতিদের সমন্বয়ে আরবদের মন্ত্রণাপরিষদ (মালা) গঠিত হতো। এ পরিষদ মক্কার বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করত। এর উদ্দেশ্য ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, গোত্রীয় ভারসাম্য রক্ষা করা এবং মৈত্রী ও সদ্ভাব কায়েম করা। এর বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল রিফাদাহ (তীর্থযাত্রীদের জন্য রসদ সরবরাহ), সিকায়াহ (তীর্থযাত্রীদের জন্য পানীয় সরবরাহ), হিজবা (তীর্থযাত্রীদের ছায়াদানের জন্য ঢেকে রাখার বিশেষ ব্যবস্থা) ও লিওয়া (যুদ্ধের সময় পতাকা বহন করা)। যে কক্ষে এ পরিষদের সভা বসত তাকে 'দারুল নাদওয়া' বলা হতো।

প্রশ্ন-৩৯. দারুন নাদওয়া বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: আল-মালা বা মন্ত্রণাসভার যে কক্ষে প্রাচীন আরবদের রাজনৈতিক সভা বসত তাই দারুন নাদওয়া নামে পরিচিত ছিল।

দারুন নাদওয়ায় বসে নগরের অভিজাতবর্গ যেকোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু মক্কা নগরী ও কাবাঘর বিষয়ক কার্যক্রম যেগুলোর সাথে সর্ব সাধারণের সংশ্লিষ্টতা ছিল, সেগুলোর জন্য সব নাগরিক কাবা প্রাঙ্গণে সাধারণ সভা করে সিদ্ধান্ত নিতেন। এ দারুন নাদওয়ায় বসেই কুরাইশ দলপতিরা রাসুলুল্লাহ (স)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে তিনি ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন।

প্রশ্ন-৪০. দিয়াত বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: ইসলামি আইনে আরবে প্রচলিত রক্তের বিনিময় প্রথা বা রক্তমূল্য পরিশোধের নীতিই দিয়াত নামে পরিচিত।

দিয়াত হলো শাস্তিস্বরূপ প্রদানকৃত ক্ষতিপূরণ। কোনো ব্যক্তি অন্য কারো দ্বারা শারীরিক ক্ষতি কিংবা হত্যার শিকার হলে কিসাসের বিকল্প হিসেবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ব্যক্তির পরিবারকে রক্তমূল্য প্রদান করা হতো। দিয়াত নির্ভর করত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মতামতের ওপর। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দাবি অনুযায়ী রক্তমূল্য পরিশোধ করে অপরাধী মুক্তি লাভ করত।

প্রশ্ন-৪১. 'আইয়াম আল আরব' বা আরবের দিন বলতে কী বোঝায়?

আইয়াম আল আরব বলতে প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে সংঘটিত গোত্রীয় সংঘর্ষকে বোঝায়।

ইসলামপূর্ব আরবে পানির নহর, গবাদি পশু, তৃণভূমির দখল, ঘোড়দৌড়ের মতো অতি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতো। এসব গোত্রীয় কলহকেই সাধারণত আইয়াম আল আরব বা আরবের দিন বলা হয়ে থাকে। এ যুগে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে বুয়াসের যুদ্ধ, বাসুসের যুদ্ধ, হারবুল ফুজারের যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন-৪২. কুসীদজীবী কারা? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবে যারা গরিব-অসহায়দের ঋণ দিয়ে চক্রবৃদ্ধিহারে তা আদায় করত তারাই কুসীদজীবী।

প্রাক-ইসলামি আরবে কুসীদ প্রথার প্রচলন ছিল। ইহুদিরা একচেটিয়া কুসীদ ব্যবসা করত। তারা তুলনামূলক গরিব-অসহায়দের ঋণ দিয়ে তা চক্রবৃদ্ধি হারে আদায় করত। কুসীদজীবীরা এত নিষ্ঠুর ছিল যে, ঋণ গ্রহণকারী অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে মহাজন ঋণ গ্রহণকারীর স্ত্রী অথবা সন্তান-সন্ততিকে জোরপূর্বক দাস-দাসী রূপে ব্যবহার বা বাজারে বিক্রি করত।

প্রশ্ন-৪৩. হানিফ সম্প্রদায় কারা? ব্যাখ্যা করো।

[সকল বোর্ড ২০২১; সকল বোর্ড ২০১৯]

উত্তর: আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে হযরত ইবরাহিম (আ)-এর প্রচারিত একেশ্বরবাদী ধর্মমতে (এক আল্লাহতে বিশ্বাস) যারা বিশ্বাস করতেন, তারাই হানিফ সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

আরব দেশ যখন কুসংস্কার ও অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন এক শ্রেণির লোক একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয় জীবনযাপন করতেন এবং কোনো প্রকার পূজায় অংশ নিতেন না। মূলত, তৎকালীন আরবের যে সম্প্রদায়টি পৌত্তলিকতা পরিহার করে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করত এবং পরলোক ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে জানত এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করত তাদেরকেই হানিফ সম্প্রদায় বলা হতো।

প্রশ্ন-৪৪. আরবের সংস্কৃতি চর্চার মূল প্রেরণা কী ছিল?

উত্তর: আরবের সংস্কৃতি চর্চার মূল প্রেরণা ছিল উকাজ মেলা।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনে উকাজ মেলার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। প্রতিবছর হজের মৌসুমে মক্কার উপকণ্ঠে অবস্থিত উকাজে এ মেলা বসত। এ মেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কাব্য প্রতিযোগিতা। কবিরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন। বিচারকদের রায়ে শ্রেষ্ঠ কবিকে পুরস্কার দেওয়া হতো। প্রতিযোগিতায় সেরা হিসেবে বিবেচিত সাতটি কবিতা সোনালি হরফে লিখে কাবাঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এরূপ সাতটি কবিতা একত্রে 'সাবায়ে মুয়াল্লাকাত' নামে পরিচিত। এগুলো প্রাচীন আরবি সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। উকাজ মেলায় আরবের গোত্রগুলো পরস্পরের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পেত। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি উকাজ মেলাকে 'Academic Franchise' বলে অভিহিত করেন।

প্রশ্ন-৪৫. উকাজ মেলা সম্পর্কে ধারণা দাও।

উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবে মক্কার কাছাকাছি উকাজ নামক স্থানে যে বার্ষিক মেলার আয়োজন করা হতো, তা-ই উকাজ মেলা নামে পরিচিত ছিল।

উকাজ মেলায় তৎকালীন আরবীয়দের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠত। এ মেলায় নানা দ্রব্য-সামগ্রীর কেনা-বেচা ছাড়াও কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। শ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতাকে পুরস্কৃত করা হতো এবং এগুলো সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ করে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো, যা 'সাবায়ে মুয়াল্লাকাত' নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ উকাজ মেলা প্রাক-ইসলামি আরবের সংস্কৃতি চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল।

প্রশ্ন-৪৬. সবায়ে মুয়াল্লাকাত বা 'সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা' বলতে কী বোঝ? *[ঢাকা বোর্ড ২০১৭]*

উত্তর: উকাজ মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতটি কবিতাকে সাবায়ে মুয়াল্লাকাত বা 'সপ্ত ঝুলন্ত' কবিতা বলা হতো।

প্রতি বছর মক্কার অদূরে উকাজের বার্ষিক মেলায় আরবের প্রখ্যাত কবিরা কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। উকাজের বাৎসরিক সাহিত্য সম্মেলনে সাতটি কবিতা পুরস্কৃত হতো। সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ করে এ কবিতাগুলো পবিত্র কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। এ কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু ছিল প্রেম, যুদ্ধবিগ্রহ, বীরত্বপূর্ণ কাহিনি, বংশ গৌরব, আরব সমাজের আতিথেয়তা, স্বাধীনতা ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৪৭. The Public Register of the Arabs বলতে কী বোঝায়? *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩]*

উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবে রচিত কবিতাগুলোকে The Public Register of the Arabs বলা হয়।

আরবি ভাষা জাহেলিয়া যুগেও খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। সে সময়ে আরবি কবিতাসমূহ উন্নত গঠনশৈলী অনুসারে রচিত হতো। আর প্রাক-ইসলামি আরবদের জীবনপ্রণালি জানার জন্য কাব্য ছাড়া অন্য কোনো উৎস ছিল না। কাব্যের মাধ্যমে আরবরা প্রেম, ভালোবাসা, গোত্রপ্রীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ আলোচনার মধ্য দিয়ে তাদের জীবনপ্রণালি সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ কারণে প্রাক-ইসলামি আরবের কবিতাগুলোকে The Public Register of the Arabs বলা হয়।

প্রশ্ন-৪৮. কাসিদা কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবে রচিত গীতিকাব্যগুলোকে কাসিদা বলা হতো।

প্রাক-ইসলামি আরবে সাহিত্যচর্চায় বিশেষ অগ্রগতি ছিল। নিজ বংশের গৌরবগাঁথা ও বিভিন্ন যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে রচিত হতো গীতিকাব্য। এসব গীতিকাব্য ছিল আরবদের সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের একমাত্র মাধ্যম। দিওয়াল-আল-হামাসা-আল মুফাজ্জালিয়াত, কিতাব আর আগানি প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাক-ইসলামি আরবে রচিত গীতিকাব্যগুলো সংকলিত আছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ কোনটি?
ক. আরব খ. কোরিয়া
গ. আফ্রিকা ঘ. জাপান

২. 'জাজিরাতুল আরব' অর্থ কী?
ক. আরব মালভূমি খ. আরব মরুভূমি
গ. আরব সংস্কৃতি ঘ. আরব উপদ্বীপ

৩. আরব উপদ্বীপের আরব নামকরণের কারণ কী?
ক. জলাবদ্ধতা খ. ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতা
গ. প্রাণীর উপস্থিতি ঘ. মরুময় বৈশিষ্ট্য

৪. আরব অঞ্চলে কোন ধরনের বায়ু প্রবাহিত হয়?
ক. লু হাওয়া খ. মৌসুমী বায়ু
গ. অয়ন বায়ু ঘ. খামসিন বায়ু

৫. আরবের প্রধান কৃষিপণ্য কী?
ক. ধান খ. পাট
গ. গম ঘ. খেজুর

৬. উটকে মরুভূমির জাহাজ বলার তাৎপর্য কী?
ক. উটের মাংস খুব সুস্বাদু ও উপাদেয়
খ. প্রাচীন আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান বাহন ছিল উট
গ. উট ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো
ঘ. বিভিন্ন জিনিস তৈরিতে উটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হতো

৭. মরু অঞ্চলের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জন্তু ছিল কোনটি?
ক. ঘোড়া খ. উট
গ. দুম্বা ঘ. মেষ

৮. বেদুইনদের গোত্রপ্রধানকে কী বলা হয়?
ক. শেখ খ. সম্রাট
গ. সুবেদার ঘ. রাজা

৯. বেদুইনদের কেন আসাবিয়াহ বলা হয়ে থাকে?
ক. তারা লুটতরাজ ও জিঘাংসামূলক কাজ করত
খ. তাদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি বিদ্যমান ছিল
গ. তারা পশুচারণ করত
ঘ. তারা যুদ্ধবাজ ছিল

১০. 'ইয়েমেন' শব্দের অর্থ কী?
ক. সুখী খ. বিত্তশালী
গ. সম্মানিত ঘ. ঐশ্বর্যশালী

১১. লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রধান কারণ কী?
ক. কলমের আবিষ্কার খ. কাগজের আবিষ্কার
গ. শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনে ঘ. হিসাব-নিকাশ রাখার জন্য

১২. কোন দেশকে নীল নদের দান বলা হয়?
ক. ইরাককে খ. মিসরকে
গ. ইরানকে ঘ. ইয়েমেনকে

১৩. ডুঙ্গি কে ছিলেন?
ক. মিসরীয় সম্রাট খ. সুমেরীয় সম্রাট
গ. ব্যাবিলনীয় সম্রাট ঘ. পারস্য সম্রাট

১৪. হাম্মুরাবি কোন সভ্যতার রাজা ছিলেন?
ক. ব্যাবিলনীয় খ. সুমেরীয়
গ. পারসিক ঘ. অ্যাসিরীয়

১৫. প্রথম নগররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে কারা?
ক. ব্যাবিলনীয়রা খ. মিসরীয়রা
গ. গ্রিকরা ঘ. রোমানরা

১৬. গ্রিক মহাকবি কে?
ক. হোমার খ. সক্রেটিস
গ. প্লেটো ঘ. এরিস্টটল

১৭. প্রথম গণতন্ত্রের ধারণা দেয় কারা?
ক. সুমেরীয়রা খ. মিসরীয়রা
গ. গ্রিকরা ঘ. রোমানরা

১৮. কোন কবিকে আরবদের শেকসপিয়র বলা হয়?
ক. আন তারা ইবন-শাদ্দাদ খ. লাবিদ ইবন-রাবিয়া
গ. আমর ইবন-কুলসুম ঘ. ইমরুল কায়েস

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৯. 'আইয়ামে জাহেলিয়া' বলতে বোঝায়—
i. অজ্ঞতার যুগ
ii. বর্বরতার যুগ
iii. অন্ধকারের যুগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে আরবদের কবিতার মূল বিষয়বস্তু ছিল—
i. নারী
ii. বংশ গৌরব
iii. যুদ্ধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২১ ও ২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কোরিয়া উপদ্বীপটির পূর্বে জাপান সাগর, পশ্চিমে কোরিয়া উপসাগর, দক্ষিণে পীত ও পূর্বে চীন সাগর অবস্থিত। এর উত্তরে চীনের চুংচান ও ফুসান রাজ্য অবস্থিত। এখানে উল্লেখযোগ্য কোনো মরুভূমি না থাকায় সমতল ভূমিতে প্রচুর শস্য জন্মে। এখানকার আবহাওয়া শুষ্ক নয়।

২১. কোরিয়ার সাথে আরব ভূ-খণ্ডের কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়?
ক. ভৌগোলিক অবস্থান খ. আবহাওয়া ও জলবায়ু
গ. জনজীবনে বিরূপ প্রভাব ঘ. মরুময়তা

২২. কোরিয়া উপদ্বীপটি আরবের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না, কারণ আরবে—
i. মরুভূমি রয়েছে
ii. এখানে সমতল ভূমির পরিমাণ বেশি
iii. এখানকার আবহাওয়া উষ্ণ ও শুষ্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৩ ও ২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
চীনা সভ্যতা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা। এটি মূলত কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। এখানকার প্রাচীন জনগোষ্ঠী হোয়াংহো নদীর দু'পাশের উর্বর এলাকাজুড়ে যব, গম, ধান ও নানা জাতের সবজি চাষ করত। তারা ব্যবহার করত পাথরের তৈরি চুড়ি ও নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। চীনারা খ্রিষ্টের জন্মের আগেই বারুদ আবিষ্কার করে। এছাড়া প্রথম শতকে তারা আবিষ্কার করে কাগজ। মানবসভ্যতায় তাদের অবদান অতুলনীয়।

২৩. চীনা সভ্যতার সাথে নিচের কোন সভ্যতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়?
ক. মিসরীয় খ. ক্যালিডীয়
গ. রোমান ঘ. গ্রিক

২৪. উদ্দীপকের সভ্যতার সাথে উক্ত সভ্যতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক হলো—
i. উভয়ই নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা
ii. উভয়ই ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল
iii. উভয় সভ্যতাই কাগজের আবিষ্কার করেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫. 'আরব' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. জলাশয় খ. জনপদ
গ. মরুভূমি ঘ. মালভূমি

২৬. আরব দেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
ক. এশিয়া খ. আফ্রিকা
গ. আমেরিকা ঘ. ইউরোপ

২৭. আরব দেশকে জাজিরাতুল আরব বলা হয় কেন? *[সকল বোর্ড ২০২১, ২০১৭]*
ক. এটি একটি দ্বীপ হওয়ার জন্য
খ. মরুভূমির জন্য
গ. তিন দিকে স্থল বেষ্টিত হওয়ার জন্য
ঘ. তিন দিকে জল বেষ্টিত হওয়ার জন্য

২৮. আরবের তিন দিকে কী? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক. জলরাশি খ. মরুভূমি
গ. পর্বতমালা ঘ. মালভূমি

২৯. ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. এক খ. দুই
গ. তিন ঘ. চার

৩০. কোন প্রাণীকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. উট খ. দুম্বা
গ. ঘোড়া ঘ. গাধা

৩১. নীল নদ কোন দেশে অবস্থিত? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. আরব খ. মিসর
গ. পারস্য ঘ. সিরিয়া

৩২. পিরামিড তৈরির মূল উদ্দেশ্য কী? *[সকল বোর্ড ২০১৯, ২০১৫]*
ক. রাজাদের সন্তুষ্টি খ. মমি সংরক্ষণ
গ. সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘ. দেবতাকে খুশি করা

৩৩. কোন রাজা সমগ্র মিসরকে একত্রিত করে একটি একক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক. হাম্মুরাবি খ. কনফুসিয়াস
গ. মেনেস ঘ. জরথুস্ট

৩৪. 'হায়ারোগ্লিফিক' কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. পর্বতমালা খ. মরুঝড়
গ. চিত্রশিল্প ঘ. লিখন পদ্ধতি

৩৫. আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
ক. গোঁড়ামির যুগ খ. প্রগতির যুগ
গ. কলির যুগ ঘ. অন্ধকারাচ্ছন্নতার যুগ

৩৬. কয়টি ঝুলন্ত কবিতাকে 'আস্-সাবউল মুয়াল্লাকাত' বলা হয়? *[সকল বোর্ড ২০২৩]*
ক. ৫টি খ. ৭টি
গ. ৯টি ঘ. ১১টি

৩৭. ইসলামপূর্ব আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
ক. আনতার খ. ইমরুল কায়েস
গ. যুহাইর বিন আবি সালমা ঘ. লাবিদ বিন রাবিয়া

৩৮. 'দার-আল-নাদওয়া' কী? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
ক. মন্ত্রণা প্রাসাদ খ. মন্ত্রণা সভা
গ. অভ্যর্থনা সভা
ঘ. কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ পরিষদ

৩৯. ইয়েমেনকে 'সুখী আরব' বলা হয়, কারণ— *[সকল বোর্ড ২০২১]*
i. উর্বর ভূমি হওয়ার কারণে
ii. ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার কারণে
iii. কৃষিকাজে বিখ্যাত হওয়ার কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪০. মিসরকে নীল নদের দান বলা হয়, কারণ— *[সকল বোর্ড ২০২১]*
i. এর তীরে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল
ii. এর মাধ্যমে কৃষিকাজে উন্নতি ঘটে
iii. নদীপথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪১. প্রাক-ইসলামি আরবে মক্কায় মালা গঠনের উদ্দেশ্য ছিল— *[সকল বোর্ড ২০২২*
i. গোত্রীয় ভারসাম্য রক্ষা করা
ii. শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম করা
iii. মক্কার প্রশাসন তদারক করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪২. প্রাক-ইসলামি সমাজকে কলুষিত করেছিল আরবদের— *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

i. ব্যভিচার
ii. কন্যা শিশুকে হত্যা
iii. শেখতন্ত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৩ ও ৪৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
পবিত্র আরব ভূখণ্ড হচ্ছে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। এটি তিনটি মহাদেশের মিলনস্থলে অবস্থিত। এদেশের মাটি পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা। তাই পবিত্র কুরআনে আরবের একটি নগরীকে উম্মুল কুরা বলা হয়েছে। *[সকল বোর্ড ২০২১]*

৪৩. উল্লিখিত 'উম্মুল কুরা' কোন নগরকে বলা হয়েছে?
ক. মদিনা খ. মক্কা
গ. ব্যাবিলন ঘ. ইস্তাম্বুল

৪৪. আরব ভূমি অবস্থিত—
i. ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের মিলনস্থলে
ii. আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের মিলনস্থলে
iii. আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের মিলনস্থলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রুক্ষ প্রকৃতিতে বেঁচে থাকা, ক্ষিপ্র গতিতে যাতায়াত, যুদ্ধ, অভিজাত জীবনযাপন প্রভৃতি আরব সমাজে নির্ভর করতো একটি প্রাণীর মালিকানার উপরে। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

৪৫. উদ্দীপকে যে প্রাণীটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো—
ক. উট খ. ঘোড়া
গ. গাধা ঘ. খচ্চর

৪৬. মানুষের জীবনে উক্ত প্রাণীর যে প্রভাব ছিল—
i. যুদ্ধজয়
ii. কৃষিকাজ
iii. যাতায়াত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৭ ও ৪৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজা বারেস নিজেকে দেবতার অবতার বলে প্রচার করেন এবং জনগণ যাতে তাকে অকুণ্ঠ সমর্থন দান করে সেজন্য তিনি নিজেকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা দেন। *[সকল বোর্ড ২০২৩]*

৪৭. কোন প্রাচীন সভ্যতার রাজা উদ্দীপকের মতো কর্মকাণ্ড করেছিলেন?
ক. মিসরীয় খ. সুমেরীয়
গ. হেলেনীয় ঘ. রোমান

৪৮. এ ধরনের ঘোষণায় জনমনে কীসের সঞ্চার হয়?
ক. শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা খ. ভয় ও সম্ভ্রম
গ. আনুগত্য ও আন্তরিকতা ঘ. দম্ভ ও অহংকার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৯ ও ৫০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
জেলা পরিষদে প্রতিনিধি পাঠানোর উদ্দেশ্যে গুয়াটন গ্রামের বয়স্ক লোকেরা একত্রে বসে এমন একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করলেন— যিনি বয়স, প্রজ্ঞা ও দৈহিক সৌন্দর্যে সব থেকে এগিয়ে ছিলেন। *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

৪৯. কোন প্রয়োজনে আরবের লোকেরা উদ্দীপকের মতো করে নেতা নির্বাচন করত?
ক. বাণিজ্য অভিযানে
খ. যুদ্ধাভিযানে
গ. গোত্র প্রধান নির্বাচনে
ঘ. উকাজ মেলা পরিচালনায়

৫০. উদ্দীপকের মতো নেতা নির্বাচনে আরবদের কোন চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটত?
ক. সহনশীলতা খ. গণতন্ত্রমনা
গ. স্বাধীনচেতা ঘ. মানবিকতা

উত্তরমালা

১	ক	২	ঘ	৩	ঘ	৪	ক	৫	ঘ	৬	খ	৭	খ	৮	ক	৯	খ	১০	ক	১১	খ	১২	খ
১৩	খ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	ক	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ঘ	২১	ক	২২	খ	২৩	ক	২৪	খ
২৫	গ	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ক	৩১	খ	৩২	খ	৩৩	গ	৩৪	ঘ	৩৫	ঘ	৩৬	খ
৩৭	খ	৩৮	খ	৩৯	ঘ	৪০	ঘ	৪১	ক	৪২	ক	৪৩	খ	৪৪	ক	৪৫	খ	৪৬	খ	৪৭	ক	৪৮	খ
৪৯	গ	৫০	খ																				

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো।
২. ভৌগোলিক দিক দিয়ে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? ভাগগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৩. আরব উপদ্বীপের আবহাওয়া ও জলবায়ুর বর্ণনা দাও।
৪. উট আরবদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে— ব্যাখ্যা করো।
৫. আরব-ই-আরিবাহ জাতির পরিচয় দাও।
৬. মরুবাসী যাযাবর বা বেদুইনদের পরিচয় দাও।
৭. গোত্রপ্রথা বেদুইনদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে? লেখো।
৮. বেদুইনদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং আতিথেয়তা ছিল উন্নত— ব্যাখ্যা করো।
৯. আসাবিয়া বা গোত্রীয় চেতনাই আরবদেরকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে— ব্যাখ্যা করো।
১০. নবোপলীয় বা প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্পর্কে ধারণা দাও।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নদীভাঙানের শিকার হয়ে একদল মানুষ ঘরবাড়ি, ফসলি জমি হারিয়ে নাখালপাড়ার বস্তিতে আশ্রয় নেয়। বাজারে মাল ওঠানামা, হোটেল কর্মচারী, পত্রিকা বিক্রি, ফুল বিক্রি, রিকশা-ভ্যান চালানো ইত্যাদি কাজ করে তারা অতি কষ্টে দিনযাপন করছিল। একদিন হঠাৎ উৎখাত হয়ে তারা শ্যামলির বস্তিতে আশ্রয় নেয়। শুরু হয় নতুন সংগ্রাম। এভাবে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তায় তাদের দিন কাটে।

[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩]

ক. কাকে 'শেখ' বলা হতো?
খ. উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনজীবনের সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের কোন জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের জনগোষ্ঠীর সাথে উক্ত জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো।

২. গোত্রের প্রতি অনিন্দ্য আকর্ষণই আফ্রিকার টুটসি জাতিগোষ্ঠীকে একই সূত্রে আবদ্ধ করেছে। এক নেতার অধীনতা মেনে নিয়ে তারা গোত্রীয় শাসন গড়ে তুলেছে। টুটসি জাতির লোকেরা গোত্রের প্রধান নেতার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করে। এমনকি অন্য গোত্রের কেউ নিজ গোত্রের লোকদের আক্রমণ করলে সবাই মিলে তা প্রতিহত করে। অন্য গোত্রের লোকদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণে তারা খুবই নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে। তবে জাতশত্রুর প্রতি তাদের আতিথেয়তা বিরল দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য বহন করে।

ক. 'Memphite Drama'— কোন সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন?
খ. কাসিদা কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. আফ্রিকার টুটসি জাতিগোষ্ঠীর সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের কোন জাতির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের জাতির মতো উক্ত জাতিও ছিল আতিথেয়তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারক— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৩. ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের আগে আর্যরা যাযাবর জাতি ছিল। পশুপালনের জন্য তারা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করত। পশুচারণের ভূমি দখল করতে তারা অনেক সময় নিষ্ঠুরতা ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিত। তবে তাদের সামাজিক জীবন ছিল পরিচ্ছন্ন। নারীদের তারা সম্মান দিত। নারীরা লেখাপড়া করা ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করত।

ক. আরব উপদ্বীপ এশিয়া মহাদেশের কোন দিকে অবস্থিত?
খ. আল-মালা কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের আর্য জাতির সাথে প্রাক-ইসলামি আরব অধিবাসীদের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত আর্যদের সামাজিক অবস্থা প্রাক-ইসলামি আরবের সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৪. গোমতী নদীর তীরবর্তী রাস্তা অনেক উঁচু এবং প্রশস্ত। এর কারণ হলো পূর্বে বর্ষাকালে গোমতী নদীতে পানি বেড়ে গিয়ে আশেপাশের এলাকায় প্লাবন সৃষ্টি করত। এতে চাষাবাদের সমস্যা হতো এবং ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যেত। অনেক সময় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করত। তাই সরকার নদীর তীরে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করে এলাকাবাসীর দুর্দশা লাঘব ও কৃষির উন্নয়নের ব্যবস্থা করেছে। কুমিল্লা শুধু কৃষির জন্যই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও বিখ্যাত। কুমিল্লার খাদি দেশে-বিদেশে পরিচিত। কুটির শিল্প, মৃৎ শিল্পসহ ছোট ছোট অনেক কলকারখানাও এখানে রয়েছে। *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*

ক. মিসরীয় লিখন পদ্ধতির নাম কী?
খ. প্যাপিরাস কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের গোমতী নদীর সাথে মিসরীয় সভ্যতার কোন নদীর সামঞ্জস্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সভ্যতার অবদান মূল্যায়ন করো।

৫. অথৈদের সমাজে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের ক্ষমতা নারীর জন্য সংরক্ষিত। পুরুষদের সুনির্দিষ্ট অধিকার থাকলেও তারা নিয়ন্ত্রিত হয় নারীদের দ্বারা। তারা কঠিনভাবে ধর্ম-কর্মে বিশ্বাসী। মৃত্যুর পরে যে জীবন আছে এবং সে জীবনে বেঁচে থাকা বা সুখ-শান্তিতে কাটানোর জন্য মৃতদেহের সাথে সমাধিতে তারা রসদাদি এমনকি ব্যবহার্য জিনিসপত্রও দিয়ে দিত।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২০]

ক. মিসরকে কীসের দেশ বলা হয়?
খ. মিসরকে নীল নদের দান বলার কারণ ব্যাখ্যা করো।
গ. অথৈদের পরিবারের সাথে প্রাচীন মিসরীয়দের পরিবারের সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের অথৈদের সমাজের মানুষের ধর্মচিন্তা প্রাচীন মিসরীয়দের ধর্মচিন্তার অনুরূপ ছিল কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো।

৬. সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতাগুলোর অন্যতম। এটি একটি নগরভিত্তিক সভ্যতা। এদের লিখন পদ্ধতি ছিল চিত্রভিত্তিক। সিন্ধু সভ্যতা নগরভিত্তিক হলেও তাদের ছিল উন্নত কৃষি ব্যবস্থা। যব, গম, তুলাসহ নানা রকম ফসল তারা উৎপন্ন করত। উন্নত ফসল উৎপাদনের জন্য তারা জমিতে বাঁধ দিত। বন্যার পানিকে সংরক্ষণ করে কাজে লাগাত। আবার নালা কেটে জলসেচের মাধ্যমে পানি এনে ফসলের মাঠে সরবরাহ করত। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১; সকল বোর্ড ২০১৫]*

ক. ইতিহাসের জনক কে?
খ. উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকের সিন্ধু সভ্যতার লিখন পদ্ধতির সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার লেখনীর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'সিন্ধু সভ্যতার কৃষি ব্যবস্থা মিশরীয় সভ্যতার কৃষি ব্যবস্থারই প্রতিচ্ছবি'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

৭. হোয়াংহো নদীর তীরে প্রাচীন চীনা সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। হোয়াংহোকে চীনের দুঃখ বলা হলেও এই নদী অধিবাসীদের জীবনে বিশাল ভূমিকা রাখে। সদ্য আবিষ্কৃত এক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে তাদের ধর্ম বিশ্বাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে একজন সম্রাটের কফিন পাথরের দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত করা আছে। কফিনের চারদিকে পাথরনির্মিত সশস্ত্র সৈন্যরা কঠোর পাহারায় নিয়োজিত। */ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; ঢা. বো. ২০১৭/*

ক. প্যাপিরাস কী?
খ. মিসরীয়দের চিত্র লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দাও।
গ. উদ্দীপকের হোয়াংহো নদীর ভূমিকার মতোই কি নীল নদ মিসরীয় সভ্যতায় ভূমিকা রেখেছিল? ব্যাখ্যা দাও।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মিসরের ফারাও সম্রাটদের সমাধি সংরক্ষণের বিবরণ দাও।

৮. ইরানের রেজা শাহ পাহলভী ইরানকে একটি আধুনিক সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর জোর দেন। তিনি কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন- জমি চাষের জন্য ট্রাক্টর আমদানি করেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাঁধ দেন, খাল খনন করেন, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার করেন। তিনি নাগরিক জীবনকে নিরাপদ করা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করেন এবং প্রয়োজনে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করেন।

[ঢা. বো., য. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩/

ক. কোন অঞ্চলে সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল?
খ. মেসোপটেমীয় অঞ্চলকে সভ্যতার লীলাভূমি বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষির উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থার সাথে সুমেরীয় সভ্যতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সুমেরীয় সভ্যতায় আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করো।

৯. মহামতি পিটার (শাসনকাল: ১৬৮২-১৭২৫) রাশিয়ার জারতন্ত্রের ইতিহাসে কালের এক অক্ষয় সাক্ষী হয়ে থাকবেন। একদিকে যেমন তিনি দিগ্বিজয়ে মাতিয়ে তুলেছিলেন রুশবাসীকে, অন্যদিকে বীরত্বের মহিমা চারদিকে ছড়িয়ে জারতন্ত্রকে একটি নিয়মতান্ত্রিক শাসনের পরিক্রমায় দাঁড় করিয়েছেন। তিনি যে নতুন পরিক্রমার সূচনা করেছেন, সেখানে নবজোয়ারের সৃষ্টি হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি দর্শন ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেও অবদান রেখেছেন।

ক. রোমান সভ্যতায় বিজ্ঞান বিষয়ে কে বিশ্বকোষ রচনা করেছিলেন?
খ. হেলেনিস্টিক সভ্যতা কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. জার পিটারের সাথে গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের শাসকের মতো গ্রিক বীর আলেকজান্ডারও জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য অবদান রেখেছিলেন— বিশ্লেষণ করো।

১০. মুঘল সম্রাট নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১২টি ধারা সংবলিত 'দস্তরুল আমল' নামে একটি ডিক্রি জারি করেন, যা ইতিহাসে Code of Jahangir নামে অভিহিত। এ ডিক্রিতে তিনি মানুষের প্রতি সমানাধিকার, দুর্বল, বিধবা ও এতিমের অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি এ আইন পালনে নাগরিকদের জন্য প্রতিবিধান জারি করেন। ডিক্রি জারি ছাড়াও সম্রাট জাহাঙ্গীর বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ভাস্কর্যের বিকাশ এবং দর্শন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

ক. 'প্রমিথুয়াস বাউন্ড' নাটকটি কার লেখা?
খ. প্রাচীন গ্রিসে কীভাবে অলিম্পিক খেলার সূত্রপাত হয়েছিল?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ডিক্রির সাথে তোমার পঠিত রোমান আইনের সাদৃশ্য দেখাও।
ঘ. 'তুমি কি মনে কর সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যের মতো রোমান সভ্যতায়ও বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ভাস্কর্যে ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল? মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

১১. রাশিদা বেগম 'বাংলাদেশ নারী অধিকার' নামক সংগঠনের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশে এমন একটি সময় ছিল যখন কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। একজন পুরুষ একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখতে পারত। তাদের কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল না। তারা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত। এসব সংঘর্ষ 'ভারতীয়দের দিন' নামে পরিচিত। তারা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে বিশ্বাসী ছিল।

[ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২/

ক. 'ইয়েমেন' শব্দের অর্থ কী?
খ. উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে রাশিদা বেগমের বক্তব্যে কোন সমাজের নারীর অবস্থা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত যুগের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করো।

১২. ফরাসি বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে অভিজাত ও নিম্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। অভিজাত শ্রেণি সমাজের সভ্য লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার-আচরণেও শ্রেষ্ঠ ছিল। তবে নিম্ন শ্রেণির লোকেরা সমাজের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতো। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতিতে সমাজ পরিচালিত হতো। সমাজে যা কিছু সিদ্ধান্ত হতো তা কোনো না কোনো নেতা গ্রহণ করতেন।

ক. প্রাচীন আরবের গোত্রপ্রধানকে কী বলা হতো?
খ. দারুন নাদওয়া বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ফ্রান্সের সামাজিক বৈষম্যের সাথে প্রাক-ইসলামি আরব সমাজের কোন বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ? বর্ণনা দাও।
ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লেখিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক অবস্থারই প্রতিচ্ছবি মাত্র'— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

১৩. আফগানিস্তান মধ্য এশিয়ার যুদ্ধকবলিত একটি দেশ। এদেশটি বিভিন্ন উপজাতি সমন্বয়ে গঠিত। উপজাতি গোত্রগুলোর মধ্যে গিলজাই, মুহাম্মদ, সাদোজাই প্রভৃতি খুব প্রভাবশালী। উপজাতিগুলো নিজ গোত্রের স্বাধীনতা, সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে যতটা আন্তরিক, অন্য গোত্রের প্রতি ততটা শত্রুভাবাপন্ন। তারা জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে গোত্রীয় স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। গোত্রীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হয়। একবার সংঘর্ষ শুরু হলে তা গৃহযুদ্ধে রূপ নেয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। *[সি. বো., ব. বো. ২০২১]*

ক. হায়ারোগ্লিফিক কী?
খ. হানিফ সম্প্রদায় কারা? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে ইসলামপূর্ব আরবের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত যুগের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করো।

১৪. জাভা দ্বীপে তখন কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। অধিবাসীরা রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করে বসবাস করত। নিজেদের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচন করে তারা পরিষদে পাঠাত। আর এভাবে সমাজের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত পরিষদ দ্বীপের প্রধান শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা দেখভাল করত। দ্বীপবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো ছিল না। কষ্টসাধ্য কিছু পেশার বাইরে অধিবাসীদের আয়ের উৎস ছিল সীমিত। বছরের নির্দিষ্ট একটি সময়ে দ্বীপের সৌন্দর্য দর্শনে আসা বাইরের দেশের পর্যটকদের ঘিরে কিছু মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করত। *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]*

ক. 'আস-সাবউল মুয়াল্লাকাত' কী? ১
খ. 'বেদুইন' কারা? ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. উদ্দীপকের জাভা দ্বীপের পরিষদ গঠনের সাথে প্রাক-ইসলামি মক্কার শাসন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জাভাবাসীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আলোকে আরবদের অর্থনৈতিক অবস্থা মূল্যায়ন করো। ৪

১৫. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি বই মেলার আয়োজন করে। উক্ত মেলায় বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকদের লেখা নতুন নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ছোট ছোট শিশু-কিশোর ও কবি সাহিত্যিকরা বিভিন্ন কবিতা, সাহিত্য আবৃত্তি করেন। ঐখানে সর্বস্তরের জনতার ঢল নামে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিকদেরকে অমর একুশে পদক বা পুরস্কার প্রদান করেন। *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*

ক. প্রাক-ইসলামি আরবের একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের নাম কী?
খ. কিউনিফর্ম বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে কবি-সাহিত্যিকদের পুরস্কার প্রাক-ইসলামি যুগের কোন পুরস্কারের অনুরূপ? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের মেলায় প্রাক-ইসলামি যুগের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পূর্ণ প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

১৬. রসুলপুর স্কুলে প্রতিবছর সাহিত্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্বরচিত কবিতা, গল্প, ছড়া, প্রবন্ধ পাঠ করে। বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত লেখকগণকে পুরস্কার দেওয়া হয় এবং তাদের লেখনীসমূহ সুন্দর হস্তাক্ষরে দেয়াল পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর উক্ত দেয়াল পত্রিকা স্কুলের লাইব্রেরিতে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহিত হয়। এতে অনেক কবি- সাহিত্যিকের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। *[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*

ক. প্রাচীন আরবে গোত্র প্রধানদের কী বলা হতো?
খ. 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের সাহিত্য মেলার সাথে প্রাচীন আরবের কোন মেলার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সাহিত্য চর্চায় উক্ত মেলার অবদান নিরূপণ করো।

১৭. স্পেনের রাজা ফার্দিনান্ডের শাসনামলে স্পেনীয় সমাজে মহাজন শ্রেণির ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। তারা নিম্ন শ্রেণির মানুষদের চড়া সুদের বিনিময়ে ঋণ দান করত। কোথাও কোথাও চক্রবৃদ্ধি হারেও সুদ প্রথা প্রচলিত ছিল। সুদ পরিশোধ করতে না পারলে মহাজনেরা খাতকের জমি-জমা বা বসতবাড়ি পর্যন্ত ক্রোক করত। এছাড়া উক্ত শাসনামলে মানুষ নিজ ধর্ম পালনে নানা জড়বাদিতা বা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করত। আর ইহুদি সম্প্রদায় মূর্তি পূজা এবং খ্রিষ্টানরা ত্রিত্ববাদিতায় নিমগ্ন ছিল। তবে এ সময় কিছু লোক একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল।

ক. ডুজ্জা কে ছিলেন?
খ. রাজা হাম্মুরাবি বিখ্যাত কেন?
গ. উদ্দীপকের সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের অর্থনৈতিক অবস্থার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মীয় অবস্থা উক্ত সময়ের ধর্মীয় অবস্থার কথাই মনে করিয়ে দেয়— বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

২

হযরত মুহাম্মদ (স)

Prophet Muhammad (Sm)

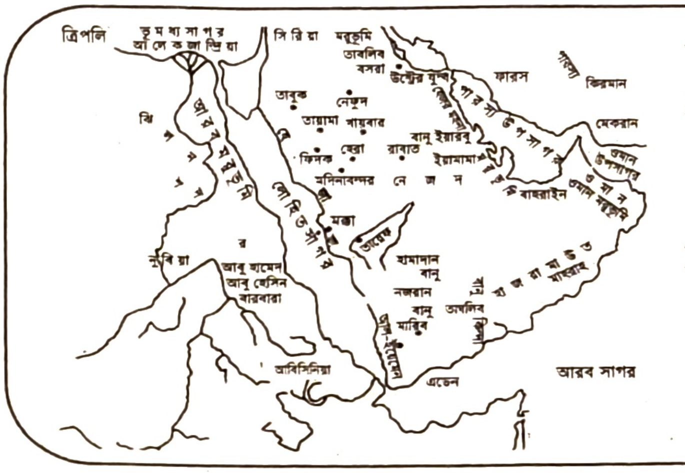
ত্রিপলি
ভূমধ্যসাগর
আলেকজান্দ্রিয়া
সিরিয়া
মরুভূমি
তাবলিব
বসরা
ফারস
পারস্য উপসাগর
কিরমান
তাবুক
তায়ামা
খায়বার
বানু ইয়ারবু
ইয়ামামা
মেকরান
ওমান উপসাগর
ফিদক
রাবাত
মদিনাবন্দর
নেজদ
লোহিত সাগর
মক্কা
তায়েফ
বাহরাইন
ওমান মরুভূমি
নুবিয়া
আবু হামেদ
বারবারা
হামাদান
বানু
নজরান
মারিব
আবিসিনিয়া
এডেন
আরব সাগর

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময় আরবদেশ

প্রধান প্রধান শব্দ

- কুরাইশ
- হিলফুল ফুজুল
- হাজরে আসওয়াদ
- নবুয়ত
- ইসলাম
- মেরাজ
- হিজরত
- আনসার
- মদিনা সনদ
- খন্দক
- বায়াতুর রিদওয়ান
- আমুল হুজুন

হযরত মুহাম্মদ (স) [৫৭০-৬৩২ খ্রি.] ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, মানবজাতির মুক্তির দূত। অধঃপতিত আরব সমাজে শান্তি ও কল্যাণের ধারা নিয়ে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে আবির্ভূত হন সর্বকালের সেরা আদর্শ, সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান এবং তাদেরকে কুফর, শিরক, জাহেলিয়াতের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে তাওহিদভিত্তিক আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ মহান কাজটি করতে গিয়ে তাঁকে প্রতিনিয়ত নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামকে একমাত্র শান্তির ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর এ সংগ্রামী জীবনের নানা ঘটনা, যেমন— হিলফুল ফুজুল গঠন, হাজরে আসওয়াদ স্থাপন, হিজরত, মদিনা সনদ প্রণয়ন, বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ, হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর, মক্কা বিজয় ও বিদায় হজের ভাষণে রয়েছে মুসলমানদের জন্য সুমহান শিক্ষা।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাল্যজীবন, মক্কাজীবন ও নবুয়তপ্রাপ্তি হিজরতের কারণ ও গুরুত্ব
- মদিনা সনদ ও মদিনায় আদর্শ রাষ্ট্র গঠন
- মহানবি (স)-এর সময়ের বিভিন্ন যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল
- হুদায়বিয়ার সন্ধির পটভূমি, শর্তাবলি ও তাৎপর্য
- মক্কা বিজয়ের ঘটনা ও এর শিক্ষা
- বিদায় হজের ভাষণের উদার ও মানবতাবাদী চেতনা
- মহানবি (স)-এর সংস্কারসমূহ
- মহানবি (স)-এর চারিত্রিক গুণাবলি এবং ইসলামি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	মুহাম্মদ (স)-এর বাল্য ও মক্কাজীবন (৫৭০-৬২২ খ্রি.)
পাঠ ২	মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত লাভ (৬১০ খ্রি.) এবং মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরত (৬১৫ খ্রি.)
পাঠ ৩ ও ৪	মুহাম্মদ (স)-এর মদিনায় হিজরত, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং মদিনা জীবন (৬২২-৬৩২ খ্রি.)
পাঠ ৫ ও ৬	হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদিনা সনদ ও এর গুরুত্ব (৬২২ খ্রি.)
পাঠ ৭ ও ৮	বদরের যুদ্ধ (১৩ মার্চ, ৬২৪ খ্রি.): কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
পাঠ ৯ ও ১০	উহুদের যুদ্ধ (২১ মার্চ, ৬২৫ খ্রি.): কারণ ও ঘটনা
পাঠ ১১	উহুদের যুদ্ধের ফলাফল ও মুসলমানদের পরাজয়ের কারণসমূহ
পাঠ ১২ ও ১৩	খন্দকের যুদ্ধ (মার্চ ও এপ্রিল, ৬২৭ খ্রি.): কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
পাঠ ১৪	মুহাম্মদ (স)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক
পাঠ ১৫ ও ১৬	হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬২৮ খ্রি.) ও এর গুরুত্ব
পাঠ ১৭	মক্কা বিজয় (৬৩০ খ্রি.) এবং এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য
পাঠ ১৮	মক্কা বিজয় পরবর্তী অভিযানসমূহ
পাঠ ১৯	বিদায় হজ (৬৩২ খ্রি.)
পাঠ ২০ ও ২১	হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার
পাঠ ২২ ও ২৩	হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার
পাঠ ২৪	হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চারিত্রিক গুণাবলি
পাঠ ২৫	ইসলামি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ

পাঠ ১

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাল্য ও মক্কা জীবন (৫৭০-৬২২ খ্রি.)

Boyhood and the Life at Makkah of Hazrat Muhammad (Sm) (570-622 AD)

জন্ম ও পরিচয়

মানবকুলের শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট (১২ রবিউল আউয়াল) সোমবার সকালে মা আমিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ)-এর বংশধরেরা আরবে 'কুরাইশ' নামে পরিচিত। কুরাইশ শব্দের অর্থ বণিক বা সওদাগর। ইসমাইল (আ)-এর বংশধর ফিহর ব্যবসা করে প্রচুর বিত্ত-বৈভব ও খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন বলে আরবরা তাকে 'কুরাইশ' বলে অভিহিত করে। এজন্য তাঁর বংশধরেরা কুরাইশ নামে পরিচিতি লাভ করে। এই কুরাইশ বংশের আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহর সাথে মদিনার বনি জোহরা গোত্রের প্রধান আবদুল ওহাবের কন্যা বিবি আমেনার বিয়ে হয়। কিছুদিন পর আব্দুল্লাহ গর্ভবতী আমিনাকে রেখে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে সিরিয়া যান এবং ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে মাত্র ২৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। অর্থাৎ মুহাম্মদ (স) জন্মের আগেই তাঁর বাবাকে হারান। মুহাম্মদ (স) ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব পিতৃহীন এ বালকের নাম রাখেন 'মুহাম্মদ' এবং মা রাখেন 'আহম্মদ'। মুহম্মদ অর্থ উচ্চ প্রশংসিত আর আহম্মদ অর্থ সর্বাধিক প্রশংসাকারী।

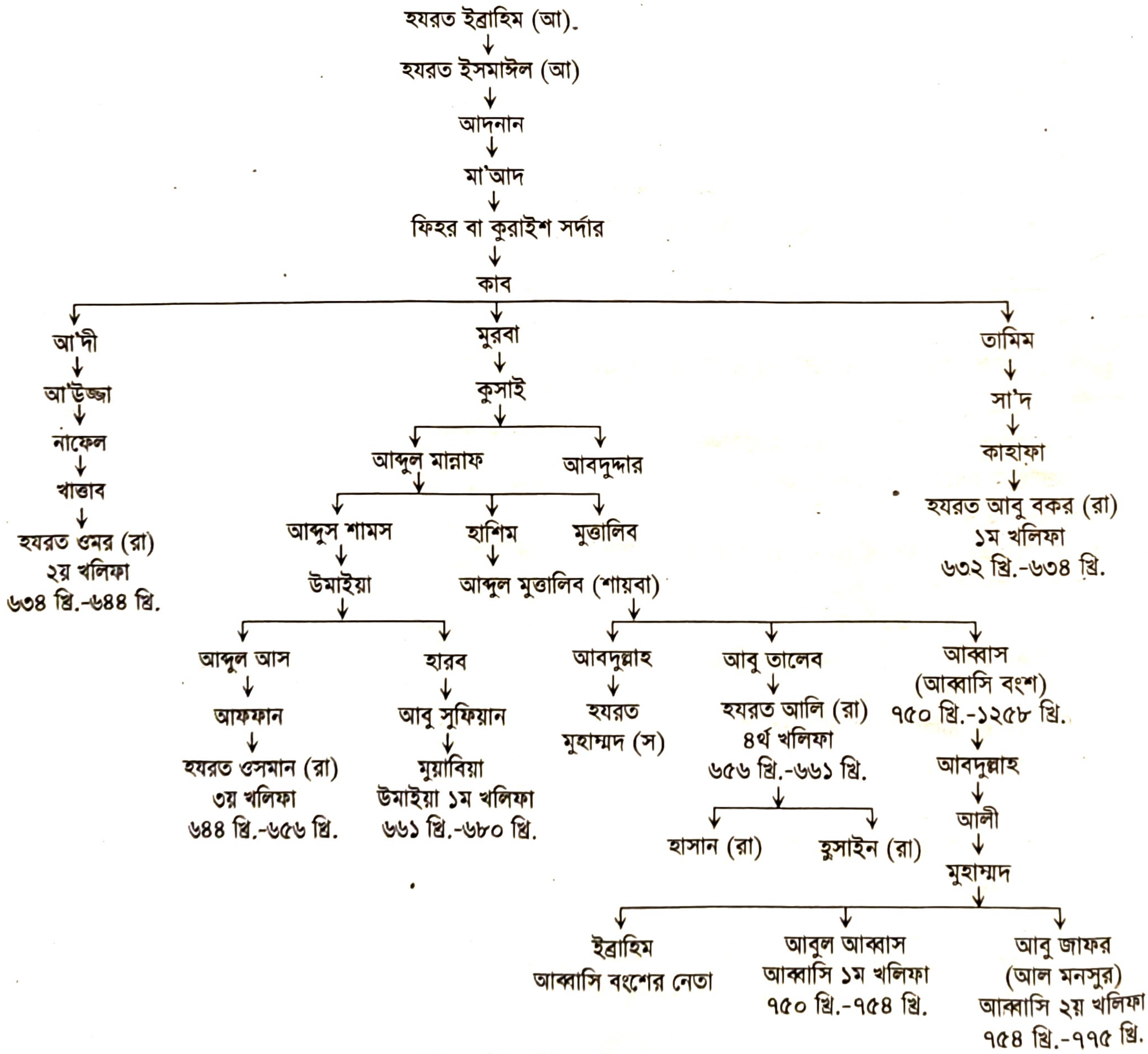

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বংশ তালিকা

হযরত ইব্রাহিম (আ)
হযরত ইসমাঈল (আ)
আদনান
মা'আদ
ফিহর বা কুরাইশ সর্দার
কাব
আ'দী
মুরবা
তামিম
আ'উজ্জা
কুসাই
সা'দ
নাফেল
আব্দুল মান্নাফ
আবদুদ্দার
কাহাফা
খাত্তাব
আব্দুস শামস
হাশিম
মুত্তালিব
হযরত আবু বকর (রা)
১ম খলিফা
৬৩২ খ্রি.-৬৩৪ খ্রি.
হযরত ওমর (রা)
২য় খলিফা
৬৩৪ খ্রি.-৬৪৪ খ্রি.
উমাইয়া
আব্দুল মুত্তালিব (শায়বা)
আব্দুল আস
হারব
আবদুল্লাহ
আবু তালেব
আব্বাস
(আব্বাসি বংশ)
৭৫০ খ্রি.-১২৫৮ খ্রি.
আফফান
আবু সুফিয়ান
হযরত
মুহাম্মদ (স)
হযরত আলি (রা)
৪র্থ খলিফা
৬৫৬ খ্রি.-৬৬১ খ্রি.
আবদুল্লাহ
হযরত ওসমান (রা)
৩য় খলিফা
৬৪৪ খ্রি.-৬৫৬ খ্রি.
মুয়াবিয়া
উমাইয়া ১ম খলিফা
৬৬১ খ্রি.-৬৮০ খ্রি.
হাসান (রা)
হুসাইন (রা)
আলী
মুহাম্মদ
ইব্রাহিম
আব্বাসি বংশের নেতা
আবুল আব্বাস
আব্বাসি ১ম খলিফা
৭৫০ খ্রি.-৭৫৪ খ্রি.
আবু জাফর
(আল মনসুর)
আব্বাসি ২য় খলিফা
৭৫৪ খ্রি.-৭৭৫ খ্রি.

সূত্র: *ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা*

ধাত্রী হালিমার তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর বক্ষ বিদারণ: তৎকালীন আরবের প্রথানুযায়ী মাত্র এক সপ্তাহ মা আমিনার দুধ পান করার পর মুহাম্মদ (স) কয়েকদিন আবু লাহাবের দাসী সোয়েবার দুধ পান করেন। এরপর তাঁকে লালন-পালনের জন্য তায়েফের বনু সাদ গোত্রের আবু খাবসার স্ত্রী বিবি হালিমার কাছে পাঠানো হয়। পাঁচ বছর তিনি ধাত্রীমাতা হালিমার কাছে ছিলেন। এ সময় তাঁর জীবনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। একদিন মাঠে মেষ চরানোর সময় দুজন ফেরেশতা এসে মুহাম্মদ (স)-এর বক্ষ বিদীর্ণ করে অন্তরাত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দেন।[১] বনু সাদ গোত্রে অবস্থানকালে তিনি বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলতে শেখেন।

মাতা ও পিতামহের মৃত্যু: ছয় বছর বয়সে মুহাম্মদ (স)-কে হালিমার কাছ থেকে তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা হয়। মা আমিনা পুত্র মুহাম্মদ ও দাসী আয়মনকে নিয়ে স্বামীর কবর জিয়ারত ও আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে মদিনায় যান। ফেরার পথে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আবওয়া নামক স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মা আমিনার মৃত্যুর পর শিশু মুহাম্মদের দেখাশোনার দায়িত্ব নেন দাদা আবদুল মুত্তালিব (শায়বা)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনিও ৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। এভাবে মুসলিম জাতির দিশারি মহানবি (স) মাতা-পিতা ও দাদার স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হন।

আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে মুহাম্মদ (স): দাদার মৃত্যুর পর এতিম মুহাম্মদ (স)-এর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন চাচা আবু তালিব। তিনি বালক মুহাম্মদ (স)-কে নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করেন। ৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে ১২ বছর বয়সে তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া যান। সিরিয়ার বাজারে 'বাহিরা' নামে একজন খ্রিষ্টান পাদ্রি মুহাম্মদ (স)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে তাঁকে ইঞ্জিলে বর্ণিত নবি হিসেবে আখ্যাত করেন।

আল-আমিন উপাধি লাভ: বাল্যকাল থেকেই মুহাম্মদ (স) সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কোমল স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য মক্কার সবাই তাঁকে পছন্দ করত ও ভালোবাসত। সত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা, আমানতের বিশ্বস্ত রক্ষাকারী, সরলতা ও পবিত্রতার জন্য মক্কার মানুষ তাঁকে 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী নামে অভিহিত করে।

হারবুল ফিজার ও হিলফুল ফুজুল গঠন: মক্কার অদূরে আয়োজিত উকাজ মেলার ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা ও কবিতা প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র জিলকদ মাসে কুরাইশ ও কায়েস গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। পবিত্র জিলকদ মাসে এ যুদ্ধ শুরু হওয়ায় একে 'হারবুল ফিজার' বা অন্যায় সমর বলা হয়। পাঁচ বছর ধরে চলা এ যুদ্ধের ভয়াবহতা বালক মুহাম্মদের মনে গভীর রেখাপাত করে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে সমমনা কয়েকজন উৎসাহী যুবক ও পিতৃব্য যুবায়েরকে নিয়ে 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘের সদস্য ফজল, ফাজেল, ফাজায়েল ও মোফাজ্জলের নামানুসারে এর নামকরণ হয় হিলফুল ফুজুল। এ সংঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল– ক. দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, খ. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করা, গ. অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া ও অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করা, ঘ. দুর্বল, অসহায় ও এতিমদের সাহায্য করা, ঙ. বিদেশি বণিকদের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "এই ফুজুল সংঘ দুর্বল ও মজলুম মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করেছিল এবং প্রথম বর্ষেই এটির তৎপরতায় ভীতি প্রদর্শন বন্ধ, ক্ষমতাশালীদের আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন দমন এবং সহায়হীনের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার বিধানে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।"[২]

বিবি খাদিজার সাথে বিবাহ

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এবং রাসুল (স)-এর সহধর্মিণী খাদিজাতুল কোবরা আরবের একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি হস্তী বর্ষের (৫৭০ খ্রি.) ১৫ বছর আগে অর্থাৎ নবির জন্মের ১৫ বছর আগে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ এবং মাতা ফাতিমা বিনতে জায়িদ। ইসলাম গ্রহণের আগেই নিষ্কলুষ চরিত্রের জন্য খাদিজা 'তাহিরা' (পবিত্র) উপাধি লাভ করেন। তিনি 'খাদিজাতুল তাহিরা' নামেও পরিচিত ছিলেন। বিত্তশালী নারী বিবি খাদিজা মুহাম্মদ (স)-এর সততা ও সত্যবাদিতার কথা শুনে তাকে ব্যবসায় তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন। পরে মুহাম্মদ (স)-এর কর্মদক্ষতা এবং গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে ৪০ বছর বয়স্ক বিবি খাদিজা ২৫ বছর বয়স্ক যুবক মুহাম্মদ (স) কে বিবাহের প্রস্তাব দেন। চাচা আবু তালিবের সম্মতিক্রমে মুহাম্মদ (স) ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে খাদিজাকে বিবাহ করেন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "এ বিবাহ তাঁর জন্য

---

[১] W. M. Watt, *Muhammad at Mecca*, pp. 34-38

[২] *The Spirit of Islam*, p. 77

বয়ে এনেছিল শান্তি ও প্রাত্যহিক পরিশ্রম থেকে মুক্তি, যা তাঁর মহান কাজে তাঁর মনকে প্রস্তুত করার জন্য অপরিহার্য ছিল।"[৩] খাদিজার গর্ভে কাসিম, আব্দুল্লাহ (তৈয়ব) ও তাহির নামে তিন পুত্র এবং রোকাইয়া, জয়নাব, কুলসুম এবং ফাতিমা নামে চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বিবি খাদিজার সহযোগিতা ও সহানুভূতি মুহাম্মদ (স)-এর চিন্তাধারাকে আরও বিকশিত করেছিল। স্বামী হিসেবে মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রতি খুব আন্তরিক ছিলেন। ঐতিহাসিক হিট্টির ভাষায়, "যত দিন এ প্রবল ব্যক্তিত্বশালী ও মহান চরিত্রের অধিকারী নারী জীবিত ছিলেন, তত দিন মুহাম্মদ (স)-এর অন্য কোনো স্ত্রীর প্রয়োজন হয়নি।"[৪] নবুয়তের দশম বছরে (৬১৯ খ্রি.) ৬৫ বছর বয়সে এ মহীয়সী নারী পরলোক গমন করেন।

হাজরে আসওয়াদ স্থাপন

৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় বন্যা হলে কাবাগৃহের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় এর শ্রীহানি ঘটে। ফলে কাবাগৃহ সংস্কার করা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে কাবার সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়। কুরাইশরা মক্কার চারটি গোত্রের কাছে কাবার কাজ ভাগ করে দেয়। কিন্তু কাবার সংস্কার শেষে হাজরে আসওয়াদ পাথর স্থাপনকে কেন্দ্র করে গোত্রগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দেয়। প্রত্যেক গোত্রই পবিত্র পাথরটি স্থাপন করে পুণ্য অর্জন করতে চেয়েছিল। কারণ এ পাথরটি ছিল পবিত্র কাবার দেয়ালে স্থাপিত একটি পবিত্র জান্নাতি পাথর, যা হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর সময় থেকে পৃথিবীতে রয়েছে। জাহেলিয়া যুগেও বিধর্মীদের কাছে এটি পবিত্র পাথর বলে গণ্য হতো। কাবার দেয়ালে এ পাথর পুনঃসংস্থাপন সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসায় সিদ্ধান্ত হলো পরদিন সকাল বেলা যে ব্যক্তি সবার আগে কাবায় আসবে, তিনি এ সমস্যার সমাধান দেবেন। পরদিন সকালে মুহাম্মদ (স) কে প্রথমে উপস্থিত হতে দেখা গেল। মুহাম্মদ (স) বিচক্ষণতার সাথে এ সমস্যার সমাধান করেন। তিনি নিজের গায়ের চাদর খুলে এর ওপর হাজরে আসওয়াদ পাথরটি রেখে চার গোত্রের অধিপতিদের দিয়ে বহন করিয়ে নেন এবং নিজে পাথরটি স্থাপন করে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের হাত থেকে মক্কাবাসীকে রক্ষা করেন।

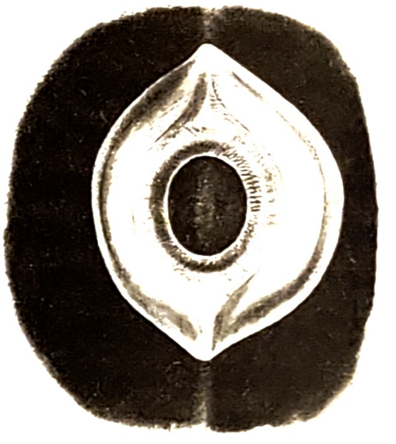
হাজরে আসওয়াদ

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
২. হযরত মুহাম্মদ (স) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?
৩. 'কুরাইশ' শব্দের অর্থ কী?
৪. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে হিলফুল ফুজুল শান্তিসংঘ গঠন করেন? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
৫. মক্কাবাসী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কী উপাধি দিয়েছিল?
৬. কাবাঘরের দেয়ালে হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর স্থাপন করেন কে?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে হিলফুল ফুজুল শান্তিসংঘের শিক্ষার আলোকে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজেদের করণীয়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[৩] *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, পৃ. ৭৫

[৪] *History of the Arabs*, p.112

চিত্র সূত্র: পি. কে. হিট্টি, *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৮

পাঠ ২

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত লাভ (৬১০ খ্রি.) এবং মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরত (৬১৫ খ্রি.) [Obtaining the Nabuw'aat (610 AD) of Hazrat Muhammad (Sm) and Migration of Muslims to Abysinia (615 AD)]

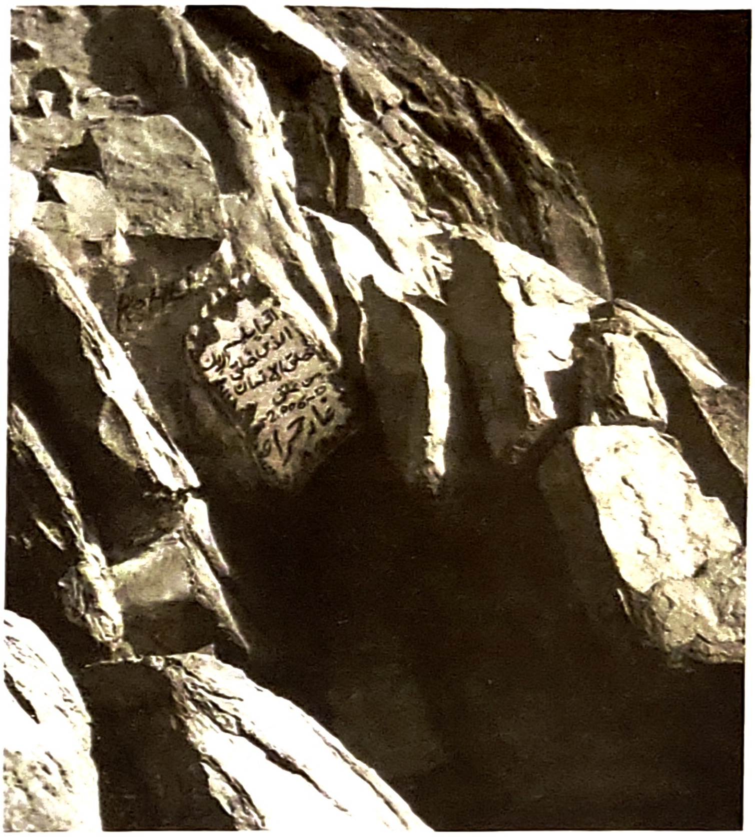

হেরা গুহা

নবুয়ত লাভ: বিবি খাদিজার সাথে বিবাহের পর মুহাম্মদ (স)-এর আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। ফলে তাঁর জীবনে মানবকল্যাণ সাধন ও স্রষ্টার আরাধনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। চারদিকের অরাজক পরিস্থিতি দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় সে উপায় খুঁজতে থাকেন। এ জন্য তিনি প্রায়ই পবিত্র কাবাঘর থেকে তিন মাইল দূরে 'জাবাল আল নূর' বা নূর পাহাড়ের হেরা গুহায় নির্জনে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। অবশেষে ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র রমজান মাসের ২১ থেকে ২৯ তারিখের কোনো এক বেজোড় রাতে তিনি ঐশী বাণী লাভ করেন। স্বর্গীয় ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) হেরা গুহায় আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বলেন, 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক্ব' (পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন)। এভাবে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করে শোনানো হয়। এ সময় তিনি ভীত হয়ে বাড়িতে ফিরে বিবি খাদিজাকে তাঁকে বস্ত্রাবৃত করতে বললেন। খাদিজা তাঁকে অভয় দিলেন এবং চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন। ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে ওয়ারাকার অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি এ ঘটনার বিবরণ শুনে অচিরেই মুহাম্মদ (স)-এর নবি বা পয়গম্বর হওয়ার কথা জানালেন।[৫] এভাবে হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর প্রত্যাদেশ লাভের মাধ্যমে নবুয়ত লাভ করেন। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (স) ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ওহি লাভ করেন। তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবি। নবুয়ত লাভের এ ঘটনার পর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ (স)-এর কাছে ওহি নাজিলের মাধ্যমে মহাগ্রন্থ আল কুরআন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় কুরআন প্রথম গ্রন্থাকারে লিপিবন্ধ হয় এবং তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর সময় মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বর্তমান সংকলন গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়।

গোপনে ইসলাম প্রচার: ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভের পর মহানবি (স) গোপনে কাছের আত্মীয়দের মধ্যে তাওহিদের (আল্লাহর একত্ববাদ) বাণী প্রচার করতে থাকেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্ত্রী খাদিজা (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। বালক হিসেবে হযরত আলি (রা) এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হিসেবে হযরত আবু বকর (রা) প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে যায়দ ইবনে হারিস, ওসমান, আব্দুর রহমান বিন আউফ, তালহা, যুবাইরসহ মক্কার বেশকিছু ধনী ব্যক্তি ও যোদ্ধা ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

[৫] মুহাম্মদ রেজা-ই- করিম, *আরব জাতির ইতিহাস*

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার ও বিরোধীদের নির্যাতন: ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে মহান আল্লাহ ওহি প্রেরণ করে প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিলে মহানবি (স) মক্কার মানুষকে পৌত্তলিকতা (মূর্তিপূজা) পরিহার করে এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানান। মহানবি (স) প্রকাশ্যে তাওহিদের বাণী প্রচার করতে শুরু করলে মক্কার কুরাইশসহ মূর্তিপূজায় লিপ্ত সব গোত্র মুহাম্মদ (স)-এর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মহানবি (স) সাফা পাহাড়ের পাদদেশে কুরাইশদের একটি সম্মেলন আহ্বান করে তাদের মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। কিন্তু কুরাইশরা তাঁর কথা তো শুনলই না; বরং তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করল। দীর্ঘ তিন বছর তিনি কুরাইশদের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করেন, কিন্তু তেমন কোনো সফলতা আসেনি। সৈয়দ আমীর আলী'র মতে, মক্কার কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় কাজ করেছিল—

১. পৌত্তলিকতা তাদের মধ্যে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল, ২. প্রাচীন ধর্মগুলোতে নানা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রলোভন বিস্তার করছিল, কিন্তু নতুন ধর্মে সে ধরনের কোনো প্রলোভন ছিল না এবং ৩. প্রাচীন ধর্মীয় উপাসনায় কুরাইশদের কায়েমি স্বার্থ ছিল এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের সাথে তাদের মানসম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি জড়িত ছিল।

জেনে রাখো

পৌত্তলিকতাবাদ বা পেগানবাদ এর ইংরেজি Paganism শব্দটি ল্যাটিন পেগানাস থেকে এসেছে। এর অর্থ খ্রিষ্টীয় আব্রাহামীয় বা ইবরাহিম (আ)-এর ধর্মমত বহির্ভূত সংস্কৃতির কিছু আত্মিক এবং সামাজিক আচার ও বিশ্বাস। মূর্তিপূজা বা প্রতিমাপূজা পৌত্তলিকতাবাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটি মূলত গ্রেকো রোমান বহুদেবতাবাদ হিসেবে ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকায় খ্রিষ্ট ধর্মের প্রসারের আগে বহু ঈশ্বরবাদী ঐতিহ্য হিসেবে প্রসার লাভ করেছে।

এসব কারণে মক্কার কুরাইশরা ইসলামের সুমহান বাণী গ্রহণ না করে; বরং ইসলামবিরোধী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো। আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল প্রমুখ নেতা মুহাম্মদ (স)-কে ধর্মদ্রোহী ও পাগল বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। এতে কোনো সফলতা না পেয়ে তারা মুহাম্মদ (স)-কে সুন্দরী নারী, অঢেল ধন-সম্পদ ও নেতৃত্ব প্রদানের শর্তে ইসলাম প্রচার করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু এতেও ব্যর্থ হওয়ায় তারা মহানবি (স) ও তাঁর অনুসারীদের ওপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করে। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল ও আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তাঁর পবিত্র মাথায় ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ ও চলার পথে কাঁটা দিত। নবদীক্ষিত অনেক মুসলমানকে অন্ধ করা হয়েছিল, এমনকি পুড়িয়েও মারা হয়েছিল।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

কুরাইশদের অত্যাচার যখন চরম আকার ধারণ করে তখন মুহাম্মদ (স) আল্লাহর নির্দেশে তাঁর শিষ্যদের আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করার পরামর্শ দেন। তখন আবিসিনিয়ার শাসক ছিলেন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী আসহেমা। তার উপাধি ছিল নাজ্জাসি। দুটি পর্যায়ে এ হিজরত সংঘটিত হয়।

প্রথম পর্যায়: ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে হযরত ওসমান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াসহ ১৫ জন (১১ জন পুরুষ ৪ জন নারী) মুসলিম নাজ্জাসির দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এটি মুসলমানদের প্রথম হিজরত।

দ্বিতীয় পর্যায়: আবিসিনিয়ায় প্রায় দুই মাস অবস্থানের পর মুসলমানরা ফিরে আসলে কুরাইশদের অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স) আবারও তাদেরকে আবিসিনিয়ায় যাবার আদেশ দিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম ও ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, এ দেশত্যাগী দলটির সাথে শীঘ্রই আরও নর-নারী যুক্ত হলো। ফলে তাদের মোট সংখ্যা হলো ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন স্ত্রীলোক। এ ঘটনা মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত নামে পরিচিত। কুরাইশরা নাজ্জাসির কাছে আশ্রয়প্রাপ্ত মুসলমানদের ফেরত চাইলেও তিনি তাতে রাজি হননি।

আবিসিনিয়ায় হিজরতের গুরুত্ব

আবিসিনিয়া ছিল খ্রিষ্টান রাজ্য। ৫৭০-৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে আরবদের সাথে তাদের একটি যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছিল। তাই তারা ছিল শত্রুপক্ষ। কিন্তু আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর এ শত্রুপক্ষ মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে দেখা দেয়।

মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি: আবিসিনিয়ায় হিজরতের ফলে মুসলমানরা কুরাইশদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় নবদীক্ষিত মুসলমানদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। তারা ভাবতে শুরু করে যে, তাদের একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল আছে যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারবে।

কুরাইশদের মনোবলে ভাঙন সৃষ্টি: কুরাইশরা ভেবেছিল যে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মুসলমানরা আবার আগের ধর্মে ফিরে যাবে। কিন্তু আবিসিনিয়ায় হিজরতের ফলে তারা অনুধাবন করতে পারল যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগ করবে না, প্রয়োজনে তারা দেশত্যাগ করবে। ফলে কুরাইশদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে।

চূড়ান্ত হিজরতের সূচনা: আবিসিনিয়ার হিজরত থেকেই মুসলমানরা পরবর্তীকালে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের প্রেরণা পেয়েছিল বলে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

মুসলিমবিরোধী সংঘ গঠন এবং মহানবি (স) ও মুসলমানদের ওপর অত্যাচার

আবিসিনিয়া থেকে মুসলমানদের ফেরত আনতে ব্যর্থ হওয়ায় কুরাইশরা তাদের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। তারা হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রের মূলোৎপাটনের জন্য ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি সংঘ গঠন করে। এ সংঘ ঘোষণা করে যে—

প্রথমত, কুরাইশদের কেউ মুসলমানদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবব্ধ হবে না;
দ্বিতীয়ত, কুরাইশদের কেউ মুসলমানদের পণ্য ক্রয় কিংবা তাদের কাছে পণ্য বিক্রি করবে না;
তৃতীয়ত, মুসলমানদের সাথে সব ধরনের সামাজিক আদান-প্রদান ও আলাপ-আলোচনা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে;
চতুর্থত, কেউ মুসলমানদের সাহায্য করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং
পঞ্চমত, মুহাম্মদ (স)-কে হত্যার জন্য কুরাইশদের কাছে হস্তান্তর না করা পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

শোয়াবে আবু তালিবে নির্বাসন: ইসলাম প্রচারে অভাবনীয় সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে কুরাইশরা মহানবি (স), তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের বয়কট করে। ৬১৭-৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শোয়াবে আবু তালিবে গিরি গুহায় মহানবি (স) তাঁর আত্মীয়-পরিজন ও অনুসারী মুসলমানসহ অবরুদ্ধ ও সমাজচ্যুত হয়ে চরম কষ্টে জীবন অতিবাহিত করেন। এভাবে হাশিম ও মুত্তালিব গোত্র প্রায় তিন বছর অবরুদ্ধ থাকায় কুরাইশরা অনুধাবন করল যে, বয়কট করে কোনো ফল আসবে না। তাই তারা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে ইসলাম প্রচার না করার শর্তে আবারও মুহাম্মদ (স)-কে আপসের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মহানবি (স) বলেন, "কেউ যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তবুও আমি ইসলাম প্রচারে পিছপা হবো না।" এ ঘোষণার পর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

হযরত হামযা ও ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ: কুরাইশদের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত হামযা ও হযরত ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে ইসলামের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "এ সময়ে নতুন ধর্ম ওমরের মতো একজন দৃঢ়চেতা সমর্থক লাভ করল, তাঁর চারিত্রিক শক্তি ইসলামের ভাবী গণতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল।"[৬]

খাদিজা ও আবু তালিবের মৃত্যু: ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ (স) তাঁর দীর্ঘ ২৫ বছরের জীবনসঙ্গী বিবি খাদিজাকে হারান। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, "খাদিজার মৃত্যু ছিল মুহাম্মদের (স) জন্য এক দুঃসহ আঘাত। তিনি ছিলেন চিরকালের জন্য মুহাম্মদের আশা ও সান্ত্বনার স্বর্গীয় দূত।" খাদিজার মৃত্যুর মাত্র ৫ সপ্তাহ পর পিতৃব্য আবু তালিব মৃত্যুবরণ করলে নবি (স) কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেও ধৈর্যহারা হননি। এ জন্য আরববাসীর অনেকে এ সময়কে (নবুয়তের দশম বছর) 'আমুল হুজন' বা দুঃখ-বেদনার বছর বলে থাকে।

---

[৬] *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, পৃ. ১০৬*

তায়েফ গমন: আবু তালিব ও খাদিজার মৃত্যুর পর কুরাইশরা মুহাম্মদ (স)-এর ওপর দ্বিগুণ নির্যাতন শুরু করে। এ অবস্থায় তিনি পালিত পুত্র যায়েদকে নিয়ে মক্কার ৭৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত তায়েফে যান। বনু আহলাফ গোত্রের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু তায়েফবাসী মুহাম্মদ (স) প্রবর্তিত ইসলামের সুমহান বাণী অনুধাবন করতে না পেরে তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং শেষ পর্যন্ত প্রস্তরাঘাত করে তায়েফ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

মেরাজ গমন: মহানবি (স)-এর জীবনে সবচেয়ে চমকপ্রদ ও অলৌকিক ঘটনা হলো মেরাজ গমন। বিবি খাদিজা ও আবু তালিবের মৃত্যুর পর মহানবি (স)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ মেরাজের মাধ্যমে তাঁকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। 'মেরাজ' শব্দের অর্থ ঊর্ধ্বগমন। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের রজব মাসের ২৬ তারিখ রাতে মুহাম্মদ (স) আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র মসজিদুল আকসা থেকে বোরাক নামের দ্রুতগতির বাহনে আরোহণ করে তিনি আরশে আজিমে যান এবং আল্লাহর সাথে কথা বলেন । তিনি মেরাজ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার নির্দেশ পান, যা সব মুসলমানের জন্য আদায় করা ফরজ।

আল-আকাবার শপথ (বায়াত-উল-আকাবা)

তিনটি পর্যায়ে আকাবার শপথ অনুষ্ঠিত হয়। যেমন—

প্রথম শপথ: ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে হজের মৌসুমে মুহাম্মদ (স) মিনায় গিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ব্যক্তিদের সাথে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় মুহাম্মদ (স)-এর সাথে ইয়াসরিবের খাযরাজ গোত্রের ৬ জন ব্যক্তি আকাবা পাহাড়ের পাদদেশে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ ও তা প্রচারে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করে। এটি আকাবার প্রথম শপথ হিসেবে খ্যাত।

দ্বিতীয় শপথ: ৬২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ৬ জন শপথ গ্রহণকারী মুসলিম খাযরাজ গোত্র থেকে আরও ৪ জন এবং আওস গোত্র থেকে ২ জন ব্যক্তিকে নিয়ে হজের সময় মহানবি (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা মুহাম্মদ (স)-কে নবি হিসেবে মেনে নিয়ে সব ধরনের পাপকাজ থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করে, যা আকাবার দ্বিতীয় শপথ নামে পরিচিত।

তৃতীয় শপথ: ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে পরবর্তী হজের মৌসুমে মদিনা থেকে আগত ৫০০ জন হাজির মধ্যে ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা আল-আকাবার প্রান্তরে মহানবি (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা মহানবি (স) ও তাঁর অনুসারীদের রক্ষা এবং ইসলামের জন্য কাজ করার অঙ্গীকার করে, যা 'আকাবার তৃতীয় শপথ' নামে খ্যাত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) কত খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভ করেন? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]*
২. কোন পর্বতের গুহায় মহানবি (স)-এর ওপর প্রথম ওহি নাজিল হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
৩. প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন কে?
৪. মুসলমানরা প্রথম কোথায় হিজরত করেছিল?
৫. কোন বছরকে 'আমুল হুজন' বা দুঃখের বছর বলা হয়?
৬. মহানবি (স)-এর 'মেরাজ' বা ঊর্ধ্বগমন কখন হয়েছিল?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আকাবার শপথের সময় এবং শপথ গ্রহণকারীদের সংখ্যা দিয়ে একটি ছক তৈরি করো।

পাঠ ৩ ও ৪

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদিনায় হিজরত, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং মদিনা জীবন (৬২২-৬৩২ খ্রি.)

Hizrat to Medina of Hazrat Muhammad (Sm), Its Importance and Significance and The Life at Medina (622-632 AD)

হিজরত

‘হিজরত’ শব্দটি আরবি, যা ‘হিজরা’ শব্দ থেকে এসেছে। হিজরা শব্দের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা, দল বর্জন করা, প্রস্থান বা গমন করা ইত্যাদি। অর্থাৎ দেশত্যাগ বা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া বোঝাতে হিজরা শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। মহানবি (স) মক্কায় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে কুরাইশদের সীমাহীন অত্যাচারের শিকার হন। ফলে তিনি আল্লাহর আদেশে হযরত আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় চলে যান। ইসলামের ইতিহাসে তাঁর এই স্থানান্তরকে হিজরত হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিছু ঐতিহাসিক মহানবি (স)-এর হিজরতকে ‘পলায়ন’ বলে অভিহিত করলেও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক কার্ল ব্রোকেলম্যান বলেন, “মহানবি (স)-এর এ হিজরত পলায়ন ছিল না, তা ছিল স্থানান্তর, যা তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছিল।”[৭]

মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের কারণ

মক্কাবাসীর অমানবিক নির্যাতন: মক্কার অভিজাত গোত্র কুরাইশরা মনে করত, ইসলামের প্রসার ও প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে যাবে। তারা মহানবি (স)-কে নিজেদের স্বার্থের প্রতিবন্ধক মনে করে তাঁর ওপর অমানবিক অত্যাচার চালায়। তাই বাধ্য হয়ে তিনি আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন।

মনস্তাত্ত্বিক কারণ: ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো নবি তার স্বদেশবাসীর কাছে প্রথমে সম্মানিত হননি। মহানবি (স)-এর এ বিষয়ে ধারণা ছিল। কাজেই মক্কাবাসীর নির্যাতনের মুখে এক পর্যায়ে তিনি কৌশল হিসেবে মদিনায় হিজরত করেন।

পরিবেশগত কারণ: প্রতিকূল জলবায়ু এবং উত্তপ্ত আবহাওয়ার জন্য মক্কাবাসী ছিল রুক্ষ এবং বদমেজাজি। নতুন কিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করার মতো মানসিকতা তাদের ছিল না। অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে বেশি সবুজ-শ্যামল মদিনার অধিবাসীরা ছিল চিন্তাশীল ও সুরুচিসম্পন্ন। তাই সেখানে ইসলাম প্রচার করা মক্কার তুলনায় সহজ হবে ভেবে মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করেন।

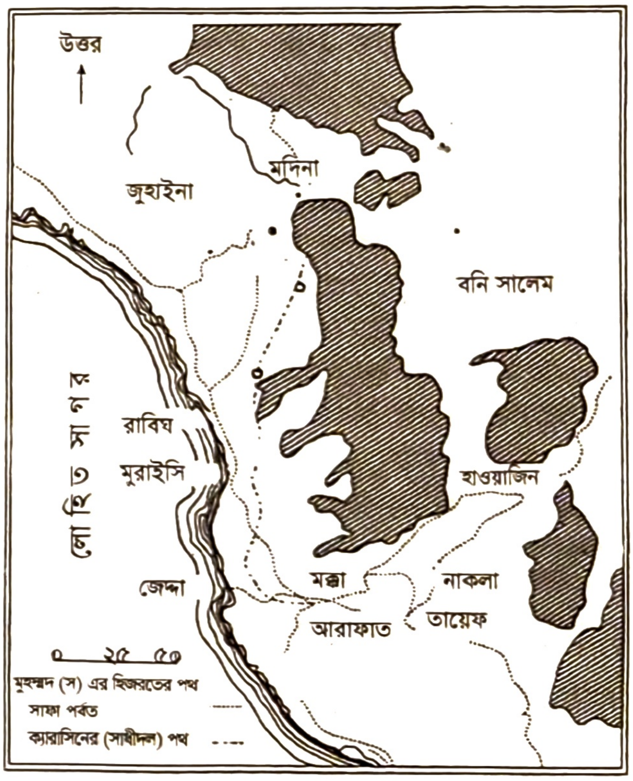

মুহাম্মদ (স)-এর মদিনায় হিজরতের পথ

আকাবার শপথ: ৬২১ খ্রিষ্টাব্দে মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের ১২ জন লোক মক্কার আকাবায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরের বছর কয়েকজন মহিলাসহ ৭৫ জন মদিনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা মহানবি (স)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁকে মদিনায় হিজরত করার আহ্বান জানান। এতে মহানবি (স) হিজরত করতে উদ্বুদ্ধ হন।

মদিনার ধর্মীয় অবস্থা: মদিনায় বিদ্যমান পৌত্তলিকতা, জড়বাদ, খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ অধিকাংশ মদিনাবাসীর পছন্দ ছিল না। এ কারণে তারা রাসুল (স)-এর প্রচারিত ধর্ম ও জীবনাদর্শ উত্তম মনে করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়।

---

[৭] This Hijrat of the Prophet that is not a flight but a migration which constituted the beginnig of a new life.– Ref: Carl Brockelmann, *The History of the Islamic Peoples.*

আত্মীয়তার সম্পর্ক: মহানবি (স)-এর পিতা আব্দুল্লাহ এবং পূর্বপুরুষ হাশিম মদিনায় বিয়ে করেছিলেন। কাজেই মদিনাবাসীর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক মহানবি (স)-কে সেখানে হিজরতের অনুপ্রেরণা দেয়। মদিনার অনেক বাসিন্দাও তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়।

মধ্যস্থতার জন্য আমন্ত্রণ: হিজরতের প্রাক্কালে মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী বুয়াস যুদ্ধ চলছিল। এ যুদ্ধ বন্ধের জন্য একজন মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন ছিল। শান্তির পক্ষে মুহাম্মদ (স)-এর বরাবরের তৎপরতার কথা জানা থাকায় ওই গোত্রদ্বয়ের লোকজন সমঝোতা করার জন্য মহানবি (স)-কে মদিনায় আমন্ত্রণ জানায়।

মুসআবের অনুকূল মতামত: এক বছর আগে আকাবার শপথ গ্রহণকারী দলের সাথে মদিনায় প্রেরিত মুসআব মদিনায় ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে বলে মহানবি (স)-কে জানালে তিনি সেখানে হিজরত করতে আগ্রহী হন।

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মানসিক পরিবর্তন ও আমন্ত্রণ: ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে উল্লেখ ছিল যে ওই সময়ে একজন নবির আবির্ভাব ঘটবে। এর ভিত্তিতে মদিনায় বসবাসকারী ইহুদিরা প্রতিশ্রুত নবি হিসেবে মুহাম্মদ (স)-কে মদিনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়।

নবি (স)-কে হত্যার পরিকল্পনা: প্রবল বাধা সত্ত্বেও মক্কায় ইসলাম দিন দিন প্রসার লাভ করলে কুরাইশরা মহানবি (স)-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। কুরাইশরা তাদের নেতা আবু জেহেলের প্রস্তাব অনুযায়ী বিভিন্ন গোত্রের যুবকদের নিয়ে একটি হত্যাকারী দল গঠন করে, যাতে কোনো একজন ব্যক্তির ওপর এ হত্যার দোষ না পড়ে। মহানবি (স) তাদের এ পরিকল্পনা জানতে পেরেছিলেন। এটা ছিল তাঁর হিজরতের অন্যতম কারণ।

আল্লাহর প্রত্যাদেশ লাভ: এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা ওহির মাধ্যমে মহানবি (স)-কে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত তিনি মদিনায় হিজরত করেন।

হিজরতের ঘটনা

কুরাইশদের অত্যাচারের হাত থেকে মুসলমান এবং ইসলামকে রক্ষার জন্য মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশ লাভ করার পর মুহাম্মদ (স) মদিনার বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন। হযরত জিবরাঈল (আ) এসে সংবাদ দেন যে, কুরাইশরা তাঁকে হত্যা করতে আসছে। এ সংবাদ শুনে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর হযরত আলিকে নিজ বিছানায় শুইয়ে রেখে হযরত আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে রাসুল (স) মদিনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন। মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করতে এসে তাঁকে গৃহে না পেয়ে হত্যাকারীরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। এ অবস্থায় তিনি আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে সাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। সাওর পর্বতের গুহায় ৩ দিন থাকার পর তিনি মদিনার উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা শুরু করেন এবং মদিনা থেকে ৩ মাইল দূরে কুবায় এসে উপস্থিত হন। তিনি এখানে ৩ দিন অবস্থান করে কুবাবাসীর মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটিই প্রথম মসজিদ, যা 'মসজিদে কুবা' নামে পরিচিত। এরপর রানুনা নামের স্থানে জুমার নামাজ আদায় শেষে হযরত মুহাম্মদ (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর মদিনায় পৌঁছালে মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্র তাঁদের স্বাগত জানায়। ফলে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, 'হিজরত ইসলামের ইতিহাসে মোড় পরিবর্তনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।'

হিজরতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মদিনায় হিজরত ইসলামের ইতিহাসে ও ইসলাম প্রচারে এক নতুন পরিবর্তন এনেছে, যা নিচে বর্ণিত হলো:

মদিনা জীবনের সূচনা: ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে হিজরতের গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। পি. কে হিট্টি বলেন, 'হিজরতের সাথে সাথে হযরতের মক্কা জীবনের অবসান এবং মদিনা জীবনের সূচনা হয় এবং এখানেই মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের মোড় ঘুরে যায়।'[৮]

মুহাজির ও আনসার শ্রেণির উদ্ভব: হিজরতের ফলে মহানবি (স) এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার ও নির্যাতনের অবসান হয়। যেসব মুসলমান জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তিনি তাদেরকে 'মুহাজির' (নির্বাসিত বা হিজরতকারী) এবং মদিনার যারা মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দিয়ে সম্পত্তি ভোগের অধিকার দেন তাদেরকে 'আনসার' (সাহায্যকারী) নামে অভিহিত করেন।

---

[৮] The Hijrat, with which Makkah period ended and the Madinese period began, proved a turning point, in the life of Muhammad.–Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.116

মদিনায় রাষ্ট্রগঠন ও এর গুরুত্ব বৃদ্ধি: মহানবি (স)-এর হিজরতের ফলে মদিনাতে ইসলামি রাষ্ট্র গঠিত হয়। মদিনার গোত্রগুলোকে একত্রিত করে তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। হিজরতের পর রাসুল (স) একজন বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মদিনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

হিজরি সন প্রবর্তন: মুহাম্মদ (স)-এর হিজরতকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য খলিফা ওমর (রা) ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে হিজরি সন প্রবর্তন করেন। আরবি সাল ও তারিখ গণনার ক্ষেত্রে এ হিজরি সালের গুরুত্ব অপরিসীম। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'এ হিজরত থেকে মুসলমানি পঞ্জিকার গণনা শুরু হয়েছে।'[৯]

ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা: মহানবি (স)-এর মদিনায় যাওয়ার পর তার মধ্যস্থতায় মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে চলমান দ্বন্দ্বের অবসান হয় এবং তারা দীর্ঘদিনের ভেদাভেদ ভুলে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'ইসলামি বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রভাবে বনি আওস ও বনি খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার সাংঘাতিক রক্তক্ষয়ী বিবাদ দূর হলে ইসলামের আদর্শে তারা সংঘবদ্ধ হয় এবং মুসলিম প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়।'[১০]

নবির শহর নামকরণ: ইয়াসরিববাসী মহানবি (স)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাদের নগরীর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন 'মদিনাতুন্নবি' বা নবির শহর। পরবর্তী সময়ে ইয়াসরিব মদিনা নামে সারাবিশ্বে পরিচিতি লাভ করে।

মদিনা সনদ প্রণয়ন: মহানবি (স) মদিনায় পৌঁছে এই অঞ্চলের নাগরিকদের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। এটিই বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। ঐতিহাসিক মুর বলেন, "হিজরতের ফলেই মহানবি (স) বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদিনা সনদ' প্রণয়ন করেন।" একজন রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি রাষ্ট্রপরিচালনারও দায়িত্ব নেন।

বিদেশে দূত প্রেরণ: মদিনা রাষ্ট্র গঠনের পর মহানবি (স) বিভিন্ন রাজদরবারে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দূত প্রেরণ করেন। এর মাধ্যমে আরবের সীমানা পেরিয়ে বহির্বিশ্বে ইসলামের যাত্রা শুরু হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০২২]*

২. হিজরতের সময় মহানবি (স)-এর সঙ্গী কে ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০২৫; ২০১৬]*

৩. হিজরতের সময় মহানবি (স) এবং আবু বকর (রা) কোন পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন?

৪. মদিনার পূর্বনাম কী? *[সকল বোর্ড ২০২১; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]*

৫. মদিনা শব্দের অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

৬. 'আনসার' শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯]*

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের কারণগুলো ছক আকারে লেখো।

২. হযরত মুহাম্মদ (স) মদিনায় গিয়ে যেসব প্রাথমিক কাজ সম্পাদন করেন তার একটি তালিকা তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

হিজরত মহানবি (স) এবং ইসলামের জন্য মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা ছিল কি না? দলীয় আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

---

[৯] The Hegira from which dates the Mohammedan Calendar. –Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.10 .

[১০] *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, পৃ. ১২৪

পাঠ ৫ ও ৬

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদিনা সনদ ও এর গুরুত্ব (৬২২ খ্রি.)

The Charter of Medina of Hazrat Muhammad (Sm) and its Importance (622 AD)

প্রাথমিক কাজসমূহ

ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারের জন্য হযরত মুহাম্মদ (স) প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় পৌঁছলে মদিনাবাসী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে। মুহাম্মদ (স)-এর হিজরতের প্রাক্কালে মদিনার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাই তিনি এখানকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

মসজিদ নির্মাণ: মদিনায় পৌঁছে মহানবি (স) প্রথমে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা 'মসজিদে নববি' নামে পরিচিত। এখান থেকেই মহানবি (স) তাঁর ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজসমূহ সম্পন্ন করতেন। মসজিদের এক পাশে নির্মিত হুজরাতে (কক্ষ বিশেষ) তিনি সপরিবারে বাস করতেন।

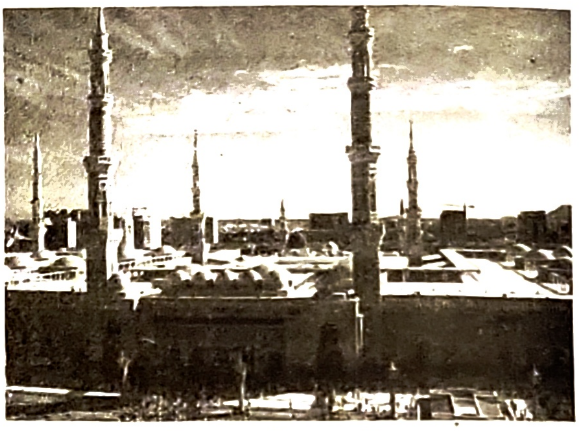

মসজিদে নববির আধুনিক রূপ

সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন: মহানবি (স) মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান শত্রুতার অবসান করে তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে তিনি বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "আরবের ইতিহাসে রক্তের সম্বন্ধের চেয়ে বরং ধর্মের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের এটিই প্রথম প্রচেষ্টা।"[১১]

বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি প্রবর্তন: মদিনায় হিজরতের পর মহানবি (স) কিছু ধর্মীয় রীতি প্রবর্তন করেন। হযরত ওমর (রা)-এর প্রস্তাব এবং অন্য সাহাবিদের সমর্থনে রাসুল (স) নামাজের সময় মুসলমানদের একত্রিত করার জন্য আজানের রীতি চালু করেন। অজু করা, দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়া, জুমার নামাজের আগে খুৎবা পাঠ ইত্যাদি নিয়মের প্রচলন প্রথম হিজরিতেই নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া মক্কায় মুসলমানরা গোপনে নামাজ পড়ত। মদিনায় এসে তারা প্রকাশ্যে জামাতে নামাজ আদায় শুরু করেন।

মদিনা সনদ প্রণয়ন ও মদিনা রাষ্ট্র গঠন: মহানবি (স) তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন, মদিনা ও এর আশপাশে বসবাসকারী মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি না হলে একটি সুসংহত রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি মদিনায় বসবাসরত সব জাতি-ধর্মের মানুষকে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের লক্ষ্যে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে একটি সনদ প্রণয়ন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক এম. ওয়াট এটিকে 'মদিনার সংবিধান' (The Constitution of Medina) বলেছেন। ইবনে হিশামের 'সীরাতে ইবনে হিশাম' গ্রন্থানুসারে মদিনা সনদের ৪৭টি ধারা ছিল। ইবনে ইসহাকের (সীরাতে রাসুলুল্লাহ) বর্ণনামতে, এ সনদের ৫৩টি ধারা রয়েছে।

মদিনা সনদের মুখবন্ধ: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পক্ষ থেকে এটি ইয়াসরিবের মুসলমান, যারা তাদের অনুসরণ করে ও তাদের সাথে যুক্ত এবং তাদের সাথে জিহাদ করে তাদের মধ্যে একটি লিখিত দলিল। মদিনা সনদের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো হলো—

১. মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী সব সম্প্রদায় একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে এবং সবাই সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।

২. হযরত মুহাম্মদ (স) মদিনা প্রজাতন্ত্রের প্রধান হবেন এবং পদাধিকার বলে তিনি মদিনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্বময় কর্তা হবেন।

---

[১১] This was the first attempt in the history of Arabia at a social organization with religion than blood as it's basis. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.120.

৩. এ সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায় শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে অন্যরা সমবেত শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করবে।

৪. প্রত্যেকের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না।

৫. কেউ কুরাইশদের সাথে বা অন্য কোনো বহিঃশত্রুর সাথে কোনো প্রকার গোপন সন্ধি করতে পারবে না কিংবা মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে কুরাইশদের সাহায্য করতে পারবে না। কোনো সম্প্রদায় মদিনা প্রজাতন্ত্রের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো কাজে লিপ্ত হবে না।

৬. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়গুলোর কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ জন্য পুরো সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না।

৭. মদিনা নগরী আক্রান্ত হলে এর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে এবং নিজ নিজ ব্যয়ভার বহন করবে।

৮. মদিনা নগরীকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হলো এবং এখানে রক্তপাত, হত্যা, বলাৎকার ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ নিষিদ্ধ করা হলো।

৯. দুর্বল ও অসহায়কে সর্বতোভাবে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে।

১০. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সব পাপ ও অপরাধকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে।

১১. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অনুমতি ছাড়া মদিনাবাসী কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

১২. নিজেদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তা মীমাংসা করবেন।

১৩. এই সনদের শর্ত ভঙ্গকারীর ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হবে।

১৪. অতীতের মতো রক্তপণ বহাল থাকবে।

১৫. মুমিন ব্যক্তি কোনো কাফেরের পক্ষ নিয়ে অন্য মুমিনকে হত্যা করবে না বা তার বিপক্ষে কোনো কাফেরকে সাহায্য করবে না।

১৬. ইহুদিদের মধ্যে যারা মুসলমানদের অনুগামী হবে তাদের জন্য সাহায্য ও মর্যাদার অধিকার থাকবে। তাদের প্রতি কোনো অবিচার অথবা তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করা হবে না।

১৭. যদি কেউ গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া কোনো মুমিনকে হত্যা করেছে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। তবে যদি নিহতের অভিভাবক রক্তপণের বিনিময় গ্রহণে সম্মত হয় তাহলে সে তা গ্রহণ করতে পারবে। সব মুমিনকে এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং এটি কার্যকর করা ছাড়া তাদের জন্য অন্য কিছু বৈধ হবে না।

১৮. অবশ্যই কোনো ব্যক্তি তার মিত্রের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না এবং মজলুমকে সবাই সাহায্য করবে।

১৯. কোনো নারীকে তার পরিবারের অনুমতি ছাড়া আশ্রয় দেওয়া যাবে না।

২০. কুরাইশ ও তাদের সাহায্যকারীদের আশ্রয় দেওয়া যাবে না।

মদিনা সনদের গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে গঠনমূলক সংস্কারে এটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এ সনদ মহানবি (স)-এর অতুলনীয় দূরদর্শিতার ফসল।

প্রথম লিখিত সংবিধান: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রণীত মদিনা সনদ বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। তাঁর আগে কোনো প্রশাসক এরূপ সংবিধান দিতে পারেননি। হযরত মুহাম্মদ (স) এ সনদের মাধ্যমে সব জাতি-ধর্মের মানুষকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এটিকে 'প্রথম লিখিত সংবিধান' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তারা একে 'আরবের ম্যাগনাকার্টা' বলেও অভিহিত করেছেন।

রাজনৈতিক ঐক্য: মদিনা সনদ মদিনার মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহ ভুলে বিপদের সময় সবাই একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এ সনদ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। ফলে এক সুদৃঢ় রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা: হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনার ভার অর্পিত হলে তিনি গোত্রভিত্তিক শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও ইসলামি শাসনতন্ত্র কায়েম করেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, 'মদিনার সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হলো।' এ সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, হযরত মুহাম্মদ (স) শুধু ধর্ম প্রচারকই নন; বরং তিনি বিশ্বের এক যুগান্তকারী বিপ্লবী শাসকও বটে।

জেনে রাখো

ম্যাগনাকার্টা (Magna Carta) ইংল্যান্ডের একটি চুক্তি, যা ১২১৫ সালে স্বাক্ষরিত হয়। রাজা জন সামন্তদের (ভূ-স্বামী) চাপে পড়ে রাজার অধিকার সংক্রান্ত এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এটি ছিল প্রজাদের অধিকার সংক্রান্ত ও রাজার ক্ষমতা হ্রাসের একটি সাংবিধানিক দলিল। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নে এটি পথনির্দেশক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে।

মহানবি (স)-এর শ্রেষ্ঠত্ব: মদিনা সনদের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় মেলে। সনদে বলা হয়েছে, চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়গুলো মক্কার কুরাইশ বা অন্য কোনো শত্রুর সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না এবং মদিনা আক্রান্ত হলে সবাই মিলে তা প্রতিহত করবে। এর মাধ্যমে কুরাইশদের বিরুদ্ধে রাসুল (স)-এর হাত শক্তিশালী হয়েছিল। এতে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়।

জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও যুদ্ধের প্রবণতা হ্রাস: মদিনা সনদের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স) মুসলমান, ইহুদি, খ্রিষ্টানসহ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করেন। এ সনদে যুদ্ধের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ থাকায় মদিনার যুদ্ধপ্রিয় গোত্রগুলো অযৌক্তিক যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকে। ফলে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি যুদ্ধের ঘটনা হ্রাস পায়।

জাতীয় ঐক্য: মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী সব সম্প্রদায়কে একটি উম্মাহ বা জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ইহুদি, খ্রিষ্টানসহ সবাই সনদের ধারাগুলো মেনে চলার অঙ্গীকার করে। ফলে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার: মদিনা সনদ প্রণয়নের পর পুরো আরবে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়। বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও জয়লাভের মাধ্যমে মহানবি (স) ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কারা মহানবি (স)-কে সাদরে গ্রহণ করেন?
২. মসজিদে নববি কোথায় নির্মাণ করা হয়?
৩. পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
৪. মদিনা সনদ কে প্রণয়ন করেন?
৫. মদিনা সনদে কয়টি ধারা ছিল?
৬. মহানবি (স) কোথায় ইসলামি শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলেন?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

মদিনা সনদের ধারাগুলোর সাথে বর্তমানে বিভিন্ন কল্যাণমূলক দেশের সংবিধানের ধারাগুলোর মিল কতটুকু তা নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

পাঠ ৭ ও ৮

বদরের যুদ্ধ (১৩ মার্চ, ৬২৪ খ্রি.): কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
Battle of Badr (March 13, 624 AD): Causes, Events and Results

কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে জীবন রক্ষার্থে মহানবি (স) ও অন্য মুসলমানরা মক্কা ছেড়ে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন। এর ফলে মুসলমানদের ওপর তাদের ক্ষোভ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি মদিনাবাসীর সাথেও তাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন কারণে এ শত্রুতা আরও বেড়ে গেলে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মার্চ (১৭ রমজান, দ্বিতীয় হিজরি) মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিমে (১২৮ কি.মি. দূরবর্তী) অবস্থিত বদর প্রান্তরে মক্কার কুরাইশ ও মদিনার মুসলমানদের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়। এটি ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ নামে পরিচিত। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ।

বদরের যুদ্ধের কারণ

মক্কার কুরাইশদের শত্রুতা: মক্কায় হযরত মুহাম্মদ (স) ইসলাম প্রচার শুরু করলে কুরাইশরা এটিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার চেষ্টা করে। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ (স) মদিনায় হিজরত করার পর মাত্র দুই বছরের মধ্যে ইসলাম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সেখানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে কুরাইশরা ভীষণভাবে ঈর্ষান্বিত হয়। তারা মদিনার মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে। মহানবি (স) তাদের কার্যক্রমের ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ আলী বলেন, 'ক্ষুদ্র মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষার দায়িত্ব মুহাম্মদ (স)-এর ওপর এসেছিল এবং তিনি একজন দক্ষ সেনানায়কের মতো শত্রুর গতিবিধি খেয়াল রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।'[১২] ফলে কুরাইশদের যুদ্ধের হুমকি তিনি মোকাবিলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ষড়যন্ত্র: খাযরাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মদিনার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল। তার স্বপ্ন ছিল মদিনার ভবিষ্যৎ শাসক হওয়া। মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর শাসক হওয়ার সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ফলে সে গোপনে কুরাইশদের সাথে ষড়যন্ত্র করে মহানবি (স)-কে মদিনা থেকে বহিষ্কারের পরিকল্পনা করে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে একটি মুনাফিক দল গঠন করে। মদিনার মুনাফিকদের এ মনোভাব মক্কার কুরাইশদের মনোবল আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তারা মদিনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়।

মদিনায় মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি: মদিনায় গিয়ে মহানবি (স) 'মদিনা সনদের' মাধ্যমে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মদিনায় তাঁর মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ. এইচ. সিদ্দিকীর মতে, "মদিনা সনদের ফলে মুহাম্মদ (স) সর্বোচ্চ সামরিক, বিচারিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রধান হলে মদিনা রাষ্ট্র একটি শক্ত ভিত্তি লাভ করে।" ফলে মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের এ অগ্রগতিতে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই তাদের ধ্বংস করার জন্য তারা মদিনা আক্রমণে অগ্রসর হলে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা: মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় মুহাম্মদ (স)-কে তাদের ধর্মে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মদিনায় আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু দ্রুত ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটলে তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। তাদের ধর্মীয় ও নাগরিক স্বাধীনতা দেওয়া সত্ত্বেও ইহুদিরা কোনো দিনই মুসলমানদের ভালো চোখে দেখেনি। তারা মদিনা সনদের ধারা লঙ্ঘন করে মক্কার কুরাইশদের কাছে তথ্য পাচার করে এবং সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করাসহ নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাই ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "সমগ্র মদিনা শহর বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতায় ভরে গিয়েছিল।"[১৩]

বাণিজ্যিক পথ রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা: সিরিয়া ও মক্কার বাণিজ্য পথে মদিনা অবস্থিত ছিল। কুরাইশরা এই পথে সিরিয়া, মিসর ও অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্য করত। মহানবি (স)-এর নেতৃত্বে মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হলে কুরাইশরা নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ হারাতে পারে এ আশঙ্কায় তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এস. এম. ইমামুদ্দিনের মতে, "একজন সত্যিকারের জেনারেল হিসেবে তিনি [মুহাম্মদ (স)] মক্কাবাসীকে (কুরাইশ) অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার জন্য সচেতন হয়ে সিরিয়ার সাথে মক্কার ব্যবসা বন্ধ করার পরিকল্পনা করেন যা বদরের যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে।"

---

[১২] The duty of the preservation of the small Muslim brotherhood developed upon the Prophet and like a skilled general, he realised the importance of keeping a watch on the movements of the enemy.' Ref: Muhammad Ali, *Muhammad the Prophet,* p.111.

[১৩] Medina itself way honeycombed by sedition and treachery. – Ref: *A Short History of the Saracens,* p.12

দস্যুবৃত্তি ও লুটতরাজ: মক্কাবাসী ও তাদের মিত্ররা প্রায়ই মদিনার প্রান্তসীমায় লুটতরাজ করত। তারা মুসলমানদের ফলের গাছ ধ্বংস করত এবং গবাদি পশু ধরে নিয়ে যেত। ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে কুরজ বিন জাবিরের নেতৃত্বে একটি কুরাইশ বাহিনী মদিনার উপকণ্ঠে হামলা চালিয়ে কয়েকটি উট ধরে নিয়ে যায়। সে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে এই বলে সতর্ক করে যে, মুহাম্মদ (স)-কে মদিনা থেকে বহিষ্কার না করলে কুরাইশরা মদিনা আক্রমণ করবে। তাদের এসব অত্যাচার ও অন্যায় কার্যকলাপের স্বাভাবিক পরিণতিই ছিল বদরের যুদ্ধ। তাই মাওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন, "ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ধ্বংসের জন্য কুরাইশদের দীর্ঘদিনের উদ্যোগ বদরের যুদ্ধের কারণ।"

মুহাম্মদ (স)-কে আশ্রয়দান: মদিনাবাসী মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাহাবিদের আশ্রয় দেওয়ায় মক্কার কুরাইশরা তাদের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "মক্কাবাসী মুহাম্মদ (স) ও তাঁর শিষ্যদেরকে বিপ্লবী বলে মনে করত। মদিনাবাসী তাঁদের আশ্রয় দিলে কুরাইশরা তাদের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। এ জন্য মক্কাবাসী ও মদিনাবাসীর মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।"[১৪]

নাখলার খণ্ড যুদ্ধ: কুরাইশদের সাথে মদিনার মুসলমানদের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে নাখলায়। কুরাইশদের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলি থেকে মদিনা রাষ্ট্রকে রক্ষার উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ (স) আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি গোয়েন্দা দল মক্কার উপকণ্ঠে প্রেরণ করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ভুলক্রমে মক্কাগামী কুরাইশদের একটি কাফেলাকে নাখলা নামক স্থানে আক্রমণ করে বসে। ফলে সেখানে একটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশ নেতা আমর বিন হাজরামি নিহত ও অপর দুই ব্যক্তি বন্দি হন। এস. এম. ইমামুদ্দিন বলেন, "আব্দুল্লাহ আল হাজরামির পুত্রের (আমর) মৃত্যু মক্কাবাসীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং এটিই বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়।"[১৫]

আবু সুফিয়ানের মিথ্যা প্রচারণা: এ সময় কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান বাণিজ্যের অজুহাতে সমরাস্ত্র সংগ্রহের জন্য সিরিয়া যান। গাজা থেকে আসা এ কাফেলায় প্রায় ৫০,০০০ দিনার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র ও ধনসামগ্রী ছিল। নাখলার যুদ্ধে বিপর্যস্ত কুরাইশরা মক্কায় কাফেলার নিরাপদে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এ সময় মক্কায় খবর আসে যে, মক্কায় ফেরার পথে কুরাইশদের কাফেলায় মদিনার মুসলমানরা হামলা করেছে। এ খবরের সত্যতা যাচাই না করেই কুরাইশরা আবু জেহেলের নেতৃত্বে প্রায় ১০০০ সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণের জন্য যাত্রা করে।

ঐশীবাণী লাভ: কুরাইশদের আগমনের সংবাদ পেয়ে মহানবি (স) চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি আল্লাহর দরবারে পরবর্তী করণীয় কী হবে তা সম্পর্কে নির্দেশ লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ ঐশীবাণী নাজিল করে জানিয়ে দেন— "তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে সীমালঙ্ঘন করো না। কারণ সীমালঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না (সূরা বাকারা, ১৯০)।" অতঃপর মহানবি (স) যুদ্ধ-সংক্রান্ত মন্ত্রণাসভার পরামর্শে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন।

বদরের যুদ্ধের ঘটনা

কুরাইশদের মদিনা আক্রমণের সংবাদ শুনে মুহাম্মদ (স) ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে কুরাইশদের গতিরোধ করার জন্য মদিনার ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বদর প্রান্তরে উপস্থিত হন। এদিকে আবু জেহেলের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী এক হাজার সৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। আরবীয় রীতি অনুসারে মল্লযুদ্ধে প্রথমে কুরাইশদের বীর উতবা, শায়বা ও ওয়ালিদ অগ্রসর হলে মহানবি (স)-এর নির্দেশে হামজা, আলি ও আবু উবায়দা কুরাইশদের পরাজিত করেন। উপায়ান্তর না দেখে আবু জেহেল মুসলমানদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। পরে উভয় বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু কুরাইশ বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। আবু জেহেলসহ ৭০ জন কুরাইশ যুদ্ধে নিহত এবং ৭০ জন বন্দি হয়। অপরদিকে ১৪ জন মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন। কুরাইশদের মধ্যে যারা যুদ্ধবন্দি হিসেবে মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে, মহানবি (স) তাদের প্রতি উদার ও মহানুভব আচরণ করেন। তাদের মধ্যে সামর্থ্যবানদের ৪ হাজার দিরহাম মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর যারা মুক্তিপণ দানে অসমর্থ ছিল তাদেরকে মুসলমানদের বিরোধিতা না করা এবং মুসলমান বালকদের শিক্ষাদানের শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়।

---

[১৪] The Meccans were much angered with the Medinites for sheltering Mohammed and his disciples, whom they considered as revolutionaries and a conflict between them and the people of Medina was unavoidable. -Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.12

[১৫] The son of Abdullah al Hadrami created sensation in Makkah and this become the battle of Badr. –Ref: S. M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims*, p.40

বদর যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল

মীমাংসাত্মক যুদ্ধ: বদরের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করে অসত্য ও পৌত্তলিকতাকে নির্মূল করার জন্য মুসলমানরা এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। অন্যদিকে এ যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ না করলে ইসলাম পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে মুছে যেত। এ জন্য এটিকে মীমাংসার যুদ্ধ বলা যায়। বদরের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য একটি যুগান্তকারী সাফল্য।

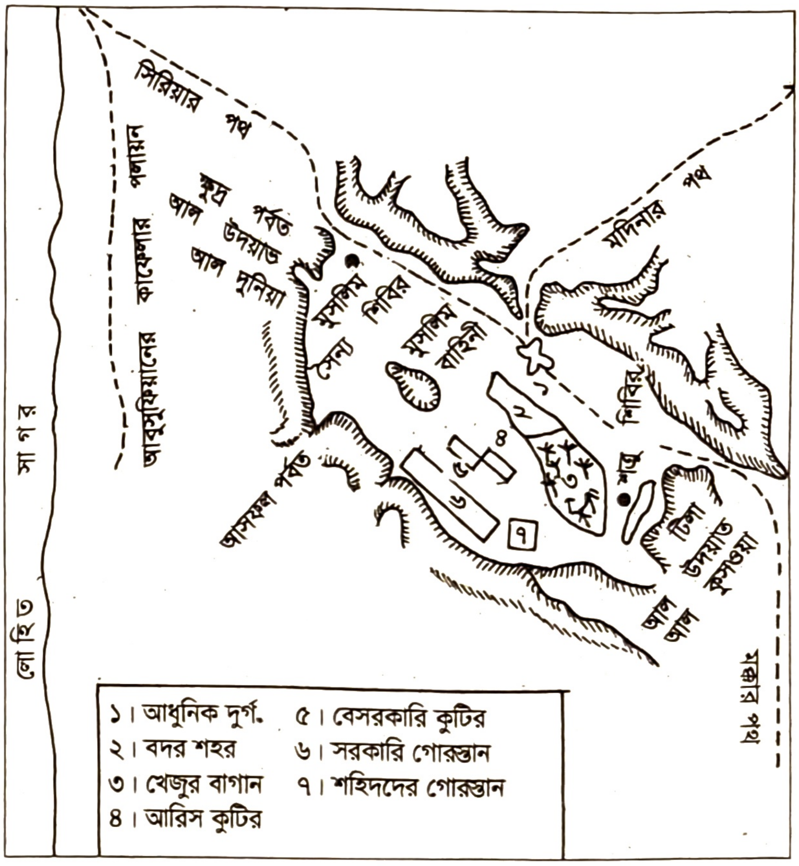
সিরিয়ার পথ
আবুসুফিয়ানের কাফেলার পলায়ন
ক্ষুদ্র পর্বত
আল উদয়াত আল দুনিয়া
মুসলিম সৈন্য শিবির
মুসলিম বাহিনী
মদিনার পথ
শত্রু শিবির
আসফল পর্বত
টিলা
আল উদয়াত আল কুসওয়া
মক্কার পথ
লোহিত সাগর
১। আধুনিক দুর্গ.
২। বদর শহর
৩। খেজুর বাগান
৪। আরিস কুটির
৫। বেসরকারি কুটির
৬। সরকারি গোরস্তান
৭। শহিদদের গোরস্তান

বদরের যুদ্ধের পরিকল্পনা

প্রথম সামরিক বিজয়: বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বিজয়। মক্কার কুরাইশরা মনে করেছিল, সামরিক অভিযান প্রেরণ করলে মুহাম্মদ (স)-এর শক্তি বিনষ্ট হবে এবং ইসলাম ধূলিসাৎ হবে। কিন্তু তাদের এ আশা পূরণ হয়নি। জোসেফ হেলের মতে, 'বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বড় ধরনের সামরিক বিজয়।' এ বিজয় স্বজাতীয়দের ওপর মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। ফলে মুসলমানদের শক্তি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, 'ইসলাম তার প্রথম ও সর্বাত্মক সামরিক বিজয় অর্জন করেছে।'[১৬]

মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি: বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভ ছিল অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের বিজয়, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের বিজয়, কুফরের বিরুদ্ধে ইমানের বিজয়। এটি ছিল ইসলাম ধর্মের এক বিশেষ পরীক্ষার দিন। এ যুদ্ধে ইসলাম ও পৌত্তলিকতার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায় এবং এতে মুসলমানরা জয়লাভ করে। অল্প সংখ্যক মুসলমান সহস্রাধিক কুরাইশদের সাথে জয়লাভ করে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হন। মুসলমানদের মনোবল, শক্তি, সাহস ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা শহিদ হওয়ারও অনুপ্রেরণা লাভ করে। তাই ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, এ বিজয় অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের ওপর মহান আল্লাহর একত্ববাদের বিজয়। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "যে অদ্ভুত পরিস্থিতি বদরের বিজয় অর্জনে প্রভাব ফেলেছিল এবং তা থেকে যে ফলাফল ঘটেছিল সেসব মুসলমানদের মনের ওপর গভীর রেখাপাত করেছিল। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিল যে, স্বর্গের ফেরেশতা তাদের পক্ষে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।"[১৭]

ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি ও এর প্রসার: বদর যুদ্ধের আগে ইসলাম শুধু মদিনার মধ্যেই একটি ধর্ম হিসেবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এরপর এটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং ইসলামের মর্যাদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ইসলাম প্রচারে নবযুগের সৃষ্টি করে। তাই ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, "ইসলাম ধর্মের প্রতি আরব বিশ্ব এমনকি পৃথিবীর মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এর ফলে মাত্র কিছু দিনের মধ্যে সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলাম সম্প্রসারিত হয়।"[১৮]

---

[১৬] Islam had won its first and decisive military victory. –Ref: P. K. Hitti. *History of the Arabs,* p.117

[১৭] সূত্র: *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম,* পৃ. ১৩৬

[১৮] Ref: Joseph Hell, *Arab Civilization*

কুরাইশদের দম্ভ ভঙ্গা: বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মক্কার কুরাইশ ও তার মিত্ররা মনে করত যে, সামরিক অভিযান পরিচালনা করলে সব সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় মক্কাবাসীর গৌরব এবং কুরাইশ বংশের দম্ভের মর্মমূলে চরম আঘাত করে। তাদের নেতৃত্বের রদবদল ছিল বদরের যুদ্ধে বিজয়ের প্রত্যক্ষ ফল।

মুহাম্মদ (স)-এর পার্থিব ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন: বদর যুদ্ধের মাধ্যমে মুহাম্মদ (স) তাঁর পার্থিব ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন করেন। এ যুদ্ধের পর মদিনায় মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ (স) মদিনার রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে একক শক্তির অধিকারী হন। তিনি বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ফলে আরব বিশ্বে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তাই ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, ‘বদরের যুদ্ধেই মুহাম্মদ (স) পার্থিব ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন করলেন। ইসলাম তার প্রথম চূড়ান্ত সামরিক বিজয় অর্জন করল।’[১৯]

পরবর্তী বিজয় ও বিশ্বজয়ের পথ প্রদর্শক: ঐতিহাসিক পি. কে হিট্টি বলেন, ‘এই সম্মুখ যুদ্ধে নিয়মানুবর্তিতা এবং মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষার যে দৃষ্টান্ত মুসলমানরা প্রদর্শন করল তাতেই ইসলামের পরবর্তী বিজয়ের বিশেষ লক্ষণসমূহ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।’ তাই বদরের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে হযরত মুহাম্মদ (স) ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে খন্দকের যুদ্ধ, ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হুদায়বিয়ার সন্ধি, ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে মুতার যুদ্ধ, ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয়, হুনায়েনের যুদ্ধ এবং তাবুক অভিযানে সাফল্য লাভ করেন। এ যুদ্ধে জয়লাভ করায় মুসলমানদের জন্য পরবর্তী বিশ্বজয়ের পথ উন্মুক্ত হয়। বদরের যুদ্ধের জয়ের সূত্র ধরেই মুসলমানরা পরবর্তী ১০০ বছরের মধ্যে পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশ, ইউরোপের কিছু অংশসহ পূর্বে ভারতবর্ষ পর্যন্ত নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মনোবলে ভাঙন: মদিনার ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের উন্নতিতে ঈর্ষা পোষণ করত। কিন্তু বদর যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করায় পার্শ্ববর্তী বেদুইন গোত্রগুলোর ওপর মুহাম্মদ (স)-এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মক্কার কুরাইশদের মতো মদিনার ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মনোবল ভেঙে পড়ে। এছাড়া মদিনার অন্যান্য গোত্র ও সম্প্রদায়ের ওপরও ইসলামের কর্তৃত্ব জোরদার হয়। পি. কে. হিট্টির মতে, ‘ইসলাম পুনর্জীবন লাভ করল এবং আত্মরক্ষার পরিবর্তে সম্প্রসারিত হওয়ার নীতি গ্রহণ করল।’[২০]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ ছিল কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
২. বদরের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? *[সি. বো., ব. বো. ২০২১]*
৩. বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?
৪. বদরের যুদ্ধে কত জন মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন? *[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*
৫. কুরাইশ নেতা আবু জেহেল কোন যুদ্ধে নিহত হয়?
৬. মুসলমানদের প্রথম সামরিক বিজয় কোনটি?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

দুটি দলে বিভক্ত হয়ে বদরের যুদ্ধের কারণ ও তাৎপর্যপূর্ণ দিক নিয়ে দুটি স্লাইড তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

---

[১৯] The Battle of Badr laid the foundation of Muhammads temporal power. Islam had won its first and decisive military victory. – Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.117

[২০] *Ref: History of the Arabs*, p.117

পাঠ ৯ ও ১০

উহুদের যুদ্ধ (২১ মার্চ, ৬২৫ খ্রি.): কারণ ও ঘটনা
The Battle of Uhud (March 21, 625 AD): Causes and Events

উহুদের যুদ্ধের কারণ

স্বার্থপর ইহুদিদের কুমন্ত্রণা: বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের পর তারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। অপরদিকে মদিনায় মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধিকে ইহুদিরা তাদের স্বার্থের প্রতি হুমকি মনে করতে শুরু করে। তারা কবিতা রচনা এবং কুমন্ত্রণার সাহায্যে কুরাইশদের মনোবল শক্তিশালী করে তুলতে তৎপর হয়। যেমন— কাব বিন আশরাফ নামে একজন ইহুদি কবি তার রচিত কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশ এবং বেদুইনদের উত্তেজিত করে।

পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ: বদরের যুদ্ধের পর মদিনার ক্রমোন্নতি এবং দ্রুতগতিতে ইসলামের প্রসার লাভ মক্কাবাসী কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। মহানবি (স)-এর নেতৃত্বে মদিনার উন্নতি কাফেরদের স্বার্থের পরিপন্থি ছিল। তাই তারা কিছুতেই এ বিষয়টি মেনে নিতে পারছিল না। এ ছাড়া বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা স্বল্পসংখ্যক মুসলিম সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়। এ পরাজয় তাদের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে দেয়। তাছাড়া এ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে কুরাইশদের রাজনৈতিক প্রাধান্য, অর্থনৈতিক, সুযোগ-সুবিধা সবই বিনষ্ট হতে থাকে। এগুলো ফিরে পেতে তারা আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেয়।

কবিদের কুমন্ত্রণা: মক্কার বিখ্যাত বীর শায়বা, উতবা, আবু জেহেল প্রমুখ বীরযোদ্ধা বদরের যুদ্ধে নিহত হলে মক্কার কবিরা তা সহ্য করতে পারেনি। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মক্কার কবি আমর জাহসী ও কিব মাসামে অনলবর্ষী ভাষায় বদরে নিহত নেতাদের জন্য মর্সিয়া, মাতমছন্দে কবিতা আবৃত্তি এবং মহানবি (স)-এর কুৎসা বর্ণনা করে মক্কাবাসীকে মদিনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে।

আবু সুফিয়ানের শপথ: বদরের যুদ্ধে আবু জেহেলের মৃত্যুর পর কুরাইশ বংশের নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটে। উমাইয়া গোত্রীয় আবু সুফিয়ান মক্কার নেতৃত্ব লাভ করেন। তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মক্কার বিভিন্ন গোত্রকে একত্রিত করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তিনি চুলে তেল দেবেন না এবং নারী স্পর্শ করবেন না। এ জন্য তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে ব্যাপক সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

উমাইয়া ও হাশেমিদের শত্রুতা: মহানবি (স) ছিলেন বনু হাশিম গোত্রের লোক। তাঁর নেতৃত্বে বনু হাশিম গোত্রের সাফল্য দেখে বনু উমাইয়া গোত্র ঈর্ষান্বিত হয়। কাজেই উমাইয়া গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান হাশেমিদের প্রভাব খর্ব করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা: মদিনায় মুহাম্মদ (স)-এর নেতৃত্বে ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে কুরাইশরা সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে নির্বিঘ্নে যাতায়াতের সুবিধা হারাতে পারে ভেবে তারা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়। এস. এম. ইমামুদ্দিন-এর মতে, "মক্কাবাসী বুঝতে পারে যে তাদের সিরিয়া বাণিজ্য হুমকির মুখে রয়েছে এবং মদিনা একটি আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।"[২১] ফলে কুরাইশ বণিকেরা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবু সুফিয়ানের পক্ষে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা দেয়।

কুরাইশ নারীদের উৎসাহ দান: উহুদের যুদ্ধের ক্ষেত্র সৃষ্টিতে কুরাইশ নারীরাও মক্কার পুরুষদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। তারা বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনামূলক উক্তি দ্বারা পুরুষদের উত্তেজিত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে আবু সুফিয়ানের স্ত্রীর উক্তি ছিল এ রকম -"তোমরা যদি অভিযান কর তাহলে আমরা তোমাদের সাদরে আলিঙ্গন করে তোমাদের সাথে যৌনসঙ্গমের ব্যবস্থা করব। আর যদি পশ্চাদপসরণ কর তাহলে আমরা তোমাদের ছেড়ে যাব এবং কখনও তোমাদের ভালোবাসব না।" বিখ্যাত তীরন্দাজ ওয়াহশিকে তারা তাদের দলভুক্ত করে এবং দেশব্যাপী প্রচারণা চালিয়ে তারা সবার মধ্যে রণোন্মাদনা জাগিয়ে তোলে।

---

[২১] Ref: *Political History of the Muslims*, p.46

উহুদের যুদ্ধের ঘটনা

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে আবু সুফিয়ান ৭০০ বর্মধারী, ৩০০ উষ্ট্রারোহী ও ২০০ অশ্বারোহীসহ মোট তিন হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনার ৫ মাইল পশ্চিমে উহুদ প্রান্তরে উপস্থিত হন। মহানবি (স) আবু সুফিয়ানের এ যুদ্ধাভিযানের খবর পেয়ে ১,০০০ জন মুজাহিদ নিয়ে উহুদের প্রান্তরে যাত্রা করেন। পথে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশত লোক নিয়ে দলত্যাগ করে। অবশেষে মাত্র সাতশত সৈন্য নিয়ে মহানবি (স) তিন হাজার কুরাইশ সৈন্যের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিলেন। মুসলিম শিবিরের একপাশে ছিল উহুদ পাহাড়। অপরপাশে একটি সংকীর্ণ গিরিপথ। এর ভেতর দিয়ে শত্রুরা যাতে পেছন থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য রাসুল (স) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ইবনে নোমানের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজকে গিরিপথ পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেন। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কোনো অবস্থাতেই যেন তারা গিরিপথ ত্যাগ না করে। ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে ২১ মার্চ (মতান্তরে ২৬ মার্চ) উহুদ প্রান্তরে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে যখন মুসলমানদের জয় প্রায় নিশ্চিত, ঠিক সেই সময় জয়ের উল্লাসে গিরিপথ রক্ষীরা শত্রুদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ (গনিমত) সংগ্রহের লোভে মহানবি (স)-এর নির্দেশ ভুলে গিয়ে গিরিপথ ত্যাগ করে। কুরাইশদের অন্যতম সেনাপতি সুচতুর খালিদ বিন ওয়ালিদ গিরিপথ রক্ষীদের গতিবিধি লক্ষ করেন। তিনি তার নেতৃত্বাধীন অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে অরক্ষিত গিরিপথ দিয়ে পেছনের দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর ওপর পাল্টা আক্রমণ চালান। এ আক্রমণের ফলে মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ হামযা (রা)-সহ ৭৩ জন মুজাহিদ শহিদ হন। মহানবি (স) নিজেও আহত হন, তাঁর দুটি দাঁত শহিদ হয়। অপরদিকে শত্রুপক্ষের ২৩ জন সৈন্য নিহত হয়। মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী মুজাহিদ মুসাব নিহত হলে গুজব ওঠে যে, মহানবি (স) নিহত হয়েছেন। কুরাইশরা এ গুজবে উল্লসিত হয়ে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে মক্কায় ফিরে যায়।

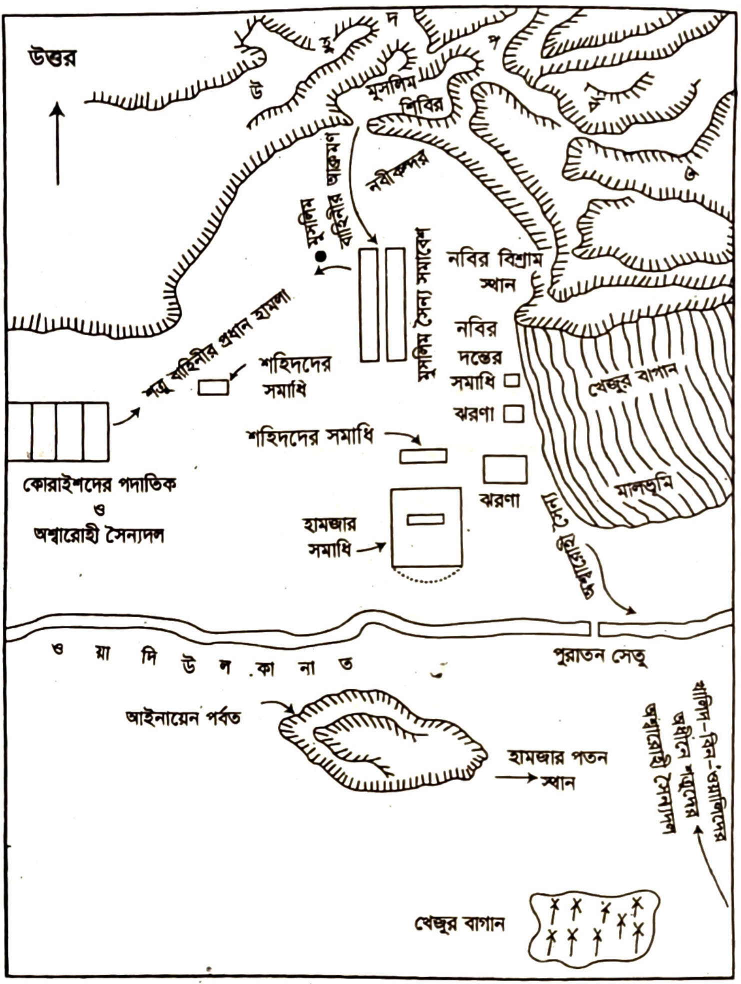
উত্তর
উ
হু
দ
প
ত
মুসলিম শিবির
মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ
নবীকন্দর
মুসলিম সৈন্য সমাবেশ
নবির বিশ্রাম স্থান
শত্রু বাহিনীর প্রধান হামলা
শহিদদের সমাধি
নবির দন্তের সমাধি
ঝরণা
খেজুর বাগান
শহিদদের সমাধি
কোরাইশদের পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল
হামজার সমাধি
ঝরণা
মালভূমি
ও য়া দি উ ল কা না ত
পুরাতন সেতু
আইনায়েন পর্বত
হামজার পতন স্থান
খালিদ-বিন-ওয়ালিদের অধীনে শত্রুদের অশ্বারোহী সৈন্যদল
খেজুর বাগান

উহুদের যুদ্ধের পরিকল্পনা

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত খ্রিষ্টাব্দে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? *[ঢা. বো., য. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]*
২. উহুদের যুদ্ধে কুরাইশ নেতা কে ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
৩. উহুদের যুদ্ধে কুরাইশ সেনাপতি কে ছিল?
৪. উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের সৈন্য কত ছিল?
৫. কোন মুনাফিক নেতা উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের দলত্যাগ করে?
৬. উহুদের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যরা কার নির্দেশ অমান্য করেছিল?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

উহুদের যুদ্ধের কারণগুলো ছক আকারে লেখো।

পাঠ ১১

উহুদের যুদ্ধের ফলাফল ও মুসলমানদের পরাজয়ের কারণসমূহ
Results of the Battle of Uhud and Causes of the Failure of Muslims

উহুদের যুদ্ধের ফলাফল

মুসলমানদের ইমান ও ধৈর্য পরীক্ষা: উহুদের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। মহান আল্লাহ উহুদের যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ধৈর্য ও ইমান পরীক্ষা করেছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এম. ওয়াট বলেন, 'উহুদের যুদ্ধে এ চরম অবস্থায় না পড়লে মুসলমানরা বুঝতে পারত না, তারা কতটুকু খাঁটি।'[২২] ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, 'উহুদের যুদ্ধের বিপর্যয় ছিল মুসলমানদের জন্য ধৈর্যের বিরাট পরীক্ষা।'[২৩]

মুসলমানদের বিপর্যয়: বীরবিক্রমে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও রাসুল (স)-এর নির্দেশ অমান্য করার ফলে মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলিম বাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর হযরত হামযা (রা) এবং পতাকাবাহী মুসাবসহ ৭৩ জন বীর সৈনিক যুদ্ধে শহিদ হন এবং মহানবি (স) নিজেও আহত হন। অন্যদিকে কুরাইশদের মাত্র ২৩ জন সৈন্য নিহত হয়। শহিদ হযরত হামযা (রা)-এর বুক চিঁড়ে কলিজা বের করে তা চিবিয়ে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা সীমাহীন নৃশংসতার পরিচয় দেয়।

ফলাফল চূড়ান্ত নয়: উহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় ঘটলেও যুদ্ধের জয়-পরাজয় চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি। যুদ্ধে জয়ী হয়েছে এই ভেবে কুরাইশরা মদিনা দখল না করে চলে যায়। তবে ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, 'মক্কার অধিবাসীরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে উহুদ প্রান্তরে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলতে এবং এমনকি মুহাম্মদ (স)-কে আঘাত করারও চেষ্টা করেছিল। তবে তাদের বিজয় স্থায়ী হয়নি।'

মুসলমানদের চরম শিক্ষালাভ: নেতার আদেশ অমান্য করে মুসলিম সৈনিকরা অবশ্যম্ভাবী বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হয়ে এক মহান শিক্ষা অর্জন করে। যুদ্ধক্ষেত্রে নেতার আদেশ অগ্রাহ্য করা এবং বিশৃঙ্খল হওয়ার পরিণতি তা তারা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। পরবর্তীকালে আর কোনো যুদ্ধেই মুসলিম সেনাবাহিনী এরূপ মারাত্মক ভুল করেনি। পরবর্তী যুদ্ধসমূহে জয়লাভের ক্ষেত্রে এ শিক্ষা বেশ সহায়ক হয়েছিল।

ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা লাভ: উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা আপাতদৃষ্টে পরাজিত হলেও মূলত এর মাধ্যমেই ইসলাম রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা লাভ করে। পি. কে হিট্টি বলেন, "এখান থেকেই ইসলাম একটি রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়েছিল।"[২৪]

ইহুদিদের চিহ্নিতকরণ ও শাস্তিদান: উহুদের যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানরা মদিনায় শত্রুভাবাপন্ন ও ষড়যন্ত্রকারী ইহুদি গোত্রগুলো চিহ্নিত করে, যেমন— বনু কায়নুকা, বনু নাজির ও কুরায়জা প্রভৃতি। পরবর্তী সময়ে মহানবি (স)-এর সাথে চুক্তি ভঙ্গের দায়ে এদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং মদিনা শত্রুমুক্ত হয়।

দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধ সংঘটন: কুরাইশ বাহিনী মুহাম্মদ (স) নিহত হয়েছেন মনে করে মদিনা ত্যাগ করে। কিন্তু যখন অবগত হলো যে, যুদ্ধে মহানবি (স) নিহত হননি, তখন তারা আবার বদর প্রান্তরে তাঁর সাথে মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু মুহাম্মদ (স)-এর সংঘবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব দেখে ভীত হয়ে বিধর্মীরা পশ্চাদপসরণ করে। ইসলামের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

ভবিষ্যৎ বিজয়ের পথ উন্মুক্ত: উহুদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে মুসলমানরা যে শিক্ষা অর্জন করে তা পরবর্তী বড় বড় যুদ্ধে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিল। অন্যদিকে কুরাইশরা তাদের বিজয় ধরে রাখতে পারেনি। ঐতিহাসিক মুর বলেন, "বাহ্যিক দিক থেকে কুরাইশরা বিজয়ী হয়েছিল, তবে কুরাইশদের জন্য এটা ছিল ক্ষণকালীন বিজয়।" পি. কে. হিট্টির মতে, "উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের বিজয় স্থায়ী হয়নি। এ সময় ইসলাম তার পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়েছিল এবং ক্রমশ নিজেকে রক্ষা করা থেকে প্রাধান্য সৃষ্টির পথে অগ্রসর হয়েছিল।"

---

[২২] Ref: W. M. Watt, *Muhammad at Medina*

[২৩] Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs.*

[২৪] Hitherto it had been a religion within a state. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.117

মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ

মহানবি (স)-এর আদেশ অমান্য: মুহাম্মদ (স) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইয়েরের নেতৃত্বে ৫০ তীরন্দাজ সৈন্যকে উহুদ ও আইনাইন পর্বতের মাঝামাঝি সংকীর্ণ গিরিপথে নিয়োজিত করেন। তিনি এ সৈন্যদের যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু সৈন্যরা মহানবি (স)-এর আদেশ অমান্য করে গনিমতের মাল সংগ্রহের জন্য গিরিপথ থেকে সরে যায়। ঠিক এ সময় কুরাইশরা খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে এ পথ দিয়ে আক্রমণ করলে মুসলমানরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

খালিদের বীরত্ব: বিজয় নিকটবর্তী ভেবে যখন মুসলিম বাহিনী গনিমত সংগ্রহে ব্যস্ত তখন কুরাইশ বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ খালিদ বিন ওয়ালিদ বুদ্ধিমত্তার সাথে এক নতুন রণকৌশল অবলম্বন করে। তিনি গনিমত সংগ্রহরত মুসলিম বাহিনীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ করলে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এভাবে খালিদের রণকৌশলের কাছে মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের পরাজয় ঘটে।

মহানবি (স)-এর মৃত্যু সংবাদ: মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী মুজাহিদ মুসাব যুদ্ধে শহিদ হলে গুজব রটে যে, মুহাম্মদ (স) যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। এ সংবাদে মুসলমান সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ে। এমতাবস্থায় কুরাইশদের আক্রমণে মুসলমানরা বিপর্যস্ত ও পরাজিত হয়।

প্রতিকূল আবহাওয়া: উহুদের যুদ্ধের সময় হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবল ঝড় ওঠে। এই ঝড়ে মুসলিম বাহিনী শত্রু, মিত্র নির্ণয় করতে ব্যর্থ হওয়ায় কুরাইশ বাহিনী সুবিধা পেয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে এ প্রতিকূল বায়ু প্রবাহের ফলে মুসলিম বাহিনী ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে এবং পরাজয়ের সম্মুখীন হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ষড়যন্ত্র: মহানবি (স) মদিনার ত্রাণকর্তা হয়ে উঠলে দীর্ঘদিন থেকে মদিনার নেতা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। তাই সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও সে পথে তাঁর ৩০০ জন অনুচরসহ মুসলমানদের দল ত্যাগ করে। ফলে মাত্র ৭০০ মুজাহিদের পক্ষে ৩০০০ সৈন্যের কুরাইশ বাহিনীকে পরাজিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এটি উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

বনু কায়নুকা গোত্রের শর্তভঙ্গ: মদিনা সনদের শর্ত অনুযায়ী সনদে স্বাক্ষরকারী গোত্রগুলো মক্কার কুরাইশদের সাহায্য করতে পারবে না। কিন্তু বনু কায়নুকা গোত্র শর্ত ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করে।

নারীদের উৎসাহ প্রদান: আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাসহ বিভিন্ন কুরাইশ নারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য যৌনসম্ভগসহ নানা প্রলোভনের মাধ্যমে পুরুষদের উৎসাহ দেয়, যা তাদের জয়ের পেছনে ভূমিকা পালন করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয় ঘটেছিল?
২. উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রধান কারণ কী?
৩. উহুদের যুদ্ধে মহানবি (স)-এর কয়টি দাঁত শহিদ হয়?
৪. বীরশ্রেষ্ঠ হামযা (রা) কোন যুদ্ধে শহিদ হন?
৫. উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের কত জন সৈন্য শহিদ হন?
৬. উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের কত জন সৈন্য শহিদ হয়?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের প্রকৃতপক্ষেই পরাজয় ঘটেছিল কি না তা নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

পাঠ ১২ ও ১৩

খন্দকের যুদ্ধ (মার্চ ও এপ্রিল, ৬২৭ খ্রি.): কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
The Battle of Khandaq (March and April, 627 AD): Causes, Events and Results

ইসলামের সূচনা পর্বে যে কয়টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল খন্দকের যুদ্ধ সেগুলোর অন্যতম। তবে এ যুদ্ধ ইতিহাসে বিভিন্ন নামে পরিচিত। 'পরিখা' (খাল) বা খন্দক খনন করে মদিনা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে এটিকে 'পরিখা' বা খন্দকের যুদ্ধ' বলা হয়। পবিত্র কুরআনে এ যুদ্ধকে 'আহযাবের যুদ্ধ' (সম্মিলিত বাহিনী) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত মক্কার কুরাইশ এবং তাদের মিত্র বেদুইন ও ইহুদিদের সম্মিলিত বাহিনী ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। মুহাম্মদ (স) এ সংবাদ পেয়ে সালমান ফারসি নামে একজন পারসিক সাহাবির পরামর্শে খন্দক বা পরিখা খননের মাধ্যমে মদিনা শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করেন। তাই ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'খন্দকের যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

খন্দকের যুদ্ধের কারণ

কুরাইশদের দূরভিসন্ধি: কুরাইশরা উহুদের যুদ্ধে জয়লাভ করলেও এ যুদ্ধের মাধ্যমে মূলত তাদের আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়নি। তারা মুসলমানদের বিনাশ করতে পারেনি। মদিনা দখল করাও কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে উহুদের যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। তাই তারা মুসলমানদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি: উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা মুহাম্মদ (স)-এর নির্দেশ অমান্য করে পরাজিত হলেও এ যুদ্ধের শিক্ষা নিয়ে তারা একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকে। তাদের এই শক্তি বৃদ্ধিতে মক্কার কুরাইশরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের সামাজিক, ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে শেষবারের মতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করলে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ে।

বেদুইনদের শত্রুতা: মদিনায় বসবাসকারী বেদুইনরা চিরকাল লুটতরাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু মুহাম্মদ (স) তাদের এসব কার্যকলাপ পছন্দ করতেন না। এমনকি তিনি কয়েকবার বেদুইনদের শাস্তিও প্রদান করেন। এর ফলে বেদুইনরা মুসলমানদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কুরাইশদের সাথে হাত মেলায়। এস. এম. ইমামুদ্দিন বলেন, "মক্কার উপকণ্ঠে বসবাসকারী বেদুইনদের সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক প্রভাব হ্রাস পেতে থাকলে তারা তাদের (কুরাইশদের) ডাকে সাড়া দেয়।"[২৫]

মুসলিম যাত্রীদলকে হয়রানি: মদিনার মুসলমানরা নিজেদের ব্যবসায়িক ও বিভিন্ন প্রয়োজনে দুমাতুল জন্দলের পথ দিয়ে চলাফেরা করত। কিন্তু দুমাতুল জন্দলের শাসকেরা ইহুদিদের প্ররোচনায় মুসলমানদের হয়রানি শুরু করলে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ইহুদিদের উসকানি: উহুদ যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মুহাম্মদ (স) বনু নাজির ও বনু কায়নুকা নামে দুটি ইহুদি গোত্রকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করেন। এই বহিষ্কৃত ইহুদিরা খাইবারের ওয়াদি-উল-কুরা ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথসহ বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করতে থাকে। এরা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় জনগণ ও শাসকদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকানি দিতে থাকে। ফলে অনেক গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

---

[২৫] As they were losing their social, religious and financial influences, the bedouin tribes living in the vicinity of Makkah also responded to their call.– Ref: S. M. Imamuddin, *Political History of the Muslim Spain*, p.53-54

খন্দকের যুদ্ধের ঘটনা

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে কুরাইশ, ইহুদি ও বেদুইনদের মিলিত শক্তি আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনা আক্রমণের জন্য রওনা হয়। এই যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীতে ৬০০ অশ্বারোহী ১০ হাজার যোদ্ধা অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে আসন্ন এ বিপদ থেকে মুসলমানদের রক্ষার জন্য মুহাম্মদ (স) তিন হাজার সৈন্যের একটি সেনাদল গঠন করেন। কিন্তু এত অল্প পরিমাণ সৈন্য নিয়ে উহুদ যুদ্ধে বিজয়ী কুরাইশদের মোকাবিলা করা কঠিন মনে করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য সালমান ফারসি নামে একজন সাহাবির পরামর্শে মুসলিম বাহিনী শহরের অরক্ষিত স্থানগুলোতে পরিখা খনন করেন। ফলে মুসলমানদের নিরাপত্তা অনেকটা নিশ্চিত হয়। ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে ৩১ মার্চ কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনী মদিনায় হামলা চালায়। কিন্তু পরিখা অতিক্রম করে হামলা চালাতে তারা ব্যর্থ হয়। দীর্ঘ ২৭ দিন অবরোধের পর খাদ্যাভাব এবং ঝঞ্ঝা ও প্রবল হিমেল হাওয়ায় কুরাইশ বাহিনী প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হলে আবু সুফিয়ান অবরোধ প্রত্যাহার করে মক্কা ফিরে যায়।

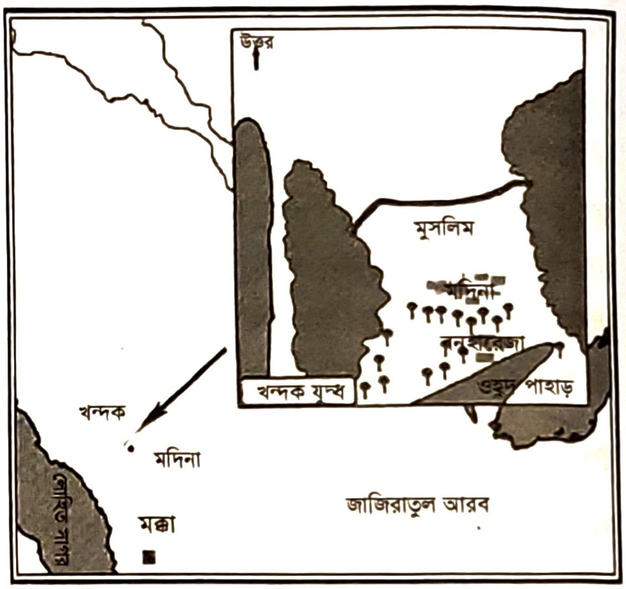

খন্দকের যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থান

কুরাইশ ও তার মিত্রদের পরাজয়ের কারণ

মুহাম্মদ (স)-এর যুদ্ধ পরিকল্পনা: আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (স) একজন রণকুশলী সেনানায়ক ছিলেন। তাঁর আদেশ অমান্য করার ফলেই উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছিল। তিনি কুরাইশদের মদিনা আক্রমণের সংবাদ শুনে ৩,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করেন। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তিনি সাহাবিদের সাথে আলোচনা করে নিজেদের সামরিক দুর্বলতার কথা চিন্তা করে শহরের ভেতর থেকেই শত্রুপক্ষের মোকাবিলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

পরিখা খনন: কুরাইশ ও তার মিত্রদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে মোকাবিলার জন্য মুহাম্মদ (স) সালমান ফার্সির পরামর্শে শহরের অরক্ষিত স্থানে গভীর পরিখা খননের ব্যবস্থা করেন। মহানবি (স) ৩ হাজার সাহাবিকে সাথে নিয়ে রমজান মাসে মদিনার উত্তর ও পশ্চিম দিকে গভীর পরিখা খনন করেন। তাই কুরাইশ ও মিত্রবাহিনী মদিনা নগরী অবরোধ করলেও তারা মদিনায় প্রবেশ করতে পারেনি। তাই এ যাত্রায় মুসলমানরা চরম ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। *দ্য ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম* গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'এ পরিখা মক্কার অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য প্রকৃত বাধা হিসেবে প্রমাণিত হয়।'[২৬]

মিত্রবাহিনীর মধ্যে কলহ: কুরাইশদের নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনী মদিনা আক্রমণে এসে মদিনায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে দীর্ঘ ২৭ দিন তাদের মদিনার বাইরে অবস্থান করতে হয়। এ সময় খাদ্যাভাব ও ঘোড়ার খাদ্যের ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মিত্রপক্ষের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এস. এম. ইমামুদ্দিন বলেন, 'পরবর্তী সময়ে মিত্রবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায় এবং তাদের দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিন কাটতে থাকে।'[২৭]

প্রাকৃতিক দুর্যোগ: কুরাইশ নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনী মদিনা আক্রমণে এসে পরিখার কারণে মদিনায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে বাইরে অবরোধ করে। কিন্তু তখন তীব্র শীত ও মরুঝড় শুরু হলে তাদের পক্ষে অবরোধ টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

খাদ্যাভাব: মিত্রবাহিনীর অবরোধের সংবাদ শুনে উহুদের শিক্ষা থেকে মুহাম্মদ (স) মদিনার দূরবর্তী ও নিকটবর্তী স্থানের খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্য যে অবস্থায় থাকুক না কেন কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। ফলে যখন মিত্রবাহিনী মদিনা অবরোধ করে তখন তাদের ও পশুর খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ফলে তারা অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়।

---

[২৬] The trench proved an effective barrier to the Maccan cavalry. –Ref: *The Cambridge History of Islam,* Voll-1 A. p 48-49.

[২৭] Meanwhile misunderstanding grew among the allies and the day was followed by a night of terror. -Ref: S. M. Imamuddin, *Political History of the Muslim Spain,* p.56.

খন্দকের যুদ্ধের ফলাফল

ইসলামবিরোধী ঐক্যজোটে ভাঙন: খন্দকের যুদ্ধে পরাজিত হলে ইসলামবিরোধী ঐক্যজোটে ভাঙন দেখা দেয়। কারণ অবরোধ চলাকালীন আবু সুফিয়ানের সাথে গাতফান গোত্র ও বনু কুরায়জা গোত্রের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ফলে এ ঐক্যজোটে ভাঙন দেখা দেয়।

কুরাইশদের সামরিক শক্তি হ্রাস: খন্দকের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর কুরাইশদের সাথে মিত্রদের সম্পর্ক ভেঙে যায়। ফলে কুরাইশদের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া এ যুদ্ধে কুরাইশদের বিপুল পরিমাণ সম্পদ নষ্ট হওয়ায় তারা আর যুদ্ধ করার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি।

ইসলামের ব্যাপক প্রসার: খন্দকের যুদ্ধের পর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের গতি বৃদ্ধি পায়। এ সময় মুহাম্মদ (স) মদিনার বাইরে ইসলামের বিস্তার সাধনে সচেষ্ট হন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এস. এম. ইমামুদ্দিন বলেন, "শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে (ইসলাম) ধর্ম প্রচারের কাজ সহজ হয়ে পড়ে।"[২৮]

ইহুদিদের শাস্তি প্রদান: খন্দকের যুদ্ধে বনু কুরায়জা গোত্র মুসলমানদের বিপক্ষে কুরাইশদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র ও সাহায্য করে। এ যুদ্ধে কুরাইশ ও তার মিত্রবাহিনী পরাজিত হলে মুহাম্মদ (স) বনু কুরায়জা গোত্রকে শাস্তি দিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইহুদিদের অনুরোধে মহানবি (স) তাদেরই নেতা সাদ ইবনে মু'আযকে বিচারক নিযুক্ত করেন। সাদ ইহুদি ধর্মগ্রন্থ অনুসারে বনু কুরায়জা গোত্রের পুরুষদেরকে হত্যা, মহিলা ও বালক-বালিকাদের দাস-দাসী হিসেবে ব্যবহার এবং তাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার রায় দেন। এ রায় সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'বর্তমানকালে এ শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বলে মনে হবে; কিন্তু সে সময় প্রচলিত যুদ্ধের প্রথা অনুসারে তা বিধিসম্মত ছিল।'[২৯]

মুহাম্মদ (স)-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি: খন্দকের যুদ্ধের পর মুহাম্মদ (স)-এর পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কেননা মদিনাকে রক্ষা করায় মদিনাবাসী তাঁকে একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে সম্মান দেখিয়েছিল। এছাড়া প্রতিপক্ষের বিশাল সেনাবাহিনীর ওপর মুসলমানদের বিজয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে মহানবি (স)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। *ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "এ অবরোধের ব্যর্থতা মুহাম্মদ (স)-এর জন্য এক বড় বিজয় ছিল।"[৩০]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পবিত্র কুরআনে কোন যুদ্ধকে 'আহযাবের যুদ্ধ' বলা হয়েছে?
২. 'খন্দক' শব্দের অর্থ কী?
৩. খন্দকের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*
৪. কার পরামর্শে খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন করা হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
৫. খন্দকের যুদ্ধের সময় কুরাইশরা কত দিন মদিনা অবরোধ করে রাখে?
৬. খন্দকের যুদ্ধে কাদের পরাজয় ঘটে?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

দুটি দলে বিভক্ত হয়ে একদল খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ এবং অন্যদল এ যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের কারণসমূহ চিহ্নিত করে দুটি স্লাইড তৈরি করো।

---

[২৮] The establishment of peace made easier the work of the propagation of the faith. – Ref: S. M. Imamuddin, *Political History of the Muslim Spain,* p.57

[২৯] This was a severe punishment according to our ideas, but it was customary according to the rules of war then prevalent.– Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens,* p.14

[৩০] The failure of the sieze was a great victory for Muhammad. –Ref: *Cambridge History of Islam,* Vol-A/ p.49.

পাঠ ১৪

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাথে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক

Relationship of Hazrat Muhammad (Sm) with the Jews and the Christians

ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক

মহানবি (স)-কে প্রতিশ্রুত নবি হিসেবে গ্রহণ: মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের আগে মদিনার ইহুদিরা তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের মাধ্যমে জানতে পারে যে, আরব ভূখণ্ডে একজন নবি আসবেন। তারা কামনা করত যে, তাদের মধ্য থেকেই এই নবির আবির্ভাব হবে। মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত লাভের পর তারা তাঁকে 'Promised Prophet' বা 'প্রতিশ্রুত পয়গম্বর' হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এমনকি তারা মহানবি (স)-কে মদিনায় আমন্ত্রণও জানিয়েছিল।

ইহুদিদের সাথে সুসম্পর্ক: হিজরতের পর প্রথমদিকে ইহুদিদের সাথে রাসুল (স)-এর সম্পর্ক ভালো ছিল। ঐতিহাসিক শিবলী নোমানীর মতে, রাসুলুল্লাহ (স) অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন বিষয়ে ইহুদিদের অনুসরণ করতেন। বোখারি শরিফেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক এম ওয়াট বলেন, 'নবি মুহাম্মদ (স) মদিনার ইহুদিদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য ১০ মহররম তাদের মুক্তির দিনে রোজা রাখতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবি (স) ও তাঁর অনুসারীরা ইহুদিদের যাবতীয় খাদ্য গ্রহণ করতেন।' হিজরতের পর মহানবি (স) মদিনায় বসবাসকারী ইহুদিসহ সব জাতি-ধর্মের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে 'মদিনা সনদ' নামে একটি ঐতিহাসিক মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ সনদে সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলা হয়।

জেনে রাখো

মানবজাতির হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহর প্রেরিত চারটি বড় আসমানি কিতাবের মধ্যে তাওরাত একটি। এটি হযরত মুসা (আ)-এর ওপর নাজিল করা হয়। হযরত মুসা (আ)-এর কওম তথা বনি ইসরাইল জাতির হেদায়েতের জন্য এ কিতাব নাজিল করা হয়েছে। এটি হিব্রু ভাষায় রচিত।

ইহুদিদের সাথে সম্পর্কের অবনতি: ঐতিহাসিক ইবনে হায়কলের মতে, 'নাজরানের ষাট সদস্যবিশিষ্ট খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দল মদিনায় মহানবি (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ এবং সম্মেলনে যোগ দিলে ইহুদি-মুহাম্মদ (স) সম্পর্কের অবনতি ঘটে।' তাছাড়া ইহুদি কবিদের রচিত কবিতা তৎকালীন ইহুদি-মুসলিম সম্পর্ক আরও জটিল করে তোলে। ইহুদিরা প্রায়ই ধর্মীয় বিভিন্ন জটিল ও বিতর্কিত বিষয় উত্থাপন করে নবমুসলিমদের বিশ্বাসে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করে। সৈয়দ মাহামুদুন্নাসির বলেন, 'ইহুদিরা ইসলামের বিরুদ্ধে অনিষ্টকর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল, ফলে তিক্ততা বেড়েই চলছিল।'[৩১]

গোপন ষড়যন্ত্র: ইহুদিরা মনে করেছিল যে, মুহাম্মদ (স) মদিনায় তাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হবেন। এ জন্য তারা মহানবি (স)-এর সহায়তায় মদিনায় একটি ইহুদি ফ্রন্ট গড়ে তুলবে বলে মহানবি (স)-কে আহ্বান করেছিল। কিন্তু ইসলামের উদীয়মান শক্তিতে তাদের সে আশা সফল হয়নি। ফলে আউস ও খাযরাজ গোত্রের ভেতরে বিদ্রোহ সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা তৎপর হয়ে ওঠে এবং গোপনে মক্কার কুরাইশদের সাথে ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

বনু কায়নুকা গোত্রের সন্ধিভঙ্গ ও বহিষ্কার: সে সময়ে মদিনায় বনু কায়নুকা, বনু নাজির ও বনু কুরায়জা নামে তিনটি ইহুদি গোত্র বাস করত। অল্পদিনের মধ্যেই বনু কায়নুকা গোত্রের লোকেরা মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে। সন্ধির শর্তানুসারে বদরের যুদ্ধে তাদের মুসলমানদের সাহায্য করার কথা ছিল। কিন্তু তারা সাহায্য না করে গোপনে কুরাইশদের সাহায্য করে। তারা প্রকাশ্যভাবে মহানবি (স) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। তাদের এসব কার্যকলাপের কারণে মহানবি (স) শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা থেকে বিতাড়িত করেন।

বনু নাজির গোত্রের নির্বাসন: উহুদের যুদ্ধের সময় ইহুদিদের বনু নাজির গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করে। এমনকি আমিন বিন জাহাস নামের জনৈক ইহুদি পাথর নিক্ষেপ করে মুহাম্মদ (স)-কে মারার অপচেষ্টা করে। তাদের এরূপ ষড়যন্ত্র ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে বাধ্য হয়ে মহানবি (স) এ গোত্রের দুই নেতা কাব বিন আশরাফ ও আবু রাফীকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং অন্য সবাইকে অবিলম্বে মদিনা ত্যাগ করতে আদেশ দেন। এতে তারা বিদ্রোহী হলে মহানবি (স) শাস্তিস্বরূপ বনু নাজিরদের ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা থেকে বহিষ্কার করেন।

---

[৩১] The Jewish malice aganist Islam, howerver, kept growing in bitterness. – Ref: Syed Mahmmudunnasir, *Islam Its Concepts and History*, p.104.

বনু কুরায়জা গোত্রের ষড়যন্ত্র: ইহুদিদের বনু কুরায়জা গোত্র ছিল বেইমান ও বিশ্বাসঘাতক। তারা উহুদের যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের সাথে ভালো আচরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে তারা কুরাইশদের সমর্থন করে, এমনকি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মদিনার মুসলমানদের হত্যা ও রক্তপাত দ্বারা জীবন বিপন্ন করে তোলে। এজন্য খন্দকের যুদ্ধের পর মুহাম্মদ (স) তাদের অবরোধ করেন। তাদের প্রস্তাব অনুসারে সাদ বিন মুয়াজকে বিচারক নিয়োগ করা হয়। তিনি আইন অনুসারে বনু কুরায়জা গোত্রের সব পুরুষকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদের দাস হিসেবে বন্দি করার নির্দেশ দেন।

খাইবারের যুদ্ধ: মদিনা থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী খাইবারে বসতি স্থাপন করে। তারা সেখান থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং বনু সাদ ও বনু গাতফান গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। এছাড়া মুসলমানদের বাড়ি লুট ও বহু মুসলমানকে হত্যা করে। এ সংবাদ পেয়ে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স) ২০০ অশ্বারোহী ও ১৬০০ পদাতিক সৈন্য নিয়ে খাইবার অবরোধ করেন। বাধ্য হয়ে ইহুদিরা মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

মুহাম্মদ (স)-কে হত্যার চেষ্টা: ইহুদিরা সর্বশেষে মহানবি (স)-এর জীবননাশের চেষ্টা চালায় বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মুহাম্মদ (স) রক্ষা পান। এরপরও মহানবি (স) তাদের ক্ষমা করেন। তবে শুধু অপরাধী জয়নবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। খলিফা ওমর তাদেরকে সিরিয়া থেকে তাড়িয়ে দিলে প্রাথমিক মুসলিম সাম্রাজ্য অনেকটা নিরাপদ হয়।

ইহুদি নীতির সমালোচনা: ইহুদিদের প্রতি মহানবি (স)-এর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে কিছু ইউরোপীয় ঐতিহাসিক যেমন— স্প্রেঙ্গার, উইল ও অসবর্ন প্রমুখ নানা সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে, মুহাম্মদ (স) মদিনার ইহুদিদের সাথে অত্যন্ত কঠোর ও গর্হিত আচরণ করেছেন। ইহুদিদের মদিনা থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং অনেককে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু ৬২২ থেকে ৬২৮ খ্রি. পর্যন্ত মদিনার সার্বিক পরিস্থিতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখা যায় ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের এসব মন্তব্য সঠিক নয়। কারণ মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করে মদিনায় বসবাসরত সব গোত্রের লোকদের নিয়ে একটি প্রজাতন্ত্র গঠন করেন। মদিনা সনদে স্বাক্ষরের মাধ্যমে সবাই একত্রে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও ইহুদিরা বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে এ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করে, যা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। তারা শুধু ধর্ম ও রাষ্ট্রদ্রোহী কাজই করেনি, তারা মুহাম্মদ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত ছিল। এছাড়া বনু কায়নুকা ও বনু নাজির গোত্র মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে মদিনার শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করলে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাই এসব দিক বিবেচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মদিনার ইহুদিদের প্রতি মুহাম্মদ (স)-এর নীতি সঠিক ও মানবিক ছিল। ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল বলেন, 'এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মদিনা অবরোধের সময় এসব লোক (ইহুদিরা) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী ছিল।' উইলিয়াম মুর ইহুদিদের শাস্তি প্রদান সম্পর্কে বলেন, 'যে কারণে মহানবি (স) ইহুদিদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তা ছিল রাজনৈতিক, ধর্মীয় নয়।'[৩২]

খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পর্ক

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিককালে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালায়। কুরাইশদের এ অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির জন্য মুসলমানদের কয়েকটি প্রতিনিধি দল আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টান সম্রাট নাজ্জাসির দরবারে আশ্রয় নিয়েছিল। এছাড়া মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবি (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন মদিনায় বসবাসকারী অন্যান্য গোত্রগুলোর মতো খ্রিষ্টানরাও মহানবি (স)-এর সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ফলে মুসলমানদের সাথে মদিনার খ্রিষ্টানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

---

[৩২] The ostensible ground for which Muhammad (Sm) punished the Jeus was political and not religious.

খ্রিষ্টানদের মহানবি (স)-এর সনদ প্রদান: ইসলামের দুঃসময়ে বন্ধুত্বসুলভ ব্যবহারের কথা মনে করে ষষ্ঠ হিজরি সনে তিনি সিনাই পর্বতের কাছাকাছি অবস্থিত সেন্ট ক্যাথারিন গির্জার পাদরি ও অন্য খ্রিষ্টানদেরকে একটি সনদ প্রদান করেন। সনদের শর্তসমূহ হলো:

১. খ্রিষ্টানদের ওপর অন্যায়ভাবে কোনো কর ধার্য করা যাবে না।
২. কোনো খ্রিষ্টান ধর্মযাজককে গির্জা থেকে বহিষ্কার করা যাবে না।
৩. কোনো খ্রিষ্টানকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা যাবে না।
৪. কোনো খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীকে তীর্থযাত্রা থেকে বিরত করা যাবে না।
৫. খ্রিষ্টানদের কোনো গির্জা ভেঙে সেখানে কোনো মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না।
৬. গির্জা কিংবা কোনো উপাসনালয় মেরামত করার সময় যদি কোনো খ্রিষ্টান কোনো মুসলমানের সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাকে সাহায্য করবে।
৭. স্বধর্ম ত্যাগ না করেও যেকোনো খ্রিষ্টান নারী যেকোনো মুসলমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য কোনো প্রকার জুলুম করতে পারবে না।
৮. আরবের বাইরের খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে সে জন্য আরবের খ্রিষ্টানদের দায়ী করা যাবে না।

সংখ্যালঘুদের জানমাল ও ধর্মের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে এ সনদ সত্যিই এক মহান দৃষ্টান্তস্বরূপ। আর তাই সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'সব খ্রিষ্টানের কাছে সনদ হিসেবে একটি অসাধারণ সহিষ্ণুতার কীর্তি স্তম্ভস্বরূপ এটি জগতে এখনও দেদীপ্যমান আছে।'[৩৩] অবশ্য পরবর্তী সময়ে মুতায় মুসলিম দূত হত্যাকে কেন্দ্র করে খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইহুদিরা কোন গ্রন্থের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের কথা জানতে পেরেছিল?
২. কারা মহানবি (স)-কে 'Promised Prophet' বা 'প্রতিশ্রুত পয়গম্বর' হিসেবে গ্রহণ করেছিল?
৩. মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করেছিল কারা?
৪. খাইবারের যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল কাদের বিরুদ্ধে?
৫. কারা বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর জীবননাশের চেষ্টা করে?
৬. মদিনায় কাদের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. যেসব ইহুদি গোত্র মহানবি (স)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের একটি তালিকা তৈরি করো।
২. মদিনা সনদের যে ধারাগুলো খ্রিষ্টানদের অনুকূলে ছিল তা চিহ্নিত করো।

গ. দলীয় কাজ

মহানবি (স)-এর ইহুদি নীতির ওপর একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

---

[৩৩] To all Christians, a charter, which is a monument of enlightended tolerance. –Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.14

পাঠ ১৫ ও ১৬

হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬২৮ খ্রি.) এবং এর গুরুত্ব
The Treaty of Hudaybiyah (628 AD) and Its Importance

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে রাসুল (স) মক্কার কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এ সন্ধি ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এর মাধ্যমে মুসলমানরা সর্বপ্রথম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে স্বাক্ষর করে মহানবি (স) অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তাই হুদায়বিয়ার সন্ধিকে মহানবি (স)-এর জীবনের 'Land Mark' বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে অভিহিত করা হয়। পবিত্র কুরআনে এটিকে 'ফাতহুম মুবিন' (Evident Victory) বা প্রকাশ্য বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হুদায়বিয়া সন্ধির পটভূমি: হিজরতের পর দীর্ঘ ছয় বছর মহানবি (স) ও মুহাজিররা (হিজরতকারী) জন্মভূমি মক্কা পরিদর্শন এবং হজ পালন করতে পারেননি। অনেকের মন প্রিয় মাতৃভূমিকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই রাসুল (স) মক্কা সফর ও উমরা পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তৎকালীন আরবের নিয়ম অনুসারে জিলকদ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। এ জন্য মহানবি (স) তাঁর ১৪০০ জন সাহাবি নিয়ে ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসের ২৫ তারিখে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। ইবনে ইসহাক-এর বর্ণনা মতে, মহানবি (স) রওনা হয়ে যখন উসফান নামক স্থানে পৌঁছেন তখন সুফিয়ান আল-কারীর পুত্র বিশর মহানবি (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল, কুরাইশরা আপনার যাত্রার সংবাদ পেয়ে চিতাবাঘের চামড়ার পোশাক পরিধান করে মক্কা থেকে রওনা হয়েছে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে আপনাকে কোনোক্রমেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তারা 'যতুওয়া' নামক স্থানে প্রতিরোধ গড়েছে। এমনকি কুরাইশরা রাসুল (স)-এর গতিরোধ করার জন্য খালিদ ও একরামার নেতৃত্বে একদল লোক পাঠায়। মহানবি (স) কুরাইশদের দুরভিসন্ধির কথা অবগত হয়ে মক্কার ৯ মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। তিনি খোজা সম্প্রদায়ের বুদাইল নামের এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাদেরকে জানান যে, মুসলমানরা শুধু হজ পালনের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, যুদ্ধ করতে নয়। কুরাইশরা মহানবি (স)-এর কথা বিশ্বাস করে আবওয়া নামে এক ব্যক্তিকে আলোচনার জন্য পাঠায়। কিন্তু তার দুর্ব্যবহারে আলোচনা ব্যর্থ হয়।

বায়াতুর রিদওয়ান: আবওয়ার সাথে আলোচনা ব্যর্থ হলে মহানবি (স) প্রথমে খেরাস ইবনে উমাইয়া খাযায়ী এবং পরে হযরত ওসমান (রা)-কে কুরাইশ নেতাদের কাছে শান্তি আলোচনার জন্য পাঠান। এ সময় তারা ওসমান (রা)-কে বন্দি করে রাখে। ফলে মুসলিম শিবিরে একথা ছড়িয়ে পড়ে যে, কুরাইশরা তাকে হত্যা করেছে। এ সংবাদ শুনে মুসলমানরা প্রয়োজনে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সুদৃঢ় শপথ করে। এ শপথকে ইসলামের ইতিহাসে 'বায়াতুর রিদওয়ান' বলা হয়। তারা একটি গাছের নিচে এ শপথ করেছিল বলে একে 'বায়াতুস শাজারা'ও বলা হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর: মুসলমানদের প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ গ্রহণের খবর পেয়ে কুরাইশরা ওসমান (রা)-কে মুক্তি দেয় এবং সুহায়েল বিন আমরের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। মহানবি (স) সানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অনেক যুক্তিতর্কের পর কুরাইশদের সাথে মহানবি (স)-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। হুদায়রিয়ার সন্ধির শর্তাবলি লিপিবদ্ধ করেন হযরত আলি (রা)। এ সন্ধির প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. এ বছর অর্থাৎ সন্ধির বছর (৬২৮ খ্রি.) মুসলমানরা হজ না করে মদিনায় ফিরে যাবে।
২. পরবর্তী বছর (৬২৯ খ্রি.) মুসলমানরা হজ করতে পারবে। কিন্তু তারা তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না। এ সময় তারা হজ করতে এলে কুরাইশরা ঐ তিন দিন মক্কার বাইরে অবস্থান করবে।

৩. মুসলমানরা হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসার সময় শুধু আত্মরক্ষার জন্য কোষবন্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কোনো মারণাস্ত্র সাথে আনতে পারবে না।

৪. মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে পরবর্তী দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

৫. কোনো কুরাইশ মক্কা ছেড়ে মদিনায় গেলে মুসলমানরা তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু কোনো মুসলমান মদিনা থেকে মক্কায় এলে কুরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে না।

৬. আরবের যেকোনো গোত্র ইচ্ছা করলে মুসলমান বা কুরাইশদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে। এতে কোনো পক্ষই আপত্তি করতে পারবে না।

৭. হজের সময় কুরাইশরা মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করবে। বিনিময়ে মক্কার বণিকেরা নির্বিঘ্নে মদিনার পথ দিয়ে সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে পারবে।

৮. মক্কার কোনো নাবালক তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুসলমানদের দলে যোগ দিলে তাকে ফেরত দিতে হবে।

৯. চুক্তির মেয়াদকালে উভয়পক্ষের মানুষের নিরাপত্তা পুরোপুরি নিশ্চিত করতে হবে। একে অপরের কোনো ধরনের ক্ষতি করতে পারবে না।

১০. সন্ধির শর্তাবলি উভয়পক্ষ পুরোপুরি মেনে চলবে।

সন্ধিটি লেখা শেষ হলে মুসলমানদের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন আবু বকর (রা), ওমর বিন খাত্তাব (রা), আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা) এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা)। কুরাইশদের পক্ষে সুহায়েল বিন আমর এবং মুকাররাম বিন হাফাস স্বাক্ষর করেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব ও ফলাফল

শ্রেষ্ঠ বিজয়: আপাতদৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি কুরাইশদের অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে এটি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনে। এ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে মহানবি (স) এক অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। হযরত আবু বকর (রা) বলেন, 'হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে আমরা যেরূপ জয়ী হয়েছি সেরূপ কখনও হইনি।' এ চুক্তির মাধ্যমে কুরাইশরা প্রথমবারের মতো মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তারা মহানবি (স)-কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। এ কারণে পবিত্র কুরআনে এ সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা প্রকাশ্য বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠা: হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে দশ বছর যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হওয়ায় মুসলমানরা নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করার সুযোগ লাভ করে। 'ইসলামি বিশ্বকোষে' বলা হয়েছে, 'এ সন্ধির ফলে মুসলমানরা ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ থেকে অব্যাহতি পেল এবং এটি ছিল মুসলিম বিজয়ের প্রথম পর্যায়।' পি. কে হিট্টি বলেন, 'এ সন্ধির মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ (স)-এর অনুসারী ও কুরাইশদের মধ্যকার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।'[৩৪]

ইসলামের দ্রুত প্রসার: হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ দিন দিন প্রশস্ত হতে থাকে। ইসলামের সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে কুরাইশরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। রাসুল (স)-এর নবুয়ত লাভের পর উনিশ বছর কঠোর পরিশ্রমের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা হয়েছিল ১৪০০ জন। অথচ হুদায়বিয়ার সন্ধির মাত্র দুই বছর পর মুসলমানদের সংখ্যা হয় ১০,০০০ জন। এ সন্ধির পর মুসলিম দূতরা আরবের বাইরে বিভিন্ন দেশের রাজদরবারে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়। ফলে অল্পদিনের মধ্যে ইসলাম ধর্ম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। আরব ঐতিহাসিক আজ-জুহরি বলেন, "পৌত্তলিকদের মধ্যে এমন কোনো সুবিবেচক লোক ছিল না যে ইসলামের ছায়াতলে আসতে প্রলুব্ধ হয়নি।"

---

[৩৪] This treaty practically ended the war of Muhammad with his people the Quraysh. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.118

ইসলামের শ্রেষ্ঠ বীর ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণ: হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আস ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে পি. কে হিট্টি বলেন, "খালিদ ও আমর ইসলামের সামরিক অভিযানে শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিলেন।"[৩৫] এ সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরই মক্কার বনু খোজা সম্প্রদায় মুহাম্মদ (স)-এর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এছাড়া আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করায় ইসলামের শক্তি আরও সুসংহত হয়।

শত্রুর জোটে ভাঙন: মুহাম্মদ (স)-এর প্রচেষ্টায় মদিনায় ইসলাম শক্ত ভিত গড়ে তোলায় নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইহুদিসহ অন্যান্য ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠী কুরাইশ ও বেদুইন গোত্রের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। কিন্তু হুদায়বিয়ার সন্ধি সাক্ষরিত হওয়ার পর কুরাইশরা নিরপেক্ষ হয়ে পড়ে। এ সময় খাইবার অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদিরা মুসলমানদের হত্যা ও সম্পদ লুটসহ বিভিন্ন ধরনের শত্রুতামূলক কাজে লিপ্ত হয়। ফলে মুহাম্মদ (স) তাদের শায়েস্তা করার জন্য ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৬০০ মুজাহিদ নিয়ে খাইবার অভিমুখে যাত্রা করেন। যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত আলি (রা) অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। বীরত্ব ও সাহসের সাথে তিনি কামুস দুর্গের ফটক খুলে রাসুল (স)-এর কাছ থেকে 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) উপাধি পান। পরাজিত ইহুদিরা মহানবি (স)-এর আনুগত্য স্বীকার করে। তিনি জিজিয়া (নিরাপত্তা কর) গ্রহণের বিনিময়ে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

মদিনা প্রজাতন্ত্র গঠন ও মক্কা বিজয়ের সূচনা: ঐতিহাসিক এম. ওয়াট বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মক্কাবাসী মদিনা প্রজাতন্ত্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র এবং মুহাম্মদ (স)-কে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকার করে নেয়। অন্যদিকে দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকায় মুসলমানরা ইসলামের প্রসার ও মদিনা প্রজাতন্ত্রের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করে। এ সন্ধির পর ইসলাম দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তার অবশ্যম্ভাবী সুফল ছিল মাত্র দুই বছর পর ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয়।

বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ: হুদায়বিয়ার সন্ধি সাক্ষরিত হওয়ার পর মহানবি (স) অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। এরপর তিনি কয়েকজন অভিজ্ঞ সাহাবির পরামর্শে 'আল্লাহ' এবং নিজের নাম মোহরাঙ্কিত করে মিসর, সিরিয়া, কনস্টান্টিনোপল, আবিসিনিয়া, পারস্য, ওমান, ইয়েমেন, বাহরাইন, ইয়ামামা প্রভৃতি দেশে দূত প্রেরণ করেন। মহানবি-এর প্রেরিত দূতদের মধ্যে ছিলেন হযরত দিয়াহ ইবনে খলিফা কালবী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাইফা, হযরত আমর ইবনে উমাইয়া, হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতা, হযরত আমর ইবনে আস সাহমী, হযরত সালীত ইবনে আমর, হযরত আলা ইবনে হাযরামী, হযরত সুজা ইবনে ওয়াহাব এবং হযরত মুহাজির ইবনে উমাইয়া মাযযুমী। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলিম দূতকে সাদরে গ্রহণ করলেও রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণ করেননি। ইয়েমেনের শাসনকর্তা বাজান, বাহরাইনের শাসনকর্তা মুনজির, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসি ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, বসরার শাসনকর্তা হারেস ও ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওজা মুসলিম দূতকে অপমান করেন এবং সিরিয়ার গাচ্ছান বংশীয় খ্রিষ্টান রাজা সুরাহবিল আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে মুসলিম দূতকে হত্যা করেন। এর ফলে মুসলিম-খ্রিষ্টান দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

---

[৩৫] Khalid Ibn-al-Walid and Amr ibn-al-As, destined to become the two mighty swords of militant Islam. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.118

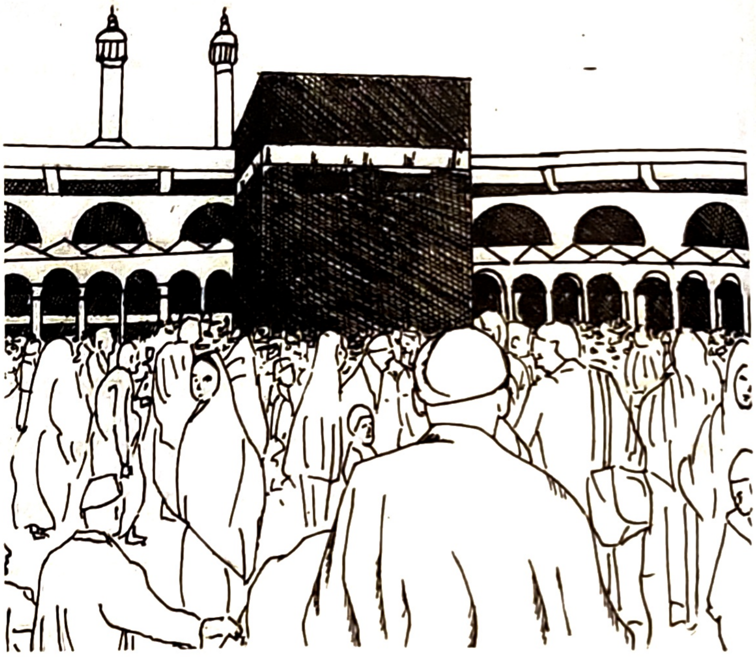
কাবা শরিফ

মুলতবি হজ: হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী মদিনার মুসলমানরা মহানবি (স)-এর সাথে মুলতবি হজ পালনের উদ্দেশ্যে পরের বছর ৭ম হিজরি সনের জিলহজ মাসে সমবেত হয়। এ সময় মহানবি (স) ২০০০ জন সাহাবির এক বিশাল কাফেলাসহ মক্কায় গিয়ে হজ আদায় করেন। তখন তিনি মক্কার কোনো আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করেননি কিংবা (স) তাদের ঘরেও যাননি। সন্ধির শর্ত পালন করে তিনি সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী এ সময় মক্কার কুরাইশরাও ৩ দিন মক্কার বাইরে অবস্থান করে।

মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রি.): রোমান সামন্তরাজ সুরাহবিল মুসলিম দূতকে সিরিয়ার সীমান্তে মুতা নামক স্থানে হত্যা করলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাধ্য হয়ে মহানবি (স)-কে সর্বপ্রথম আরবের বাইরে অভিযান প্রেরণ করতে হয়। ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাঁর দত্তক পুত্র যায়েদের নেতৃত্বে ৩,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। রোমের সৈন্যসংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। তুমুল যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি যায়েদ নিহত হন। এরপর ক্রমান্বয়ে জাফর ইবনে আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহ মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তারা উভয়েই শহিদ হলে খালিদ বিন ওয়ালিদ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং মুসলমানরা জয়লাভ করে। খালিদ তার অসীম বীরত্বের জন্য 'সাইফুল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর তরবারি' খেতাবে ভূষিত হন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মহানবি (স) কাদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করেন?
২. হুদায়বিয়ার সন্ধি কত খ্রিষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়? *[রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো. ২০১৭]*
৩. 'ফাতহুম মুবিন' অর্থ কী? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]*
৪. হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক কে ছিলেন?
৫. হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কত বছর যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকার কথা বলা হয়?
৬. মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমর ইবনুল আস কোন ঘটনার পর ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

'হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের পথ সুগম করেছিল'— বিষয়টির ওপর একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

পাঠ ১৭

মক্কা বিজয় (৬৩০ খ্রি.) এবং এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য
The Conquest of Makkah (630 AD) and Its Importance and Significance

রক্তপাতহীন মক্কা বিজয় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তৎকালীন আরব বিশ্বে মক্কা ছিল বেশ প্রভাবশালী এবং প্রবল প্রতিপত্তির অধিকারী। গোটা আরবে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এ মক্কাই ইসলামের জন্য সবচেয়ে বেশি হুমকি ছিল। তাই রাসুল (স) মক্কা ছেড়ে মদিনায় যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি এবং এর শান্তিনীতি ও উদারতা মহানবি (স)-কে আবার মক্কায় ফিরিয়ে নিয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের কারণ

মক্কার অভ্যন্তরীণ অবস্থা: মক্কা বিজয়ের আগে মক্কার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা আবু জেহেল এবং আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। গোত্রীয় স্বার্থ ও রাজনৈতিক অনৈক্য মক্কার শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এ অবস্থায় ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে মহানবি (স)-এর মহানুভবতা ও ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মক্কার খালিদ বিন ওয়ালিদ, আমর বিন আস ও ওসমান বিন তালহার মতো বীরদের ইসলাম গ্রহণ মক্কা বিজয়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ: হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখার শর্ত ছিল। কিন্তু কুরাইশরা মাত্র দুই বছরের মধ্যে এ শর্ত ভঙ্গ করে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বনু খোজা ও বনু বকর গোত্র যথাক্রমে মহানবি (স) ও কুরাইশদের সাথে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। কুরাইশদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে বনু বকর সম্প্রদায় বনু খোজা সম্প্রদায়ের ওপর হামলা এবং কিছু লোককে হত্যা করে। এর মাধ্যমে হুদায়বিয়ার সন্ধি লঙ্ঘিত হয়। কুরাইশদের হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন ও অবমাননা ছিল মক্কা বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ।

খোজা গোত্রের প্রার্থনা ও মহানবি (স)-এর মক্কা অভিযান: ক্ষতিগ্রস্ত খোজা গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মহানবি (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। যুদ্ধ এড়াবার জন্য তিনি কুরাইশদের কাছে তিনটি প্রস্তাব দেন। ১. অন্যায়ভাবে নিহত খোজা সম্প্রদায়ের লোকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ২. বনু বকর সম্প্রদায়কে সকল প্রকার সাহায্যদানে বিরত থাকতে হবে; অথবা ৩. হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলি বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে। কুরাইশরা শেষোক্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে মহানবি (স) হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল ঘোষণা করে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি নেন।

মক্কা বিজয়ের ঘটনা

মহানবি (স) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের (রমযান, অষ্টম হিজরি) জানুয়ারি মাসে প্রায় ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে মক্কা অভিযানে বের হন। মুসলিম বাহিনীর আগমনে কুরাইশরা ভীত হয়ে পড়ে। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান গোপনে মুসলিম সৈন্য সমাবেশ দেখতে এসে মুসলমানদের হাতে ধরা পড়েন এবং ইসলাম কবুল করেন। মহানবি (স) মক্কায় প্রবেশ করলে আবু সুফিয়ান তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি এবং হযরত আব্বাস (রা) কুরাইশদের মহানবির কাছে আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধ করেন। এর ফলে বলতে গেলে বিনা বাধায় বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজিত হয়। বিজয়ী মহানবি (স) মক্কাবাসীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন- ১. যে অস্ত্র ত্যাগ করবে সে নিরাপদ, ২. যে কাবাগৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, ৩. যে নিজ গৃহে অবস্থান করবে সেও নিরাপদ এবং ৪. যে বা যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে অবস্থান নিবে তারাও অভয়প্রাপ্ত।

মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রক্তপাতহীন মহাবিজয়: ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা বিজয় ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে রক্তপাতহীন এক ঐতিহাসিক বিজয়। মুহাম্মদ (স) মক্কা জয়ের পর সবাইকে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা করলে বিশ্ববাসী এক রক্তপাতহীন মহাবিজয় প্রত্যক্ষ করে। ঐতিহাসিক পি. কে হিট্টি বলেন, "প্রাচীন ইতিহাসে এটি একটি অতুলনীয় বিজয়।"[৩৬] বিখ্যাত বীর আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সিজার ও নেপোলিয়নের দেশজয় ছিল নিরীহ জনসাধারণের রক্তপাতের ইতিহাস, কিন্তু এ রক্তপাতহীন বিজয় ছিল সমগ্র আরব উপদ্বীপে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

উদারতা ও মহানুভবতার বিজয়: দীর্ঘ তেরো বছর ধরে মুহাম্মদ (স) নির্যাতন সহ্য করে পরম প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। আট বছর নির্বাসনে থাকার পর বিজয়ীর বেশে মাতৃভূমিতে তিনি প্রবেশ করেন। কুরাইশদের অতীতের সমস্ত অপমান ও অন্যায় ভুলে গিয়ে তিনি তাদের প্রতি সর্বজনীন ক্ষমা প্রদর্শন করে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত

---

[৩৬] Hardly a triumphal entry in ancient annals is comparable to this.–Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs,* p.118

স্থাপন করেন। তাঁর এ উদারতা ও মহানুভবতা ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই অতুলনীয়। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "জয়ের সমগ্র ইতিহাসে মক্কা বিজয়ের তুলনা নেই।"[৩৭] ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেন, "যে মক্কাবাসী এত দিন ধরে মুহাম্মদ (স)-কে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেছিল, তাদের প্রতি তাঁর এ উদার ব্যবহার সত্যিই প্রশংসনীয়।"[৩৮]

মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয়: মুহাম্মদ (স)-এর মক্কার এ বিজয় ছিল মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয়, অন্যায়ের ওপর ন্যায়ের বিজয়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষমার বিজয়। মক্কা বিজয়ের পর থেকে মহানবি (স) মক্কার সর্বময়কর্তা ও একচ্ছত্র অধিপতি হলেন। তাঁর জীবন সাধনায় সফলতা অর্জন করেন তিনি। আল্লাহর ঘরের মর্যাদা ফিরিয়ে এনে তিনি বলেন, "অসত্য দূরীভূত হয়ে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে। প্রত্যেক অসত্যই অস্থায়ী।" এস. এম. ইমামুদ্দিন বলেন, "মক্কা বিজয় মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয় ছাড়া কিছুই নয়।"[৩৯]

পৌত্তলিকতার অবসান ও একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা: মহানবি (স)-এর মক্কা বিজয় ছিল পৌত্তলিকতার (মূর্তি পূজা) ওপর একত্ববাদের (তাওহিদ) বিজয়। ওই সময় আরবের মধ্যে মক্কাই ছিল পৌত্তলিকতার কেন্দ্রস্থল। পবিত্র কাবাঘরেই ৩৬০টি মূর্তি ছিল। রাসুল (স) এসব মূর্তি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। এর ফলে দীর্ঘদিনের পৌত্তলিকতার অবসান ঘটে এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। মক্কা থেকে পৌত্তলিকতা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। মহান আল্লাহ আল-কুরআনে বলেন, "সত্য এসেছে, মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে।" (সূরা বনি ইসরাইল, ৮১)

রাজনৈতিক গুরুত্ব: মক্কা বিজয়ের সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল অতুলনীয়। মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এ জন্য ঐতিহাসিক নিকলসন বলেন, "মক্কাবাসীর আত্মসমর্পণে আরব উপদ্বীপে রাসুল (স)-এর অপর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না।" মহানবি (স)-এর মহত্ত্ব ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে দলে দলে পৌত্তলিকরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তাই এ বিজয়কে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় বলা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয় করেন? *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]*
২. কুরাইশদের হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন কোন ঘটনার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল?
৩. কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান কখন ইসলাম গ্রহণ করেন?
৪. কোনটিকে রক্তপাতহীন মহাবিজয় বলা হয়?
৫. মক্কা বিজয়ের ফলে কোনটির অবসান ঘটে?
৬. মক্কা বিজয়ের ফলে কোনটি প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মহানবি (স)-এর মক্কা বিজয়ের কারণগুলো ছক আকারে লেখো।

গ. দলীয় কাজ

কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে বিশ্বের বিখ্যাত বীরদের দেশ জয় থেকে মহানবি (স)-এর মক্কা বিজয়কে কীভাবে আলাদা করা যায় তা ছক আকারে লেখো।

---

[৩৭] Through all the annuals of conquest there has been no triumphant entry like unto this one. –Ref: *A Short History of the Saracens*, p.16

[৩৮] The magnanimity with which Muhammad treated a people which had so long hated and rejected him, was worthy of admiration.–Ref: William Muir, *The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall.*

[৩৯] The conquest of Makkah was nothing but the supremacy of truth over falsehood. –Ref: S. M. Inamuddin *Political History of the Muslim Spain*, p.75

পাঠ ১৮

মক্কা বিজয় পরবর্তী অভিযানসমূহ
Campaigns after the Conquest of Makkah

হুনায়ুনের যুদ্ধ (জানুয়ারি ৬৩০ খ্রি.): ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমানরা মুহাম্মদ (স)-এর নেতৃত্বে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা জয় করে। কিন্তু মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত হাওয়াজিন এবং সাকিফ গোত্রদ্বয় এরপরও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। এ গোত্রদুটি কাবাগৃহে পৌত্তলিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য পার্শ্ববর্তী কিছু বেদুইন গোত্রের সাথে জোট গঠন করে। তারা ২০,০০০ সৈন্যসহ মক্কার তিন মাইল দূরে অবস্থিত হুনায়ুন উপত্যকায় সৈন্য সমাবেশ করে। মুহাম্মদ (স) ১২,০০০ মুসলিম সৈন্য নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হন। হুনায়ুন উপত্যকার পাহাড়ি পথ পার হওয়ার সময় পর্বত গুহায় লুকিয়ে থাকা বেদুইন সৈন্যরা হঠাৎ মুসলমানদের ওপর তীর নিক্ষেপ শুরু করে। মুসলিম সেনাদের অনেকে আহত হয়ে পালাতে শুরু করে। এ পরিস্থিতিতে মহানবি (স) তাদের যুদ্ধের ময়দানে ফিরে আসার আহ্বান জানান । তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলমানগণ আবার যুদ্ধের মাঠে ফিরে আসে। মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অবশেষে হযরত আলি (রা) ও খালিদের বীরত্ব ও মুহাম্মদ (স)-এর নেতৃত্বগুণে মুসলিম বাহিনী জয়ী হয়। প্রায় ৬,০০০ শত্রুসেনা বন্দি হয় এবং ২৪,০০০ ভেড়া, ২৮,০০০ উট, ৪১,০০০ তোলা রুপাসহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র গনিমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়।

তায়েফ বিজয় (৬৩০ খ্রি.): হুনায়ুনের যুদ্ধে জয়লাভের পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) তায়েফে অভিযান পরিচালনা করেন। কারণ হুনায়ুনের যুদ্ধে পরাজিত বিধর্মীদের অনেকে তায়েফ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। তিন সপ্তাহ যুদ্ধের পর তায়েফবাসী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। এ যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে বনু হাওয়াজিন, বনু মালিক, বনু সাফিন, বনু নাসর, বনু জুসামের মতো শক্তিশালী বেদুইন গোত্রগুলো মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে। ফলে অন্যান্য গোত্র আর ইসলাম বিরোধী ভূমিকা গ্রহণের সাহস পায়নি। ফলে ইসলাম একটি সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছে যায়।

তাবুক অভিযান (৬৩০ খ্রি.): তাবুক অভিযান ছিল মহানবি (স)-এর শেষ যুদ্ধযাত্রা। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি একটি প্রতিনিধি দলকে বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠান। মহানবি (স)-এর প্রতিনিধির সাথে তিনি ভালো ব্যবহার করলেও ইসলাম গ্রহণ করেননি। কারণ তিনি মহানবি (স)-এর মক্কা, তায়েফ, হুনায়ুন বিজয়ে ঈর্ষাবোধ করেন। তাছাড়া ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে মুতার যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে রোমানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে তিনি এর প্রতিশোধ গ্রহণেরও পরিকল্পনা করেন। এ সময় মুহাম্মদ (স)-এর কাছে পরাজিত ও নিজেদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে মদিনা থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য হিরাক্লিয়াসকে উদ্বুদ্ধ করে। ইতোমধ্যে সম্রাটের কাছে সংবাদ আসে যে, মুহাম্মদ (স) মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় সেখানকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও প্রায় ভঙ্গুর। এসব কারণে সম্রাট হিরাক্লিয়াস যুদ্ধের জন্য বিশাল আয়োজন করেন। প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে তিনি ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মদিনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। রোমানদের এ অভিযানের কথা শুনে এবং তাদের প্রতিহত করতে রাসুল (স) প্রায় ১০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৪০,০০০ পদাতিক সৈন্যসহ বাইজান্টাইন সীমান্তবর্তী 'তাবুক' প্রান্তর অভিমুখে রওনা হন। রোমানরা মুসলমানদের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ শুনে যুদ্ধ না করা উত্তম ভেবে পশ্চাদপসরণ করে। ফলে দুপক্ষের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হয়নি। মহানবি (স) কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে মদিনায় ফিরে যান। এ ঘটনা তাবুক অভিযান বা তাবুক যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা) তার সব সম্পদ, হযরত ওমর (রা) তার সম্পদের অর্ধেক এবং হযরত ওসমান (রা) ১,০০০ উট, ৭০টি ঘোড়া এবং ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। এছাড়া মহানবি (স)-এর অন্য সাহাবিরাও সাধ্যমতো দান করেন। এ সময় আরবে দুর্ভিক্ষ চলছিল। তাই খুব কষ্টে অর্থ, খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য রসদ সংগ্রহ এবং প্রখর রৌদ্রতাপ সহ্য করে তাবুকে গিয়ে অবস্থান করায় এ অভিযানকে 'গাজওয়াতুল ওসারাত' বা 'কষ্টের যুদ্ধ' বলা হয়। এ অভিযানে সম্রাট হিরাক্লিয়াস যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের আক্রমণ করার ক্ষমতা ও সাহস সমসাময়িক আর কোনো শক্তির ছিল না। এভাবে ইসলাম সব দিক থেকে বিজয়ী হলো। বিশ বছর ধরে মহানবি (স) ও তাঁর অনুসারীরা যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তার অবসান হলো। সব যুদ্ধ, হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো শান্তির ধর্ম ইসলাম।

প্রতিনিধি প্রেরণের বছর (৬৩০-৬৩১ খ্রি.): এস. এম. ইমামুদ্দিন এর মতে, "মহানবি (স)-এর প্রচেষ্টায় নানা যুদ্ধে এবং বিভিন্ন স্থানে ইসলামের সাফল্যের ফলে আরব ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলাম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।"[৪০] এ অবস্থায় ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজিত হলে মহানবি (স)-এর গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পায়; তেমনি ইসলাম ব্যাপকভাবে আরব ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করে। ফলে ৬৩০-৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে (নবম হিজরি) আরব ও আরব ভূখণ্ডের বাইরের বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ থেকে মহানবি (স)-এর কাছে দলে দলে শান্তি প্রস্তাব আসে। ওমান, হাজরামাউত, নাজরান, ইয়েমেন, বাহরাইন প্রভৃতি অঞ্চল মহানবি (স)-এর অভিযান ছাড়াই মদিনায় তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে আনুগত্যের শপথ করে। বনু তামিম, বনু মুস্তালিক, বনু কিনদাহ, বনু আজাদ, বনু তায়ীসহ বিভিন্ন গোত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ইবনে হিশাম-এর মতে, এই বছর রাসুল (স) অসংখ্য প্রতিনিধিকে (ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে) সাদর অভ্যর্থনা জানান। এজন্য এ বছরকে 'প্রতিনিধি প্রেরণের বছর' বা 'সানাৎ-আল-উফুদ' (The Year of Deputation) বলা হয়।

প্রতিনিধি প্রেরণের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটি শুধু ইসলাম প্রচারে সহায়তা করেনি, বরং পুরো আরব জাতিকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করে। ফলে আরবজাতি তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি বাইজান্টাইন ও পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্য মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হুনায়ুনের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
২. হুনায়ুনের যুদ্ধে কারা জয়লাভ করে?
৩. মহানবি (স)-এর শেষ যুদ্ধযাত্রা ছিল কোনটি?
৪. কোন যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা) তার সব সম্পদ দান করে দেন?
৫. তাবুক অভিযান কত সালে প্রেরিত হয়েছিল? *[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*
৬. 'সানাৎ-আল-উফুদ' বা প্রতিনিধি প্রেরণের বছর বলা হয় কোনটিকে?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সঠিক সাল দিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করো।

নাম	সময়
বদর যুদ্ধ	
উহুদ যুদ্ধ	
খন্দক যুদ্ধ	
মক্কা বিজয়	
হুনায়ুনের যুদ্ধ	
তাবুক অভিযান	

২. প্রতিনিধি প্রেরণের বছরে মহানবি (স) যেসব অঞ্চলে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন এবং যেসব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[৪০] Ref: S. M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims Vol, I*, p. 84

পাঠ ১৯

বিদায় হজ (৬৩২ খ্রি.)
The Farewell Pilgrimage (632 AD)

মক্কা বিজয়ের অল্প কিছু দিনের মধ্যে পুরো আরবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিনিধি প্রেরণের বছর আরবের লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এ পর্যায়ে মহানবি (স) বুঝতে পারেন, তাঁর সাধনা পূর্ণ হয়েছে। বয়সও বেড়ে গেছে। হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবেন না। সামর্থ্যবান হিসেবে হজ ফরজ হলেও এখনো তিনি তা আদায় করতে পারেননি। এ অবস্থায় রাসুল (স) হজ পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি দশম হিজরি সনের ২৫ জিলক্বদ (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রায় ১ লাখ ১৪ হাজার মুসলমানসহ মদিনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং জিলহজ মাসের ৮ তারিখ সেখানে পৌঁছান। এ বছর আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১০ লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলিম হজ পালনের জন্য মক্কায় সমবেত হয়। এটি ছিল মহানবি (স)-এর প্রথম এবং সর্বশেষ হজ পালন। এ জন্য এ হজকে 'হুজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ বলা হয়।

বিদায় হজের ভাষণ

হজ পালনকালে মহানবি (স) জিলহজ মাসের ৯ তারিখে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশে এক যুগান্তকারী ভাষণ দেন। আরাফাতের ময়দানের পাশে অবস্থিত 'জাবালে রহমত' নামে একটি পাহাড়ে উঠে রাসুল (স) বলেন— "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। তাঁর কোনো সঙ্গী নেই। তিনিই সার্বভৌম এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর।" আল্লাহর প্রশংসার পর প্রিয়নবি (স) বলেন,

১. হে লোক সকল, তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এ বছরের পর হয়তো তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না।
২. হে মানবজাতি, মনে রেখো আল্লাহ একজন নর (আদম) ও একজন নারী (হাওয়া) থেকে সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি কোনো কালো মানুষের ওপর কোনো সাদা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একমাত্র তাকওয়াই (আল্লাহভীতি) হলো শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি।
৩. জাহেলিয়া যুগের সব ধরনের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অন্যায়-অনাচার আজ আমার পায়ের নিচে দলিত হলো।
৪. জেনে রাখো, আজকের এ দিন, মাস এবং জনপদ যেমন পবিত্র; তেমনি তোমাদের জীবন ও সম্পদ পরস্পরের কাছে পবিত্র।
৫. নারীদের ওপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও সেরূপ অধিকার আছে। তাদের প্রতি অত্যাচার করো না। মনে রেখো, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গ্রহণ করেছ।
৬. দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের ওপর কোনোরূপ অত্যাচার করবে না। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তাই খাওয়াবে; তোমরা যা পরবে, তাদেরকে তাই পরাবে– ভুলে যেও না তারাও তোমাদের মতো মানুষ।
৭. মনে রেখো, সব মুসলমান ভাই ভাই। কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় নয়। আল্লাহর চোখে সবাই সমান। আর সব মুসলমান মিলে একটি অখণ্ড ভ্রাতৃসমাজ।
৮. সাবধান! ধর্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করো না। এ বাড়াবাড়ির ফলে অতীতে বহুজাতি ধ্বংস হয়েছে।
৯. হুঁশিয়ার! নেতৃত্বের আদেশ কখনও লঙ্ঘন করো না। যদি কোনো কালো ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমির করে দেওয়া হয় এবং সে যদি আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদের পরিচালনা করে, তবে তোমরা অবনত মস্তকে তার আদেশ মেনে চলবে।
১০. স্মরণ রেখো, তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে নিজ নিজ কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে।
১১. একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দোষ দেওয়া যাবে না। যেমন— পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে অথবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দোষ দেওয়া যাবে না।
১২. হুঁশিয়ার! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদের স্পর্শ না করে। তোমরা শিরক করো না, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করো না, চুরি করো না, ব্যভিচার করো না।
১৩. আইয়ামে জাহেলিয়াতের কুসীদপ্রথাও রহিত হলো। আমি প্রথমে আমার বংশের সুদের দাবি নাকচ করলাম।

১৪. আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি— যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে— আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রাসুল (স)-এর সুন্নাহ।

১৫. আজ এখানে তোমরা যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাগুলো স্মরণ রেখো, আর যারা এখানে উপস্থিত নেই তাদের কাছে পৌঁছে দিও। হয়তো তাদের মধ্যে আজকের কোনো কোনো শ্রোতার চেয়ে অধিকতর বোধশক্তিসম্পন্ন ও স্মৃতিতে ধরে রাখার মতো ব্যক্তি থাকতে পারে।

১৬. নিশ্চয়ই জেনে রাখো; আমার পর আর কোনো নবি নেই। আমিই শেষ নবি।

শেষে তিনি আসমানের দিকে চেয়ে বললেন "হে প্রভু! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিতে পারলাম? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারলাম?" উপস্থিত জনসমুদ্র থেকে আওয়াজ এলো— হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পেরেছেন। তখন তিনি পুনরায় বলেন, "হে প্রভু সাক্ষী থাকো। এরা বলছে, আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি।" এ সময় কুরআনের শেষ আয়াত নাজিল হলো, "আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু লাকুম নিয়ামাতি ওয়া রাদিতুলাকুমুল ইসলামা দীনা।" **অর্থ:** "হে মুহাম্মদ (স) আজ আমি তোমার দীনকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমার ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমার ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল মায়েদা: ৩)। এ আয়াতের তাৎপর্য উপলব্ধি করে হযরত আবু বকর (রা) কেঁদে ফেলেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, মহানবি (স)-এর মিশন শেষ। এখন যেকোনো সময় তাঁর জীবনাবসান ঘটবে। এরপর আরাফাত ময়দান থেকে মহানবি (স) মুজদালিফা হয়ে মিনাতে যান। পথে নির্দিষ্ট স্থানে শয়তানের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করেন। মিনাতে তিনি কুরবানি সম্পন্ন করে পবিত্র মাথা মুন্ডন করেন। এরপর তিনি ইহরাম খুলে হজের সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন।

বিদায় হজের ভাষণের তাৎপর্য: মহানবি (স) তাঁর জীবনের শেষ হজে বিশ্বমানবতার উদ্দেশে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন যা বিশ্বের মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ছিল একটি মাইলফলক। বিদায় হজের ভাষণের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সৈয়দ আমীর আলী তাই বলেন, "তিনি জাবালুল আরাফাতে দাঁড়িয়ে সমবেত জনগণকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা এখনও প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে সমুজ্জ্বল রয়েছে।"[৪১]

মুহম্মদ (স)-এর ওফাত (৬৩২ খ্রি.): মক্কায় হজ পালন শেষে মদিনায় ফেরার পর থেকেই রাসুল (স)-এর শরীর ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। দীর্ঘদিন রোগ-ভোগের পর রাসুল (স) একাদশ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন) সোমবার বিকেলে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিদায় হজ কত খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়?
২. মহানবি (স) জিলহজ মাসের কত তারিখে বিদায় হজের ভাষণ দেন?
৩. মহানবি (স) কোথায় বিদায় হজের ভাষণ দেন? */সকল বোর্ড ২০১৯/*
৪. কোন পাহাড়ে উঠে মহানবি (স) বিদায় হজের ভাষণ দেন?
৫. বিদায় হজের ভাষণের সময় কী পূর্ণতা পায়?
৬. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? */সি. বো., ব. বো. ২০২১/*

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

'মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণ বিশ্বমানবতার জন্য দিক নির্দেশনাস্বরূপ'— বিষয়টির ওপর একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করো।

---

[৪১] He (Prophet) addressed the assembled multitude from the top of the *Jabal ul-Arafat* in words which yet live in the hearts of all Moslems.–Ref: Syed Ameer Ali, *A short History of the Saracens*, p.17

পাঠ ২০ ও ২১

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার
Social, Cultural and Religious Reforms of Prophet Muhammad (Sm)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) একাধারে যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্কারের সূচনা করেন তা বিশ্বে নজিরবিহীন। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স) আরব সমাজে বিদ্যমান নানা অত্যাচার-অনাচার দূর করে ন্যায়নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে একটি আদর্শ ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। পৌত্তলিক তথা বহু দেবদেবীর আরবে তিনি একেশ্বরবাদী ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক গিবন তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারসমূহকে 'এক অতি স্মরণীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এস. এম. ইমামুদ্দিন মহানবি (স)-এর সংস্কারমূলক কার্যাবলি সম্পর্কে বলেন, "মহানবি (স)-এর আবির্ভাব ঘটেছিল সামাজিক, গোষ্ঠীগত, জাতীয় এবং অন্যান্য কৃত্রিম বাধাকে অপসারণ করে মানবতার বাঁধনে বেঁধে একটি সর্বজনীন বিশ্বাস প্রচার ও এক সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার জন্য।" তিনি এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার করেছিলেন।

সামাজিক সংস্কার

মানবতার ভিত্তিতে সমাজ গঠন: সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে মহানবি (স) একটি উন্নত ও আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বে নজির সৃষ্টি করেন। তিনি মানুষের মধ্যে বিরাজমান অসাম্য ও ভেদাভেদ দূর করে বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "সব মানুষ সমান, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট তিনি, যিনি তাকওয়াবান।" বিদায় হজের ভাষণে তিনি আভিজাত্যের গৌরব, কৌলীন্য প্রথা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করে শুধু তাকওয়াকে (আল্লাহভীতি) মানুষের শ্রেষ্ঠতের মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করেন। তিনি সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বলেন, "কোনো অনারব যেমন একজন আরবের ওপর মর্যাদাবান নয়, তেমনি কোনো আরব একজন অনারবের চেয়ে মর্যাদাবান নয়।" মহানবি (স) সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রচলিত 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি পরিহার করে কিছু গঠনমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেন। এর ফলে সমাজ থেকে খুন, লুণ্ঠন, মদপান, জুয়াখেলা, সুদপ্রথা, কন্যাশিশু হত্যাসহ সব ধরনের অন্যায়-অবিচার দূর হয়।

সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা: মহানবি (স) নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি পিতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলেও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "স্ত্রীর ওপর স্বামীর যেরূপ অধিকার আছে, স্বামীর ওপর স্ত্রীরও সেরূপ অধিকার আছে।" (সুরা বাকারা, ২২৮) ইসলামপূর্ব যুগে কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়াকে সমাজে অভিশপ্ত ও লজ্জাকর মনে করা হতো। তাই মুহাম্মদ (স) ঘোষণা করেন, "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।" এ হাদিসের মাধ্যমে রাসুল (স) মানুষকে বুঝিয়েছেন যে, চিরশান্তির স্থান জান্নাত লাভ করতে হলে অবশ্যই মা তথা নারীর সম্মান রক্ষা করতে হবে। তিনি বিবাহ ও পরিবার আইন সংশোধন করে নারীকে স্ত্রীর মর্যাদা দেন। তিনি তাদেরকে পিতা ও স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকার এবং বিবাহে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেন।

কন্যা সন্তান হত্যা বন্ধ ঘোষণা: প্রাক-ইসলামি আরবে দারিদ্র্য ও লজ্জার ভয়ে শিশুকন্যা হত্যার প্রচলন ছিল। মুহাম্মদ (স) আরবের এ শিশুকন্যা হত্যার জঘন্য প্রথাও বন্ধ করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না।" (সুরা বনি ইসরাইল, ৩১) তিনি নারীদের সামাজিক মর্যাদাদানের জন্য কন্যাসন্তানের জন্মকে অভিশাপ হিসেবে না দেখার জন্য আরববাসীর উদ্দেশে বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার প্রথম সন্তান মেয়ে।" তিনি নারীদের জন্য পর্দা প্রথা চালু করে পরকীয়া, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ব্যভিচার দূর করে সমাজে নারীকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

দাস-দাসীর মর্যাদা দান: মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের আগে দাস-দাসীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। মনিবরা দাসদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালাত। দাসদের কাজ ছিল সূর্যোদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করা। তাদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। মনিবের ইচ্ছা মতোই তাদের কাজ করতে হতো। এমনকি দাস-দাসীদের বিবাহ, জীবন-মৃত্যু প্রভুর ওপর

নির্ভর করত। মুহাম্মদ (স) ১৪০০ বছর আগে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রথম অবস্থান নেন। তিনি দাসপ্রথাকে ঘৃণা করেন এবং দাসমুক্তিকে উৎসাহিত করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "গোলামকে মুক্তি দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কাজ আল্লাহর কাছে আর কিছুই নেই।" তিনি দাস-দাসীদের ওপর সদয় আচরণ ও তাদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে বিদায় হজের ভাষণে বলেন, "তোমরা যা খাবে, যা পরবে, দাস-দাসীদেরও তাই খেতে ও পরতে দেবে। যদি তারা এমন কোনো অপরাধ করে যা তোমরা ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক; তাহলে তোমরা তাদের পরিত্যাগ করবে, কারণ তারাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং দুর্ব্যবহার পাওয়ার উপযুক্ত নয়।" এভাবে মহানবি (স) আমৃত্যু একটি সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে গেছেন।

সাংস্কৃতিক সংস্কার

আরবরা সুপ্রাচীনকাল থেকেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বেশ আগ্রহী ও পারদর্শী ছিল। প্রাক-ইসলামি আরবে উকাজ মেলায় কবিতা আবৃত্তি, জুয়াখেলা, নাচগান, ঘোড়া ও উটের দৌড়সহ নানা রকম খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হতো। ইসলামি অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মুহাম্মদ (স) আরবে মদ, জুয়া, অশ্লীলতা প্রভৃতি দূর করে একটি সুস্থ ও সুশৃঙ্খল সামাজিক-সাংস্কৃতিক আবহ তৈরির চেষ্টা করেন। ইসলামকে জানা, বোঝা ও সার্বিকভাবে জগত ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। মহানবি (স) শিক্ষার এ গুরুত্ব অনুধাবন করে মানুষকে জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ঘোষণা করেন— ১. আলেমরা (জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তি) নবিদের ওয়ারিশ, ২. যারা শিক্ষার পথে বের হয়, তারা গৃহে না ফেরা পর্যন্ত আল্লাহর পথে থাকে। ৩. প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাসুল (স) হিজরতের আগেই সাওর পর্বতের পাদদেশে হযরত আরকামের বাড়িতে ইসলামের প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদকে এখানে শিক্ষা প্রদানের মূল দায়িত্ব দেন। মহানবি (স) হযরত আয়েশা (রা)-এর গৃহকে নরীদের শিক্ষাগৃহ হিসেবে গড়ে তোলেন।

কল্যাণকামী ও সুশৃঙ্খল জাতি গঠন: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) একজন শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মী ছিলেন। তিনি হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি থেকে বিরত থেকে পারস্পরিক সম্প্রীতির মাধ্যমে সমাজ গঠনের যে ধারণা দেন, আজও তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত। মহানবি (স) পরিবারকে ত্যাগ করে ধর্মপালনের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, "বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর আহ্বান হলো, যাদের ওপর কর্তব্য রয়েছে তাদের প্রতি সেই কর্তব্য পালন করতে হবে।" তিনি সমাজে অর্থনৈতিক সমতা স্থাপনের জন্য জাকাত আদায়সহ নানাভাবে গরিবদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াতে ধনীদের নির্দেশ দেন। আরবের মানুষ মহানবি (স) এর আহ্বানে সাড়া দেওয়ায় সমাজে দারিদ্র্যের হার যেমন হ্রাস পেয়েছিল, তেমনি মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বেড়েছিল। মহানবি (স) সমাজে শান্তি স্থাপনে নারী, শিশু, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও অবহেলিতদের প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেন। এভাবে সমকালীন আরব সমাজে তিনি একটি জনকল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠন: মুহাম্মদ (স) ইসলামের সাম্যের বাণী প্রচার করে শতধাবিভক্ত ও কলহরত আরবদের একতাবদ্ধ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তৎকালীন আরবে প্রচলিত গোত্রভিত্তিক শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত করে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলেন। মহানবি (স) আরবদেরকে একই ধর্মের আদর্শে ঐক্যবদ্ধ করায় তাদের মধ্যে আভিজাত্যের ভেদাভেদ ও দ্বন্দ্ব-কলহ দূর হয় এবং একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর আরব জাতির যাত্রা শুরু হয়। পি. কে. হিট্টি বলেন, "আরবের ইতিহাসে রক্তের পরিবর্তে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের এটাই প্রথম প্রচেষ্টা।"[৪২] তিনি আরও বলেন, "আল-মদিনা থেকে ইসলামি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে তা পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিরাট অংশকে অধিকার করেছিল।"

---

[৪২] This was the first attempt in the history of Arabia at a social organisation with religion rather than blood as its basis. – Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.120

ধর্মীয় সংস্কার

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের আগে আরবরা বিভিন্ন ধরনের দেব-দেবীর মূর্তি ও প্রকৃতিপূজায় লিপ্ত ছিল। বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা সম্পর্কে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা মানুষকে কোনো সঠিক ধারণা দিতে সক্ষম হয়নি। তাই কুরআন শরিফে বলা হয়েছে "মরুবাসী আরবরা অবিশ্বাস ও ভণ্ডামিতে আত্মনিয়োগ করেছে।" আরবের এ ধর্মীয় অধঃপতনের যুগে হযরত মুহাম্মদ (স) তাওহিদের বাণী প্রচার করে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেন। একত্ববাদের ভিত্তিতে তিনি সব মুসলমানকে একটি ভ্রাতৃসংঘে আবদ্ধ করেন। সব যুগের সব মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি যে বাণীর সংকলন করেন সে সম্পর্কে পি. কে. হিট্টি বলেন, "নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না করেও মুহাম্মদ (স) এমন একখানা ধর্মগ্রন্থ প্রদান করেন যা বিশ্বের এক-অষ্টমাংশ অধিবাসীর কাছে সমস্ত বিজ্ঞান, ধর্ম ও সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডাররূপে পরিগণিত।"[৪৩] মুহাম্মদ (স) মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ ও জীবনাদর্শ হিসেবে পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনকে নির্দিষ্ট করেন। তিনি ঘোষণা করেন "যতদিন তোমরা পবিত্র কুরআন ও রাসুল (স)-এর সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না।" আধুনিক অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষক পবিত্র কুরআনকে সব জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। মহানবি (স) কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে মুসলমানদের জন্য পাঁচটি বিষয়- কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত'—এ কথা কে বলেছেন?

২. হযরত মুহাম্মদ (স) কার সম্পদে নারীর উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন?

৩. মহানবি (স) কাদেরকে নবিদের ওয়ারিশ বলেছেন?

৪. কার বাড়িতে ইসলামের প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়?

৫. মহানবি (স) কার ঘরকে নারীদের শিক্ষাগৃহ হিসেবে গড়ে তোলেন?

৬. হযরত মুহাম্মদ (স) ইসলামে বিশ্বাসীদের ধর্মগ্রন্থ ও জীবনাদর্শ হিসেবে কোন গ্রন্থকে নির্দিষ্ট করেন?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. মানুষকে জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে রাসুল (স)-এর নির্দেশগুলো পয়েন্ট আকারে লেখো।

২. মহানবি (স)-এর ধর্মীয় সংস্কারের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো পয়েন্ট আকারে লেখো।

গ. দলীয় কাজ

১. মহানবি (স)-এর সামাজিক সংস্কার সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল— বিষয়টির ওপর একটি দলীয় আলোচনা উপস্থাপন করো।

---

[৪৩] Himself an unschooled man, Muhammad (sm) was nevertheless responsible for a book still considered by one-eighth of mankind as the embodiment of all science, wisdom and theology. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.122

পাঠ ২২ ও ২৩

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার
Political, Economic and Judicial Reforms of Hazrat Muhammad (Sm)

রাজনৈতিক সংস্কার

সাম্য ও মৈত্রীর ওপর ভিত্তি করে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে মুহাম্মদ (স) হিজরতের পর মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন। সব মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করে রচিত এ সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে মদিনা প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। রাসুল (স) এ প্রজাতন্ত্র পরিচলনার জন্য যেসব নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেন তা একটি ইসলামি রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।

আল্লাহর আইনভিত্তিক রাষ্ট্রগঠন: মদিনা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্মীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আল্লাহর রাসুল (স) নিজেই এটির প্রতিষ্ঠাতা। এর আগে সেখানে কোনো বৃহত্তর জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল না। এই ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন। শরিয়তের আইন ছাড়া অন্য কোনো আইনে ইসলামি রাষ্ট্র চলে না। আল্লাহ বলেন, "আমি প্রত্যেক রাসুলকে আমার আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য পাঠিয়েছি।" রাসুল (স) বলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতদিন পর্যন্ত তোমরা এ দুটিকে আঁকড়ে ধরবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর এ দুটি জিনিস হলো কুরআন ও সুন্নাহ।" মদিনায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে মহানবি (স) কুরআনের নির্দেশনার আলোকে আইন প্রণয়ন করেন। কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে তিনি নিজে থেকে সমাধান না দিয়ে আল্লাহর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতেন কারণ আল্লাহই হলেন সর্বময় ক্ষমতার উৎস। পি. কে হিট্টির মতে, "আরব জাতির একমাত্র বন্ধন গোত্রপ্রীতি; এটি একটিমাত্র আঘাতেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং এর স্থান অধিকার করে ইমান (বিশ্বাস)।"

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা: ইসলামি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মালিক মহান আল্লাহ। কুরআনে উল্লেখ আছে "আল্লাহ ছাড়া কারও সার্বভৌমত্ব নেই।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪০) অন্যত্র বলা হয়েছে, "আধিপত্য একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১০৭)।" আল্লাহর এই সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে তাঁর সব বিধি-বিধান নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। মুহাম্মদ (স) আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আল্লাহর এবং মুহাম্মদ (স) ছিলেন সেই আইনের বাস্তবায়নকারী। বিশেষজ্ঞদের মতে, মদিনা রাষ্ট্রে আল্লাহ ছিলেন De Jure Sovereignty এবং মুহাম্মদ (স) De facto Sovereignty. অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ এবং মহানবি (স)-এর প্রতিনিধি।

সাম্যভিত্তিক সরকার গঠন: মদিনা রাষ্ট্রে মহানবি (স) একটি সাম্যভিত্তিক সরকার গঠন করেন। মদিনা সনদের ধারাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মদিনা রাষ্ট্রে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এ রাষ্ট্রে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃত ছিল। মদিনা সনদের ধারা মেনে চলার ক্ষেত্রে সব গোত্রের যোগদানের সুযোগ উন্মুক্ত ছিল। মদিনা রাষ্ট্রকে মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ইসলামি রাষ্ট্র নামে আখ্যায়িত করেছেন। এ রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে মহানবি (স) কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যথা—. ১. মদিনা রাষ্ট্রের রাজধানী হলো মদিনা। এ রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন দফতরের হিসাব সংরক্ষণের জন্য মহানবি (স) কাতিব বা সচিব নিযুক্ত করেন। ২. প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তিনি মদিনা শহর ছাড়া রাষ্ট্রের বাকি অংশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রদেশে ওয়ালি বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ৩. জাকাত, জিজিয়া, খারাজ, গনিমাত ও আলফে এই পাঁচটি উৎস হতে রাজস্ব আদায় করেন। ৪. রাসুল (স) নিজেই সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। ৫. মহানবি (স) ছিলেন প্রশাসন, আইন, বিচার এবং ধর্মপ্রচার বিভাগের প্রধান । তাঁর সুষ্ঠু পরিচালনায় প্রতিটি দপ্তর নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করত।

জেনে রাখো

সাম্যের সাধারণ অর্থ হচ্ছে সমতা ও অভিন্নতা। আধুনিক গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধারণায় সাম্য বলতে সুযোগ-সুবিধাদির সমতাকে (Equalities of Opportunities) বোঝায়। প্রকৃত অর্থে সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায় যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে এবং সেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ ও ব্যবহার করে সবাই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে।

অর্থনৈতিক সংস্কার

মহানবি (স) কুরআনের নির্দেশ, নিজের বিবেক বুদ্ধি এবং শিক্ষিত লোকদের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তিনি ঐশীতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয়ে আরব দেশে একটি দক্ষ ও কার্যকর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি মদিনা রাষ্ট্রে শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেন। কুসীদপ্রথা (সুদপ্রথা), লুটতরাজ, আর্থিক বৈষম্য দূর করে তিনি মুসলমানদের শরিয়ত সম্মতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য উপায়ে অর্থ উপার্জনের নির্দেশ দেন। রাসুল (স)-এর সময় পাঁচটি উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো । যথা—জাকাত, খারাজ, জিজিয়া, গনিমত ও আলফে। জাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রধান খাত। সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য এটি আদায় করা ফরজ। পরিবারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ (জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য ন্যূনতম সম্পদ) পূর্ণ এক বছর হাতে থাকলে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ জাকাত হিসেবে দান করতে হয়। এটি দরিদ্র মুসলিমদের অধিকার।

খারাজ হচ্ছে ভূমিকর। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম প্রজাদেরকে ভূমিকর হিসেবে খারাজ দিতে হয়। জিজিয়া হলো নিরাপত্তা কর। ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজারা সেনাবাহিনীতে যোগদান থেকে অব্যাহতি এবং নিরাপত্তার বিনিময়ে এ কর প্রদান করেন। গনিমত হচ্ছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। যুদ্ধের ময়দানে শত্রু পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে গনিমত বলা হয়। এর পাঁচ ভাগের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হতো। বাকি এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হতো। আলফে হচ্ছে রাষ্ট্রের খাস সম্পত্তি। এ সম্পত্তির আয় থেকে মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করা হতো।

বিচার বিভাগীয় সংস্কার

মহানবি (স) যে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় এসে তা আরও বিকশিত হয়। বিচারের দায়িত্ব যে কর্মচারীর ওপর ন্যস্ত থাকত তাকে কাজি বলা হতো। কেন্দ্রে তিনি স্বয়ং প্রধান কাজির দায়িত্ব পালন করতেন। তার অধীনে প্রাদেশিক কাজি এবং জেলা কাজি নিয়োগ দেওয়া হতো। এদের নিয়োগদানের সময় তাদের কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস ও ফিকাহ্‌শাস্ত্রে জ্ঞান পরীক্ষা করা হতো। এমনকি কাজিকে শারীরিক দিক দিয়েও সুস্থ হতে হতো। কাজিদের উপযুক্ত বেতন ও সম্মানী প্রদান করা হতো। কাজিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল বিবাদ মীমাংসা করা, অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, ওয়াকফ্ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, অছিয়ত বাস্তবায়ন করা, দোষীদের শাস্তি প্রদান করা, সর্বোপরি নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য কী?
২. রাসুল (স) আমাদের কোন দুটি জিনিস আঁকড়ে ধরতে বলেছেন?
৩. ইসলামি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মালিক কে?
৪. ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রধান খাত কী?
৫. অমুসলিমদের নিরাপত্তা করকে কী বলা হয়?
৬. যুদ্ধের ময়দানে শত্রু পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে কী বলা হয়?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মদিনা রাষ্ট্রকে আদর্শ ও জনকল্যাণমুখী করতে মহানবি (স) যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তার একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২৪

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চারিত্রিক গুণাবলি
Noble Qualities of Prophet Muhammad (Sm)

আল্লাহর ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস: সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর প্রতি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থা। একজন একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হিসেবে তিনি আল্লাহর প্রবর্তিত ধর্ম ইসলাম প্রচারের জন্য কাফেরদের নির্মম অত্যাচার সহ্য করেন। তবুও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারাননি। তাওহিদের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের জোরেই তিনি নিঃস্ব অবস্থায় মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। ইমানের দৃঢ়তার কারণেই তিনি খুব কমসংখ্যক মুসলিম সৈন্য নিয়ে বদরের যুদ্ধে বিশাল কুরাইশ বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হলেও তিনি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস অটল রেখেছিলেন। এর ফলেই পর্যায়ক্রমে গোটা আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

সত্যবাদিতা: মহানবি (স)-এর চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল তাঁর সত্যবাদিতা। ছোটবেলা থেকেই তিনি মিথ্যা বলা, ছলনা ও প্রতারণাকে ঘৃণা করতেন। এজন্য ছেলেবেলায় তিনি 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী উপাধি পেয়েছিলেন। মহানবি (স)-এ এতই সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন যে, তাঁর ঘোর শত্রু আবু জেহেলও প্রায়ই বলতেন, "মুহাম্মদ, আমি বলি না তুমি মিথ্যাবাদী, কিন্তু তুমি যা প্রচার করছ তা আমি সঠিক বলে মনে করি না।" স্কটিশ ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সত্যবাদিতা সম্পর্কে বলেন, "মুহম্মদ শৈশব থেকেই চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁর সাথিরা তাঁকে 'আল-আমিন' বলে ডাকত। সত্যবাদী ও বিশ্বাসী এ মানুষটি কথায়, কাজে ও চিন্তায় তার পরিচয় দিয়েছেন।"

নম্রতা: হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন নম্রতা ও বিনয়ের মূর্ত প্রতীক। তিনি কাউকে কোনোদিন আঘাত দিয়ে কথা বলেননি। চরম শত্রুদের সাথেও খুব বিনয়ের সাথে কথা বলতেন। যুদ্ধবন্দি, দাস-দাসী এবং অধীনস্তদের সাথে তিনি ভদ্র ও কোমল আচরণ করতেন। তাঁর খাদেম আনাস (রা) বলেন, "আমি দশ বছর নবি করিম (স)-এর সেবা করেছি, কিন্তু তিনি কখনও আমার প্রতি বিরক্তিসূচক 'উহ!' শব্দটিও করেননি বা কোনো কটু কথা বলে কষ্ট দেননি।" পি. কে. হিট্টি বলেন, "তাঁর দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অথবা মামুলি ধরনের আচরণগুলোও এক একটি অনুশাসন তৈরি করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ সেগুলো আজও সচেতনতার সাথে অনুকরণ করে আসছে। মানবজাতির আর কোনো অংশই তাঁর মতো আর কাউকে পরিপূর্ণ মানুষরূপে গ্রহণ করে তার আচার-আচরণগুলোকে এত সূক্ষ্মভাবে অনুকরণ করেনি।"[৪৪]

অনাড়ম্বর জীবনযাপন: জন্মের পর থেকে দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে বড় হওয়ায় মহানবি (স)-এর মননে সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাচরণের বিষয়টি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই হিজরতের পর মদিনা রাষ্ট্র এবং আরও পরে পুরো আরবের একচ্ছত্র শাসক হলেও তিনি কখনো রাজকীয়ভাবে জীবনযাপন করেননি। পি. কে. হিট্টি বলেন, "তাঁর জীবনের দুঃখময় দিনগুলোর মতো গৌরবময় দিনগুলোতেও তিনি একটি মাটির বাড়িতে সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন। বর্তমান আরব ও সিরিয়ার পুরনো ধাঁচের বাড়ির মতো তাঁর বাড়িতেও ছিল কয়েকটি ঘর এবং তার সামনেই ছিল উঠান, আর উঠান দিয়ে প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করা যেত। প্রায়ই তাঁকে নিজের কাপড় সেলাই করতে দেখা যেত এবং সর্বদাই সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর দ্বার ছিল উন্মুক্ত।"[৪৫]

শান্তিপ্রিয়তা: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। যুদ্ধের হানাহানি, ঝগড়া-বিবাদ তাঁর হৃদয়কে জর্জরিত করত। তাই তিনি জাহেলিয়া যুগের আরবে যুদ্ধের ভয়াবহতা লক্ষ করে 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠন অত্যাচারিতকে সাহায্য এবং অত্যাচারীকে বাধাদানসহ শান্তি প্রতিষ্ঠায় নানা উদ্যোগ গ্রহণ করত। মহানবি একজন শান্তিকামী মানুষ হিসেবে সর্বদাই অসহায় ও নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কাজ করেছেন।

উদারতা ক্ষমার প্রতীক: মহানবি (স) ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক। তিনি চরম শত্রুকেও বিনাশর্তে ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাসুল (স)-এর চলাচলের রাস্তায় জনৈক কুরাইশ নারীর কাঁটা দেওয়ার ঘটনা, মক্কা বিজয়ে প্রতিশোধ না নেওয়াসহ অনেক ক্ষেত্রে তার ধৈর্য ও ক্ষমার অনন্য উদাহরণ পাওয়া যায়। মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের চরম শত্রুদের তিনি নিঃশর্ত

---

[৪৪] His daily behaviour has instituted a cannon which millions observe at this day with conscious mimicry. No one regarded by any section of the human race as perfect man has been imitated so minutely. -Ref: *P. K. Hitti, History of the Arabs*, p. 120

[৪৫] Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.120

ক্ষমা করেছিলেন। এ সম্পর্কে পি. কে হিট্টি বলেন, "বিজয়ী মুসলিম বাহিনী মক্কা প্রবেশের সময় যেরূপ মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিল প্রাচীন ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।"[৪৬] একজন ক্ষমাশীল ব্যক্তি হিসেবে মুহাম্মদ (স) বলতেন, "আমি শাস্তি দেওয়ার জন্য আসিনি, শান্তিদূতরূপে এসেছি।"

সাম্যের ধারক: মহানবি (স) ছিলেন সাম্যের ধারক। ছোট বেলা থেকেই তার মধ্যে এ গুণটি ছিল। তাই দুধমাতা হালিমার গৃহে যখন ছিলেন তখন তিনি একটি স্তন পান করতেন এবং অন্যটি দুধ ভাই যায়েদের জন্য রেখে দিতেন। তিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ পছন্দ করতেন না। কারণ আল্লাহর চোখে সব মানুষ সমান। সবার সমান ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার রয়েছে। তাই মুহাম্মদ (স) মদিনা সনদ প্রণয়ন করে সব শ্রেণির মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন 'সব মানুষ ভাই ভাই।' মানুষে মানুষে এ সাম্য প্রতিষ্ঠা বিশ্বের কোনো ধর্মে আর দেখা যায় না।

সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা: মহানবি (স) একজন ন্যায়বিচারক ছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কেউ তার কাছে কিছু আমানত রাখলে তিনি তা যথাযথভাবে সংক্ষণ করতেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে মালিককে ফেরত দিতেন। তিনি সবসময় অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তিনি আল্লাহর কাছে সবসময় বিপথগামী বা পদস্খলিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাইতেন। তাঁর মধ্যে যেমন উদারতা, কোমলতা, ক্ষমাপ্রবণতা ছিল তেমনি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কঠোর হতেও পারতেন। মহানবি (স) মুসলমানদের ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। মুহাম্মদ (স) চারিত্রিক ও মানবিক দিক দিয়ে এতটাই উজ্জ্বল ছিলেন যে, বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার ও সমালোচক জর্জ বানার্ড শ' বলেন, "আমার বিশ্বাস, মুহাম্মদ (স)-এর মতো একজন ব্যক্তিকে যদি আধুনিক বিশ্বের একনায়কের আসনে বসানো হতো তাহলে তিনি এমনভাবে সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারতেন যে, তা বিশ্বে অতি প্রয়োজনীয় সুখ ও শান্তি আনতো।"[৪৭] এস এম ইমামউদ্দিন বলেন, "মুহাম্মদ (স)-এর মধ্যে সব নবির ব্যক্তিত্ব অন্তর্নিহিত ছিল। তাঁর মধ্যে মুসার পৌরুষ, দাউদের সাহসিকতা এবং ঈসার মানবিকতার গুণ উপস্থিত ছিল। সংক্ষেপে তিনি ছিলেন নবিদের নক্ষত্রপুঞ্জের সূর্য, যিনি ঐ আলো সব গতিপথে বিকিরণ করছেন।"[৪৮]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কার ওপর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল?
২. কোন গুণের জন্য মহানবি (স) 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী উপাধি পেয়েছিলেন?
৩. মহানবি (স)-এর খাদেম কে ছিলেন?
৪. মক্কা বিজয়ে মুহাম্মদ (স) কীসের পরিচয় দিয়েছিলেন?
৫. মহানবি (স) কোনটির মাধ্যমে সব শ্রেণির মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন?
৬. 'সব মানুষ ভাই ভাই'— এটি কে প্রথম ঘোষণা করেন?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

---

[৪৬] The people themselves, however, were treated with special magnanimity. Hardly a triumphal entry in ancient annals is comparable to this. – Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 188

[৪৭] I belive that if a man like prophet Mohammad was to assume the dictatorship of modern world, would succeed in solving its problem in a way that would bring in much needed peace and happiness.

[৪৮] The qualities of all other Prophets were embodied in the personality of Muhammad. Thus he possessed the manliness of Musa, the daring of Daud and the humanity of 'Isa. In short he was the sun in the constellation of the prophets from which light radiates of all directions. "Ref: S. M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims*, Vol-I, p. 100

পাঠ ২৫

ইসলামি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ
The Emergence of Islamic Nationalism

মদিনা রাষ্ট্র গঠনের ফলে আরব সমাজে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার হয়। ইসলামের সাম্য ও শান্তির বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে যুদ্ধোন্মাদ ও কলহে লিপ্ত আরব জাতি গোত্রীয় সংকীর্ণতা ত্যাগ করে মুহাম্মদ (স)-এর নেতৃত্বে ঐক্যবন্ধ হয়। তারা অতীতের বৈরিতা ভুলে মুসলিম হিসেবে পরস্পরকে আপন মনে করতে থাকে। এভাবেই আরবদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য তথা ইসলামি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। পি. কে. হিট্টি বলেন, “মুহাম্মদ তাঁর সংক্ষিপ্ত নশ্বর জীবনে সম্ভাবনাহীন উপাদান থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, যারা আগে কখনও ঐক্যবন্ধ হয়নি। আর এমন একটি দেশের সৃষ্টি করেছিলেন, যা তখন পর্যন্ত কেবল একটি ভৌগোলিক পরিচয় ছাড়া কিছু ছিল না।”[৪৯] এভাবেই মুহাম্মদ (স) আরব জাতির মধ্যে ইসলামি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন।

সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা: মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মানবজাতির জন্য একটি চিরন্তন অভিশাপ। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন মানবসমাজে বংশের ভিত্তিতে ছোটবড় ভেদ বা কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত রয়েছে। রাসুল (স) বিদায় হজের ভাষণে কৌলীন্য প্রথা বাতিল করেন। তিনি ঘোষণা করেন, মানুষ এক আদমের বংশজাত আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে। সুতরাং মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সবাই মিলেমিশে বসবাস করার মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ রয়েছে। এছাড়া রাসুল (স) মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করেছেন ‘তাকওয়া’ অর্থাৎ আল্লাহভীতির নিরিখে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে যতবেশি ভয় করে তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে সে ততবেশি মর্যাদাবান। এভাবে সাম্য ও মৈত্রীভিত্তিক সমাজ গঠনের ফলে মুসলমানরা একটি ঐক্যবন্ধ ও শক্তিশালী জাতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা: মুহাম্মদ (স)-এর কর্মজীবনের অন্যতম দিক ছিল বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে ধর্ম ও মানবতার আদর্শ প্রচার করা। বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। এছাড়া বিদায় হজের ভাষণে তিনি বলেন, ‘প্রত্যেক মুসলিম ভাই ভাই।’ এ ভাষণে রাসুল (স) মুসলমানদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবন্ধ হতে বলেছেন। মদিনা সনদে রাসুল (স) ইহুদি, খ্রিষ্টানসহ সব ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পাশাপাশি বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন: প্রাক-ইসলামি যুগে আরববাসী বিভিন্ন গোত্র ও বংশধারায় বিভক্ত ছিল। পি.কে. হিট্টির মতে, ‘আসাবিয়া’ বা রক্তের সম্পর্ক তথা গোত্রপ্রীতি ছিল আরব সমাজের মূল বন্ধন।’

মহানবি (স)-এর প্রচেষ্টায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এ ধারণার পরিবর্তন ঘটে। তিনি রক্ত বা গোত্রের সম্পর্কের চেয়ে ধর্মীয় সম্পর্ককেই বেশি গুরুত্ব দেন। এর ফলে মদিনায় এক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। পি. কে. হিট্টি এ সম্পর্কে বলেন, “আল-মদিনার ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকেই পরবর্তী সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।”[৫০]

জেনে রাখো

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুকাদ্দিমার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাযাবর বা বেদুইন সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে আল আসাবিয়া প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘Social Solidarity’, যাকে বাংলায় বলা হয় ‘সামাজিক সংহতি’ বা ‘গোত্র সংহতি’। ইবনে খালদুনের মতে— রক্ত, ধর্ম, জাতীয়তা প্রভৃতির মাধ্যমে সামাজিক সংহতি গড়ে ওঠে। এ সংহতির মাত্রাগত ভিন্নতার কারণে সমাজ ও রাজনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটতে পারে।

মুহাম্মদ (স) এ মুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বলেন, “কোনো আরব অনারবের ওপর মর্যাদাবান নয়, যেমন নয় কোনো অনারব আরবের ওপর।” তিনি ধনী-গরিব নির্বিশেষে সব মানুষকে আইনের চোখে

---

[৪৯] With in a brief span of mortal life Muhammad called forth out of unpromising material a nation never united before, in a country that was hitherto but a geographical expression. – Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.22

[৫০] Out of religious community of Al-Madinah the later and larger state of Islam arose. – Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.120

সমান হিসেবে উপস্থাপন করেন। এছাড়া যোগ্যতার ভিত্তিতে সবাইকে সমানভাবে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন। রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন নীতি গ্রহণে রাসুল (স) সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতেন। ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্র একটি আদর্শ ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপ লাভ করে। প্রাচীন গ্রিসে গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর এর গৃহীত পদক্ষেপ সেই গণতন্ত্রের ধারণাকে আরও শক্তিশালী করে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত। আল্লাহর প্রেরিত রাসুল হিসেবে তিনি ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও সহনশীলতার যে বাণী প্রচার করেছেন, তা বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধিকে বেগবান করেছে। তিনি যেমন একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন তেমনি একজন দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক, সেনানায়ক, প্রশাসক ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তাঁর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন সমকালীন আরব সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি এনেছিল তেমনি আজকের যুগেও শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনে সেগুলো সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এস. এম. ইমামুদ্দিন বলেন, “তিনি (মুহাম্মদ) ছিলেন সকল নক্ষত্রপুঞ্জের সূর্যস্বরূপ যা থেকে সকল গতিপথে আলোর বিকিরণ হয়।”[৫১] মুহাম্মদ (স) যে একজন সত্যিকারের জাতি গঠনকারী ও পথনির্দেশক ছিলেন তা সৈয়দ আমীর আলীর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, “মুহাম্মদ (স)-এর ইসলামের শাশ্বত বাণী প্রচারের পর চৌদ্দশত বছর অতীত হয়েছে, কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি যে নিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং সেদিনকার মতো আজও বিশ্বাসীদের অন্তর ও মুখে সেই স্মরণীয় বাণী উচ্চারিত হয়: “হে আল্লাহর রাসুল, আমার জীবন তোমাতেই উৎসর্গ হোক।”[৫২]

জেনে রাখো

গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy, যা গ্রিক শব্দ ‘Demos’ এবং ‘kratos’ বা kratia থেকে এসেছে। ‘Demos’ অর্থ জনগণ এবং ‘kratos’ বা kratia অর্থ শাসন ক্ষমতা। সুতরাং শাব্দিক অর্থে গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন ক্ষমতা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেন, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য, জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাই হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আরব জাতির মধ্যে ইসলামি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন কে?
২. সব মানুষ কার বংশধর?
৩. মানবসমাজে বংশের ভিত্তিতে ছোট-বড় ভেদাভেদকে কী বলা হয়?
৪. রাসুল (স) কোনটিকে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বলেছেন?
৫. কাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করে মুহাম্মদ (স) প্রথম বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন?
৬. বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত কে?

উত্তরের জন্য ১১০ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ইসলামি জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষে মহানবি (স)-এর গৃহীত পদক্ষেপগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[৫১] He (Muhammad) was the sun in the constellation of the prophets from which light madiates of all directions. –Ref: *S. M. Imamuddin, A Political History of the Muslims,* p. 100

[৫২] তথ্যসূত্র: *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, পৃ. ২০৩*

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. ৫৭০; ২. কুরাইশ; ৩. বণিক বা সওদাগর; ৪. ৫৯০; ৫. আল-আমিন (বিশ্বাসী); ৬. হযরত মুহাম্মদ (স)।

পাঠ-২: ১. ৬১০; ২. হেরা; ৩. হযরত খাদিজা (রা); ৪. আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া); ৫. নবুয়তের দশম বছর; ৬. ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের রজব মাসের ২৬ তারিখ।

পাঠ-৩ ও ৪: ১. ৬২২; ২. হযরত আবু বকর (রা); ৩. সাওর; ৪. ইয়াসরিব; ৫. শহর; ৬. সাহায্যকারী।

পাঠ-৫ ও ৬: ১. মদিনাবাসী; ২. মদিনায়; ৩. মদিনা সনদ; ৪. হযরত মুহাম্মদ (স); ৫. ৪৭টি; ৬. মদিনায়।

পাঠ-৭ ও ৮: ১. বদরের যুদ্ধ; ২. ৬২৪ (১৩ মার্চ); ৩. নাখলার খণ্ড যুদ্ধ; ৪. ১৪; ৫. বদরের; ৬. বদরের যুদ্ধ।

পাঠ-৯ ও ১০: ১. ৬২৫; ২. আবু সুফিয়ান; ৩. খালিদ বিন ওয়ালিদ; ৪. তিন হাজার; ৫. আবদুল্লাহ বিন উবাই; ৬. হযরত মুহাম্মদ (স)।

পাঠ-১১: ১. উহুদের; ২. নেতার আদেশ অমান্য করা; ৩. দুটি; ৪. উহুদের ৫. ৭৩; ৬. ২৩।

পাঠ-১২ ও ১৩: ১. খন্দকের; ২. পরিখা বা খাল; ৩. ৬২৭; ৪. পারসিক সাহাবি সালমান ফারসি; ৫. ২৭; ৬. কুরাইশদের।

পাঠ-১৪: ১. তাওরাত; ২. ইহুদিরা; ৩. ইহুদিরা; ৪. ইহুদিদের; ৫. ইহুদিরা; ৬. খ্রিষ্টানদের।

পাঠ-১৫ ও ১৬: ১. মক্কার কুরাইশদের; ২. ৬২৮; ৩. প্রকাশ্য বিজয়; ৪. হযরত আলি (রা); ৫. দশ; ৬. হুদায়বিয়ার সন্ধি।

পাঠ-১৭: ১. ৬৩০ (অষ্টম হিজরি); ২. মক্কা বিজয়ের; ৩. মক্কা বিজয়ের সময়; ৪. মক্কা বিজয়; ৫. পৌত্তলিকতা (মূর্তি পূজা); ৬. তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ)।

পাঠ-১৮: ১. ৬৩০; ২. মুসলিম বাহিনী; ৩. তাবুক অভিযান; ৪. তাবুক; ৫. ৬৩০ খ্রি.; ৬. ৬৩০-৬৩১ খ্রি.।

পাঠ-১৯: ১. ৬৩২; ২. ৯; ৩. আরাফাতের ময়দানে; ৪. জাবালে রহমত; ৫. ইসলাম; ৬. ৬৩২।

পাঠ-২০ ও ২১: ১. হযরত মুহাম্মদ (স); ২. পিতা ও স্বামী; ৩. আলেমদের; ৪. হযরত আরকাম (রা); ৫. হযরত আয়েশা (রা); ৬. আল কুরআন।

পাঠ-২২ ও ২৩: ১. আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন;২. কুরআন এবং হাদিস; ৩. মহান আল্লাহ; ৪. জাকাত; ৫. জিজিয়া; ৬. গনিমত।

পাঠ-২৪: ১. মহান আল্লাহর; ২. সত্যবাদিতা; ৩. হযরত আনাস (রা); ৪. ক্ষমা ও উদারতা; ৫. মদিনা সনদ; ৬. হযরত মুহাম্মদ (স)।

পাঠ-২৫: ১. হযরত মুহাম্মদ (স); ২. হযরত আদম (আ); ৩. কৌলীন্য প্রথা; ৪. তাকওয়া (আল্লাহভীতি); ৫. আনসার ও মুহাজির; ৬. হযরত মুহাম্মদ (স)।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

কুরাইশ	শব্দের অর্থ বণিক বা সওদাগর। হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ)-এর বংশধররা আরবে 'কুরাইশ' নামে পরিচিত। হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর পুত্র ইসমাইল (আ)-এর বংশধর ফিহর ব্যবসা করে প্রচুর বিত্ত-বৈভব ও খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন বলে আরবরা তাকে 'কুরাইশ' বলে অভিহিত করে। এজন্য তার বংশধররা কুরাইশ নামে পরিচিতি লাভ করে। এ কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স)। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। মুহাম্মদ (স) ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব পিতৃহীন এ বালকের নাম রাখেন 'মুহাম্মদ' এবং মা রাখেন 'আহম্মদ'। মুহাম্মদ অর্থ প্রশংসিত আর আহম্মদ অর্থ সর্বাধিক প্রশংসাকারী।
হিলফুল ফুজুল	৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে উকাজ মেলার ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা ও কাব্য প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে পবিত্র জিলকদ মাসে কুরাইশ ও হাওয়াজিন গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। পবিত্র জিলকদ মাসে এ যুদ্ধ শুরু হওয়ায় একে 'হারবুল ফুজ্জার' বা অন্যায় সমরও বলা হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চলা এ যুদ্ধের ভয়াবহতা বালক মুহাম্মদের মনে গভীর রেখাপাত করে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে সমমনা কয়েকজন উৎসাহী যুবক ও পিতৃব্য যুবায়েরকে নিয়ে যে শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন তা ইতিহাসে 'হিলফুল ফুজুল' নামে পরিচিত। এই সংঘের সদস্য ফজল, ফাজেল, ফাজায়েল ও মোফাজ্জলের নামানুসারে এর নামকরণ হয় হিলফুল ফুজুল। এ সংঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল— ক. দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, খ. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্ভাব স্থাপন ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করা, গ. অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করা, ঘ. দুর্বল, অসহায় ও এতিমদের সাহায্য করা, ঙ. বিদেশি বণিকদের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা ও অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া।
হাজরে আসওয়াদ	হাজরে আসওয়াদ পবিত্র কাবা শরিফের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মাতাফ থেকে দেড় মিটার উঁচু দেয়ালে বিশেষভাবে স্থাপনকৃত একটি পাথরের নাম। আরবি 'হাজর' শব্দের অর্থ পাথর আর 'আসওয়াদ' শব্দের অর্থ কালো। সুতরাং এর অর্থ কালো পাথর। এটি বেহেশতের একটি মর্যাদাপূর্ণ পাথর। হজযাত্রীরা হজ করতে গিয়ে রাসুল (স)-এর আদর্শ অনুসারে এতে সরাসরি বা ইশারার মাধ্যমে চুম্বন করে থাকেন। রাসুল (স) বলেছেন, 'হাজরে আসওয়াদ একটি জান্নাতি পাথর, তার রং দুধের চেয়েও বেশি সাদা ছিল। এরপর বনি আদমের পাপরাশি এটিকে কালো বানিয়ে দিয়েছে।' (জামে তিরমিজি: ৮৭৭, মুসনাদে আহমদ, ১,৩০৭,৩২৯) এটি ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে কাবাগৃহ সংস্কারের সময় আবার পুনঃস্থাপন করা হয়। হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করে পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে চারটি কুরাইশ গোত্রের সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিলে হযরত মুহাম্মদ (স) অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে নিজের গায়ের চাদর খুলে এর ওপর পাথরটি রেখে চার গোত্রের অধিপতিদের দিয়ে বহন করিয়ে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের হাত থেকে মক্কাবাসীকে রক্ষা করেন। এ পবিত্র পাথরের দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৭ ইঞ্চি। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের শাসনামলে কাবাঘরের গিলাফে আগুন লাগলে হাজরে আসওয়াদ আট টুকরা হয়ে যায়। আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের ভাঙা টুকরাগুলো রুপার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেন।
নবুয়ত	সাধারণত নবির কাজ বা দায়িত্বকে নবুয়ত বলা হয়। আর নবি হলেন মানবজাতির হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহর প্রেরিত এবং প্রত্যাদেশ (ওহি) প্রাপ্ত বিশেষ বান্দা। মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি পাঠিয়েছেন। তারা সবাই মানুষকে সত্য ও সুন্দর জীবনবিধান তথা আল্লাহর দীন অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের সবার প্রচারিত দীনের মূলকথা ছিল আল্লাহর একত্ববাদ। হযরত আদম (আ)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারা শুরু হয়েছে এবং ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর আল কুরআন নাজিলের মধ্যদিয়ে এ ধারা শেষ হয়েছে।
ইসলাম	ইসলাম শব্দটি আরবি সিলমুন মূলধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ শান্তি। ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা। ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহ তায়ালা এবং রাসুল (স)-এর আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে। ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা। মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, নিয়ম-কানুনের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো ইসলাম। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণতা পেয়েছে।
আমুল হুজন	রাসুল (স)-এর দুজন প্রিয় ব্যক্তি চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদিজা (রা) মৃত্যুবরণ করার কারণে নবুয়তের দশম বছর তথা ৬২০ খ্রিষ্টাব্দকে আমুল হুজন বা শোকের বছর বলা হয়। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে রাসুল (স)-এর চাচা আবু তালিব ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এর পাঁচ সপ্তাহ পরে বিবি খাদিজা (রা) ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এ দুজন ব্যক্তি মহানবি (স)-কে ইসলাম প্রচারে ঘরে-বাইরে সহায়তা করতেন। ফলে তাদের মৃত্যুতে রাসুল (স) মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এ জন্য বছরটিকে আমুল হুজন বলা হয়।

মেরাজ	‘মেরাজ’ অর্থ উর্ধ্বগমন। মুহাম্মদ (স)-এর উর্ধ্বাকাশে গিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের ঘটনাকে মেরাজ বলে । ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ রজব রাতে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স)-কে তাঁর গৃহ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে সপ্ত আকাশ ভেদ করে নিজ আরশে আজিমে নিয়ে যান। সেখানে তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেন এবং তাঁর অসীম কুদরতে বেহেশত, দোজখসহ সৃষ্টির রহস্যাবলি দেখার সুযোগ পান। এরপর আল্লাহ তাঁকে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। এ সময়েই মুসলমানদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ (অত্যাবশ্যকীয়) করা হয়। রাসুল (স)-এর এ উর্ধ্বগমনই ইসলামের ইতিহাসে ‘মেরাজ’ নামে পরিচিত।
হিজরত	হিজরত শব্দের অর্থ প্রস্থান বা গমন। হিজরত বলতে সাধারণত বিশেষ উদ্দেশ্যে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়াকে বোঝায়। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভের পর হযরত মুহাম্মদ (স) ইসলাম প্রচার শুরু করলে মক্কার কুরাইশরা তাঁর ওপর নানা অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে। কিন্তু এরপরও তারা যখন হযরত মুহাম্মদ (স)-কে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারল না তখন তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে। আবু জেহেলের নেতৃত্বে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে তিনি আল্লাহর আদেশে আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর মদিনায় পৌছান। মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা থেকে মদিনায় এ স্থানান্তরকে হিজরত বলা হয়।
মুহাজির ও আনসার	মক্কায় ইসলাম প্রচারের কারণে মহানবি (স) এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। এ কারণে আল্লাহর নির্দেশে যারা জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন মহানবি (স) তাদেরকে মুহাজির (হিজরতকারী) নামে অভিহিত করেন। ‘আনসার’ শব্দের অর্থ সাহায্যকারী। ধর্মের ভিত্তিতে যারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন তাদেরকে আনসার বলা হয়। এরা রক্তের সম্পর্ক বিবেচনা না করে ধর্মের সম্পর্কের কথা চিন্তা করে মুহাজিরদের আশ্রয়দানসহ সার্বিক সহযোগিতা করেন।
মদিনা সনদ	৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে পরিচিত। মদিনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান। মহানবি (স) হিজরতের মাধ্যমে মদিনায় পৌছে মদিনায় বসবাসরত সকল জাতির সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ‘মদিনা সনদ’ নামে একটি মহাসনদ প্রণয়ন করেন। এটি মদিনার বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে ভূমিকা রাখে। ঐতিহাসিক ইবনে হিশামের ‘সিরাত’ গ্রন্থানুসারে এতে মোট ৪৭টি ধারা ছিল। এ সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে মদিনায় একটি সাধারণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানে বসবাসকারী সব নাগরিক সুখে ও শান্তিতে জীবনযাপন করতে থাকে।
খন্দক	ফারসি ‘খান্দা’ শব্দ থেকে আরবি খন্দক শব্দটি এসেছে, যার অর্থ পরিখা (খাল)। ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধে খন্দক বা পরিখার মাধ্যমে শত্রুদের বাধা প্রদান করা হয়েছিল বলে এ যুদ্ধকে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। উহুদ যুদ্ধে জয়লাভ করলেও আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ায় মক্কার কুরাইশরা মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। তাই মদিনা রক্ষার জন্য রাসুল (স) পারসিক সাহাবি সালমান ফারসি (রা)-এর পরামর্শে মদিনার অরক্ষিত স্থানগুলোতে পরিখা খনন করেন, যাতে মদিনা আক্রমণকারী শত্রুরা কোনোভাবেই এ পরিখা অতিক্রম করতে না পারে। এভাবে মুসলিমরা খন্দক বা পরিখার মাধ্যমে শত্রুর হাত থেকে মদিনাকে রক্ষা করেছিল।
বায়াতুর রিদওয়ান	বায়াতুর রিদওয়ান হলো মুসলমানদের গ্রহণকৃত একটি শপথ। ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমান (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে— এমন সংবাদ শুনে এটি গ্রহণ করা হয়েছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে মহানবি (স) সাহাবি খোরাস ও ওসমান (রা)-কে কুরাইশ নেতাদের কাছে শান্তি আলোচনার জন্য পাঠান। এ সময় কুরাইশরা ওসমান (রা)-কে আটক করে রাখে। এ সময় মুসলিম শিবিরে রব ওঠে যে কুরাইশরা ওসমান (রা)-কে হত্যা করেছে। এ সংবাদে মুসলমানরা দৃঢ় শপথ গ্রহণ করে যে, তারা জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। এ শপথকেই ইসলামের ইতিহাসে ‘বায়াতুর রিদওয়ান’ (৬২৮ খ্রি.) বলা হয়।
সানাত আল-উফূদ	সানাত আল-উফুদ শব্দের অর্থ প্রতিনিধি প্রেরণের বছর। নবম হিজরিতে মুহাম্মদ (স) অসংখ্য প্রতিনিধিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। তাই এ বছরকে প্রতিনিধি প্রেরণের বছর বলা হয়। বিভিন্ন যুদ্ধে এবং বিভিন্ন স্থানে ইসলামের সাফল্যের ফলে আরব ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গোত্রপ্রধানরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রাসুল (স)-এর আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকে। নবম হিজরিতে ওমান, হাজরামাউত, নাজরান, ইয়েমেন, বাহরাইন প্রভৃতি অঞ্চলের অসংখ্য গোত্র ইসলাম গ্রহণের জন্য মদিনায় রাসুল (স)-এর কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এ কারণেই নবম হিজরিকে প্রতিনিধি প্রেরণের বছর বলা হয়।

একনজরে বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

সময় (খ্রি.)	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
৫৭০	মানবতার মুক্তির দূত মহানবি (স) মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।
৫৮২	বাণিজ্য উপলক্ষ্যে নবি (স) চাচার সাথে সিরিয়া যান।
৫৯০	শান্তিসংঘ হিলফুল ফুজুল গঠন করেন। এর প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্দেশ্য ছিল ৫টি।
৫৯৫	২৫ বছর বয়সে বিবি খাদিজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।
৬০৫	পবিত্র কাবাগৃহে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করেন।
৬১০	নবি (স) হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে ওহি লাভ করেন। এ সময় সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিল হয়।
৬১৩	রাসুল (স) সব বাধা উপেক্ষা করে আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।
৬১৫	কুরাইশদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভের জন্য রাসুল (স) নওমুসলিমদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দেন।
৬১৯	নবি (স)-এর দুর্দিনের সাথী স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা) ও চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন।
৬২২	মক্কায় ধর্ম প্রচার প্রতিকূল হওয়ায় আল্লাহর নির্দেশে রাসুল (স) সহচর আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। এটি ছিল তাঁর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এর মাধ্যমে তিনি ধর্ম প্রচারক থেকে রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হন। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন। মদিনায় বসবাসরত সব গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাসুল (স) এ সনদ প্রণয়ন করেন। এ সনদে মোট ৪৭টি ধারা ছিল।
৬২৪	বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদিনায় মুসলমানদের প্রভাব বিস্তারে শঙ্কিত হয়ে মক্কার কুরাইশরা মদিনা আক্রমণ করলে ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে মুসলমানরা জয়লাভ করে।
৬২৫	উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে কুরাইশরা পুনরায় মদিনা আক্রমণ করলে উহুদ প্রান্তরে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম সৈন্যরা নেতার আদেশ অমান্য করায় কুরাইশদের কাছে পরাজিত হয়।
৬২৭	খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কুরাইশ, ইহুদি ও বেদুইনদের সম্মিলিত বাহিনী মদিনা আক্রমণ করলে রাসুল (স) পারসিক সাহাবি সালমান ফারসি (রা)-এর পরামর্শক্রমে মদিনার চারপাশে পরিখা (খাল) খনন করে কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিহত করেন বলে এ যুদ্ধকে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়।
৬২৮	হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। মহানবি (স)-এর নেতৃত্বে মদিনার মুসলমানরা মক্কায় হজ করতে রওনা দিলে হুদায়বিয়া নামক স্থানে কুরাইশরা মুসলমানদের বাধা দেয়। ফলে মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে এ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এতে কুরাইশরা রাসুল (স)-কে প্রথমবারের মতো নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এ সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে উল্লেখ করেন।
৬৩০	মহানবি (স) মক্কা বিজয় করেন। কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করায় মুসলমানরা মক্কা আক্রমণ করলে বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে মক্কা বিজয় 'রক্তপাতহীন বিজয়'-হিসেবে স্বীকৃত। এ বিজয়ের সময় নবি (স) প্রতিশোধ না নিয়ে কুরাইশদের ক্ষমা করে দেন— যা ইতিহাসে বিরল ঘটনা। হুনায়ুন ও তাবুক অভিযান পরিচালিত হয়। মক্কা বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী হুনায়ুন ও তাবুক অঞ্চল জয় করে।
৬৩২	বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়। রাসুল (স)-এর জীবনের শেষ হজ ছিল বলে এটি বিদায় হজ নামে পরিচিত। এ হজে রাসুল (স) আরাফার ময়দানে সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। এরপর বেশ কিছুদিন অসুস্থ থেকে রাসুল (স) ইন্তেকাল করেন।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাল্যজীবন, মক্কাজীবন ও নবুয়তপ্রাপ্তি

প্রশ্ন-১. 'কুরাইশ' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: 'কুরাইশ' শব্দের অর্থ সওদাগর বা বণিক।

প্রশ্ন-২. মহানবি (স) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন?

উত্তর: মহানবি (স) কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন-৩. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: মহানবি (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৪. 'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থ কী?

[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]

উত্তর: 'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থ প্রশংসিত।

প্রশ্ন-৫. মহানবি (স)-এর পিতার নাম কী?

উত্তর: মহানবি (স)-এর পিতার নাম আবদুল্লাহ।

প্রশ্ন-৬. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাতার নাম কী?

[রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো. ২০১৭]

উত্তর: হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাতার নাম আমিনা বেগম।

প্রশ্ন-৭. মহানবি (স)-এর পিতামহের নাম কী?

উত্তর: মহানবি (স)-এর পিতামহের নাম আবদুল মুত্তালিব।

প্রশ্ন-৮. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রথম দুধমাতার নাম কী?

উত্তর: হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রথম দুধমাতার নাম সোয়েবা।

প্রশ্ন-৯. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দ্বিতীয় দুধমাতার নাম কী?

উত্তর: হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দ্বিতীয় দুধমাতার নাম হালিমা।

প্রশ্ন-১০. হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম কোন ভাষায় কথা বলতে শেখেন?

উত্তর: হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলতে শেখেন।

প্রশ্ন-১১. আল-আমিন কার উপাধি ছিল?

উত্তর: হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপাধি ছিল আল আমিন বা বিশ্বাসী।

প্রশ্ন-১২. 'হারবুল ফুজ্জার' অর্থ কী?

উত্তর: 'হারবুল ফুজ্জার' অর্থ অন্যায় যুদ্ধ।

প্রশ্ন-১৩. হারবুল ফুজ্জার কত বছর স্থায়ী হয়েছিল?

উত্তর: হারবুল ফুজ্জার দীর্ঘ পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

প্রশ্ন-১৪. 'হিলফুল ফুজুল' অর্থ কী? *[রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]*

উত্তর: 'হিলফুল ফুজুল' অর্থ শান্তিসংঘ।

প্রশ্ন-১৫. 'হিলফুল ফুজুল' কে গঠন করেন?

উত্তর: 'হিলফুল ফুজুল' মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) গঠন করেন।

প্রশ্ন-১৬. হিলফুল ফুজুল কত বছর স্থায়ী ছিল?

উত্তর: হিলফুল ফুজুল ৫০ বছর স্থায়ী ছিল।

প্রশ্ন-১৭. পবিত্র কাবাগৃহের দেয়ালে স্থাপিত পাথরটির নাম কী?

উত্তর: পবিত্র কাবাগৃহের দেয়ালে স্থাপিত পাথরটির নাম হাজরে আসওয়াদ।

প্রশ্ন-১৮. বাহিরা কে ছিলেন?

উত্তর: বাহিরা ছিলেন মহানবি (স) এর সময়কার একজন খ্রিষ্টান পাদরি।

প্রশ্ন-১৯. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভ করেন?

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]

উত্তর: মহানবি (স) ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভ করেন।

প্রশ্ন-২০. মহানবি (স) কোথায় নবুয়ত লাভ করেন?

উত্তর: মহানবি (স) পবিত্র কাবাগৃহ থেকে তিন মাইল দূরে 'জাবালে নূর' পাহাড়ের হেরা গুহায় নবুয়ত লাভ করেন।

প্রশ্ন-২১. কত বছর বয়সে নবি করিম (স) নবুয়তপ্রাপ্ত হন?

উত্তর: ৪০ বছর বয়সে নবি করিম (স) নবুয়তপ্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন-২২. মহানবি (স)-এর ওপর প্রথম কোন আয়াত নাজিল হয়?

উত্তর: মহানবি (স)-এর ওপর প্রথম সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাজিল হয়।

প্রশ্ন-২৩. কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর: বিবি খাদিজা (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-২৪. কখন মুসলমানদের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়?

উত্তর: ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত হামজা (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-২৫. কত খ্রিষ্টাব্দে মিরাজ সংঘটিত হয়?

[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]

উত্তর: ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে মিরাজ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-২৬. 'মেরাজ' শব্দের অর্থ কী?

[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]

উত্তর: 'মেরাজ' শব্দের অর্থ ঊর্ধ্বগমন।

প্রশ্ন-২৭. আকাবার শপথ কয়টি পর্যায়ে হয়েছিল?

উত্তর: আকাবার শপথ তিনটি পর্যায়ে হয়েছিল।

■ হিজরতের কারণ ও গুরুত্ব

প্রশ্ন-২৮. মুসলমানরা প্রথম কোথায় হিজরত করেছিল?

উত্তর: মুসলমানরা প্রথম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিল।

প্রশ্ন-২৯. হিজরত কী?

উত্তর: আল্লাহর নির্দেশে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা থেকে মদিনায় চলে যাওয়ার ঘটনাই ইসলামের ইতিহাসে হিজরত বলে পরিচিত।

প্রশ্ন-৩০. মহানবি (স)-এর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা বলা হয় কোনটিকে?

উত্তর: মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকে মহানবি (স)-এর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা বলা হয়।

প্রশ্ন-৩১. হিজরতের সময় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গী কে ছিলেন? */সকল বোর্ড ২০১৬/*

উত্তর: হিজরতের সময় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)।

প্রশ্ন-৩২. আকাবার শপথ কী?

উত্তর: ৬২০, ৬২১ ও ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা থেকে আসা সাহাবিদের আকাবা উপত্যকায় ইসলামের ওপর অটল থাকার এবং ইসলামের কাজে সাহায্য করার শপথ গ্রহণই হলো আকাবার শপথ।

প্রশ্ন-৩৩. হিজরত অর্থ কী? */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১; রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো. ২০১৭/*

উত্তর: হিজরত অর্থ দেশত্যাগ বা একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করা।

প্রশ্ন-৩৪. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন? */ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮/*

উত্তর: মহানবি (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন।

প্রশ্ন-৩৫. 'আনসার' শব্দের অর্থ কী? */ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯/*

উত্তর: 'আনসার' শব্দের অর্থ সাহায্যকারী।

প্রশ্ন-৩৬. মদিনায় হিজরতকারীরা কী নামে পরিচিত?

উত্তর: মদিনায় হিজরতকারীরা 'মুহাজির' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৩৭. 'মোহাজিরীন' শব্দের অর্থ কী? */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩/*

উত্তর: মোহাজিরীন' শব্দের অর্থ নির্বাসিত।

■ মদিনা সনদ ও মদিনায় আদর্শ রাষ্ট্র গঠন

প্রশ্ন-৩৮. মদিনার পূর্বনাম কী ছিল? */ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; সকল বোর্ড ২০২১; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯; রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮; সকল বোর্ড ২০১৬/*

উত্তর: মদিনার পূর্বনাম ছিল ইয়াসরিব।

প্রশ্ন-৩৯. মদিনা সনদ কত খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত হয়?

উত্তর: মদিনা সনদ ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত হয়।

প্রশ্ন-৪০. কোনটিকে আরবের ম্যাগনাকার্টা বলা হয়?

উত্তর: বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদকে আরবের ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

প্রশ্ন-৪১. মদিনা সনদ কী?

উত্তর: মহানবি (স) মদিনায় হিজরতের পর মদিনায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে যে সনদ প্রণয়ন করেন তাই 'মদিনা সনদ' হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন-৪২. বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান কোনটি?

উত্তর: বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান হচ্ছে মদিনা সনদ।

প্রশ্ন-৪৩. মদিনা সনদে কয়টি ধারা ছিল?

উত্তর: মদিনা সনদে ৪৭টি ধারা ছিল।

■ মহানবি (স)-এর সময়ের বিভিন্ন যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল

প্রশ্ন-৪৪. কত সালে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো. , সি. বো. ২০২৩; সি. বো., ব. বো. ২০২১/*

উত্তর: ৬২৪ সালে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৪৫. বদরের যুদ্ধে কতজন মুসলিম সৈন্য শহিদ হয়েছেন? */ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫/*

উত্তর: বদরের যুদ্ধে ১৪ জন মুসলিম সৈন্য শহিদ হয়েছেন।

প্রশ্ন-৪৬. বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সেনাপতি কে ছিলেন? */ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮/*

উত্তর: বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সেনাপতি ছিলেন আবু জেহেল।

প্রশ্ন-৪৭. মুসলমানদের প্রথম সামরিক বিজয় কোনটি?

উত্তর: মুসলমানদের প্রথম সামরিক বিজয় বদরের যুদ্ধ।

প্রশ্ন-৪৮. কত খ্রিষ্টাব্দে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩; ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১/*

উত্তর: ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৪৯. উহুদের যুদ্ধে কুরাইশ নেতা কে ছিলেন? */সকল বোর্ড ২০১৬/*

উত্তর: উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের নেতা ছিলেন আবু সুফিয়ান।

প্রশ্ন-৫০. কোন যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ঘটে?

উত্তর: উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ঘটে।

প্রশ্ন-৫১. মহানবি (স)-এর দুটি দাঁত শহিদ হয় কোন যুদ্ধে?

উত্তর: মহানবি (স)-এর দুটি দাঁত শহিদ হয় উহুদ যুদ্ধে।

প্রশ্ন-৫২. 'খন্দক' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: খন্দক শব্দের অর্থ খাল বা পরিখা।

প্রশ্ন-৫৩. পবিত্র কুরআনে খন্দকের যুদ্ধকে কী নামে উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর: পবিত্র কুরআনে খন্দকের যুদ্ধকে 'আহযাবের যুদ্ধ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৫৪. খন্দকের যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল? */ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২/*

উত্তর: খন্দকের যুদ্ধ ৬২৭ সালে হয়েছিল।

প্রশ্ন-৫৫. খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের পরামর্শ দেন কে?

উত্তর: খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের পরামর্শ দেন সালমান ফারসি (রা)।

প্রশ্ন-৫৬. 'আহযাব' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: আহযাব শব্দের অর্থ সম্মিলিত বাহিনী, দল, জোট।

প্রশ্ন-৫৭. মহানবি (স) কাকে 'সাইফুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন? */ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২/*

উত্তর: মহানবি (স) খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) কে 'সাইফুল্লাহ' তথা আল্লাহর তরবারি উপাধিতে ভূষিত করেন।

■ হুদায়বিয়ার সন্ধির পটভূমি, শর্তাবলি ও তাৎপর্য

প্রশ্ন-৫৮. হুদায়বিয়ার সন্ধি কত খ্রিষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়? */রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো. ২০১৭/*

উত্তর: হুদায়বিয়ার সন্ধি ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়।

প্রশ্ন-৫৯. কোন ঘটনাকে ফাতহুম মুবিন বলা হয়?

উত্তর: হুদায়বিয়ার সন্ধিকে ফাতহুম মুবিন বলা হয়।

প্রশ্ন-৬০. 'ফাতহুম মুবিন' শব্দের অর্থ কী? */ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫; সি. বো., ব. বো. ২০২১/*

উত্তর: 'ফাতহুম মুবিন' শব্দের অর্থ প্রকাশ্য বিজয়।

প্রশ্ন-৬১. হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক কে ছিলেন?

উত্তর: হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক ছিলেন হযরত আলি (রা)।

প্রশ্ন-৬২. কোন চুক্তি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা দান করে?

উত্তর: হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা দান করে।

■ মক্কা বিজয়ের ঘটনা ও এর শিক্ষা

প্রশ্ন-৬৩. কত খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয় হয়েছিল? */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো. ২০২৩; ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১; রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮/*

উত্তর: ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয় হয়েছিল।

প্রশ্ন-৬৪. কোনটি বিশ্বের ইতিহাসে রক্তপাতহীন ঐতিহাসিক বিজয় বলে অভিহিত?

উত্তর: মক্কা বিজয় বিশ্বের ইতিহাসে রক্তপাতহীন ঐতিহাসিক বিজয় বলে অভিহিত।

প্রশ্ন-৬৫. মহানবি (স)-এর মক্কা বিজয়ে কীসের বিজয় হয়েছে?

উত্তর: মহানবি (স)-এর মক্কা বিজয়ে মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয় হয়েছে।

প্রশ্ন-৬৬. মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের ফলে কোনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

উত্তর: মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের ফলে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন-৬৭. কোন ঘটনা মহানবি (স)-এর ক্ষমা ও উদারতার উজ্জ্বল নিদর্শন?

উত্তর: মক্কা বিজয়ের ঘটনা মহানবি (স)-এর ক্ষমা ও উদারতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

প্রশ্ন-৬৮. তাবুক অভিযান কত সালে প্রেরিত হয়েছিল?
/ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫/

উত্তর: তাবুক অভিযান ৬৩০ সালে প্রেরিত হয়েছিল।

■ বিদায় হজের ভাষণের উদার ও মানবতাবাদী চেতনা

প্রশ্ন-৬৯. হুজ্জাতুল বিদা কী?

উত্তর: মহানবি (স)-এর সর্বশেষ জীবনের হজ ছিল হুজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ।

প্রশ্ন-৭০. বিদায় হজ কত খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর: বিদায় হজ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৭১. মহানবি (স) কোথায় বিদায় হজের ভাষণ দেন?

উত্তর: মহানবি (স) আরাফাতের ময়দানে জাবালে রহমত পাহাড়ে উঠে বিদায় হজের ভাষণ দেন।

প্রশ্ন-৭২. বিদায় হজের ভাষণে রাসুল (স) বিশ্বমানবতাকে কী অনুসরণ করতে বলছেন?

উত্তর: বিদায় হজের ভাষণে রাসুল (স) বিশ্বমানবতাকে কুরআন ও হাদিস অনুসরণ করতে বলছেন।

প্রশ্ন-৭৩. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন?
/সি. বো., ব. বো. ২০২১; ঢা. বো. ২০১৭/

উত্তর: মহানবি (স) ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

■ মহানবি (স)-এর সংস্কারসমূহ

প্রশ্ন-৭৪. মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক কে ছিলেন?

উত্তর: মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স)।

প্রশ্ন-৭৫. মহানবি (স) কোনটিকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করেন?

উত্তর: মহানবি (স) তাকওয়াকে (আল্লাহভীতি) শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করেন।

প্রশ্ন-৭৬. ইসলামের প্রথম বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয় কোথায়?

উত্তর: ইসলামের প্রথম বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয় মক্কার সাওর পর্বতের পাদদেশে হযরত আরকাম (রা) এর বাড়িতে।

প্রশ্ন-৭৭. ইসলামি জ্ঞানের মূল উৎস কোনটি?

উত্তর: ইসলামি জ্ঞানের মূল উৎস পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন।

প্রশ্ন-৭৮. ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন কে?

উত্তর: হযরত মুহাম্মদ (স) প্রথম ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৭৯. ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর: ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (স)।

প্রশ্ন-৮০. ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রধান উৎস কী?

উত্তর: ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রধান উৎস যাকাত।

প্রশ্ন-৮১. খারাজ কী?

উত্তর: ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম প্রজাদের দেওয়া ভূমিকরই খারাজ।

প্রশ্ন-৮২. গনিমত কী?

উত্তর: যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া সম্পদই গনিমত।

প্রশ্ন-৮৩. জিজিয়া কী?

উত্তর: ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের দেওয়া নিরাপত্তা করই জিজিয়া।

প্রশ্ন-৮৪. বায়তুল মাল কী?

উত্তর: ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগার হলো বায়তুল মাল।

প্রশ্ন-৮৫. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংস্কারক কে ছিলেন?

উত্তর: হযরত মুহাম্মদ (স) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংস্কারক ছিলেন।

■ মহানবি (স)-এর চারিত্রিক গুণাবলি এবং ইসলামি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ

প্রশ্ন-৮৬. কার ওপর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থা ছিল?

উত্তর: মহান আল্লাহর ওপর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থা ছিল।

প্রশ্ন-৮৭. আল-আমিন শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: আল-আমিন শব্দের অর্থ বিশ্বাসী।

প্রশ্ন-৮৮. আল-আমিন কাকে বলা হতো?

উত্তর: হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল আমিন বলা হতো।

প্রশ্ন-৮৯. 'প্রত্যেক মানুষ ভাই ভাই'— এটি কে বলেছেন?

উত্তর: 'প্রত্যেক মানুষ ভাই ভাই'— এটি হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন।

প্রশ্ন-৯০. মদিনা রাষ্ট্রের রূপ কী ছিল?

উত্তর: মদিনা রাষ্ট্রের রূপ ছিল ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

প্রশ্ন-৯১. বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত কে ছিলেন?

উত্তর: বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত ছিলেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল-আমিন বলা হতো কেন? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১; ঢাকা বোর্ড ২০১৭; সকল বোর্ড ২০১৫]*

উত্তর: সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য মহানবি (স)-কে আল-আমিন বলা হতো।

বাল্যকাল থেকেই মুহাম্মদ (স) সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। সত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তা ছাড়া তিনি ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ, অমায়িক, সরল ও বিশ্বাসযোগ্য। এ কারণে সবাই তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী উপাধি দিয়েছিল।

প্রশ্ন-২. হারবুল ফিজার কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: প্রাক-ইসলামি আরবের মক্কার বিখ্যাত উকাজ মেলাকে কেন্দ্র করে কুরাইশ ও কায়েস গোত্রের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধই হারবুল ফিজার বা অন্যায় সমর নামে পরিচিত।

প্রতিবছর আয়োজিত উকাজ মেলায় বিভিন্ন লোকের সমাগম ঘটে। ৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এ মেলায় জুয়াখেলা, কাব্য প্রতিযোগিতা, ও ঘোড়দৌড়কে কেন্দ্র করে কুরাইশ ও কায়েস গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নিষিদ্ধ মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং কায়েস গোত্র অন্যায়ভাবে এ যুদ্ধ কুরাইশদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল বলে একে হারবুল ফিজার বা অন্যায় যুদ্ধ বলা হয়। এ যুদ্ধ পাঁচ বছর স্থায়ী হয় এবং এতে অনেক প্রাণহানি ঘটে। এ যুদ্ধে বালক রাসুল (স) নিক্ষিপ্ত তীর সংগ্রহ করে তার চাচার হাতে তুলে দিতেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তার মন কেঁদে ওঠে এবং তিনি যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হিলফুল ফুজুল শান্তিসংঘ গঠন করেন।

প্রশ্ন-৩. হিলফুল ফুজুল বলতে কী বোঝায়? *[ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো. ২০১৭]*

উত্তর: হিলফুল ফুজুল বলতে যুবক বয়সে মহানবি (স)-এর প্রতিষ্ঠিত একটি শান্তিসংঘকে বোঝায়।

মহানবি (স) ছিলেন শান্তির দূত। তাই বালক বয়সে যখন তিনি 'হারবুল ফিজার' (৫৮৪ খ্রি.) যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখলেন তখন তাঁর অন্তর মানবতার জন্য কেঁদে উঠল। এ প্রেক্ষিতেই তিনি সমমনা কয়েকজন উৎসাহী যুবক ও পিতৃব্য যুবাইরকে নিয়ে ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে গড়ে তোলেন হিলফুল ফুজুল নামের শান্তিসংঘ। এ সংঘ মক্কার তৎকালীন গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত নির্মূল করে সবার মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে, যা বর্তমানেও আদর্শ হিসেবে অনুসৃত হচ্ছে।

প্রশ্ন-৪. 'হাজরে আসওয়াদ' সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টিকা লেখো।

উত্তর: হাজরে আসওয়াদ পবিত্র কাবা শরিফের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মাতাফ থেকে দেড় মিটার উঁচু দেয়ালে বিশেষভাবে স্থাপনকৃত একটি পাথরের নাম। আরবি 'হাজর' শব্দের অর্থ পাথর আর 'আসওয়াদ' শব্দের অর্থ কালো। সুতরাং এর অর্থ কালো পাথর। এটি বেহেশতের একটি মর্যাদাপূর্ণ পাথর। হজযাত্রীরা হজ করতে গিয়ে রাসুল (স)-এর আদর্শ অনুসারে এতে সরাসরি বা ইশারার মাধ্যমে চুম্বন করে থাকেন। রাসুল (স) বলেছেন, 'হাজরে আসওয়াদ একটি জান্নাতি পাথর, তার রং দুধের চেয়েও বেশি সাদা ছিল। এরপর বনি আদমের পাপরাশি এটিকে কালো বানিয়ে দিয়েছে।' (জামে তিরমিজি: ৮৭৭, মুসনাদে আহমদ, ১,৩০৭,৩২৯) ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে কাবাগৃহ সংস্কারের সময় মহানবি (স) নিজ হাতে কাবাগৃহে হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপন করে মক্কাবাসীকে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করেন। এ পবিত্র পাথরের দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৭ ইঞ্চি। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের শাসনামলে কাবাঘরের গিলাফে আগুন লাগলে হাজরে আসওয়াদ আট টুকরা হয়ে যায়। আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের ভাঙা টুকরাগুলো রুপার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেন।

প্রশ্ন-৫. মেরাজ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। *[সি. বো., ব. বো. ২০২১; রা বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]*

উত্তর: মেরাজ বলতে মুহাম্মদ (স)-এর উর্ধ্বাকাশে গিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের ঘটনাকে বোঝায়।

'মেরাজ' অর্থ উর্ধ্বগমন। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ রজব দিবাগত রাতে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স)-কে তাঁর গৃহ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে সপ্ত আকাশ ভেদ করে নিজ আরশে আজিমে নিয়ে যান। সেখানে তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেন এবং তাঁর অসীম কুদরতে বেহেশত, দোজখসহ সৃষ্টির রহস্যাবলি দেখার সুযোগ পান। এরপর আল্লাহ তাকে ইসলামের কতিপয় মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞান দান করে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। এই সময়েই মুসলমানদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। রাসুল (স)-এর এই উর্ধ্বগমনই ইসলামের ইতিহাসে 'মেরাজ' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৬. 'শোয়াবে আবু তালিব'-এর বর্ণনা দাও।

উত্তর: 'শোয়াবে আবু তালিব' আরবের মক্কা দূরবর্তী একটি পাহাড়, যেখানে ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশ সম্প্রদায় দ্বারা বনু হাশিম গোত্র বয়কট হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায় মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বললে আবু তালিব এটাকে প্রত্যাখান করেন। তখন কুরাইশ বংশ ও সকল বংশ একত্র হয়ে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের সাথে সকল লেনদেন বন্ধ করে দেয়। ফলে মুহাম্মদ (স)-এর চাচা আবু তালিব অপারগ হয়ে বাড়ি ঘর ছেড়ে মুহাম্মদ (স) সহ বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের নারী, পুরুষ ও শিশুসহ সবাইকে সজো নিয়ে বাধ্য হয়ে শোয়াবে আবু তালিব নামক পাহাড়ে মধ্যে নির্বাসিত হলেন।

প্রশ্ন-৭. ইহুদিরা মহানবিকে (স) প্রতিশ্রুত নবি হিসেবে গ্রহণ করেছিল কেন?

উত্তর: ইহুদিরা তাদের ধর্মগ্রন্থের নির্দেশানুসারে মহানবি (স)-কে প্রতিশ্রুত নবি হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

নৈতিক অধঃপতিত আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠা যখন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল তখনই মানবমুক্তির দূত হিসেবে মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাব ঘটেছিল। মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মদিনার ইহুদিরা তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের মাধ্যমে জানতে পারে যে, আরব ভূ-খণ্ডে একজন নবির আবির্ভাব ঘটবে। তাই মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তারা তাঁকে Promised Prophet বা প্রতিশ্রুত পয়গম্বর হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ কারণে তারা মহানবি (স)-কে মদিনায় আমন্ত্রণ জানায়।

প্রশ্ন-৮. হিজরত বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: হিজরত বলতে সাধারণত বিশেষ উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করাকে বোঝায়।

হিজরত শব্দের অর্থ প্রস্থান বা গমন। মক্কার অভিজাত কুরাইশরা মনে করত, ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের প্রভুত্ব কমে যাবে। তাই তারা মহানবি (স)-কে চিরশত্রু মনে করে তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে এবং নির্যাতনের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে তারা আবু জেহেলের নেতৃত্বে রাসুল (স)-কে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তায়ালা রাসুল (স)-কে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। তাই তিনি হযরত আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মক্কা থেকে মদিনায় চলে যান। মুহাম্মদ (স) এর মক্কা থেকে মদিনায় চলে যাওয়ার এ ঘটনাকেই ইসলামের ইতিহাসে হিজরত বলা হয়।

প্রশ্ন-৯. হিজরতকে মহানবি (স)-এর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী অধ্যায় বলা হয় কেন?

উত্তর: হিজরতের মধ্য দিয়েই রাসুল (স)-এর মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন ও এর কর্ণধার হন। তাই একে রাসুল (স)-এর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী অধ্যায় বলা হয়।

মক্কায় অবহেলিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুহাম্মদ (স) হিজরতের মাধ্যমে মদিনায় এসে একজন সম্মানিত নেতার মর্যাদা লাভ করেন। তিনি মদিনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। সেখানে তিনি সব ধর্মের মানুষকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ গড়ে তোলেন। এভাবে তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসক ও কূটনীতিবিদের আসন লাভ করেন। আর এ কারণেই হিজরতকে রাসুল (স)-এর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী অধ্যায় বলা হয়।

প্রশ্ন-১০. কাদেরকে আনসার ও মুহাজির বলা হয়? *[ঢা. বো., য. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১; সকল বোর্ড ২০১৬]*

উত্তর: ধর্মের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ যারা হিজরতকারী মুসলিমদের সাহায্য করেন এবং যারা জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে হিজরত করেন তাদেরকেই যথাক্রমে আনসার এবং মুহাজির বলা হয়।

'আনসার' শব্দের অর্থ সাহায্যকারী এবং 'মুহাজির' শব্দের অর্থ হিজরতকারী। মক্কায় ইসলাম প্রচারের কারণে মহানবি (স) এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। এ কারণে আল্লাহর নির্দেশে যারা জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন মহানবি (স) তাদেরকে মুহাজির নামে অভিহিত করেন। আর রক্তের সম্পর্ক বিবেচনা না করে ধর্মের সম্পর্কের কথা চিন্তা করে মুহাজিরদের যারা আশ্রয়দানসহ সার্বিক সহযোগিতা করেন তাদেরকে তিনি আনসার নামে অভিহিত করেন।

প্রশ্ন-১১. মুহাজির কারা?

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯]

উত্তর: ইসলামের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসার জন্য যারা জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে হিজরত করেন তাদেরকে মুহাজির বলা হয়।

'মুহাজির' আরবি শব্দ। এর অর্থ হিজরতকারী। মক্কায় ইসলাম প্রচারের কারণে কুরাইশরা মহানবি (স) এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালালে আল্লাহর নির্দেশে তারা জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। মহানবি (স) এ দেশ ত্যাগকারীদের মুহাজির নামে অভিহিত করেন।

প্রশ্ন-১২. হিজরত ও দেশত্যাগের মধ্যে পার্থক্য কী? বুঝিয়ে লেখো। *[সি. বো., ব. বো. ২০২১; রা. বো., দি. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো., কু. বো., চ. বো. ২০১৭]*

উত্তর: হিজরত এবং দেশত্যাগের মধ্যে মৌলিক ও উদ্দেশ্যগত কিছু পার্থক্য রয়েছে।

শাব্দিকভাবে হিজরত ও দেশত্যাগ একই অর্থ ধারণ করে। অর্থাৎ এগুলোর অর্থ এক দেশ বা একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া। কিন্তু উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে দুটি ভিন্ন বিষয়। দেশত্যাগ যে কোনো প্রয়োজনে, বৈষয়িক বা পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনে হতে পারে। কিন্তু 'হিজরত' শব্দটির সাথে ইসলাম প্রচার বা প্রসারের বিষয়টি জড়িত। রাসুল (স) ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে বিরোধীদের নির্যাতনের শিকার হয়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বর্তমান সময়েও কেউ যদি অনুরূপ পরিস্থিতিতে বা উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তবে তা হিজরত বলে পরিগণিত হবে।

প্রশ্ন-১৩. মদিনা সনদকে বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান বলা হয় কেন?

উত্তর: পৃথিবীর ইতিহাসে মদিনা সনদই ছিল প্রথম সংবিধান বা লিখিত দলিল।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরতের পর মহানবি (স) মদিনার সংহতির কথা চিন্তা করে সেখানে বসবাসকারী পৌত্তলিক, ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের জন্য যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন তাই হলো মদিনা সনদ। এটি মহানবি (স)-এর সর্বাধিক দূরদর্শিতার ফসল। তাঁর পূর্বে কোনো নবি তার জাতিকে লিখিত সংবিধান

দিতে পারেননি। তাদের মুখোচ্চারিত বাণীই ছিল আইন। তাই আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এটিকে 'The first written constitution' হিসেবে আখ্যা দিয়ে আরবের 'ম্যাগনাকার্টা' বলে অভিহিত করেছেন। আবার ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, এটিই ছিল পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান।

প্রশ্ন-১৪. আকাবার শপথ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১; সকল বোর্ড ২০১৫/*

উত্তর: আকাবার শপথ বলতে মক্কার কাছাকাছি আকাবায় মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণ ও এর প্রসারে ভূমিকা রাখার অঙ্গীকারকে বোঝায়।

৬২১ খ্রিষ্টাব্দে মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের ৬ জন লোক মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরের বছর কয়েকজন মহিলাসহ ৭৫ জন মদিনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে মদিনাবাসী আকাবার শপথের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলাম প্রসারে সহযোগিতা করবে বলে সম্মত হয়। তাদের এ অঙ্গীকারই আকবার শপথ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-১৫. নাখলার খণ্ড যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো।

/দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩/

উত্তর: ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল নাখলার খণ্ড যুদ্ধ।

মক্কার কুরাইশ ও তাদের মিত্ররা প্রায়ই মদিনার প্রান্তসীমায় লুটতরাজ করত। তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলি থেকে মদিনা রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স) আবদুল্লাহ ইবনে জাহসের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি গোয়েন্দা দল মক্কার উপকণ্ঠে পাঠান। কিন্তু আবদুল্লাহ ভুলক্রমে মক্কাগামী কুরাইশদের একটি কাফেলাকে নাখলা নামক স্থানে আক্রমণ করে। ফলে সেখানে একটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশ নেতা আমর বিন হাজরামি নিহত ও অপর দুই ব্যক্তি বন্দি হন। আমর বিন হাজরামির মৃত্যু কুরাইশদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং এটিই বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন-১৬. উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩/*

উত্তর: উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ছিল নেতার আদেশ অমান্য করা।

যুদ্ধে জয়লাভের ক্ষেত্রে নেতার নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত উহুদের যুদ্ধে রাসুল (স) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজকে উহুদ ও আইনাইন পর্বতের মাঝামাঝি সংকীর্ণ গিরিপথে নিয়োজিত করে চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু তারা মুসলমানদের বিজয় আসন্ন দেখে গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) মাল সংগ্রহের জন্য গিরিপথ থেকে সরে যায়। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কুরাইশরা সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে এ পথ দিয়ে আক্রমণ করলে মুসলিমরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে।

প্রশ্ন-১৭. খালিদ বিন ওয়ালিদ বিখ্যাত কেন?

/ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫/

উত্তর: দক্ষ ও সুকৌশলী বীর সেনাপতি হিসেবে খালিদ বিন ওয়ালিদ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রাথমিক জীবনে কুরাইশদের সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ করলেও হুদায়বিয়ার সন্ধির (৬২৮খ্রি.) পর রাসুল (স)-এর বিচক্ষণতা ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধে খালিদের দক্ষ রণকৌশলেই মুসলমানরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাসুল (স)-এর সময়ে হুনায়নের যুদ্ধ, তায়েফ বিজয়, তাবুক অভিযানে দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করে তিনি ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত করেন। তাছাড়া রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পর ইয়ামামার যুদ্ধে (৬৩২খ্রি.) বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে খালিদ বিন ওয়ালিদ ভণ্ডনবিদের শায়েস্তা করেন। এরপর জীবিত থাকা পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে সংঘটিত সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। এমন বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্যই খালিদ বিন ওয়ালিদ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রশ্ন-১৮. খন্দকের যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয় কেন?

উত্তর: আরবের বিভিন্ন শত্রুদল একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করেছিল বলে পবিত্র কুরআনে খন্দকের যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয়েছে।

ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে না পেরে মক্কার কুরাইশ, মদিনার ইহুদি এবং বেদুইনরা একত্র হয়ে সম্মিলিত বাহিনী গঠন করে ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ মার্চ ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণ করে। পরিখা (খাল) খননের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনী সম্মিলিত এ বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তি জোটের আক্রমণের কারণে খন্দকের যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয়।

প্রশ্ন-১৯. বায়াতুর রিদওয়ান কী? ব্যাখ্যা করো। */সি. বো., ব. বো. ২০২১/*

উত্তর: বায়াতুর রিদওয়ান হলো মুসলমানদের গ্রহণকৃত একটি শপথ।

হুদায়বিয়ার সন্ধির (৬২৮ খ্রি.) আগে মহানবি (স) ওসমান (রা)-কে কুরাইশ নেতাদের নিকট শান্তি আলোচনার জন্য পাঠায়। এ সময় কুরাইশরা ওসমান (রা)-কে আটক করে রাখে। পরবর্তীকালে মুসলিম শিবিরে রব ওঠে যে কুরাইশরা ওসমান (রা)-কে হত্যা করেছে। এ সংবাদে মুসলমানরা দৃঢ় শপথ গ্রহণ করে যে, তারা জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। এ শপথকেই ইসলামের ইতিহাসে বায়াতুর রিদওয়ান বলা হয়।

প্রশ্ন-২০. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' কী? বলা হয় কেন?

/ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো., ২০২৩; সকল বোর্ড ২০১৬/

উত্তর: পরোক্ষভাবে মুসলমানদের বিজয় নিহিত ছিল বলে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয়।

ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগান্তকারী ঘটনা। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ ও মুসলিমদের মধ্যে দশ

বছরের জন্য এ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে ছিল। এ সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মহানবি (স)-কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। মুসলমানরা যে একটি স্বতন্ত্র শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ সন্ধির মাধ্যমে। মোট কথা, এ সন্ধি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা দান করে। এ কারণে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয়।

প্রশ্ন-২১. ওমরাতুল কাযা বা মুলত্রবি হজ কী?

[ঢা. বো., রা: বো., য. বো. ২০২২]

উত্তর: হুদায়বিয়ার সন্ধির (৬২৮ খ্রি.) শর্তানুযায়ী এর পরের বছর মহানবি (স) ২০০০ জন সাহাবি নিয়ে যে হজ পালন করেন তাকে ওমরাতুল কাযা বা মুলতবি হজ বলা হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী মদিনার মুসলিমরা মহানবি (স)-এর সাথে মুলতবি হজ পালনের উদ্দেশ্যে পরের বছর ৭ম হিজরি সনের জিলহজ মাসে সমবেত হয়। এ সময় মহানবি (স) ২০০০ জন সাহাবির এক বিশাল কাফেলাসহ মক্কায় গিয়ে হজ আদায় করেন। তখন তিনি মক্কার কোনো আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করেননি কিংবা তাদের ঘরেও যাননি। সন্ধির শর্ত পালন করে তিনি সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী এ সময় মক্কার কুরাইশরাও ৩ দিন মক্কার বাইরে অবস্থান করে।

প্রশ্ন-২২. মক্কা বিজয়কে রক্তপাতহীন বিজয় বলা হয় কেন?

[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]

উত্তর: মহানবি (স) মক্কা বিজয়ের সময়ে কোনো প্রকার রক্তপাত না ঘটিয়ে মক্কাবাসীকে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা করেন, তাই এ বিজয়কে রক্তপাতহীন বিজয় বলা হয়।

মহানবি (স) ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয় করেন। এ সময় তিনি অতীতের সব অপমান ও অন্যায় ভুলে গিয়ে মক্কাবাসীর প্রতি সর্বজনীন ক্ষমা ঘোষণা করেন। এভাবে রচিত হয় পৃথিবীর ইতিহাসে রক্তপাতহীন এক ঐতিহাসিক বিজয়। আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সিজার ও নেপোলিয়ানের দেশজয় ছিল নিরীহ জনসাধারণের রক্তপাতের ইতিহাস। কিন্তু মহানবি (স)-এর মক্কা বিজয় ছিল রক্তপাতহীন এক মহাবিজয়।

প্রশ্ন-২৩. বিদায় হজ বলতে কী বোঝায়?

[সি. বো., ব. বো. ২০২১; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]

উত্তর: বিদায় হজ বলতে মহানবি (স)-এর জীবনের একমাত্র ও সর্বশেষ হজকে বোঝায়।

মহানবি (স) তাঁর মদিনার জীবনে দু'বার ওমরাহ করলেও পূর্ণাঙ্গ হজ পালন করতে পারেননি। এ অবস্থায় তিনি ১০ম হিজরি সনের ২৫ জিলকদ (৬৩২ খ্রি.) ১ লাখ ১৪ হাজার মুসলমানসহ পবিত্র হজ পালনের জন্য মক্কায় গমন করেন। ১০ লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলিম হজ পালনের জন্য মক্কায় সমবেত হয়। এটি ছিল মহানবি (স)-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বশেষ হজ পালন। এ জন্য এ হজকে 'হুজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ বলা হয়।

প্রশ্ন-২৪. খারাজ কী? বর্ণনা করো।

উত্তর: মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম প্রজাদের চাষকৃত ভূমির ওপর আরোপিত কর খারাজ নামে পরিচিত।

ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম প্রজা বা জিম্মিদের চাষাবাদের জমিকে বলা হয় খারাজি ভূমি। আর খলিফা বা ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক এই ভূমির ওপর যে কর আদায় করেন তাকে বলা হয় খারাজ। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময় রাজস্ব আদায়ের অন্যতম উৎস ছিল খারাজ। ভূমি রাজস্ব বিভাগের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য ওমর (রা) 'দিউয়ান-উল-খারাজ' নামে একটি নতুন রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন-২৫. রাসুলের জীবনাদর্শ অনুকরণীয় কেন?

উত্তর: সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে রাসুল (স)-এর শান্তি প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আরব সমাজ আইয়ামে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে রাসুল (স) মানুষকে শিরক, মূর্তি পূজা বাদ দিয়ে এক আল্লাহকে অনুসরণের আহ্বান জানান। তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও বিচার বিভাগসহ সকলক্ষেত্রে উত্তম আদর্শের উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। মহানবি (স)-এর চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল তাঁর সত্যবাদিতা। তিনি ছিলেন নম্রতা ও বিনয়ের মূর্ত প্রতীক। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক, সাম্যের ধারক এবং ন্যায়বিচারক। এসব কারণেই রাসুলের জীবনাদর্শ অনুকরণীয়।

প্রশ্ন-২৬. মহানবি (স)-এর সংস্কারের ফলে আরবদের সমাজ জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল?

উত্তর: মহানবি (স)-এর সংস্কারের ফলে আরবদের সমাজ জীবনে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহানবি (স) যে উন্নত ও আদর্শ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন তার নজির বিশ্বের ইতিহাসে নেই। তিনি মানুষের মধ্যে বিরাজমান অসাম্য ও ভেদাভেদ দূর করে মানবিক এবং বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করেন। তিনি পিতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলেও সমাজে যাতে নারীরা যথাযথ মর্যাদা পায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি নারীদের জন্য পর্দা প্রথা চালু করে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ব্যভিচার দূর করে একটি সুন্দর সমাজ গঠন করে সমাজে নারীদের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। মুহাম্মদ (স) ১৪০০ বছর আগে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রথম অবস্থান নেন। তিনি দাসপ্রথাকে ঘৃণা করেন এবং দাসমুক্তিকে উৎসাহিত করেন। এভাবে মহানবি (স) আরববাসীকে একটি সাম্যভিত্তিক সমাজ উপহার দেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহানবি (স) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. কায়েস
খ. বনু বকর
গ. কুরাইশ
ঘ. হাওয়াজিন

২. 'কুরাইশ' শব্দের অর্থ কী?
ক. সত্যবাদী
খ. বণিক
গ. সাহায্যকারী
ঘ. স্বর্ণকার

৩. 'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থ কী?
ক. উজ্জ্বল
খ. প্রশংসাকারী
গ. উচ্চ প্রশংসিত
ঘ. মহান

৪. মহানবি (স)-এর ধাত্রী মা কে ছিলেন?
ক. আমিনা
খ. উম্মে আয়মান
গ. যাকিয়া
ঘ. হালিমা

৫. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল আমিন বলা হয়, কারণ তিনি—
ক. আমানত রক্ষা করতেন ও সর্বদা সত্য কথা বলতেন
খ. কর্তব্যনিষ্ঠায় অটুট ছিলেন
গ. সৎ রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতা ছিলেন
ঘ. অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতেন

৬. হাজরে আসওয়াদ কী?
ক. মসজিদ
খ. কালো পাথর
গ. মিনার
ঘ. কাবাঘর

৭. 'হিলফুল ফুজুল' অর্থ কী?
ক. শান্তিসংঘ
খ. অন্যায় সমর
গ. প্রশংসিত
ঘ. ন্যায়সংঘ

৮. হিলফুল ফুজুল নামক সংঘ কত সালে গঠিত হয়?
ক. ৫৯০
খ. ৫৯২
গ. ৫৯৪
ঘ. ৫৯৬

৯. কোন গুহায় মহানবি (স)-এর কাছে ওহি নাজিল হয়?
ক. সাফা
খ. হেরা
গ. মারওয়া
ঘ. সাওর

১০. রাসুল (স) কত বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করেন?
ক. এক
খ. দুই
গ. তিন
ঘ. চার

১১. মুসলমানরা প্রথম হিজরত করেন কোথায়?
ক. আবিসিনিয়া
খ. মদিনা
গ. তায়েফ
ঘ. নজদ

১২. মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময়ে সেখানকার রাজা কে ছিলেন?
ক. আবরাহা
খ. নাজ্জাসি
গ. খসরু
ঘ. গাস্সানি

১৩. মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের মূল কারণ কী ছিল?
ক. মক্কায় কুরাইশদের নির্মমতা
খ. মদিনা ইসলামের অনুকূলে
গ. মদিনায় সুন্দর জীবন
ঘ. মদিনার সমৃদ্ধতা

১৪. মদিনায় হিজরতকারীদের ইসলামের ইতিহাসে কী নামে ডাকা হয়?
ক. আনসার
খ. মুহাজির
গ. হানিফ
ঘ. মাওয়ালি

১৫. বদরের যুদ্ধে কতজন মুসলিম সৈন্য শাহাদাৎবরণ করেন?
ক. ১৪ জন
খ. ১৫ জন
গ. ২০ জন
ঘ. ৭০ জন

১৬. খন্দকের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
ক. ৬২৫
খ. ৬২৬
গ. ৬২৭
ঘ. ৬২৮

১৭. হুদায়বিয়ার সন্ধি কত খ্রিষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ৬২৫
খ. ৬২৬
গ. ৬২৭
ঘ. ৬২৮

১৮. ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি কাদের সাথে স্বাক্ষরিত হয়?
ক. কুরাইশদের
খ. ইহুদিদের
গ. খ্রিষ্টানদের
ঘ. হিন্দুদের

১৯. পবিত্র কুরআনে 'ফাতহুম মুবিন' বলা হয়েছে কোনটিকে?
ক. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে
খ. হিলফুল ফুজুলকে
গ. মক্কা বিজয়কে
ঘ. মদিনা বিজয়কে

২০. কত হিজরিতে মক্কা বিজয় হয়?
ক. ষষ্ঠ
খ. সপ্তম
গ. অষ্টম
ঘ. দশম

২১. বিদায় হজ কত খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়?
ক. ৬৩০
খ. ৬৩২
গ. ৬৩৩
ঘ. ৬৩৪

২২. মহানবি (স) কোন পাহাড়ে উঠে বিদায় হজের ভাষণ দেন?
ক. জাবালে নূর
খ. সাওর
গ. সাফা পর্বতে
ঘ. জাবালে রহমত

২৩. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
ক. ৬৩০
খ. ৬৩২
গ. ৬৩৩
ঘ. ৬৩৪

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২৪. হিলফুল ফুজুলের উদ্দেশ্য ছিল—
i. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা
ii. ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা
iii. নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদের সেবা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৫. মক্কা বিজয়ের ফলে—
i. পৌত্তলিকতার অবসান হয়
ii. একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা হয়
iii. মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

নায়ানপুর গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন বংশের লোকদের মধ্যে কলহ-বিবাদ লেগেই থাকে, যা কখনো কখনো চরম আকার ধারণ করে। এরূপ অবস্থা দেখে রফিক সাহেব তার বন্ধুদের নিয়ে গ্রামে একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

২৬. রফিক সাহেবের প্রতিষ্ঠিত শান্তিসংঘের সাথে মিল রয়েছে—
ক. হিলফুল ফুজুলের খ. হুদায়বিয়ার সন্ধির
গ. মসলিশ-উস-শুরার ঘ. বাইতুল মালের

২৭. উক্ত সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল—
i. রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করা
ii. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা
iii. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডারগণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গতিরোধ করার জন্য এদেশের গুরুত্বপূর্ণ কালভার্ট, ব্রিজ ভেঙে ফেলা এবং রাস্তা কেটে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উক্ত পরিকল্পনাটি গ্রহণের ফলে শত্রুরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে ব্যর্থ হয় এবং পরাজয় বরণ করে। এ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি সফল হয় এবং স্বাধীনতা লাভ করে।

২৮. উদ্দীপকের পরিকল্পনাটির সাথে মহানবি (স)-এর কোন পরিকল্পনার সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. আত্মরক্ষা খ. প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
গ. পরিখা খনন ঘ. সেনা মোতায়েন

২৯. উদ্দীপকে বর্ণিত কৌশলটি গ্রহণ করে মুসলমানরা উপকৃত হয়েছিলেন—
i. গনিমতের মাল সংগ্রহে
ii. সফলতা লাভে
iii. আত্মরক্ষায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩০ ও ৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

কৌশলপূর্ণ পশ্চাদগমন দূরদর্শী নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। একজন মহাপুরুষ তাঁর জীবনে এরূপ একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে সুদূরপ্রসারী ও রণচাতুর্যপূর্ণ বিজয় অর্জন করেন।

৩০. উদ্দীপকের ঘটনাটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
ক. হিলফুল ফুজুল খ. আকাবার শপথ
গ. মদিনা সনদ ঘ. হুদায়বিয়ার সন্ধি

৩১. উক্ত ঘটনার সুদূরপ্রসারী ফলাফল হলো—
i. দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধাবস্থার অবসান
ii. মহাবিজয়
iii. আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩২. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
ক. ৫৬০ খ. ৫৬৫
গ. ৫৭০ ঘ. ৫৭৫

৩৩. 'হিলফুল ফুজুল' গঠনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? *[সকল বোর্ড ২০২৩]*
ক. শান্তি প্রতিষ্ঠা খ. ক্ষমতা দখল
গ. নিজেদের প্রচার ঘ. যুবকদের সংগঠিত করা

৩৪. হিলফুল ফুজুল গঠনের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মূলত কোন গুণটির প্রকাশ ঘটেছে? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. সাহসিকতা খ. নেতৃত্বগুণ
গ. মানবিকতা ঘ. গোত্রপ্রীতি

৩৫. ওয়ারাকা বিন নওফেল কোন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
ক. ইসলাম খ. ইহুদি
গ. খ্রিষ্টান ঘ. একেশ্বরবাদ

৩৬. হযরত মুহাম্মদ (স) কত খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত প্রাপ্ত হন? *[সকল বোর্ড ২০২৩]*
ক. ৫৭০ খ্রি. খ. ৫৯৫ খ্রি.
গ. ৬১০ খ্রি. ঘ. ৬২২ খ্রি.

৩৭. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
ক. ৬২০ খ. ৬২২
গ. ৬২৪ ঘ. ৬২৬

৩৮. সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০২১]*

ক. মদিনা সনদ　খ. ব্রিটেন আইন
গ. আমেরিকান আইন　ঘ. ফ্রান্সের আইন

৩৯. মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০২১]*

ক. উহুদের যুদ্ধ　খ. খন্দকের যুদ্ধ
গ. বদরের যুদ্ধ　ঘ. মুতার যুদ্ধ

৪০. বদর যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

ক. ৬২২　খ. ৬২৪
গ. ৬২৫　ঘ. ৬২৭

৪১. কে মহানবি (স)-কে পরিখা খনন করতে পরামর্শ দেন? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

ক. আমর বিন আস (রা)　খ. খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)
গ. হামজা (রা)　ঘ. সালমান ফারসি (রা)

৪২. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয় করেন? *[সকল বোর্ড ২০২১]*

ক. ৬২৯　খ. ৬৩০
গ. ৬৩১　ঘ. ৬৩২

৪৩. মহানবি (স) কোথায় বিদায় হজের ভাষণ দেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

ক. কাবা চত্বরে　খ. মিনায়
গ. সাফা পর্বতে　ঘ. আরাফাতে

৪৪. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর 'আল আমিন' উপাধি প্রাপ্তির কারণ, তাঁর— *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

i. বিশ্বস্ততা
ii. আমানতদারিতা
iii. সত্যবাদিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

৪৫. মদিনা সনদের মাধ্যমে মুসলিমরা অর্জন করেছিল তাদের— *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

i. ধর্মীয় স্বাধীনতা
ii. সামাজিক অধিকার
iii. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. ii ও iii
গ. i ও iii　ঘ. i, ii ও iii

৪৬. মহানবি (স) হুদায়বিয়ার সন্ধি করেছিলেন— *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

i. পৌত্তলিকদের সাথে
ii. ইহুদিদের সাথে
iii. কুরাইশদের সাথে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

৪৭. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বলার কারণ— *[সকল বোর্ড ২০২১]*

i. মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা
ii. দশ বছর যুদ্ধ বিরতি
iii. কুরাইশদের সদিচ্ছা প্রকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　খ. i ও ii
গ. i ও iii　ঘ. i, ii ও iii

৪৮. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বিদায় হজের ভাষণ গুরুত্বপূর্ণ — *[সকল বোর্ড ২০২১]*

i. ইসলামি রাজনীতি ও সমাজনীতি বিবৃত হওয়ায়
ii. মানবজীবনের আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতিফলন থাকায়
iii. মানবজীবনের জাগতিক শিক্ষার প্রতিফলন থাকায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৯ ও ৫০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশে ফ্যাসিস্টকে উৎখাত করতে তরুণ ছাত্র সমাজ ও বিক্ষুব্ধ জনতা সরকারের পেটোয়া বাহিনীর অত্যাধুনিক অস্ত্র-গুলির মুখে ঢিল ছুড়ে প্রতিরোধ করেছিল। তাদের এই অভিনব ও অভাবনীয় প্রতিরোধ-অভ্যুত্থান ফ্যাসিস্টকে পালাতে বাধ্য করেছিল। *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

৪৯. উদ্দীপকে ফ্যাসিস্ট উৎখাতের প্রক্রিয়ার সাথে মক্কা আক্রমণকারী কোন শত্রুর উৎখাতের মিল রয়েছে?

ক. আবরাহা　খ. আবু জেহেল
গ. আবু সুফিয়ান　ঘ. ইবনে উবাই

৫০. উদ্দীপকে অস্ত্রের মুখে ঢিল ছোড়ার সাথে মক্কা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কোন কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য রয়েছে?

ক. বন্যায় শত্রুপক্ষের ভেসে যাওয়া
খ. আরবদের গোত্রপ্রীতির প্রতিফলন
গ. হস্তী বাহিনীর পা কাদায় আটকে যাওয়া
ঘ. আবাবিল পাখির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর নিক্ষেপ

উদ্দীপকটি পড়ে ৫১ ও ৫২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিবদমান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। জাতিসংঘের সনদে বিরোধ মীমাংসা, প্রশাসন পরিচালনা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি ধারাগুলো একটি বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিত দেয়। *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

৫১. উদ্দীপকে বর্ণিত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পটভূমির সাথে মহানবি (স)-এর জাতি গঠনের কোন উদ্যোগের মিল রয়েছে?

ক. হিলফুল ফুজুল　খ. মদিনা সনদ
গ. হুদায়বিয়ার সন্ধি　ঘ. আকাবার শপথ

৫২. উক্ত উদ্যোগের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর ব্যক্তিত্বে প্রকাশ পেয়েছে—
i. রাজনৈতিক প্রজ্ঞা
ii. সংস্কারবাদী মনোভাব
iii. নেতৃত্বগুণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৩ ও ৫৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সালমা একটি যুদ্ধের ঘটনা শুনছিল। যেখানে বন্দিদের প্রতি ভালো আচরণ করা হয়েছিল এবং মুক্তিপণের মাধ্যমে তাদের অনেককে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

৫৩. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটির সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের মিল রয়েছে?
ক. বদরের যুদ্ধ খ. খন্দকের যুদ্ধ
গ. উহুদের যুদ্ধ ঘ. মুতার যুদ্ধ

৫৪. বন্দিদের প্রতি উক্ত যুদ্ধের শিক্ষা হচ্ছে—
i. মানবিক আচরণ করা
ii. সহজশর্তে মুক্তি দেওয়া
iii. সারা জীবন বন্দি রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো ৫৫ ও ৫৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার আদেশ তাঁর সেনাপতি মীরজাফর আলী খান পালন না করায় নবাব ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট পরাজিত হন। *[সকল বোর্ড ২০২২]*

৫৫. উদ্দীপকের উক্ত ঘটনা মহানবি (স)-এর কোন যুদ্ধকে মনে করিয়ে দেয়?
ক. বদরের যুদ্ধ খ. উহুদের যুদ্ধ
গ. খন্দকের যুদ্ধ ঘ. নাখলার যুদ্ধ

৫৬. উক্ত যুদ্ধের ফলে—
i. মুসলমানদের ইমানি শক্তির পরীক্ষা হয়
ii. মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়
iii. আত্মঅহংকারের উচিত শিক্ষা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৭ ও ৫৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইকবাল সাহেবের মৃত্যুর পর পরিচিতজনরা বলাবলি করতে থাকল যে, 'তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন, কারো হক নষ্ট করেননি, নিজ ধর্ম পালনে কখনো গাফেলতি করেননি।' *[সকল বোর্ড ২০২৩]*

৫৭. ইকবাল সাহেবের জীবনে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কোন নির্দেশনার প্রতিফলন দেখা যায়?
ক. হিলফুল ফুযুলের
খ. বায়াত-আর-রিদওয়ানের
গ. মদিনা সনদের
ঘ. বিদায় হজের ভাষণের

৫৮. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উক্ত নির্দেশনা মানব জাতির জন্য ছিল—
ক. পরিপূর্ণ জীবনবিধান
খ. আংশিক জীবনবিধান
গ. একপেশে বিধি-বিধান
ঘ. শুধু মুমিনদের প্রতি আহ্বান

উত্তরমালা

১	গ	২	খ	৩	গ	৪	ঘ	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	ক	৯	খ	১০	গ	১১	ক	১২	খ
১৩	ক	১৪	খ	১৫	ক	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ক	২০	গ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	খ
২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	গ	২৯	গ	৩০	ঘ	৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	ঘ	৩৬	গ
৩৭	খ	৩৮	ক	৩৯	গ	৪০	খ	৪১	ঘ	৪২	খ	৪৩	ঘ	৪৪	খ	৪৫	ক	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ঘ
৪৯	ক	৫০	ঘ	৫১	খ	৫২	ঘ	৫৩	ক	৫৪	ক	৫৫	খ	৫৬	খ	৫৭	ঘ	৫৮	ক				

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. হারবুল ফিজার সম্পর্কে ধারণা দাও।
২. হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা কীভাবে করা হয়েছিল? লেখো।
৩. কীভাবে আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে?
৪. মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের কারণ ব্যাখ্যা করো।
৫. মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের ভৌগোলিক কারণ কী ছিল?
৬. বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ব্যাখ্যা করো।
৭. উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যে শিক্ষা লাভ করেছিল তা সংক্ষেপে লেখো।
৮. হুদায়বিয়ার সন্ধির পাঁচটি ধারা লেখো।
৯. মক্কার বিজয়কে রক্তপাতহীন বিজয় বলার কারণ ব্যাখ্যা করো।
১০. বিদায় হজের ভাষণের পাঁচটি উল্লেখযোগ্য দিক লেখো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফাহিম তার সমমনা বন্ধুদের নিয়ে 'অন্বেষা সংঘ' গড়ে তোলে। এই সংঘ যুবকদের নানামুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের সাবলম্বী করে তোলে। ইভটিজিং, মাদক সেবন প্রতিরোধ করা, রাস্তা মেরামত, জলাশয় পরিষ্কার, পথশিশুদের খাবার ও পাঠদান, বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন তাদের লক্ষ্য। অনিষ্টকারীদের দমন ও নিপীড়িতদের সাহায্য দানই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩]

ক. 'মোহাজেরিন' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'The Public Register of The Arabs' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংগঠনটিতে মহানবি (স)-এর গঠিত কোন সংগঠনের প্রভাব পড়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের সংগঠনের কার্যক্রম সমাজে কী প্রভাব ফেলবে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২. আধুনিক সিঙ্গাপুর রাষ্ট্র এক সময় মালয়েশিয়ার সাথে সংযুক্ত ছিল। পরবর্তীতে তারা মালয়েশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ সময় সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন অনৈতিক কাজ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এ সকল চুরি-ডাকাতিসহ অন্যান্য কাজের অপবাদ থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য কতিপয় যুবক ঐক্যবদ্ধ একটি সমিতি গঠন করেন এবং উক্ত সমিতি কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে। এতে অল্প সময়ের মধ্যে সিঙ্গাপুর একটি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ও সভ্য জাতিতে পরিণত হয়।

ক. আরব দেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত?

খ. হযরত মুহাম্মদ (স)-কে 'আল-আমিন' বলা হতো কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমিতি গঠনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত সমিতির কর্মসূচিগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৩. বিক্রমপুর গ্রামের স্কুল মাঠে অবস্থিত প্রাচীন মসজিদটি ভেঙে নতুন মসজিদ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রত্যেকের এ কাজে সম্পৃক্ততা নিয়ে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। সবাই এ কাজের উন্নয়নে ব্যক্তিগত অর্থ খরচ করতে আগ্রহী। এ পরিস্থিতিতে গ্রামের চেয়ারম্যান সাহেব এ কাজে সবার সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। গ্রামে বিরাজমান এ ধরনের আরও অনেক সমস্যা সমাধানে চেয়ারম্যান সাহেব স্থানীয় সমমনা ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. আল-আমিন কাকে বলা হতো?

খ. হস্তীর বছর বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের মসজিদ স্থাপন সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার সাথে মহানবি (স)-এর সম্পাদিত কোন কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'চেয়ারম্যান সাহেবের শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগটি মহানবি (স)-এর গঠিত হিলফুল ফুজুলের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন'— এ ব্যাপারে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

৪. হযরত ইব্রাহীম (আ) ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইরাকের বাবেল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐশীবাণী প্রাপ্ত হয়ে তিনি সেখানে একটি নতুন ধর্মমত এবং আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার শুরু করেন। কিন্তু বাবেলের শাসক মূর্তি পূজারি নমরুদ এর বিরোধিতা শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত শাস্তিস্বরূপ হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যার চেষ্টা করে। আল্লাহর রহমতে তিনি অগ্নি থেকে রক্ষা পান এবং নিজ মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে সিরিয়া গমন করেন। তিনি আল্লাহর ইবাদত করার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করেন এবং আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করতে থাকেন।

[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]

ক. মিরাজ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?

খ. মক্কা বিজয়কে 'রক্তপাতহীন বিজয়' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের হযরত ইব্রাহীম (আ) এর সাথে তোমার পঠিত কোন মহান ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তোমার পঠিত উক্ত মহান ব্যক্তির জন্মভূমি ত্যাগকে কি 'মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা' হিসেবে অভিহিত করা যায়? বিশ্লেষণ করো।

৫. আয়াতুল্লাহ আলী খোমিনী ইরানে ইসলামি আদর্শ প্রচার শুরু করলে শাসকগোষ্ঠী তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়। তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন শুরু হয়। অতপর খোমিনী মাতৃভূমি ইরান ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী দেশে গমন করেন। সেখান থেকেই তিনি তাঁর প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। অবশেষে ১৯৭৯ সালে তিনি দেশে ফিরে স্বৈরাচারী শাসক রেজা শাহর পতন ঘটিয়ে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন এবং তিনি কোনো প্রতিশোধ না নিয়ে সকলকে ক্ষমা করে দেন।

[সি. বো., ব. বো. ২০২১]

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স) মৃত্যুবরণ করেন?

খ. বায়তুর রিদওয়ান কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. মহানবি (স)-এর জীবনের কোন ঘটনার সাথে খোমিনীর মাতৃভূমি ত্যাগের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত ঘটনার গুরুত্ব নিরূপণ করো।

৬. শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। মায়ানমারের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শাসকগোষ্ঠী নির্যাতন, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে তাদের বিতাড়িত করে। ফলে উপায়ান্তর না পেয়ে তারা দলে দলে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশ তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে জীবন-জীবিকা ও নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করে। এমনকি জন্মভূমিতে যাতে ফিরে যেতে পারে সেজন্যও সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]*

ক. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত প্রাপ্ত হন?

খ. হযরত আলি (রা) হযরত মুহাম্মদ (স) এরও পরে হিজরত করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা দাও।

গ. বাংলাদেশে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের সাথে মদিনায় হিজরতকারী মুসলমানদের সামঞ্জস্য খুঁজে বের করো।

ঘ. বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর তুলনায় মদিনায় হিজরতকারী মুসলমানরা অনেক বেশি সমাদৃত ও অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন— ব্যাখ্যা করো।

৭. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর মধ্য এশিয়া থেকে বারবার বিতাড়িত হয়ে ভারতবর্ষে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২ হাজার সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল বাহিনী নিয়ে ভারতের শেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদির ১,২০,০০০ সৈন্যের মোকাবিলা করেন। ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বিপুল সৈন্য থাকা সত্ত্বেও সুলতান লোদি বাবরের হাতে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর বাবর আরো কয়েকটি যুদ্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুদের পরাজিত করে ভারতে মুঘল শাসনের সূচনা করেন। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]*

ক. মদিনার পূর্ব নাম কী ছিল?

খ. 'আকাবার শপথ' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন যুদ্ধের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য মহানবি (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়'— ব্যাখ্যা করো।

৮. United Nations General Assembly ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করে। এ সনদে উল্লিখিত ধারাসমূহে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের সহজাত মর্যাদা, সমান অধিকার ও সমতা রক্ষার কথা বলা হয়। তা ছাড়া এ সনদে বিশেষভাবে বিশ্বের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এবং সকল বর্ণ ও ধর্মের মানুষের সমমর্যাদার কথা বলা হয়েছে— যা বিশ্ব-মানবের সকলকে একই সূত্রে গ্রথিত করে। এভাবে এ সনদ বিশ্ব মানবতার মুক্তির ম্যাগনাকার্টা হিসেবে বিশ্ব বিবেককে সচেতন করে তোলে। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]*

ক. 'হিজরত' শব্দের অর্থ কী?

খ. মুহাজির ও আনসার কারা? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সনদের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সনদের সাদৃশ্য আছে? বিশ্লেষণ করো।

ঘ. উক্ত সনদে পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে— বিশ্লেষণ করো।

৯. সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ দক্ষিণ সুদান। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়ে। এ নিয়ে সরকারপ্রধান রাষ্ট্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংবিধান রচনা করেন। এর ফলে সকলের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯]*

ক. 'আনসার' শব্দের অর্থ কী?

খ. মুহাজির কারা? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধান প্রণয়নের সাথে মহানবি (স) কর্তৃক গৃহীত কোন পদক্ষেপের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের দক্ষিণ সুদানের মতো মহানবি (স)-এর গৃহীত ব্যবস্থা মানবাধিকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত— মূল্যায়ন করো।

১০. ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন 'ম্যাগনাকার্টা' দলিলে স্বাক্ষর করেন। রাজার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য সামন্তরা রাজাকে বন্দি করে এবং উক্ত দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। ফলে জনগণের অধিকার বহুলাংশে রক্ষা পায়। রাজা স্থানীয় প্রধানদের সম্মতি ব্যতীত সম্পদ ও সম্পত্তি হস্তগত করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। জনগণের সাধারণ অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়। *[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*

ক. তাবুক অভিযান কত সালে প্রেরিত হয়েছিল?

খ. হুনায়নের যুদ্ধের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

গ. 'ম্যাগনাকার্টা'-এর সাথে মহানবি (স) প্রদত্ত কোন সংবিধানের কতটুকু সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মহানবি (স)-এর সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্যের বৈপরীত্য পর্যালোচনা করো।

১১. দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার রক্ষা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জনমত ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে একটি সংবিধান রচিত হয়। এতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সংরক্ষিত হয়। এই সংবিধান অনুসারেই রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩]*

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয় হয়েছিল?

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সংবিধান প্রণয়নের সাথে মহানবি (স)-এর প্রণীত কোন ব্যবস্থাপনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রাষ্ট্রের সংহতি, শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের জন্য সংবিধানের ভূমিকা উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১২. মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা-নরসিংদী মহাসড়কে বড় বড় গাছ কেটে ফেলে রাখা হয়েছিল। ভারী কিছু লোহার পিলারও ফেলে রাখা হয়েছিল। যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে সাময়িক কষ্ট হলেও অপশক্তির সরাসরি হামলা থেকে একটি বৃহত্তর জনপদকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একদল লোক স্বাধীনতার বিরোধিতা করে মূল জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এরা রাজাকার নামে পরিচিত। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩]*

ক. বদরের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল?

খ. উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের মূল কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে মহানবি (স)-এর সময়ে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধের কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মহানবি (স)-এর সাথে ভিন্নমত পোষণকারী দলের কর্মকাণ্ড উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১৩. অটোমান সুলতান বায়েজিদ অঙ্গোরার প্রান্তরে তৈমুর লঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মোকাবিলা করেন। যুদ্ধে বায়েজিদের অনেক সৈন্য বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং কিছু সৈন্য গনিমতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেওয়ায় তৈমুরীয় বাহিনীর কাছে বায়েজিদ পরাজিত হন। তৈমুরীয় বাহিনী বিজয় অর্জন করলেও তারা স্থায়ী কোনো শাসন এশিয়া মাইনরে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এবং তা অটোমান তুর্কিদেরকেই চরম শিক্ষাদান করেছে, যা তাদের ভবিষ্যতে সচেতন করে তুলেছিল। *[সি. বো., ব. বো. ২০২১]*

ক. বদরের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?

খ. বিদায় হজ কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন যুদ্ধের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করো।

১৪. কমলাপুর গ্রামের মানুষ পার্শ্ববর্তী ইসলামপুর গ্রামের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদেরকে আক্রমণ করলে যুদ্ধে কমলাপুর গ্রাম পরাজিত হয় এবং তাদের নেতা নিহত হন। এ পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলা এবং নেতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কমলাপুরবাসী আবারো ইসলামপুর গ্রাম আক্রমণ করে। ইসলামপুর গ্রামের চেয়ারম্যান ইবনে আব্দুল্লাহ ৫০ জন তীরন্দাজকে নির্দেশ দেন, 'আমরা সবাই যুদ্ধে মারা গেলেও তোমরা এখান থেকে সরবে না।' কিন্তু নেতার আদেশ অমান্য করার জন্য ইসলামপুরবাসী এ যুদ্ধে পরাজিত হয়। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

ক. উহুদের যুদ্ধে কুরাইশ নেতা কে ছিলেন?

খ. 'ফাতহুম মুবিন' কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের ঘটনা তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'নেতার আদেশ অমান্য করা উক্ত যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম কারণ'— উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন রহমান সাহেব। কমান্ডার জলিল সাহেবের দলে তিনি যুদ্ধে অংশ নেন। এ বাহিনী সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে যখন তাদের অঞ্চলকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন উক্ত বাহিনীর অধিনায়ক এক অভিনব পন্থা বের করেন। তার পরামর্শে রাতের অন্ধকারে উক্ত অঞ্চলের প্রবেশের প্রধান প্রধান সড়কগুলো কেটে বড় বড় খাদের সৃষ্টি করে দিয়ে সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়। ফলে শত্রু বাহিনীর হাত থেকে উক্ত অঞ্চল রক্ষা পায়।

ক. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন?

খ. উহুদের যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়েছিল?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কমান্ডার মহানবি (স)-এর যে যুদ্ধ কৌশলটি অনুসরণ করেন- তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত কৌশলের দ্বারাই মহানবি (স) মদিনাকে রক্ষা করতে সক্ষম হন-মূল্যায়ন করো।

১৬. দীর্ঘ আলোচনার পর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে ১৯১৯ সালে মিত্র শক্তি ও জার্মানির মধ্যে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাসে যা ভার্সাই সন্ধি নামে পরিচিত। এ সন্ধিতে এমন কতগুলো শর্ত আরোপ করা হয়, যা জার্মানির জন্য ছিল অসম ও অবমাননাকর। তারপরও জার্মানি শান্তির জন্য সকল শর্ত স্বীকার করে চূড়ান্ত পরাজয় মেনে নেয়। *[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*

ক. মুহাম্মদ শব্দের অর্থ কী?
খ. 'নাখলার খণ্ড যুদ্ধ' কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের ভার্সাই সন্ধির সাথে তোমার পঠিত কোন সন্ধির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ঘটনার গুরুত্ব নিরূপণ করো।

১৭. ইসরাইলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিন ও জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী আবদেল সালাম আল মাজলির মধ্যে ১৯৯৪ সালে ২৬ শে অক্টোবর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে উভয় দেশ পরবর্তীতে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না—এ শর্তে একমত হয়। আর এ চুক্তি দ্বারা উভয় দেশের জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং এক দেশ হতে অন্য দেশের উপর কোনো আঘাত আসবে না বা এক দেশ দ্বারা অন্য দেশের কোনো ক্ষতি হবে না বলে একমত হয়। তাছাড়া এ চুক্তি দ্বারা এক দেশ অন্য দেশকে আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবে বলে ঐকমত্য পোষণ করে। তবে আলজাজিরা নিউজ চ্যানেলের এক নিউজ বিশ্লেষণে বলা হয় যে, এ উক্তি ছিল জর্ডানের পরোক্ষ বিজয়।
[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]
ক. কত সালে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
খ. খন্দকের যুদ্ধে মহানবি (স) পরিখা খনন করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চুক্তির সাথে মহানবি (স)-এর গৃহীত কোন সন্ধি বা চুক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত সন্ধিকে পবিত্র কুরআনে মহাবিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে কেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো।

১৮. ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। শান্তিচুক্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হাজার হাজার সামরিক-বেসামরিক মানুষ নিহত হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে উভয়পক্ষ যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়। শান্তিবাহিনী অস্ত্রসমর্পণ করে। ফলে উভয়পক্ষের শক্তির সাশ্রয় হয়। সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার মানুষের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ পায়। এ চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারকে একটু বেশি ছাড় দিতে হলেও প্রকারান্তে সরকার লাভবানই হয়েছিল। আন্তর্জাতিক মহল একে সরকারের অনেক বড় অর্জন বলে চুক্তির প্রশংসা করেছে।
ক. 'হিজরত' শব্দের অর্থ কী?
খ. বায়াতুর রিদওয়ান বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের চুক্তির সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির মিল? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের চুক্তির মতো হুদায়বিয়ার সন্ধিও মুসলমানদের জন্য অনেক বড় অর্জন ছিল? মতামত দাও।

১৯. জাহান খান বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজা। বরেন্দ্র ভূমি তার পৈত্রিক জন্মভূমি। কৈবর্ত নেতা দিব্যক ও তার সমর্থকরা জাহান খানকে বরেন্দ্র ভূমি থেকে বহিষ্কার করেন। জাহান খান তাঁর লোকজনদের নিয়ে পাটালিপুত্রে আশ্রয় নেয়। দশ বছর পর তিনি যোদ্ধার বেশে বরেন্দ্র উদ্ধার করেন। রামাবতী নগরে স্থাপিত প্রধান মন্দির থেকে সমস্ত দেব-দেবীর মূর্তি উচ্ছেদ করে মন্দিরকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি সকল মানুষের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এভাবে জাহান খান বরেন্দ্র ভূমি জয় করেন।
ক. হযরত মুহাম্মদ (স) কত সালে মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন?
খ. 'হুজ্জাতুল বিদা' কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জাহান খানের বরেন্দ্র বিজয়ের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের মহানবি (স)-এর জীবনের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. জাহান খানের রামাবতীর প্রধান মন্দিরের দেব-দেবীর মূর্তি উচ্ছেদের সাথে মহানবির মক্কা বিজয়ের কোনো ঘটনার সাথে যোগসূত্র আছে কি? মতামত দাও।

২০. ৫ আগস্ট ২০২৪-বাংলাদেশের মানুষ অন্যরকম এক বিজয় দেখল। স্বৈরাচার বিরোধী অসংখ্য মানুষের ঢল ক্ষমতাসীনদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করল অথচ দু'বছর আগেও মানুষ ভাবতে পারেনি যে, এমনটা সম্ভব। রাষ্ট্র ৩-৪ দিন সরকারবিহীন থাকল। তারপরও বিজয়ীদের পক্ষ থেকে কোনো রক্তপাত হলো না, ধ্বংসলীলা হলো না, বরং জীবন-সম্পদ রক্ষায় সকলে স্বতঃস্ফূর্ত এগিয়ে এলো। সর্বত্র বিজয় ও মানবতার পতাকা পতপত করে উড়তে থাকল। *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]*
ক. 'ফাতহুম মুবিন' অর্থ কী?
খ. খালিদ বিন ওয়ালিদ বিখ্যাত কেন? সংক্ষেপে লেখো।
গ. সংখ্যা-বিচারে উদ্দীপকের বিজয়ী দলের সাথে মক্কা বিজয়ী মুসলমানদের সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মক্কা বিজয়-পরবর্তী বিজয়ী মুসলমানদের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করো।

২১. আশরাফ সাহেবের বাসায় সবসময় দুই ধরনের রান্না হয়। ভালোমানের রান্না হয় তার পরিবারের জন্য, আর নিম্নমানের খাবার তৈরি হয় ড্রাইভার, বাবুর্চি আর পরিচারিকাদের জন্য। তাদের চিকিৎসা, বাসস্থান ও ভালো পোশাকেরও সুব্যবস্থা নাই। আশরাফ সাহেব তার স্ত্রীর সাথেও সবসময় দুর্ব্যবহার করেন। পারিবারিক কোনো সিদ্ধান্তে তিনি স্ত্রীর মতামত গ্রহণ করেন না। এসব নিয়ে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে। *[ঢাকা বোর্ড ২০১৭]*

ক. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন?

খ. মুহাম্মদ (স)-কে আল-আমিন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আশরাফ সাহেব মহানবি (স)-এর কোন উপদেশ মেনে চললে অধীনস্তদের সাথে বিরূপ আচরণ করতে পারতেন না? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে নারীর প্রতি যে অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে তা মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের এ সংক্রান্ত নির্দেশাবলির পরিপন্থি— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

২২. যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের অবসানকল্পে গেটিসবার্গে এক বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ সাধনের ঘোষণা দেন। তিনি এ ভাষণে বর্ণ বৈষম্য উচ্ছেদের ঘোষণা করেন এবং তিনি বলেন, 'আজ থেকে কেউ কৃষ্ণাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গের দোহাই দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পারবে না।' দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]*

ক. কত সালে মহানবি (স) মক্কা বিজয় করেন?

খ. ভণ্ড নবি কারা? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিংকনের ভাষণ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ভাষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত ভাষণ ছিল মানবজাতির মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ দলিল— উক্তিটির বিশ্লেষণ করো।

২৩. **ঘটনা ১:** রাকিব সাহেব তাঁর সন্তানদের উপদেশ দিলেন যে, তোমরা শ্রমিকের মজুরি ইনসাফের ভিত্তিতে যথাসময়ে প্রদান করবে। বাড়ির কাজের লোকদের প্রতি সদাচরণ করবে।

ঘটনা ২: জামিল সাহেব তার স্ত্রীর সাথে প্রায়শই খারাপ আচরণ করেন। তিনি মেয়েকে একজন অযোগ্য পাত্রের সাথে বিয়ে দিয়ে পণ হিসেবে অনেক টাকা-পয়সা নেন এবং নিজের বিলাসিতায় উক্ত অর্থ ব্যয় করেন।

[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

ক. বদর যুদ্ধে কতজন মুসলমান শহিদ হয়েছিলেন?

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. রাকিব সাহেবের কথার সাথে মহানবি (স)-এর চরিত্রের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জামিল সাহেবের চরিত্রে মহানবি (স)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোন কোন দিকটি অনুপস্থিত? বিশ্লেষণ করো।

২৪. আব্রাহাম লিংকন পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তিদের একজন। আমেরিকা যখন দাস-ব্যবস্থা নিয়ে মারাত্মক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত তখন তিনি দাস মুক্তির শপথ নিয়ে শত প্রতিকূলতার মধ্যে আমেরিকাকে সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি গণতন্ত্র বলতে সাধারণের ইচ্ছা, মানবাধিকার ও জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন বলে মনে করতেন। মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ সামনে রেখে তিনি আমেরিকাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*

ক. খন্দকের যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল?

খ. ওমরাতুল কাযা বা মুলতবি হজ কী?

গ. মহানবি (স)-এর কোন সংস্কারের সাথে আব্রাহাম লিংকনের সংস্কারের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মহানবি (স)-এর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিংকনের রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো মূল্যায়ন করো।

২৫. রহিমগঞ্জ এলাকায় অনেক ধনী মহাজনের বাস। এলাকার দরিদ্র ও অসহায় পরিবারগুলো এসব ধনী মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে ঋণের দায়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। পরিবারগুলোকে এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন এলাকার শিক্ষিত সমাজসেবক রাসেল। রাসেল এলাকাবাসীকে এসব ধনী মহাজনের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলেন। তিনি তাদেরকে ঋণগ্রহণে নিরুৎসাহিত করে বলেন ইসলামে সুদের ব্যবসা হারাম। তিনি সবাইকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানান।

ক. হিজরি সাল কে প্রবর্তন করেন?

খ. মহানবি (স) মেরাজে গিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে ধনী মহাজনদের কাজের সাথে প্রাচীন আরবের কোন সম্প্রদায়ের কার্যকলাপের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রাসেলের উদ্যোগটি কি মহানবি (স)-এর অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতিফলন? তোমার মতামত দাও।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২৬. বেশ কিছু দিন ধরে 'জাহান ডিপার্টমেন্টাল স্টোর' এর সেলস্ম্যান রূপা কাজে আসছে না। কারণ জানার জন্য মিসেস নাজমা জাহান রূপার বাসায় আসেন। কাজে না আসার কারণ জানতে চাইলে রূপা কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলে যে, তার স্বামীর সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণে সে অসুস্থ। সে মিসেস নাজমা জাহানকে আরও বলে যে, তার মদ্যপ স্বামী তার দুই কন্যাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সমাজে নারীদের কোনো অধিকার নেই। মিসেস নাজমা জাহান এসব শুনে খুব ব্যথিত হন। তিনি সমাজে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও যথাযথ মর্যাদার সাথে বসবাসের জন্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এতে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ১ ও ২*

[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]

ক. প্রাক-ইসলামি আরবের শ্রেষ্ঠ কবি কে ছিলেন?

খ. উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত করুণ ঘটনাটি প্রাক-ইসলামি আরবের সামাজিক অবস্থার কোন দিকটিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'মিসেস নাজমা জাহানের চিন্তা-চেতনায় নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স)-এর নির্দেশনা ও আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে'— বক্তব্যটি সমর্থন কর কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২৭. এক সময় পৃথিবীতে দাস ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। শক্তিশালী দেশ তাদের কৃষিকাজের জন্য দরিদ্র দেশ থেকে অশিক্ষিত লোকদেরকে এনে কৃষিকাজে নিয়োজিত করত। এদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা ধনী দেশ কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। তবে তাদের কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না। বরং তাদের ওপর নির্যাতন করা হতো। তারা তাদের প্রভুর কথা মেনে চলতে বাধ্য হতো। মত প্রকাশের অধিকার না থাকায় এক সময় তারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ গৃহ যুদ্ধের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য 'X' দেশের সরকার সংবিধান প্রণয়ন করে দাসদের স্বাধীনতা প্রদান করে। এ পদক্ষেপের ফলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ১ ও ২ [রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৭]*

ক. হুদায়বিয়ার সন্ধি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

খ. আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে ইসলামপূর্ব আরবের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থা বিলুপ্তির ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ছিল ইসলামের ইতিহাসের অনুরূপ— বিশ্লেষণ করো।

২৮. 'রবিনসন ক্রুসো' ড্যানিয়েল ডিফোর একটি উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় লেখনী। এর মূল চরিত্র ভ্রমণপিপাসু রবিনসন জাহাজ ডুবির ঘটনায় একটি দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ দ্বীপের সভ্যতাজ্ঞানহীন মানুষগুলোর জীবনাচরণ ও সমাজব্যবস্থা দেখে রবিনসন থমকে গিয়েছিলেন। তারা গাছ, পাথর, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির প্রার্থনা করলেও এ অনুভূতি তাদের জীবনে ইতিবাচক কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তারা সর্বদা একদল অন্য দলের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত। নারীদেরকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করত। নীতি, নৈতিকতা, মানবতাবোধ বা সভ্যতাজ্ঞান বলতে তাদের কিছুই ছিল না। ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ১ ও ২*

ক. মহানবি (স) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

খ. খন্দকের যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয় কেন?

গ. রবিনসনের আশ্রয় নেওয়া দ্বীপের মানুষের জীবনাচরণ ও সমাজব্যবস্থা আরবের কোন সময়ের সমাজব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত সময়ের সমাজের অনাচার নিয়ন্ত্রণে মহানবি (স) এর গঠিত হিলফুল ফুজুল সংঘটি কোনো অবদান রেখেছিল কি? মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

২৯. বাঞ্ছানগর গ্রামের হতদরিদ্র রফিকের ৭ বছরের মেয়ে রিনা জীবিকার তাগিদে পাশের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়। ছেলের সাথে খেলাধুলা করার অপরাধে গৃহকর্মীর নৃশংসতায় আঁতকে ওঠেন মানবাধিকার কর্মী নাজনীন। গৃহপরিচারিকাদের ওপর এরূপ নির্যাতন বন্ধে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন থাকার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

◀ *সমন্বিত অধ্যায় ১ ও ২ [ফেনী সরকারি কলেজ]*

ক. কোন প্রাণীকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়?

খ. খারাজ কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চিত্রে আইয়ামে জাহেলিয়ার কোন বিষয়টি দৃশ্যমান? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'উদ্দীপকের মানবাধিকার কর্মীর আহ্বান যেন মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের প্রতিধ্বনি'— তুমি কি একমত? মতামত দাও।

৩০. ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রি. রবিবার রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট বেড়িবাঁধ এলাকার একটি ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার করা হয় ১১ বছরের আদুরীকে। আদুরী জানায়, সে একটি বাসায় কাজ করত। কাজে ভুল হলেই তাকে মারধর করা হতো। খাবার দেওয়া হতো না। কিন্তু ডাস্টবিনে কিভাবে এল তা সে জানে না। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, তার শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন। পাজরের হাড়গুলো জেগে উঠেছে। যন্ত্রণাকাতর আদুরীর চোখে মুখে শুধুই আতঙ্কের ছাপ। তবে আশার কথা হলো সরকার আদুরীর পাশে দাঁড়িয়েছে। (সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রি.) ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ১ ও ২ [কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর]*

ক. কিউনিফর্ম কী?

খ. জাজিরাতুল আরব বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের আদুরী কোন যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বিদায় হজের ভাষণের আলোকে আদুরীদের সুরক্ষার পথ বিশ্লেষণ করো।

৩

খুলাফায়ে রাশেদিন

Khulafa-e-Rashideen

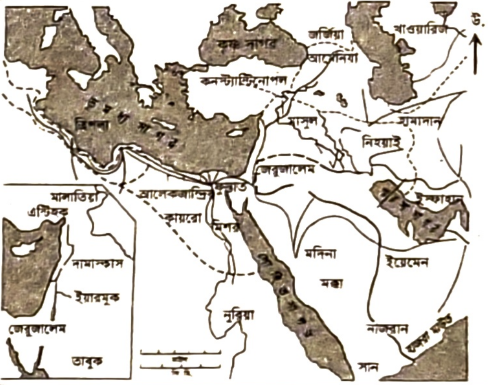

খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় মুসলিম সাম্রাজ্য

প্রধান প্রধান শব্দ

- খিলাফত
- খলিফা
- ইসলামের ত্রাণকর্তা
- রিদ্দা যুদ্ধ
- ইয়ামামার যুদ্ধ
- আল-ফারুক
- মজলিশ-উস-শুরা
- দিওয়ান-উল-খারাজ
- সাইফুল্লাহ
- জামিউল কুরআন
- আসাদুল্লাহ
- খারেজি
- শিয়া

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রি.) যে চারজন খলিফা ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন তাঁরাই খুলাফায়ে রাশেদিন (সত্য ও ন্যায়পথগামী খলিফাগণ) নামে পরিচিত। তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলি (রা)। তাঁরা মহান আল্লাহর নির্দেশিত ও মহানবি (স)-এর দেখানো পথ অনুসারে নিজেদের জীবন ও রাষ্ট্রীয় শাসনকাজ পরিচালনা করেছেন। তাঁরা সবাই মহানবি (স)-এর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রাসুল (স)-এর কাণ্ডারি হিসেবে তাঁরা ইসলামের বিস্তৃতি ও মুসলিম সাম্রাজ্যের অগ্রগতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ৬৩২-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ত্রিশ বছর মুসলিম জাহানের দায়িত্ব পালন করে এ চারজন খলিফা সততা, সরলতা, ত্যাগ, উদারতা ও জনকল্যাণের উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের আদর্শ প্রত্যেক শাসকদের জন্য অনুকরণীয়। এ চারজন খলিফার তিনজনই আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আলি (রা)-এর শাহাদাতবরণের মধ্য দিয়ে খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনের অবসান ঘটে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন প্রক্রিয়া
- ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা)-এর কৃতিত্ব ও চরিত্র
- হযরত ওমর (রা)-এর রাজ্যবিস্তার ও প্রশাসন ব্যবস্থা এবং তাঁর মহানুভবতা ও ন্যায়বিচার আদর্শ
- হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকার্যাবলি ও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ
- হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যার কারণ ও ফলাফল এবং তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব
- হযরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের কারণ, ফলাফল এবং তাদের ব্যর্থতা ও সফলতার কারণ
- ইসলামে শিয়া ও খারেজি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাদের মূল দর্শন খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন নীতি
পাঠ ২	হযরত আবু বকর (রা)-এর পরিচয়, প্রাথমিক জীবন, খিলাফত লাভ ও প্রাথমিক সমস্যাসমূহ
পাঠ ৩	হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় সংঘটিত রিদ্দা যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
পাঠ ৪	হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে পারসিক ও রোমানদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত
পাঠ ৫	ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা)-এর অবদান এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
পাঠ ৬ ও ৭	হযরত ওমর (রা)-এর পরিচয়, প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) এবং পারস্যে খিলাফত সম্প্রসারণ
পাঠ ৮	বাইজান্টাইন অঞ্চলে হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত সম্প্রসারণ
পাঠ ৯	ইসলামের সেবায় সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদের অবদান
পাঠ ১০	হযরত ওমর (রা)-এর কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা
পাঠ ১১	হযরত ওমর (রা)-এর প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা
পাঠ ১২	হযরত ওমর (রা)-এর দিউয়ান ও রাজস্ব প্রশাসন
পাঠ ১৩	হযরত ওমর (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ১৪ ও ১৫	হযরত ওসমান (রা)-এর পরিচয়, খিলাফত লাভ ও এর সম্প্রসারণ (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)
পাঠ ১৬	হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ ও এর যথার্থতা নিরূপণ
পাঠ ১৭	খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যার কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
পাঠ ১৮	খলিফা ওসমান (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ১৯	হযরত আলি (রা)-এর প্রাথমিক জীবন, খিলাফত লাভ ও প্রাথমিক সমস্যাসমূহ
পাঠ ২০	হযরত আলি (রা)-এর সময় সংঘটিত জামাল/উষ্ট্রের যুদ্ধ বা ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ (৬৫৬ খ্রি.)
পাঠ ২১	হযরত আলি (রা) ও আমির মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্ব এবং সিফফিনের যুদ্ধ
পাঠ ২২	শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাদের মতবাদ
পাঠ ২৩	খারেজি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাদের মতবাদ
পাঠ ২৪	হযরত আলি (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ২৫	খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসন নীতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

পাঠ ১

খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন নীতি
The Election Policy of Khulafa-e-Rashideen

খুলাফায়ে রাশেদিন: হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইন্তেকালের পর চারজন সাহাবি পর্যায়ক্রমে তাঁর প্রতিনিধিরূপে ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বিক মঙ্গলের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথ অনুসারে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন এবং রাজ্যের শাসনকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন। এজন্য তাঁদেরকে খুলাফায়ে রাশেদিন বা সত্য ও ন্যায়পথগামী বলা হয়। তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলি (রা)। এই চার জন খলিফার প্রত্যেকে মহানবি (স)-এর নিত্যসহচর এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। তাঁরা ৬৩২ থেকে ৬৬১ খ্রি. পর্যন্ত মোট ত্রিশ বছর মুসলিম জাহানের খিলাফত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। ঐতিহাসিক পি. কে হিট্টি বলেন, "এই যুগের চার খলিফা আরব ঐতিহাসিকদের কাছে 'আল-রাশেদুন' হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন।"[১]

খিলাফত: আরবি 'খিলাফত' শব্দটি 'খালফুন' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত (Representative)। এটি মুসলমানদের একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Religio-Political Institution)। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ধর্ম ও ইসলামি রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও সার্বভৌমত্বে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশ করে। এটি সারা বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক। খিলাফত প্রসঙ্গে দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন বলেন, "খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা মুহাম্মদ (স)-এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।"[২] বিখ্যাত আরব ঔপন্যাসিক জুরজি জয়দান খিলাফত সম্পর্কে বলেন, "এটি ছিল একটি ধর্মীয় সার্বভৌমত্ব যা কেবল বিশেষ ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতি ও বিরল ব্যক্তির জন্য উপযোগী।"[৩]

খলিফার উপাধি ও যোগ্যতা: যিনি ইসলামি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনিই খলিফা। প্রথম দিকে খলিফাদের তিনটি উপাধিতে ভূষিত করা হতো। যথা: খলিফা, ইমাম ও আমিরুল মুমেনিন। রাষ্ট্র চিন্তাবিদ আল মাওয়ার্দীর মতে, "খলিফা পদে যোগ্য হতে হলে ৭টি গুণের অধিকারী হতে হবে। তাঁকে কুরাইশ বংশোদ্ভূত, মুসলমান, পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক, চরিত্রবান, শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিমুক্ত এবং শাসনকার্য পরিচালনার উপযোগী কুরআন ও হাদিসভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।"

নির্বাচন পদ্ধতি: খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন গণতান্ত্রিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে কেউ খলিফার পদ লাভ করেননি। এ সময় খলিফা নির্বাচনের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকলেও দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। যেমন—

১. **সরাসরি নির্বাচন:** এ পদ্ধতিতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মুসলমানদের সমর্থনের ভিত্তিতে হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত আলি (রা) খলিফা নির্বাচিত হন।

২. **নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে নির্বাচন:** এ পদ্ধতিতে একজন খলিফা দায়িত্বে থাকাকালীন পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য 'আহল আল-ইমামাহ/আহল আল-ইখতিয়ার/আহল আল-হাল আল-আখদ' বা 'নির্বাচকমণ্ডলী' নামে একটি পরিষদ গঠন করতেন। এ পরিষদ যোগ্যতার ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচন করত। হযরত ওসমান (রা) এই পদ্ধতিতে খলিফা পদ লাভ করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্বাচন: মহানবি (স) কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। ঐতিহাসিক পি. কে হিট্টি বলেন, "খিলাফত প্রশ্নই ছিল ইসলামের প্রথম সমস্যা। এটি অদ্যাবধি একটি জীবন্ত সমস্যা।"[৪] খলিফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মুসলিমগণ মদিনার কাছাকাছি 'ছাকিফা বানি সায়িদা' নামে একটি স্থানে মিলিত হন। সেখানে খলিফা নির্বাচনের প্রশ্নে আনসার, মুহাজির, কুরাইশ ও আলি (রা)-এর সমর্থক এ চারটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। হযরত আবু বকর (রা) উপস্থিত সাহাবিদের সামনে ইসলামের ঘোর দুর্দিনে মুহাজির ও আনসারদের অবদানের কথা তুলে ধরেন। এরপর আনসাররা উভয়পক্ষ থেকে একজন করে খলিফা নির্বাচনের প্রস্তাব দেন। হযরত ওমর (রা) বলেন, 'এক খাপে দুই তরবারি শোভা পায় না।' এ নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়।

---

[১] The four Caliphs of this era are known to Arab historians al-Rashidin.–Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.183/140

[২] Khilafat is the such kind of institution that represents the mission of prophet Muhammad (sm).– Ref: Ibn Khaldun, *Al-Maquaddima*

[৩] It was a religious sovereignty, suitable for a few rare individuals and conditions such as have rarely occured. –Ref: Jurji Zaydan, *Umayyads and Abbasids*, p.41

[৪] The Caliphate is therefore the first problem Islam had to face. It is still a living issue. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.139

হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর সমর্থনে জোরালো বক্তব্য দেন। তিনি আবু বকর (রা)-এর ইমামতিতে মহানবি (স) কয়েকবার নামাজ আদায় করা, বয়োজ্যেষ্ঠতা, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, তাঁর প্রতি মহানবি (স)-এর আস্থা প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেন। এরপর হযরত ওমর (রা) আরবের প্রথা অনুযায়ী তাঁর হাত চুম্বন করে তাঁকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন এবং ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। উপস্থিত সব সাহাবি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ঘোষণা মেনে নিয়ে খলিফা হিসেবে আবু বকর (রা)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন।

হযরত ওমর (রা)-এর নির্বাচন: খিলাফত নিয়ে দ্বন্দ্ব এড়াতে হযরত আবু বকর (রা) মৃত্যুর আগে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি আবদুর রহমান, ওসমান (রা), সাঈদ বিন যায়েদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে হযরত ওমর (রা)-কে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করেন। ইন্তেকালের আগে হযরত আবু বকর (রা) নিজের গৃহের সামনে সমবেত মুসলিমদের সামনে তাঁর উত্তরসূরি খলিফা হিসেবে ওমর (রা)-এর নাম ঘোষণা করলে সকলে আনুগত্যের শপথ করেন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "মৃত্যুর আগে আবু বকর (রা) ওমরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যান, যা সর্বসাধারণের মনঃপুত ছিল।"[৫] এভাবে হযরত ওমর (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে খুলাফায়ে রাশেদিনের দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

হযরত ওসমান (রা)-এর নির্বাচন: হযরত ওমর (রা) খিলাফতে থাকাকালীন খলিফা নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচক পরিষদ গঠন করেন। হযরত ওসমান, হযরত আলি, তালহা, যুবাইর, সাদ বিন জায়েদ ও আবদুর রহমান এ পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইসলামের খেদমতে এ সাহাবিদের প্রত্যেকেরই অসামান্য অবদান ছিল। এরূপ জটিল পরিস্থিতি আবদুর রহমান সমাধানের চেষ্টা করেন। তিনি যুবাইর, ওসমান ও আলির নাম প্রস্তাব করেন। তালহা মদিনায় উপস্থিত ছিলেন না। ভোটাভুটির মাধ্যমে সাদ ওসমানকে, আলি ওসমানকে এবং ওসমান আলীকে সমর্থন করেন। ফলে এক ভোট বেশি পেয়ে হযরত ওসমান (রা) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। আনসার, মুহাজিরসহ সবাই তাঁর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

হযরত আলি (রা)-এর নির্বাচন: ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যার পর এক জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে বিদ্রোহী কুফাবাসী যুবাইর, বসরাবাসী তালহা ও মিসরবাসী ইবনে সাবার নেতৃত্বে আলি (রা)-কে সমর্থন করে। ওসমান (রা) হত্যার পঞ্চম দিনে মিসরীয় বিদ্রোহীরা হযরত আলি (রা)-এর নাম প্রস্তাব করলে কুফা ও বসরার বিদ্রোহীরা আলি (রা)-কে সমর্থন দেয়। মদিনার বিশিষ্ট নাগরিকদের অনুরোধে হযরত আলি (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সম্মত হন। জনগণও আনুগত্যের শপথ নিলে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন হযরত আলি (রা) ইসলামের চতুর্থ খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'খুলাফায়ে রাশেদিন' অর্থ কী?
২. খুলাফায়ে রাশেদিন মোট কত জন?
৩. খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়কাল কত? */ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো., ২০২৫; সকল বোর্ড ২০২১/*
৪. 'খিলাফত' শব্দের অর্থ কী? */সকল বোর্ড ২০২৫; সি. বো., ব. বো. ২০২১/*
৫. খলিফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মুসলিমগণ কোন স্থানে মিলিত হয়েছিলেন?
৬. খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন নীতি কীরূপ ছিল?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খুলাফায়ে রাশেদিনের নাম ও সময়কাল নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

---

[৫] Before his death, Abu Bakr nominated Omar as his successor in the Caliphate and is appointment was accepted by people.
–Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.279

পাঠ ২

হযরত আবু বকর (রা)-এর পরিচয়, প্রাথমিক জীবন, খিলাফত লাভ ও প্রাথমিক সমস্যাসমূহ (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.) [Introduction, Early Life, Obtaining Throne and Initial Problems of Hazrat Abu Bakr (R) (632-634 AD)]

জন্ম, বংশ পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন

হযরত আবু বকর (রা) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনু তাইম গোত্রে ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ওসমান এবং মাতার নাম উম্মুল খায়ের সালমা। তাঁর আরেক নাম আবদুল্লাহ। মেরাজের কথা সর্বপ্রথম বিশ্বাস করেন বলে তাঁকে মহানবি (স) 'সিদ্দিক' বা বিশ্বাসী উপাধি দেন। দানশীলতার জন্য তিনি 'আতিক' উপাধি পান। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আবু বকর (রা) মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মহানবি হযরত মুহম্মদ (স)-এর স্ত্রী বিবি আয়েশা (রা) খলিফা আবু বকর (রা)-এরই কন্যা। হযরত আবু বকর (রা) ছোটবেলা থেকেই সদাচরণ, পরোপকার, মানবতাবোধ ও বিচক্ষণতার জন্য এলাকায় সম্মানিত ছিলেন। তিনি শিক্ষিত ছিলেন এবং কবিতা লিখতে পারতেন। কুলজি বা বংশপঞ্জি সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। আবু বকর (রা) কাপড়ের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি আতিথেয়তা, সহনশীলতা, দানশীলতা, সরলতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী ছিলেন। এম. আহসানুল্লাহ বলেন, "তিনি (আবু বকর) প্রকৃতপক্ষেই ধার্মিক ছিলেন এবং সব গুণের অধিকারী ছিলেন।"[৬]

ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের খেদমত: হযরত আবু বকর (রা) ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। তিনি আজীবন ইসলামের খেদমত করেছেন। আবু বকর (রা)-এর প্রচেষ্টায় তার মা, বাবা, হযরত ওসমান, তালহা, যুবাইর, আবদুর রহমান, সাদ প্রমুখ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হযরত বেলাল (রা)সহ কয়েকজন দাস-দাসীকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহাসংকটের সময় মহানবি (স)-এর সাথে তিনি মদিনায় হিজরত করেছিলেন। মদিনায় মসজিদ ও মহানবি (স)-এর বাসগৃহ নির্মাণ, বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধ এবং তাবুক অভিযানের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন আবু বকর (রা)। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "আবু বকর বিনীত অথচ দৃঢ় ছিলেন এবং নতুন রাষ্ট্রের শাসনকাজ ও জনগণের কল্যাণে তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন।"[৭] হযরত ওমর বলেন, "আবু বকরকে ইসলামের খেদমতের ব্যাপারে কেউ অতিক্রম করতে পারেনি।" ইতিহাসের বর্ণনা মতে, ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে আবু বকর (রা) এর ৪০,০০০ দিরহাম মূল্যের সম্পদ ছিল। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হিজরতের সময় তা কমে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) দিরহাম হয়। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি ইসলামের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। তিনি বিপদে-আপদে সব সময় মহানবি (স)-এর পাশে থাকতেন। এজন্য রাসুল (স) বলেন, "যদি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বন্ধু বলতাম, তবে আবু বকর (রা)-কেই বন্ধু বলতাম।" মহানবি (স) আবু বকর (রা)-এর প্রতি এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তিনি তাঁর ইমামতিতে বহুবার নামাজ আদায় করেন।

খিলাফত লাভ

হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত লাভের সময় এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ মহানবি (স)-এর পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবে বা কীভাবে হবে তা নির্ধারিত ছিল না। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "খিলাফত প্রশ্নই ছিল ইসলামের প্রথম সমস্যা।"[৮] তাই মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর (৬৩২ খ্রি.) খলিফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মুসলিমগণ 'ছাকিফা বানি সায়িদা' নামক স্থানে মিলিত হন। খলিফা নির্বাচনের প্রশ্নে চারটি রাজনৈতিক পক্ষ তৈরি হয়। যথা: আনসার, মুহাজির, কুরাইশ ও আলি (রা)-এর সমর্থক। তারা প্রত্যেকে নিজেদের লোকদের সমর্থনে কথা বলেন। আবু বকর (রা) ইসলামের জন্য আনসার ও মুহাজিরদের ত্যাগের কথা বললেন। আনসাররা উভয় দল থেকে একজন করে খলিফার কথা

---

[৬] He (Abu Bakr) was extremely religious and accomplished with many virtues.–Ref: M. Ahsanullah, *History of the Islamic World,* p.26

[৭] Abu Bakr was gentle but firm, he devoted all his energies and to the administrator of the new born state and to the good of people, –Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens,* p.26-27

[৮] The Caliphate is therefore the first problem Islam had to face. Ref: P.K Hitti, *History of the Arabs*, p.139

বলেন। সবার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করে ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর সমর্থনে জোরালো বক্তব্য দেন। তিনি আরবের প্রথা অনুযায়ী আবু বকর (রা)-এর হাত চুম্বন করে তাঁকে খলিফা ঘোষণা করেন। সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবু বকর (রা)-কে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের জয় ঘোষিত হয়।

খলিফা হিসেবে আবু বকর (রা)-এর উদ্বোধনী ভাষণ: খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা) জনতার উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক উদ্বোধনী ভাষণ দেন। এতে তিনি বলেন, "হে মুসলমানগণ! আপনারা এখন আমাকে শাসনের গুরুভারপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখছেন। কিন্তু আপনাদের অপেক্ষা আমি অধিক গুণ ও যোগ্যতাসম্পন্ন নই। আপনাদের পরামর্শ ও সাহায্য আমার সর্বদা প্রয়োজন হবে। আমি যদি ভালো কাজ করি, তবে আপনারা আমাকে সমর্থন দেবেন। আর যদি ভুল করি উপদেশ দেবেন। শাসকের কাছে সত্য কথা বলাই প্রকৃত আনুগত্য এবং সত্য গোপন করা বিদ্রোহেরই নামান্তর। কাজেই আপনাদের কাছ থেকে সত্যের অনুসরণ ও মিথ্যা বর্জন কামনা করছি। দুর্বল ও সবল সবাই আমার কাছে সমান এবং সবার প্রতি ন্যায়সংগত আচরণ করা আমার কর্তব্য। আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ পালন করব, ততক্ষণ আপনারা আমাকে মান্য করবেন। আর যদি এর ব্যত্যয় ঘটে তবে আপনাদের আনুগত্য লাভের বিন্দুমাত্র অধিকার আমার থাকবে না।" নিঃসন্দেহে খলিফার এ ভাষণ অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। এ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ আলির মন্তব্য, "অসাধারণ এ বক্তৃতাটির প্রতিটি শব্দই জ্ঞানসমৃদ্ধ এবং এটি মুসলিম জাহানের কাছে আলোর সংকেতস্বরূপ।"

প্রাথমিক বাধা-বিপত্তিসমূহ

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর আবু বকর (রা) নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁর মেয়ে হযরত আয়েশা (রা) এ বিষয়ে বলেছেন, "আরব সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিধর্মী এবং ইহুদিরা সুযোগের সন্ধানে ছিল। তাহারা সংখ্যায় নগণ্য ছিল কিন্তু তাহাদের দুশমন দল ছিল সংখ্যাতীত।"

খিলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আবু বকর (রা)-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নির্দেশ এবং অভিপ্রেত অনুযায়ী প্রতিটি কাজ বাস্তবায়ন করা। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনকালে তাঁর দত্তকপুত্র যায়েদ বিন হারিস মুতার যুদ্ধে নিহত হন। তিনি হারিসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সিরিয়ায় একটি যুদ্ধাভিযান পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের ফলে এ অভিযান স্থগিত করা হয়। হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে পরের দিনই মহানবি (স)-এর ইচ্ছানুযায়ী যায়েদ বিন হারিসের যুবকপুত্র উসামাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে সিরিয়ায় অভিযান চালান। উসামা সিরিয়ার বিদ্রোহী গোত্রগুলোকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন এবং কর প্রদানে রাজি করান। এভাবে হযরত আবু বকর (রা) দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সাথে সমস্যাসমূহ মোকাবিলা করে ইসলামের অবস্থান সুদৃঢ় করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন কে? *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*
২. ইসলামের প্রথম খলিফা কে ছিলেন? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫; সি. বো., ব. বো. ২০২১]*
৩. হযরত আবু বকর (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে খলিফা নিযুক্ত হন?
৪. মেরাজের ঘটনা সর্বপ্রথম কে বিশ্বাস করেন?
৫. হযরত আবু বকর (রা)-এর উপাধি কী ছিল?
৬. হযরত আয়েশা (রা)-এর পিতা কে ছিলেন?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত লাভের পর প্রাথমিক বাধা-বিপত্তির একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৩

হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় সংঘটিত রিদ্দা যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল [Causes, Events & Results of the Battle of Riddah at the time of Hazrat Abu Bakr (R)]

রিদ্দা যুদ্ধ

'রিদ্দা' আরবি শব্দ। এর অর্থ স্বধর্মত্যাগ বা দলত্যাগ। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালে হেজাজ ছাড়া প্রায় পুরো আরবে ইসলাম ধর্ম ও নবপ্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ শুরু হয়। অনেকে ইসলাম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে যায়। নবুয়তকে লাভজনক মনে করে কিছু ব্যক্তি নিজেদের নবি বলে দাবি করে। অনেক বেদুইন গোত্র জাকাত দানে অস্বীকার করে। এভাবে প্রায় গোটা আরবে খণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পর আরবের এসব বিদ্রোহী গোত্র এবং ভণ্ড নবিদের পরিচালিত আন্দোলনকে ইসলামের ইতিহাসে স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন (Apostasy Movement) বলা হয়। আর তাদের বিরুদ্ধে খলিফা হযরত আবু বকর (রা) যে অভিযান পরিচালনা করেন তা 'রিদ্দার যুদ্ধ' নামে পরিচিত। ৬৩২-৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেন, "সমগ্র আরবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে স্বধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়েছিল।"[৯] হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, "যখন মহানবি (স) ইন্তেকাল করেন তখন আরববাসী স্বধর্মত্যাগ করে, ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং (সর্বত্র) বিদ্রোহ শুরু হয়। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর তিরোধানের ফলে শীতের রাতের বৃষ্টিপাতে উন্মুক্ত মেষপালের মতো মুসলমানরা দুরবস্থায় মধ্যে পড়ে যতক্ষণ না আল্লাহ পাক তাদেরকে আবু বকর (রা) নেতৃত্বে একত্র করেন।"

রিদ্দা যুদ্ধের কারণ

ইসলাম প্রচারের সীমাবদ্ধতা: মহানবি (স) তাঁর জীবদ্দশায় সময়ের স্বল্পতা, প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দীর্ঘসময় যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকার কারণে আরবের সব অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে পারেননি। পি. কে. হিট্টি বলেন, "আসল কারণ হলো যোগাযোগের অভাব ও কম সময়ের জন্য সংগঠিতভাবে প্রচারকার্য চালানো সম্ভব হয়নি।"[১০] এছাড়া ওই সময় অনেক গোত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ফলে রাসুল (স)-এর ইন্তেকালের সাথে সাথেই তারা ইসলাম ত্যাগ করে এবং অমুসলিমদের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়।

খাঁটি বিশ্বাসের অভাব: আরব উপদ্বীপে অনেকে রাসুল (স)-এর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে লোক দেখানো ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আলোড়ন জাগানো ফরাসি বিপ্লবের মতো সপ্তম শতকে ইসলাম আরবের বুকে সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে এলেও আরববাসী এ নতুন জীবনধারাকে সহজে মেনে নিতে অভ্যস্ত ছিল না। তাই তারা রাসুল (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে যায়।

ইসলামি অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ: ইসলামের কঠোর বিধিনিষেধ ও নৈতিক অনুশাসন, সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের নির্দেশনা মরুবাসী দুরন্ত আরবদের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। মূলত উদ্ধত ও স্বাধীনচেতা আরবদের অনেকে মহানবি (স)-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও পরে তারা আর ইসলামের কঠোর অনুশাসন মানতে পারছিল না।

---

[৯] The Arabs were in all sides mising in rebellion, apostasy and disaffection raised their heads. –Ref: William Muir, *The Caliphate, Its rise, decline and Fall,* p.11

[১০] The fact is that with the lack of communication, the utter absence of organized methods of missionary activity and the short time involved. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs,* p.141

মদিনার প্রাধান্য অস্বীকার: মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে আরবে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু আরবরা কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিল না। তাই অনেকেই এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন মেনে নিতে পারেনি। এছাড়া ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে মদিনা শহরের প্রভাব বৃদ্ধি অন্য অঞ্চলের আরবদের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তোলে।

নবুয়তের প্রতি লোভ: খুব অল্প সময়ে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহানবি (স)-এর অভাবনীয় সাফল্য দেখে আরবের অনেকে নবুয়তকে একটি লাভজনক ব্যবসা মনে করে। এজন্য কেউ কেউ নিজেদের নবি বলে দাবি করে। নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার বা ভণ্ড নবিদের মধ্যে ছিলেন ইয়েমেনের আনসি গোত্রের আসওয়াদ আনসি, মধ্য আরবের ইয়ামামার বনু হানিফ গোত্রের মুসায়লামা তুল-কাজ্জাব, উত্তর আরবের বনু আসাদ গোত্রের তোলায়হা এবং মধ্য আরবের বনু ইয়ারবু গোত্রের নারী সাজাহ। এদের মধ্যে সাজাহ ও মুসায়লামা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ভণ্ড নবিরা মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে আরবদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। যেসব মুসলিমের অন্তরে তখনও ইসলাম সুদৃঢ় হয়নি তারা ভণ্ড নবিদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয় এবং মদিনায় নবপ্রতিষ্ঠিত খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দেয়।

জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি: মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পরে সম্পদশালীরা বিশেষ করে বেদুইন সম্প্রদায় ইসলামের বিধি মোতাবেক জাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। স্বাধীনচেতা আরবদের বিভিন্ন গোত্র জাকাত দেওয়াকে নিজেদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। তারা এর বিরুদ্ধে ভণ্ড নবি তোলায়হার নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

অমুসলিম সম্প্রদায়ের ইন্ধন: অন্যায় আচরণের জন্য মহানবি (স) মদিনা থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সুযোগ বুঝে ঐ ইহুদিরা ইসলামি রীতি-নীতির বিরুদ্ধে বেদুইনদের উসকানি দেয়। ইহুদিসহ অমুসলিম সম্প্রদায়ের ইন্ধন উদ্ভূত সংকটকে আরও তীব্র করে।

জেনে রাখো

ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে জাকাত তৃতীয়। জাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধতা। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের ওপর (ধনী মুসলমান) জাকাত আদায় করা ফরজ। জাকাত অস্বীকারকারী কাফির বলে গণ্য হয়। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় মহান আল্লাহ সালাত কায়েমের পাশাপাশি জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ধনী-গরিবের মধ্যে আর্থিক সমন্বয় সাধনের জন্য মহান আল্লাহ জাকাতের বিধান দিয়েছেন। জাকাত গরিবের অধিকার। তাই এটি আদায় করা ধনী মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

রিদ্দা যুদ্ধের ঘটনা

আগেই বলা হয়েছে, ইয়েমেনের আসওয়াদ আনসি, বনু আসাদ গোত্রের তোলায়হা, ইয়ামামার বনু হানিফ গোত্রের মুসায়লামা এবং মধ্য আরবের বনু ইয়ারবু গোত্রের সাজাহ নামের একজন মহিলা নিজেকে নবি বলে দাবি করে। তারা ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য তৎপরতায় লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় ইসলামকে রক্ষা ও আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য খলিফা আবু বকর (রা) বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে ১১টি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক সেনাদলকে একজন অভিজ্ঞ সেনাপতির অধীনে ন্যস্ত করে আরবের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। খলিফা নিজে সামগ্রিক অভিযানের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।

ভণ্ড নবি আসওয়াদ আনসিকে দমন: আসওয়াদ আনসি ছিল নবুয়তের প্রথম মিথ্যা দাবিদার। সে ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স)-এর জীবদ্দশায় নবুয়ত দাবি করে এবং সমগ্র ইয়েমেন থেকে মুসলিম প্রতিনিধিদের বিতাড়িত করে নাজরান ও ইয়েমেনের রাজধানী সানা দখল করে। এরপর সে পার্শ্ববর্তী গোত্রপ্রধানদের সহযোগিতা নিয়ে দক্ষিণ আরব দখল করে

নিজ অবস্থানকে সুসংহত করে। আসওয়াদের বিদ্রোহ দমনের জন্য মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) মুয়াজ ইবন জাবালকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। কিন্তু মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের এক বা দুই দিন আগে তার আত্মীয় ফিরোজ দাইলামীর হাতে আনসি নিহত হয়।

ভণ্ড নবি তোলায়হা ও জাকাতবিরোধীদের দমন এবং মদিনার মর্যাদা রক্ষা: হযরত আবু বকর (রা) জাকাত অস্বীকৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ভণ্ড নবি তোলায়হা বেদুইন সম্প্রদায়কে জাকাত না দিতে উসকানি দেয়। তা ছাড়া সে উত্তর আরবের বেদুইন সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করে। তারা বলে যে, তারা ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধান মানতে রাজি কিন্তু জাকাত দিতে রাজি নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে হযরত ওমর (রা)ও যুক্তি দেন যে, সাময়িকভাবে তাদের জাকাত থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আবু বকর (রা) অবিচলচিত্তে বলেন, জাকাত কুরআন নির্দেশিত বাধ্যতামূলক কর। তিনি শর্ত দেন যে, জাকাত না দিলে আত্মসমর্পণ বা যুদ্ধ করতে হবে। এক পর্যায়ে জাকাত বিরোধী বনি আবস ও বনি জুবিয়ান গোত্র মদিনার উপকণ্ঠে হানা দেয়। মদিনা নগরীর রক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে খলিফা মদিনার বিশ্বস্ত গোত্রীয় লোকদের মদিনার বিভিন্ন প্রবেশ পথে প্রহরী নিযুক্ত করেন। হযরত আলি (রা), তালহা এবং যুবায়ের প্রহরী দলের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। এভাবে খলিফা তাদের রাবাদা ও জুলকাশার যুদ্ধে পরাজিত করে মদিনা থেকে তাড়িয়ে দেন। এতে মদিনার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। ভণ্ড নবি তোলায়হা সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে বুঝাখারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্ত্রীসহ সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। কিন্তু কিছু দিন পর মদিনায় এসে সে পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

ভণ্ড নবি সাজাহকে দমন: ভণ্ড নবি সাজাহকে দমনের জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলমানরা তামিম গোত্র আক্রমণ করে। কারণ এ গোত্রের উপগোত্র বনু ইয়ারবু সম্প্রদায়ের নেতা মালিক বিন নোবায়রা সাজাহকে সমর্থন করেছিল। খালিদ মালিক বিন নোবায়রাকে পরাজিত করলে তামিম গোত্রের সব শাখা তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু পরে সাজাহ নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রভাবশালী ভণ্ড নবি মুসায়লামার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ইয়ামামার যুদ্ধ ও ভণ্ড নবি মুসায়লামাকে দমন: ভণ্ড নবিদের মধ্যে মুসায়লামা ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। সাজাহকে বিবাহ করার পর ৪০ হাজার লোকের বাহিনী নিয়ে বনু হানিফ গোত্রের সহায়তায় সে ইসলামকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। খলিফা আবু বকর (রা) তাদের এই যৌথ বাহিনীকে দমনের জন্য প্রথমে ইকরামা ও সুরাহবিলকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা ব্যর্থ হলে খালিদ বিন ওয়ালিদকে তাদের সাহায্যে পাঠানো হয়। ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামামার প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মুসায়লামার যৌথ বাহিনী পরাজিত হয় এবং মুসায়লামাসহ তার অনুসারী হানিফ গোত্রের হাজার হাজার লোক নিহত হয়। মুসলিম বাহিনীতে যুদ্ধরত কুরআনের বহু হাফিজ এ যুদ্ধে শহিদ হন। বিপুলসংখ্যক যোদ্ধার মৃত্যুর কারণে ঐতিহাসিক তাবারি এ যুদ্ধকে 'মৃত্যু-উদ্যানের যুদ্ধ' বা 'The Battle of the Garden of Death' নামে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, "ইয়ামামার যুদ্ধ কঠিনতম ও সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহের অন্যতম যুদ্ধ ছিল।"[১১] ইসলামের ইতিহাসে ইয়ামামার যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে শক্তিশালী বনু হানিফ গোত্রের ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের বিরোধিতার অবসান ঘটে। মুসায়লামা নিহত হলে তারা পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে খলিফার আনুগত্য প্রকাশ করেন। তবে এ যুদ্ধের সবচেয়ে ইতিবাচক ফল হলো পবিত্র কুরআন শরিফ সংকলন। যুদ্ধে তিনশ হাফিজ মতান্তরে ৭০ জন শাহাদাতবরণ করলে হযরত ওমর (রা) পবিত্র কুরআন শরিফ গ্রন্থাকারে সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর পরামর্শে খলিফা আবু বকর (রা) যায়েদ বিন সাবিত (রা)-এর সহায়তায় কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। এটিই ছিল পবিত্র কুরআন সংকলনের প্রথম পদক্ষেপ।

---

[১১] The battle of Yamama was among the toughest and the bloodiest wars. –Ref: *The Arab Civilization*

এভাবে খলিফা আবু বকর (রা) রিদ্দা যুদ্ধে সব ভণ্ড নবিকে পরাজিত করেন। মুসায়লামা ও আসওয়াদ আনসি নিহত হয় এবং তোলায়হা ও সাজাহ ইসলাম গ্রহণ করে। মুসলিম সেনাপতিরা সমগ্র আরবের বিদ্রোহ দমন করে মুসলিম আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য ঐতিহাসিক পি.কে. হিট্টি বলেন, "বিশ্বজয়ের আগে আরববাসীকে সর্বপ্রথম আরব দেশকেই জয় করতে হয়েছিল।"[১২] স্বধর্মত্যাগীদের দমনের পর খলিফা আবু বকর (রা) বাহরাইনের বিদ্রোহী বকর গোত্রকে দমন করে বাহরাইনে আধিপত্য বিস্তার করেন। সেনাপতি হোজায়ফা ও ইকরামা আম্মান ও মাহরাবের বিদ্রোহ দমন করে।

রিদ্দা যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল

মোড় পরিবর্তনকরী যুদ্ধ: রিদ্দা যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য হুমকি থেকে রক্ষা পায়। ঐতিহাসিক মুর বলেন, "রিদ্দা যুদ্ধের পরাজয় যেমন মারাত্মক হতো তেমনি এর জয় ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।" এ যুদ্ধে জয়লাভ করে ইসলাম শুধু আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাই পায়নি; বরং আরবের বুকে ইসলামের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়।

মদিনা রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ: রিদ্দা যুদ্ধে বিজয়ের ফলে মুসলিম রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা পায়। ঐতিহাসিক মুর বলেন, "এটা আরবদের ওপর রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের যুদ্ধ।" এই যুদ্ধে বিজয়ের পর সমাজে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। আরব উপদ্বীপ ইসলামের সাম্যবাদী ও আল্লাহর একত্ববাদের নীতিকে মেনে নেয়।

মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি: 'রিদ্দা' যুদ্ধ জয়ের ফলে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলেই পরবর্তী সময়ে হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে মুসলিমরা আরবের বাইরে আক্রমণ করার সাহস পায়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টি. ডব্লিউ. আরনল্ড বলেন, রিদ্দার যুদ্ধে জয়ের পর ইসলাম যে শক্তিলাভ করেছিল এরই প্রেক্ষিতে মুসলমানরা বিখ্যাত রোমান-বাইজান্টাইন ও পারসিকদের পরাজিত করার সাহস পায় এবং এসব অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।"[১৩]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'রিদ্দা' শব্দের অর্থ কী?
২. ভণ্ড নবিদের পরিচালিত আন্দোলন ইসলামের ইতিহাসে কী নামে পরিচিত? */সকল বোর্ড ২০২১/*
৩. ভণ্ড নবিদের উত্থানের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? */সকল বোর্ড ২০২৫/*
৪. মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর কারা জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়?
৫. ইয়ামামার যুদ্ধে সেনাপতি কে ছিলেন? */সকল বোর্ড ২০১৮/*
৬. সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ভণ্ড নবি ছিল কে?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়কার ভণ্ড নবিদের একটি তালিকা তৈরি করো।
২. রিদ্দা যুদ্ধের পাঁচটি কারণ ও ফলাফল ছক আকারে লেখো।

---

[১২] Arabia had to conquer itself before it could conquer the world. -Ref: *P.K. Hitti, History of the Arabs*, P.242

[১৩] Ref: T. W. Arnold, *The Preaching of Islam*, P.22

পাঠ ৪

হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে পারসিক ও রোমানদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত
Conflict of Hazrat Abu Bakr (R) with the Persian and the Roman

পারসিকদের সাথে দ্বন্দ্বের কারণ

প্রথমত, হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে পারস্যের সম্রাট ছিলেন হরমুজ। মহানবির (স) ইন্তেকালের পর তিনি বিভিন্ন গোত্রকে স্বধর্মে ফিরে যেতে উসকানি দেন।

দ্বিতীয়ত, মহানবি (স) পারস্যের সম্রাট দ্বিতীয় খসরু পারভেজকে ইসলাম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র পাঠান। কিন্তু আন্তর্জাতিক রীতি লঙ্ঘন করে পারসিক রাজদরবারে মুসলিম দূতকে অপমান করা হয়।

তৃতীয়ত, বাহরাইনে বিদ্রোহ দমনকালে পারস্যবাসীরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিল।

চতুর্থত, সীমান্ত রক্ষা ও উসকানিমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেও খলিফা সীমান্তে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন।

পারস্যে মুসলিম অভিযান

উবাল্লার হাফির যুদ্ধ (৬৩৩ খ্রি.): রিদ্দা যুদ্ধের সময় পারসিকরা বাহরাইনের বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিল। তাই এ যুদ্ধের পর খলিফা আবু বকর (রা) সেনাপতি মুসান্নার নেতৃত্বে ৮,০০০ (আট হাজার) মুসলিম সৈন্য পারস্য আক্রমণে পাঠান। পরে তাকে সাহায্য করার জন্য সেনাপতি খালিদের নেতৃত্বে আরও ১০,০০০ (দশ হাজার) সৈন্য পাঠানো হয়। উবাল্লার হাফির নামক স্থানে পারস্য বাহিনী এবং মুসলিমরা মুখোমুখি হয়। তুমুল যুদ্ধ শেষে পারস্য বাহিনী পরাজিত হয়। ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি হরমুজ নিহত হন। এ যুদ্ধে পারসিক সেনাপতি হরমুজ যুদ্ধ কৌশল হিসেবে সেনাবাহিনীর পেছনের সারিকে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা মাটির সাথে বেঁধে রাখেন। তার উদ্দেশ্য ছিল সৈন্যরা যাতে পিছু না হটে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে। তাই এ যুদ্ধ শৃঙ্খলের যুদ্ধ বা Battle of Chain নামেও পরিচিত।

ওয়ালজার যুদ্ধ (৬৩৩ খ্রি.): শৃঙ্খলের যুদ্ধে সেনাপতি হরমুজ নিহত হলে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে পারসিক বাহিনী সেনাপতি বাহমানের নেতৃত্বে ওয়ালাজা নামক স্থানে পুনরায় মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধেও পারসিক বাহিনী মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়।

হিরা ও আনবার দখল (৬৩৩ খ্রি.): খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্যরা তৎকালীন ইরাকের রাজধানী হিরা অবরোধ করে। হিরাবাসী ইসলাম গ্রহণ না করে বার্ষিক ৬০,০০০ (ষাট হাজার) দিরহাম জিজিয়া দিতে রাজি হয়। হিরা বিজয় করার পর খালিদ ফোরাত নদীর তীরবর্তী আনবার শহর জয় করেন।

রোমানদের সাথে দ্বন্দ্বের কারণ

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকে বলা হয় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। ইসলামের ইতিহাসের প্রথমদিকে হযরত মুহম্মদ (স) বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে দূত প্রেরণ করেন। রোমান সম্রাট মুসলিম দূতকে সাদরে গ্রহণ করেন। তবে পরবর্তী সময়ে নানা কারণে রোমানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি হয়।

প্রথমত, মহানবি (স) বসরার শাসনকর্তার কাছে দূত হিসেবে হারিস বিন উমায়েরকে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বসরা যাওয়ার পথে মুতা নামক স্থানে উপস্থিত হলে সেখানকার রোমান সামন্তরাজ শুরাহবিল ইবনে আমর (গাসসান গোত্রের নেতা) তাকে হত্যা করে। এটা ছিল আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের শামিল। এ হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হারিসের ছেলে জায়েদের নেতৃত্বে ৩,০০০ (তিন হাজার) সৈন্য পাঠানো হয়। ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত মুতার যুদ্ধে যায়েদসহ বেশ কয়েকজন মুসলিম সেনাপতি শহিদ হন। আবু বকর (রা)-এর সময় উসামার নেতৃত্বে সিরিয়া সীমান্তে আরেকটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে রোমানদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, রিদ্দা যুদ্ধের সময় রোমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ফলে সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, রোমানদের নিয়ন্ত্রিত সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ছিল উর্বর এলাকা। তাই মরুবাসী আরবদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই ওই অঞ্চলগুলোতে অভিযান প্রেরণ করেন।

চতুর্থত, আরব বণিকেরা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এসব অঞ্চলে যাতায়াত করত। এ অঞ্চলের অনেক অধিবাসী আরব বংশোদ্ভূত ছিল এবং আরবদের সাথে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। ফলে সহজে বাণিজ্য প্রসারের জন্য তারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য জয় করেন।

পঞ্চমত, ভৌগোলিক দিক থেকে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন আরবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া রাজনৈতিক দিক থেকে ইসলামের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে মুসলমানরা এসব অঞ্চল জয় করেন।

অভিযানের ঘটনাবলি

রিদ্দার যুদ্ধের পর খলিফা হযরত আবু বকর (রা) মুসলিম সেনাবাহিনীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেনাপতি আমর ইবনুল আস, ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান, শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ এবং আবু উবায়দার নেতৃত্বে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল দখলের জন্য পাঠান। কয়েকটি ছোট ছোট সংঘর্ষে মুসলমানরা জয় লাভ করে। এরপর রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বাধাদানের জন্য অগ্রসর হয়। অপরদিকে খলিফা সেনাপতি খালিদকে পারস্য সীমান্ত থেকে সিরিয়ায় যাওয়ার নির্দেশ দেন।

আজনাদাইনের যুদ্ধ (৬৩৪ খ্রি.): খালিদ বিন ওয়ালিদ হীরা থেকে ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা দেন। ঐতিহাসিক বালাজুরির মতে, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভাই থিওডোরাসের নেতৃত্বে রোমান সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০ (এক লক্ষ)। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২,৪০,০০০ (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার)। অন্যদিকে, আমর, ইয়াজিদ, শোরাহবিল, আবু উবায়দা ও খালিদের বাহিনী মিলে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার)। মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন খালিদ বিন ওয়ালিদ। আজনাদাইন প্রান্তরে ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে মুসলিম ও রোমান বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়। সম্রাট হিরাক্লিয়াস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। যুদ্ধে অনেক রোমান সেনা নিহত হয়।

খলিফার মৃত্যু: বিভিন্ন যুদ্ধ পরিচালনার পর হঠাৎ খলিফা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরবর্তী খলিফা মনোনয়নের জন্য তিনি আব্দুর-রহমান বিন-আউফ, ওসমান, আলি প্রমুখ নেতার সাথে আলাপ-আলোচনা করে ওমর (রা)-এর নাম ঘোষণা করেন। অনেকে ওমরের চরিত্রের কঠোরতার কথা বলে কিছুটা আপত্তি তুললেও পরে সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা পদের জন্য তার মনোনয়ন সমর্থন করা হয়। প্রায় ১৫ দিন রোগভোগের পর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ আগস্ট (১৩ হিজরির ২২ জামাদিউস সানি) হযরত আবু বকর (রা) ইন্তেকাল করেন। তিনি মাত্র ২ বছর ৩ মাস খেলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে পারস্যের সম্রাট কে ছিলেন?
২. কোন যুদ্ধকে শৃঙ্খলের যুদ্ধ (Battle of Chain) বলা হয়?
৩. উবাল্লার হাফির যুদ্ধ কাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়?
৪. কোন অঞ্চলকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলা হয়?
৫. ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে আজনাদাইনের যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল কার বিরুদ্ধে?
৬. হযরত আবু বকর (রা) তার পরবর্তী খলিফা মনোনীত করেছিলেন কাকে?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে পারসিক এবং রোমানদের দ্বন্দ্বের কারণগুলো চিহ্নিত করে ছক আকারে লেখো।
২. হযরত আবু বকর (রা) এবং পারসিক ও রোমানদের সাথে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৫

ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা)-এর অবদান এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য [Contribution of Hazrat Abu Bakr (R) as the Saviour of Islam and His Characteristics]

ইসলামের সেবায় হযরত আবু বকর (রা)-এর অবদান

ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের খেদমত: হযরত আবু বকর (রা) পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ হিসেবে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মেরাজের কথা সর্বপ্রথম বিশ্বাস করেন বলে মহানবি (স) তাঁকে 'সিদ্দিক' উপাধিতে ভূষিত করেন। মদিনার মসজিদ ও মহানবি (স)-এর বাসগৃহ নির্মাণ, তাবুক অভিযান এবং বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। হযরত ওমর (রা) বলেন "আবু বকরকে ইসলামের খেদমতের ব্যাপারে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না।" তিনি মহানবি (স)-এর কঠিনতম মুহূর্তে তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। হিজরতের মহাসংকটেও মহানবি (স) আবু বকর (রা)-কে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন কাজে আবু বকরের এরূপ সাহায্যের জন্য মহানবি (স) ঘোষণা করেন, "যদি আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে বন্ধু বানাতাম, তবে আবু বকরই হতো সেই ব্যক্তি।"[১৪]

খিলাফত রক্ষা: ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স)-এর মৃত্যু হলে মুসলমানদের খলিফা কে হবেন এ নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি এ বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান না হবার পূর্ব পর্যন্ত রাসুল (স)-এর পবিত্র মরদেহের দাফন পর্যন্ত হয়নি। ইসলামের এই দুঃসময়ে জনসাধারণের খলিফা নির্বাচিত হয়ে আবু বকর (রা)-ই সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করেছিলেন। উইলিয়াম মুর বলেন, "নির্বাচনে মতানৈক্যের অর্থ ছিল ইসলামকে বিভক্ত করা এবং সেই অবস্থায় ইসলামের পরিণাম ছিল ধ্বংস।"[১৫]

ভণ্ড নবিদের দমন: হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়তের সাফল্য অনেকের মনে নবুয়ত লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। তাঁর জীবনের শেষ দিকে দেশের বিভিন্ন অংশে কিছু ভণ্ড নবির উদ্ভব হয় এবং নবিজি (স)-এর ইন্তেকালের সাথে সাথে তাদের দাবি চরমে পৌঁছে। এদের মধ্যে আসওয়াদ আনসি, মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ ছিল প্রধান। এদের মধ্যে মুহাম্মদ (স)-এর সময়ই ফিরোজ দাইলামী আসওয়াদ আনসিকে হত্যা করে। পরবর্তী সময়ে আবু বকর (রা) খালিদ বিন ওয়ালিদসহ কয়েকজন মুসলিম সেনাপতির নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়ে তোলায়হা, সাজাহ ও ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামাকে কঠোরহস্তে দমন করে ইসলামকে ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন প্রতিহত: আবু বকর (রা)-এর খিলাফত লাভের পরপরই রিদ্দা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। হযরত আবু বকর (রা) তখন বুঝতে পারলেন সমগ্র উপদ্বীপে ধর্মত্যাগীদের আন্দোলন প্রতিহত করতে না পারলে বাইরে ইসলাম প্রচার করা তো দূরের কথা দেশের অভ্যন্তরেই ইসলামকে রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার হবে। তাই তিনি সাহস ও দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের দমন করেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, "আবু বকর (রা)-এর সংক্ষিপ্ত শাসনকালের অধিকাংশ সময়টাই তথাকথিত রিদ্দা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ছিল।"[১৬]

রাজ্যবিস্তার: আবু বকর (রা) কেবল ইসলামের অভ্যন্তরীণ অনৈক্যই প্রতিরোধ করেননি বরং তিনি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আরবকে মুক্ত রেখে রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি মুসান্না এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে পারস্যে অভিযান চালিয়ে কালদিয়া ও হিরা রাজ্য জয় করেন। অপরদিকে শুরাহবিল, আমর, ইয়াজিদ এবং আবু ওবায়দার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী চারভাগে বিভক্ত হয়ে সিরিয়ায় অভিযান চালায়। তারা একত্রিত হয়ে আজনাদাইনের যুদ্ধে গ্রিক বাহিনীকে ভীষণভাবে পর্যুদস্ত করেন। এভাবে আবু বকর (রা) বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে পারস্য এবং রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত করেন। তিনি খিলাফতের সীমানা ইরাক ও সিরিয়ার ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

আল-কুরআন গ্রন্থাকারে প্রকাশ: হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে ভণ্ড নবি মুসায়লামাকে দমনের সময় ইয়ামামার যুদ্ধে প্রায় ৩০০ জন (মতান্তরে ৭০ জন) কুরআনের হাফিজ শাহাদাতবরণ করেন। ফলে পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণ নিয়ে আশঙ্কা দেখা দেয়। এজন্য আবু বকর (রা) হযরত ওমর (রা)-এর পরামর্শে যায়েদ বিন সাবিত (রা) নামে এক সাহাবির নেতৃত্বে একটি কুরআন সংকলন কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি কুরআনের বাণীগুলো সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করে।

---

[১৪] Ref: *Willium Muir, The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall*

[১৫] The Arabs throughout the peninsula were relapning into apostasy. –Ref: *Willium Muir,The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall*

[১৬] The short caliphate of Abu Bakr was mostly occupied with the so-called Riddah war. –Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.140

মদিনা রাষ্ট্রের ভিত মজবুত করা: আবু বকর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হয়ে মুসলিম রাষ্ট্র ও ইসলামকে আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে ইতিহাসে ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে আখ্যা পান। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "আবু বকর বিনীত অথচ দৃঢ় ছিলেন এবং নতুন রাষ্ট্রের শাসনকার্যে এবং জনগণের মঙ্গলে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন।"[১৭] তিনি শুরা বা মন্ত্রণা পরিষদের সাহায্যে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। দেশের আইনকে জনগণের ইচ্ছার অধীন এবং তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার দান করে আবু বকর (রা) প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারের গোড়াপত্তন করেন। তিনিই প্রথম দীন-দুঃখীর দুর্দশা দূর করার জন্য 'বায়তুল মাল' প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত এসব কাজ করে তিনি নবগঠিত মদিনা রাষ্ট্রের ভিতকে শক্তিশালী করেছিলেন। ঐতিহাসিক মাসুদি বলেন "বস্তুত মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাতে আবু বকরের মতো একজন খলিফা না থাকলে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র কোনোটাই রক্ষা পেত না।" মূলত খিলাফত লাভের পরে ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রের একনিষ্ঠ সেবা, পবিত্র কুরআন সংকলন, জাকাত আদায়, ভণ্ড নবিদের দমন, জাকাতবিরোধীদের দমন এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে তিনি দেশকে যেভাবে রক্ষা করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে তাকে 'Saviour of Islam' বা ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়।

হযরত আবু বকর (রা)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

চারিত্রিক মাধুর্য: হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন মহান আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাঁর আচার-ব্যবহার এতই সরল ও অকপট ছিল যে, হযরত ওমর, ওসমান, আলিসহ অনেক সাহাবি মহানবি (স)-এর পরে তাকে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন উদার মনের অধিকারী এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তাঁর মানবতাবোধ, দৃঢ়তা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা বিশ্বের ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে।

চারিত্রিক দৃঢ়তা: হযরত আবু বকর (রা) চারিত্রিক দিক থেকে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণ মেলে নিরপেক্ষ বিচারে, নির্ভীক রাষ্ট্র পরিচালনায়। তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় হযরত ওমর (রা) সহ কিছু সাহাবি বেদুইনদের জাকাত প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে হযরত আবু বকর (রা) এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। খলিফা হওয়ার পর তিনি সাহাবিদের অনুরোধে বার্ষিক ৬০০০ দিরহাম ভাতা গ্রহণ করতে রাজি হন। কিন্তু ওই অর্থ গ্রহণ করায় মৃত্যুকালে তিনি এত কষ্টবোধ করছিলেন যে, তিনি তার কিছু সম্পদ বিক্রি করে সেই অর্থ পরিশোধ করতে আদেশ দেন।

দানশীল ও বিশ্বাসী: ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা) 'আতিক' বা দানশীল হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি তাবুকের যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য নিজের সব সম্পদ দান করেন। প্রথম পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ব্যক্তি হিসেবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং মেরাজের কথা সর্বপ্রথম বিশ্বাস করে রাসুল (স)-এর কাছ থেকে 'সিদ্দিক' বা বিশ্বাসী উপাধি পান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত আবু বকর (রা)-কে ইসলামের কী বলা হয়?
২. কার ইমামতিতে হযরত মুহাম্মদ (স) বহুবার নামাজ আদায় করেছেন?
৩. বায়তুল মাল গঠন করেন কে?
৪. পবিত্র কুরআন প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন কে?
৫. কোন যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সব সম্পদ দান করে দেন?
৬. 'আতিক' শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১১]*

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ভণ্ড নবি ও স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন প্রতিহতকরণে হযরত আবু বকর (রা)-এর গৃহীত পদক্ষেপগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।
২. হযরত আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলার পক্ষে তোমার যুক্তি উপস্থাপন করো।

---

[১৭] Abu Bakr was gentle but firm; he devoted all his energies to the administration of the new born state and to the good of people. Ref: Syed Ameer Ali, *A short History of the Saracens*, pp.26-27

পাঠ ৬ ও ৭

হযরত ওমর (রা)-এর পরিচয়, প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) এবং পারস্যে খিলাফত সম্প্রসারণ

Introduction, Early Life and Obtaining Khilafat of Hazrat Umar (R) (634-644 AD) and The Expansion of the Khilafat in Persia

পরিচয়

'আল-ফারুক' বা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী হিসেবে পরিচিত ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের 'আদ্দিয়া' (Addiya) গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম খাত্তাব বিন নুফাইল বিন ওজ্জা এবং মায়ের নাম হানতামা। ওমর (রা)-এর বাল্যনাম ছিল আবুল হাফস্। তিনি দেখতে ছিলেন দীর্ঘদেহী ও শ্যামবর্ণের। ঐতিহাসিক বালাজুরির (ফুতুহ আল বুলদান) মতে, জাহেলিয়া যুগে কুরাইশ বংশের ১৭ জন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে ওমর ছিলেন একজন। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। একজন সুবক্তা ও কবি হিসেবেও তৎকালীন আরবে তাঁর খ্যাতি ছিল।

ইসলাম গ্রহণ: ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত ওমর (রা) ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। তিনি ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স)-কে হত্যার জন্য খোলা তরবারি হাতে নিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে তিনি জানতে পারেন যে, তার বোন ফাতেমা ও ভগ্নিপতি সাইদ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ সংবাদে তিনি তাদের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে বোনের বাড়িতে যান এবং বোন ফাতেমার কণ্ঠে সুরা ত্ব-হার তেলাওয়াত শুনে ইসলামের মর্মবাণী বুঝতে পারেন। ফলে অনুতপ্ত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় তার বয়স ছিল ৩৩ বছর। ইসলাম ও পৌত্তলিকতার মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারায় মহানবি (স) তাঁকে 'ফারুক' বা 'সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইসলামের প্রসারে অংশগ্রহণ ও খিলাফত লাভ

ওমর (রা)-এর মতো তেজস্বী কুরাইশ বীর ইসলাম গ্রহণ করায় ইসলামের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। ওমর (রা)-এর প্রভাব ও প্রতিপত্তির কারণে কুরাইশরা মুসলমানদের কাবা শরিফে নামাজ পড়তে বাধা দেয়নি। হিজরতের পর তার পরামর্শে রাসুল (স) মদিনা মসজিদে নামাজের আগে আজান দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেন। বদর, ওহুদ, খন্দক, হুনায়ুন, খাইবারসহ অনেকগুলো যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে ওমর (রা) ইসলামের প্রসারে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬২৮ খ্রি.) এবং মক্কা বিজয়ে (৬৩০ খ্রি.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাবুক অভিযানের সময় হযরত ওমর (রা) তার সঞ্চিত সম্পদের অর্ধেক যুদ্ধ তহবিলে দান করেন। খায়বার অঞ্চলে তাঁর বিস্তৃত ভূসম্পত্তি তিনি ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচন প্রশ্নে যে গুরুতর রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল, হযরত ওমর (রা) খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা) নাম ঘোষণা করে তা সমাধান করেন। খলিফা আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে তার উপদেষ্টা এবং একজন বিচারক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আবু বকর (রা)-এর মৃত্যুর পর তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হন। উল্লেখ্য, মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর খিলাফতকে কেন্দ্র করে মুসলিম জাহানে যে গুরুতর রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি এড়ানোর লক্ষ্যে হযরত আবু বকর (রা) তার ইন্তেকালের আগে নেতৃস্থানীয় সাহাবিদের সাথে পরামর্শক্রমে হযরত ওমর (রা)-কে পরবর্তী খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। মুসলমানরা তার এ মনোনয়নকে সানন্দচিত্তে মেনে নিয়ে খলিফা হিসেবে হযরত ওমর (রা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে হযরত ওমর (রা) আবু বকর (রা)-এর বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেন।

পারস্যে হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত সম্প্রসারণ

৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আবু বকর (রা)-এর ইন্তেকালের পর তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ও সাহসী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হযরত ওমর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর ফলে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যে মুসলিম বিজয়াভিযানের নবযুগের সূচনা হয়। পি. কে. হিট্টি বলেন, "আবু বকরের সময় মুসলিম বাহিনী বিজয়যাত্রা শুরু করে এবং ওমরের সময় এসে এক অভাবনীয়

সাফল্য লাভ করে।"[১৮] মূলত কতকগুলো সুস্পষ্ট কারণেই হযরত ওমর বর্তমান ইরাক, ইরানসহ মধ্য এশিয়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত তৎকালীন পারস্য সাম্রাজ্যে খিলাফত সম্প্রসারণ করেছিলেন। যেমন—

প্রথমত, ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রসার পারস্যবাসীর ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ালে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাই মুসলমানরা নিরাপত্তার জন্য অভিযান চালায়।

দ্বিতীয়ত, মহানবি (স)-এর পাঠানো দূতকে পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরু পারভেজ অপমানিত করেন। এতে আন্তর্জাতিক নীতির অবমাননা করা হয়। ফলে প্রতিশোধস্বরূপ খলিফা আবু বকর (রা)-এর সময় মুসলমানরা পারস্যে অভিযান চালায়। হযরত ওমর (রা) এ অভিযান অব্যাহত রাখেন।

তৃতীয়ত, ফোরাত ও দজলা নদীর অববাহিকা ছিল খুবই সমৃদ্ধিশালী ও উর্বর। মরুবাসী আরবরা বহুদিন থেকে এ অঞ্চলের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ঈর্ষান্বিত পারস্যবাসী মুসলমানদের অব্যাহতভাবে বাণিজ্য করতে দিতে রাজি ছিল না। ফলে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও মুসলমানরা পারস্যে অভিযান চালাতে বাধ্য হয়।

চতুর্থত, রিদ্দা যুদ্ধের সময় বাহরাইনে যখন বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তখন পারস্যবাসী বিদ্রোহীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। তাদের এ প্রকাশ্য শত্রুতার জন্য মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

মূলত খলিফা আবু বকর (রা)-এর সময় নানা কারণে পারসিকদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ শুরু হয়। হযরত ওমর (রা)-এর সময় ইসলাম ও মুসলিম সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্য এ অভিযান প্রত্যাহার করা সম্ভব হয়নি।

পারস্যে অভিযানসমূহ (৬৩৪-৬৪১ খ্রি.)

ব্যাবিলনের যুদ্ধ (৬৩৪ খ্রি.): খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় সেনাপতি মুসান্না ও খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলমানরা পারস্যে অভিযান শুরু করে। এ সময় শৃঙ্খলের যুদ্ধ ও উইলিসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উইলিসের যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে মুসলমানরা হিরা রাজ্য দখল করে। খলিফার আদেশে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ সিরিয়ায় যান। এ সুযোগে পারস্য সম্রাট মুসান্নার বিরুদ্ধে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলমানদের আক্রমণে শত্রুরা দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায়। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের শেষার্ধে সংঘটিত এ যুদ্ধ 'ব্যাবিলনের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। যুদ্ধের পর সেনাপতি মুসান্না খলিফার কাছে সীমান্ত রক্ষার জন্য আরও সৈন্য চেয়ে দূত পাঠান। কিন্তু খলিফা আবু বকর (রা) মৃত্যুবরণ করেন।

নামারকের যুদ্ধ (৬৩৪ খ্রি.): মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য পারস্যের সম্রাজ্ঞী বুরান দুখত খোরাসানের শাসনকর্তা মহাবীর রুস্তমকে পারসিক সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। অন্যদিকে মুসলিম সেনাপতি মুসান্নার অনুরোধে ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে হযরত ওমর (রা) খিলাফত লাভ করে আবু উবায়দার নেতৃত্বে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এ দলটি হিরায় পৌঁছালে নামারক নামক স্থানে পারসিক বাহিনীর সাথে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পারসিক সেনাপতি রুস্তমের বাহিনী পরাজিত হয়। ফলে মুসলমানরা হিরা রাজ্য পুনর্দখলে সক্ষম হয়।

সেতু বা জসরের যুদ্ধ (৬৩৪ খ্রি.): নামারকের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য পারস্য সম্রাট রুস্তম বাহমানের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। মুসলিম বাহিনী ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থান নেয়। সেনাপতি আবু উবায়দা নদীর ওপর একটি নৌকার সেতু নির্মাণ করেন। সেনাপতি মুসান্নার পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি নদী পার হয়ে পারস্য বাহিনীর মোকাবিলা করেন। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সংঘটিত এ যুদ্ধ সেতু বা জসরের যুদ্ধ নামে পরিচিত। মুসলিম বাহিনী এ যুদ্ধে মর্মান্তিকভাবে পরাজিত হয়। সেনাপতি আবু উবায়দা নিহত হলে মুসান্না মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। প্রায় ৬০০০ মুসলিম সৈন্য নিহত হন। অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় মুসান্না আরব সীমান্তে ফিরে এসে শিবির স্থাপন করে কোনোরকমে আগে দখল করা স্থানসমূহ রক্ষা করেন।

---

[১৮] The conquest of world receiving its impules under Abu Bakr reached its highest water mark under Umar. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs,* p.175

বুয়ায়েবের যুদ্ধ (৬৩৫ খ্রি.): সেতুর যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ও সেনাপতির মৃত্যুতে খলিফা ওমর (রা) মর্মাহত হন। ইবনে জাবিরের অধীনে তিনি একদল সৈন্য মুসলমানদের সাহায্যে পারস্যে প্রেরণ করেন। মুসান্নার নেতৃত্বে ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত বুয়ায়েবের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়ী হয়। পারসিক সেনাপতি মিহরান মাসরুইরাহ হামাদানি যুদ্ধে নিহত হন। এ বিজয়ের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা মাদায়েন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মেসোপটেমিয়ার নিম্নাঞ্চল ও ব-দ্বীপ অঞ্চলও মুসলিম অধিকারে আসে।

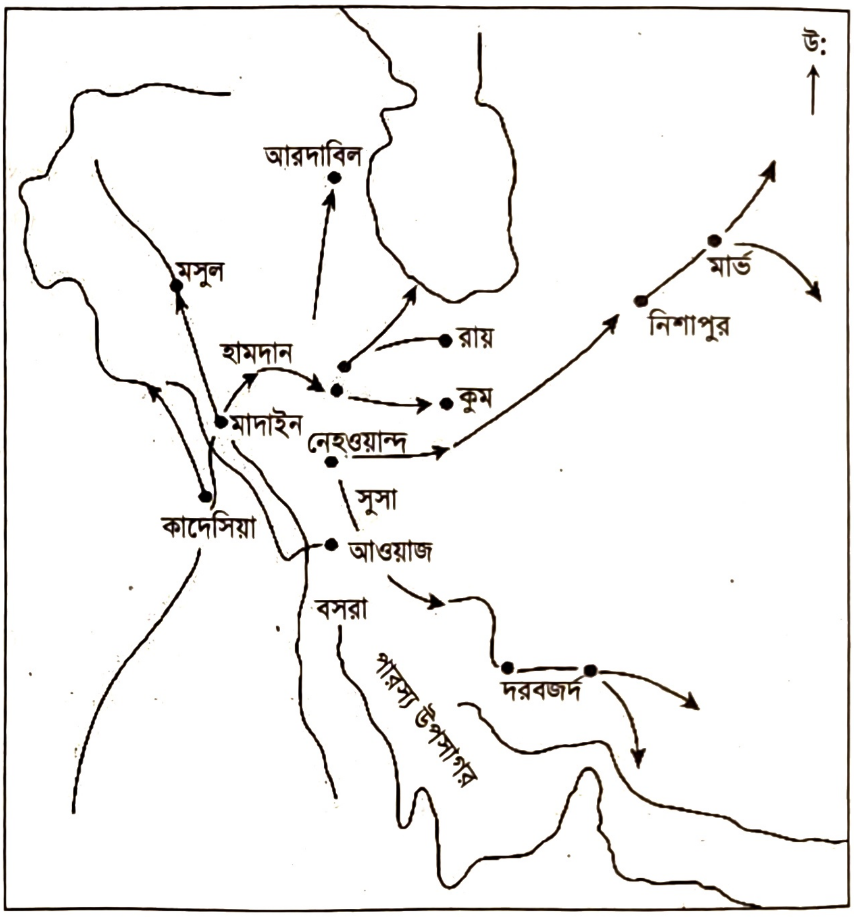

পারস্যে মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ

কাদেসিয়ার যুদ্ধ (৬৩৬ খ্রি.): বুয়ায়েবের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পারস্য সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগার্দ মহাবীর রুস্তমের নেতৃত্বে বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন। খলিফা ওমর (রা) সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে এক বিশাল বাহিনী 'কাদেসিয়ার প্রান্তরে' প্রেরণ করেন। ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিন দিনব্যাপী তুমুল যুদ্ধ হয়। আরবরা প্রথম দিনকে 'বিশৃঙ্খলার দিন বা ইয়াওমুল আরমাস' বলে অভিহিত করেন। দ্বিতীয় দিনটিকে বলা হয় 'সাহায্যের দিন বা ইয়াওমুল আগওয়াহ'। তৃতীয় দিনটিকে বলা হয় দুর্দশার দিন বা 'ইয়াওমুল উম্মাছ'। তৃতীয় দিন সারা রাত যুদ্ধ চলায় একে 'লাইলাতুল হারির' বলা হয়। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়।

ইসলামের ইতিহাসে কাদেসিয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ যুদ্ধে পারসিক বাহিনীর বীর সেনানি রুস্তম নিহত হলে পারসিকদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম দিকসহ বিশাল উর্বর এলাকা মুসলমানদের অধিকারে আসে। ফলে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। কাদেসিয়ার যুদ্ধ ছিল একটি মীমাংসাত্মক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুসলমানদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। এটি তাদের পরবর্তী বৃহত্তর বিজয়ে উদ্বুদ্ধ করে।

মাদায়েন ও জালুলার যুদ্ধ (৬৩৭ খ্রি.): কাদেসিয়ার যুদ্ধের পর সেনাপতি সাদ ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের রাজধানী মাদায়েন দখল করেন। পারস্য সম্রাট প্রাণভয়ে হুলয়নে পালিয়ে যান। মাদায়েন অর্থ দুই শহর। সেনুসিয়া ও টেসিফোনিয়া নামক দুটি শহরের সমন্বয়ে পারসিকদের রাজধানী গড়ে উঠেছিল বলে একে মাদায়েন বলা হতো। সাদ পলাতক বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করেন। ফলে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সাদের বাহিনী বাবলের যুদ্ধে নাসিরজান ও হরমুজান দখল করে। এভাবে দজলা ও ফোরাতের মধ্যবর্তী এলাকায় মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর সাদ শত্রু বাহিনীর মোকাবিলা করে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে জালুলার যুদ্ধে পারসিকদের পরাজিত করে হলওয়ান অধিকার করেন। ফলে সমগ্র মেসোপটেমিয়া মুসলিম অধিকারে আসে। মাদায়েনকে ইরাকের রাজধানী করা হয়। ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে খলিফার নির্দেশে সাদ ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে কুফা নামে একটি নগরীর গোড়াপত্তন করেন। একই বছর উবাল্লার কাছে শাত-ইল-আরবে 'বসরা' নগরী নির্মাণ করা হয়। এর ফলে পূর্ব দিকে মুসলমানদের বিজয়াভিযান প্রেরণ সহজ হয়।

নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ (৬৪১ খ্রি.): বারবার পরাজিত হয়ে পারস্য সম্রাট ইয়াজদিগার্দ পুনরায় তাবারিস্তান, জুরজান, ইস্পাহান, আজারবাইজান, সিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এমতাবস্থায় হযরত ওমর (রা) পারস্য বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য নুমান বিন মুকারানের নেতৃত্বে ৩০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনীকে পারস্যে প্রেরণ করেন। নুমান নিহাওয়ান্দে পৌঁছালে পারসিক বাহিনীর সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা হয়, যা নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ নামে পরিচিত। ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত এ যুদ্ধে নুমান শহিদ হলেও মুসলিম বাহিনী জয় লাভ করে। মুসলমানদের এ বিজয়কে মহাবিজয় (Victory of Victories) বলা হয়। কারণ এ যুদ্ধ জয়ের ফলে পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় ইসলামের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। তবে এ যুদ্ধে বেশ কিছু কুরআনের হাফিজ শহিদ হন।

পারস্য বিজয়ের ফলাফল

মুসলমানদের পারস্য বিজয়ের যেমন কিছু ইতিবাচক ফলাফল ছিল, তেমনি এর কিছু নেতিবাচক প্রভাবও ছিল।

ইতিবাচক ফলাফল হিসেবে দেখা যায়—

প্রথমত, এটি ছিল আর্যদের ওপর সেমেটিকদের বিজয়। জোরোষ্ট্রীয় ধর্মমতের ওপর একেশ্বরবাদী ইসলামের বিজয়। এ বিজয়ের ফলে পারস্য ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসে।

দ্বিতীয়ত, পারস্য বিজয়ের ফলে মুসলমানরা সেখানকার সহজাত ও গৌরবময় ঐতিহ্যের সংস্পর্শে আসে। ফলে মুসলমানরা অপরিমিত ধনৈশ্বর্যের মালিক হয়। তাছাড়া মুসলমানরা পারসিক সমরকৌশলের সাথে পরিচিত হয়, যা তাদের পরবর্তী সমরাভিযানে সাফল্যের সুযোগ এনে দেয়।

তৃতীয়ত, সমকালীন বিশ্বে পারস্য ছিল এক উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি। পারস্য বিজয়ের ফলে মুসলমানরা এ উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকে পরিণত হয়। পারসিক সংস্কৃতি মুসলিম সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে।

চতুর্থত, পারস্য বিজয় মুসলমানদের মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছিল তা মুসলমানদের পরবর্তী বিজয়ে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

পারস্য বিজয়ের নেতিবাচক প্রভাবের মধ্যে রয়েছে—

প্রথমত, এ বিজয়ের ফলে মুসলমানরা অগণিত ধনৈশ্বর্যের মালিক হয়। পারস্য সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসী জীবনধারা মুসলিম সমাজকে কলুষিত করে। তাদের নৈতিক জীবনে অবক্ষয় দেখা দেয়। পাপ-পঙ্কিলতা আরব মুসলিম রক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট করে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের ধ্বংসের পথকে উন্মুক্ত করে।

দ্বিতীয়ত, পারস্য বিজয়ের ফলে মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন পথ ও মতের সৃষ্টি হয়। এর ফলে মুসলিম সমাজের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়। মুসলিম সাম্রাজ্যের জৌলুস ও গৌরব ক্রমান্বয়ে ম্লান হয়ে পড়ে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'ফারুক' উপাধি ছিল কার? *[রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৭]*
২. হযরত ওমর (রা) ইসলামের কততম খলিফা ছিলেন?
৩. হযরত ওমর (রা) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?
৪. সেতু বা জসরের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? *[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*
৫. চূড়ান্তভাবে পারস্য বিজয় অর্জিত হয় কোন যুদ্ধের মাধ্যমে? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
৬. কোন যুদ্ধকে মুসলমানদের মহাবিজয় বলা হয়?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. হযরত ওমর (রা)-এর পরিচয় ও খিলাফত লাভ সম্পর্কে পাঁচটি করে বাক্য লিখে ছকে উপস্থাপন করো।
২. পারসিকদের সাথে হযরত ওমর (রা)-এর সংঘটিত যুদ্ধের নাম ও সংঘটিত হওয়ার সাল ছক আকারে লেখো।

পাঠ ৮

বাইজান্টাইন অঞ্চলে হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত সম্প্রসারণ
The Expansion of Khilafat in Byzantine Area by Hazrat Umar (R)

সিরিয়া, জর্ডান, প্যালেস্টাইন ও মিসরের বিস্তীর্ণ ভূভাগ পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ রোমান সাম্রাজ্যই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। মুহাম্মদ (স) রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে দূত প্রেরণ করলে সম্রাট মুসলিম দূতকে সাদরে গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে বসরার শাসকের কাছে প্রেরিত মুসলিম দূতকে সিরিয়ার বনি গাসসানের শাসক মুতা নামক স্থানে হত্যা করলে মুসলমানদের সাথে তাদের সুসম্পর্কের অবনতি ঘটে। ধীরে ধীরে মুসলিম রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে উঠলে রোমান সম্রাট ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন এবং বিভিন্নভাবে মুসলমানদের দমনের চেষ্টা করেন। ফলে আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানরা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিসর দখল করে।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে মুসলমানদের খিলাফত সম্প্রসারণের কারণ

মুসলিম দূত হত্যা: মহানবি (স)-এর জীবদ্দশায় মুসলিম দূত হারিস বিন উমায়েরকে রোমান সামন্তরাজ শুরাহবিল (গাসসান গোত্রের নেতা) মুতা নামক স্থানে হত্যা করে। এটা ছিল আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের শামিল । ফলে ওই সময় মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। হারিসের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে রোমানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এছাড়া রিদ্দা যুদ্ধে বিদ্রোহীদের সাহায্য করায় খলিফা আবু বকর (রা) রোমান সীমান্তে অভিযান প্রেরণ করেন। খলিফা ওমর (রা) এ অভিযান অব্যাহত রাখেন।

অর্থনৈতিক কারণ: সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিসর ছিল উর্বর এলাকা। অপরদিকে আরবের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল মরুময়। সুতরাং আরবরা নিজেদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি উর্বর অঞ্চল দখলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

বাণিজ্যিক কারণ: আরব বণিকেরা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাইজান্টাইন অঞ্চলে যাতায়াত করত। এ অঞ্চলের অনেক অধিবাসী আরব বংশোদ্ভূত ছিল এবং আরবদের সাথে তাদের অনেকেরই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। ফলে আরব বণিকদের সহজে ব্যবসা-বাণিজ্য করার আকাঙ্ক্ষাও রোমানদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষে ভূমিকা রাখে।

ভৌগোলিক কারণ: ভৌগোলিক দিক থেকে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন আরবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব অঞ্চল শক্তিশালী বাইজান্টাইন শাসকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে এসব অঞ্চল জয় করা প্রয়োজন ছিল। রিদ্দা যুদ্ধে রোমানরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করায় নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছিল। এসব কারণে মুসলমানরা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করে।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে অভিযানসমূহ

সিরিয়া বিজয়: মহানবি (স)-এর জীবদ্দশায় মুতা অভিযান এবং আবু বকর (রা)-এর খিলাফতের শুরুতে উসামার নেতৃত্বে সিরিয়া অভিযান মুসলিম দূতকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। প্রথমটিতে মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত হলেও দ্বিতীয়টিতে উসামা রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় গৌরব অর্জন করেন। স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর (রা) রিদ্দার যুদ্ধের পর সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি আমর ইবন আসকে প্যালেস্টাইন, ইয়াজিদ ইবন আবু সুফিয়ানকে দামেস্ক, আবু ওবায়দাকে হিমস এবং শোরাহবিলকে জর্ডান উপত্যকা অঞ্চলে পাঠান। এ অভিযানে সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমর ইবনুল আসকে।

আরাবর ও গাজার যুদ্ধ (৬৩৩ খ্রি.): হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত সাগর ও আকাবা উপসাগরের মধ্যবর্তী আরাবা উপত্যকায় মুসলমানদের সাথে রোমানদের প্রথম মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এবং রোমানরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এরপর প্যালেস্টাইনে নিযুক্ত রোমান শাসনকর্তা সার্জিয়াস গাজার নিকটবর্তী একস্থানে আমর ইবনুল আসের সাথে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে সার্জিয়াস পরাজিত ও নিহত হন। যুদ্ধের পর আমর সামনে অগ্রসর না হয়ে কেন্দ্রের সাহায্যের জন্য আরাবায় অপেক্ষা করেন। অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে ইরাক থেকে সিরিয়ায় প্রেরণ করা হয়।

আজনাদাইনের যুদ্ধ (জুলাই, ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ): মুসলমানদের যুদ্ধ পরিকল্পনার সংবাদে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলিম অভিযান প্রতিহত করতে ২,৪০,০০০ (মতান্তরে এক লক্ষ) সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী তার ভ্রাতা থিওডোরের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। মুসলমানরা ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে রোমান বাহিনীর সাথে ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে আজনাদাইনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধে রোমান বাহিনী পরাজিত হয়। ফলে গাজা, নিউপলিস, জাফা প্রভৃতি স্থান মুসলমানদের দখলে আসে।

দামাস্কাস বিজয় (৬৩৫ খ্রি.): খলিফা ওমর (রা) খালিদ বিন ওয়ালিদকে সিরিয়া বিজয়ের আদেশ দেন। আজনাদাইনের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস এন্টিওক শহরে আশ্রয় নেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার রাজধানী এবং অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র দামাস্কাস অবরোধ করেন। ছয় মাস অবরোধের পর নগরবাসী সম্রাটের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের সাহায্য করলে দামাস্কাস মুসলমানদের দখলে আসে।

ফিহল ও হিমসের যুদ্ধ (৬৩৫ খ্রি.): ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ৫০,০০০ সৈন্যের রোমান বাহিনীর সাথে খালিদের নেতৃত্বে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। ফিহলে সংঘটিত এ যুদ্ধেও রোমানরা পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সমগ্র জর্দান উপত্যকা মুসলমানদের অধিকারে আসে। বিজয়ী মুসলমানরা পরাজিত রোমানদের জীবন, সম্পদ ও গির্জার নিরাপত্তা দিয়ে মানবাধিকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জর্দান অধিকারের পর বিজিত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠনে খলিফা সেনাপতি আবু উবায়দাকে হিমসে, আমর ইবনুল আসকে জর্দানে এবং খালিদ বিন ওয়ালিদকে দামাস্কাসের শাসনভার ন্যস্ত করেন। ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানরা খণ্ডযুদ্ধের মাধ্যমে হিমস দখল করে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ (৬৩৬ খ্রি.): মুসলমানদের হাতে দামাস্কাস, হিমস ও জর্দানের পতনের ফলে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তিনি ভ্রাতা থিওডোরাসের নেতৃত্বে ৫০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুসলিম সেনাপতি আবু ওবায়দা, আমর ইবনুল আস ও খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে সংঘটিত এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২৫,০০০। উভয় পক্ষের মধ্যে মাসব্যাপী খণ্ডযুদ্ধের পর ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ারমুক উপত্যকায় এক সর্বাত্মক যুদ্ধে রোমানরা পরাজিত হয়। এ বিপর্যয়ের সংবাদ শুনে হিরাক্লিয়াস কনস্টান্টিনোপলে পালিয়ে যান।

ফলাফল: ইসলামের ইতিহাসে ইয়ারমুকের যুদ্ধকে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সমৃদ্ধিশালী সিরিয়া স্থায়ীভাবে মুসলিম অধিকারে আসে। রোমান বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার সাহস হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে এ যুদ্ধের সাফল্য মুসলমানদের পরবর্তী বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে। ইয়ারমুকের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই খলিফা ওমর (রা) খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেন। তার স্থলে আবু ওবায়দা ইবনে জাররাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। নতুন সেনাপতি বারবেক, এডোনা ও আলেপ্পোসহ সমগ্র সিরিয়া জয় করেন।

প্যালেস্টাইন বিজয় (৬৩৭ খ্রি.): খলিফা আবু বকর (রা)-এর সময়ে প্যালেস্টাইনের কিছু অংশ বিজিত হয়েছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী সেনাপতি আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে রোমান শাসনকর্তা আরতাবিনকে পরাজিত করে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে প্যালেস্টাইন দখল করেন। এরপর মুসলমানরা প্যালেস্টাইনের রাজধানী জেরুজালেম অবরোধ করেন। অনেক চেষ্টা করেও রোমানরা জেরুজালেম অধিকারে রাখতে পারেনি। অবরুদ্ধ জেরুজালেমবাসীর দাবি অনুযায়ী খলিফা ওমর (রা) নিজে জেরুজালেমে উপস্থিত হয়ে খ্রিষ্টানদের সাথে সন্ধি স্বাক্ষর করে জেরুজালেমের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। জিজিয়া করদানের শর্তে জেরুজালেমের নাগরিকদের জানমাল ও ধর্মীয় নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। জেরুজালেমের পতনের ফলে সমগ্র প্যালেস্টাইন মুসলিম কর্তৃত্বাধীনে আসে।

জাজিরা বিজয় (৬৩৮ খ্রি.): মেসোপটেমিয়ার উত্তরে বিস্তৃত ভূখণ্ডকে জাজিরা (উপদ্বীপ) বলা হতো। জাজিরাবাসীরা রোমান সম্রাটের প্ররোচনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। মুসলমানরা বাধ্য হয়েই ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আবু ওবায়দার নেতৃত্বে জাজিরা দখল করে। আবু ওবায়দা ৩০,০০০ বিদ্রোহী জাজিরাবাসীকে পরাজিত করে মুসলিম শাসনের অধীনে আনেন।

আর্মেনিয়া ও উত্তর মেসোপটেমিয়া বিজয়: রোমানদের প্ররোচনায় কুর্দ ও আর্মেনিয়ানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। মুসলমানরা কুর্দ অধ্যুষিত উত্তর মেসোপটেমিয়া ও আর্মেনিয়া দখল করেন। তারা এশিয়া মাইনরে রোমান শক্তির কেন্দ্র সাইলিসিয়া প্রদেশও অধিকার করেন।

এভাবে খলিফা ওমর (রা)-এর প্রচেষ্টায় মাত্র ছয় বছরের মধ্যে সমগ্র সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন আরব মুসলমানদের অধিকারে আসে। খলিফা হযরত মুয়াবিয়া (রা)-কে সিরিয়ার প্রদেশপাল নিয়োগ করেন।

মিসর বিজয়: মুসলমানদের মিসর বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল আত্মরক্ষা। কারণ রোমানরা সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও জেরুজালেম থেকে পরাজিত হয়ে মিসরে অবস্থান করে। আর মিসর ইসলামি রাষ্ট্রের নিকটবর্তী দেশ হওয়ায় এখানে রোমানদের উপস্থিতি মুসলিম সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া এখান থেকে রোমানদের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার আশঙ্কা ছিল। নীল নদের অববাহিকায় অবস্থিত মিসরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মুসলমানদের মিসর জয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল। খলিফা ওমর (রা)-এর অনুমতিক্রমে ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে আমর ইবনুল আস ৪,০০০ সৈন্য নিয়ে মিসরের দিকে অগ্রসর হন। ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিসরে প্রবেশ করে রোমানদের সাথে হেলিপলিস নামক স্থানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে রোমানরা মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়। এরপর মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আস ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে রোমানদের প্রধান সামরিক ঘাঁটি আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করেন। সম্রাট সিজার্স তার ভ্রাতা থিওডোরসকে সাহায্য করার জন্য ৫০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু রোমান বাহিনী মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়। আলেকজান্দ্রিয়া পতনের সাথে সাথে রোমানদের প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায় এবং মিসর মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। আমর ইবনুল আস ব্যাবিলনের কাছে একটি শহরকে রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলেন। এটির নাম দেন ফুসতাত নগরী। এটি ৬৪২ থেকে ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিসরের রাজধানী ছিল।

মিসর বিজয়ের গুরুত্ব: ইসলামের ইতিহাসে মিসর বিজয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মিসর বিজয়ের ফলে মুসলমানদের আর্থিক উন্নতি ঘটে। আফ্রিকায় মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়। খলিফার নির্দেশে আমর সুয়েজ খাল খনন করে নীল নদ ও লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেন। এর ফলে মিসর থেকে আরবের সামুদ্রিক বন্দর ইয়ানবু পর্যন্ত যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। ৮০ বছর সচল থাকার পর বালু পড়ে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

উত্তর আফ্রিকা অভিযান: মিসর থেকে বিতাড়িত হয়ে রোমানরা উত্তর আফ্রিকার বার্কা ও ত্রিপোলি থেকে মিসর সীমান্তে আক্রমণ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ফলে ৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে খলিফার নির্দেশে মুসলিম বাহিনী বার্কা ও ত্রিপোলি আক্রমণ করে। পরাজিত হয়ে সেখানকার অধিবাসীরা করদানের শর্তে মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়।

বাইজান্টাইন অঞ্চল বিজয়ের ফলাফল: মুসলমানদের বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সিরিয়া, মিসর ও প্যালেস্টাইন বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমা অনেক বেড়ে যায় এবং ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পি. কে. হিট্টি বলেন, 'খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমর ইবনুল আসের ইরাক, পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিযান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক অভিযানসমূহের অন্যতম এবং এটা নেপোলিয়ন, হ্যানিবল ও আলেকজান্ডারের পরিচালিত যুদ্ধগুলোর সাথে তুলনাযোগ্য।'[১৯] সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিসর দখলের ফলে মুসলমানরা উর্বর ও সমৃদ্ধিশালী এলাকার অধিকারী হয়। এর মাধ্যমে তারা ভূমধ্যসাগরের সংস্পর্শে আসে এবং একটি শক্তিশালী নৌশক্তির অধিকারী হয়। ফলে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়। এ বিজয়ের মাধ্যমেই মুসলমানরা গ্রিক ও রোমান সভ্যতার সংস্পর্শে আসে এবং পরস্পরের সম্মিলনে এক উন্নত ইসলামি সভ্যতা গড়ে তোলে।

অবশ্য পারস্য বিজয়ের মতো বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে সাফল্যের একটি নেতিবাচক দিকও ছিল। বস্তুত এ বিজয়ের ফলে মুসলমানরা রোমান দরবার ও সমাজের বিলাসিতা ও শান-শওকত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে অনাচার বৃদ্ধি পায়। পাপ-পঙ্কিলতা মুসলিম সমাজের জীবনীশক্তি বিনষ্ট করে ফেলে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন খলিফার সময় সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিসর মুসলমানদের দখলে আসে?
২. কোন সেনাপতি দামাস্কাস বিজয় করেন?
৩. ইয়ারমুকের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
৪. মুসলমানরা কার নেতৃত্বে প্যালেস্টাইন দখল করে?
৫. জেরুজালেমের খ্রিষ্টানদের সাথে সন্ধি স্বাক্ষর করেন কে?
৬. মিসর বিজয় করে সেনাপতি আমর ইবনুল আস কোন নগরী গড়ে তোলেন?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে মুসলমানদের খিলাফত সম্প্রসারণের কারণ ছক আকারে লেখো।
২. হযরত ওমর (রা) এবং বাইজান্টাইনদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

'হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতকালেই ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে'— দুটি দলে ভাগ হয়ে বক্তব্যটির পক্ষে পাঁচটি করে যুক্তি দাও।

---

[১৯] The military campaigns of Khalid-ibn-Walid and Amr ibn-al-As which ensued in al Iraq, Persia, Syria and Egypt are among the most brilliantly, executed in the history of warfare and bear favourable comparison with those of Napoleon, Harnibal or Alexander. –Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs,* P.142

পাঠ ৯

ইসলামের সেবায় সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদের অবদান
The Contribution of Fighter Khaled Ibn Oyalid Serve in Islam

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ বিশ্বের ইতিহাসে অপরাজেয় বীরদের একজন হিসেবে খ্যাত। তিনি মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ এ সেনাপতি ষষ্ঠ হিজরি পর্যন্ত মহানবি (স)-এর ঘোর শত্রু ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে (৬২৫ খ্রি.) তিনি কুরাইশদের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এ যুদ্ধে মুসলমানরা প্রথম দিকে জিততে থাকলেও শেষ পর্যন্ত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের অসাধারণ রণনৈপুণ্যের কাছে পরাজিত হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধি (৬২৮ খ্রি.) স্বাক্ষরিত হবার পর খালিদ ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের সেবায় তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। যেমন—

রাসুল (স)-এর সময়: মুসলমান হওয়ার পর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ নিজেকে একনিষ্ঠভাবে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেন। ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে রোমানদের সাথে সংঘটিত মুতার যুদ্ধে কয়েকজন মুসলিম সেনাপতির মৃত্যুর পর তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। খালিদ এ যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে মুসলমানদের বিজয় ছিনিয়ে আনেন। বিজয়ী খালিদ মদিনায় ফিরে গেলে রাসুলুল্লাহ (স) তাকে 'সাইফুল্লাহ' বা 'আল্লাহর তরবারি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মক্কা বিজয়ের সময় তার অবিশ্বাস্য বীরত্বে কুরাইশরা স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। রাসুল (স)-এর আদেশে খালিদ দেবী আল ওজ্জার মন্দির ধ্বংস করেন। তিনি ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে 'দুমাতুল জন্দলের' (সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি রাজ্য, বর্তমানে সৌদি আরবের অন্তর্ভুক্ত) রাজা উকাইদিরের বিরুদ্ধে সফলতার সাথে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিনা রক্তপাতে ইয়েমেন সীমান্তবর্তী নাজরান অঞ্চলের হারিস গোত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।

খলিফা আবু বকর (রা)-এর সময়: আবু বকর (রা)-এর শাসনকালে (৬৩২-৬৩৪খ্রি.) ভণ্ড নবি ও স্বধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ ইসলাম তথা নবীন মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। প্রধানত খালিদের অসীম বীরত্বের কারণেই এ বিদ্রোহ দমন করে নব্য মুসলিম রাষ্ট্রকে রক্ষা সম্ভব হয়। ভণ্ড নবি তোলায়হাকে তিনি বুঝাখারের যুদ্ধে পরাজিত করেন। তার অভিযানের কারণেই আরবের অন্যতম প্রভাবশালী গোত্র বনি তামিমের সব উপগোত্র মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে। এরপর খালিদ ইয়ামামার যুদ্ধে (৬৩৩ খ্রি.) ভণ্ড নবি মুসায়লামাকে পরাজিত ও নিহত করেন। ঐতিহাসিক ভন ক্রেমার বলেছেন, "খালিদের সাহস এবং আবু বকরের (রা) বিজ্ঞতা না থাকলে সেদিন (রিদ্দা যুদ্ধে) ইসলামের শত্রুরা জয়লাভ করত।"

৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে খালিদ উইলিসের যুদ্ধে পারসিকদের পরাজিত করে হিরা দখল করেন। আবু বকর (রা) তাকে সেখান থেকে বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়া পাঠান। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে আজনাদাইনের যুদ্ধে রোমানরা শোচনীয়ভাবে খালিদের বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এরপর তিনি দামেস্ক, উরদুন, হিম্‌স্ প্রভৃতি স্থান দখল করেন।

খলিফা ওমর (রা)-এর সময়: হযরত ওমর (রা)-এর শাসনকালে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইয়ারমুকের যুদ্ধে খালিদ রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে সমগ্র সিরিয়া দখল করেন। এ যুদ্ধে সিরিয়ায় রোমানদের চূড়ান্ত পরাজয় হয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধে খালিদ যে দুঃসাহসিকতা, রণকৌশল ও শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেন তা অনেক ঐতিহাসিকের কাছে হ্যানিবল, সিজার, নেপোলিয়ন প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত বীরদের সাথে তুলনীয় বলে মনে হয়।

জেনে রাখো:

হ্যানিবল (Hannibal) (২৪৭-১৮৩/১৮২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) ছিলেন একজন কার্থেজ সেনাপতি। তিনি কার্থেজের পিউনিক বংশের লোক ছিলেন। তিনি প্রথম পিউনিক যুদ্ধে একজন নেতৃস্থানীয় কার্থেজীয় সেনাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে তিনি একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আইবেরিয়া থেকে পাইরেনিস হয়ে উত্তর ইতালির আল্পস এলাকায় এ্যালিফ্যান্টের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। হ্যানিবল প্রায় ১৫ বছর ইতালি দখল করে রাখেন। সেনাপতি হিসেবে তিনি ছিলেন সফল। যুদ্ধের সময় অসাধারণ যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে তিনি জয় ছিনিয়ে আনতেন। ইতালির জীবনে তিনি ট্রেবিয়া ট্রাসেমেনি এবং কানাই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তবে শেষ জীবনে হ্যানিবল রোমানদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে যান। পরবর্তী সময়ে রোমানরা বিশ্বাসঘাতকতা করলে হ্যানিবল বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

খলিফা ওমর (রা) খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে সিরিয়ার শাসনকর্তা করলে তিনি সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। সুশাসক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জীবনে কোনো যুদ্ধেই পরাজিত হননি। কিন্তু তার শেষ জীবন ছিল দুঃখময়। কিছু অভিযোগের কারণে হঠাৎ খলিফা ওমর (রা) তাকে প্রধান সেনাপতি এবং শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করেন। পদচ্যুতির কিছুদিন পরে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

পদচ্যুতির কারণ: যার অসাধারণ বীরত্বে মুসলমানরা ইসলামের প্রাথমিক যুদ্ধগুলোতে জয়লাভে সক্ষম হয়েছিল, ওমর (রা)-এর নির্দেশে তার পদচ্যুতি ইসলামের ইতিহাসের এক দুঃখজনক ঘটনা। ঐতিহাসিক ইবনুল আসিরের মতে, হযরত ওমর (রা) খালিদকে নির্দয়ভাবে পদচ্যুত করেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে, ওমরের (রা) কঠোর ন্যায়পরায়ণতা খালিদের পতনের জন্য দায়ী। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তিনি খালিদের মতো একজন অপরাজেয় বীরকেও ক্ষমা করেননি। তার পদচ্যুতির কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

প্রথমত, খলিফা ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে খালিদের সেনাপতিত্বে পরিচালিত সব যুদ্ধের আয়-ব্যয়ের হিসাব তলব করলে তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে খলিফা অসন্তুষ্ট হন।

দ্বিতীয়ত, অষ্টাদশ হিজরিতে সিরিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলার সময় খালিদ জনৈক কবিকে তার বীরত্বের গাঁথা রচনার জন্য এক হাজার দিনার পুরস্কার দেন। খলিফা এর জন্য কৈফিয়ত তলব করলেও খালিদ তার জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানান। অবশ্য এ পুরস্কার তিনি কবিকে নিজের অর্থ থেকে দিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, গনিমত হিসেবে তখন খালিদের সম্পত্তির দাম ৬০,০০০ দিনার হওয়ার কথা। অথচ হিসাবে তার সম্পত্তির মোট মূল্য ৮০,০০০ দিনার হলে খলিফা তার কাছ থেকে ২০,০০০ দিনার মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

চতুর্থত, খালিদের ঔদ্ধত্য এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বেশি নিষ্ঠুরতা খলিফা ওমর (রা) মোটেই পছন্দ করতেন না।

পঞ্চমত, রিদ্দা যুদ্ধের সময় ইয়ারবু গোত্রের দলপতি মালিক ইবনে নোয়াবার বিদ্রোহী হলে খালিদ তার বিরুদ্ধে অভিযান চালান। মালিক পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকারে রাজি হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে সে আবার বিদ্রোহী হতে পারে এই আশঙ্কায় খালিদ তাকে হত্যা করেন। তিনি মালিকের বিধবা সুন্দরী স্ত্রী লায়লাকে বিয়েও করেন। এতে খলিফা ওমর (রা) খুবই রেগে যান।

সর্বোপরি, খালিদের জনপ্রিয়তা, অপ্রতিহত শৌর্য-বীর্যের জন্য মুসলমানরা তাকে অপরাজেয় ভেবে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করতে শুরু করে। অনেকে মনে করতে থাকে, রণাঙ্গনে ইসলামের বিজয়গুলো আল্লাহর অনুগ্রহের চেয়ে বরং খালিদের বাহুবলের জন্যই সম্ভব হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের বিজয় ও গৌরব বৃদ্ধি যে আল্লাহর আনুকূল্যের কারণেই সম্ভব হচ্ছে তা প্রমাণ করার লক্ষ্যেই খলিফা খালিদকে পদচ্যুত করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিখ্যাত বীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?
২. কোন যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন?
৩. খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কখন ইসলাম গ্রহণ করেন?
৪. মহানবি (স) খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে কী উপাধি দিয়েছিলেন?
৫. ইয়ামামার যুদ্ধে ভণ্ড নবি মুসায়লামাকে পরাজিত ও নিহত করেন কে?
৬. কোন যুদ্ধে খালিদ রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে সমগ্র সিরিয়া দখল করেন?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ইসলামের সেবায় খালিদ ইবনে ওয়ালিদের অবদানের একটি চার্ট তৈরি করো।
২. সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের পদচ্যুতির কারণগুলো ছক আকারে তুলে ধরো।

পাঠ ১০

হযরত ওমর (রা)-এর কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা
The Central Administration of Hazrat Umar (R)

হযরত আবু বকর (রা)-এর মাধ্যমে খেলাফতের যাত্রা শুরু হলেও হযরত ওমর (রা) ছিলেন ইসলামি শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিজিত অঞ্চলে বিরাজমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থার কথা চিন্তা করে প্রশাসনকে সুষ্ঠু, সুসংহত ও মানুষের কল্যাণের উপযোগী করে গড়ে তোলেন। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "ত্রিশ বছরের খিলাফত আমলে ওমরের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর রাষ্ট্রনীতি ও কৌশল প্রধানত তার থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল।"[২০] হযরত ওমর (রা) তাঁর দশ বছর শাসনকালে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সবার সমান সুযোগ সৃষ্টি ও সমমর্যাদা দান এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে হযরত ওমর (রা) সমগ্রবিশ্বে কল্যাণধর্মী শাসন ব্যবস্থার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। হযরত ওমর (রা)-এর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিভাগগুলো হলো—

মজলিশ-উস-শুরা: 'শুরা' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ 'পরামর্শ'। প্রাক-ইসলামি যুগের দারুন নাদওয়ায় বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদ-এর অনুকরণে রাসুল (স) এই পরামর্শ ব্যবস্থা চালু রাখেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়কালেও এ ব্যবস্থা চালু ছিল। হযরত ওমর (রা) এ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কারণ তিনি সবসময় বলতেন, 'পরামর্শ ছাড়া খিলাফত চলতে পারে না'। এ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জনগণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং স্বচ্ছভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রণাপরিষদ গঠন করেন, যা মজলিশে-শুরা বা মন্ত্রণাপরিষদ নামে পরিচিত। এটি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা:

ক. মজলিশ আল-খাস এবং
খ. মজলিশ আল-আম।

মজলিশ আল-খাস: মজলিশ আল-খাস ছিল উচ্চ পরিষদ। এটাকে Cabinet বলা হয়। এ পরিষদের সদস্য ছিলেন হযরত ওসমান (রা), হযরত আলি (রা), তালহা (রা), যুবায়ের (রা), আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবিরা। মদিনা মসজিদে এ মন্ত্রণাপরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হতো। মজলিশ আল-খাসের পরামর্শ ছাড়া ওমর (রা) কোনো কাজ সম্পাদন করতেন না। খলিফা মজলিশ আল-খাসের পরামর্শক্রমে প্রশাসনে কর্মচারী, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, বিচারক নিয়োগ দিতেন। এটি ছিল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি।

মজলিশ আল-আম: মজলিশ আল-আমের সদস্য ছিলেন প্রাদেশিক শাসক, মদিনার গণ্যমান্য ব্যক্তি, মুহাজির ও আনসাররা। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মজলিশ আল-আমের বৈঠক ডাকা হতো এবং সেখানে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো।

সামরিক বিভাগ: হযরত ওমর (রা) তার শাসনামলে একটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গঠন করেন। তিনি এ লক্ষ্যে সমগ্র সাম্রাজ্যকে নয়টি জুনদ বা সামরিক জেলায় (Military Districts) ভাগ করেন। জুনদগুলো হলো: ১. মক্কা, ২. মদিনা, ৩. কুফা, ৪. বসরা, ৫. ফুসতাত, ৬. মসুল, ৭. মিসর, ৮. দামেস্ক, ৯. হিমস ও প্যালেস্টাইন। প্রত্যেক ঘাঁটিতে ৪০০০ (চার হাজার) অশ্বসহ ৩৬০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকত।

---

[২০] During the thirty years that the republic lasted, the policy derived its character chiefly from Omar, both during his life time and after his death.–Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, P.57

সৈনিকদের শ্রেণিবিভাগ: সেনাবাহিনীতে প্রধানত পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ, বাহক, সেবক প্রভৃতি বিভাগ ছিল। সৈনিকেরা নিয়মিত ও অনিয়মিত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। নিয়মিত সৈন্যরা সেনা ছাউনিতে (ব্যারাক) অবস্থান করত এবং নিয়মিত বেতন পেত। অনিয়মিত সৈন্যরা প্রয়োজনে রাষ্ট্রের আহ্বানে যুদ্ধে যেত। তারা নিয়মিত বেতন পেত না। সেনাবাহিনীতে প্রতি দশজন সৈন্যের নেতৃত্বদানের জন্য একজন আমির উল আশরাফ, প্রতি দশজন আমির উল আশরাফের (একশতজন সৈন্য) ওপর একজন 'কায়েত' নিযুক্ত থাকত। প্রতি দশজন কায়েতের নেতৃত্বে থাকতেন একজন আমির। 'আহরা' নামে একটি সংস্থা সেনাবাহিনীর রসদ সংগ্রহ করত।

সৈনিকদের সুযোগ-সুবিধা: নিয়মিত সৈন্যদের বেতন ছিল আকর্ষণীয়। প্রথমদিকে তাদের বাৎসরিক ২০০ দিরহাম বেতন দেওয়া হতো। পরে তা ৩০০ দিরহামে উন্নীত করা হয়েছিল। বেতন ছাড়াও সৈনিকগণ গনিমতের অংশ, খাদ্য, বস্ত্র ও পারিবারিক ভাতা পেত। সর্ব সাকুল্যে একজন সৈন্য বছরে ৬০০০ এবং অফিসাররা ৭০০০-১০,০০০ দিরহাম বেতন হিসেবে পেতেন।

পুলিশ বা শান্তিরক্ষী বিভাগ: প্রজাসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দমন এবং সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত ওমর (রা) সর্বপ্রথম একটি সুসংগঠিত পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। এ বাহিনীর কাজ ছিল চুরি, ডাকাতি ও মাদকদ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করা, ওজন পরীক্ষা ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি। পুলিশ বাহিনীর প্রধান ছিলেন 'সাহিব-উল-আহদাস।' খলিফা ৪০০০ দিরহামের বিনিময়ে সাফওয়ান বিন উমাইয়ার বাড়ি ক্রয় করে সেটিকে কারাগার হিসেবে ব্যবহার করেন।

রাজস্ব বিভাগ: হযরত ওমর (রা)-এর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের একটি অন্যতম দফতর ছিল রাজস্ব বিভাগ। তিনি রাসুল (স) এবং হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়কার রাষ্ট্রীয় রাজস্বের উৎস যেমন– আল-গনিমত, আল-জাকাত, আল-উসর, আল-জিজিয়া, আল-খারাজ, আল-উশর, আল-ফাই, আল-হিসার মতো উৎসগুলোকে বজায় রাখেন। তিনি এসব উৎস থেকে আয়কৃত অর্থ বায়তুল মালের মাধ্যমে জনকল্যাণে ব্যয় করেন। ওমর (রা) এই রাজস্ব ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে 'দিওয়ান' গড়ে উঠেছিল।

বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা: বায়তুল মাল হলো ইসলামের অর্থ-সংক্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এটি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার সরকারি কোষাগার। বায়তুল মাল একটি আরবি পরিভাষা। এর অর্থ ধনসম্পদের ঘর। কিন্তু ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অর্থ তহবিল বা জাতীয় কোষাগারকে বায়তুল মাল বলা হয়। মূলত হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়ে বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠিত হলেও তার মৃত্যুর সময় এতে মাত্র এক দিরহাম সঞ্চিত ছিল। খলিফা ওমর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে ওয়ালিদ বিন হিশামের পরামর্শে আব্দুল্লাহ বিন আকরামকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে বায়তুল মালের সংস্কার ও পুনর্গঠন করেন। কেন্দ্রের আলোকে প্রদেশে বায়তুল মালের শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বায়তুল মাল ছিল প্রধানত তিন প্রকার।

ক. **বায়তুল মাল আল-খাস:** এটি ছিল শাসক ও অভিজাতদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এ অর্থকড়ি আল-ফাই এর আয়, জরিমানা প্রভৃতি থেকে আয় হতো এবং খলিফার পরিবারের ভরণপোষণ, ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহ, রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহসহ বিভিন্ন কাজে ব্যয় করা হতো।

খ. **বায়তুল মাল আল-আস:** এটি খিলাফতের রাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে পরিচিত ছিল। মুসলমান ও আহলে জিম্মার সম্পদ এখানে গচ্ছিত থাকত। জাকাত ছাড়া অন্য সব উৎসের আয় এখানে জমা হতো। এর কেন্দ্রীয় প্রধান ছিলেন 'সাহিব আল-মাখজুম' এবং প্রাদেশিক প্রধান ছিলেন 'খাজিন'।

গ. **বায়তুল মাল আল-মুসলেমিন:** ইসলামি রাষ্ট্রের তৃতীয় রাজকোষাগার ছিল বায়তুল মাল আল-মুসলেমিন। এস.এম. ইমামুদ্দিন বলেন, এটি ছিল সব মুসলমানের রাজ কোষাগার।[২১] বায়তুল মালের এ শাখা সমাজকল্যাণমূলক কাজ যেমন— রাস্তাঘাট, সেতু, মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ, এতিম ও দরিদ্রদের সাহায্যদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত। অধ্যাপক এম. এ. মান্নান বলেন, এটি থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সবাইকে সাহায্য প্রদান করা হতো।[২২] বায়তুল মালের এ শাখাটি মসজিদ-ই-জামিতে সংরক্ষণ করা হতো। প্রদেশে 'কাজি' (বিচারক) ছিলেন এর প্রধান এবং কেন্দ্রীয় স্তরে 'কাজি-উল-কুজ্জাত' ছিলেন প্রধান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামি শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?
২. মজলিশ-উস-শুরা বা মন্ত্রণাপরিষদ গঠন করেন কে?
৩. 'পরামর্শ ছাড়া খিলাফত চলতে পারে না'-এটি কার কথা? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
৪. হযরত ওমর (রা) তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়টি জুনদ বা সামরিক জেলায় ভাগ করেন?
৫. 'বায়তুল মাল' কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৬. বায়তুল মাল সংস্কার ও পুনর্গঠন করেন কে?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. হযরত ওমর (রা)-এর কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার নানা দিক ছক আকারে লেখো।
২. হযরত ওমর (রা)-এর সাম্রাজ্যকে যতগুলো সামরিক জেলা বা জুনদে বিভক্ত করা হয়েছে সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

হযরত ওমর (রা)-এর শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল— বিষয়টির ওপর বিতর্কের আয়োজন করো।

ঘ. বাড়ির কাজ

জনাব বাসিত এলাকার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ঘোষণা করলেন, আলোচনা ছাড়া পরিষদ চলতে পারে না। তাই তিনি গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করেন। তার এ কাজের সুফল এলাকার সবাই ভোগ করছে।

১. জনাব বাসিতের সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
২. উক্ত শাসকের সময়ে গণতন্ত্রের যে বিকাশ ঘটেছিল তা অর্জন করতে বিশ্বের আরও সময় লাগবে— উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো।

---

[২১] Ref: *Bayt-al-Mal and Banks in the Medieval Muslim World.*
[২২] Ref: M.A. Mannan, *Public Finance in Islam.*

পাঠ ১১

হযরত ওমর (রা)-এর প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা
The Provincial Administration of Hazrat Umar (R)

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য হযরত ওমর (রা) সমগ্র সাম্রাজ্যকে মোট ১৪টি প্রদেশে ভাগ করে প্রদেশগুলোতে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যেক প্রদেশকে আবার কতগুলো জেলায় ভাগ করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে ওয়ালি এবং জেলার শাসনকর্তাকে আমিল বলা হতো ।প্রদেশে বিচারের জন্য কাজি এবং কোষাগারের জন্য কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

শাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ: খলিফা ওমর (রা) খিলাফতে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করেন। তিনি সামরিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। যথা— মক্কা, মদিনা, আল-জাজিরা, সিরিয়া, কুফা, বসরা, মিসর, ফিলিস্তিন, ফারস, কিরমান, খোরাসান, মাকরান, সিজিস্তান ও আজারবাইজান। তিনি প্রশাসনিক সুবিধার্থে প্রদেশগুলোকে জেলায় এবং জেলাকে মহকুমায় বিভক্ত করেন।

প্রদেশ ও জেলার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ক্ষমতা: মজলিশে শুরার পরামর্শক্রমে ওমর (রা) প্রত্যেক প্রদেশে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ওয়ালি বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিতেন। ওয়ালিগণ শুধু প্রাদেশিক শাসনকর্তাই ছিলেন না, তারা ছিলেন সংশ্লিষ্ট প্রদেশের সর্বোচ্চ সামরিক, ধর্মীয় ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান। সুষ্ঠু শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে তিনি একজন কাতিব (প্রধান উপদেষ্টা), একজন কাতিব উদ-দিউয়ান (প্রধান সামরিক উপদেষ্টা), একজন সাহিব-উল-খারাজ (রাজস্ব উপদেষ্টা), একজন সাহিব-উল আহদাস (পুলিশ উপদেষ্টা), একজন সাহিব-উল-বায়তুল মাল (কোষাধ্যক্ষ), একজন কাজি বা বিচারক এবং আরো অনেক কর্মচারীর সহযোগিতা নিতেন। তবে কেন্দ্রের মতো প্রদেশের প্রত্যেক দফতরই স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করত। প্রদেশের আয়তন ও কার্যক্রম বিবেচনা করে ওয়ালিগণ প্রদেশকে কতকগুলো জেলায় বিভক্ত করতেন। এসব জেলার প্রশাসককে 'আল-আমিল' বলা হতো। বড় বড় জেলাকে আবার কতকগুলো মহকুমায় (Sub-Division) বিভক্ত করা হতো। ওয়ালি এবং আমিলগণ তাদের কাজের জন্য খলিফার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন। প্রতিবছর হজের মৌসুমে খলিফা তাদের কাছে প্রশাসনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ করতেন।

প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা: কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের মতোই প্রাদেশিক কর্মকর্তারা সরকারি নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। প্রশাসকগণ নিয়মিত বেতনসহ রেশন পেতেন। বেতনের পরিমাণও ছিল উচ্চ। ওয়ালিগণ বার্ষিক ৬০০ দিরহামসহ দৈনিক রেশন পেতেন। এছাড়া প্রাদেশিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রদেশ থেকে যে আয় হতো তা থেকে ব্যয় নির্বাহ করে বাকি অর্থ কেন্দ্রে জমা দিতেন। সমাজে ওয়ালি, আমিল, কাজি, কাতিব আল-দিওয়ান, সাহিব আল-বায়তুল মালের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ছিল। খলিফা ওমর (রা) ওয়ালি ও বিভিন্ন প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের শাসনকার্য পরিচালনা ও কর্তব্য পালনের জন্যে নিয়মিতভাবে পরামর্শ প্রদান করতেন। এরপরও যদি কোনো প্রাদেশিক কর্মকর্তা দুর্নীতির আশ্রয় নেয় তাহলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নানারকম শাস্তি প্রদান করতেন। দুর্নীতির অভিযোগে তিনি আবু হুরায়রা (রা) এবং আমর ইবনুল আস (রা)-কে পদচ্যুত ও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।

নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ: নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য রাসুল (স)-এর সময় থেকেই বিচার বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রতি প্রদেশে একজন করে কাজি নিযুক্ত করতেন। হযরত ওমরের (রা) সময় বিচার বিভাগ দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা, বিচারক নিয়োগ ও রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন করা হয়। বিচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কাজি বলা হতো। কেন্দ্রে খলিফা নিজেই প্রধান কাজি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজি নিয়োগ দেওয়া হতো। খলিফা ওমর (রা) কাজিদের উপযুক্ত বেতন দিতেন। কাজিদের দায়িত্ব ছিল বিবাদ নিষ্পত্তি করা, অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, ওয়াকফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করা, ওছিয়ত কার্যকর করা,

বিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা, নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করা, জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ সাধন, অধীনস্থদের ওপর কর্তৃত্ব রাখা এবং তাদের আচরণের ওপর লক্ষ রাখা। বিচারালয় হিসেবে মসজিদকে ব্যবহার করা হতো। বাদী ও বিবাদীকে আইনি পরামর্শ দেওয়ার জন্য খলিফা ওমর (রা) মুফতি বা আইন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন। বিচার করার ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা)-এর নির্দেশ ছিল— যেসব মুসলমানকে কোনো দিন শাস্তি দেওয়া হয়নি এবং যার সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি, কেবল তাদের সাক্ষ্যই গৃহীত হবে। ওয়ালি, আমিল, কাজি প্রমুখ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগের সময় তাদের বিষয়-সম্পত্তির তালিকা নেওয়া হতো। উৎকোচ (ঘুষ) গ্রহণের প্রমাণ পেলে তাদের বরখাস্ত করা হতো এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। বিচারের জন্য বিচারপ্রার্থীর কোনো প্রকার ফি লাগত না।

জনহিতকর কাজ: হযরত ওমর (রা) জনহিতকর কাজের জন্য কোনো বিভাগ গঠন না করলেও বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব আয় থেকে জনকল্যাণে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রভৃতি জেলায়, প্রদেশে, মহকুমায় রাস্তা-ঘাট, সেতু, নালা, মসজিদ, মাদ্রাসাসহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট নালা ছাড়াও পানি সরবরাহ ও নৌচলাচলের জন্য বড় খাল খনন করা হয়। দজলা নদী থেকে 'নাহরুল মাকীম' লোহিত সাগর ও নীল নদের যোগযোগকারী 'নাহরু-আমিরুল মুমেনিন' বসরায় 'নাহরু আবু মুসা' প্রভৃতি খাল পানি সরবরাহ ও নৌপরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হতো। দজলা ও ফোরাত থেকে অনেক খাল খনন করে পতিত জমি আবাদযোগ্য করা হয়। হযরত ওমর (রা)-এর সময়েই সেনাপতি আমর ইবনুল আস সুয়েজ খাল খনন করে লোহিত ও ভূমধ্যসাগরে নৌচলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করেন। হযরত ওমর (রা) কুফা, বসরা, ফুসতাত, মসুল প্রভৃতি নগরীর গোড়াপত্তন করেন। তিনি বাঁধ ও খাল পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মচারীও নিয়োগ দেন। খিলাফতের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, আইন-কানুন বাস্তবায়ন, মানুষের অভাব জানার জন্য খলিফা নিজে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। হজের সময় সাধারণ মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীর বিরুদ্ধে খলিফার কাছে অভিযোগ করার সুযোগ পেত। জনসাধারণের কল্যাণই ছিল হযরত ওমর (রা)-এর প্রবর্তিত শাসনের মূল লক্ষ্য।

হযরত ওমর (রা) সর্বদা প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের কাজের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। হযরত ওমর (রা)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ সময় কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি শক্তিশালী প্রাদেশিক শাসন কাঠামো গড়ে উঠেছিল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত ওমর (রা) তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়টি প্রদেশে ভাগ করেন? */ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০১৬/*

২. হযরত ওমর (রা)-এর প্রদেশের শাসনকর্তাকে কী বলা হতো?

৩. সর্বপ্রথম কে স্বাধীন বিচার বিভাগ গড়ে তোলেন?

৪. কেন্দ্রে প্রধান কাজি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন কে?

৫. কার সময়ে সুয়েজ খাল খনন করা হয়?

৬. হযরত ওমর (রা)-এর প্রবর্তিত শাসনের মূল লক্ষ্য কী ছিল?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত যতগুলো প্রদেশে বিভক্ত ছিল তার একটি তালিকা তৈরি করো।

২. হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের পদবি ও কাজের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১২

হযরত ওমর (রা)-এর দিউয়ান ও রাজস্ব প্রশাসন
Diwan and Revenue Administration of Hazrat Umar (R)

হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে খিলাফতের সীমানা পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হলে ওই অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ রাজস্ব হিসেবে কেন্দ্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মালে জমা হতে থাকে। খলিফা এ অর্থ দিয়ে প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতেন। হযরত ওমর (রা)-এর গঠিত দিউয়ান-উল-খারাজ বিভাগটি এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

দিউয়ান-উল-খারাজ প্রতিষ্ঠা: 'খারাজ' আরবি শব্দ। এ শব্দটি গ্রিক Khoregin শব্দ থেকে সিরীয় ভাষার মাধ্যমে আরবি ভাষায় এসেছে। এর অর্থ যা বের হয়ে গেছে। যেহেতু জমির কর ভূমির মূল উৎপাদন থেকে বের হয়ে যায় তাই একে খারাজ বলে। হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে বিজিত এলাকাগুলোতে ভূমিকর হিসেবে প্রাপ্ত খারাজের হিসাব-নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'দিউয়ান-উল-খারাজ' বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বিভাগের কাজ ছিল খারাজের খাত থেকে আয়কৃত অর্থের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং দাপ্তরিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ মুসলিমদের মধ্যে মাঝে বণ্টন। এ লক্ষ্যে হযরত ওমর (রা) প্রথম আদমশুমারি বা লোক গণনা ব্যবস্থা করেন এবং একটি তালিকা প্রণয়ন করে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

রাজস্বের উৎসসমূহ

জাকাত: জাকাত ইসলামি অর্থনীতির প্রধান উৎস। এটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মুসলমানদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক কর। নিসাব পরিমাণ সম্পদ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির কাছে যদি নিজের পরিবারের ব্যয় নির্বাহের পর বছরান্তে কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা তার সমপরিমাণ অর্থ থাকে, তবে উক্ত সম্পদের ২.৫% হারে আল্লাহর নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে জাকাত বলে। পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ৬০ নম্বর আয়াতে জাকাতের এ আটটি খাতের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো— ১. অভাবগ্রস্ত বা ফকির, ২. সম্বলহীন বা মিসকিন, ৩. যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, ৪. মন জয় করার উদ্দেশ্যে, ৫. মুক্তিকামী দাস, ৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, ৭. আল্লাহর পথে এবং ৮. মুসাফির বা অসহায় পথিক। রাসুল (স)-এর সময় যেভাবে জাকাত আদায় হতো খলিফা ওমর (রা) সেভাবেই আদায় করতেন। তবে তার আমলে ঘোড়ার ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় তিনি এর ওপর জাকাত ধার্য করেন।

জিজিয়া: জিজিয়া হলো মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম প্রজাদের ওপর নির্ধারিত একটি নিরাপত্তামূলক কর। মহানবি (স)-এর সময়ে এ করের পরিমাণ ছিল মাথাপিছু বার্ষিক এক দিনার। তিনি প্রত্যেক সামর্থ্যবান অমুসলিমের ওপর এ কর ধার্য করেছিলেন। খলিফা ওমর (রা) রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এ খাত সংস্কার করেন। তিনি পারসিক ও রোমানদের আর্থিক সচ্ছলতার কথা বিবেচনা জিজিয়ার পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করেন। প্রত্যেক ধনীর ওপর চার দিনার, মধ্যবিত্তদের ওপর দুই দিনার এবং নিম্নবিত্তদের ওপর এক দিনার জিজিয়া আরোপ করা হয়। গরিব, শিশু, নারী, বিকলাঙ্গ এবং অসামর্থ্যবান পুরুষের কাছ থেকে এ কর আদায় করা হতো না। রাষ্ট্র কোনো জিম্মি বা অমুসলিম প্রজাদের নিরাপত্তাদানে ব্যর্থ হলে জিজিয়ার অর্থ ফেরত দেওয়া হতো।

গনিমত: যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের কাছে থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে গনিমত বলা হয়। পরাজিত সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, খাদ্যশস্য, পোশাক, দাস-দাসী, স্বর্ণ-রৌপ্য, পশু প্রভৃতি গনিমতের অন্তর্ভুক্ত। এসব সম্পদের পাঁচ ভাগের চারভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো। অবশিষ্ট পাঁচ ভাগের এক ভাগ বায়তুল মালে জমা রাখা হতো। এই অংশকে বলা হয় 'আল-খুমস'। খুমুসের তিন ভাগের এক ভাগ মহানবি (স)-এর পরিবারবর্গকে দেওয়া হতো। খলিফা ওমর (রা) এ নিয়ম রদবদল করে মহানবি (স)-এর পরিবারের অংশটুকু দিয়ে সৈন্যদের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করার নির্দেশ দেন।

উশর: উশর হলো মুসলমানদের দেওয়া ভূমি রাজস্ব। এ ভূমি রাজস্ব দুই পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। যথা—ক. বৃষ্টির পানির মাধ্যমে ভূমি চাষাবাদ হলে উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ এবং খ. সেচের পানির মাধ্যমে চাষাবাদ করলে উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ উশর হিসেবে আদায় করা হতো।

উশুর: উশুর হলো বাণিজ্য শুল্ক বা কর। খলিফা ওমর (রা) সর্বপ্রথম বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিদেশি বণিকেরা কোনো প্রকার বাণিজ্য কর দিত না। কিন্তু যেসব মুসলিম ব্যবসায়ী পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সাথে বাণিজ্য করত তাদেরকে পণ্যদ্রব্যের ওপর শতকরা দশ ভাগের এক ভাগ কর দিতে হতো। খলিফা ওমর এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে মুসলমান বণিকদের ওপর ২.৫%, জিম্মি (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম প্রজা) বণিকদের ওপর ৫% এবং বিদেশি বণিকদের ওপর ১০% শুল্ক আরোপ করেন।

আল-ফাই: আল-ফাই হলো রাষ্ট্রের মালিকানাধীন খাস ভূমি। দেশ বিজয়ের পর যেসব পলাতক শত্রুর ভূমি, বিদ্রোহীদের বাজেয়াপ্ত করা জমি, বনভূমি, গোচারণক্ষেত্র, বেওয়ারিশ জমি পাওয়া যেত সেগুলো সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন না করে সরকারের দখলে নেওয়া হতো। এসব ভূ-সম্পদ আল-ফাই হিসেবে পরিচিত ছিল। এসব ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের অর্থ রাষ্ট্র পেত।

আল-হিমা: আল হিমা হলো পশুচারণ ক্ষেত্রে আরোপিত কর। খলিফা ওমর (রা) চারণভূমি হিসেবে বিশাল এলাকা উন্মুক্ত করে দেন। এ রাষ্ট্রীয় চারণভূমিতে পশুচারণের জন্য কর আরোপ করা হয়।

খারাজ: ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম প্রজা বা জিম্মিদের চাষাবাদের জমিকে বলা হয় খারাজি ভূমি। আর খলিফা বা ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক এই ভূমির ওপর যে কর আদায় করেন তাকে বলা হয় 'খারাজ'। এস.এম. ইমামুদ্দিন বলেন, খারাজ হচ্ছে সেই ভূমিকর যা অমুসলিমদের কাছ থেকে আদায় করা হয়।[২৩] মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময় রাজস্ব আদায়ের অন্যতম উৎস ছিল খারাজ। ভূমিরাজস্ব বিভাগের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য ওমর (রা) 'দিউয়ান উল-খারাজ' নামে গঠিত নতুন রাজস্ব বিভাগ রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করত। সুষ্ঠুভাবে খারাজ আদায়ের জন্য খলিফা ওমর ৩০ হাজার বর্গমাইল এলাকায় ৩৬,০০,০০০ জারিব আবাদি ভূমি রেকর্ড করেন। (ঐতিহাসিক বালাজুরির মতে, ১ জারিব = ৩৬৮০ বর্গগজ, লেভির মতে, ৬০×৬০ = ৩৬০০ বর্গফুট)। তিনি ভূমির উৎপাদন শক্তির ওপর ভিত্তি করে খারাজের হার নির্ধারণ করেন।

দিউয়ান-এর ব্যয়ের খাত: রাষ্ট্রের আয়ের বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত রাজস্বগুলো হযরত ওমর (রা) দিওয়ানের মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে ব্যয়ের সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করেছিলেন। দিউয়ানের ব্যয়ের খাতগুলো হচ্ছে— ১. গরিব, দুঃখী, আদায়কারী, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্তের ঋণমোচন, আল্লাহর পথের পথিক এবং মুসাফিরদের সাহায্যদান, ২. অসামরিক খাতের ব্যয়ভার নির্বাহ, ৩. সামরিক বিভাগের ব্যয়ভার নির্বাহ, ৪. অনাথ, বেওয়ারিশ শিশুর লালন-পালন, ৫. দুস্থদের ভাতা প্রদান এবং ৬. বিভিন্ন জনহিতকর কাজ সম্পাদন।

ভাতার তালিকা প্রস্তুতকরণ: হযরত ওমর (রা)-এর সময় দিউয়ান-উল-খারাজ বিভাগ একটি ভাতাভোগী তালিকা প্রস্তুত করে। এ তালিকা তৈরি করার জন্য আদমশুমারি পরিচালনা করা হয়। সামরিক ও বেসামরিক খাতে রাজকর্মচারীদের বেতন এবং জনহিতকর কাজে ব্যয় করার পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকত তা সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো। দিউয়ানের মাধ্যমে এ বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এম আই মুসা বলেন, 'Umar established the Diwan for persons and department the amounts to be distributed to the recipients according to their descent seniority in Islam or relationship to the Prophet'.[২৪]

প্রত্যেক মুসলমানের ভাতার পরিমাণ তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করত। যথা: ক. মহানবি (স)-এর আত্মীয়স্বজন, খ. ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমান এবং গ. ইসলামের সাহায্যকারী। হযরত ওমর (রা)-এর সময়ে দিউয়ানের মাধ্যমে প্রদত্ত ভাতার একটি তালিকা নিম্নরূপ:

ভাতাভোগী শ্রেণি	ভাতার পরিমাণ
১. মুহাজির ও আনসার (যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন)	৫,০০০ দিরহাম
২. মুহাজির ও আনসার (যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি)	৪,০০০ দিরহাম
৩. রাসুলের (স) স্ত্রী (বিবি আয়েশা ব্যতীত)	১০,০০০ দিরহাম

---

[২৩] The Kharaj was the land tax collected from non-Muslims. Ref: S.M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims*, P.245

[২৪] Ref: M. I. Moosa, *The Diwan of Umar Ibn al Kattab in Islam*, Vol-11, 1965, P.68

ভাতাভোগী শ্রেণি	ভাতার পরিমাণ
৪. হযরত আয়েশা (রা)	১২,০০০ দিরহাম
৫. মুহাজির ও আনসারদের পুত্র	২,০০০ দিরহাম
৬. মুহাজির ও আনসারদের স্ত্রী	২০০-৬০০ দিরহাম
৭. রাসুলের (স) চাচা আব্বাস	১০,০০০ দিরহাম
৮. হাসান ও হুসেইন	৫,০০০ দিরহাম
৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর	৩,০০০ দিরহাম
১০. মক্কার অধিবাসী	৮০০ দিরহাম
১১. মদিনার অধিবাসী	৩০০-৫০০ দিরহাম
১২. গভর্নর	৬০০ দিরহাম
১৩. শিশু (বালেগ হওয়া পর্যন্ত)	১০০ দিরহাম

বাৎসরিক এ ভাতার সাথে প্রত্যেকে প্রতি মাসে ২ জারিব শস্য পেত। আল মাওয়াদীর (*আল আহকামুস সুলতানীয়া*) মতে, "হযরত ওমর (রা) আরব ও অনারব সকলের ক্ষেত্রে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন।" ঐতিহাসিক ডব্লিউ মুর বলেন, "ওমরের ভাতা ব্যবস্থা ছিল জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনী যা সম্ভবত তৎকালীন বিশ্বে কোথাও ছিল না।"[২৫]

ভূমি জরিপের ব্যবস্থা: খলিফা ওমর (রা) বিজিত এলাকায় ভূমি জরিপ করে জমির উর্বরা শক্তির ওপর ভিত্তি করে কর নির্ধারণ করেন। শুধু ইরাকেই চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ ছিল ৩৬,০০,০০,০০০ জারিব (লোহার বলয় দ্বারা বেষ্টিত শক্ত দণ্ড; যা দিয়ে জমি মাপা হতো)। প্রতি জারিব জমিতে বাৎসরিক কর নির্ধারিত হতো গমে ২ দিরহাম, বার্লি ১, আখ ৬, তুলা ৫, আঙুর ১০, খেজুর ১০ ও তিল জাতীয় দ্রব্য ৮ দিরহাম।

ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেন, "আরব জাতির মতো ভ্রাতৃত্ব, সমতার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ রাজস্ব, গনিমত এবং বিজিত স্থানসমূহের বণ্টনপ্রথা সম্ভবত বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন।"[২৬]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'দিউয়ান-উল-খারাজ' বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন কে?
২. মুসলিম রাষ্ট্রে প্রথম আদমশুমারি বা লোক গণনা ব্যবস্থা চালু করেন কে? */সকল বোর্ড ২০১৯/*
৩. মহান আল্লাহ জাকাতের কয়টি খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন?
৪. মহানবি (স)-এর সময়ে বার্ষিক জিজিয়া করের পরিমাণ কত ছিল?
৫. মুসলমানদের দেওয়া ভূমি রাজস্বকে কী বলা হয়?
৬. সর্বপ্রথম কে উশুর বা বাণিজ্যিক শুল্ক ধার্য করেন?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. হযরত ওমর (রা)-এর সময়ে যেসব উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।
২. হযরত ওমর (রা)-এর রাজস্ব ব্যবস্থায় জিজিয়া ও খারাজ আদায়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।

---

[২৫] The pension system of Umar in a spectacle probably without parallel in the world. –Ref: W. Muir, *The Caliphate*

[২৬] A people dividing amongest them the whole revenues, spoils and conquests of the state on the basis of an equal, brotherhood, is a spectacle probably without parallel in the world. –Ref: W. Muir, *The Caliphate, Its Rise Dectline and fall*

পাঠ ১৩

হযরত ওমর (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
Character and Achievements of Hazrat Umar (R)

চরিত্র

উত্তম আদর্শ: খলিফা ওমর (রা) ছিলেন সুমহান আদর্শের অধিকারী। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব উচ্চ প্রশংসিত। তিনি ছিলেন ত্যাগী, নির্লোভ, বিনয়ী ও ন্যায়পরায়ণ। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'অদম্য কর্মস্পৃহা ও চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ওমর (রা) ছিলেন তীক্ষ্ণ নীতিজ্ঞান এবং সূক্ষ্ম বিচারবোধ সম্পন্ন।'[২৭]

কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ: হযরত ওমর (রা)-এর চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বজ্রকঠোর। মহানবি (স) বলেছেন, 'আল্লাহর কাজে ওমর যত শক্ত ও কঠোর আমার উম্মতের মধ্যে তেমন আর কেউ নেই।' অপরদিকে সাম্রাজ্যের গরিব-দুঃখী প্রজাদের প্রতি তার হৃদয় করুণায় বিগলিত হতো। সাধারণ মানুষের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য ওমর (রা) গভীর রাতে ছদ্মবেশে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন এবং অসহায় মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করতেন। তার মহানুভবতা নিয়ে অনেক কাহিনি রয়েছে।

সরলতা ও অনাড়ম্বরতা: খলিফা ওমর (রা) সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক হয়েও তিনি কখনো ভোগ-বিলাসে মত্ত হননি। একজন সাধারণ প্রজার মতো বায়তুল মাল থেকে ওমর (রা) দৈনিক মাত্র দুই দিরহাম পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। তার পোশাক ছিল বহু খুব সাধারণ এবং তালিবিশিষ্ট। বিশ্বের রাজা-বাদশারা সাধারণত নিজেদের নিরাপত্তার জন্য প্রহরী বা দেহরক্ষী রাখেন। কিন্তু খলিফা ওমর (রা)-এর কোনো নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। তিনি সামান্য রুটি বা খেজুর আহার করতেন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, তিনি অনাড়ম্বর, নীতিবান ও মিতব্যয়ী ছিলেন এবং সব সময় সাধারণ প্রজারা তার সাথে যোগাযোগ করতে পারত।

ন্যায়বিচারক: ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় খলিফা ওমর (রা) ছিলেন আপসহীন। তার কাছে মুসলিম-অমুসলিম, ধনী-দরিদ্র, আপন-পর সবাই ছিল আইনের চোখে সমান। বিচারে ওমর (রা)-এর পুত্র আবু শাহমা মদপানের অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলে আইন অনুসারে তিনি নিজ হাতে তাকে দোররা (লাঠি বা চাবুকজাতীয় কোনো কিছু দিয়ে আঘাত) মারেন। ফলে সে মারা যায়। খলিফা নিজে ভুল করলে আল্লাহ ও মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতেন। সামান্য অপরাধে তিনি দিগ্বিজয়ী সেনানায়ক খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করে সামান্য সৈনিকের পদে নামিয়ে আনেন। তার সম্পর্কে উইলিয়াম মুর বলেন, 'ওমরের জীবনচরিত অল্প কথায়ই আঁকা যায়; সরলতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা তার জীবনাদর্শ ছিল এবং নিরপেক্ষতা ও একাগ্রতা ছিল তার শাসনের মূলনীতি।'[২৮]

অমুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল: খলিফা ওমর (রা) ছিলেন অমুসলিম প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তার শাসনামলে অমুসলিম সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারত। তাদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তাও তিনি দিয়েছিলেন। পরবর্তী খলিফারা যাতে সব জিম্মির প্রতি সম্মান দেখান তিনি সে উপদেশ দিয়ে যান।

আল্লাহভীতি: আল্লাহভীতি ছিল হযরত ওমর (রা)-এর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি সারারাত আল্লাহর ইবাদত করতেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'ঊর্ধ্বলোক থেকে যদি ঘোষিত হয় দুনিয়ার একজন ছাড়া সবাই জান্নাতবাসী হবে, তখনও এ আশঙ্কা আমাকে কাতর ও আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখবে যে, হয়তো সে হতভাগ্য ব্যক্তি আমিই হব।'

অসাধারণ পাণ্ডিত্য: বাল্যকাল থেকেই হযরত ওমর (রা) মেধাবী ও বাগ্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় এক হাজার ফিকাহ (সমস্যা) সংক্রান্ত মাসআলা (সমাধান) সম্পর্কে যা বলেছেন, পরবর্তী সময়ে ফকিহরা (আইন বিশেষজ্ঞ) তা সমর্থন করেছেন। তার বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মহানবি (স) একদা বলেছিলেন, তাঁর পর কেউ নবি হলে সে পদ ছিল একমাত্র ওমরের প্রাপ্য।

---

[২৭] He was a man of strong moral fibre and a keen sense of justice possessed a great energy and force of character. –Ref: Syed Ameer Ali, A *Short History of the Sarecens*, P.27

[২৮] Umar's life requires but a few lines to sketch: Simplicity and duty were the guiding principles in his life, impartiality and devotion the leading features of his administration. –Ref: W. Muir, *The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall*

আদর্শ খলিফা ও প্রকৃত মানুষ: হযরত ওমর (রা)-এর মতো সুযোগ্য শাসক বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। তিনি রাতের বেলা প্রজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তা দূর করার চেষ্টা করেছেন। আবার কঠোরভাবে অন্যায়কেও দমন করেছেন। এরূপ বৈশিষ্ট্য ওমর (রা)-কে একজন আদর্শ খলিফা ও প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছে। তিনি তার অসাধারণ প্রশাসনিক ও সামরিক দক্ষতাবলে খিলাফতের সীমানা বৃদ্ধি করেছেন। পাশাপাশি সুদক্ষ প্রশাসন গড়ে তুলে নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাম্রাজ্যের অবস্থানকে সুসংহত করেছেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি যথার্থই বলেছেন, 'একজন খলিফার যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন সেগুলো সবই ওমরের মধ্যে ছিল। তার নিষ্কলুষ চরিত্র সব ধর্মভীরু উত্তরাধিকারীর জন্য ছিল আদর্শস্বরূপ।'[২৯]

কৃতিত্ব

ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন: মহানবি (স) আরবে যে ইসলামি সাধারণতন্ত্রের সূচনা করেছিলেন হযরত ওমর (রা) সেটিকে একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। তার দশ বছরের শাসনামলে মুসলমানরা অসাধারণ রণনৈপুণ্য এবং যোগ্যতায় পরাক্রমশালী রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করেন। তার আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা পারস্য, সিরিয়া ও মিসর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। *ক্যাম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম* গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'আবু বকরের সময়কার বিজয় অভিযানের ফল হিসেবে তা ওমরের সময়ে চলমান ও আরও বিস্তৃত হয়।'[৩০]

আরব জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি: কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠী নিজ ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্যগত যে চেতনা লালন করে সেটাই হলো জাতীয়তাবাদ। হযরত ওমর (রা) পুরোপুরিভাবে এ চেতনার ধারক ছিলেন। তিনি শতধাবিভক্ত আরববাসীকে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তিনি আরববাসীকে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। আরবদের মধ্যেও মুসলিম জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পারস্য, ইয়েমেন, মিসর, বাইজান্টাইন, প্যালেস্টাইন, আর্মেনিয়া, উত্তর মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি রাজ্য জয় করে তিনি ইসলামের গৌরব ও সংহতি বৃদ্ধি করেন। তিনি মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত করার উদ্যোগ নেন। মজলিসে শুরা গঠন, দিওয়ান প্রতিষ্ঠা, বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা এবং নানা গঠনমূলক পরিবর্তন সাধন করে তিনি আরব জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সুসংহত করেন। তিনি মনে করেন, আরব মুসলমানরা ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জাতি। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব, সামরিক প্রাধান্য, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, আভিজাত্য ও বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং অসৎ আচরণের কারণে তিনি আরবে বসবাসরত ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের আরবের বাইরে অবস্থানের নির্দেশ দেন। এজন্য তাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। বিজিত অঞ্চলে জমি ক্রয় বা চাষাবাদ থেকে মুসলমানদের বিরত থাকতে বলেন। তিনি আরবি ভাষার সংস্কার সাধন করেন। তিনি আরব উপদ্বীপকে শুধু আরব মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ করে আরব জাতীয়তাবাদ গঠনে ভূমিকা রাখেন।

সামরিক বিচক্ষণতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা: খলিফা ওমর (রা)-এর মহাবিজয়গুলোর পশ্চাতে ছিল তার অসাধারণ সামরিক দক্ষতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা। তিনি অপূর্ব রণকৌশলে উচ্ছৃঙ্খল বেদুইনদের ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে নিয়োজিত করতে সক্ষম হন। এছাড়া খলিফা ওমর (রা) আরবদের একটি সুশৃঙ্খল সামরিক জাতি হিসেবে গড়ে তোলেন। সৈনিকদের আভিজাত্য সংরক্ষণ ও মান উন্নয়নে তিনি বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর সামরিক নীতি সর্বযুগে প্রশংসা অর্জন করে।

শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ: খলিফা ওমর (রা) সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করেন। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে, প্রত্যেক প্রদেশকে জেলায় এবং জেলাকে মহকুমায় বিভক্ত করেন। তিনি রাজস্ব ও সামরিক বিভাগকে গভর্নরের এখতিয়ার থেকে পৃথক করে দেন। তিনিই বিশ্বের প্রথম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করেন।

গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক: খলিফা ওমর (রা) ছিলেন সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রমনা। তার প্রতিষ্ঠিত 'মজলিশ-উস-শুরা' বা উপদেষ্টা পরিষদ আজও বিশ্ব গণতন্ত্রের জয়গান করছে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, পরামর্শ ছাড়া কোনো খিলাফত চলতে পারে না। তাঁর মতে, গণতন্ত্র ছাড়া কোনো রাষ্ট্র চলা উচিত নয়। বস্তুত মহানবি (স) মদিনায় গণতন্ত্রের যে বীজ বপন করেন, তা হযরত ওমর (রা)-এর ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রী নীতিতে এক শক্তিশালী মহীরূহে পরিণত হয়েছিল।

---

[২৯] As the personification of all the virtues a caliph ought to possess. His irreproachable character became an exemplar for all conscientious successors to follow. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs,* p.175

[৩০] As a result of the conquests begun under Abu Bakr and continued under Umar the empire increased enormously in extent. –Ref: *Cambridge History of Islam,* Edi by. P.M. Holt & Bernard Lewis, Vol-IA, p.64

বায়তুল মাল পুনর্গঠন: বায়তুল মাল পুনর্গঠন ছিল খলিফা ওমর (রা)-এর এক অক্ষয়কীর্তি। ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার লাভের ফলে যখন আয় বৃদ্ধি পায় তখন তিনি হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রতিষ্ঠিত বায়তুল মাল বা সরকারি কোষাগারের ব্যাপক সংস্কার করেন।

আদমশুমারি প্রবর্তন: খলিফা ওমর (রা) দুর্বল, অসহায় এবং খোঁড়া, বেকার, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অনাথ প্রমুখের অভাব দূর করার জন্য সরকারি ভাতার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য তিনি বিশ্বে প্রথম আদমশুমারির প্রচলন করেন। এ জন্য ঐতিহাসিক ডব্লিউ মুর বলেন, ‘ওমর (রা)-এর প্রবর্তিত ভাতাভোগীদের বৃত্তি তালিকা সম্ভবত দুনিয়ার বুকে তুলনাহীন।’[৩১]

সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা: খলিফা ওমর (রা) সামাজিক সাম্য ও মানবিক মূল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি মহানবি (স)-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র ইসলামি রাজ্যে দাসত্ব প্রথার বিলোপ সাধন করেন। তিনি তাঁর শাসনব্যবস্থা ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। এ জন্য তিনি ছিলেন আমিরুল মুমেনীন।

ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ: হযরত ওমর (রা) শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখেছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি প্রতিটি মসজিদের সাথে মক্তব স্থাপন করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি অসংখ্য স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ প্রভৃতি স্থাপন করেন। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি জ্ঞানী-গুণীদের নিয়োগ করতেন। তার আমলেই ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে কুফা, বসরা, ফুস্তাত ও মসুলসহ বিভিন্ন শহরে শিক্ষাকেন্দ্রের বিকাশ ঘটে।

জনকল্যাণমুখী শাসন প্রতিষ্ঠা: হযরত ওমর (রা) একটি জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি সুষ্ঠু রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা, জেলখানা স্থাপন, হিজরি সন প্রবর্তন, সীমান্ত দুর্গ নির্মাণ, বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি বিধান, নারীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি তিনি কাজ সম্পাদন করেন। সমগ্র ইসলামি সাম্রাজ্যে একটি সুষ্ঠু কল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন খলিফা ওমর (রা)-এর একটি স্মরণীয় কীর্তি।

হযরত ওমর (রা)-এর মৃত্যু: হযরত ওমর (রা)-এর মৃত্যু ছিল খুবই দুঃখজনক। মসজিদে নামাজরত অবস্থায় খ্রিষ্টান পারসিক আততায়ী আবুলুল ফিরোজের ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত ওমর (রা)-এর চরিত্রে কীসের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল?
২. বায়তুল মাল থেকে ওমর (রা) দৈনিক কত পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন?
৩. মদপানের অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলে ওমর (রা) কাকে শাস্তি দিয়েছিলেন?
৪. কোন খলিফা রাতের বেলা প্রজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখতেন?
৫. কোনটি হযরত ওমর (রা)-এর গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ?
৬. প্রথম পুলিশ বাহিনী গঠন করেন কে?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

হযরত ওমর (রা)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে হযরত ওমর (রা)-এর কৃতিত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর একটি স্লাইড তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

---

[৩১] The pension system of Umar is a spectacle probably without parallel in the world. –Ref: W. Muir, *The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall*

পাঠ ১৪ ও ১৫

হযরত ওসমান (রা)-এর পরিচয়, খিলাফত লাভ ও এর সম্প্রসারণ (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) [Introduction, Obtaining Throne and Expansion of the Khilafat of Hazrat Osman (R) (644-656 AD)]

জন্ম, বংশ পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন

হযরত ওসমান (রা) ৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে (কারো মতে ৫৭৩ খ্রি.) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আফফান। মহানবি (স)-এর আপন ফুফু উম্মে হাকিম বিনতে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা ছিলেন ওসমান (রা)-এর মা আরওরা বিনতে কুরাইজ। ওসমান (রা)-এর বাল্যনাম ছিল আবু আমর ও আবু আবদুল্লাহ। তার উচ্চতা ছিল মধ্যম, গায়ের রং ঈষৎ রক্তিম, নাসিকা উন্নত এবং বক্ষ ও গণ্ডদেশ ছিল মাংসল। সুদর্শন ওসমান (রা)-এর মুখে ঘন ও লম্বা দাড়ি ছিল। হযরত ওসমান (রা) তৎকালীন মক্কার একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাই লোকজন তাকে গনি (ধনী) বলে সম্বোধন করত। তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। তিনি পরোপকারী, চরিত্রবান এবং শিক্ষিত ছিলেন। জাহেলিয়া যুগেও সত্যবাদী ও আমানতদার হিসেবে তার বিশেষ সুনাম ছিল।

বিবাহ ও ইসলাম গ্রহণ: হযরত ওসমান (রা) মহানবি (স)-এর দুই কন্যা প্রথমে রুকাইয়া ও তার মৃত্যুর পর উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন। এজন্য তাকে যুন্নুরাইন (দুই নুর বা জ্যোতির অধিকারী) বলা হয় । মহানবি (স) ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। প্রথমদিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল হযরত ওসমান (রা) ছিলেন তাদের একজন। ইসলাম গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। ওসমান (রা)-এর চাচা হাকাম নতুন ধর্মমত গ্রহণের কারণে তাকে রশি দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে প্রহার করেছিল। তবুও তিনি ইসলাম ত্যাগ করেননি বরং ইসলামের কল্যাণে নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত করেছিলেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরত: রাসুল (স)-এর প্রচারিত নতুন ধর্ম ইসলাম দিন দিন প্রসার লাভ করতে থাকলে। মক্কার কুরাইশরা এটিকে নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থি হিসেবে মনে করে। এজন্য তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের ওপর অমানবিক অত্যাচার শুরু করে। মুহাম্মদ (স) তাঁর কিছু অনুসারীকে কুরাইশদের নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করার নির্দেশ দেন। হযরত ওসমান (রা) তার স্ত্রী রুকাইয়াসহ একদল সাহাবির সাথে সেখানে হিজরত করেন। আবিসিনিয়ায় দুই বছর অবস্থান করার পর তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় মদিনায় হিজরত করে রাসুল (স)-এর সাথে মিলিত হন।

খলিফা হওয়ার আগে ইসলামের খেদমত: ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরতের পর মুহাজিরদের (হিজরতকারী) আর্থিক অভাব-অনটন দেখে ওসমান (রা) তাঁর ধন-সম্পদ অকাতরে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করেন। এসময় মদিনার মুসলমানদের মধ্যে পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়। এ কষ্ট দূর করার জন্য ওসমান (রা) ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) দিনার দিয়ে একজন ইহুদির কাছ থেকে 'বীরে রুমা' নামে একটি কূপ ক্রয় করে সেটি ওয়াক্ফ (দান) করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এটি সংস্কারের জন্য আরও ২,০০০ (দুই হাজার) দিনার খরচ করেন। এছাড়া মদিনা মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য ওসমান (রা) প্রচুর পরিমাণে অর্থ সহায়তা দেন। রাসুল (স)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত প্রত্যেকটি যুদ্ধে (বদর যুদ্ধ ছাড়া) তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদও খরচ করেন ওসমান (রা)। তাবুক অভিযানের ব্যয়ভার বহনের জন্য তিনি নগদ ১,০০০ দিনার, ১,০০০ উট, ৭০টি ঘোড়া এবং সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশের বেতন দেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরের আগে তিনি নিজের জীবনবাজি রেখে কুরাইশ শিবিরে গিয়ে বন্দি হয়েছিলেন। তার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানরা মহানবি (স)-এর নেতৃত্বে 'বায়াতুর রিদওয়ান' বা প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে মক্কার কুরাইশরা ভীত হয়ে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করে। এছাড়া হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর সময় মজলিশ-উস-শুরার সদস্য হিসেবে তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতেন।

খিলাফত লাভ

খলিফা নির্বাচনের জটিলতা এড়াতে হযরত ওমর (রা) মৃত্যুর আগে একটি নির্বাচনি পরিষদ গঠন করেন। হযরত ওসমান, হযরত আলি, তালহা, যুবাইর, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও আবদুর রহমান (রা) এ পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইসলামের খেদমতে তাদের প্রত্যেকেরই অসামান্য অবদান ছিল। তালহা এ সময় মদিনায় ছিলেন না। আবদুর রহমান খিলাফতের গুরুভার নিতে অস্বীকৃতি জানান। আবদুর রহমান যুবাইর, ওসমান ও আলি— এ তিন জনের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা নির্বাচন করতে বলেন। সাদ ওসমানকে, ওসমান আলিকে এবং আলি ওসমানকে সমর্থন করেন। ফলে এক ভোট বেশি পেয়ে হযরত ওসমান (রা) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। আবদুর রহমান ওসমান (রা)-কে খলিফা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলে সবাই তার কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে।

খিলাফত সম্প্রসারণ

খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই হযরত ওসমান (রা) নানা বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। হযরত ওমর (রা)-এর মৃত্যুর পর মিসর, সিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি প্রদেশে রোমান ও পারসিকরা নিজেদের হাতছাড়া হওয়া অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধারে তৎপরতা চালায়। তারা নানা দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। এ অবস্থায় ৭০ বছর বয়সী হযরত ওসমান (রা) অসামান্য দৃঢ়তার সাথে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেন।

পারস্যে রাজ্য বিস্তার: হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফত লাভের কিছুদিন পর পারস্যে বিদ্রোহ শুরু হয়। পারস্য সম্রাট তৃতীয় ইয়াজজিদ হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। খলিফার আদেশে বসরার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ ইবনে আমীর তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে বলখ, তাবারিস্তান, মার্ভ, নিশাপুর প্রভৃতি বিদ্রোহী অঞ্চল দখল করেন। ফলে পারস্য সম্রাটের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তুর্কিস্তান সীমান্তের কাছে নিজ পক্ষের লোকের হাতেই নিহত হন। ইবনে আমীরের অধীনস্থ সেনাপতিরা অভিযান অব্যাহত রাখেন। তারা কিরমান ও সিজিস্তানের বিদ্রোহ দমন করেন। আধুনিক আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হিরাত, কাবুল, গজনি প্রভৃতি প্রদেশও খলিফার বশ্যতা স্বীকার করে। করদানের শর্তে বিজিত অঞ্চলগুলোর শাসনভার স্থানীয় শাসকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। খলিফার আদেশে এসব অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণ ও পরিখা খনন এবং বিজয়ীদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

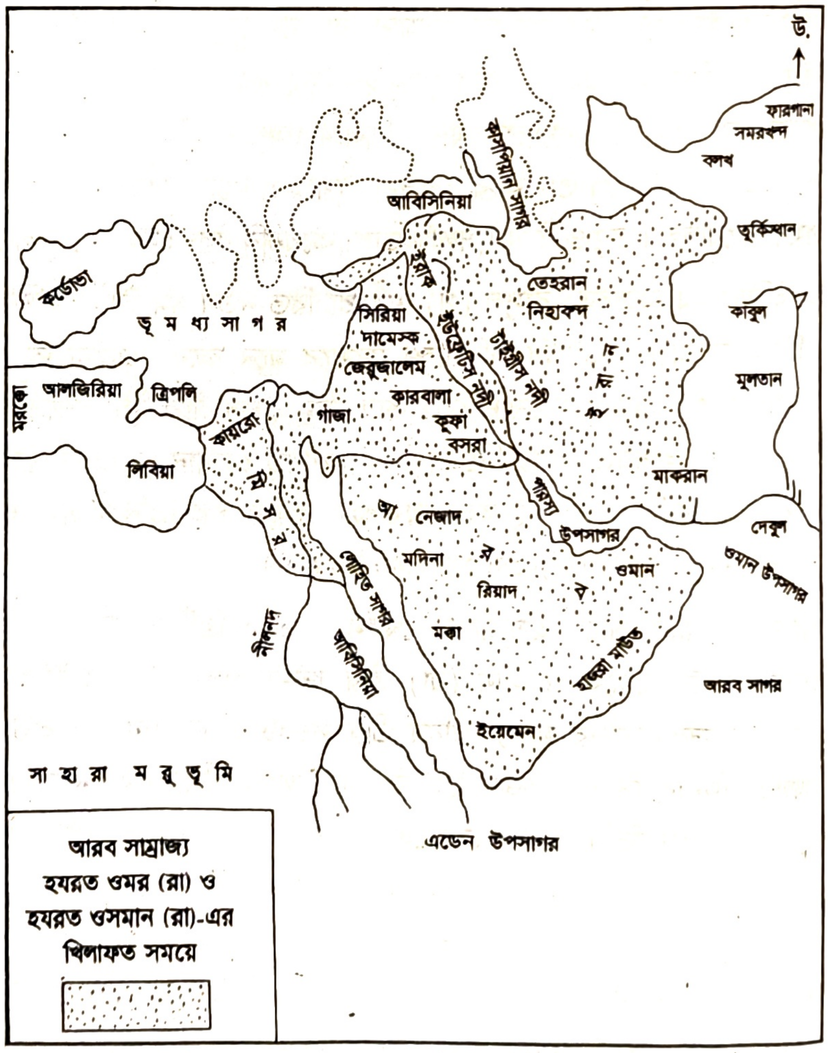
উ.
ফারগানা
সমরকন্দ
বলখ
কাস্পিয়ান সাগর
আবিসিনিয়া
তুর্কিস্থান
কর্ডোভা
ভূ ম ধ্য সা গ র
সিরিয়া
দামেস্ক
জেরুজালেম
তেহরান
নিহাবন্দ
ইউফ্রেটিস নদী
টাইগ্রীস নদী
কাবুল
মুলতান
মরক্কো
আলজিরিয়া
ত্রিপলি
কায়রো
গাজা
কারবালা
কুফা
বসরা
লিবিয়া
মি স র
পারস্য
উপসাগর
মাকরান
আ
নেজাদ
মদিনা
র
ব
রিয়াদ
ওমান
দেবুল
ওমান উপসাগর
লোহিত সাগর
নীলনদ
আবিসিনিয়া
মক্কা
হাজরা মাউত
আরব সাগর
ইয়েমেন
সা হা রা ম রু ভূ মি
এডেন উপসাগর
আরব সাম্রাজ্য হযরত ওমর (রা) ও হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফত সময়ে

হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর সময়কার আরব সাম্রাজ্য

খাজারদের বিরুদ্ধে অভিযান: খলিফা ওসমানের (রা) খিলাফতকালে কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরস্থ তুর্কি ও খাজার সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হয়। আজারবাইজানের গিরিপথে সংঘটিত যুদ্ধে অনেক আরব যোদ্ধা ও নেতৃবৃন্দ নিহত হন। খলিফা ওসমান তখন সিরিয়া থেকে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করেন পাঠান। এ সময় তুর্কিস্তানে প্রচণ্ড তুষারপাতের ফলে মুসলমানদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এমন বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও দলে দলে নতুন সৈন্য ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়। ফলে মুসলমানরা ওই অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

সিরিয়া অভিযান: হযরত ওমর (রা)-এর সময় থেকে সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন মুয়াবিয়া। ওসমান (রা)-এর খিলাফতের দ্বিতীয় বছরে এশিয়া মাইনর থেকে রোমানরা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে হঠাৎ সিরিয়া আক্রমণ করে। মুয়াবিয়া সিরিয়ার সেনাবাহিনী এবং পূর্বদিকের প্রদেশগুলো থেকে আরও প্রায় ৮,০০০ (আট হাজার) সেনা সংগ্রহ করে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং এশিয়া মাইনর দখল করে নেন। এরপর তিনি আর্মেনিয়ার মধ্য দিয়ে তাবারিস্তান হয়ে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বতীরস্থ মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেন। উভয় বাহিনী মিলিত হয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত পুরো অঞ্চল জয় করে। এ সময় প্রায় প্রতি বছরই রোমানদের সাথে সংঘর্ষ হতো। মুয়াবিয়া ওসমান (রা)-এর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে কনস্টান্টিনোপলের সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং শত্রুদের অনেক দুর্গ ধ্বংস করেন।

আফ্রিকা অভিযান: হযরত ওসমান (রা) তার দুধভাই আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারাহকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এ সময় ত্রিপলির বাইজান্টাইন শাসনকর্তা গ্রেগরী মিসরে হানা দিতে শুরু করে। আব্দুল্লাহ তার বিরুদ্ধে অভিযান চালান। কার্থেজের কাছে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। প্রাণপণ যুদ্ধ করেও গ্রেগরীর সৈন্যরা মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়। ৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপলি মুসলমানদের দখলে আসে। ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি আবু কায়েসের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ভূমধ্যসাগরের সাইপ্রাস দ্বীপে নৌ অভিযান পরিচালনা করে। তখন সাইপ্রাস, রোডসসহ অনেক দ্বীপ মুসলমানরা অধিকার করে। সাইপ্রাস পতনের তিন বছর পর বাইজান্টাইনরা ৫০০ রণতরী নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে। আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধেও মুসলমানরা জয়ী হয়। ৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল্লাহ এক সন্ধি করে নুবিয়ার অধিবাসীদের আরব অধীনে আনেন। হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেও পূর্বে পারস্য, উত্তরে কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী অঞ্চল, মিসরসহ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে খিলাফত সম্প্রসারিত হয়।

জেনে রাখো

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলে প্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গঠিত হয়। এ সময় সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া নৌবাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে মুসলিম নৌবাহিনী গঠনের প্রস্তাব করেন। শর্তসাপেক্ষে খলিফা তাকে নৌবাহিনী গড়ে তোলার অনুমতি দেন। খলিফার অনুমোদনক্রমে ২৮ হিজরিতে মুসলিম নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন হয়। মুয়াবিয়া ছিলেন এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মুসলিম নৌবাহিনী গড়ে তোলেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে সর্বপ্রথম সাইপ্রাস দ্বীপে নৌ আক্রমণ চালান। সাইপ্রাসবাসী মুয়াবিয়াকে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। মুয়াবিয়া ৭২০০ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে সাইপ্রাসবাসীর সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। মুসলিম নৌবাহিনীর প্রথম অভিযান সফল হওয়ার পর একে আরও মজবুত করে পুনর্গঠন করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত ওসমান (রা) কুরাইশ বংশের কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন?
২. কত বছর বয়সে হযরত ওসমান (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন?
৩. 'যুন্নুরাইন' কার উপাধি ছিল? *[সি. বো., ব. বো. ২০২১; সকল বোর্ড ২০১৫]*
৪. ইসলামের তৃতীয় খলিফা কে?
৫. হযরত ওসমান (রা) কত দিনার দিয়ে মদিনার 'বীরে রুমা' ক্রয় করেছিলেন?
৬. 'গনি' বলা হয় কাকে?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খলিফা হওয়ার আগে হযরত ওসমান (রা) ইসলামের যেসব সেবা করেন তা তালিকা আকারে লেখো।

পাঠ ১৬

হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ ও এর যথার্থতা নিরূপণ [Complaints against Hazrat Osman (R) and Assessment of Its Accuracy]

হযরত ওসমানের (রা) বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ

হযরত ওসমান (রা) ১২ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। এর মধ্যে প্রথম ছয় বছর (৬৪৪—৬৫০ খ্রি.) তিনি বেশ সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেন। ঐতিহাসিক আয্-যুহরীর মতে, "এই সময় তিনি কুরাইশদের কাছে খলিফা ওমর (রা)-এর চেয়েও বেশি প্রিয় ছিলেন।" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত খিলাফতের শেষ ছয় বছর (৬৫০-৬৫৬ খ্রি.) ওসমান (রা) প্রজাসাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়েন। এ সময় খলিফার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। অবশ্য এসব অভিযোগের অধিকাংশই ছিল অমূলক ও ভিত্তিহীন। তবুও এসব অভিযোগের কারণে খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এমনকি বিদ্রোহীদের হাতে খলিফা হযরত ওসমান (রা)-কে জীবন দিতে হয়। এর ফলে মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলো হলো—

স্বজনপ্রীতির অভিযোগ: হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আরব বেদুইন ও অনারব মুসলমানরা স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তোলে। অভিযোগ করা হয় যে, তিনি মহানবি (স)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অপসারিত করে নিজ আত্মীয়স্বজন এবং উমাইয়া গোত্রের লোকদের প্রাদেশিক শাসনকর্তাসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি, সৈয়দ আমীর আলী, উইলিয়াম মুর, মাসুদি, ভনক্রেমার প্রমুখ এ অভিযোগ সমর্থন করেন। তবে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আত্মীয়স্বজনের প্রতি কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও কোনো অযোগ্য আত্মীয়কে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেননি।

বিদ্রোহীদের অভিযোগে বলা হয়, হযরত ওসমান (রা) তাঁর উপদেষ্টা মারওয়ানের পরামর্শে বিভিন্ন প্রদেশের জনপ্রিয় ও দক্ষ শাসনকর্তাদের অপসারণ করেছিলেন। যেমন— কুফার গভর্নর সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে অপসারণ করে ওয়ালিদ বিন ওকবাকে নিয়োগ দেন। বসরার গভর্নর মুসা আল আসারীকে বরখাস্ত করে আবদুল্লাহ ইবনে আমীরকে নিয়োগ করেন। মিসরের আমর ইবনুল আসকে পদচ্যুত করে দুধভাই আবদুল্লাহকে গভর্নর করেন। নিরপেক্ষ বিচারে বলা যায়, তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এসব প্রশাসনিক রদবদল প্রয়োজন ছিল। কারণ—

প্রথমত, কুফার গভর্নর সাদকে বিলাস-ব্যসন ও অমিতব্যয়িতার কারণে অপসারণ করে ওয়ালিদকে নিযুক্ত করা হয়। ঘটনাক্রমে ওয়ালিদ ছিলেন খলিফার সৎভাই। পরে মদপান ও অসহিষ্ণুতার অভিযোগে হযরত ওসমান (রা) তাকেও অপসারণ করে সেখানে সাঈদ আল আসকে নিয়োগ দেন। এই সাঈদও খলিফার আত্মীয় ছিল। একসময় তাকেও অপসারণ করে আবদুল্লাহ ইবনে আমীরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বারবার এ পরিবর্তনে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, প্রশাসনিক প্রয়োজনেই প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে রদবদল করা হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, মিসরের শাসনকর্তা আমর ইবনুল আসের সাথে রাজস্ব সচিব আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারাহর মতবিরোধ হলে খলিফা আমরকে অপসারণ করে দুধভাই আবদুল্লাহকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে বিদ্রোহীদের দাবির কারণে খলিফা তাদের মনোনীত প্রার্থী মুহম্মদ বিন আবু বকরকে মিসরের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দেন ।

তৃতীয়ত, সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন মুয়াবিয়া। হযরত ওমর (রা) তাকে নিয়োগ করেছিলেন। খলিফা ওসমান (রা) মুয়াবিয়াকে তার কর্তব্যনিষ্ঠা এবং প্রশাসনিক ও সামরিক দক্ষতার জন্য উক্ত পদে বহাল রাখেন। যোগ্য হওয়ার পরও শুধু উমাইয়া গোত্রের লোক হওয়ায় বিদ্রোহীরা তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ তোলে। যা ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

চতুর্থত, হযরত আলি (রা) বলেন, খলিফা ওসমান (রা) আত্মীয়দের প্রশাসনে নিয়োগ দিলেও তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা অন্য কোনো অভিযোগ উঠলে তিনি দ্রুত তাদের পদচ্যুত করেন। এক্ষেত্রে তিনি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখাননি।

পঞ্চমত, মিসর, কুফা ও বসরার কিছু লোক মূলত স্বার্থের কারণে খলিফার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলেছিল। ঐতিহাসিক বার্নার্ড লুইস বলেছেন, 'তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধর্মীয় অথবা ব্যক্তিগত ছিল না; এটি ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বেদুইনদের বিদ্রোহ কেবল হযরত ওসমানের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, যেকোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।' সুতরাং বলা যায়, বিদ্রোহীরা খলিফার বিরুদ্ধে যে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলেছিল, সেটির পেছনে অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণের অভিযোগ: হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে গুরুতর অভিযোগ ছিল কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ। তাঁর রাজত্বকালে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নিজেদের সুবিধার্থে কুরআনের ভাষা ও উচ্চারণ পরিবর্তন করে পাঠ করতে থাকে। এ সময় চক্রান্তকারী ও বিভ্রান্তকারীরা কুরআনের বাণী বিকৃত করে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে থাকে। খলিফা ওসমান (রা) এ সংবাদ পেয়ে ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে যায়েদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে একটি কুরআন সংকলন পরিষদ গঠন করেন। হযরত হাফসার (রা) কাছে সংরক্ষিত নির্ভুল কপি থেকে সাতটি প্রতিলিপি তৈরি করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ করে ভ্রান্তিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন কুরআনের পাণ্ডুলিপিগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। তাই হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত ধর্মগ্রন্থ অবমাননার এ অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। হযরত ওসমান (রা)-এর কুরআন সংকলনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের কোনো অকল্যাণ ও ক্ষতি হয়নি বরং বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে মুসলমানরা রক্ষা পেয়েছে।

বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ: খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার অভিযোগ আনেন। বিশেষ করে উমাইয়াদের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি দান করার অভিযোগ তোলা হয়। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি, মাসুদিসহ অনেকে এ মতের সমর্থক। প্রকৃতপক্ষে খলিফা ওসমান (রা) আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন ছিলেন। তিনি ইসলামের খেদমতে অকাতরে ব্যক্তিগত অনেক সম্পদ ব্যয় করেছেন। তিনি নিজের সম্পদ থেকেই আত্মীয়স্বজনকে অনেক অর্থ দান করেছেন, বায়তুল মাল থেকে নয়।

সরকারি চারণভূমি নিজস্ব কাজে ব্যবহারের অভিযোগ: অভিযোগ করা হয় যে, খলিফা সরকারি চারণভূমিতে জনগণের উট, দুম্বা, বকরি চরাতে দেননি। মহানবি (স) ও প্রথম দুই খলিফার রীতি অনুসরণ করে খলিফা ওসমান (রা) যুদ্ধের জন্য রক্ষিত উট ও ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারি চারণভূমি ব্যবহার করেন। খলিফা শুধু তার দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র।

আবু-জর গিফারির নির্বাসন: আবু-জর গিফারি ছিলেন একজন সাধুপুরুষ ও মহানবি (স)-এর প্রিয় সাহাবা। তিনি মুসলমানদের জাঁকজমক ও বিলাসবহুল জীবনযাপন পছন্দ করতেন না। তার মতে, যারা সম্পদ জমা করবে তারা জাহান্নামে যাবে। ধনসম্পদ জমা করার জন্য নয়, এগুলো জনকল্যাণে ব্যয় করা উচিত। প্রথমে তিনি সিরিয়াতে এ মতবাদ প্রচার করে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলেন। সেখানকার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া তাকে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। হযরত ওসমান (রা) তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে জাকাত প্রদানের পর ধনসম্পদ সঞ্চয় করা বৈধ। কিন্তু মদিনাতেও তিনি নিজের মতবাদ প্রচার করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য খলিফা তাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ 'রাবাদায়' পাঠিয়ে দেন। রাবাদায় বসবাসের সময় তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। কিন্তু অভিযোগকারীরা এটিকে আন্দোলনের একটি বড় অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায়।

মদিনার বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার: খলিফার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, মদিনার বাজারে দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ে তিনি একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এস.এম. ইমামউদ্দিন মনে করেন, এটি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। বস্তুত তিনি রাষ্ট্র মালিকানাধীন উটের আহারের জন্য মদিনার বাজারে খেজুর বিক্রয় বাধ্যতামূলক করেন। এটি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই করা হয়েছিল, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে নয়।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদের ভাতা স্থগিত: অভিযোগ করা হয় যে, খলিফা আক্রোশবশে আবদুল্লাহ বিন মাসউদের ভাতা স্থগিত করেন। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বিরুদ্ধে কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগের কারণে তাঁর ভাতা প্রদান স্থগিত রাখা হয়। অবশ্য পরে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তত দিনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইন্তেকাল করেন। এ অবস্থায় খলিফা ভাতা হিসেবে তার সমুদয় পাওনা তার পরিবারদেরকে দিয়ে দেন।

অভিযোগগুলোর যথার্থতা নিরূপণ

খলিফা ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে সেগুলো ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হয়। যেমন– তিনি আত্মীয়স্বজনদের প্রতি কিছুটা দুর্বল থাকলেও কোনো অনুপযুক্ত আত্মীয়কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেননি। পরিস্থিতির কারণে তিনি গভর্নর পরিবর্তন করলেও সকল গভর্নর তার আত্মীয় ছিল না। কুরআন শরিফে উচ্চারণগত সমস্যা দূর করার জন্যই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অসঙ্গতিপূর্ণ কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ তো দূরের কথা বরং তিনি নিজের সম্পদ ইসলামের জন্য অকাতরে দান করেছেন। সরকারি চারণভূমি রাষ্ট্রীয় পশুপালনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি তার আগের দুইজন খলিফাকে অনুসরণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি আবু-জর গিফারিকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

শান্তিপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ খলিফা অভিযোগগুলোর সত্যতা বিচারের জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করেন। তবুও তিনি বিশৃঙ্খলা থামাতে এবং মর্মান্তিক ঘটনার হাত থেকে খিলাফতকে রক্ষা করতে পারেননি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকাল লেখো। *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]*
২. হযরত ওসমান (রা) কখন খিলাফতে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন?
৩. কোন খলিফার বিরুদ্ধে আরব বেদুইন ও অনারব মুসলমানরা স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তোলে?
৪. হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে সিরিয়ার শাসনকর্তা কে ছিলেন? *[সি. বো., ব. বো. ২০২১]*
৫. হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে গুরুতর ছিল কোনটি?
৬. হযরত ওসমান (রা) আবু-জর গিফারিকে কোথায় নির্বাসন দেন?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের ওপর একটি তালিকা তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ ঠিক ছিল কি না— কয়েকজন মিলে আলোচনা করে মতামত দাও।

পাঠ ১৭

খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যার কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
The Causes, Events and Results of the Killing of Caliph Osman (R)

ওসমান (রা)-এর হত্যার কারণ

হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনা অধিকাংশ অভিযোগই ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাই তিনি নিজের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডনের জন্য অভিযোগকারীদের পরবর্তী হজ মৌসুমে মদিনায় এসে অভিযোগ পেশ করতে বলেন। কিন্তু অভিযোগকারীদের কেউ আসেনি। এ সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তারা তাকে মদিনা ত্যাগ অথবা বিদ্রোহীদের কঠোরভাবে দমনের পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি রক্তপাত কিংবা মদিনা ত্যাগ কোনোটিই পছন্দ করলেন না। কিন্তু বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য ছিল ওসমান (রা)-কে খিলাফত ত্যাগে বাধ্য করা। ওসমান (রা)-এর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাই তারা নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে খলিফা শাহাদাতবরণ করেন। নিচে তার হত্যার কারণগুলো তুলে ধরা হলো—

কাবাগৃহের সম্প্রসারণ: কাবাগৃহের সম্প্রসারণ কাজ খলিফা ওমর (রা)-এর সময় শুরু হলেও ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা ওসমান (রা)-এর শাসনামলে এর কাজ সমাপ্ত হয়। কাবাগৃহের সম্প্রসারণের জন্য যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তারা ইসলামি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওমর (রা)-এর সময় নিশ্চুপ থাকলেও ওসমান (রা)-এর সরলতার সুযোগে তার কাছে জমির ক্ষতিপূরণ দাবি করে। খলিফা তাতে সম্মতি দিলেও পরে তারা তা নিতে অসম্মতি জানায় এবং গোলযোগ শুরু করে।

মদিনার বাজারে একচেটিয়া ব্যবসা: রাষ্ট্রীয় উটসমূহের আহার সহজলভ্য করার জন্য খলিফা ওসমান (রা) মদিনার বাজারে খেজুর বিক্রি বাধ্যতামূলক করেন। কিন্তু এতে বিদ্রোহীরা অভিযোগ করে যে, ওসমান নিজ ব্যবসায়িক স্বার্থে মদিনার বাজারে খেজুর বিক্রি বাধ্যতামূলক করেছেন।

হজের আনুষ্ঠানিকতা পরিবর্তন ও আংটি হারানোর অভিযোগ: খলিফা ওসমান (রা) হজের অনুষ্ঠানের সময় দুই রাকাত নামাজের পরিবর্তে চার রাকাত নামাজ পড়ার রীতি চালু করেন। এছাড়া তিনি মহানবি (স)-এর মোহরাঙ্কিত আংটি একটি কূপে হারিয়ে ফেলেন। এতে ওসমানবিরোধীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বৈষম্য: খলিফা ওমর (রা)-এর সময় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। কিন্তু খলিফা ওসমান (রা)-এর সময় মুহাজিররা অবহেলিত হতে থাকে, এমনকি মজলিশ-উস-শুরার সদস্যপদ থেকে তাদের বাদ দেওয়া হয়, যা পরবর্তীকালে তাকে হত্যায় ইন্ধন জোগায়।

হাশেমি-উমাইয়া বিরোধ: মহানবি (স)-এর জন্মের অনেক আগে থেকে কুরাইশ বংশের হাশেমি ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যে কাবাঘর পরিচালনার নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। মক্কা বিজয়ের পর উমাইয়ারা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর থেকে হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত দুই গোত্রের মধ্যে সদ্ভাব বজায় ছিল। কিন্তু উমাইয়া গোত্রের সদস্য ওসমান (রা)-এর খিলাফত লাভের ফলে পুরনো দ্বন্দ্ব পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে হয়। উমাইয়ারা প্রশাসনের বড় বড় পদ লাভের পাশাপাশি অনেক ভূমি জায়গির হিসেবে পায়। ফলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। তাদের প্রভাব হাশেমিরা কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। এজন্যই হাশেমি ও তাদের সমর্থকরা খলিফা ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে বিদ্রোহে যোগ দেয়। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 'মুদারীয় ও হিমারীয় বংশীয়দের প্রাচীন বংশগত বিদ্বেষ প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল কিন্তু এ সময় তা নতুন তেজে জেগে ওঠে।'[৩২]

খলিফার চারিত্রিক দুর্বলতা: বিভিন্ন গুণে বিভূষিত হলেও খলিফা ওসমান (রা)-এর চরিত্রগত দুর্বলতাই ছিল তার হত্যার অন্যতম কারণ। তিনি উদার ও সরল ছিলেন। তিনি যদি যথাসময়ে কঠোরহস্তে দুষ্টের দমন করতেন তাহলে হয়তো তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো।

---

[৩২] Under Osman commence that better feud between the Hashimids and the Ommeyads which lasted forever a century. –Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.46

মারওয়ানের ধ্বংসাত্মক নীতি: খলিফার দুর্বলতার সুযোগে তার প্রধান উপদেষ্টা মারওয়ান (জামাতা এবং চাচাতো ভাই) রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। উমাইয়াদের ধন-ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত করে হাশেমিদের দুর্বল করাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের উচ্চপদে উমাইয়াদের নিয়োগ করেন। মারওয়ানের এসব কুচক্রান্ত ও স্বার্থপর নীতি বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল, যা খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করে।

ইবনে সাবার অপপ্রচার: আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ধারণা করা হয়, যেসব লোক নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল তিনি তাদের একজন ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য তিনি একটি ভুল মতবাদ প্রচার করেন। তার মতে, হযরত আলি (রা) রক্তের সম্পর্ক এবং বৈবাহিক সূত্রে মহানবি (স)-এর একমাত্র উত্তরাধিকারী। সুতরাং খিলাফত লাভের বৈধ অধিকার শুধু তারই। তাঁর এরূপ অপপ্রচার কুফা ও বসরায় জনপ্রিয়তা লাভ করে। অনেকে ওসমান (রা)-কে অবৈধ খলিফা ভেবে বিরোধিতা শুরু করে। কুফা এবং বসরার গভর্নররা তাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করলে তিনি মিসরে গিয়ে নিজের মতবাদ প্রচার করেন।

হত্যার ঘটনা

উপরে আলোচিত কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে খলিফার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের মনে ক্ষোভ তৈরি হয়। অনেক স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কুফা, বসরা এবং মিসর থেকে বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি দল মদিনায় আসে। তারা খলিফার কাছে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগ উত্থাপন করে সেগুলো প্রতিকারের দাবি জানায়। খলিফা তাদের অভিযোগ শুনে প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে তারা নিজ নিজ প্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এ সময় 'অভিযোগকারীদের যেন নিজ নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন মাত্রই হত্যা করা হয়'—এরূপ আদেশ সম্বলিত এবং খলিফার সীলযুক্ত একটি পত্র বিদ্রোহীরা এক দূতের কাছ থেকে উদ্ধার করে। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, কুচক্রী মারওয়ান খলিফার সীল জাল করে এ পত্র পাঠিয়েছিল। ফলে বিদ্রোহীরা ফিরে এসে খলিফার কাছে এ ঘটনার কৈফিয়ত দাবি করে। খলিফা তাদেরকে বলেন যে, এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। বিদ্রোহীরা বুঝতে পারেন এটা মারওয়ানের কাজ। তারা মারওয়ানকে তাদের হাতে সমর্পণ করার দাবি জানায়। খলিফা এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ফলে বিদ্রোহীরা খলিফা ওসমান (রা)-এর বাসগৃহ অবরোধ করে। তারা খলিফাকে অযোগ্য ঘোষণা করে তাকে পদত্যাগ করতে বলে। হযরত আলি (রা), তালহা (রা) ও যুবায়ের (রা)-এর পুত্ররা বিদ্রোহীদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে বিদ্রোহীরা ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জুন মুহাম্মদ বিন আবু বকরের নেতৃত্বে খলিফাকে কুরআন পাঠরত অবস্থায় হত্যা করে। হিট্টি বলেন, 'এভাবে মুসলমানদের হাতে প্রথম একজন খলিফার রক্তপাত ঘটানো হলো।'[৩৩]

ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের ফলাফল

বিদ্রোহীদের হাতে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) এর হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে ছিল একটি মর্মান্তিক ঘটনা। এ ঘটনা ইসলাম ও মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি করে।

খিলাফতের পবিত্রতা নষ্ট: ওসমান (রা)-কে হত্যার ফলে খিলাফতের প্রতি মুসলমানদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক খোদা বকস-এর মতে, 'ওসমান (রা)-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চিরকালের জন্য খিলাফতের পবিত্রতা বিনষ্ট করে।' ঐতিহাসিক বার্নাড লুইস বলেন, 'বিদ্রোহী মুসলমানদের মাধ্যমে একজন খলিফার প্রাণহানির কারণে যে বেদনাবিধুর দৃষ্টান্তের সৃষ্টি হলো তা ইসলামের ঐক্যের প্রতীক খিলাফতের ধর্মীয় ও নৈতিক মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করেছে।'

---

[৩৩] Thus fell the first caliph whose blood was shed by Moslem hands. –Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.77

গৃহযুদ্ধের সূচনা: ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ড মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। তার মর্মান্তিক মৃত্যুর পর মুসলমানদের সুদৃঢ় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হয়। এর ফলেই পরবর্তী সময়ে উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ ঘটনার জের ধরেই ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে রাসুল (স)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসন শহিদ হন। কারবালার সে ঘটনাও ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সংযোজন করে। উমাইয়া ও হাশেমি দ্বন্দ্ব মারাত্মক আকার ধারণ করে। এসব কারণ বিবেচনায় ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন যথার্থই বলেছেন 'এর ফলে গৃহযুদ্ধের ফটক খুলে যায়, যা আর কখনও বন্ধ হয়নি।' ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, 'ওসমানের হত্যা ছিল গৃহযুদ্ধের বিপদসংকেতস্বরূপ।' বস্তুত এর পর সৃষ্ট গৃহযুদ্ধের ফলে মুসলিম বিশ্ব শতধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব: মহানবি (স)-এর সময় থেকে তার খিলাফত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে একতা ছিল। খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হয়। মুসলিম সমাজ সুন্নি, শিয়া ও খারেজি প্রভৃতি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এজন্য জার্মান ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন, 'ওসমানের হত্যা ইসলামের ইতিহাসে যেকোনো ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর যুগান্তকারী।'[৩৪]

গণতন্ত্রের সমাধি রচনা: খলিফা আবু বকর (রা)-এর সময় থেকে খিলাফতে গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতি ঘটে। খলিফা হযরত আলি (রা)-এর মৃত্যুর পর (৬৬১ খ্রি.) সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আলি (রা)-এর পুত্র ইমাম হাসানকে খিলাফতের দাবি ত্যাগে বাধ্য করেন। পরবর্তী সময়ে মুয়াবিয়া নিজ পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধীকারী হিসেবে মনোনয়ন করেন। ফলে খিলাফতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র চালু হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত ওসমান (রা) মদিনার বাজারে কী বিক্রি বাধ্যতামূলক করেছিলেন?
২. হযরত ওসমান (রা) হজের সময় কয় রাকাত নামাজ পড়ার রীতি চালু করেন?
৩. ওসমান (রা)-এর প্রধান উপদেষ্টা কে ছিলেন?
৪. ওসমান (রা)-এর হত্যার অন্যতম প্রধান কারণ কী ছিল? */সকল বোর্ড ২০১৫/*
৫. ওসমান (রা)-এর খলিফা হওয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছিল কে?
৬. কোন ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার কারণগুলো ছক আকারে লেখো।
২. হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই ইসলমে প্রথম গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়ে— পাঁচটি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করো।

গ. দলীয় কাজ

হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের ফলাফল ছিল ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি— দুটি দলে বিভক্ত হয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করো।

---

[৩৪] The murder of Osman was more epoch-making than almost any other event of Islamic History. –Ref: J. Wellhausen, *The Arab Kingdom and its Fall*

পাঠ ১৮

খলিফা ওসমান (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
Character and Achievements of Caliph Osman (R)

চরিত্র

খলিফা ওসমান (রা)-এর মধ্যে মানবচরিত্রের প্রায় সবরকম মহৎগুণের সমাবেশ ঘটেছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও কোমল স্বভাবের। নিজের মহৎ গুণাবলির কারণে মুহাম্মদ (স)-এর সবচেয়ে প্রিয় চারজন সাহাবির একজন হতে পেরেছিলেন হযরত ওসমান (রা)। মহানবি (স) তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর দুই কন্যাকে ওসমান (রা)-এর সাথে বিয়ে দেন। এস. এম. ইমামুদ্দিন বলেন, 'তিনি ছিলেন ভদ্র এবং সৎ, আন্তরিক এবং দৃঢ় এবং দৈনিক নামাজ পড়তেন।'[৩৫] তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ—

বদান্যতা: বদান্যতায় খলিফা ওসমান (রা) চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন। ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে ওসমান (রা) তাঁর অঢেল সম্পদ থেকে অকাতরে ব্যয় করেছিলেন। তাবুক অভিযানে প্রেরিত মোট ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈন্যের মধ্যে দশ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করেছিলেন। মদিনায় পানির জন্য কূপ ক্রয় ও সংস্কার এবং মদিনা মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি কেনাসহ বিভিন্ন কাজে ওসমান (রা) বহু অর্থ দান করেছিলেন। এছাড়া তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে প্রায় দুই হাজার ক্রীতদাসকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

বিনয়: বিনয় ছিল হযরত ওসমান (রা)-এর চরিত্রের প্রধান ভূষণ। আরবের সেরা ধনীদের একজন হলেও তার মধ্যে কোনো অহংকার ছিল না। তার জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল অনাড়ম্বর। ওসমান (রা)-ই একমাত্র খলিফা যিনি বায়তুল মাল থেকে নিজের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কোনো অর্থ নিতেন না। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও হযরত ওসমান (রা) সাধারণ মানুষের মতো খুব সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন।

ধৈর্য ও সহনশীলতা: হযরত ওসমান (রা) ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক। ইচ্ছা করলেই তিনি তার বাসগৃহ অবরোধকারী বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন। তাদেরকে তিনি কঠোরভাবে দমন করতে পারতেন। কিন্তু অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার অধিকারী ওসমান (রা) আত্মরক্ষার জন্য কোনো মুসলমানের রক্ত ঝরাতে রাজি ছিলেন না। এর ফলে তাকে নিজ জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল।

সরল ও দয়ালু: খলিফা ওসমান (রা) ছিলেন খুব সরল ও দয়ালু। সরলতার জন্যই তিনি অপরাধীকেও প্রীতি ও অনুকম্পা দেখাতেন। এ সুযোগে তার উপদেষ্টা ধূর্ত ও বিশ্বাসঘাতক মারওয়ান নানা অপকর্মের মাধ্যমে খিলাফতের সর্বনাশ করে।

দেশপ্রেম: হযরত ওসমান (রা) ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। সব মুসলমানকে তিনি ভাইয়ের মতো মনে করতেন। স্বধর্মীয়দের প্রতি এ মমত্ববোধের কারণে ওসমান (রা) তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের পরিবর্তে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। এস. এম. ইমামুদ্দিন বলেন, 'তৃতীয় খলিফা (ওসমান) ইসলামের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন এবং মুসলমানদের অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন।'[৩৬]

কৃতিত্ব

রাজ্যবিস্তার: খলিফা ওসমান (রা)-এর শাসনামলে খিলাফতের সীমানা উত্তরে কৃষ্ণসাগর এবং পূর্বে গজনি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তিনি বেলুচিস্তান দখল করে ভারতের প্রান্তসীমা পর্যন্ত ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। তার শাসনকালে মুসলমানরা সাইপ্রাস, রোডসসহ ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি দ্বীপে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং ত্রিপলি দখল করে। এ সময় তুর্কিস্তান, নিশাপুর, মার্ভ, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম শাসন সুদৃঢ় হয়।

---

[৩৫] He was modest and honest, sincere and firm and himself conducted the daily prayers. –Ref: S.M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims,* Vol-1,P.20

[৩৬] He, third Caliph (Usman) sacrificed his life in the cause of the unity of Islam and trying to save the Muslims from engaging themselves in internecine strife. –Ref: S.M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims,* Vol-I, p.198

কুরআন শরিফ সংকলন: কুরআন মজিদের সংকলন খলিফা ওসমানের (রা) একটি অক্ষয় কীর্তি। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কুরআন পাঠের উচ্চারণভঙ্গির পার্থক্য দেখে তা দূরীকরণের জন্য ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে যায়েদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি খলিফা ওমরের কন্যা বিবি হাফসা (রা)-এর কাছে রক্ষিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে কয়েকটি বিশুদ্ধ অনুলিপি তৈরি করে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কুরআনের ত্রুটিপূর্ণ কপিগুলো সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলা হয়। এ মহৎ কাজের জন্য খলিফা ওসমান (রা) 'জামিউল কুরআন' উপাধিতে ভূষিত হন।

প্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গঠন: খলিফা ওসমান (রা)-এর সময় মুসলমানরা সর্বপ্রথম নৌবাহিনী গঠন করেন। তাঁর শাসনকালে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া ও মিসরের শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ রোমান আক্রমণ প্রতিহত করা জন্য নৌবহর গড়ে তোলেন। মুয়াবিয়া আরব নৌবহরের মাধ্যমে দুর্ধর্ষ রোমান নৌবাহিনীকে ধ্বংস করে সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করেন। একইভাবে মিসরের শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ খলিফার নির্দেশে উত্তর আফ্রিকার ত্রিপলি ও বার্কা দখল করেন।

কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান কমিটি গঠন: খলিফা ওসমান (রা) ২৪ হিজরিতে প্রশাসনের সংস্কার ও উন্নয়নের প্রয়োজনে রাজধানীতে মজলিশে শূরার অনুরূপ একটি কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ ও ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য কমিটির সদস্যরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার শাসনকর্তা ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের কাজকর্ম এবং প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে খলিফাকে অবহিত করতেন।

সামরিক প্রশাসন: খলিফা ওসমান (রা) সামরিক বাহিনীতে সেনাধ্যক্ষের জন্য একটি নতুন পদ সৃষ্টি করেন। তিনি সামরিক বিভাগকে প্রশাসনিক বিভাগ থেকে পৃথক করেন। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। খলিফা প্রত্যেকটি প্রদেশে একজন সামরিক কর্মকর্তার অধীনে সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করেন। এভাবে তিনি একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করেন।

জনহিতকর কার্যাবলি: খলিফা ওসমান (রা) ইসলামের খেদমত ও প্রজাদের সার্বিক কল্যাণে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। তিনি সুষ্ঠুভাবে রাজস্ব আদায় করে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি করেন। মদিনা মসজিদের পুনর্নির্মাণ ও কাবাগৃহের সংস্কারসহ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি অনেক বাসগৃহ, রাস্তা, সেতু, মসজিদ, সরাইখানা, বাঁধ, পয়ঃপ্রণালি প্রভৃতি নির্মাণ করেন। ওসমান (রা)-এর সময় মদিনা ও নজদের মধ্যবর্তী রাস্তায় পথিকদের পিপাসা নিবারণের জন্য কূপ খনন করা হয়। মদিনায় বন্যা প্রতিরোধের জন্য তিনি বিরাট মাহজুর বাঁধ নির্মাণ করেন। তাছাড়া খলিফা মদিনায় অবস্থিত 'বনাত না ইলাহ' নামে একটি খাল থেকে আরসায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে ঐ স্থানকে চাষের উপযোগী করে তোলেন।

ইসলামি শিক্ষার প্রসার: ইসলামি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে খলিফা ওসমান (রা) অমুসলিম বন্দিদের মধ্যে ইসলামের শান্তির বাণী ও উদ্দেশ্য প্রচার করতেন। এতে অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। মুসলমানদের ধর্মীয় জ্ঞান ও চেতনা বৃদ্ধির জন্য ওসমান (রা) সাম্রাজ্যে ইসলামি শিক্ষার প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'গনি' শব্দের অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
২. 'গনি' বলা হতো কাকে?
৩. ওসমান (রা)-এর চরিত্রের প্রধান ভূষণ কী ছিল?
৪. 'জামিউল কুরআন' বা কুরআন সংকলনকারী বলা হয় কাকে?
৫. আল-কুরআন সংকলন কমিটির প্রধান কে ছিলেন?
৬. কোন খলিফার সময় মুসলমানরা সর্বপ্রথম নৌবাহিনী গঠন করে?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. হযরত ওসমান (রা)-এর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো চিহ্নিত করে একটি চার্ট তৈরি করো।
২. কুরআন শরিফ সংকলনে হযরত ওসমান (রা)-এর গৃহীত পদক্ষেপ সঠিক ছিল কি না পাঁচটি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করো।

পাঠ ১৯

হযরত আলি (রা)-এর প্রাথমিক জীবন, খিলাফত লাভ ও প্রাথমিক সমস্যাসমূহ (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.) [The Early Life, Obtaining Khilafat and Initial Problems of Hazrat Ali (R) (656-661 AD)]

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত আলি (রা) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমি গোত্রে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবু তালিব এবং মায়ের নাম ফাতেমা। আবু তালিব ছিলেন মহানবি (স)-এর চাচা এবং লালন-পালনকারী। আলি (রা)-এর ডাক নাম ছিল আবুল হাসান ও আবু তোরাব। তিনি মহানবি (স)-এর কন্যা ফাতিমাকে দ্বিতীয় হিজরিতে বিবাহ করেন। বিবি ফাতেমার গর্ভে তার তিন পুত্র হাসান, হুসাইন ও মহসিন এবং দুই কন্যা জয়নাব ও উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করে। হযরত আলি (রা) ছিলেন আকর্ষণীয় ও সুন্দর চেহারার অধিকারী। তাঁর উচ্চতা ছিল মাঝারি। গায়ের রং ছিল লালাভ। চোখ দুটো ছিল কিছুটা বড়। আলির (রা) বুক ছিল প্রশস্ত। তার গালভরা লম্বা ও ঘন দাড়ি ছিল।

ইসলাম গ্রহণ: হযরত আলি (রা) ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১০ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসুল (স)-এর স্ত্রী খাদিজার পর দ্বিতীয় মুসলিম ছিলেন হযরত আলি (রা)। তরুণদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলির মতে, ইসলাম গ্রহণকালে বয়সে নবীন থাকলেও হযরত আলি (রা) এই নতুন ধর্মের প্রচারে খুব তৎপর ছিলেন। তিনি আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছিলেন। তাই অর্থ দিয়ে ইসলামের সেবায় অবদান রাখতে করতে পারেননি। তবে নিজের মেধা, সাহস ও বীরত্ব দিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অনন্য অবদান রাখেন আলি (রা)।

খিলাফত লাভের আগে ইসলামের খেদমত: ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হিজরতের সময় হযরত আলি (রা) শত্রু পরিবেষ্টিত গৃহে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে রাসুল (স)-এর বিছানায় শুয়ে ছিলেন। তিনি রাসুল (স)-এর কাছে লোকজনের জমা রাখা আমানত রক্ষা করেন এবং মালিকের কাছে তা ফেরত দেন। মহানবি (স)-এর জীবদ্দশায় প্রায় প্রত্যেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আলি (রা) অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। অধিকাংশ যুদ্ধেই তিনি মহানবি (স)-এর পতাকাবাহক ছিলেন। বদর যুদ্ধে বীরত্বের কারণে মহানবি (স) তাঁকে 'জুলফিকার' তরবারি উপহার দেন। উহুদ, খন্দক ও খাইবার যুদ্ধেও আলি (রা) অসাধারণ অবদান রাখেন। খাইবার যুদ্ধে আলি (রা)-এর বীরত্বে খুশি হয়ে মুহাম্মদ (স) তাকে 'আসাদুল্লাহ' বা 'আল্লাহর সিংহ' উপাধি দেন। হযরত আলিই (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক ছিলেন। রাসুল (স)-এর নির্দেশে তিনি হিজরি দশম সালে ইয়েমেনে ইসলাম প্রচার করতে যান এবং সেখানে তিনি সফলভাবে ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। পরে তিনি সেখানে প্রধান কাজি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া হযরত আলি (রা) তাঁর আগের তিনজন খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তাদের খিলাফতের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করেন। তাদের সময়ে উপদেষ্টা পদে থেকে তিনি খলিফাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। হযরত ওসমান (রা)-এর বাসগৃহ শত্রুরা ঘিরে ফেললে তিনি হাসান-হোসেনকে তাঁর গৃহের পাহারায় রেখেছিলেন। এভাবে তিনি খলিফা হওয়ার আগে ইসলামের খেদমত করেছেন।

জেনে রাখো

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের প্রথম যুদ্ধ ছিল বদরের যুদ্ধ। ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মার্চ বদর প্রান্তরে মক্কার কুরাইশ ও মদিনার মুসলমানদের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের নেতৃত্বে ছিলেন— হযরত মুহাম্মদ (স)। তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। অন্যদিকে কুরাইশদের নেতৃত্বে ছিল আবু জেহেল। তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০০০ জন। যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। এ যুদ্ধকে মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ বলা হয়। এ যুদ্ধে অসত্যের ওপর সত্যের বিজয় হয় এবং মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস ও ইমানি শক্তি বেড়ে যায়।

খিলাফত লাভ

৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত ওসমান (রা) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করলে খিলাফতের সর্বত্র বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় মিসরীয় বিদ্রোহী দলের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ইসলামের চতুর্থ খলিফা হিসেবে হযরত আলি (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন। কুফা ও বসরা থেকে আগত বিদ্রোহীরাও এ প্রস্তাব সমর্থন করে। কিন্তু হযরত আলি (রা) খিলাফতের

দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানান। কিন্তু পরে মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিরা তাকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানালে তিনি তা উপেক্ষা করতে পারেননি। এরূপ পরিস্থিতিতে ৬৫৬ সালের ২৩ জুন হযরত আলি (রা) ইসলামের চতুর্থ খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হলে সবাই তার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, ‘কার্যত সমগ্র মুসলিম বিশ্ব তার উত্তরাধিকারত্বে স্বীকৃতি জানায়।’[৩৭]

প্রাথমিক সমস্যাসমূহ

হযরত আলি (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হাশেমি ও উমাইয়া গোত্রের প্রায় একশ বছরের পুরনো দ্বন্দ্ব পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নতুন খলিফা হাশেমি গোত্রের লোক ছিলেন। তাই খলিফা ওসমান (রা)-এর সময় সুবিধাভোগী উমাইয়াদের প্ররোচনায় গোটা উমাইয়া গোত্র আলি (রা)-এর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। তারা তাৎক্ষণিকভাবে হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করে। বিশিষ্ট সাহাবি হযরত তালহা, যুবাইর, রাসুল (স)-এর স্ত্রী বিবি আয়েশাসহ অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি খলিফা ওসমান (রা)-কে হত্যার বিচার দ্রুত করার দাবি জানান। ফলে মুসলমানদের মধ্যে হত্যাকারীদের বিচারের দাবি প্রবল আকার ধারণ করে। খলিফা আলি (রা) এ হত্যাকাণ্ডের বিচার করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তৎকালীন গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ওই হত্যার বিচারকাজ খুব দ্রুত করা সম্ভব ছিল না। বিচারকাজ বিলম্বিত হওয়ায় উমাইয়ারা মিথ্যা প্রচারণা চালায় যে, ওসমান (রা) হত্যাকাণ্ডে আলি (রা) জড়িত ছিলেন। অন্যদিকে একদল লোক ওসমান (রা)-এর নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের রদবদল এবং উমাইয়াদের অন্যায়ভাবে দখলকৃত জায়গির ও ভূ-সম্পত্তি সরকারের কাছে ফিরিয়ে আনার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ফলে হযরত আলি (রা) খিলাফত লাভের পর ইসলামি সাম্রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে।

খলিফা আলি (রা)-এর গৃহীত প্রাথমিক পদক্ষেপ: অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যেই বিদ্রোহীদের সন্তুষ্টি অর্জন এবং প্রশাসনে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে খলিফা কুফা, বসরা, মিসর ও সিরিয়ার প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নতুন লোক নিয়োগ দেন। কুফা, বসরা ও মিসরের প্রাদেশিক শাসনকর্তারা খলিফার নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া (রা) খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যার বিচারের আগে এ নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে খলিফা আলি (রা)-এর সাথে তার বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ বিরোধই পরবর্তী সময়ে খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের পতনে ভূমিকা রাখে। দায়িত্ব গ্রহণের পর খলিফা আলি (রা)-এর উমাইয়াদের অন্যায়ভাবে দখল করা সরকারি ভূসম্পত্তি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশে সিরিয়ার প্রদেশপাল মুয়াবিয়া (রা)সহ অনেক প্রভাবশালী উমাইয়া রাজনীতিবিদের স্বার্থহানি ঘটে। ফলে তারা খলিফার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত আলি (রা)-এর পিতার নাম কী? *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]*
২. বালকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন কে?
৩. হযরত আলি (রা)-এর স্ত্রী কে ছিলেন?
৪. কোন যুদ্ধে বীরত্বের জন্য আলি (রা) ‘জুলফিকার তরবারি’ লাভ করেন?
৫. ‘আসাদুল্লাহ’ বা আল্লাহর সিংহ উপাধি ছিল কার? *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*
৬. ইসলামের চতুর্থ খলিফা কে ছিলেন?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. খিলাফত লাভের আগে হযরত আলি (রা) ইসলামের সেবায় যে অবদান রেখেছেন তার একটি তালিকা তৈরি করো।
২. প্রাথমিক সমস্যা মোকাবিলায় হযরত আলি (রা)-এর গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছক আকারে লেখো।

---

[৩৭] Practically the whole Muslim world acknowledged his succession. –Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*

পাঠ ২০

হযরত আলি (রা)-এর সময় সংঘটিত জামাল/উষ্ট্রের যুদ্ধ বা ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ (৬৫৬ খ্রি.) [The Battle of Jamal/Camel or the First Civil War of Islam at the time of Hazrat Ali (R) (656 AD)]

খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের কারণে মুসলিম সমাজে মারাত্মক আন্তঃকলহ সৃষ্টি হয়। তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়। উন্মোচিত হয় গৃহযুদ্ধের দ্বার। হযরত আলি (রা)-এর শাসনামলে পরপর তিনটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এগুলো হলো উষ্ট্র, সিফফিন ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে উষ্ট্রের যুদ্ধকে ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ বলা হয়।

উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ

ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি: হযরত আলি (রা) ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ জুন খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার দায়িত্ব লাভের পর পরই রাসুল (স)-এর বিশিষ্ট সাহাবি তালহা ও যুবায়ের (রা) খলিফার কাছে ওসমান (রা)-এর হত্যার বিচারের দাবি জানান। কিন্তু তখনকার গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়া কঠিন ছিল। কারণ খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ড ছিল একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ঘটনা। এ হত্যার পেছনে কুফা, বসরা ও মিসরের বহু লোক জড়িত ছিল। অপরাধীদের তাৎক্ষণিক শাস্তি দিলে ওই অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়া এবং খিলাফতে ভাঙন শুরুর আশঙ্কা ছিল। এ কারণে খলিফা দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এটি ছিল উষ্ট্রের যুদ্ধের অন্যতম কারণ।

তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশা: সৈয়দ আমীর আলীর মতে, 'তালহা ও যুবায়ের (রা) যথাক্রমে কুফা ও বসরার শাসনকর্তার পদ লাভের জন্য হযরত আলি (রা)-এর কাছে প্রস্তাব করেন। কিন্তু খলিফা তাদের এ দাবি পূরণ না করায় তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।'[৩৮] ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি ও উইলিয়াম মুর মনে করেন, 'তালহা ও যুবায়ের মুসলিম বিশ্বের খলিফা পদ লাভে আগ্রহী ছিলেন।' তাই তারা হযরত আলি (রা)-এর সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু হিট্টি এবং মুরের এ মতামত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ তালহা ও যুবায়ের (রা) খিলাফত লাভে আগ্রহী হলে আরও আগেই সে দাবি তোলার সুযোগ তাদের ছিল। তারা খলিফা ওমর (রা)-এর সময় গঠিত নির্বাচনি পরিষদের সদস্য ছিলেন। খলিফা হওয়ার ইচ্ছা থাকলে তখনই সে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। কিন্তু তারা তা করেননি। বস্তুত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য নীতিগত বিরোধের কারণে তারা খলিফার বিরোধিতা করেছিলেন।

ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার: হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে বিলম্ব হওয়ায় তালহা ও যুবায়ের (রা) অসন্তুষ্ট হন। তারা হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করে মদিনা ত্যাগ করেন। এ সময় উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশা (রা) মক্কায় হজ আদায় শেষে মদিনায় ফিরছিলেন। তিনি মদিনার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন এবং বিদ্রোহীদের শাস্তি বিধানের দাবিতে তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর পক্ষে যোগ দেন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'আবু বকরের কন্যা আয়েশা আলির প্রতি সীমাহীন বিদ্বেষ পোষণ করায় তিনিও বিদ্রোহকে উস্কে দিয়েছেন।'[৩৯]

আয়েশা (রা)-এর বিদ্বেষ: ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত বনি মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে হযরত আয়েশা (রা) গলার হার হারিয়ে ফেলেন। এটি খুঁজতে গিয়ে তিনি কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়েন। এ সময় অনেকে তার চরিত্র নিয়ে মিথ্যা অপবাদ রটায়। পরে ওহি নাজিলের মাধ্যমে আল্লাহ বিবি আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করেন। সৈয়দ আমীর আলীসহ কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ নিয়ে যখন জল্পনাকল্পনা চলছিল তখন মহানবি (স) এ বিষয়ে

---

[৩৮] Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, P.50

[৩৯] Ayesha, the daughter of Abu Bakr, who entertained as inconceivable dislike to Ali, fanned the flame. –Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.50

হযরত আলি (রা)-এর মতামত চেয়েছিলেন। আলি মহানবি (স)-কে বিবি আয়েশা (রা)-এর দাসী কবিরাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে পরামর্শ দেন। সৈয়দ আমীর আলীসহ কয়েকজন ঐতিহাসিকের ভাষ্য, এজন্য হযরত আয়েশা (রা) হযরত আলি (রা)-এর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু আয়েশা (রা) আসলে বিদ্বেষের কারণে খলিফার বিরোধিতা করেননি। খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতেই তিনি তালহা ও যুবায়েরের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। আয়েশা (রা)-এর আপন ভাই মুহম্মদও ওসমান হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল। তিনি তাকেও ক্ষমা করতে রাজি ছিলেন না।

জেনে রাখো

হযরত আয়েশা (রা) ৬১৩/৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবু বকর (রা) এবং মায়ের নাম উম্মে রুম্মান। তার উপাধি 'সিদ্দিকা' ও 'হুমায়রা'। শিশুকাল থেকেই তিনি প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। নবুয়তের দশম বছর মহানবি (স)-এর সাথে তার বিয়ে হয়। বাল্যকালেই তিনি কাব্য, সাহিত্য এবং ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে আয়েশা (রা) তাফসির, হাদিস, ফিকাহশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। নারীদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। তিনি মানুষকে শিক্ষাদান করতেন। নারীদের সম্পর্কে অধিকাংশ মাসয়ালা আয়েশার কাছে জিজ্ঞাসা করা হতো। ঐতিহাসিক ইবনে শিহাব জুহুরির মতে, মানুষের মধ্যে আয়েশা সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন। ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।

যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি ও ঘটনা

তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর বসরা দখল: হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে তালহা ও যুবায়ের হযরত আলি (রা)-এর প্রতি তাদের আনুগত্যের শপথ প্রত্যাহার করে মদিনা ত্যাগ করেন। মক্কার দিকে যাওয়ার সময় তাদের সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এর দেখা হয়। তালহা ও যুবায়ের (রা) তাকেও দলে ভিড়িয়ে নিতে সক্ষম হন। তারা মদিনা, মক্কা ও ইরাকের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৩,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বসরা দখল করেন।

হযরত আলি (রা)-এর প্রস্তুতি ও শান্তি প্রস্তাব পেশ এবং কোরায়বার যুদ্ধ: হযরত আলি (রা) সিরিয়ার শাসক মুয়াবিয়ার বিদ্রোহ দমনের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর বসরা দখলের খবর পান। কাজেই তিনি মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর না হয়ে ২০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ বসরার দিকে রওনা হন। কুফা নগরী হয়ে যাওয়ার সময় কুফার ৯ হাজার লোক হযরত আলি (রা)-এর সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। খিলাফতের শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বার্থে হযরত আলি (রা) বসরায় উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ ও রক্তপাত এড়ানোর লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দেন। হযরত তালহা, যুবায়ের ও হযরত আয়েশা (রা) এ প্রস্তাবে সম্মত হন। কিন্তু শান্তি আলোচনার অগ্রগতিতে ওসমান (রা) হত্যায় জড়িত ইবনে সাবার অনুসারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কারণ এ আলোচনা সফল হলে তাদেরকে বিচারের মাধ্যমে শাস্তিভোগ করতে হতো। তাই ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর তারা খলিফা আলি (রা)-এর অজ্ঞাতসারে কোরায়বা নামে একটি স্থানে হযরত আয়েশা (রা)-এর শিবিরে রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত সেনাদের ওপর আক্রমণ করে। এতে অনেক সেনা হতাহত হয়।

তালহা ও যুবায়ের (রা) নিহত এবং আয়েশার (রা) পরাজয়: রাতের বেলা আকস্মিক এ আক্রমণের সংবাদে আলি (রা) ও বিবি আয়েশা (রা) উভয়েই বিস্মিত হন। যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভোরে হযরত আয়েশা (রা) উটে এবং খলিফা আলি (রা) ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করেন। ষড়যন্ত্রকারীদের মূল লক্ষ্য ছিল নেতৃবৃন্দ। তাদের ষড়যন্ত্রে ইবনে সাবার অনুচরদের হাতে হযরত তালহা ও যুবায়ের (রা) শহিদ হন। হযরত আলি (রা) বহু কষ্টে যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হন। তিনি আয়েশা (রা)-কে উদ্ধার করে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। বিবি আয়েশা (রা) উটের পিঠে চড়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন বলে এ যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে উষ্ট্রের যুদ্ধ বা জঙ্গে জামাল নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে ১০ হাজারের মতো মুসলিম সৈন্য শাহাদাতবরণ করেন।

যুদ্ধের ফলাফল

মুসলমান-মুসলমান যুদ্ধ সূচনা: উষ্ট্রের যুদ্ধ কোনো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ না হলেও, এ যুদ্ধ দুটি মুসলিম সেনাদলের মধ্যে সংঘটিত হয়। মুসলমানরা এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে রক্তপাতের সূচনা করে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, 'ফলাফলের দিক থেকে উষ্ট্রের যুদ্ধ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা না হলেও সম্মুখযুদ্ধে দুই মুসলিম সেনাদলের শক্তি পরীক্ষার নজির এ যুদ্ধেই প্রথম সূত্রপাত হয়। মুসলমানদের মধ্যে গোত্রগত দ্বন্দ্ব-কলহের সূচনার বীজও এ যুদ্ধে নিহিত ছিল।'[৪০]

প্রশাসনিক রদবদল: উষ্ট্রের যুদ্ধের ফলে বসরা ও কুফায় হযরত আলি (রা)-এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মক্কা, বসরা ও কুফায় মুসলমানদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল এ যুদ্ধে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধের পর মদিনা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রদবদল ঘটে। কায়েস ইবনে সাদকে মিসর, সাহল ইবনে হানিফকে হেজাজ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। এ যুদ্ধের পর খলিফার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ ছিল মদিনা থেকে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর। ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল কুফায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। এর ফলে মহানবি (স)-এর স্মৃতি বিজড়িত ও মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় কেন্দ্রমূল মদিনার রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পায়। এ ঘটনায় মদিনায় বসবাসরত সাহাবারা মর্মাহত হন এবং অভিমানবশে অনেকেই খিলাফতে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন, যা হযরত আলি (রা)-এর জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছিল।

গৃহযুদ্ধের বিস্তৃতি: উষ্ট্রের যুদ্ধ একটি ষড়যন্ত্রের যুদ্ধ এবং ষড়যন্ত্রের কারণেই এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর ফলেই পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বে গৃহযুদ্ধ বিস্তৃতি লাভ করে। পি. কে. হিট্টি বলেন, 'যে রাজ্যে বংশগত লড়াই বারেবারে ইসলামের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে তার সূত্রপাত হয় এভাবেই।'[৪১]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

. ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ কোনটি? */ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮/*
২. উষ্ট্রের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? */সি. বো., ব. বো. ২০২১; সকল বোর্ড ২০১৬/*
৩. কোন যুদ্ধে বিবি আয়েশা (রা) উটের পিঠে বসে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন?
৪. উষ্ট্রের যুদ্ধে আয়েশা (রা)-এর প্রতিপক্ষ কে ছিলেন?
৫. বিশিষ্ট সাহাবি হযরত তালহা ও যুবায়ের (রা) কোন যুদ্ধে শহিদ হন?
৬. হযরত আলি (রা) মদিনা থেকে কোথায় রাজধানী স্থানান্তর করেন?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. উষ্ট্রের যুদ্ধ যাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল তাদের নামের একটি তালিকা তৈরি করো।
২. উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল চিহ্নিত করে ছক আকারে লেখো।

---

[৪০] Thus came to an end the first, but by no means the last, encounter in which Moslem stood against Moslem in battle array. The dynastic wars that were to convulse Islam from time to time and occassionally shake it to its very foundation had just begun. –Ref: P.K Hitti, *History of the Arabs*, P.180

[৪১] The dynastic wars that were to convulse Islam from time to time and occasionally shake it to its very foundation has just begun. –Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, P.180

পাঠ ২১

হযরত আলি (রা) ও আমির মুয়াবিয়া (রা)-এর দ্বন্দ্ব এবং সিফফিনের যুদ্ধ (৬৫৭ খ্রি.)

Conflict between Hazrat Ali (R) and Amir Muawiyah and The Battle of Siffin (657 AD)

উষ্ট্রের যুদ্ধের পর মক্কা, মদিনা, ইরাক ও মিসরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও সিরিয়ার পরিস্থিতি প্রায় আলি (রা)-এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সেখানকার গভর্নর মুয়াবিয়া (রা) নানা কারণে আলি (রা)-এর সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। উষ্ট্রের যুদ্ধের পর আলি (রা) মুয়াবিয়া (রা)-কে মুসলিম জাহানের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দেন। কিন্তু ওসমান (রা) হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মুয়াবিয়া (রা) আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো সিফফিনের গৃহযুদ্ধ।

সিফফিনের যুদ্ধের কারণ

হাশেমি ও উমাইয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব: মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের দুটি শাখা হাশেমি ও উমাইয়া গোত্র প্রায় একশ বছর ধরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। হযরত আলি (রা) ছিলেন হাশেমি গোত্রের সদস্য, তাই তাঁর খিলাফত লাভে উমাইয়ারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এ সময় আলি (রা) উমাইয়াদের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারণ করে হাশেমিদের নিয়োগ দেন। তাই মুয়াবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বে উমাইয়ারা আলি (রা)-এর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। এর ফলে দুই গোত্রের শত্রুতা নতুনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আলি (রা) ও সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা) এ দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, 'ইসলামের রাজনৈতিক মঞ্চে প্রাধান্য বিস্তার করবে কে? সিরিয়া না ইরাক, কুফা না বসরা! এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো।'

মুয়াবিয়া (রা)-এর অসহযোগিতা: হযরত আলি (রা) খলিফা নির্বাচিত হয়ে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা)-কে পদত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু তিনি ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের বিচার না করা পর্যন্ত পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানান। এছাড়া আলি (রা) খিলাফতে আরোহণ করেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ও কোষাগারের হিসাব নিতে শুরু করেন। ফলে সরকারি সম্পত্তি যাদের ব্যক্তিগত মালিকানায় ছিল তারা সমস্যায় পড়ে। উমাইয়া গোত্রের সদস্যরা, বিশেষ করে মুয়াবিয়া (রা) খলিফা ওসমান (রা)-এর সময় বিপুল ধনসম্পত্তি জমা করে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। আলি (রা) তাদের অবৈধভাবে দখল করা জমি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন'। আলি (রা)-এর ভূমি ও রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতি মুয়াবিয়াসহ উমাইয়া গোত্রের অনেক লোকের স্বার্থের পরিপন্থি ছিল। তাই তারা খলিফাকে প্রশাসন পরিচালনায় অসহযোগিতা করে।

ওসমান (রা) হত্যার প্রতিশোধ দাবি: মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের বিচার তাৎক্ষণিকভাবে করা আলির পক্ষে সম্ভব নয়— মুয়াবিয়া (রা) এটা বুঝতে পেরে বিচারকাজে খলিফার বিলম্বকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন। তিনি এ হত্যাকাণ্ডের সাথে হযরত আলি (রা) নিজেও জড়িত ছিলেন বলে মিথ্যা প্রচারণা চালাতে শুরু করেন। এ প্রচারণার জন্য মুয়াবিয়া (রা) নিহত খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর রক্তে রঞ্জিত পোশাক ও তার স্ত্রী নায়লার কাটা আঙুল দেখিয়ে সিরিয়ার লোকদের উত্তেজিত করে তোলেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, 'মুয়াবিয়া দামস্কের মসজিদে শহিদ হওয়া খলিফার রক্তে রঞ্জিত জামা এবং তাকে রক্ষা করতে আসা তার স্ত্রী নায়লার কাটা আঙুল প্রদর্শন করেন।'[৪২]

হযরত আয়েশা (রা) বিরোধিতা: ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ দাবিকারীদের অন্যতম ছিলেন হযরত আয়েশা (রা)। তিনি বিশিষ্ট সাহাবি তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর সাথে যোগ দিয়ে বসরা দখল করেছিলেন। এর ফলে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ ঘটনাও আলি (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর দ্বন্দ্বে ইন্ধন জোগায়।

সিফফিনের যুদ্ধ (৬৫৭ খ্রি.): ইসলামের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য উষ্ট্রের যুদ্ধের পর খলিফা আলি (রা) ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে মুয়াবিয়ার বিদ্রোহ দমনের জন্য দামেস্কের দিকে অগ্রসর হন। অপরদিকে মুয়াবিয়া ৬০,০০০ সৈন্যসহ ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত সিফফিন প্রান্তরে পৌছান। অহেতুক রক্তপাত এড়ানোর জন্য আলি (রা) মুয়াবিয়া (রা)-কে আনুগত্য প্রকাশের জন্য পুনরায় আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি এতে সম্মত না হওয়ায় যুদ্ধ

---

[৪২] Muawiyah exhibited in the Damascus mosque the blood-stained shirt of the murderd ruler and the fingers cut from the hand of his wife Nailah as she tried to defend him. –Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.180

অনিবার্য হয়ে পড়ে। ২৬ জুলাই দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। হযরত আলি (রা)-এর সেনাপতি মালিক আল আসতারের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে মুয়াবিয়া (রা)-এর সেনাবাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পরাজয় অনিবার্য বুঝতে পেরে মুয়াবিয়া (রা) তার সেনাপতি ও উপদেষ্টা আমর ইবনুল আসের পরামর্শে যুদ্ধ স্থগিত রাখার জন্য পতাকা শীর্ষে ও বর্শার মাথায় পবিত্র কুরআন শরিফ বিদ্ধ করে সন্ধি শর্তের আহ্বান জানান। খলিফা তার প্রতিপক্ষ মুয়াবিয়া (রা) কৌশলের মর্মার্থ উপলব্ধি করে বিজয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান। কিন্তু খলিফার পক্ষে যুদ্ধরত হাফিজরা কুরআনের পবিত্রতা ও সম্মান রক্ষার্থে সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে হযরত আলি (রা) যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হন।

দুমাতুল জন্দলের সালিশ (৬৫৯ খ্রি.): যুদ্ধ বন্ধের পর বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য হযরত আলি (রা)-এর পক্ষে আবু মুসা আল আশারি এবং মুয়াবিয়া (রা) পক্ষে আমর ইবনুল আসকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী দুমাতুল জন্দল নামে একটি স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে সালিশি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে উভয় পক্ষের প্রায় ৮০০ প্রতিনিধি অংশ নেন। তবে মূল আলোচনা শুরুর আগে দুপক্ষের দলনেতা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসেন। আবু মুসা ছিলেন সরলমনা মানুষ। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা) প্রতিনিধি আমর ইবনুল আস ছিলেন একজন কৌশলী কূটনীতিবিদ। তিনি খলিফার প্রতিনিধিকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে খিলাফতের স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা) উভয়কে অপসারণ করতে হবে। আবু মুসা এতে সম্মত হন। আনুষ্ঠানিক বৈঠকে তিনি প্রতিনিধিদের সামনে হযরত আলি (রা)-এর পদচ্যুতি ঘোষণা করেন। কিন্তু আমর ইবনুল আস তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি আলির পদচ্যুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে খিলাফতের শূন্যপদে আমার প্রতিনিধি মুয়াবিয়াকে নিযুক্ত করলাম।' এ রায়ে খলিফার প্রতিনিধিরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। উভয় পক্ষ প্রতিশোধের শপথ নিয়ে বৈঠক ত্যাগ করে। দুমাতুল জন্দলের সালিশের রায় যৌক্তিক নয়। পি. কে. হিট্টি বলেন, 'এ সিদ্ধান্তে আলি (রা) ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। প্রকৃতপক্ষে সালিশ মুয়াবিয়াকে আলির সমকক্ষ করে তোলে এবং আলিকে একজন মিথ্যা দাবিদারের পর্যায়ে নামিয়ে আনে।'

যুদ্ধের ফলাফল

মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট: দুমাতুল জন্দলের সালিশের রায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এতে অযৌক্তিকভাবে একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে খলিফার সমকক্ষ করা হয়েছে। এ সালিশে যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছতে না পারার কারণে মুসলিম জাহানের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এর ফলে একক অপ্রতিরোধ্য মুসলিম শক্তি তাৎক্ষণিকভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যথা- ১. আলি (রা)-এর সমর্থক বা শিয়া, ২. মুয়াবিয়া (রা)-এর দল ও.৩. খারেজি সম্প্রদায়। পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের মধ্যে আরও অনেক দল-উপদলের সৃষ্টি হয়।

খারেজিদের উদ্ভব: হযরত আলি (রা)-এর সেনাদের একটি অংশ যুদ্ধ বন্ধে রাজি ছিল না। দুমাতুল জন্দরের সালিশের রায়ে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের নেতৃত্বে তারা 'লা হুকমা ইল্লাল লিল্লাহ' বা 'আল্লাহর আদেশ ছাড়া কোনো বিধান নেই' ঘোষণা দিয়ে খলিফার দল ত্যাগ করে। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার। খলিফার দল ত্যাগ করায় এরা খারেজি বা দলত্যাগী নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক খোদা বকশ্-এর মতে, "ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দল (Religio-political Group) হিসেবে খারেজি নামে একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।"

আলি (রা)-এর শক্তি হ্রাস ও মুয়াবিয়া (রা)-এর শক্তি বৃদ্ধি: দুমাতুল জন্দলের রায় হযরত আলি (রা)-এর জন্য কূটনৈতিক পরাজয় ছিল। মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। অথচ সালিশে তাকে খলিফা আলি (রা) সমকক্ষ করে তোলা হয় এবং আলিকে একজন মিথ্যা খিলাফতের দাবিদার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এতে স্বাভাবিকভাবে আলি (রা)-এর মর্যাদা কমে যায় এবং মুয়াবিয়া (রা) আরও শ্রদ্ধাভাজন হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, 'আলির মতো খলিফার সাথে তার (মুয়াবিয়ার) চুক্তি হওয়ায় তার সম্মান বেড়ে আলির সমান হলো, পাশাপাশি আলির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলো।[৪৩]

রাজতন্ত্রের উদ্ভব: সিফফিনের গৃহযুদ্ধে পাঁচ হাজার মুসলিম শহিদ হন। একপর্যায়ে আলি (রা)-এর শাহাদাতের সাথে সাথে গণতন্ত্র ও খিলাফতের অবসান ঘটে এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। পি. কে. হিট্টি বলেন, '৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে আলির মৃত্যুর সাথে সাথে আবু বকর (৬৩২)-এর হাত ধরে খিলাফতের যে প্রজাতন্ত্রী যুগের সূচনা হয়েছিল তা শেষ হয়।'[৪৪]

---

[৪৩] The very fact of the arbitrartion itself had raised him (Muawiyah) to a level equivalent to that of Ali, whose position was thereby lowered to that of a more pretender. –Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.181

[৪৪] With the death of Ali' (661) what maybe termed the republican period of the Caliphate, which began with Abu-Bakr (632), came to an end. –Ref: P.K. Hitti, History of the Arabs, p.183

হাশেমি-উমাইয়া দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি: হযরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার গৃহযুদ্ধ হাশেমি ও উমাইয়াদের পুরাতন কলহকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরবর্তী সময়ে ইমাম হাসানকে বিষপানে হত্যা করা হয়, অন্যদিকে কারবালার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে ইমাম হুসাইনের পরিবারের হৃদয়বিদায়ক পরিসমাপ্তি ঘটে।

সাম্রাজ্যের বিভক্তিকরণ: দুমাতুল জন্দলের সালিশি বৈঠক এবং পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত নানা পরিস্থিতির কারণে খলিফা হযরত আলি (রা) মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে একটি সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য হন। এ সন্ধি মোতাবেক সিরিয়া ও মিসর মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয়। মুসলিম জাহানের অবশিষ্ট অংশ হযরত আলি (রা)-এর কর্তৃত্বাধীনে থাকে। এভাবে খিলাফতের বিভক্তি ঘটে। হযরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার গৃহযুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের সংহতি, ঐক্য ও সমৃদ্ধির জন্য ছিল এক সুদূরপ্রসারী অশনি সংকেত। ঐতিহাসিক ভন ক্রেমারের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'যদি আলি ও মুয়াবিয়ার মধ্যে কোনো সংঘর্ষ না হতো এবং ইসলামের পরবর্তী যুগ গোলযোগবিহীন হতো তাহলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ আরও প্রীতিকর ও সম্ভবত অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হতো।'

হযরত আলি (রা)-এর ব্যর্থতার কারণ: হযরত আলি ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধে খলিফা হযরত আলি (রা)-এর ব্যর্থতার মূলে বেশকিছু কারণ ছিল। **প্রথমত,** একজন যোদ্ধা ও বিদ্বান হিসেবে খলিফা আলি (রা) মুয়াবিয়া (রা) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। তবে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং কূটনৈতিক মেধায় মুয়াবিয়া (রা) আলি (রা) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর এ কারণেই মুয়াবিয়া (রা)-কে নিয়ন্ত্রণে হযরত আলি (রা) যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হন। একই কারণে তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের বিচার-সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের দাবির বিষয়টি যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারেননি। বিচারকাজে দীর্ঘসূত্রিতা প্রতিপক্ষের প্রতি সাধারণ মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন বৃদ্ধি করেছিল। চতুর মুয়াবিয়া (রা) এ বিষয়টিকে তার স্বার্থ হাসিলের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। খলিফার বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীদের বিচার না করা এবং তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ এনে তাকে দুর্বল করা হয়। **দ্বিতীয়ত,** মদিনা থেকে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর, মহানবি (স)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে বিরোধ ও যুদ্ধ এবং তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি কারণে মহানবি (স)-এর অনেক সাহাবি হযরত আলি (রা)-কে সহায়তা দানে বিরত থাকেন। **তৃতীয়ত,** মদিনা থেকে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর খলিফার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। কেননা এর ফলে তিনি মক্কা-মদিনাবাসীর সহানুভূতি হারান। অন্যদিকে কুফাবাসীও বিপদে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াননি। সিরিয়াবাসী যেমন মুয়াবিয়া (রা)-কে সহায়তা করেছিলেন, আলি (রা)-এর পক্ষে কুফাবাসীর এরূপ সমর্থন ছিল না। **চতুর্থত,** হাশেমি ও উমাইয়াদের চিরাচরিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হযরত আলি (রা)-এর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল। উমাইয়ারা তাদের প্রতিনিধি মুয়াবিয়া (রা)-কে যেভাবে সমর্থন দিয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশত হাশেমিদের কাছ থেকে হযরত আলি (রা) সেরূপ সমর্থন পাননি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত আলি (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের নাম কী?
২. সিফফিনের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
৩. হাশেমি ও উমাইয়া গোত্র কোন বংশের শাখা ছিল?
৪. মুয়াবিয়া (রা) কোন অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিল?
৫. হযরত আলি (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার জন্য কোথায় সালিশ বসে?
৬. দুমাতুল জন্দলের সালিশিতে কে বিশ্বাসঘাতকতা করে?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণগুলো ছক আকারে লেখো।
২. কূটনৈতিক জ্ঞানের অভাবই হযরত আলি (রা)-এর পরাজয় ডেকে এনেছিল— পাঁচটি যুক্তি দিয়ে বিষয়টি প্রমাণ করো।

পাঠ ২২

শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাদের মতবাদ
The Emergence of Shiaism and Their Doctrines

শিয়াদের পরিচয়

'খিলাফত' ও 'ইমামত' প্রশ্নে ইসলামের প্রথম যুগেই মুসলমানদের মধ্যে দুটি বিবদমান দলের উদ্ভব হয়। একটি হলো 'শিয়া', অপরটি সুন্নি। 'শিয়া' আরবি শব্দ। এর অর্থ দল, সমর্থক, অনুসারী প্রভৃতি। *'এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিক্স'* গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী, 'শিয়া একটি সমষ্টিবাচক শব্দ যার অর্থ হচ্ছে দল বা অনুসারী।'[৪৫] ইসলামের ইতিহাসে 'শিয়া' শব্দটি দিয়ে মহানবি (স)-এর জামাতা হযরত আলি (রা)-এর অনুসারীদের সমন্বয়ে গঠিত দলকে বোঝায়। *'দি ম্যাকমিলান ফ্যামিলি এনসাইক্লোপিডিয়া'* গ্রন্থে শিয়াদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'শিয়া হচ্ছে সেই গোষ্ঠী যারা দাবি করে যে, একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (স)-এর গোত্রভুক্ত, বিশেষ করে তাঁর কন্যা ফাতিমা এবং তার স্বামী আলির বংশধরেরাই শিয়া।'[৪৬] পি. কে. হিট্টি শিয়াদের সম্পর্কে বলেন, 'খিলাফতের প্রশ্নে ইসলামের প্রাথমিক যুগে সৃষ্ট বিভক্তির ফলে গড়ে ওঠা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর একটি হলো শিয়া গোষ্ঠী।'[৪৭] *'The Social Structure of Islam'* গ্রন্থের রচয়িতা আর. লেভি (R. Levy) বলেন, 'রাজনৈতিক দল হিসেবে উদ্ভব হলেও শিয়ারা এক পর্যায়ে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।'[৪৮] সুতরাং এ কথা বলা যেতে পারে যে, ইসলামে 'খিলাফত' ও 'ইমামত' প্রশ্নে যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে হযরত আলি (রা)-কে সমর্থন করে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত লোকেরাই শিয়া মুসলিম।

শিয়াদের উৎপত্তি ও বিকাশ

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মৃত্যুর পর ইসলামের খলিফা কে হবেন তা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দেয় এবং চারটি দলের উদ্ভব হয়। এ অবস্থায় হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা)-কে খলিফা ঘোষণা করে তার হাতে বায়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেন। এরপর সবাই তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেন। কিন্তু হযরত আলি (রা)-কে সমর্থন দেওয়া দলটি এ মনোনয়নকে পছন্দ করেনি। পরবর্তী সময়েও আলি (রা)-এর বদলে পর্যায়ক্রমে হযরত ওমর (রা) ও ওসমান (রা) খলিফা মনোনীত হলে তাঁরা চরমভাবে অসন্তুষ্ট হয়। ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যা করে আলি (রা)-কে ক্ষমতায় বসায়। ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আলি (রা) ও সিরিয়ার বিদ্রোহী শাসক মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে ইউফ্রেটিসের তীরে অবস্থিত সিফফিনের যুদ্ধ হয়। এক পর্যায়ে যুদ্ধবিরতি হয় এবং দুমাতুল জন্দলে সালিশি সভা বসে। এ সভায় আলি (রা)-এর সাথে প্রতারণা করে মুয়াবিয়া (রা)-কে খলিফা ঘোষণা করা হয়। ফলে আলি (রা)-এর প্রতি তাঁর অনুসারীদের সমর্থন দৃঢ় হয় এবং তারা শিয়া নামটি গ্রহণ করে। *'দি এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন'* গ্রন্থের বর্ণনা মতে, 'ঐতিহাসিকভাবে প্রথম গৃহযুদ্ধের সময়ে আলি (রা)-এর সহযোগী হিসেবে (হি. ৩৫-৪০/ খ্রি. ৬৫৬-৬৬১) শিয়াদের উদ্ভব ঘটেছিল।[৪৯] হযরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার গৃহযুদ্ধের সময় শিয়াদের উৎপত্তি ঘটলেও ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে খারেজিদের হাতে হযরত আলি (রা) শাহাদাতবরণ পরই কেবল তারা একটি সংগঠিত রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াজিদ আগের শত্রুতার জের ধরে কারবালায় আলি (রা)-এর পুত্র ইমাম হুসাইনকে সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এর প্রতিক্রিয়ায় শিয়ারা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে কুফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পি. কে. হিট্টি বলেন, 'শিয়া মতবাদ গঠনে আল হুসাইনের রক্ত তার পিতার চেয়েও বেশি কার্যকর বীজ বলে প্রমাণিত হলো। ১০ মরহরম শিয়া মতবাদের জন্ম হয়।[৫০]

---

[৪৫] The term 'Shiah' is a collective term meaning 'party' or following. – Ref: *The Encyclopedia of Religion & Ethics,* Vol-11, p.453

[৪৬] The Shiah are those who insisted that only members of the prophet's clan, specially, the descendants of Muhammad's daughter Fatima and her husband Ali. –Ref: *The Macmillan Family Encyclopedia,* Vol-17, p.327

[৪৭] The Shiah, one of the two hostile camps in which early Islam split on the issue of the caliphate. –Ref . P. K. Hitti, *History of the Arabs,* p.247

[৪৮] Shiah who originally were a political party but became also a religious community. –Ref. R. Levy, *The Social Structure of Islam,* p.171

[৪৯] Historically, the Shiah emerged in support of the caliphate of Ali (AH 35-40/656-661 C.E.) during the firsy civil war. –Ref: *The Encyclopedia of Religion,* Vol-13, p.242

[৫০] The blood of Al-Husayn, even more than that of his father, proved to be the seed of the Shiite church. Shi'ism was born on the tenth of Muharram. –Ref. P. K. Hitti, *History of the Arabs,* p.191

শিয়া উপদলসমূহ: এক পর্যায়ে ইমামতের প্রশ্নে শিয়ারা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে তাদের মধ্যে কয়েকটি উপদলের সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে সাতজন ইমামে বিশ্বাসী দলটি সাবিয়া বা ইসমাঈলীয়, দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী দলটি ইসনা আশারিয়া এবং চতুর্থ ইমাম জয়নুল আবেদীনের পুত্র যায়েদের অনুসারী দলটি যায়েদীয়া নামে পরিচিত।

শিয়াদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদ

ইমাম তত্ত্ব: শিয়ারা মুহাম্মদ (স)-কে ইসলামের নবি তথা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে মান্য করে। তাদের মতে, মুসলিম জাহানের নেতৃত্ব বা ইমামতি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বংশধরদের জন্মগত অধিকার। কাজেই রাসুল (স)-এর মেয়ে ফাতেমা এবং তার স্বামী হযরত আলির বংশধরেরাই কেবল ইমামতি করতে পারবেন, অন্য কেউ নন।

কালেমা তত্ত্ব: শিয়ারা 'লা-ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এ কালেমার সাথে 'আলি খলিফাতুল্লাহ' বা 'আলি আল্লাহর প্রতিনিধি' যুক্ত করে পড়েন।

কুরআন তত্ত্ব: শিয়াদের মতে, পবিত্র কুরআন সৃষ্ট নয় (গায়রে মাখলুক)। তারা সুন্নিদের দোষারোপ করে বলে যে, কুরআনের যে সব আয়াত তাদের সমর্থনে ছিল সেগুলো তারা গোপন করেছে। শিয়ারা মনে করে, পবিত্র কুরআন ও হাদিসই সর্বজ্ঞানের আধার এবং ইজমা ও কিয়াসের কোনো প্রয়োজন নেই।

হাদিস তত্ত্ব: শিয়ারা কুরআনের সাথে হাদিসকেও গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু তারা হাদিস সম্পর্কে বলে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু হুরায়রা প্রমুখ রাবি (হাদিস বর্ণনাকারী) আলি (রা)-এর ইমামত লাভ সম্পর্কিত হাদিস গোপন করেছেন।

মাহদী তত্ত্ব: শিয়ারা ইমাম তত্ত্বের পাশাপাশি মাহদী তত্ত্বও নিজেদের মতো করে সৃষ্টি করেছে। তাদের মতে, দেশ বা মানুষকে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করতে ইমাম মাহদী দুনিয়াতে আসবেন এবং ন্যায়বিচার, শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বর্গীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। সৈয়দ আমীর আলীর মতে 'মূলত রাজনৈতিক কারণেই এ মতটি প্রচারিত হয়েছিল।'[৫১]

ইমামত ও ইমাম নির্বাচন: 'ইমামত' একটি পদের নাম। রাসুল (স)-এর অবর্তমানে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার একক কর্তৃত্বকে 'ইমামত' বলে। এ পদে যিনি অধিষ্ঠিত হবেন তিনি হচ্ছেন ইমাম। শিয়াদের মধ্যে নানা উপদল থাকলেও ইমামতের প্রশ্নে সবাই একমত পোষণ করে। তাদের মতে, ইমাম জনসাধারণের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে পারে না। কারণ মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাদের নির্বাচন ভুল হতে পারে। সে জন্য ইমাম অবশ্যই স্বর্গীয়ভাবে নির্বাচিত হবেন। তাই আল্লাহর রাসুল ও তার বংশধরদের মধ্য থেকে বংশানুক্রমে ইমাম নির্বাচিত হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত আলি (রা)-এর অনুসারীরা ইতিহাসে কী নামে পরিচিত?
২. 'শিয়া' শব্দের অর্থ কী?
৩. কীসের প্রশ্নে শিয়ারা বিভক্ত হয়ে পড়ে?
৪. সাত জন ইমামে বিশ্বাসী দলটি কী নামে পরিচিত?
৫. ইজমা, কিয়াস অস্বীকার করে কারা?
৬. ইমাম জনসাধারণের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে পারে না— এটি কাদের মত?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

দুটি দলে বিভক্ত হয়ে শিয়াদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করো।

---

[৫১] Ref: Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam.*

পাঠ ২৩

খারেজি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাদের মতবাদ
The Rise of Kharijites and Their Doctrines

খারেজিদের পরিচয়

আরবি শব্দ 'খারাজ' থেকে খারেজি শব্দটি এসেছে। এর অর্থ দলত্যাগী। এ আর এ নিকলসন বলেন, 'খারেজি বলতে তাদেরকে বোঝায় যারা আল্লাহর নামে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন।'[৫২] মুহাম্মদ আল শাহরাস্তানির *'মিলাত ওয়ান-নিহাল'* গ্রন্থে বলা হয়েছে, আলি ও মুয়াবিয়ার মধ্যে 'দুমাতুল জন্দলের' সালিশি বৈঠককে কেন্দ্র করে যে দলটি 'লা হুকমা ইল্লা-লিল্লাহ' বা 'আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান নেই' এ আওয়াজ তুলে খলিফা আলির পক্ষ ত্যাগ করেছিল তারাই মূলত খারেজি নামে পরিচিত। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, উমাইয়াদের বিলাসিতা ও আর্থিক লালসার বিরোধিতা থেকেই খারেজিদের সৃষ্টি।

খারেজিদের উত্থান ও ক্রমবিকাশ

সিফফিনের যুদ্ধে খলিফা হযরত আলি (রা)-এর সেনাদের একটি অংশ যুদ্ধ বন্ধে রাজি ছিল না। দুমাতুল জন্দলের সালিশের রায়ে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের নেতৃত্বে তারা 'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ' বা 'আল্লাহর আদেশ ছাড়া কোনো বিধান নেই' ঘোষণা দিয়ে খলিফার দল ত্যাগ করে। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার। তারা মানুষের সালিশি মানতে অস্বীকার করে। এ অসন্তুষ্ট গোষ্ঠী খলিফার সাথে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ করে তার দল ত্যাগ করায় এদেরকে খারেজি বলা হয়। দুমাতুল জন্দলের সালিশের পর তারা আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের নেতৃত্বে হারুরা নামে একটি স্থানে একত্র হয়। হারুরায় প্রথম সমবেত হয়েছিল বলে ইতিহাসে তারা 'হারুরি' নামেও পরিচিত। খারেজিরা মূলত একটি উগ্র ধর্মীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। খলিফা আলি (রা) ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেন। এরপর তারা খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে উমাইয়া ও আব্বাসি শাসনামলে খারেজিরা অনেকবার বিদ্রোহ করে। ফাতেমি খলিফাদের হাতে তাদের চূড়ান্ত পতন হয়।

খারেজিদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদ

ধর্মীয় কর্তব্য: খারেজিদের মতে, কোনো মুসলমান নিয়মিতভাবে নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ধর্মীয় কর্তব্য পালন না করলে সে কাফের বলে গণ্য হবে। ধর্মদ্রোহিতার জন্য তাকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করা উচিত। এরূপ ব্যক্তি খলিফা হলে তাকে অপসারণ করে হত্যা করা কর্তব্য। ডাচ ঐতিহাসিক এবং সেমিটিক ভাষার অধ্যাপক এ জে ওয়েনসিঙ্ক এ সম্পর্কে বলেন, 'খারেজিদের বর্ণনা মতে যারা গুরুতর পাপ করবে তাদের আর বেঁচে থাকার অধিকার থাকবে না।'[৫৩]

কবিরা গুনাহ: খারেজিরা মনে করে, কোনো ব্যক্তি কবিরা গুনাহ করে যদি তওবা না করে, মৃত্যুবরণ করে তবে সে অনন্তকাল ধরে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে। এ জে ওয়েনসিঙ্ক বলেন, 'খারেজিদের মতানুযায়ী যদি কেউ গুরুতর পাপ করে সে আর মুসলমান থাকবে না।'[৫৪]

---

[৫২] Kharijites means one who leaves his home among the unbelievers for God's sake. –Ref. R. A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs,* p.207

[৫৩] According to the Kharijites, those who have committed grave sins no longer belong to the community. –Ref: A. J. Wensinck, *The Muslim.Creed,* p.47

[৫৪] According to the Kharijites, any one who is guilty of a grave sins is no longer a Muslim. –Ref: A. J. Wensinck, The Muslim Creed, p.47

সংকীর্ণ মনোভাব ও ধর্মীয় গোঁড়ামি: খারেজিরা সংকীর্ণতাকে নিরুৎসাহিত করত। এ জন্য তারা কুরআন শরিফের সুরা ইউসুফকে গ্রহণ করত না। খোদা বকশ্ বলেন, 'কোনো কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে খারেজিরা ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়া ছিল।'[৫৫]

খলিফা নির্বাচন: খারেজিরা গণতন্ত্রমনা ছিলেন। তাদের মতে, খলিফাকে সারা বিশ্বের মুসলমানদের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হবে এবং তিনি তাদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। খলিফা পদ কোনো ব্যক্তি বা গোত্রের মধ্যে সীমাবন্ধ থাকবে না। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ডি বি ম্যাকডোনাল্ড বলেন, 'তাদের মতাদর্শ ছিল পুরোপুরি গণতান্ত্রিক। খলিফা সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন এবং প্রয়োজনে তাকে অপসারণও করা যাবে। তাকে কোনো বিশেষ পরিবার বা গোত্রের হতে হবে না; তিনি একজন দাসও হতে পারেন যদি তার মধ্যে মুসলিম রাজ্য শাসনের গুণাবলি বজায় থাকে।'[৫৬]

খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি: খারেজিরা হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-কে খিলাফতের বৈধ খলিফা হিসেবে মনে করে। হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলি (রা) ইসলামের দুশমনদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করেছিল দাবি করে তারা এই দুই খলিফার বিরোধিতা করে। খারেজিরা হযরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-কে অবৈধ শাসক বলে মনে করত। এ প্রসঙ্গে খোদা বকশ্ বলেন, 'তারা আলি ও মুয়াবিয়া উভয়কেই অবৈধ শাসক হিসেবে ঘোষণা করে।'[৫৭] খারেজিদের একটি দল মনে করে খলিফার কোনো প্রয়োজন নেই। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ডি.বি. ম্যাকডোনাল্ড বলেন, 'খারেজিদের মতে মুসলমানরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে তবে খলিফার কোনো প্রয়োজন হবে না।'

অখারেজিদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি: খারেজিদের মতে, যারা খারেজি মতের সাথে একমত নয় তারা ধর্মদ্রোহী বা কাফের। তারা সাধারণ মুসলমানদের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। তাদের মতে, যারা খারেজি মতকে সমর্থন করবে না তাদের হত্যা করা উচিত। এমনকি তাদেরকে সপরিবারে হত্যা করা যাবে। তবে অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি খারেজিরা ছিল উদার। যদি কোনো অমুসলিম স্বীকার করে যে মুহম্মদ (স) মুসলমানদের নবি তাদের নয়, তাহলে খারেজিরা তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে বিশ্বাসী।

খারেজিরা গণতান্ত্রিক না চরমপন্থি: খারেজিরা প্রথম দিকে ধর্মীয় ধারণাকে কেন্দ্র করেই রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল। খলিফা নির্বাচন ও অমুসলিমদের প্রতি তাদের মনোভাব পর্যালোচনা করলে তাদের একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে মনে হয়। কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা খারেজিদের অন্যান্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শ পর্যালোচনা করে তাদের 'Most fanatic' বা চরমপন্থি বলে উল্লেখ করেছেন। খোদা বকশ্-এর মন্তব্যটিকেই এক্ষেত্রে সঠিক বলে মনে হয়। তিনি বলেন, 'কোনো কোনো ক্ষেত্রে খারেজিরা ইসলামের সঠিক ধারক, তারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে গোঁড়া ও রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক।'[৫৮]

---

[৫৫] In certain sense the Kharijites were the puritans of Islam. –Ref: Khuda Baksh, *Politics in Islam,* p.74

[৫৬] Their principle were absolutely democratic. The Khalifa was to be elected by the whole muslim community, and could be deposed again at need. He need be of no special family or tribe, he might be a slave, provided he was a good muslim ruler.' –Ref: D. B. Macdonald, *Development of Muslim Theology; Jurisprudence and Constitutional Theory,* p.23

[৫৭] They declared both Ali and Muawiyah unjust ruler. –Ref: Khuda Baksh, *Politics in Islam,* p.75

[৫৮] In a certain sense the Kharijites were the puritans of Islam, fanatical in religion, democratic in politics. –Ref: Khuda Buksh, *Politics in Islam,* p.74

খারেজি বিদ্রোহ ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধ: খলিফা হযরত আলি (রা)-এর দল ত্যাগ করে খারেজিরা হযরত আলি (রা)-কে পুনরায় মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অনুরোধ জানায়। কিন্তু খলিফা তাতে সম্মত না হওয়ায় তারা আলি (রা) ও মুয়াবিয়া উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে ইরাক ও ইরানে ব্যাপক গোলযোগ সৃষ্টি করে। তারা বাগদাদের নিকটবর্তী নাহরাওয়ান নামক স্থানে দলপতি আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের মত বিরোধী মুসলমানদের হত্যা, গৃহে অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাটের ঘটনা শুরু করে। খারেজিদের এ বিধ্বংসী কার্যক্রম প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আলি (রা) তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ। নাহরাওয়ানে উভয় পক্ষের মধ্যকার যুদ্ধে খারেজিরা পরাজিত হয়। অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক পরাজিত খারেজি বাহরাইন ও আল-আহসায় পালিয়ে যায়। তাদের দলপতি আবদুল্লাহসহ কিছুসংখ্যক খারেজি যুদ্ধে প্রাণ হারায়।

হযরত আলি (রা)-এর শাহাদাত: নাহরাওয়ানের যুদ্ধে দলপতি আবদুল্লাহর হত্যাকাণ্ড তার উগ্র সমর্থকদের আরও বেশি বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা হযরত আলি, মুয়াবিয়া এবং আমর ইবনুল আসকে ইসলামের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নির্ধারিত দিনে তিনজন আততায়ীকে কুফা, দামেস্ক ও কুফাতে পাঠানো হয়। সৌভাগ্যক্রমে মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস আততায়ীর হাত থেকে বেঁচে গেলেও ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি হযরত আলি (রা) আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম নামে একজন আততায়ীর চুরিকাঘাতে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর এ মর্মান্তিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খুলাফায়ে রাশেদিনের স্বর্ণযুগের শাসনকালেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'খারেজি' শব্দের অর্থ কী?
২. দুমাতুল জন্দলের শালিস বৈঠকের পর কাদের উৎপত্তি ঘটে? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৩. কার দল ত্যাগকারীরা ইতিহাসে খারেজি নামে পরিচিত?
৪. হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-কে খিলাফতের বৈধ খলিফা হিসেবে মনে করে কারা?
৫. নাহরাওয়ানের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
৬. হযরত আলি (রা)-কে হত্যা করে কারা?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খারেজিদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কিত একটি ছক তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

খারেজিদের মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি কতটা যৌক্তিক— দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করো।

পাঠ ২৪

হযরত আলি (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব
Character and Achievements of Hazrat Ali (R)

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা) ছিলেন আল্লাহর একনিষ্ট এক মহান ব্যক্তিত্ব। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি মহান আল্লাহর ও রাসুল (স)-এর নির্দেশ অনুসরণ করেছেন। তিনি চার বছর নয় মাস খিলাফত পরিচালনা করেছেন। এ সময়ে খিলাফতে নানা গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। উদার ও দয়ালু মনোভাব এবং কূটনৈতিক জ্ঞানের অভাবে তিনি ততটা দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারেননি। যদিও ইসলামের খেদমতে তাঁর অবদান অসামান্য। নিচে তার চরিত্রের নানা দিক এবং কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

জেনে রাখো

সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, মানবমুক্তির দিশারি হযরত মুহাম্মদ (স) এবং প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হযরত খাদিজা (রা)-এর ছোট মেয়ে ছিলেন হযরত ফাতিমা (রা)। তিনি ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচার এবং এর প্রসারে তিনি সবসময় মুহাম্মদ (স)-এর পাশে থেকেছেন। হিজরতের পর (৬২২ খ্রি.) মুহাম্মদ (স)-এর চাচাতো ভাই আলি ইবনে আবু তালিবের সাথে হযরত ফাতিমা (রা)-এর বিয়ে হয়। তিনি ইমাম হাসান এবং কারবালার যুদ্ধে (৬৮০ খ্রি.) শহিদ হওয়া ইমাম হোসেনের মা। তিনি খুব সহজ-সরল এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। রাসুল (স) মারা যাওয়ার (৬৩২ খ্রি.) ৯০ দিন পর হযরত ফাতিমা (রা) ২৯ বছর বয়সে মারা যান। মদিনার জান্নাতুল বাকিতে তাকে কবর দেওয়া হয়। রাসুল (স) তাকে 'বেহেশতের নারীদের নেত্রী' বলে অভিহিত করেছেন।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন: হযরত আলি (রা) ছিলেন সত্য, ন্যায় ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক। তিনি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। পরিবার পরিজন নিয়ে হযরত আলি (রা) জীর্ণকুটিরে বসবাস এবং মোটা ও তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন। তার স্ত্রী বিবি ফাতিমা (রা)-কে নিজ হাতে গৃহের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে হতো। খলিফা ওমর (রা)-এর আমলে অধিকাংশ মানবকল্যাণমূলক কাজ আলি (রা)-এর পরামর্শে প্রবর্তন করা হয়েছিল।

অসীম বীরত্ব: অসীম বীরত্ব এবং সুনিপুণ রণকৌশলের অধিকারী হযরত আলি (রা) ইসলামের বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। তার নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো। বদর যুদ্ধে শৌর্য-বীর্য-বীরত্ব প্রদর্শন করে তিনি রাসুল (স)-এর কাছ থেকে 'যুলফিকার' তরবারি উপহার পান। খাইবারের কামুস দুর্গ জয়ে অসাধারণ বীরত্বের জন্য মহানবি (স) তাকে 'আসাদুল্লাহ' বা ' আল্লাহর সিংহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। বীর হিসেবে আলি (রা)-কে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে তুলনা করা যায়। তিনি নিজ হাতে হুদায়বিয়ার সন্ধি লিখেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় (৬৩০ খ্রি.) মুসলিম বাহিনীর পতাকা ছিল তার হাতে।

পাণ্ডিত্য ও অন্যান্য গুণাবলি: হযরত আলি (রা) ছিলেন অসাধারণ মেধা এবং স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, কুরআন, হাদিস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার রচিত 'দিওয়ানে আলি' গ্রন্থটি আজও আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। খলিফা আলি (রা)-এর তত্ত্বাবধানে আবুল আসওয়াদ প্রথম আরবি ব্যাকরণ সংকলন করেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, 'যুদ্ধে সাহসী, পরামর্শদানে বিজ্ঞ, বক্তৃতায় পটু, বন্ধুদের প্রতি অকপট এবং শত্রুদের প্রতি সদাশয় আলি ছিলেন মুসলিম আভিজাত্য ও শৌর্যবীর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্বরূপ।'[৫৯] তার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে তাকে জ্ঞানের দরজা বলে অভিহিত করা হয়।

দূরদর্শিতা ও কঠোরতার অভাব: খলিফা হযরত আলি (রা) অসাধারণ বীরত্বের অধিকারী হলেও তার মধ্যে দূরদর্শিতা এবং কঠোরতার অভাব ছিল। সিরিয়ার বিদ্রোহী শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা)-এর বিরুদ্ধে তিনি কোনো সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। ইসলামের কেন্দ্রস্থল মদিনা থেকে কুফায় খিলাফতের রাজধানী স্থানান্তর করে হযরত আলি (রা)

---

[৫৯] Valiant in battle, wise in counsel, eloqeunt in speech, true to his friends, magnanimous to his foes, he became both the paragon of Moslem nobility and chivarly. –Ref: P.K Hitti, *History of the Arabs*, P.180

অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। খারেজিদের তিনি কঠোরভাবে দমন করেননি। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 'তার চরিত্রে যদি ওমরের কঠোরতা থাকত তবে তিনি দুরন্ত আরব জাতিকে আরও সফলভাবে শাসন করতে সমর্থ হতেন।'[৬০]

বিশ্বস্ততা ও দায়িত্বশীলতা: হযরত আলি (রা) একজন বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মহানবি (স) তাকে খুব বিশ্বাস করতেন। তাই হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার সময় মহানবি (স) তাকে আমানতের মালের দায়িত্ব দিয়ে বিছানায় রেখে যান। জীবনের কঠিন ঝুঁকি নিয়ে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন। মহানবি (স)-এর দেওয়া দায়িত্বের কাছে তিনি তার জীবনকে তুচ্ছ মনে করেছেন। দায়িত্ব পালনই ছিল তার কাছে বড় ব্যাপার। হযরত আলি (রা)-এর মতো সত্যের পথে জীবন উৎসর্গ করা যুবক খুব কম আছে। সত্য প্রতিষ্ঠা ও সত্যের পথে অবিচল থাকাই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান।

সরলমনা ও উদারতা: হযরত আলি (রা) ছিলেন একজন সরলমনা ও উদার শাসক। যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষ হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সফল হতে পারেননি। খলিফা হিসেবে ব্যর্থ হলেও মানুষ হিসেবে হযরত আলি (রা) পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছিলেন। ঐতিহাসিক মাসুদির ভাষায়, 'আল্লাহ তাকে যে গুণরাজি দিয়ে বিভূষিত করেছেন তা তার আগের অথবা পরবর্তী কারও মধ্যে আমরা খুঁজে পাই না।'[৬১]

হযরত আলি (রা) আর্থিকভাবে সচ্ছল না হওয়ায় ধন-সম্পদ দিয়ে ইসলামের উল্লেখযোগ্য সেবা করতে পারেননি। তবে তিনি শৌর্য-বীর্য, সাহসিকতা ও লেখনির মাধ্যমে ইসলামের অনেক সেবা করেছেন। সাহসিকতা, বীরত্ব, জ্ঞানচর্চা, আত্মসংযম, অনাড়ম্বর জীবনযাপন, উদারতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের কারণে হযরত আলি (রা) ইসলামের ইতিহাসে একজন আদর্শ ও ন্যায়বান মানুষ হিসেবে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কার নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো?
২. খাইবারের কামুস দুর্গ কে জয় করেন?
৩. হযরত আলি (রা)-এর রচিত গ্রন্থটির নাম কী?
৪. 'আমি জ্ঞানের নগরী এবং আলি তার দরজা।' উক্তিটি কার? *[সি. বো., ব. বো. ২০২১]*
৫. হিজরতের সময় মহানবি (স)-এর আমানতের দায়িত্ব পালন করেন কে?
৬. হযরত আলি (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. বাড়ির কাজ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মরুভূমিতে যুদ্ধ করে 'ডেজার্ট ব্যাট' উপাধি প্রাপ্ত সেনাপতি জেনারেল মন্টোগোমারির জীবনী পড়তে গিয়ে ইতিহাসের ছাত্রী সিনথিয়ার মনে পড়ে যায় এক মহান খলিফার কথা, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বীর কেশরীর মতো যুদ্ধ করে উড়িয়েছেন ইসলামের বিজয় কেতন এবং কুড়িয়েছেন অনেক উপাধি। একজন পাণ্ডিত্যানুরাগী, সরল ও উদার, একনিষ্ঠ মুসলমান হিসেবে উক্ত খলিফার খুবই সুখ্যাতি ছিল। তবে সিনথিয়া উক্ত খলিফার সময় সংঘটিত গৃহযুদ্ধের কথা স্মরণ করে একটু মর্মাহত হন।

১. সিনথিয়ার কোন খলিফার কথা মনে পড়ে যায়? ব্যাখ্যা করো।
২. সিনথিয়ার মর্মাহত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো।

---

[৬০] Ref: *A short History of the Saracens*

[৬১] We shall search in vain to find, either among his predecessors, (save one) or among his successors, those virtues with which Allah had endowed him.

পাঠ ২৫

খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসন নীতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা (The Ruling Policy of Khulafa-e-Rashideen and Their Socio-Economic Features)

শাসন নীতি

খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসন নীতি ছিল গণতান্ত্রিক। এ আমলে খলিফা ছিলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তা। তবে খলিফাকে অবশ্যই কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা এবং উপদেষ্টাদের পরামর্শ ও সাধারণ প্রজাদের মতামত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে হতো। খলিফা তার কাজের জন্য প্রজাদের কাছে জবাবদিহি করতেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসন ব্যবস্থা মূলত হযরত ওমর (রা)-এর প্রবর্তিত নিয়ম-নীতির সমষ্টি। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'ত্রিশ বছরের খিলাফত আমলের শাসন ব্যবস্থা ওমরের জীবদ্দশায় ও তার মৃত্যুর পর তারই প্রবর্তিত নীতি অনুসারে ক্রমে ক্রমে বিশিষ্ট রূপলাভ করেছিল।' আরব, অনারব, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর কাছে যেমন সমান ঠিক তেমনি খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনেও সব নাগরিক সমান ছিল। প্রজাদের অরাজকতা থেকে রক্ষা করা এবং তাদের সেবা করাই ছিল তাদের শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ব্যাপারে এবং রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে খলিফাকে সাহায্য করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ ছিল। এটিকে মজলিশ-উস-শুরা বলা হতো। খলিফারা সুষ্ঠু বিচারকার্য পরিচালনার জন্য কাজি নিযুক্ত করতেন। মহানবি (স) এবং খুলাফায়ে রাশেদিন দুনিয়ার বুকে যে ন্যায়বিচার ও সাম্যের উদাহরণ রেখে গেছেন তা ছিল বিরল এবং অভূতপূর্ব।

খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবনযাপন পদ্ধতি: খুলাফায়ে রাশেদিন অর্থাৎ ইসলামের প্রথম চার খলিফা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। তারা ছিলেন আদর্শের প্রকৃত অনুসারী। তারা নিজেদের কষ্টার্জিত উপার্জনের সাথে সামান্য রাষ্ট্রীয় ভাতা গ্রহণ করতেন। তিনজন খলিফা আততায়ীর হাতে শহিদ হয়েছেন কিন্তু তাদের কোনো দেহরক্ষী ছিল না। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, ব্যবহার্য জিনিসপত্র সব কিছুই ছিল অতি সাধারণ।

আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য: হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মৃত্যুর পর ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে হযরত মুয়াবিয়ার শাসন ক্ষমতা দখলের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল বিস্তৃত ছিল। এ দীর্ঘ সময়ে খুলাফায়ে রাশেদিনের আয়ের উৎস ছিল জাকাত, জিজিয়া, খারাজ, উশর, খুমস, আল-ফাই ইত্যাদি। খলিফা ওমর (রা)-এর সময় বায়তুল মাল সুসংগঠিত কাঠামো লাভ করে। এ বায়তুল মালে সব ধরনের কর জমা রাখা হতো। এ ছাড়া প্রশাসনিক ব্যয় বাদে প্রদেশ থেকে প্রেরিত উদ্বৃত্ত অর্থও খুলাফায়ে রাশেদিনের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল। বায়তুল মালের অর্থ খলিফাদের ইচ্ছামাফিক খরচ করার সুযোগ ছিল না। কেবল মজলিসে শুরার নির্ধারিত মাসিক ভাতা খলিফারা গ্রহণ করতেন। ফলে খলিফারা অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনের অধিকারী ছিলেন। তারা বায়তুল মালের অর্থ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতেন। এছাড়াও খলিফারা প্রজাসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। এ সময় বহু সংখ্যক খাল খনন এবং দজলা ও ফোরাত নদীর তীরের বাঁধ পর্যবেক্ষণ কর্মী নিয়োগ করা হয়। হযরত ওমর (রা)-এর নির্দেশ মতো আমর ইবনুল-আস মিসরে আমীরুল মুমেনীন খাল খনন করেন। এভাবে খলিফারা প্রজাদের আর্থিক সচ্ছলতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। অধিকন্তু হযরত ওমর (রা)-এর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ফলে আরব, পারসিক, সিরীয়, রোমান ও বাইজান্টাইনদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। আর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সামাজিক শ্রেণি: খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে সমাজে তিন শ্রেণির মানুষ বসবাস করত। যথা: ক. আরবীয় মুসলমান খ. নবদীক্ষিত মুসলমান ও গ. জিম্মি বা ইহুদি, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য অমুসলিম। খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় মাওয়ালিরা আরবীয় মুসলমানদের মতো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। জিম্মিরাও মহানবি (স)-এর সময়ের মতো পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করত।

নারীদের অবস্থা: খুলদায়ে রাশেদিনের সমাজে নারীরা কুরআন ও হাদিস অনুসারে পূর্ণ মর্যাদা ভোগ করত। আরবের মধ্যে মেয়েরা ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। মহিলারা খলিফাদের ধর্মোপদেশ শুনতে যেত। পারিবারিক জীবন ছিল পিতৃতান্ত্রিক। মা-বাবা, স্বামী ও সন্তানের সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ছিল। হযরত আলি (রা)-এর সময় বিবি আয়েশা (রা) যুদ্ধে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেন।

দাস-দাসীর অবস্থা: খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় দাস-দাসীদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা হতো। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। যারা আইনসম্মতভাবে যুদ্ধে বন্দি হতো শুধু তাদেরকেই মুক্তিপণ না দেওয়া পর্যন্ত দাস হিসেবে রাখা যেত।

পোশাক-পরিচ্ছদ: শ্রেণিভেদে মানুষ আলাদা পোশাক পরত। যেমন- সমাজের বিত্তবান ও গোত্রীয় শেখরা হাঁটু পর্যন্ত ঢোলা জামা পরত। অনেকে জুব্বা, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত জামা পরিধান করত। বয়স ও পদমর্যাদার ভেদে বিভিন্ন আকারের পাগড়ি ব্যবহার করত। পাগড়ির ওপরে রুমাল (Scarf) ব্যবহার করত। বেদুইনরা লম্বা কোর্তা ও ঢিলা পায়জামা পরত। মহিলারা ঢিলেঢালা লম্বা গাউন বা বোরখা ব্যবহার করত। এছাড়া তারা ঢিলা সালোয়ার, গ্রীবার দিকে উন্মুক্ত জামা পরত। শীতকালে তারা জ্যাকেট ব্যবহার করত।

শিক্ষাব্যবস্থা: খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় সব মসজিদ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাড়ি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হতো। কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, আরবি, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, গণিত, দর্শন প্রভৃতি চর্চা করা হতো। হযরত ওমর (রা) মক্কা-মদিনাসহ সব প্রাদেশিক রাজধানীতে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

ধর্মীয় অবস্থা: খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় পৃথক কোনো ধর্মীয় বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান ছিল না। রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ লাভের জন্য কুরআন, হাদিসের ব্যুৎপত্তিগত জ্ঞানের ওপর জোর দেওয়া হতো। মসজিদে নামাজের খুৎবায় ইমামরা ধর্মীয়, দেশের হাল-হকিকত ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আলোচনা করতেন। এককথায় খুৎবা রাজনৈতিক ইশতেহারে পরিণত হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাড়াও সমাজে ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক, মূর্তিপূজারি প্রভৃতি লোক বাস করত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসন নীতি কীরূপ ছিল?
২. খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে সমাজে কয় শ্রেণির মানুষ বসবাস করত?
৩. খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনকাল কত বছর ছিল?
৪. ইসলামের প্রথম চার খলিফার জীবনযাপন পদ্ধতি কীরূপ ছিল?
৫. খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় নারীরা কেমন ছিলেন?
৬. খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় পারিবারিক জীবন কীরূপ ছিল?

উত্তরের জন্য ১৯৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খুলাকায়ে রাশেদিনের শাসনামলের সামাজিক শ্রেণিসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. সত্য ও ন্যায়পথগামী খলিফাগণ; ২. চার জন; ৩. ৬৩২-৬৬১ খ্রি.; ৪. প্রতিনিধিত্ব; ৫. ছাকিফা বানি সায়িদা; ৬. গণতান্ত্রিক।

পাঠ-২: ১. হযরত আবু বকর (রা); ২. হযরত আবু বকর (রা); ৩. ৬৩২; ৪. হযরত আবু বকর (রা); ৫. সিদ্দিক এবং আতিক; ৬. হযরত আবু বকর (রা)।

পাঠ-৩: ১. স্বধর্মত্যাগ বা দলত্যাগ; ২. স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন; ৩. স্বার্থ হাসিল; ৪. বেদুইন সম্প্রদায়; ৫. খালিদ বিন ওয়ালিদ; ৬. মুসায়লামাতুল কাজ্জাব।

পাঠ-৪: ১. হরমুজ; ২. উবাল্লার হাফির যুদ্ধ; ৩. পারসিক; ৪. পূর্ব রোমান; ৫. বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস; ৬. হযরত ওমর (রা)-কে।

পাঠ-৫: ১. ত্রাণকর্তা; ২. হযরত আবু বকর (রা); ৩. হযরত আবু বকর (রা); ৪. হযরত আবু বকর (রা); ৫. তাবুক; ৬. দানশীল।

পাঠ-৬ ও ৭: ১. হযরত ওমর (রা); ২. দ্বিতীয়; ৩. কুরাইশ বংশের আদ্দিয়া গোত্র; ৪. ৬৩৪ খ্রি.; ৫. কাদেসিয়ার যুদ্ধ; ৬. নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ।

পাঠ-৮: ১. খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর; ২. খালিদ বিন ওয়ালিদ; ৩. ৬৩৬; ৪. সেনাপতি আমর ইবনুল আস; ৫. হযরত ওমর (রা); ৬. ফুসতাত।

পাঠ-৯: ১. কুরাইশ; ২. উহুদ; ৩. হুদায়বিয়ার সন্ধির পর (৬২৮ খ্রি.); ৪. সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি); ৫. খালিদ ইবনে ওয়ালিদ; ৬. ইয়ারমুকের যুদ্ধে।

পাঠ-১০: ১. হযরত ওমর (রা); ২. হযরত ওমর (রা); ৩. হযরত ওমর (রা); ৪. নয়টি; ৫. রাষ্ট্রীয় কোষাগার; ৬. হযরত ওমর (রা)।

পাঠ-১১: ১. ১৪টি; ২. ওয়ালি; ৩. হযরত ওমর (রা); ৪. খলিফা নিজে; ৫. হযরত ওমর (রা)-এর; ৬. জনকল্যাণ।

পাঠ-১২: ১. হযরত ওমর (রা); ২. হযরত ওমর (রা); ৩. আটটি; ৪. এক দিনার; ৫. উশর; ৬. হযরত ওমর (রা)।

পাঠ-১৩: ১. কঠোরতা ও কোমলতা; ২. দুই দিরহাম; ৩. পুত্র আবু শাহমা; ৪. হযরত ওমর (রা); ৫. মজলিশ-উস-শুরা গঠন; ৬. হযরত ওমর (রা)।

পাঠ-১৪ ও ১৫: ১. উমাইয়া; ২. ৩৪; ৩. হযরত ওসমান (রা)-এর; ৪. হযরত ওসমান (রা); ৫. ১৮০০; ৬. হযরত ওসমান (রা)-কে।

পাঠ-১৬: ১. ৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.; ২. শেষ ছয় বছর (৬৫০-৬৫৬ খ্রি.); ৩. হযরত ওসমান (রা)-এর; ৪. মুয়াবিয়া (রা); ৫. কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ; ৬. রাবাদায়।

পাঠ-১৭: ১. খেজুর; ২. চার; ৩. মারওয়ান (জামাতা ও চাচাতো ভাই); ৪. মারওয়ানের ধ্বংসাত্মক নীতি; ৫. আবদুল্লাহ ইবনে সাবা; ৬. ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ড।

পাঠ-১৮: ১. ধনী; ২. হযরত ওসমান (রা)-কে; ৩. বিনয়; ৪. হযরত ওসমান (রা); ৫. যায়েদ বিন সাবিত (রা); ৬. খলিফা ওসমান (রা)-এর।

পাঠ-১৯: ১. আবু তালিব; ২. হযরত আলি (রা); ৩. হযরত ফাতিমা (রা); ৪. বদর; ৫. হযরত আলি (রা)-এর; ৬. হযরত আলি (রা)।

পাঠ-২০: ১. উষ্ট্রের যুদ্ধ; ২. ৬৫৬ (২৩ জুন); ৩. উষ্ট্রের; ৪. হযরত আলি (রা); ৫. উষ্ট্রের যুদ্ধে; ৬. কুফায়।

পাঠ-২১: ১. সিফফিনের যুদ্ধ; ২. ৬৫৭; ৩. কুরাইশ; ৪. সিরিয়া; ৫. দুমাতুল জন্দলে; ৬. আমর ইবনুল আস (মুয়াবিয়া (রা)-এর সেনাপতি)।

পাঠ-২২: ১. শিয়া; ২. দল বা অনুসারী; ৩. ইমামতের; ৪. সাবিয়া বা ইসমাঈলীয়; ৫. শিয়ারা; ৬. শিয়াদের।

পাঠ-২৩: ১. দলত্যাগী; ২. খারেজিদের; ৩. হযরত আলি (রা)-এর; ৪. খারেজিরা; ৫. ৬৫৯; ৬. খারেজিরা।

পাঠ-২৪: ১. হযরত আলি (রা); ২. হযরত আলি (রা); ৩. 'দিওয়ানে আলি'; ৪. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর; ৫. হযরত আলি (রা); ৬. ৬৬১।

পাঠ-২৫: ১. গণতান্ত্রিক; ২. তিন; ৩. ত্রিশ; ৪. সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর; ৫. স্বাধীন; ৬. পিতৃতান্ত্রিক।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

খিলাফত	আরবি 'খিলাফত' শব্দটি 'খালফুন' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত। এটি মুসলমানদের একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Religio-Political Institution)। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ধর্ম ও ইসলামি রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও সার্বভৌমত্বে সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশ করে। এটি সারা বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক। খিলাফত প্রসঙ্গে দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন বলেন, 'খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা মুহাম্মদ (স)-এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।'
খলিফা	হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইন্তেকালের পর যে চারজন সাহাবি পর্যায়ক্রমে তাঁর প্রতিনিধিরূপে ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন তাদেরকে খলিফা বলা হয়। তারা হলেন হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলি (রা)। তারা ৬৩২ থেকে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ত্রিশ বছর মুসলিম জাহানের খিলাফত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বিক মঙ্গলের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথ অনুসারে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন এবং রাজ্যের শাসনকার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন। এজন্য তাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদিন বা সত্য ও ন্যায়পথগামী খলিফা বলা হয়।
ইসলামের ত্রাণকর্তা	খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-কে 'Saviour of Islam' বা ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়। রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নবুয়তের দাবিদার ভণ্ড নবিদের কঠোরভাবে দমন করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ সভা আহ্বান করতেন এবং সবার সাথে পরামর্শ করে কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন। হযরত আবু বকর (রা) ইসলামের ইতিহাসের সর্বাধিক সংকটময় সময়ে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দক্ষতার সাথে সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করেন। ষড়যন্ত্রকারীদের সঠিক জবাব দিয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রকে তিনি শঙ্কামুক্ত করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন কুরআনের হাফিজ শহিদ হলে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই হযরত ওমর (রা)-এর পরামর্শে হযরত আবু বকর (রা) প্রথম গ্রন্থাকারে কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। তাই তাকে 'Saviour of Islam' তথা ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।
রিদ্দা যুদ্ধ	'রিদ্দা' আরবি শব্দ। এর অর্থ স্বধর্মত্যাগ বা দলত্যাগ। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালে হেজাজ ছাড়া প্রায় পুরো আরবে ইসলাম ধর্ম ও নবপ্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ শুরু হয়। অনেকে ইসলাম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে যায়। নবুয়তকে লাভজনক মনে করে কিছু ব্যক্তি নিজেদের নবি বলে দাবি করে। অনেক বেদুইন গোত্র জাকাত দানে অস্বীকার করে। এভাবে প্রায় গোটা আরবে খণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পর আরবের এসব বিদ্রোহী গোত্র এবং ভণ্ড নবিদের পরিচালিত আন্দোলনকে ইসলামের ইতিহাসে স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন (Apostasy Movement) বলা হয়। আর তাদের বিরুদ্ধে খলিফা হযরত আবু বকর (রা) যে অভিযান পরিচালনা করেন তা 'রিদ্দার যুদ্ধ' নামে পরিচিত।
ইয়ামামার যুদ্ধ	রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পর মধ্য আরবের ইয়ামামার বনু হানিফ গোত্রের গোত্রপতি মুসায়লামা নিজেকে নবি হিসেবে দাবি করে। তাকে দমন করার জন্য হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্দেশে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেটিই ইয়ামামার যুদ্ধ নামে পরিচিত। ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত এ যুদ্ধ ইসলামের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ যুদ্ধে তিনশ জন কুরআনের হাফিজ শহিদ হন। ভণ্ড নবি মুসায়লামাসহ তার অনুসারী হানিফ গোত্রের দশ হাজার লোক নিহত হয়। আর এ কারণেই ঐতিহাসিক তাবারি এ যুদ্ধকে 'The Battle of the Garden of death' বলে অভিহিত করেছেন।

আল-ফারুক

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) 'আল-ফারুক' বা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী হিসেবে পরিচিত। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত ওমর (রা) ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। তিনি ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স)-কে হত্যার জন্য খোলা তরবারি হাতে নিয়ে রওনা হন। পথে তিনি জানতে পারেন যে, তার বোন ফাতেমা ও ভগ্নিপতি সাইদ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ সংবাদে তিনি তাদের শাস্তি দিতে বোনের বাড়িতে যান এবং বোন ফাতেমার কণ্ঠে সুরা ত্ব-হার তেলাওয়াত শুনে ইসলামের মর্মবাণী বুঝতে পারেন। ফলে অনুতপ্ত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় তার বয়স ছিল ৩৩ বছর। ইসলাম ও পৌত্তলিকতার মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারায় মহানবি (স) তাঁকে ফারুক বা 'সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মজলিশ-উস-শুরা

'শুরা' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ 'পরামর্শ'। হযরত ওমর (রা) রাসুল (স)-এর সময়ে প্রচলিত পরামর্শ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেন। কারণ তিনি সবসময় বলতেন, 'পরামর্শ ছাড়া খিলাফত চলতে পারে না'। এ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জনগণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং স্বচ্ছভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রণাপরিষদ গঠন করেন, যা মজলিশ-উস-শুরা বা মন্ত্রণাপরিষদ নামে পরিচিত। এটি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা: ক. মজলিশ আল-খাস এবং খ. মজলিশ আল-আম। মজলিশ আল-খাস ছিল উচ্চ পরিষদ। এটাকে Cabinet বলা হয়। এ পরিষদের সদস্য ছিলেন হযরত ওসমান (রা), হযরত আলি (রা), তালহা (রা), যুবায়ের (রা), আবদুর রহমান বিন আউফ প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবিরা। অন্যদিকে মজলিশ আল-আমের সদস্য ছিলেন প্রাদেশিক শাসক, মদিনার গণ্যমান্য ব্যক্তি, মুহাজির ও আনসাররা। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মজলিশ আল-আমের বৈঠক ডাকা হতো এবং সেখানে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো।

দিওয়ান-উল-খারাজ

'খারাজ' আরবি শব্দ। এ শব্দটি গ্রিক Khoregin শব্দ থেকে সিরীয় ভাষার মাধ্যমে আরবি ভাষায় এসেছে। এর অর্থ যা বের হয়ে গেছে। যেহেতু জমির কর ভূমির মূল উৎপাদন থেকে বের হয়ে যায় তাই একে খারাজ বলে। হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে খিলাফতের সম্প্রসারণের ফলে বিজিত এলাকাগুলোতে ভূমিকর হিসেবে প্রাপ্ত খারাজের হিসাব-নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি 'দিউয়ান-উল-খারাজ' বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিভাগের কাজ ছিল খারাজের খাত থেকে আয়কৃত অর্থের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং দাপ্তরিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করা। এ লক্ষ্যে হযরত ওমর (রা) প্রথম আদমশুমারির ব্যবস্থা করেন এবং একটি তালিকা প্রণয়ন করে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ফলে হযরত ওমর (রা)-এর এ দপ্তরটি মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

সাইফুল্লাহ

'সাইফুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর তরবারি। বিখ্যাত বীর খালিদ বিন ওয়ালিদকে সাইফুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণের পর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ নিজেকে একনিষ্ঠভাবে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেন। ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে রোমানদের সাথে সংঘটিত মুতার যুদ্ধে কয়েকজন মুসলিম সেনাপতির মৃত্যুর পর তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। খালিদ এ যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে বিপর্যয় ঠেকিয়ে মুসলমানদের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনেন। বিজয়ী খালিদ মদিনায় ফিরে গেলে রাসুলুল্লাহ (স) তাকে 'সাইফুল্লাহ' বা 'আল্লাহর তরবারি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মক্কা বিজয়ের সময় তার অবিশ্বাস্য বীরত্বে কুরাইশরা স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। রাসুল (স)-এর আদেশে সেনাপতি খালিদ কুরাইশদের দেবী আল-ওজ্জার মন্দির ধ্বংস করেন।

জামিউল কুরআন

'জামিউল কুরআন' অর্থ কুরআন সংকলনকারী। খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর হযরত ওসমান (রা) সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কুরআন পাঠের উচ্চারণভঙ্গির পার্থক্য খেয়াল করেন। কুরআন পাঠের অভিন্ন রীতি চালু এবং দ্বন্দ্ব দূরীকরণে ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে যায়েদ বিন সাবিত (রা)-এর নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি খলিফা ওমর (রা)-এর মেয়ে বিবি হাফসা (রা)-এর কাছে রক্ষিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে সাতটি বিশুদ্ধ অনুলিপি তৈরি করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেয়। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কুরআনের ত্রুটিপূর্ণ কপিগুলো সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলা হয়। এ মহৎ কাজের জন্য খলিফা ওসমান (রা) 'জামিউল কুরআন' উপাধিতে ভূষিত হন।

আসাদুল্লাহ

'আসাদুল্লাহ' অর্থ 'আল্লাহর সিংহ'। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা)-কে আসাদুল্লাহ উপাধি দেওয়া হয়েছে। মহানবি (স)-এর জীবদ্দশায় প্রায় প্রত্যেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আলি (রা) অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। অধিকাংশ যুদ্ধেই তিনি মহানবি (স)-এর পতাকাবাহক ছিলেন। বদর যুদ্ধে বীরত্বের কারণে মহানবি (স) তাকে 'জুলফিকার' তরবারি উপহার দেন। উহুদ, খন্দক ও খাইবার যুদ্ধেও আলি (রা) অসাধারণ অবদান রাখেন। খাইবার যুদ্ধে আলি (রা)-এর বীরত্বে খুশি হয়ে মুহাম্মদ (স) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' বা 'আল্লাহর সিংহ' উপাধি দেন।

খারেজি	আরবি শব্দ 'খারাজ' থেকে খারেজি শব্দটি এসেছে। এর অর্থ দলত্যাগী। ঐতিহাসিক নিকলসন বলেন, 'খারেজি বলতে তাদেরকে বোঝায় যারা আল্লাহর নামে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন।' মুহাম্মদ আল শাহরাস্তানির 'মিলাত ওয়ান-নিহাল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আলি ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধের (৬৫৭ খ্রি.) মীমাংসার জন্য 'দুমাতুল জন্দলের' সালিশি বৈঠককে কেন্দ্র করে যে দলটি 'লা হুকমা ইল্লা-লিল্লাহ' বা 'আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান নেই' এ আওয়াজ তুলে খলিফা আলির পক্ষ ত্যাগ করেছিল তারাই মূলত খারেজি নামে পরিচিত।
শিয়া	'শিয়া' আরবি শব্দ। এর অর্থ দল, সমর্থক, অনুসারী প্রভৃতি। ইসলামের ইতিহাসে 'শিয়া' বলতে মহানবি (স)-এর জামাতা আলি (রা)-এর সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত দলকে বোঝায়। অর্থাৎ 'শিয়া' হচ্ছে সেই গোষ্ঠী যারা মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলি (রা)-কে খিলাফতের একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী বলে মনে করে। তারা ইমামতে বিশ্বাসী। তারা মনে করে, ইমাম স্বর্গীয়ভাবে নিয়োগকৃত।

■ একনজরে খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

সময় (খ্রি.)	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
৬৩২	মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতে আরোহণ করেন। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্র ও ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে ইতিহাসে ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে পরিচিতি পান। স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে রিদ্দা যুদ্ধ সংঘটিত এবং ভণ্ড নবিদের কঠোরভাবে দমন করা হয়।
৬৩৩	প্রভাবশালী ভণ্ড নবি মুসায়লামা বিন কাজ্জাবের সাথে মুসলমানদের ইয়ামামার প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে বিখ্যাত বীর খালিদ বিন ওয়ালিদের হাতে মুসায়লামা পরাজিত ও নিহত হয়। বিপুল সংখ্যক যোদ্ধার মৃত্যুর কারণে এ যুদ্ধ The Battle of the Garden of Death বা 'মৃত্যু-উদ্যানের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে ৭০ জন কুরআনের হাফিজ শহিদ হন।
৬৩৪	হযরত আবু বকর (রা) ইন্তেকাল করেন এবং দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে হযরত ওমর (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। এছাড়া মুসলমানরা আজনাদাইনের যুদ্ধে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বাহিনীকে এবং নামারকের যুদ্ধে পারসিক সেনাপতি মহাবীর রুস্তমকে পরাজিত করে।
৬৩৫	হযরত ওমর (রা)-এর তত্ত্বাবধানে মুসলমানরা পারস্য বিজয় করে এবং ইসলামে নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়।
৬৩৬	ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিশাল রোমান বাহিনী বিখ্যাত বীর খালিদের কাছে পরাজিত হলে সিরিয়া মুসলমানদের দখলে আসে।
৬৩৭	মুসলমানরা খ্রিষ্টান অধ্যুষিত জেরুজালেম দখল করে।
৬৩৯	আমর ইবনে আসের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী মিসরে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।
৬৪১	নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করে। এ যুদ্ধ জয়ের ফলে পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় ইসলামের অগ্রযাত্রার সূত্রপাত ঘটেছিল।
৬৪৪	হযরত ওমর (রা) ইন্তেকাল করেন ও হযরত ওসমান (রা) তৃতীয় খলিফা হিসেবে খিলাফতে বসেন।
৬৫১	পবিত্র কুরআন বিকৃত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে সংকলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
৬৫৬	বিদ্রোহীদের হাতে হযরত ওসমান (রা) নিহত হন। ফলে ইসলামে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সূচনা ঘটে, নানা মতবাদ ও উপদলের সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। হযরত আলি (রা) খিলাফত লাভ করেন। হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে হযরত আয়েশা (রা) এবং আলি (রা)-এর মধ্যে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ।
৬৫৭	খিলাফতের রাজধানী মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তর করা হয়। আলি ও মুয়াবিয়ার মধ্যে ঐতিহাসিক সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত। আলি (রা)-এর অদূরদর্শিতা ও মুয়াবিয়া (রা)-এর সেনাপতি আমরের কৌশলের ফলে দুমাতুল জন্দলের সালিশের ফলে খিলাফতের বিভক্তি ঘটে। মুয়াবিয়া (রা) নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। ফলে ইসলামে খারেজি ও শিয়াদের উত্থান ঘটে।
৬৬১	খারেজিদের হাতে হযরত আলি (রা) শাহাদতবরণ করেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের সমাপ্তি ঘটে। হযরত মুয়াবিয়া দামেস্কে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে ইসলামি খিলাফতে গণতন্ত্রের জায়গায় রাজতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন প্রক্রিয়া

প্রশ্ন-১. 'খিলাফত' শব্দের অর্থ কী? */সি. বো., ব. বো. ২০২১/*

উত্তর: 'খিলাফত' শব্দের অর্থ প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত।

প্রশ্ন-২. খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়কাল লেখো। */ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫/*

উত্তর: খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়কাল ৬৩২-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রশ্ন-৩. খুলাফায়ে রাশেদিন কারা?

উত্তর: ইসলামের চারজন সত্য ও ন্যায়পথগামী খলিফা হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলি (রা)-কে খুলাফায়ে রাশেদিন বলা হয়।

প্রশ্ন-৪. খুলাফায়ে রাশেদিন কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন?

উত্তর: খুলাফায়ে রাশেদিন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রশ্ন-৫. খলিফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মুসলমানরা কোন স্থানে মিলিত হন?

উত্তর: খলিফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মুসলমানরা মদিনার 'ছাকিফা বানি সায়িদা' নামক স্থানে মিলিত হন।

প্রশ্ন-৬. ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী কোথায় স্থাপিত হয়? */সকল বোর্ড ২০১৬/*

উত্তর: ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী স্থাপিত হয় মদিনায়।

■ ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা)-এর কৃতিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন-৭. বয়স্ক পুরুষের মধ্যে কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন? */ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২; ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮/*

উত্তর: বয়স্ক পুরুষের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা) প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৮. মহানবি (স) কাকে সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত করেন? */সকল বোর্ড ২০১৫/*

উত্তর: মহানবি (স) হযরত আবু বকর (রা)-কে সিদ্দিক (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রশ্ন-৯. ইসলামের প্রথম খলিফা কে ছিলেন? */ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫; সি. বো., ব. বো. ২০২১/*.

উত্তর: হযরত আবু বকর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা ছিলেন।

প্রশ্ন-১০. কাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়?

উত্তর: প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

প্রশ্ন-১১. 'আতিক' শব্দের অর্থ কী? */ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯/*

উত্তর: 'আতিক' শব্দের অর্থ দানশীল।

প্রশ্ন-১২. 'আতিক' বা দানশীল বলা হয় কাকে?

উত্তর: ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা)-কে 'আতিক' বা দানশীল বলা হয়।

প্রশ্ন-১৩. 'রিদ্দা' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: 'রিদ্দা' শব্দের অর্থ স্বধর্মত্যাগ বা দলত্যাগ।

প্রশ্ন-১৪. রিদ্দার যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? */ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২/*

উত্তর: রিদ্দার যুদ্ধ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-১৫. মুসায়লামা কোন যুদ্ধে নিহত হয়?

উত্তর: মুসায়লামা ইয়ামামার যুদ্ধে নিহত হয়।

প্রশ্ন-১৬. একমাত্র মহিলা ভণ্ড নবির নাম কী ছিল?

উত্তর: একমাত্র মহিলা ভণ্ড নবি ছিল সাজাহ।

প্রশ্ন-১৭. ইয়ামামার যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?

উত্তর: ইয়ামামার যুদ্ধ ৬৩২-৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-১৮. বায়তুল মাল কে প্রতিষ্ঠা করেন? */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩/*

উত্তর: হযরত আবু বকর (রা) বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন।

■ হযরত ওমর (রা)-এর রাজ্যবিস্তার ও প্রশাসন ব্যবস্থা এবং তাঁর মহানুভবতা ও ন্যায়বিচারের আদর্শ

প্রশ্ন-১৯. হযরত ওমর (রা)-এর উপাধি কী ছিল? */রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো, ২০১৭/*

উত্তর: হযরত ওমর (রা)-এর উপাধি ছিল ফারুক।

প্রশ্ন-২০. হযরত ওমর (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন?

উত্তর: হযরত ওমর (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।

প্রশ্ন-২১. 'আল-ফারুক' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: 'আল-ফারুক' শব্দের অর্থ সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী।

প্রশ্ন-২২. ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার নাম কী?

উত্তর: ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার নাম হযরত ওমর (রা)।

প্রশ্ন-২৩. হযরত ওমর (রা) তার বিশাল সাম্রাজ্যকে কতটি প্রদেশে বিভক্ত করেন? */ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০১৬/*

উত্তর: হযরত ওমর (রা) তার বিশাল সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন।

প্রশ্ন-২৪. মজলিশ-উস-শুরা কী?

উত্তর: হযরত ওমর (রা) স্বচ্ছভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন, যা মজলিশ-উস-শুরা বা মন্ত্রণাপরিষদ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২৫. উশর কী?
উত্তর: ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলমান প্রজাদের ভূমির ওপর যে কর ধার্য করা হয়, তাই উশর।

প্রশ্ন-২৬. হযরত ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর প্রধানকে কী বলা হতো?
উত্তর: হযরত ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর প্রধানকে বলা হতো 'সাহিব-উল-আহদাদ'।

প্রশ্ন-২৭. ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কাকে?
উত্তর: হযরত ওমর (রা)-কে ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

■ হযরত ওসমান (রা)-এর শাসন কার্যাবলি ও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ এবং হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যার কারণ ও ফলাফল ও তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব

প্রশ্ন-২৮. হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকাল লেখো। *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]*
উত্তর: হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকাল ৬৪৪-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রশ্ন-২৯. 'যুন্নুরাইন' অর্থ কী? *[ঢা. বো. ২০১৭]*
উত্তর: 'যুন্নুরাইন' অর্থ দুই জ্যোতির অধিকারী।

প্রশ্ন-৩০. 'যুন্নুরাইন' কাকে বলা হয়? *[সি. বো., ব. বো. ২০২১; ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯]*.
উত্তর: হযরত ওসমান (রা)-কে 'যুন্নুরাইন' বলা হয়।

প্রশ্ন-৩১. গনি কার উপাধি?
উত্তর: গনি (ধনী) হযরত ওসমান (রা)-এর উপাধি।

প্রশ্ন-৩২. ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম কী?
উত্তর: ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম হযরত ওসমান (রা)।

প্রশ্ন-৩৩. 'বীরে রুমা' কী?
উত্তর: 'বীরে রুমা' হলো মদিনার একটি কূপ, যা মদিনাবাসীর পানির কষ্ট লাঘবের জন্য হযরত ওসমান (রা) ক্রয় করে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৩৪. কাকে হত্যার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়?
উত্তর: হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়

■ হযরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের কারণ, ফলাফল এবং তাঁদের ব্যর্থতা ও সফলতার কারণ

প্রশ্ন-৩৫. ইসলামের চতুর্থ খলিফা কে ছিলেন?
উত্তর: ইসলামের চতুর্থ খলিফা ছিলেন হযরত আলি (রা)।

প্রশ্ন-৩৬. হযরত আলি (রা)-এর পিতার নাম কী? *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]*
উত্তর: হযরত আলি (রা)-এর পিতার নাম আবু তালিব।

প্রশ্ন-৩৭. 'আসাদুল্লাহ' শব্দের অর্থ কী? *[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]*
উত্তর: 'আসাদুল্লাহ' শব্দের অর্থ আল্লাহর সিংহ।

প্রশ্ন-৩৮. 'আসাদুল্লাহ' কার উপাধি ছিল? *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*
উত্তর: 'আসাদুল্লাহ' হযরত আলি (রা)-এর উপাধি ছিল।

প্রশ্ন-৩৯. উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? *[সি. বো., ব. বো. ২০২১; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯; সকল বোর্ড ২০১৬]*
উত্তর: ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৪০. ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ কোনটি? *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]*
উত্তর: ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ হলো উষ্ট্রের যুদ্ধ।

প্রশ্ন-৪১. পুরুষদের মধ্যে কে ১০ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন?
উত্তর: পুরুষদের মধ্যে প্রথম হযরত আলি (রা) ১০ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৪২. 'দিওয়ানে আলী' কার রচিত সাহিত্য?
উত্তর: 'দিওয়ানে আলী' হযরত আলি (রা)-এর রচিত সাহিত্য।

প্রশ্ন-৪৩. বদর যুদ্ধে বীরত্বের কারণে মহানবি (স) হযরত আলি (রা)-কে কী প্রদান করেন?
উত্তর: বদর যুদ্ধে বীরত্বের কারণে মহানবি (স) হযরত আলি (রা)-কে 'জুলফিকার' তরবারি প্রদান করেন।

প্রশ্ন-৪৪. কামুস দুর্গ জয় করেন কে?
উত্তর: খাইবারের কামুস দুর্গ জয় করেন হযরত আলি (রা)।

■ ইসলামে শিয়া ও খারেজি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাদের মূল দর্শন

প্রশ্ন-৪৫. 'শিয়া কারা?
উত্তর: মহানবি (স)-এর জামাতা আলি (রা)-এর সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত দলই শিয়া সম্প্রদায়।

প্রশ্ন-৪৬. 'শিয়া' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: 'শিয়া' শব্দের অর্থ দল, সমর্থক, অনুসারী।

প্রশ্ন-৪৭. ইমামত কী?
উত্তর: মহানবি (স)-এর অবর্তমানে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার একক কর্তৃত্বই ইমামত।

প্রশ্ন-৪৮. খারাজ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: খারাজ শব্দের অর্থ 'যা বের হয়ে গেছে বা দলত্যাগী।'

প্রশ্ন-৪৯. খারেজিদের উৎপত্তি হয়েছে কখন?
উত্তর: ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিফফিনের যুদ্ধের পর দুমাতুল জন্দলের সালিশি থেকে খারেজিদের উৎপত্তি হয়েছে।

■ খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

প্রশ্ন-৫০. ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনীতির ভিত্তি কী?
উত্তর: ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনীতির ভিত্তি জাকাত।

প্রশ্ন-৫১. বায়তুল মাল কী?
উত্তর: বায়তুল মাল হচ্ছে ইসলামি সাম্রাজ্যের সরকারি কোষাগার।

প্রশ্ন-৫২. খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি কী ছিল?
উত্তর: খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল কুরআন এবং হাদিস।

প্রশ্ন-৫৩. জিজিয়া কী?
উত্তর: জিজিয়া হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের দেওয়া নিরাপত্তা কর।

প্রশ্ন-৫৪. গনিমত কী? *[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*
উত্তর: গনিমত হলো যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ।

প্রশ্ন-৫৫. 'শূরতা' কী?
উত্তর: খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনী 'শূরতা' নামে পরিচিত ছিল।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০২১; ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯; ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]
উত্তর: খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে ইসলামের প্রথম চারজন খলিফাকে বোঝায়।

খুলাফায়ে রাশেদিন অর্থ সত্য বা ন্যায় পথগামী খলিফাগণ। হযরত মুহাম্মদ (স) ইন্তেকালের পর (৬৩২ খ্রি.) যে চারজন সাহাবি মহানবি (স)-এর প্রতিনিধিরূপে আরব রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁরাই মুসলিম জাহানের ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশেদিন নামে পরিচিত। তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলি (রা)। তাঁরা ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিক মঙ্গলের জন্য আল্লাহ ও রাসুল (স)-এর নির্দেশিত পদ্ধতিতে সব কাজ পরিচালনা করায় তাদেরকে খুলাফায়ে রাশেদিন বলা হয়।

প্রশ্ন-২. খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন?
উত্তর: মহানবি (স)-এর ওফাতের (মৃত্যু) পর ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং পৃথিবীতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মুসলিম উম্মাহর ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির লক্ষ্যে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকসহ সকল অঙ্গনের সার্বিক কর্মসূচিতে নেতৃত্ব প্রদান করে কুরআন-হাদিসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনাই খিলাফতের উদ্দেশ্য। তবে এ খিলাফত অবশ্যই জনসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত হতে হবে।

প্রশ্ন-৩. হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা)-কে প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করতে চাইলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
উত্তর: বয়স, পদমর্যাদা ও ইসলাম ধর্ম প্রচারে অবদানের কথা বিবেচনা করে হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা)-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করতে চাইলেন।

রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পর হযরত ওমর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা)-কে নির্বাচনের ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য দেন। আবু বকর (রা)-এর ইমামতিতে মহানবি (স)-এর কয়েকবার নামাজ আদায় করা, বয়োজ্যেষ্ঠতা, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, তার প্রতি মহানবি (স)-এর আস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করে ওমর (রা) আবু বকর (রা)-কে প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করার পক্ষে মত দেন।

প্রশ্ন-৪. হযরত আবু বকর (রা)-কে রাসুল (স) সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত করেন কেন? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
উত্তর: রাসুল (স)-এর মিরাজের (আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য উর্ধ্বগমন) কথা শোনামাত্র বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে রাসুল (স) হযরত আবু বকর (রা)-কে সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত করেন।

হযরত আবু বকর (রা) রাসুল (স)-এর জীবনসহচর ও ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। নেতৃস্থানীয় ও বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাসুল (স)-এর মিরাজ গমনের কথা শোনামাত্র নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেন। এ জন্যই রাসুল (স) তাকে 'সিদ্দিক' বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রশ্ন-৫. রিদ্দার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কেন?
উত্তর: ভণ্ড নবি ও স্বধর্মত্যাগীদের দমনের জন্য রিদ্দার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। রিদ্দার যুদ্ধ বলতে হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়ে স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধকে বোঝায়। রাসুল (স)-এর ওফাতের পর বিভিন্ন গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইসলাম ত্যাগ এবং খলিফার আধিপত্যকে অস্বীকার করে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি সুসংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালিত করে। অনেকে নিজেদের নবি দাবি করে। এসব ভণ্ড নবির বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা) মুসলিম বাহিনী নিয়ে যে অভিযান পরিচালনা করেন তাই রিদ্দার যুদ্ধ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৬. রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। *[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*
উত্তর: স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন বলতে ভণ্ড নবিদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা)-এর পরিচালিত যুদ্ধকে বোঝায়।

মহানবি (স)-এর পরলোকগমনের পর গোত্রের পর গোত্র ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাদের আগের ধর্মে ফিরে যেতে থাকে। এছাড়া এসময় কিছু সংখ্যক গোত্রপ্রধান নবুয়তকে একটি লাভজনক পেশা মনে করে নিজেদেরকে নবি ঘোষণা করে। এদের মিথ্যা বক্তব্যে সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ইসলাম ধর্মের নেতৃত্ব নিয়ে চরম সংকট তৈরি হয়। এ চরম সংকটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে এসব ভণ্ড নবি ও স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধই ইসলামের ইতিহাসে রিদ্দার যুদ্ধ বলে খ্যাত।

প্রশ্ন-৭. খালিদ বিন ওয়ালিদ ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যাসহ লেখো। */ঢাকা বোর্ড ২০১৭/*

উত্তর: দক্ষ ও সুকৌশলী বীর সেনাপতি হিসেবে খালিদ বিন ওয়ালিদ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রাথমিক জীবনে কুরাইশদের সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ করলেও হুদায়বিয়ার সন্ধির (৬২৮ খ্রি.) পর খালিদ বিন ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর রাসুল (স)-এর সময়ে হুনায়ুনের যুদ্ধ, তায়েফ বিজয়, তাবুক অভিযানে দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করে তিনি ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত করেন। তাছাড়া রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পর ইয়ামামার যুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে তিনি ভণ্ড নবিদের শায়েস্তা করেন। এছাড়া জীবিত থাকা পর্যন্ত তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। ইসলামের খেদমতে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্যই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রশ্ন-৮. ভণ্ড নবি কারা? ব্যাখ্যা করো। */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯/*

উত্তর: মহানবি (স)-এর জীবনের শেষ দিকে আসওয়াদ আনসি এবং আবু বকর (রা)-এর ক্ষমতা গ্রহণের পর মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ নবুয়ত পাওয়ার দাবি করে খিলাফতের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এরাই ভণ্ড নবি নামে পরিচিত। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালে হেজাজ ছাড়া প্রায় পুরো আরবে ইসলাম ধর্ম ও নবপ্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ শুরু হয়। অনেকে ইসলাম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে যায়। নবুয়তকে লাভজনক পেশা মনে করে কিছু ব্যক্তি নিজেদের নবি বলে দাবি করে। অনেক বেদুইন গোত্র জাকাত দানে অস্বীকার করে। এভাবে প্রায় গোটা আরবে খণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পর আরবের এসব বিদ্রোহী গোত্র এবং ভণ্ড নবিদের পরিচালিত আন্দোলনকে ইসলামের ইতিহাসে স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন (Apostasy Movement) বলা হয়। আর তাদের বিরুদ্ধে খলিফা হযরত আবু বকর (রা) যে অভিযান পরিচালনা করেন তা 'রিদ্দার যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৯. হযরত আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আবু বকর (রা) ইসলাম ধর্মকে ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করেন। এ জন্য তাকে ত্রাণকর্তা বলা হয়।

ইসলামের এক সংকটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দুই বছর তিন মাস খলিফা পদে অধিষ্ঠিত থেকে ইসলাম ধর্ম ও শিশু মুসলিম রাষ্ট্রকে এক ভয়াবহ বিপদ হতে রক্ষা করেন। তাঁর সময় ভণ্ড নবিদের ধর্মীয় প্রতারণা, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তিনি কঠোর হস্তে দমন করে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখেন। তিনি খিলাফত লাভের পূর্বে ও পরে ইসলামের সেবায় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এজন্য তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-১০. হযরত ওমর (রা)-কে ফারুক উপাধি দেওয়া হয়েছিল কেন?

উত্তর: সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের বিচক্ষণতা থাকায় ওমর (রা)-কে ফারুক উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত ওমর (রা) ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। প্রচণ্ড ইসলামবিদ্বেষী হিসেবে তিনি ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স)-কে হত্যার দায়িত্ব নিয়ে খোলা তরবারি হাতে তার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে জানতে পারেন যে, তার বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ সংবাদ শুনে তিনি তাদের শাস্তি প্রদান করতে বোনের বাড়িতে যান। কিন্তু বোনের কণ্ঠে সূরা ত্বহার তেলাওয়াত শুনে ইসলামের মর্মবাণী বুঝতে পেরে ৩৩ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ও পৌত্তলিকতার মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারায় মহানবি (স) তাকে 'ফারুক' বা 'সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী' উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রশ্ন-১১. দিওয়ানুল খারাজ বলতে কী বোঝায়?

/ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫/

উত্তর: 'খারাজ' আরবি শব্দ। এ শব্দটি গ্রিক Khoregin শব্দ থেকে সিরীয় ভাষার মাধ্যমে আরবি ভাষায় এসেছে। এর অর্থ যা বের হয়ে গেছে। যেহেতু জমির কর ভূমির মূল উৎপাদন থেকে বের হয়ে যায় তাই একে খারাজ বলে।

হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে খিলাফতের সম্প্রসারণের ফলে বিজিত এলাকাগুলোতে ভূমিকর হিসেবে প্রাপ্ত খারাজের হিসাব-নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি 'দিউয়ান-উল-খারাজ' বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিভাগের কাজ ছিল খারাজের খাত থেকে আয়কৃত অর্থের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং দাপ্তরিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করা।

প্রশ্ন-১২. মজলিশ-উস-শুরা বলতে কী বোঝায়? */দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; সি. বো., ব. বো. ২০২১; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯/*

উত্তর: মজলিশ-উস-শুরা ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি মন্ত্রণাপরিষদ।

প্রাক-ইসলামি যুগের দারুন নাদওয়ায় বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদের অনুকরণে রাসুল (স) একটি পরামর্শব্যবস্থা চালু রাখেন। পরবর্তী সময়ে হযরত আবু বকর (রা) সেটি অনুসরণ করেন। হযরত ওমর (রা) এ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কারণ তিনি সব সময় বলতেন, পরামর্শ ছাড়া খিলাফত চলতে পারে না। এ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জনগণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং স্বচ্ছভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রণাপরিষদ গঠন করেন, যা মজলিশ-উস-শুরা নামে পরিচিত। এটি মজলিশ-উস-আম ও মজলিশ-উস-খাস-এ দু ভাগে বিভক্ত ছিল।

প্রশ্ন-১৩. জিজিয়া কী? ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

উত্তর: জিজিয়া হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের দেওয়া নিরাপত্তা কর।

জিজিয়া মাথাপিছু হারে নির্ধারিত হয়ে থাকে। অমুসলিম নাগরিকরা জিজিয়া দেওয়ার মাধ্যমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি লাভ করে। জিজিয়া দেওয়ার বদৌলতে মুসলিম শাসকেরা অমুসলিম নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। তবে নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ ও উন্মাদ এবং ধর্মীয় পুরোহিতরা এ করের আওতাভুক্ত নয়।

প্রশ্ন-১৪. বায়তুল মাল বলতে কী বোঝায়? *[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; সি. বো., ব. বো. ২০২১; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]*

উত্তর: বায়তুল মাল বলতে ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারি কোষাগারকে বোঝায়।

ইসলামি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সমস্ত অর্থ এক স্থানে জমা থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনায় এ অর্থ ব্যয় করা হয়। রাষ্ট্রের বাৎসরিক ব্যয় ভার নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ গরিবদের মাঝে বন্টন করা হয়। রাষ্ট্রের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এ সম্পদের ওপর নির্ভর করে। এ ধরনের রাষ্ট্রীয় কোষাগারই বায়তুল মাল নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-১৫. গনিমত বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: গনিমত বলতে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত মালকে বোঝায়।

কোনো যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হলে বিজিত পক্ষ পরাজিত পক্ষের ধন-সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে। যুদ্ধজয়ের ফলে তারা এ সকল ধন-সম্পদ নিজেদের করে নিতে পারে। এগুলোই গনিমত হিসেবে পরিচিত। বিজিত সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, খাদ্যশস্য, পোশাক, স্বর্ণ-রোপ্য প্রভৃতি গনিমতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন-১৬. হযরত ওমর (রা) আরব জাতীয়তাবাদ নীতি গ্রহণ করেছিলেন কেন?

উত্তর: আরব জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, বিশুদ্ধতা, আভিজাত্য ও সামরিক প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য হযরত ওমর (রা) আরব জাতীয়তাবাদ নীতি গ্রহণ করেন।

জাতীয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। আরব জাতি যে বিশ্বে একটি স্বতন্ত্র সত্তা তা প্রমাণ এবং উন্নত করাই ছিল হযরত ওমর (রা)-এর আরব জাতীয়তাবাদ নীতির মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে তিনি অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক সব ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার সাধান করে মুসলিম উম্মাহকে একটি আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ জাতিতে রূপ দেওয়ায় চেষ্টা করেন। তিনি আরবদের প্রাধান্য বজায় রাখতে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের আরব দেশের বাইরে অবস্থানের নির্দেশ দেন। আরবি ভাষা সংস্কারে বিশেষ উদ্যোগ নেন। তাছাড়া আরবদের বিজিত দেশে জমি ক্রয় বা উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এভাবে তিনি আরব জাতীয়তাবাদ নীতি গ্রহণ করে আরবদের নিজস্ব সত্তাও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করেন।

প্রশ্ন-১৭. কীভাবে হযরত ওসমান (রা) খিলাফত লাভ করেন? *[ঢাকা বোর্ড ২০১৭]*

উত্তর: নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হযরত ওসমান (রা) খিলাফত লাভ করেন।

খলিফা নির্বাচনের জটিলতা এড়াতে হযরত ওমর (রা) মৃত্যুর আগে একটি নির্বাচনি পরিষদ গঠন করেন, যার সদস্য ছিলেন হযরত ওসমান (রা), হযরত আলি (রা), তালহা, যুবাইর, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও আবদুর রহমান। হযরত ওমর (রা)-এর মৃত্যুর সময় তালহা মদিনায় উপস্থিত ছিলেন না এবং আব্দুর রহমান (রা) খিলাফতের গুরুভার নিতে সম্মত ছিলেন না। এ সময় আব্দুর রহমান ও যুবাইর, ওসমান ও আলি উভয়কেই খলিফা হিসেবে সমর্থন করেন। আবার, সাদ ওসমানকে, ওসমান আলিকে এবং আলি ওসমানকে সমর্থন করেন। ফলে এক ভোট বেশি পেয়ে হযরত ওসমান (রা) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন।

প্রশ্ন-১৮. যুন্নুরাইন বলতে কী বোঝায়? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ বো., সি. বো. ২০১৯]*

অথবা, কোন খলিফাকে যুন্নুরাইন বলা হয় এবং কেন? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫; ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩; রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]*

উত্তর: হযরত ওসমান (রা) মহানবি (স)-এর দুই কন্যা, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন বলে তাকে যুন্নুরাইন বলা হয়।

যুন্নুরাইন শব্দের অর্থ দুই নুর বা জ্যোতির অধিকারী। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কন্যারা ছিলেন জ্যোতিষ্কের সাথে তুলনীয়। বিবাহ সূত্রে ওসমান (রা) তাদের দুজনের অধিকার লাভ করেন। এজন্য তাকে দুই জ্যোতিষ্কের অধিকারী বা যুন্নুরাইন বলা হয়।

প্রশ্ন-১৯. হযরত ওসমান (রা) কীভাবে পানীয় জলের অভাব দূর করেন? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]*

উত্তর: মদিনার বিখ্যাত রূমা কূপটি ক্রয় করে হযরত ওসমান (রা) মদিনাবাসীর পানীয় জলের অভাব দূর করেন।

মহানবি (স)-এর নেতৃত্বে মুসলমানরা ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে। মদিনায় পানীয় জলের অভাব ছিল প্রকট। পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য মহানবি (স)-এর নির্দেশে ইসলামের তৃতীয় খলিফা সম্পদশালী হযরত ওসমান (রা) কূপ কেনার জন্য অর্থ প্রদান করেন। ওসমান (রা)-এর দেওয়া ১৮,০০০ দিরহামের মাধ্যমে মদিনাবাসীর পানির সংকট দূর করার জন্য 'বীরে রূমা' ক্রয় করা হয়। পরে আরও ২০০০ দিরহাম দিয়ে তিনি এ কূপটি সংস্কার করেন।

প্রশ্ন-২০. হযরত ওসমান (রা)-কে জামিউল কুরআন বা কুরআন সংকলনকারী বলা হয় কেন?

উত্তর: বিশেষ কমিটি গঠন করে বিশেষ সতর্কতার সাথে কুরআন সংকলনের জন্য ওসমান (রা)-কে জামিউল কুরআন বলা হয়।

আল কুরআন সংকলন খলিফা ওসমান (রা)-এর একটি অক্ষয় কীর্তি। ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কুরআন পাঠের উচ্চারণভঙ্গির পার্থক্য দেখা দেয়। এ পার্থক্য দূর করার জন্য ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জায়েদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি খলিফা ওমরের (রা) কন্যা বিবি হাফসার কাছে সংরক্ষিত কুরআনের মূল পাণ্ডুলিপি থেকে একটি বিশুদ্ধ কুরআন সংকলন করেন। মূল কপির সাতটি অনুলিপি তৈরি করে ওসমান (রা) সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন এবং অন্য কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। তার এই কীর্তির জন্য ইসলাম বিরাট ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

প্রশ্ন-২১. হযরত ওসমান (রা)-কে গনি বলা হয় কেন?

উত্তর: হযরত ওসমান (রা) তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদশালীদের একজন ছিলেন। তাই তাকে গনি (ধনী) বলা হয়।

হযরত ওসমান (রা) ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। তাঁর অঢেল সম্পদ তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করেন। জাহেলিয়া যুগেও তিনি পরোপকার ও বদ্যান্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। মুসলমানদের পানির কষ্ট দূর করতে তিনি ২০,০০০ দিরহাম ব্যয় করে মদিনার বিখ্যাত 'বীর রুমা' কিনে দেন এবং সংস্কার করেন। তাছাড়া তিনি তাবুক যুদ্ধে ১০ হাজার সৈন্যের ব্যয় ভার বহন করে। তিনি প্রায় দুই হাজার ক্রীতদাসকে দাসত্ব মুক্ত করেন। সুতরাং বোঝা যায় হযরত ওসমান (রা) একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন এবং এজন্যই তাকে গনি বলা হতো।

প্রশ্ন-২২. হযরত আলি (রা)-কে জ্ঞানের দরজা বলা হয় কেন?

উত্তর: অসাধারণ মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ায় হযরত আলি (রা)-কে রূপক অর্থে জ্ঞানের দরজা বলা হয়। হযরত আলি (রা) কুরআন, হাদিস, সাহিত্য, ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। তার রচিত 'দিওয়ানে আলী' গ্রন্থটি আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। হযরত আলি (রা)-এর তত্ত্বাবধানে আবুল আসওয়াদ প্রথম আরবি ব্যাকরণ রচনা করেন। তার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কারণে তাকে জ্ঞানের দরজা বলে সম্বোধন করা হয়।

প্রশ্ন-২৩. দুমার মীমাংসা কী? ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

উত্তর: হযরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে যে সালিশি বৈঠক হয়েছিল, সেটিই ইতিহাসে দুমার মীমাংসা নামে পরিচিত।

হযরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সিফফিন নামক স্থানে যে সংঘর্ষটি হয় তা মীমাংসার জন্য উভয়পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। হযরত আলি (রা)-এর পক্ষে আবু মুসা আশারি ও মুয়াবিয়া (রা)-এর পক্ষে আমর বিন আস সালিশদার বা মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত হন। তারা ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী দুমাতুল জন্দলে একটি সালিশ বৈঠকের আয়োজন করেন। ইতিহাসে এটিই দুমার মীমাংসা নামে পরিচিত। তবে মুয়াবিয়া (রা) মনোনীত আমরের কৌশলের কারণে দুমার মীমাংসা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন-২৪. উষ্ট্রের যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আয়েশা (রা), তালহা, যুবায়ের এবং হযরত আলি (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধই উষ্ট্রের যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত।

উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের বিচার বিলম্বিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তালহা, যুবায়ের এবং আয়েশা (র) বসরা দখল করে। হযরত আলি (রা) তাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য সেখানে যান এবং যুদ্ধের বদলে শান্তিচুক্তি করার প্রস্তাব দেন। শান্তি আলোচনার প্রস্তাবের অগ্রগতিতে মুনাফিক ইবনে সাবা আতঙ্কিত হয়ে আলি (রা)-এর অগোচরে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিদ্রিত বাহিনীকে আক্রমণ করে। এমতাবস্থায় হযরত আলি বহু কষ্টে যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হন। বিবি আয়েশা (রা)-কে উদ্ধার করে তিনি মদিনায় পাঠিয়ে দেন। বিবি আয়েশা (রা) উটের পিঠে চড়ে এ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন বলে ইতিহাসে এটি উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২৫. শিয়া শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাসহ লেখো।

[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]

উত্তর: শিয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ দল, সমর্থক, অনুসারী ইত্যাদি।

ইসলামের ইতিহাসে 'শিয়া' বলতে মহানবি (স)-এর জামাতা আলি (রা)-এর সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত দলকে বোঝায়। 'শিয়া' হচ্ছে সেই গোষ্ঠী যারা একমাত্র মহানবি (স)-এর গোত্রভুক্ত। বিশেষ করে মুহাম্মদ (স)-এর কন্যা ফাতিমা এবং তাঁর স্বামী আলির অনুসারী। ইসলামে 'খিলাফত' ও 'ইমামত' প্রশ্নে যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা হযরত আলি (রা)-কে সমর্থন করে রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল তারাই 'শিয়া'।

প্রশ্ন-২৬. খারেজি কারা? ব্যাখ্যা করো।

[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; সি. বো., ব. বো. ২০২১]

উত্তর: উমাইয়াদের বিলাসিতা ও আর্থিক লালসার বিরোধিতা থেকে যে সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে তারাই খারেজি নামে অভিহিত।

খারেজি শব্দের অর্থ দলত্যাগ। প্রকৃত প্রস্তাবে খারেজিদের উদ্ভব হলো দুমাতুল জন্দলের মীমাংসাকে কেন্দ্র করে। আবু মুসা আশারি ও আমর ইবনুল আস আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর দ্বন্দ্ব নিরসনে শান্তি প্রক্রিয়া বের করার উদ্দেশ্যে আলোচনায় বসেন। আলোচনার এক পর্যায়ে আমর ইবনুল আস আলি (রা)-কে পদচ্যুত করে মুয়াবিয়া (রা)-কে খলিফা ঘোষণা করেন। এতে হযরত আলি (রা)-এর দল থেকে ১২০০০ সদস্য বের হয়ে চলে যায়। এরাই ইতিহাসে খারেজি নামে পরিচিত।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'খুলাফায়ে রাশেদিন' শব্দের অর্থ কী?
ক. সত্য ও ন্যায়পথগামী খলিফাগণ
খ. আল্লাহর সাহায্যকারী খলিফাগণ
গ. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী
ঘ. দায়িত্বপালনকারী

২. 'খলিফা' শব্দের অর্থ কী?
ক. বিশ্বস্ত খ. প্রতিনিধি
গ. জায়গির ঘ. অনুচর

৩. খুলাফায়ে রাশেদিনের খলিফাদের সংখ্যা কতজন ছিল?
ক. দুই খ. চার
গ. পাঁচ ঘ. দশ জন

৪. ইসলামের প্রথম খলিফা কে?
ক. হযরত আবু বকর (রা) খ. হযরত ওমর (রা)
গ. হযরত আলি (রা) ঘ. হযরত ওসমান (রা)

৫. ভণ্ড নবি ও স্বধর্মত্যাগীদের দমন করেন কে?
ক. আবু বকর (রা) খ. আলি (রা)
গ. খালিদ বিন ওয়ালিদ ঘ. ওমর (রা)

৬. আবু বকর 'সিদ্দিক' উপাধি পান কেন?
ক. মেরাজের ঘটনা বিশ্বাসের জন্য
খ. দানশীলতার জন্য
গ. হিজরতের জন্য
ঘ. তায়েফ গমনের জন্য

৭. ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কাকে?
ক. হযরত আবু বকর (রা) খ. হযরত ওমর (রা)
গ. হযরত ওসমান (রা) ঘ. হযরত আলি (রা)

৮. 'রিদ্দা' শব্দের অর্থ কী?
ক. দলত্যাগ খ. অনুসরণ
গ. ভণ্ডামি করা ঘ. যুদ্ধ করা

৯. আতিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন কে?
ক. হযরত উমর (রা) খ. হযরত আলি (রা)
গ. ইমাম হোসেন (রা) ঘ. আবু বকর (রা)

১০. খলিফা আবু বকর (রা) ভণ্ড নবিদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন?
ক. শৃঙ্খলের যুদ্ধ খ. রিদ্দার যুদ্ধ
গ. কাদেসিয়ার যুদ্ধ ঘ. আজনাদাইনের যুদ্ধ

১১. হযরত ওমর (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে খিলাফত লাভ করেন?
ক. ৬৩২ খ. ৬৩৪
গ. ৬৪৪ ঘ. ৬৫৬

১২. কোন খলিফার শাসনামলে ইসলাম সুবিস্তৃতি লাভ করে?
ক. হযরত আবু বকর (রা) খ. হযরত ওমর (রা)
গ. হযরত ওসমান (রা) ঘ. হযরত আলি (রা)

১৩. জনাব 'ক' গণতন্ত্রের ধারক বলে শাসনব্যবস্থায় একটি বিশেষ পরামর্শ সভা গঠন করেন। তার সাথে নিচের কোন খলিফার মিল রয়েছে?
ক. হযরত আলি (রা) খ. হযরত ওমর (রা)
গ. হযরত আবু বকর (রা) ঘ. হযরত ওসমান (রা)

১৪. বায়তুল মাল বলতে কী বোঝায়?
ক. মসজিদের ভাণ্ডার খ. প্রাসাদ ব্যবস্থাপনা
গ. রাষ্ট্রীয় কোষাগার ঘ. দুর্গে রক্ষিত সম্পদ

১৫. 'বায়তুল মাল' শব্দের অর্থ কী?
ক. ধনসম্পদের ঘর খ. জাতীয় কোষাগার
গ. অর্থসম্পদ ঘ. সরকারি কোষাগার

১৬. ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
ক. আলি (রা) খ. ওমর (রা)
গ. আবু বকর (রা) ঘ. ওসমান (রা)

১৭. সর্বপ্রথম পুলিশ বাহিনী গঠন করেন কে?
ক. হযরত আলি (রা) খ. হযরত ওমর (রা)
গ. হযরত আবু বকর (রা) ঘ. হযরত ওসমান (রা)

১৮. ওসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন কত খ্রিষ্টাব্দে?
ক. ৬৪৩ খ. ৬৪৪
গ. ৬৪৫ ঘ. ৬৪৬

১৯. হযরত ওসমান (রা) বীরে রুমা ক্রয় করেন কেন?
ক. জলসেচের জন্য
খ. নিজের প্রয়োজনে কুয়ার জন্য
গ. মাছ চাষের জন্য
ঘ. মুসলমানদের পানির কষ্ট দূর করার জন্য

২০. হযরত ওসমান (রা) আবু জর গিফারিকে কোথায় নির্বাসন দেন?
ক. বসরায় খ. মক্কায়
গ. রাবাদায় ঘ. সিরিয়ায়

২১. ইসলামের চতুর্থ খলিফা কে?
ক. আলি (রা) খ. ওসমান (রা)
গ. আবু বকর (রা) ঘ. ওমর (রা)

২২. শিয়া দল কাকে খিলাফতের বৈধ দাবিদার মনে করে?
ক. আবু বকর (রা) খ. ওমর (রা)
গ. আলি (রা) ঘ. ওসমান (রা)

২৩. উষ্ট্রের যুদ্ধের অপর নাম কী?
ক. সিফফিনের যুদ্ধ খ. নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ
গ. জামালের যুদ্ধ ঘ. খারিজিদের যুদ্ধ

২৪. খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনকাল কত বছর ছিল?
ক. ৪০ খ. ৩০
গ. ৩৫ ঘ. ৫০

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২৫. হযরত আবু বকর (রা)-কে প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচনের কারণ হলো, তার—
i. বয়োজ্যেষ্ঠতা
ii. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইঙ্গিত
iii. কুরাইশ বংশীয় হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৬. রিদ্দা যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল—
i. স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে
ii. ভণ্ড নবিদের বিরুদ্ধে
iii. নওমুসলিমের বিরুদ্ধে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' রাষ্ট্রের প্রধান নেতার মৃত্যুর পর পরবর্তী দলনেতা নির্বাচনে সংঘাতময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এমতাবস্থায় বিবদমান দলগুলোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় বসে সর্বসম্মতিক্রমে বয়োজ্যেষ্ঠ জনাব জোবায়েরকে প্রধান নেতা নির্বাচিত করেন। ফলে সবাই তাকে মেনে নেয়।

২৭. এ নির্বাচন প্রক্রিয়া ইসলামের ইতিহাসের কোন খলিফার নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ?
ক. হযরত আবু বকর (রা) খ. হযরত ওমর (রা)
গ. হযরত ওসমান (রা) ঘ. হযরত আলি (রা)

২৮. এ খলিফা নির্বাচিত হওয়ায়—
i. নেতৃত্ব সংকটের অবসান হয়
ii. সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পায়
iii. রাষ্ট্র সংঘাতের হাত থেকে রক্ষা পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি ২৯ ও ৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব 'ক' সাহেব 'খ' আসনের একজন এমপি। দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে কাজ চালিয়ে যান। তিনি তার আসনের সব মানুষের সুখে-দুঃখে নিবেদিত প্রাণ। তা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তোলা হয়।

২৯. 'ক' সাহেবের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কোন খলিফার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অনুরূপ?
ক. আবু বকর (রা) খ. ওমর (রা)
গ. আলি (রা) ঘ. ওসমান (রা)

৩০. উদ্দীপকের মতো উক্ত খলিফাও অবদান রেখেছিলেন—
i. ইসলামের খেদমতে
ii. জনগণের কল্যাণে
iii. হাদিস সংকলনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি ৩১ ও ৩২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আজাদ দলনেতা নির্বাচিত হয়ে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে।

৩১. উদ্দীপকের আজাদের সাথে কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. হযরত আলি (রা) খ. সুলাইমান
গ. হযরত ওসমান (রা) ঘ. মুয়াবিয়া (রা)

৩২. উদ্দীপকে উল্লেখিত গৃহযুদ্ধের কারণ হলো—
i. মুয়াবিয়া (রা)-এর অসহযোগিতা
ii. হাশেমি ও উমাইয়াদের দ্বন্দ্ব
iii. ওসমান হত্যার প্রতিশোধ দাবি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৩. 'খিলাফত' কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. উত্তরাধিকারিত্ব খ. প্রতিনিধিত্ব
গ. রাজত্ব ঘ. শিষ্যত্ব

৩৪. খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়কাল কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
ক. ৬৩০—৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ খ. ৬৩২—৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ
গ. ৬৩২—৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ ঘ. ৬৩২—৬৬২ খ্রিষ্টাব্দ

৩৫. খিলাফত শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
ক. Representative খ. Represent
গ. Leadership ঘ. Ruler

৩৬. বয়স্কদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
ক. হযরত আবু বকর (রা) খ. হযরত ওমর (রা)
গ. হযরত ওসমান (রা) ঘ. হযরত তালহা (রা)

৩৭. খলিফা আবু বকর (রা)-কে 'সিদ্দিক' উপাধি দেওয়া হয়েছিল কেন? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

ক. সত্যবাদিতার জন্য
খ. ভণ্ড নবিদের দমন করেন বলে
গ. জাকাত আদায়ে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাই
ঘ. অধিক দানশীল ছিলেন বলে

৩৮. ভণ্ড নবিদের উত্থানের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

ক. ধর্ম প্রচার খ. ইসলাম অবমাননা
গ. রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঘ. স্বার্থ হাসিল

৩৯. ইয়ামামার যুদ্ধে সেনাপতি কে ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

ক. মুনজির খ. আবু ওবায়দা
গ. খালিদ বিন ওয়ালিদ ঘ. ওসামা

৪০. ইয়ামামার যুদ্ধে কোন ভণ্ড নবি নিহত হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

ক. আসাদ আনসি খ. মুসায়লামা
গ. তোলায়হা ঘ. সাজাহ

৪১. হযরত আবু বকর (রা) কুরআন সংগ্রহে উৎসাহিত হলেন কেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

ক. ভণ্ড নবিদের উৎপাত বৃদ্ধি পাওয়ায়
খ. কুরআনের আয়াত ভুলে যাওয়ার ভয়ে
গ. কুরআনের অনেক হাফেজ শহিদ হওয়ায়
ঘ. রাষ্ট্রীয়কার্যে কুরআনের আইন প্রয়োগ করতে

৪২. হযরত আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়, কারণ— *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

ক. তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন
খ. তিনি সব সময় রাসুলের (স) সঙ্গে ছিলেন
গ. তিনি অরাজক ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থায় ইসলামকে রক্ষা করেন
ঘ. তিনি পরম সত্যবাদী ছিলেন

৪৩. হযরত ওমর (রা) ইসলামের কততম খলিফা ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০২৩]*

ক. ১ম খ. ২য়
গ. ৩য় ঘ. ৪র্থ

৪৪. হযরত ওমর (রা) ও হযরত ওসমান (রা) কীভাবে খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

ক. অভিজাতদের সমর্থনে
খ. প্রাদেশিক শাসনকর্তার সমর্থনে
গ. বংশানুক্রমিক পদ্ধতিতে
ঘ. নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক

৪৫. হযরত ওমর (রা)-এর উপাধি কী ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

ক. বিশ্বাসী খ. সত্যবাদী
গ. আল্লাহর তরবারি ঘ. সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী

৪৬. 'বায়তুল মাল' কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

ক. বিচারালয় খ. রাষ্ট্রীয় কোষাগার
গ. উপাসনালয় ঘ. রাজস্ব দপ্তর

৪৭. মুসলিম রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম কোন শাসক আদমশুমারি করেছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

ক. হযরত আবু বকর (রা) খ. হযরত ওমর (রা)
গ. মুয়াবিয়া ঘ. আব্দুল মালিক

৪৮. 'গনী' শব্দের অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০২২]*

ক. দানশীল খ. বিশ্বাসী
গ. ধনী ঘ. দয়ালু

৪৯. 'যুন্নুরাইন' কোন খলিফাকে বলা হয়? *[সকল বোর্ড ২০২৩; ২০১৫]*

ক. হযরত আবু বকর (রা)-কে
খ. হযরত ওমর (রা)-কে
গ. হযরত ওসমান (রা)-কে
ঘ. হযরত আলি (রা)-কে

৫০. খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যার অন্যতম প্রধান কারণ কী ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

ক. মারওয়ানের ধ্বংসাত্মক নীতি
খ. কুরাইশদের ষড়যন্ত্র
গ. হযরত আলি (রা)-এর অসহযোগিতা
ঘ. মুয়াবিয়ার (রা) ষড়যন্ত্র

৫১. মুসলমানদের বিলাস-ব্যসনের প্রথম বিরোধিতাকারী সাহাবির নাম কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

ক. হযরত উসমান (রা)
খ. হযরত আলি (রা)
গ. হযরত মুয়াবিয়া (রা)
ঘ. হযরত আবুজর গিফারি (রা)

৫২. হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে— *[সকল বোর্ড ২০২২]*

i. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়
ii. সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে
iii. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৩. রিদ্দার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ— *[সকল বোর্ড ২০২১]*

i. ইসলামকে রক্ষা
ii. ভণ্ড নবিদের দমন
iii. ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৪. 'যুন্নুরাইনের' সাথে সম্পর্কিত— *[সকল বোর্ড ২০২১]*
i. হযরত ওসমান (রা)
ii. হযরত রোকেয়া (রা)
iii. হযরত কুলসুম (রা)
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৫. হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যার পেছনে যে কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো— *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
i. কুরাইশ-অকুরাইশ দ্বন্দ্ব
ii. ক্ষমতার অপব্যবহার
iii. খলিফার সরলতা ও উদারতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৬. 'দুমাতুল জন্দলের' সালিশ বৈঠকের ফলে— *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
i. মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট হয়
ii. মাওয়ালিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
iii. খারেজিদের উৎপত্তি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫৭ ও ৫৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রাজা নাফিস একজন ভৃত্য সহকারে উটের পৃষ্ঠে চড়ে তার সেনাপতি কর্তৃক অবরুদ্ধ শহরের দিকে রওনা হন। পালাক্রমে তিনি ও তার ভৃত্য উটের পৃষ্ঠে চড়ে শহরে উপস্থিত হলেন। শহরে প্রবেশকালে রাজা উটের রশি টানছিলেন আর ভৃত্য উটের পৃষ্ঠে বসা। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

৫৭. উদ্দীপকের ঘটনাটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত?
ক. জেরুজালেম অধিকার
খ. খ্রিস্টান ও মুসলমানদের যুদ্ধ বিরতি
গ. জেরুজালেম এর নিরাপত্তা
ঘ. খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সন্ধি চুক্তি

৫৮. উক্ত ঘটনাটিতে হযরত ওমর (রা)-এর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশিত হয়েছে—
i. ন্যায়বিচার
ii. মানবতাবোধ
iii. সাম্যবাদিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫৯ ও ৬০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফুলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইমতিয়াজ সাহেব গভীর রাতে এলাকার মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখতে বের হন এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করেন। তিনি তার কাজের জন্য কোনো বেতন-ভাতা নেন না। *[সকল বোর্ড ২০২১]*

৫৯. ইমতিয়াজ সাহেবের কাজের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে?
ক. খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর
খ. খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর
গ. খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর
ঘ. খলিফা হযরত আলি (রা)-এর

৬০. উক্ত খলিফা দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি ছিলেন—
i. কঠোর
ii. দয়ালু
iii. সহানুভূতিশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৬১ ও ৬২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

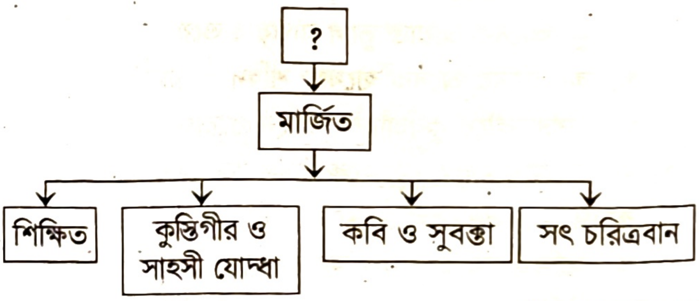

[সকল বোর্ড ২০২১]

৬১. উপরে উল্লিখিত গুণাবলি কোন খলিফার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়?
ক. হযরত আবু বকর (রা) খ. হযরত ওমর (রা)
গ. হযরত উসমান (রা) ঘ. হযরত আলি (রা)

৬২. হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর চরিত্রে কোনটির সংমিশ্রণ ঘটেছিল বলে তুমি মনে কর?
ক. কোমলতা ও সরলতা খ. সাম্য ও কঠোরতা
গ. কোমলতা ও কঠোরতা ঘ. নির্মলতা ও সরলতা

উদ্দীপকটি পড়ে ৬৩ ও ৬৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রহিম, রাম, ও জন একটি ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করেন। রহিম যে হারে ভূমি কর দেন, রাম ও জন তার চেয়ে একটু বেশি ভূমি কর দেন। সামরিক করের বিনিময়ে রাম ও জন ইসলামি রাষ্ট্রে যুদ্ধ অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকলেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রহিমের যুদ্ধে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

৬৩. রহিমের প্রদেয় ভূমি করের নাম কী?
ক. জিজিয়া খ. উশর
গ. খারাজ ঘ. যাকাত

৬৪. রাম ও জন যুদ্ধে যাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পায় যে কর পরিশোধের কারণে, তা হলো—
ক. খারাজ খ. জিজিয়া
গ. আল্-ফে ঘ. উশর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৫ ও ৬৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
নড়াইলের প্রত্যন্ত গ্রামে জনগণকে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্যে মিজান সাহেব প্রচুর অর্থ ব্যয়ে একটি আধুনিক পানির প্লান্ট স্থাপন করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

৬৫. মিজান সাহেবের কাজে কোন খলিফার কাজের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়?
ক. হযরত আবু বকর (রা) খ. হযরত ওমর (রা)
গ. হযরত ওসমান (রা) ঘ. হযরত আলি (রা)

৬৬. উক্ত খলিফার কাজে—
i. জনকল্যাণের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়
ii. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়
iii. নিজের সুনাম বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৭ ও ৬৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে ভারতের মমতা ব্যানার্জি একাই সরকারের ভিত কাঁপিয়ে তোলেন। সরকার তাঁকে রাজধানী দিল্লি থেকে সরিয়ে দূরবর্তী প্রদেশে অবস্থানে বাধ্য করলেও জনগণের মধ্যে তার প্রভাব শক্তিশালী রূপ নেয়। *[সকল বোর্ড ২০২১]*

৬৭. মমতা ব্যানার্জির মতো কোন মুসলিম সাধক খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে তার মতবাদ দিয়ে সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন?
ক. আবু জর আল গিফারি (রা)
খ. আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা)
গ. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)
ঘ. মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা)

৬৮. উদ্দীপকের ভারত সরকারের মতো খলিফার কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পেয়েছিল—
i. সরকারের দুর্বলতা
ii. সাধকের মতবাদের যৌক্তিকতা
iii. সরকারের অসহিষ্ণুতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৯ ও ৭০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তার রাজধানী দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করেন। কারণ দেবগিরি ছিল সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে। *[সকল বোর্ড ২০২২]*

৬৯. উদ্দীপকের সুলতানের ন্যায় খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফা রাজধানী মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তর করেন?
ক. হযরত আবু বকর (রা) খ. হযরত ওমর (রা)
গ. হযরত উসমান (রা) ঘ. হযরত আলি (রা)

৭০. উক্ত খলিফার রাজধানী স্থানান্তরের কারণ—
i. কুফাবাসীর সমর্থন
ii. সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল
iii. খলিফার উচ্চাকাঙ্ক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭১ ও ৭২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
গ্রামপ্রধান নির্বাচন নিয়ে দুটি পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে উভয়পক্ষ সদলবলে শালিস বৈঠকে বসে। এতে এক পক্ষের কিছুসংখ্যক লোক অন্যপক্ষের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তে অসন্তোষ ও ক্ষুব্ধ হয়ে বৈঠক ত্যাগ করে উভয়পক্ষের বিরোধী হিসেবে আবির্ভূত হয়। *[সকল বোর্ড ২০২৩]*

৭১. উদ্দীপকের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সাথে নিচের কোন সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য রয়েছে?
ক. খারেজি খ. মাওয়ালি
গ. শিয়া ঘ. উমাইয়া

৭২. উদ্দীপকের মতো দ্বন্দ্বের জেরে অনুষ্ঠিত 'দুমাতুল জন্দলের' শালিস বৈঠক ছিল—
i. দুরভিসন্ধিমূলক
ii. প্রহসনমূলক
iii. সমঝোতামূলক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	ক	৬	ক	৭	ক	৮	ক	৯	ঘ	১০	খ	১১	খ	১২	খ
১৩	খ	১৪	গ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	গ	২১	ক	২২	গ	২৩	গ	২৪	খ
২৫	ক	২৬	ক	২৭	ক	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	ক	৩১	ক	৩২	ঘ	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	ক	৩৬	ক
৩৭	ক	৩৮	ঘ	৩৯	গ	৪০	খ	৪১	গ	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	ঘ	৪৫	ঘ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	গ
৪৯	গ	৫০	ক	৫১	ঘ	৫২	ঘ	৫৩	ক	৫৪	ঘ	৫৫	গ	৫৬	খ	৫৭	ক	৫৮	গ	৫৯	খ	৬০	গ
৬১	খ	৬২	গ	৬৩	খ	৬৪	খ	৬৫	গ	৬৬	ক	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	ঘ	৭০	ক	৭১	ক	৭২	ক

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন নীতি কীরূপ ছিল? ব্যাখ্যা করো।

২. ভণ্ড নবি ও জাকাত বিরোধীদের আন্দোলন দমনে হযরত আবু বকর (রা) কীরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? লেখো।

৩. হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ব্যাখ্যা করো।

৪. ইসলামের সেবায় খালিদ বিন ওয়ালিদের অবদান ব্যাখ্যা করো।

৫. হযরত ওমর (রা) বায়তুল মাল পুনর্গঠন করেন কেন?

৬. হযরত ওমর (রা)-এর রাজস্ব আয়ের উৎসগুলো লেখো।

৭. খলিফা হওয়ার আগে হযরত ওসমান (রা) ইসলামের সেবায় কীরূপ ভূমিকা রাখেন? ব্যাখ্যা করো।

৮. হযরত ওসমান (রা) হত্যার প্রতিক্রিয়া কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

৯. কুরআন শরিফ সংকলনে হযরত ওসমান (রা)-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

১০. উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিগত সরকার পরপর তিনটি একতরফা নির্বাচনে নিজেদেরকে নির্বাচিত দাবি করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। অথচ সঠিকভাবে জনরায় নিলে তারা নির্বাচিত হতে পারতো না। ফলে তাদের বিরুদ্ধে দেশের অধিকাংশ মানুষ ক্ষুব্ধ ছিল। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতা করেছে। অথচ ইতিপূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত তিনটি সুষ্ঠু নির্বাচনে নির্বাচিত সরকার নির্বিঘ্নে দেশ পরিচালনা করেছে।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]

ক. ইসলামের প্রথম খলিফার নাম কী?

খ. খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত একতরফা নির্বাচনের সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচনের পার্থক্য নির্ণয় করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মতোই খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন অনুষ্ঠানে জনরায় প্রতিফলিত হয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে ব্যাখ্যা দাও।

২. আব্বাসি বংশের ৩য় খলিফা আল মাহ্দী ৭৭৫ সালে বাগদাদের খলিফা হওয়ার পর বহুমুখী বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। তাঁর শাসনামলে কদাকার খর্বাকৃতি হাশিম বিন হাকিম (মুকান্না) নিজেকে আল্লাহর অবতার বলে মিথ্যা নবুয়তের দাবি করেন। এ ভণ্ড নবির যথেষ্ট অনুসারী ছিল। তারা সাদা কাপড় ব্যবহার করত বলে তাদেরকে 'মুবায়িদ' বলা হতো। তাছাড়া বাগদাদের পূর্ব দিকে 'মুহাম্মির' নামক আর এক দল ভণ্ড লোকের উদ্ভব হয়। তাদের 'জিন্দিক' বলা হতো। পারস্যের কেউ কেউ আবার যাকাত দিতেও অস্বীকার করে। খলিফা মাহ্দী কঠোর হস্তে সকল ভণ্ড নবি এবং ভণ্ড ধর্মীয় নেতাদেরকে দমন করেন এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের যাকাত দিতে বাধ্য করেন। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]*

ক. মহানবি কত সালে খায়বার জয় করেন?

খ. মুতার যুদ্ধে মহানবি (সা) পর্যায়ক্রমে তিনজন সেনাপতির নাম ঘোষণা করেন কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের খলিফা আল মাহ্দীর কার্যক্রমের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন খলিফার কার্যক্রমের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত খলিফার বিদ্রোহ দমনে গৃহীত পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করো।

৩. যশোধর সিং অভিনেতা এবং শরীর চর্চাবিদ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এমনিতেই তার অনেক অনুসারী ছিল। তারপরও ধর্মকে ব্যবহার করে আরও মর্যাদা ও অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তিনি 'ক' অঞ্চলে ডেরা খুলে বসেন। নিজে ধর্মগুরু সেজে কাল্পনিক ধর্ম বিশ্বাসের মিথ্যা লোভ দেখিয়ে প্রচুর ভক্ত ও অর্থের মালিক হন। কিন্তু তার এহেন কার্যকলাপ রাষ্ট্র ধর্মের জন্য হুমকি মনে করে সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। একই সাথে অন্যান্য ধর্ম ব্যবসায়ীদেরও সরকার সমূলে দমন করে।

[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]

ক. বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন?

খ. গ্রন্থাকারে কুরআন লিপিবদ্ধ করার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের মতো ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ীর আবির্ভাব কোন খলিফার আমলে প্রকট আকার ধারণ করেছিল? বুঝিয়ে লেখো।

ঘ. উদ্দীপকে ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের তুলনায় রিদ্দা আন্দোলন ছিল আরও ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

৪. ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়। আইনসভাটি দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। উচ্চকক্ষের নাম হাউজ অব কমন্স। মূলত হাউজ অব কমন্সে নির্বাচিত প্রতিনিধি ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অপরদিকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হাউজ অব লর্ডসের সদস্যগণ দেশের সার্বিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে সুচিন্তিত মতামত দেন।

[ঢা. বো.; দি. বো; কু. বো., চ. বো, সি. বো. ২০১৯]

ক. আতিক শব্দের অর্থ কী?

খ. যুন্নুরাইন বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আইনসভার সাথে হযরত ওমর (রা) প্রবর্তিত কোন পরিষদের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত পরিষদের কার্যাবলি পর্যালোচনা করো।

৫. — 'অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধূলার তখতে বসি
খেঁজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি
সাইমুম-ঝড়ে পড়েছে কুটির, তুমি পড়নি ক'নুয়ে,
উর্ধ্বের যারা পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভুঁয়ে।
শত প্রলোভন বিলাস বাসনা ঐশ্বর্যের মদ
করেছে সালাম দূর হতে সব ছুঁইতে পারেনি পদ।
সবারে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নিচে,
বুকে করে সবে বেড়া করি পার, আপনি রহিলে পিছে।'

(উৎস: 'উমর ফারুক'; কাজী নজরুল ইসলাম)

ক. খিলাফত শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

খ. শিয়াদের ইমামত ও ইমাম নির্বাচন পদ্ধতি কেমন ছিল?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কবিতার লাইনগুলো ইসলামের কোন খলিফার কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।

৬. মহামতি সুলাইমান একজন শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য বিস্তারকারী ছিলেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করে পূর্বে কৃষ্ণসাগর থেকে পশ্চিমে তিউনিসিয়া এবং উত্তরে ভিয়েনা থেকে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি সাম্রাজ্যে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্নীতির দায়ে তার জামাতাকেও তিনি শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিতেন। *[সি. বো., ব. বো. ২০২১]*

ক. ইসলামের প্রথম খলিফার নাম কী?

খ. 'খুলাফায়ে রাশেদিন' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মহামতি সুলাইমানের সাথে তোমার পঠিত কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করো।

৭. দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ ঘুরির মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দীন আইবেক সুলতান হিসেবে মনোনীত হন। তিনি দেশ জয়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করেন। তিনি শুধু একজন বিজেতাই ছিলেন না বরং একজন সফল প্রশাসকও ছিলেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন করে একটি শক্তিশালী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। মূলত তার শাসনামলেই ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন পূর্ণতা লাভ করে। *[ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

ক. উষ্ট্রের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?

খ. 'বায়তুল মাল' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের মিল রয়েছে? বাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের শাসকের চেয়ে উক্ত খলিফা ছিলেন আরও অধিকতর সফল প্রশাসক— উক্তিটিকে তুমি কি সমর্থন কর? যুক্তিসহ তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো।

৮. দিল্লির বাদশাহ নাসিরুদ্দিন ছিলেন একজন প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি রাতে ছদ্মবেশে পথে-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে নিজ চোখে প্রজাদের অবস্থা দেখতেন। অনেক সময় বাদশাহ নিজে খাবার সামগ্রী বহন করে দুঃখী প্রজাদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। প্রজাদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। প্রজারঞ্জক, ধর্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তবে বিচারের ক্ষেত্রে তিনি তেমন কঠোর হতে পারেননি কিংবা সাম্রাজ্য সম্প্রসারণেও বিশেষ কোনো অবদান রাখেননি।

ক. ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম কী?

খ. হযরত আবু বকর (রা)-কে সিদ্দিক বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের বাদশাহ নাসিরুদ্দিনের কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পঠিত ইসলামের কোন খলিফার কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের বাদশাহ অপেক্ষা খলিফার কর্মকাণ্ড অধিক প্রশংসার দাবি রাখে— বিশ্লেষণ করো।

৯. **ঘটনা ১:** বাংলাদেশে অসংখ্য মাজার রয়েছে। এই মাজারগুলোতে ভণ্ড সাধু ও সেবকরা মাজারে শায়িত পিরের আদি ভৌতিক ও অতিলৌকিক ক্ষমতার গুণকীর্তন প্রকাশ করে বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জন করে। মূলত এটিই হলো ধর্ম-ব্যবসা।

ঘটনা ২: জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও দেশের মানুষের সমস্যা, দেশের আর্থিক ও জনকল্যাণমূলক সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। *[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো. য. বো., ব. বো. ২০২৫]*

ক. খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়কাল লেখো।

খ. 'রিদ্দা আন্দোলন' কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. মাজারকেন্দ্রিক ভণ্ড সাধু-সেবকদের সাথে খলিফা আবু বকর (রা)-এর শাসনামলের কোন গোষ্ঠীর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা ২-এর আলোকে 'মজলিশ-উশ-শূরার' গঠন ও কার্যপরিধির বৈপরীত্য বিশ্লেষণ করো।

১০. বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব নির্ধারণ ও রাজস্ব আদায়ের জন্য 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ড' গঠন করেছে। বোর্ডের প্রধানকে বলা হয় 'চেয়ারম্যান'। রাজস্ব বোর্ডের প্রধান কাজ হলো সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করা, হিসাব সংরক্ষণ করা এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করা। রাজস্বের প্রধান খাতগুলো হলো আয়কর, ভ্যাট, আমদানি ও রপ্তানি কর, বাণিজ্য কর, সেবা করসহ অন্যান্য খাত। *[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো. য. বো., ব. বো. ২০২৫]*

ক. খলিফা ওমর (রা) তাঁর সাম্রাজ্যকে কতটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন?

খ. বায়তুল মাল কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. খলিফা ওমর (রা) সাম্রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের জন্য বাংলাদেশের 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের' আদলে কোন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে খলিফা ওমর (রা)-এর রাজস্ব ব্যবস্থা পর্যালোচনা করো।

১১. আমেরিকায় ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি সাউদার্ন স্টেট ও নর্দান ফেডারেল স্টেটের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও নানা অসহযোগিতাকে কেন্দ্র করে এ গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া নানা অনৈক্য, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্য, দাস-দাসীদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন এ যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। তৎকালীন সময়ে The Newyork Times পত্রিকা এ যুদ্ধ সম্পর্কে এক সংবাদ বিবৃতিতে বলেছিল, এ যুদ্ধ মার্কিন জাতিগত সংঘাত, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের অবক্ষয় ও নানা কুশাসনকে উসকে দিয়েছিল।

ক. কাকে গণি বলা হয়?

খ. হযরত ওসমান (রা) আবু-জর গিফারিকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন কেন?

গ. উদ্দীপকের ঘটনা খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলের কোন গৃহযুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের যুদ্ধের মতো উক্ত যুদ্ধ মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ইসলামি গণতান্ত্রিক ধারাকে বিনষ্ট করেছিল? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

১২. বাদশা সরফরাজ খান ছিলেন একজন সরলমনা ও প্রজাবৎসল শাসক। তিনি সবসময় অহেতুক রক্তপাত এড়িয়ে যেতেন। তার এ সরলতার সুযোগ নিয়ে একদল বিপথগামী জনতা তার বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ এনে বিদ্রোহ শুরু করে। তিনি এ বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন না করায় আস্তে আস্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। *[ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

ক. মহানবি (স) কাকে 'সাইফুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন?

খ. হযরত আবু জার-গিফারি (রা)-কে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের বাদশাহর সাথে ইসলামের কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত খলিফার ওপর আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তোমার মতামত যুক্তির আলোকে তুলে ধরো।

১৩. চিলি রাষ্ট্রের জাতীয় কবি পাবলো নেরুদা। তার বিরুদ্ধে শাসনবিরোধী ষড়যন্ত্র, সরকার বিরোধী মিথ্যা প্রচারণা, জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলাসহ নানা অভিযোগ আনা হয়। ১৯৭১ সালে অগাস্টো পিনোশের আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তবে প্রকৃত পক্ষে তিনি এ অভিযোগগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। কবিকে হত্যার পর চিলির স্বৈরশাসকবিরোধী আন্দোলন আরও বেগবান হয়ে ওঠে, যা চিলির শাসনব্যবস্থাকে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

ক. সর্ব প্রথম বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন কে?

খ. গনিমত বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের হত্যাকাণ্ডের মতো উক্ত খলিফার হত্যাকাণ্ডও ইসলামকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছিল? যৌক্তিক মতামত দাও।

১৪. রায়পুর জেলা পরিষদের প্রশাসক নির্বাচিত হয়ে সেলিম চৌধুরী তার জেলায় কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেন। এদের মধ্যে কয়েকজন যোগ্য হলেও তারা ছিলেন প্রশাসকের নিকটআত্মীয়। কিছু দিন পর কতিপয় ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, কোষাগারের অর্থ আত্মসাৎ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারসহ বেশ কিছু অভিযোগ উত্থাপন করে। বিশেষ মহলের উস্কানিতে বিদ্রোহীরা এক পর্যায়ে প্রশাসকের বাসভবন অবরোধ করে এবং সেই সাথে উত্তেজিত জনতা তাকে আক্রমণ করে। ফলে রায়পুরের অধিবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এবং সংঘাতের বীজ রোপিত হয়। *[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*

ক. 'আসাদুল্লাহ' শব্দের অর্থ কী?

খ. খারেজি কারা? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার পরিণতি বিশ্লেষণ করো।

১৫. **ঘটনা ১:** ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর তৎকালীন সরকার প্রধান অসৎ উদ্দেশ্যে হেফাজতের লোকজন কুরআন পুড়িয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন।

ঘটনা ২: রেজাশাহ পাহলভী ইমাম খোমেনিকে তার স্বৈরাচারী শাসনের জন্য হুমকি মনে করে ফ্রান্সে নির্বাসনে পাঠান। কেননা, ইমাম খোমেনি গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষার জন্য জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলনের ডাক দেন। */ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫/*

ক. হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকাল লেখো।

খ. 'যুন্নুরাইন' উপাধি কাকে এবং কেন দেওয়া হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে ওসমান (রা)-এর জীবনের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ইমাম খোমেনির জীবন ও কর্মের সাথে হযরত আবুজর গিফারি (রা)-এর জীবন ও কর্মের বৈসাদৃশ্যসমূহ বিশ্লেষণ করো।

১৬. জনাব শামসুল হক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের শাসকের নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের বরখাস্ত করেন। ইলিয়াস নামক গভর্নর ব্যতীত সকল গভর্নর তার নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখান। তাছাড়া গভর্নর ইলিয়াস সাহেব পূর্বের শাসনকর্তার সময়ে যেসব সরকারি সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন নতুন শাসনকর্তা তা রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে উক্ত শাসনকর্তা ও গভর্নর ইলিয়াসের মধ্যে এক সংঘর্ষ শুরু হয়। */সি. বো., ব. বো. ২০২১/*

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

খ. খারেজি কারা? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংঘর্ষ দ্বারা তোমার পঠিত কোন সংঘর্ষের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত যুদ্ধের ফলাফল মূল্যায়ন করো।

১৭. ভ্রান্তিবিলাসী আরব বসন্তের ঢেউ মিসরের বয়োঃবৃদ্ধ প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কিন্তু জনগণ নতুন যাকে শাসক নিয়োগ করে তিনি সেনাপ্রধানের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। ফলে নতুন শাসক শক্তি ও শাসনে যোগ্যতার পরিচয় দিলেও কূটকৌশলে বিরোধীদের কাছে হেরে যান এবং অল্প সময়ের মধ্যে কঠিন পরিণতি ভোগ করেন। সেনাপ্রধান খোলস ছেড়ে প্রেসিডেন্টের পদ দখল করেন। */ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২; রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮/*

ক. 'আসাদুল্লাহ' কার উপাধি?

খ. 'শিয়া' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাসহ লেখো।

গ. মিসরের প্রেসিডেন্টের পরিণতির সাথে হযরত উসমান (রা)-এর পরিণতির সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের নিরিখে হযরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার দ্বন্দ্বের পরিণতি মূল্যায়ন করো।

১৮. ইরাকের বিখ্যাত সুফি তাপস হাসান বসরি (র)-এর শিষ্য ছিলেন ওয়াসিল বিন আতাহ। একদিন এক প্রশ্নের উত্তর নিয়ে হাসান বসরি (র)-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে দল ত্যাগ করেন তারই শিষ্য ওয়াসিল বিন আতাহ। আর হাসান বসরি তার শিষ্যকে এই সময় বলেন, 'ইত্তাজিলা আন্না'। বিচ্ছিন্নবাদিতার নিদর্শনস্বরূপ হাসান বসরি (র) তার শিষ্যের প্রতি এমন মন্তব্য করেন। আর পরবর্তীতে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াসিল বিন আতাহ মতামত প্রদান করেন। তার প্রতিষ্ঠিত দল 'মুতাজিলা' সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

ক. 'আসাদুল্লাহ' শব্দের অর্থ কী?

খ. সিফফিনের যুদ্ধের ফলাফল কীরূপ ছিল?

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের সম্প্রদায়ের মতো উক্ত সম্প্রদায়ও রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে অনেক মতবাদ প্রদান করেছে? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

১৯. দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালে রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল জাকাত, জিজিয়া, খারাজ, উশুর ইত্যাদি। তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সামান্য ভাতা পেতেন তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। রাষ্ট্রীয় আয়ের বেশির ভাগই তিনি জনকল্যাণে ব্যয় করতেন। তাছাড়া জনগণের উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন খাল খনন করেন এবং ফিরোজাবাদ নামে নতুন নগরী নির্মাণ করেন। তিনি টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এমনকি তার রাজত্বকালে দাস-দাসীদের জন্য 'দিওয়ান-ই-খয়রাত' বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও নারীর অধিকার সমুন্নত রাখতে তিনি সব সময় সচেষ্ট ছিলেন। তার সময়ে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের পাশাপাশি নারীর অবস্থার উন্নতি ঘটে।

ক. 'জুলফিকার' কার উপাধি ছিল?

খ. সিফফিনের যুদ্ধের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের অর্থনৈতিক অবস্থার সাদৃশ্য দেখাও।

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়েও শিক্ষা বিস্তার ও নারীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছিল? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২০. 'ক' দেশের তৃণমূল পর্যায়ে কিছু ধনী লোক গরিব লোকদের এত উচ্চ সুদে ঋণ দেয় যে তাদের পক্ষে তা আর শোধ করা সম্ভব হয় না। আর ঋণ শোধ না করতে পারলে গরিবদের ওপর চলে নানা অত্যাচার। অনেক সময় ঋণের দায়ে ঋণগ্রস্তদের স্ত্রী, সন্তানদেরও ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এভাবে 'ক' দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ছে। আবার অনেকেই অভাব মেটাতে অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ২ ও ৩*

ক. 'খিলাফত' শব্দের অর্থ কী?

খ. খলিফা নির্বাচন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের বর্ণনায় প্রাক-ইসলামি আরবের কোন দিকটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'ক' দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কীরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? খুলাফায়ে রাশেদিনের অর্থনৈতিক নীতিমালার আলোকে মতামত দাও।

২১. 'এই সে স্বর্গ, এই যে বেহেশত, এখানে বিভেদ নাই, যত হাতাহাতি হাতে রেখে হাত মিলিয়াছে ভাই ভাই'। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ২ ও ৩*

[কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্য' কবিতা থেকে সংগৃহীত]

ক. হিলফুল ফুজুল কে গঠন করেন?

খ. 'খুলাফায়ে রাশেদিন' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কবিতার লাইনটির বিষয়বস্তু কোন মহামানবের ঘোষণায় পরিপূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উল্লিখিত কবিতার লাইনটির বিষয়বস্তু বিবেচনায় হযরত ওমর (রা)-কে উক্ত মহামানবের প্রকৃত অনুসারী বলা যায় কি? মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

২২. 'ক' রাষ্ট্রের শাসক অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। নিজের রাষ্ট্রের সব অনাচার দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি সব সময় অত্যাচারিত, নির্যাতিত মানুষের পক্ষে অবস্থান করতেন। অন্য রাষ্ট্রের প্রতিও তিনি উদার ছিলেন। তার মৃত্যুর পর 'ক' রাষ্ট্রে অত্যন্ত সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতিতে তার বিশ্বস্ত সহচর জনগণের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে 'ক' রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাসনভার গ্রহণ করে তিনি 'ক' রাষ্ট্র ও এর জনগণকে ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা করেন। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ২ ও ৩*

ক. 'হিজরত' শব্দের অর্থ কী?

খ. বায়তুল মাল বলতে কী বোঝায়?

গ. 'ক' রাষ্ট্রের শাসকের মধ্যে মহানবি (স)-এর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের শাসকের বিশ্বস্ত সহচরের কাজের আলোকে হযরত আবু বকর (রা)-এর কাজের মূল্যায়ন করো।

২৩. হাবিবুর রহমান একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। তার অর্থবিত্তের কোনো অভাব নেই। কিন্তু তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেন। তার বাড়িতে একজন মাত্র কাজের লোক। কিন্তু তাকে কাজের লোক বলে কেউ চিনতে পারবে না। কারণ হাবিবুর রহমান তার পরিবারের অন্য সদস্যদের মতোই কাজের লোকটিকে আপন করে নিয়েছেন। তার জন্য ভালো জামাকাপড়, খাওয়া-দাওয়া কোনো কিছুরই অভাব রাখেননি। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ২ ও ৩*

ক. মদিনায় হিজরতকালে মহানবি (স) কোন পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন?

খ. তাবুক অভিযানকে 'গাজওয়াতুল ওসারাত' বলা হয় কেন?

গ. হাবিবুর রহমানের কর্মকাণ্ডে মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. হযরত ওমর (রা)-এর জীবনাদর্শের আলোকে হাবিবুর রহমানের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

২৪. তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে রাতের বেলা প্রজাদের অবস্থা সচক্ষে দেখতেন। তার রাজ্যে কেউ কষ্টে থাকুক এটি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়ার জন্য জিরগা পরিষদ গঠন করেন। সভা করে তিনি এ পরিষদের সদস্যদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করতেন। গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ এ মহান শাসক জনগণের মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল তার লক্ষ্য। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ২ ও ৩*

ক. 'হিজরত' শব্দের অর্থ কী?

খ. হযরত আবু বকর (রা)-কে 'সিদ্দিক' উপাধি দেওয়া হয়েছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের শাসক খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার প্রতিনিধিত্ব করছেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের শাসকের লক্ষ্য যেন রাসুল (স)-এর আদর্শকেই প্রতিফলিত করে— মন্তব্যটির পক্ষে যুক্তি দাও।

৪

উমাইয়া খিলাফত

The Umayyad Khilafat

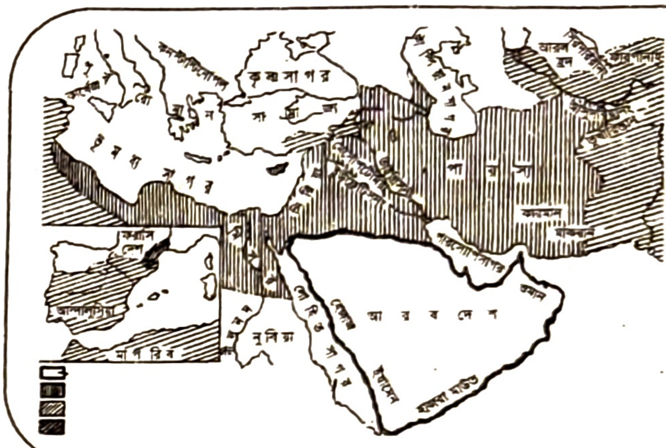

খলিফা আল ওয়ালিদের সাম্রাজ্য

প্রধান প্রধান শব্দ

- উমাইয়া বংশ
- রাজতন্ত্র
- আরব আলেকজান্ডার
- কারবালার যুদ্ধ
- রাজেন্দ্র
- কুব্বাতুস সাখরা
- বালাত-উশ-শুহাদা
- উমাইয়া সাধু
- মাওয়ালি
- জিম্মি

৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা)-এর মৃত্যুর পর আমির মুয়াবিয়া (রা) এ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের ইতিহাসে উত্তরাধিকার-ভিত্তিক রাজতন্ত্রের সূচনা করেন। উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে নতুন ভাবধারা ও রীতিনীতির উদ্ভব হয়। আবদুল মালিক ও আল-ওয়ালিদের অধীনে মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়। খলিফা আল-ওয়ালিদের দশ বছরের রাজত্বকালে (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) তার সুযোগ্য সেনানায়ক কুতায়বা বিন মুসলিম, মুসা বিন নুসায়ের ও তারিক বিন জিয়াদের সহযোগিতায় মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে মধ্য এশিয়ার ফারগানা থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তবে এক পর্যায়ে অযোগ্য শাসকদের কর্মকাণ্ডে উমাইয়া বংশের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত নানা বাধা-বিপত্তির মুখে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধে আব্বাসি শক্তির কাছে এ বংশের পতন হয়। উমাইয়া রাজবংশের মোট ১৪ জন খলিফা প্রায় ৯০ বছর রাজত্ব করেন।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস
- মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনব্যবস্থা, চরিত্র ও কৃতিত্ব
- কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার কারণ ও পরবর্তী ইতিহাসে এর প্রভাব
- উমাইয়া শাসন সুদৃঢ়ীকরণে খলিফা আবদুল মালিকের শাসন নীতি ও সংস্কারসমূহ
- খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের খিলাফত সম্প্রসারণ
- খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ-এর রাজস্ব সংস্কার ও শাসননীতি
- উমাইয়া খিলাফতের ক্রমাবনতি ও পতনের কারণ
- উমাইয়াদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
- উমাইয়া আমলে শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা (৬৬১ খ্রি.)
পাঠ ২	আমির মুয়াবিয়া (রা)-এর পরিচয় ও তার সামরিক অভিযান (৬৬১-৬৮০ খ্রি.)
পাঠ ৩	খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসন ব্যবস্থা
পাঠ ৪	খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং ইসলামের সেবায় আমর ইবনুল আসের অবদান
পাঠ ৫	ইয়াজিদ (৬৮০-৬৮৩ খ্রি.) ও ইমাম হুসাইনের পরিচয় ও তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণ
পাঠ ৬	কারবালার যুদ্ধ (৬৮০ খ্রি.) ও পরবর্তী ইতিহাসে এর প্রভাব ও গুরুত্ব
পাঠ ৭	খলিফা আবদুল মালিকের সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ীকরণ ও সম্প্রসারণ (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.)
পাঠ ৮	খলিফা আবদুল মালিকের শাসন নীতি ও সংস্কার
পাঠ ৯	খলিফা আবদুল মালিকের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ১০	খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ, প্রাথমিক কার্যাবলি ও খিলাফত সম্প্রসারণ (৭০৫-৭১৫ খ্রি.)
পাঠ ১১ ও ১২	খিলাফত সম্প্রসারণে খলিফা আল-ওয়ালিদের অভিযানসমূহ
পাঠ ১৩	উমাইয়াদের স্পেন বিজয় (৭১১ খ্রি.)
পাঠ ১৪	খলিফা আল-ওয়ালিদের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ১৫	হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জীবন ও কর্ম
পাঠ ১৬	খলিফা সুলায়মানের জীবন ও কর্ম (৭১৫-৭১৭ খ্রি.)
পাঠ ১৭	খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের ক্ষমতা লাভ এবং তার শাসন নীতি ও সংস্কারসমূহ (৭১৭-৭২০ খ্রি.)
পাঠ ১৮	খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ১৯	খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসন নীতির সমালোচনা এবং উমাইয়া বংশের পতনে তার দায়বদ্ধতা
পাঠ ২০	খলিফা হিশামের শাসন নীতি, চরিত্র ও কৃতিত্ব (৭২৪-৭৪৩ খ্রি.) এবং পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ
পাঠ ২১	উমাইয়া খিলাফতের পতনের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
পাঠ ২২	উমাইয়া শাসনামলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
পাঠ ২৩	উমাইয়া প্রশাসন ব্যবস্থা
পাঠ ২৪	উমাইয়া যুগে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা
পাঠ ২৫	উমাইয়া আমলের শিল্প ও স্থাপত্য

পাঠ ১

উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা (৬৬১ খ্রি.)
Establishment of the Umayyad Dynasty (661 AD)

উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ও ঘটনা

ইসলামের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য উষ্ট্রের যুদ্ধের (৬৫৬ খ্রি.) পর খলিফা হযরত আলি (রা) সিরিয়ার বিদ্রোহী শাসক মুয়াবিয়া (রা)-এর বিরুদ্ধে ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হন। এ সংবাদ শুনে মুয়াবিয়া (রা) ৬০,০০০ সৈন্যসহ আলি (রা)-কে মোকাবিলা করার জন্য সিরিয়া থেকে রওনা হন। ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত সিফফিন নামে একটি স্থানে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। অহেতুক রক্তপাত এড়াতে খলিফা আলি (রা) মুয়াবিয়া (রা)-কে দূত মারফত শান্তির প্রস্তাব দেন। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা)-এর উদ্ধত মনোভাবে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সিফ্‌ফিনের প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধে মুয়াবিয়া (রা)-এর বাহিনী এক পর্যায়ে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে পড়লে সেনাপতি ও উপদেষ্টা আমর ইবনুল আসের পরামর্শে তিনি যুদ্ধ স্থগিত রাখার জন্য কৌশলের আশ্রয় নেন। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তিনি আবু মুসা আল আশারি ও মুয়াবিয়া (রা) আমর ইবনুল আসকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করেন। ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী 'দুমাতুল জন্দলে' সালিশি বৈঠক বসে। বৈঠকে স্থির হয় যে, আবু মুসা প্রথমে আলি (রা)-এর পদচ্যুতি এবং পরে আমর মুয়াবিয়া (রা)-এর পদচ্যুতি ঘোষণা করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহজ-সরল আবু মুসা আল আশারি আলি (রা)-এর পদত্যাগ ঘোষণার পরই আমর বলেন, মুসলিম খিলাফত যেহেতু এখন খলিফা শূন্য, তাই এ খিলাফতের মঙ্গলের জন্য আমি মুয়াবিয়া (রা)-কে খলিফা হিসেবে মনোনীত করলাম। আমর ইবনুল আসের এ ঘটনায় খলিফা আলি (রা)-এর সমর্থকেরা ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং তারা বৈঠক ত্যাগ করে। এভাবে মুয়াবিয়া (রা) চাতুরির মাধ্যমে নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করে মুসলিম বিশ্বে অশান্তির বীজ বপন করেন।

তাই দুমাতুল জন্দলের রায়ে অযৌক্তিকভাবে একজন প্রাদেশিক কর্মকর্তাকে খলিফার সমকক্ষ করা হয়। রায়টি ছিল সম্পূর্ণ নীতিবহির্ভূত। সালিশি বৈঠক মুয়াবিয়া (রা)-কে আলি (রা)-এর সমকক্ষ করে তোলে এবং আলি (রা)-কে একজন মিথ্যা দাবিদারে পরিণত করে। পি. কে. হিট্টি বলেন, "আলির মতো খলিফার সাথে তার (মুয়াবিয়া (রা)-এর) চুক্তি হওয়ায় তার সম্মান বেড়ে আলির সমান হলো, পাশাপাশি আলির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলো।"[১] সংঘর্ষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের নেতৃত্বে ১২ হাজার লোকের একটি দল 'লা হুকমা ইল্লালিল্লাহ' বা 'আল্লাহর আদেশ ছাড়া কোনো বিধান নেই' ঘোষণা দিয়ে খলিফা আলি (রা)-এর দল ত্যাগ করে। খোদা বকশ্‌-এর মতে, ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দল (Religio-political Group) হিসেবে খারেজি নামে একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এরা ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আলি (রা)-কে কাফের ঘোষণা দিয়ে তাকে হত্যা করে এবং মুয়াবিয়া (রা) ও আমর ইবনুল আসকেও হত্যার ঘোষণা দেয়। খারেজিরা উমাইয়া ও আব্বাসি শাসনামলের পুরো সময়ে রাজ্যের সর্বত্র অশান্তি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে তৎপর ছিল।

সিফ্‌ফিনের গৃহযুদ্ধের ফলে আরব রাজ্যে গণতন্ত্র ও খিলাফতের অবসান ঘটে এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। পি. কে. হিট্টি বলেন, "৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে আলির মৃত্যুর সাথে সাথে আবু বকর (৬৩২খ্রি.)-এর হাত ধরে খিলাফতের যে প্রজাতন্ত্রী যুগের সূচনা হয়েছিল তা শেষ হয়।"[২]

হযরত আলি (রা) শাহাদাত বরণের পর (৬৬১ খ্রি.) মুয়াবিয়া (রা) সিরিয়ার দামেস্কে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এ সময় আলি (রা)-এর পুত্র হাসান (রা) কুফায় খলিফা হিসেবে অভিষিক্ত হলে মুয়াবিয়া (রা) ইরাক আক্রমণ করেন। তখন হাসান (রা) কয়েস নামক একজন যোদ্ধাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে উমাইয়াদের প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু একটি যুদ্ধে সেনাপতি কয়েস নিহত হন। এ সময় হাসান (রা)-এর সেনাদলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়ায় হাসান (রা) মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী মুয়াবিয়া (রা)-কে তার জীবনকালের জন্য খিলাফত দেওয়া হয় এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর আলি (রা)-এর দ্বিতীয় পুত্র হুসাইন (রা) খলিফা নিযুক্ত হবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রে ইমাম হাসান (রা) স্ত্রী জায়েদার বিষ প্রয়োগে শাহাদাতবরণ করেন। এতে খুলাফায়ে রাশেদিনের স্বর্ণযুগের অবসান হয় এবং উমাইয়াদের রাজতান্ত্রিক শাসনের সূচনা হয়।

---

[১] The very fact of the arbitration itself had raised him (Muawiyah) to a level equivalent to that of Ali whose position was thereby lowered to that of a more pretender.–Ref : P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p.181

[২] With the death of 'Ali' (661) what may be termed the republican period of the Caliphate, which began with Abu-Bakr (632) came to an end. –Ref : P.K. Hitti, *History of the Arabs.* p.183

উমাইয়া বংশ আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশেরই একটি শাখা। কুরাইশ গোত্রের বিখ্যাত দলপতি ছিলেন আবদুল মান্নাফ (মহানবি (স)-এর পঞ্চম ঊর্ধ্বতন পুরুষ) আবদুল মান্নাফের ছয় পুত্রসন্তানের অন্যতম ছিলেন আবদুস শামস। তিনি মহানবি (স)-এর প্রপিতামহ হাশিমের সহোদর ভাই ছিলেন। আবদুস শামসের পুত্র উমাইয়ার নামানুসারেই খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'উমাইয়া বংশ' নামে পরিচিতি লাভ করে। উমাইয়া বংশ প্রধান দুটি শাখায় বিভক্ত— ক. সুফিয়ানি এবং খ. মারওয়ানি। সুফিয়ানি শাখাকে হারবীয় শাখাও বলা হয়।

উমাইয়াদের বংশ তালিকা (৬৬১-৭৫০ খ্রি.)

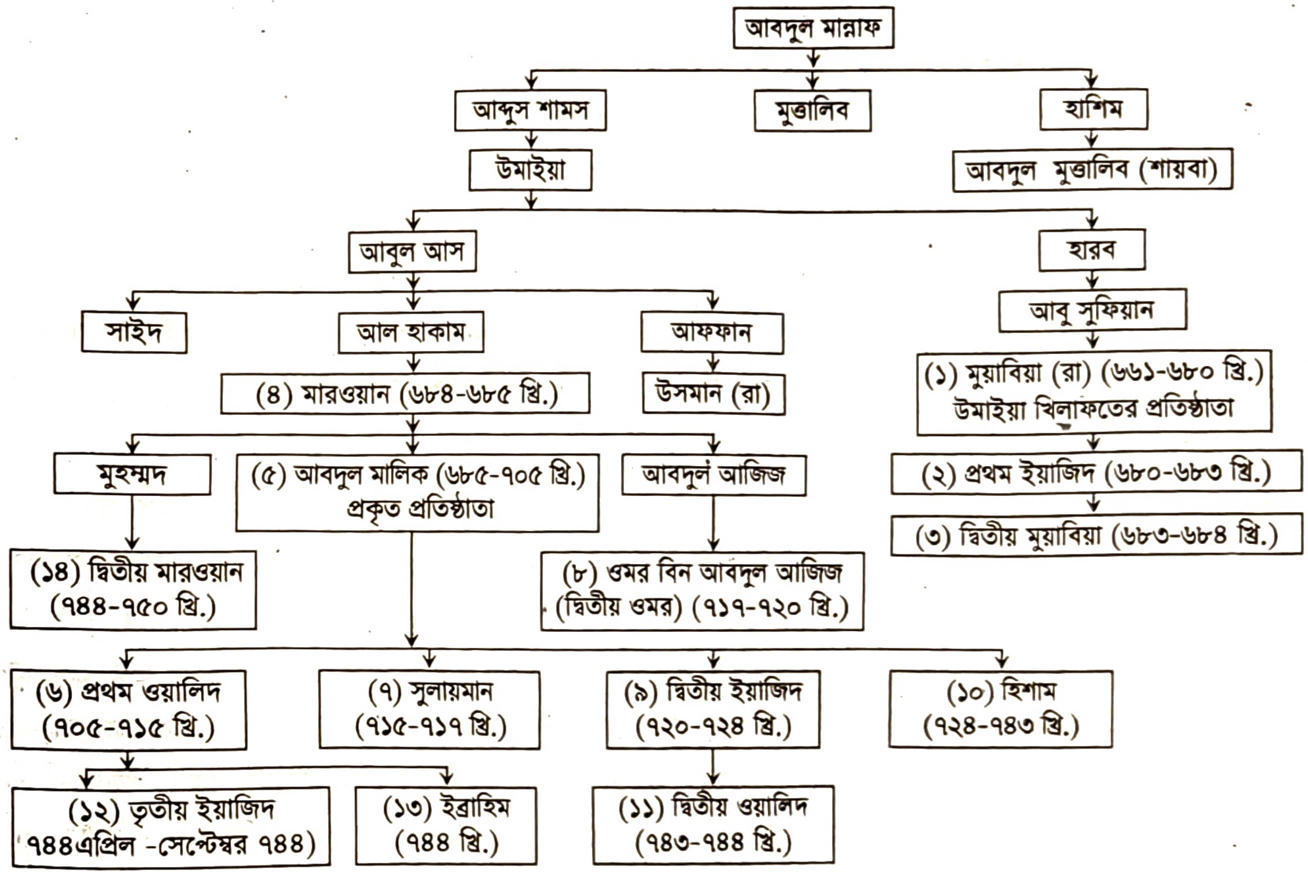
আবদুল মান্নাফ
আব্দুস শামস
মুত্তালিব
হাশিম
উমাইয়া
আবদুল মুত্তালিব (শায়বা)
আবুল আস
হারব
সাইদ
আল হাকাম
আফফান
আবু সুফিয়ান
(৪) মারওয়ান (৬৮৪-৬৮৫ খ্রি.)
উসমান (রা)
(১) মুয়াবিয়া (রা) (৬৬১-৬৮০ খ্রি.) উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা
মুহম্মদ
(৫) আবদুল মালিক (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা
আবদুল আজিজ
(২) প্রথম ইয়াজিদ (৬৮০-৬৮৩ খ্রি.)
(৩) দ্বিতীয় মুয়াবিয়া (৬৮৩-৬৮৪ খ্রি.)
(১৪) দ্বিতীয় মারওয়ান (৭৪৪-৭৫০ খ্রি.)
(৮) ওমর বিন আবদুল আজিজ (দ্বিতীয় ওমর) (৭১৭-৭২০ খ্রি.)
(৬) প্রথম ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রি.)
(৭) সুলায়মান (৭১৫-৭১৭ খ্রি.)
(৯) দ্বিতীয় ইয়াজিদ (৭২০-৭২৪ খ্রি.)
(১০) হিশাম (৭২৪-৭৪৩ খ্রি.)
(১২) তৃতীয় ইয়াজিদ ৭৪৪এপ্রিল -সেপ্টেম্বর ৭৪৪)
(১৩) ইব্রাহিম (৭৪৪ খ্রি.)
(১১) দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৭৪৪ খ্রি.)

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়?

২. উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন কে? *[ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; সকল বোর্ড ২০১৬]*

৩. সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলি (রা.)-এর পরাজয়ের কারণ কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

৪. উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী কোথায় ছিল? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯]*

৫. মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর কে খলিফা নিযুক্ত হবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়?

৬. মুসলিম বিশ্বে প্রথম রাজতন্ত্রের সূচনা করেন কে?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর্যায়ক্রমিক ঘটনা ছক আকারে লেখো।

পাঠ ২

আমির মুয়াবিয়া (রা)-এর পরিচয় ও তার সামরিক অভিযান (৬৬১-৬৮০ খ্রি.)
Indroduction to Amir Muawiyah and His Military Expedition (661-680 AD)

পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন

উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম খলিফা মুয়াবিয়া (রা) ৬০২ খ্রিষ্টাব্দে[৩] কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আবু সুফিয়ান বিন হারব বিন উমাইয়া এবং মায়ের নাম ছিল হিন্দা। এ হিন্দাই উহুদের যুদ্ধে শহিদ হওয়া মহানবি (স)-এর চাচা বীরকেশরী হযরত হামজা (রা)-এর হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করে ইতিহাসে কুখ্যাতি লাভ করেন। মক্কার কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ানের পুত্র মুয়াবিয়া (রা) প্রথম জীবনে ঘোরতর ইসলামবিরোধী ছিলেন এবং বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানরা মক্কা জয় করলে মুয়াবিয়া (রা) পিতা আবু সুফিয়ানসহ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। মহানবি (স) তাকে ওহি লেখক হিসেবে নিযুক্ত করেন। মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর সময় মুয়াবিয়া (রা)-এর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। খলিফা ওমর (রা) যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা দেখে তাকে সিরিয়া প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। খলিফা ওসমান (রা)-এর সময় তিনি আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। কিন্তু খলিফা ওসমান (রা)-এর মৃত্যুর পর খলিফা আলি (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলে মুয়াবিয়া (রা)-কে তার দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তবে তিনি এ অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাখ্যান করায় খলিফার সাথে তার বিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

খিলাফত লাভ: হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে খলিফা আলি ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। আলি এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের বড় ধরনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে। মুয়াবিয়া (রা) নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে কূটকৌশলের মাধ্যমে এ যুদ্ধ বন্ধ করেন। আপসহীন খলিফা হযরত আলি (রা) তার সাথে সন্ধি করেন। সন্ধি প্রস্তাব অনুযায়ী মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আলি (রা)-এর পক্ষে ছিলেন সরলমনা বৃদ্ধ আবু মুসা আল আশারি এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর পক্ষে ছিলেন প্যালেস্টাইনের গভর্নর ধূর্ত আমর ইবনুল আস। মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রতিনিধি আমরের কূটনৈতিকচালে খলিফা আলি (রা)-এর কূটনৈতিক পরাজয় ঘটে এবং মুয়াবিয়া (রা) খিলাফত দাবি করেন। 'দুমাতুল জন্দল'-এর সালিশ বৈঠকে মুয়াবিয়া (রা) সাম্রাজ্যের অর্ধেক অংশের খলিফা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু আলি (রা)-এর দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া খারেজিরা মুসলিম সম্প্রদায়ের এ বিভাজনকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা আলি (রা), মুয়াবিয়া (রা) ও আমর অর্থাৎ অন্যসব পক্ষের প্রধানকেই হত্যার পরিকল্পনা করে। কালক্রমে খলিফা আলি (রা) আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম নামক একজন খারেজির হাতে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আলি (রা)-এর শাহাদাতের পর মুয়াবিয়া (রা) কালবিলম্ব না করে রাজধানী কুফায় হাসানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। হাসান (রা) মুয়াবিয়া (রা)-এর কাছে পত্র দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। সন্ধির শর্তানুযায়ী হাসান (রা) মুয়াবিয়া (রা)-কে তার জীবদ্দশায় খলিফা মেনে নিতে রাজি হন। সিদ্ধান্ত হয় যে, মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলির (রা) দ্বিতীয় পুত্র হুসাইন (রা) খলিফা হবেন। মুয়াবিয়া (রা) বিজয়দর্পে কুফায় প্রবেশ করে নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সিরিয়ার দামেস্কে রাজধানী স্থাপন করে উমাইয়া খিলাফত পরিচালনা করতে থাকেন। *'ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম'* গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মুয়াবিয়া (রা)-এর সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য বিশ বছরের জন্য অভ্যন্তরীণ শান্তি-সমৃদ্ধি এবং সামরিক বিজয়ের যাত্রা শুরু করল'।[৪]

---

[৩] Ref: Encyclopaedia Britannica

[৪] For the Islamic empire, Muawiyah accession to power marked the begining of twenty years of internal peace, prosperity and military conquests. – Ref: *The Cambridge History of Islam*, Vol. I, edited by P.M. Holt, p. 77

খলিফা হিসেবে মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রাথমিক কার্যাবলি

মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক ও দক্ষ কূটনীতিবিদ। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ এবং একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পরপরই তিনি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তিনি মুসলিম জাহানের রাজধানী কুফা থেকে দামেস্কে স্থানান্তর করেন। এরপর তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী খারেজিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। খলিফা হিমারীয় (দক্ষিণ আরবের অধিবাসী) এবং মুদারীয় (উত্তর আরব বা হেজাজের অধিবাসী) সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক বিরোধ আবার জাগিয়ে তুলে প্রয়োজনানুসারে উভয় সম্প্রদায়কে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন। মুয়াবিয়া (রা) একজন বিচক্ষণ শাসক হিসেবে মুদারীয়দের ওপর অধিক নির্ভরশীল ছিলেন সত্য, তবে হিমারীয়দেরকে তিনি একেবারে দূরে ঠেলে দেননি। তিনি একজন বিচক্ষণ শাসক হিসেবে নিজের ক্ষমতার ভিত সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে তার ঘনিষ্ঠ এবং ক্ষমতা লাভে সহায়ক ব্যক্তিদেরকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দেন। নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন আমর ইবনুল আস, মুগিরা ইবনে শুবা এবং জিয়াদ ইবনে আবিহ প্রমুখ। সমকালে সুদক্ষ রাজনীতিক এবং কূটনীতিবিদ হিসেবে এই তিন ব্যক্তির সুখ্যাতি ছিল। পি. কে. হিট্টি বলেন, "এ তিনজন এবং তাদের নেতা মুয়াবিয়া (রা) আরব মুসলমানদের চারজন রাজনৈতিক মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত।" মুয়াবিয়া (রা)-এর খিলাফত লাভে আমর ইবনুল আসের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে কৃতজ্ঞ মুয়াবিয়া (রা) তাকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং আমৃত্যু তাকে উক্ত পদে বহাল রাখা হয়। অপর সহযোগী তায়েফের মুগিরা ইবনে শুবা খলিফাকে পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নে পরামর্শ দিয়েছিলেন। খলিফা তাকে কুফার গভর্নর নিয়োগ করেন। জিয়াদ বিন আবিহ প্রথমে বসরা এবং পরে মুগিরার মৃত্যুর পর কুফার গভর্নর নিযুক্ত হন।

সামরিক অভিযান

খলিফা মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন একজন সুদক্ষ সমরনায়ক ও রাজ্য বিজেতা। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক বিধি প্রবর্তনের পর তিনি খিলাফত সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করেন। তার সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয়।

খিলাফতের পূর্বাঞ্চল বিজয় (৬৬২-৬৭৬ খ্রি.): পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর একটি অন্যতম কৃতিত্ব। ৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে হিরাতে (বর্তমান আফগানিস্তানে) বিদ্রোহ দেখা দিলে কঠোর হাতে তা দমন করা হয়। সাথে সাথে কাবুল, গজনি, বলখ, কান্দাহারসহ সীমান্তবর্তী কিছু এলাকা খলিফার দখলে আসে। এরপর ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী বুখারা জয় করে এবং ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সমরখন্দ ও তিরমিজ অধিকৃত হয়। ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি মুহাল্লাবের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী পূর্বে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। তবে এতে তারা সফল হননি।

উত্তর আফ্রিকা বিজয় (৬৭০ খ্রি.): খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর সময় মিসরে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলে বার্কা ও জাবিলাসহ মিসরের অনেকাংশ আরবদের অধিকারে আসে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রোমানরা সে অঞ্চলগুলো পুনরায় দখল করে নেয়। এখানকার দুর্ধর্ষ বার্বাররা আরবদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করায় মিসরের শাসনকর্তা আমর ইবনুল আস বাধ্য হয়ে বার্বারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তিনি এ বিষয়ে খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-কে অবহিত করলে খলিফা তার সাহায্যার্থে ১০,০০০ সৈন্যসহ 'মুসলিম আলেকজান্ডার' নামে খ্যাত উকবা বিন নাফিকে উত্তর আফ্রিকায় পাঠান। উকবা এক প্রচণ্ড যুদ্ধের মাধ্যমে বার্বারদের দমন করেন। তিনি ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে লিবিয়া ও তিউনিশিয়া জয় করে কায়রোয়ান নগরীতে উত্তর আফ্রিকার রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর উকবা আরও অগ্রসর হয়ে আলজেরিয়া ও মরক্কো অধিকার করে আটলান্টিক-এর পূর্ব তীর পর্যন্ত মুসলিম শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। পি.কে. হিট্টি বলেন, "আটলান্টিকের ঢেউ তার ঘোড়ার গতি রুদ্ধ না করা পর্যন্ত তিনি থামেননি।" এ সময় উকবা আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে উপনীত হয়ে দুঃখ করে বলেন, 'হে আল্লাহ! যদি এই বিশাল সমুদ্র আমার অন্তরায় না হতো, তাহলে আমি আরও দেশ জয় করতে পারতাম এবং তোমার ধর্ম ও নামের মহিমা প্রচার করতাম।' উত্তর আফ্রিকা বিজয়ে আরবদের দ্রুত

সাফল্য বিবেচনা করে ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলি বলেন, "উত্তর-আফ্রিকার দুর্ধর্ষ ও রণপ্রিয় জাতিসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরবগণ যে অদম্য সাহস ও অপ্রতিহত উদ্দীপনা প্রদর্শন করেছিল তা অন্য কোনো দেশ বা জাতি প্রদর্শন করতে পারেনি।" খলিফা মুয়াবিয়া (রা) বিজিত অঞ্চলের শাসক হিসেবে উকবাকে নিয়োগ দেন। কিন্তু ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে উকবা বার্বার ও রোমানদের মিলিত শক্তির কাছে আধুনিক আলজেরিয়ার কাছে অবস্থিত বিস্করায় পরাজিত ও নিহত হন। উকবার মৃত্যুতে উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ (৬৬২-৬৭৪ খ্রি.): মুয়াবিয়া (রা) ক্ষমতায় আসার পর যেসব বাইজান্টাইন অঞ্চল মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালনার সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে ৬৬২ খ্রিস্টাব্দে অভিযান প্রেরণ করে আর্মেনিয়ার রোমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে আর্মেনিয়া জয় করেন। ৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা মুয়াবিয়া (রা) গ্রিকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে নৌ ও স্থলবাহিনী প্রেরণ করেন। ফাদালা ইবনে উবায়েদ আল আনসারী এ অভিযানে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। যুবরাজ ইয়াজিদ এ অভিযানে ফাদালার সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। তবে খাদ্যাভাব, মহামারি ইত্যাদি কারণে আরবদের এ অভিযান সফল হয়নি। মুসলমানরা শুধু কনস্টান্টিনোপলের নিকটবর্তী সিজিকাস দ্বীপটি জয় করেন। এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত সাহাবি আবু আইয়ুব আল আনসারি। হিজরতের পর তিনি মুহম্মদ (স)-কে তার গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মুয়াবিয়া (রা) সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গঠন করে ভূমধ্যসাগরে গ্রিকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালীন ৫০০ জাহাজসহ একটি বিশাল নৌবহর গড়ে তোলেন তিনি। এ নৌবহরের সাহায্যে তিনি সাইপ্রাস রোডস, লেড ও এশিয়া মাইনরের উপকূলের কাছাকাছি অন্যান্য গ্রিক দ্বীপ জয় করেন। মুসলিম বাহিনী ৬৭২ খ্রিষ্টাব্দে রোডস্ দ্বীপ জয় করে। তবে একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে আবার ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তা উমাইয়াদের অধিকারে আসে।

এভাবে খলিফা মুয়াবিয়া (রা) তার রাজত্বকালে সিন্ধু নদের তীর থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। পি. কে. হিট্টি বলেন, "এরূপে মুয়াবিয়া (রা) কেবল এক নতুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, খলিফা ওমর (রা)-এর পর খিলাফতের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন।"

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আমির মুয়াবিয়া (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
২. মুয়াবিয়া (রা)-এর পিতার নাম কী?
৩. মুয়াবিয়া (রা) কখন ইসলাম গ্রহণ করেন?
৪. কাকে আরব বিশ্বের প্রথম রাজা বলা হয়? *[ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; সকল বোর্ড ২০১৬]*
৫. সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গঠন করেন কে? *[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*
৬. 'মুসলিম আলেকজান্ডার' নামে খ্যাত কে?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খলিফা মুয়াবিয়া (রা) যেসব অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন তার একটি তালিকা তৈরি করো।

গ. বাড়ির কাজ

আমির মুয়াবিয়া (রা)-এর খিলাফত লাভের ঘটনা যৌক্তিক ছিল কিনা— কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো।

পাঠ ৩

খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসন ব্যবস্থা
The Administration of Khalifa Muawiyah

একটি দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুয়াবিয়া (রা) অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রাচীন রোমান শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি স্থায়ী ও সুসংহত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তার শাসন ব্যবস্থার প্রধান দিকগুলো ছিল—

রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন: ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুরের মতে, 'মুয়াবিয়া (রা)-এর সিংহাসনে আরোহণের ফলে খুলাফায়ে রাশেদিনের গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে এবং রাজতান্ত্রিক (Kingship) শাসনের সূচনা হয়। বস্তুত রাজক্ষমতা গ্রহণ করে মুয়াবিয়া (রা) খুলাফায়ে রাশেদিন যুগের কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসনের ইতি ঘটিয়ে রোমান ও সাসানীয় ধারার রাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন করেন। পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী নিয়োগের মধ্য দিয়ে তিনি আরবে প্রচলিত শাসনরীতিও পরিবর্তন করেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিন যুগের মজলিশ-উস-শুরা বাতিল করে তার স্থলে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

সচিবালয় প্রতিষ্ঠা: শাসনকার্যের সুবিধার জন্য খলিফা মুয়াবিয়া (রা) সাসানীয় ও রোমানদের মতো কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে আরবিতে এবং প্রাদেশিক সচিবালয়গুলোতে আরবি, গ্রিক ও ফারসি ভাষার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করা হতো। সচিবালয় প্রতিষ্ঠার ফলে সুষ্ঠুভাবে সরকারি দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হয়। খলিফা শাসনকাজের সুবিধার্থে রাজধানীতে একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন।

প্রশাসনিক সংস্কার ও যোগ্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ: মুয়াবিয়া (রা) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বাইজান্টাইন ও পারসিক শাসন পদ্ধতির আলোকে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, "সরকারের বহু প্রথাগত বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত করে তিনি প্রাচীন গ্রিসের অনুকরণে একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন।"[৫] নবপ্রতিষ্ঠিত উমাইয়া খিলাফতে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে আমর ইবনুল আসকে মিসরে, মুগিরা ইবনে শুবাকে কুফায় এবং জিয়াদ বিন আবিহকে বসরায় প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগদান করেন।

জেনে রাখো

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের দেশ ফ্রান্সে আমলাতন্ত্র ধারণাটির উৎপত্তি ঘটে। দ্য গুরনে (De Gourney) ফরাসি ভাষায় শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। 'আমলা' মূলত আরবি শব্দ; এর অর্থ আদেশ পালনকারী বা বাস্তবায়নকারী। আবার আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Bureaucracy'। শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ফরাসি শব্দ 'ব্যুরো' (Bureau) এবং গ্রিক শব্দ 'ক্রেটিন' (Kratein) থেকে। Bureau শব্দের অর্থ টেবিল বা দপ্তর (Desk) আর Kratein শব্দের অর্থ শাসন। অতএব উৎপত্তিগত অর্থে আমলাতন্ত্র হলো দপ্তরনির্ভর শাসন। প্রখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী **ম্যাক্স ওয়েবার** (Max Weber) সর্বপ্রথম আমলাতন্ত্রের একটি আইনগত ও যুক্তিসংগত মডেল উপস্থাপন করেন।

দিওয়ান-আল-খাতাম বা রেজিস্ট্রি বিভাগ: কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে প্রাদেশিক সরকারের লিখিত সংযোগসাধনের জন্য খলিফা মুয়াবিয়া (রা) 'দিওয়ান-আল-খাতাম' (Department of Signet) বা 'রেজিস্ট্রি বিভাগ' নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার যেসব হুকুমনামা প্রাদেশিক সরকারকে প্রদান করত সেগুলো যেন জাল না হয় এবং ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায় সে জন্য মুয়াবিয়া (রা) এ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে সরকারি হুকুমনামা ও চিঠিপত্রাদির জালিয়াতি ও বিকৃতি রোধ করা সম্ভব হয়। এ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার পদবি ছিল সাহিব-উল-খাতাম।

দিওয়ান-আল-খারাজ বা ভূমি রাজস্ব বিভাগ: মুয়াবিয়া (রা) ভূমি রাজস্ব বিভাগ পুনর্গঠন করেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য 'দিওয়ান-আল-খারাজ' নামে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করেন। এ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে 'সাহিব-আল-খারাজ' (Director of the Finance Department) বলা হতো। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, এটি ছিল বর্তমান যুগের অর্থ বিভাগের মতো। কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব এ বিভাগে সংরক্ষিত থাকত। প্রাদেশিক গভর্নররা প্রদেশের ব্যয় মিটিয়ে বাকি যে অর্থ পাঠাতেন তা মূলত এ বিভাগেই এসে জমা হতো। মুয়াবিয়া (রা) খলিফা ওমর (রা)-এর প্রবর্তিত নীতি অনুযায়ী জনসাধারণকে যে সরকারি ভাতা প্রদান করা হতো তা থেকে জাকাত বাবদ শতকরা আড়াই ভাগ কেটে রাখতেন। এ ব্যবস্থা বর্তমান যুগের আয়করের সাথে তুলনীয়।

---

[৫] He abolished many traditional features of the government and on the earlier Byzantine framework built a stable, well-organized state. Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*. pp-194-195

দিওয়ান-আল-বারিদ বা ডাক বিভাগ: মুসলিম শাসকদের মধ্যে খলিফা মুয়াবিয়া (রা) প্রথম 'দিওয়ান-আল-বারিদ' বা ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সরকারের সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ করত। সাম্রাজ্যের সরকারি ও সাধারণ মানুষের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য মুয়াবিয়া (রা) প্রতি ১২ মাইল অন্তর একটি করে ডাকঘর স্থাপন করেন। ঘোড়া ও উটের সাহায্যে এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে সংবাদ আদান-প্রদান করা হতো। এ বিভাগকে বলা হতো 'দিওয়ান-আল-বারিদ'। এর প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হতো 'সাহিব-উল-বারিদ'। এস. এম. ইমামুদ্দিন বলেন, "মুয়াবিয়া (রা) ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন, আবদুল মালিক এটির উন্নতি সাধন করেন এবং ওয়ালিদ এটির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করেন।"[৬]

গুপ্তচর প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠা: খলিফা ওমর (রা)-এর সময় যে গুপ্তচর প্রথার প্রচলন ছিল মুয়াবিয়া (রা) তাকে নতুনরূপে এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থানরত ওয়ালি বা প্রাদেশিক গভর্নর, আমির, কাতিব, সাহিব-উল-খারাজ, কাজিসহ সব গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের কর্মকাণ্ডে উমাইয়া খিলাফতের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি না, উচ্চপদস্থ এসব কর্মচারী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে কি না, পার্শ্ববর্তী প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রগুলো কোনো ক্ষতিকর পদক্ষেপ নিচ্ছে কি না, সর্বোপরি রাষ্ট্রের জনগণের মনোভাব জানার জন্য তিনি একটি শক্তিশালী গুপ্তচর ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। গুপ্তচরেরা ডাক বিভাগের প্রধান সাহিব-উল-বারিদের তদারকিতে তাদের দায়িত্ব পালন করতেন।

নৌ ও সেনাবাহিনী গঠন: মুয়াবিয়া (রা) প্রাচীন গোত্রভিত্তিক সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে একটি সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তিনি একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীও গঠন করেন। উমাইয়া আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেস্কে স্থানান্তরিত হওয়ায় এবং সাম্রাজ্যের সীমারেখা আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন ছিল অপরিহার্য। খলিফা ওসমান (রা)-এর সময়ই মুয়াবিয়া (রা) নৌবাহিনী গঠন করেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উত্তর আফ্রিকা ও সিরিয়া প্রায়ই রোমান নৌবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হতো। এ কারণে খলিফা হওয়ার পর মুয়াবিয়া (রা) মুসলিম নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করেন। এ বাহিনীর সাহায্যেই তিনি ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সাইপ্রাস, রোডস, ক্রিট এবং এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন দ্বীপ দখল করেন।

জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন: মুসলিম নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য মুয়াবিয়া (রা) মিসরের মতো সিরিয়াতেও একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দ মুয়াবিয়া (রা) কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করার জন্য জল ও স্থলপথে সৈন্য পাঠিয়ে ছিলেন। মুয়াবিয়া (রা)-এর সময় জুনাদাহ ও আবদুল্লাহ বিন কায়েস নামে দুই জন বিখ্যাত নৌ-সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন কায়েস একাই বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে ৬০টি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। মুয়াবিয়া (রা)-এর আমলে মুসলিম নৌবাহিনীর ১৭০০টি দ্রুতগামী জাহাজ ছিল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খুলাফায়ে রাশেদিন যুগের মজলিশ-উস-শূরা বাতিল করেন কে?
২. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন কে?
৩. মুয়াবিয়া (রা)-এর গঠিত 'দিওয়ান-আল-খাতাম' কী?
৪. মুসলিম শাসকদের মধ্যে প্রথম 'দিওয়ান-আল-বারিদ' বা ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন কে? */ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯/*
৫. মুয়াবিয়া (রা) প্রতি কত মাইল অন্তর একটি করে ডাকঘর স্থাপন করেন?
৬. কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষিত থাকত কোন বিভাগে?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রশাসনিক কাঠামো ছকের মাধ্যমে দেখাও।

---

[৬] Muawiyah introduce postal service, Abd-al-Malik extended it throughout his empire and Walid made full use of it. –Ref: S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*. p-60

পাঠ ৪

খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং ইসলামের সেবায় আমর ইবনুল আসের অবদান [Character and Achievements of Khalifa Muawiyah and the Contribution of Amar Ibnul As in the Service of Islam]

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী মুয়াবিয়া (রা) ২০ বছর সিরিয়ার প্রদেশপাল এবং আরও প্রায় বিশ বছর মুসলিম জাহানের খিলাফত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (শাবান ৬১ হিজরি) মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। মৃত্যুর আগে তিনি বিখ্যাত কূটনীতিবিদ মুগীরা বিন শুবার প্ররোচনায় পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। পরবর্তী উমাইয়া খলিফারা তার এ নীতি অনুসরণ করে। তাই তাকে উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তক বলা হয়।

মুয়াবিয়া (রা)-এর চরিত্র

মানুষ হিসেবে মুয়াবিয়া (রা): মানুষ হিসেবে মুয়াবিয়া (রা) অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিয়মিতভাবে ধর্মানুষ্ঠান পালন করতেন। তিনি পারস্য ও রোমান সম্রাটদের মতো আড়ম্বরপূর্ণ ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের মতো তিনি জুমার নামাজে ইমামতি করতেন। তিনি তদানীন্তন আরবের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বক্তার মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, মার্জিত, রুচিশীল ও সংযত চরিত্রের লোক ছিলেন। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন ধূর্ত, ধর্মভয় হীন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, কৃপণ অথচ প্রয়োজনবোধে অস্বাভাবিক উদার এবং যাবতীয় ধর্মীয় কার্যে বাহ্যিকভাবে নিষ্ঠাবান।"[৭]

উদারতা ও সহিষ্ণুতা: খলিফা মুয়াবিয়া (রা) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কাছে অত্যন্ত কঠোর, দরিদ্র ও দুর্বলদের প্রতি দয়ালু ও সুবিবেচক ছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ভনক্রেমার বলেন, 'সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন উদার হৃদয়ের শাসক।' তিনি ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে গুণীর সমাদর করতেন এবং অমুসলমানদের তিনি সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করে রাজকার্যে নিয়োগ করতেন।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ও বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ: খলিফা মুয়াবিয়া (রা) দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ও বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ হিসেবে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "তিনি শঠতা ও ধূর্ততা এবং নম্র ব্যবহার দ্বারা শত্রুদের সন্দেহ দূর করে তাদেরকে বশে আনতে পারতেন। ধৈর্য এবং সংযত আচরণের জন্য সব অবস্থাতেই তিনি পরিস্থিতিকে নিজের আয়ত্তাধীনে আনতে পারতেন। তিনি যেখানে শান্তিপূর্ণভাবে প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হতেন সেখানে বল প্রয়োগ করতেন।"[৮] খলিফা নিজেই বলেছেন, 'যেখানে আমার চাবুকই যথেষ্ট সেখানে তরবারি ব্যবহার করি না এবং যেখানে আমার কথায় কাজ হয়, সেখানে আমি চাবুক ব্যবহার করি না। কারো সাথে চুল পরিমাণ সম্পর্ক থাকলেও আমি তা নষ্ট করি না। অপরে যখন আমাকে আকর্ষণ করে আমি তখন ঢিল দিই। কিন্তু তারা ঢিল দিলে আমি তখন টান দিই।'

ধর্মনিরপেক্ষতা: ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের একজন ধর্মীয় শাসক হলেও মুয়াবিয়া (রা) বাইজান্টাইন ও পারসিক সম্রাটদের মতো বাস্তববাদী শাসক ছিলেন। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসনের মতে, 'মুয়াবিয়া (রা) তার পূর্ববর্তী খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।'

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা: খলিফা মুয়াবিয়া (রা) সুশৃঙ্খলভাবে দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করতেন। ঐতিহাসিক মাসুদির বর্ণনা থেকে জানা যায়, ফজরের নামাজের পরই তিনি নগরাধ্যক্ষের বর্ণনা শুনতেন। তারপর মন্ত্রী ও সভাসদগণ দৈনন্দিন কার্জ নিয়ে আসতেন। জোহরের নামাজের পর মসজিদের নির্দিষ্ট স্থানে বসে তিনি ফরিয়াদির অভিযোগ শুনতেন। এ সময় তিনি সভাসদদের সাথে মিলতেন। এরপর তিনি দুপুরের আহার গ্রহণ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। আসরের নামাজের পর কাজের জন্য তিনি আবার আমাত্যদের সাথে মিশতেন। রাতের আহার গ্রহণ করে আরেকবার কিছুক্ষণের জন্য অধিবেশন করে তিনি দিনের রাজকীয় কাজ সমাধা করতেন।' এরপর তিনি অধ্যয়ন করতেন। ইতিহাস, বিশেষ করে আরবের ইতিহাস এবং ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় ছিল তার পছন্দের পাঠ্যবিষয়।

---

[৭] Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens.*

[৮] His Prudent mildness by which he tried to disarm the enemy and shame the opposite, his slowness to anger and his absolute self control left him under all circumstances master of the situation. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.197

মুয়াবিয়া (রা)-এর কৃতিত্ব

নতুনত্বের প্রবর্তক: মুয়াবিয়া (রা) শুধু উমাইয়া নামে একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাই নয়, তিনিই নতুন মুসলিম রাষ্ট্রকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তিনিই প্রথম শাসক যিনি নিজেকে রাজ মর্যাদায় ভূষিত করেন। মুসলিম শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাজকীয় সিংহাসন, খোঁজাদের দিয়ে গঠিত দেহরক্ষী দল, প্রাসাদদ্বারে রক্ষীবাহিনী, জামাতের নামাজের সময় মসজিদে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে পৃথক তাঁবু এবং নিরাপত্তার জন্য আলাদা কক্ষ এবং রেশম ও মুক্তার মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যবহার করেন।

রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা: খলিফা মুয়াবিয়া (রা) ৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতকে প্রথম উত্তরাধিকারভিত্তিক সালতানাতে রূপান্তরিত করেন। তার প্রবর্তিত খলিফা মনোনয়নের পদ্ধতি পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ অনুসরণ করেন। পরবর্তী আব্বাসিদের আমলেও তা অনুসৃত হয়।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার: খলিফা মুয়াবিয়া (রা) একজন সুদক্ষ ও প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে প্রবর্তিত মজলিশ-উস-শুরা বা পরামর্শসভা বাতিল করে প্রচলিত ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় কতগুলো শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এনেছিলেন। বস্তুত তিনিই প্রথম ও শেষ খলিফা যিনি তখনকার অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থার মধ্যেও সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশগুলোর সাথে পরামর্শের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করতেন।

দক্ষ সামরিক সংগঠক: সামরিক সংগঠক হিসেবে মুয়াবিয়া (রা) অদ্বিতীয় ছিলেন। খলিফা ওসমান (রা)-এর সময় তিনি প্রথম ভূমধ্যসাগরে গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নৌবাহিনী গঠন করেন। খলিফা হয়ে তিনি গ্রিকদের বিরুদ্ধে তাদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে অবিরাম নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। তার প্রচেষ্টাতেই পূর্ব ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলেই উকবা বিন নাফি উত্তর আফ্রিকা ও আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হন।

বিজেতা: বিজেতা হিসেবেও মুয়াবিয়া (রা) কম কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন না। তিনি নৌবহরের সাহায্যে সাইপ্রাস, রোডস, ক্রিট ও এশিয়া মাইনরের উপকূলবর্তী অন্যান্য গ্রিক দ্বীপ জয় করেন। প্রাচ্যেও তিনি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। প্রাচ্যে বর্তমান আফগানিস্তানের কাবুল, গজনি, বলখ, কান্দাহার, বুখারা, সমরখন্দ, তিরমিজ প্রভৃতি জয় করেন। উত্তর আফ্রিকা বিজয় ছিল তার রাজত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

প্রশাসনিক সংগঠক: ঐতিহাসিক হিট্টির মতে, 'মুয়াবিয়া (রা) গতানুগতিক বহু সরকারি পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করেন এবং রোমানদের আদি শাসনব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে একটি সুসংহত রাষ্ট্র গড়ে তোলেন।'[৯] তিনি প্রথমে 'দিওয়ান-উল-খাতাম' বা চ্যানসারি (Chancery) পরিষদ এবং 'দিওয়ান-উল-বারিদ' বা ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য মুয়াবিয়া (রা) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই আধুনিক আয়কর (Income Tax)-এর মতো কর প্রবর্তন করে রাজকোষ পূর্ণ করতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, 'তিনি শুধু প্রথম রাজাই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন বিখ্যাত আরব শাসকদের অন্যতম।'[১০]

সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক: মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন একজন সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান খলিফা। তৎকালে আরবের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বক্তার মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। খ্রিষ্টান কবি আল আখতাল ছিলেন তার সভাকবি। তিনি খলিফার উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। খলিফার আনুকূল্যে চিকিৎসা বিষয়ক কিছু বিদেশি ভাষার মূল্যবান গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করা হয়।

সার্বিক মূল্যায়ন: ইতিহাসবিদ অসবার্ন, ডব্লিউ মুর, ভনক্রেমার এবং সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মুয়াবিয়া (রা)-এর সমালোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে, পি.কে. হিট্টি এবং মাসুদি প্রমুখ শাসক হিসেবে মুয়াবিয়া (রা)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বস্তুত মুয়াবিয়া (রা)-এর কিছু নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কিছু প্রশাসনিক বিধিবিধান বাদ দিলে তিনি শুধু আরবীয় নৃপতিদের মধ্যেই নয়, সমকালীন বিশ্ব নৃপতিদের মধ্যেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। অনেকে তাকে সমসাময়িক রোমান সম্রাট দ্বিতীয় কনস্টান্টাইন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে গণ্য করেন।

---

[৯] Ref: *History of the Arabs*

[১০] He was not only the first but also one of the best of Arab kings. –Ref: *History of the Arabs*, p.198

ইসলামের সেবায় আমর ইবনুল আসের অবদান

আমর ইবনুল আস ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, দূরদর্শী কূটনীতিক ও ঝানু রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। তিনি মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আমর প্রথম জীবনে ইসলামের চরম শত্রু ছিলেন। ষষ্ঠ হিজরিতে (৬২৮ খ্রি.) হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

আমর ইবনুল আস হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.) ইসলাম ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) তিনি সেনাপতি হিসেবে অসাধারণ সাফল্য পান। ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমানদের সাথে সংঘটিত ইয়ারমুকের যুদ্ধে তার কৌশল অবলম্বন করেই মুসলমানরা বিপর্যয়ের মুখেও জয়লাভ করেছিল। আমর ইবনুল আস ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে প্যালেস্টাইন এবং ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে আফ্রিকার মিসর জয় করেন। মিসর বিজয় তার শ্রেষ্ঠ সামরিক কৃতিত্ব। খলিফা ওমর (রা) তাকে সেখানে গভর্নর (ওয়ালি) হিসেবে নিয়োগ দেন। আমর ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে প্যালেস্টাইন, মিসর ও সিরিয়ায় যাতায়াত করতেন। ফলে এসব অঞ্চলের রাস্তাঘাট ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তার ধারণা ছিল, যা মিসর বিজয়ে সহায়ক হয়েছিল। ৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার ত্রিপলি ও বার্কা নগরী দখল করে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন ইসলামের এই স্মরণীয় বীর।

ঐতিহাসিকদের মতে, আমর ইবনুল আস আরবের তখনকার চারজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদের একজন ছিলেন। মিসরের মতো বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত স্থানে তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে সুনাম অর্জন করেন। আমর মিসরে ফুসতাত নগরীর গোড়াপত্তন এবং ওই অঞ্চলে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকালে ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তাকে মিসরের গভর্নরের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আমর ইবনুল আস সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে (৬৫৭ খ্রি.) এবং দুমাতুল জন্দলের সালিশিতে তৎকালীন সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া (রা)-এর জয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এরপর তিনি মুয়াবিয়া (রা)-এর হয়ে মিসরে খলিফা হযরত আলির (রা) নিয়োগ দেওয়া গভর্নর মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে পরাজিত করে তা দখল করেন।

মুয়াবিয়া (রা) ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে আবার আমর ইবনুল আসকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি আমৃত্যু উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে (হিজরি ৪৩) আমর ইবনুল আসের মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিক মুর বলেন, "খিলাফতের ভাগ্য পরিবর্তনে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আর কেউ পালন করেননি। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী, পরামর্শে ধূর্ত, কথায় ও কাজে কর্কশ এবং নীতিজ্ঞানহীন আমরের কূটকৌশলেই মুয়াবিয়া (রা) আলিকে (রা) পরাজিত করে উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।" বিখ্যাত সুফিসাধক হাসান আল বসরি (র) আমরকে 'ইসলামের অন্যতম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী' বলে অভিহিত করেছেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুয়াবিয়া (রা) কত বছর মুসলিম জাহানের খিলাফত পরিচালনা করেন?
২. মুসলিম রাষ্ট্রকে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করেন কে?
৩. মুয়াবিয়া (রা) কখন নগরাধ্যক্ষের বর্ণনা শুনতেন?
৪. মুয়াবিয়া (রা) কাকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন?
৫. মুয়াবিয়া (রা) কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন?
৬. দুমাতুল জন্দলের সালিশিতে মুয়াবিয়া (রা)-এর জয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেন কে?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে একজন বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ হিসেবে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর কৃতিত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে একটি স্লাইড তৈরি করো।

পাঠ ৫

ইয়াজিদ (৬৮০-৬৮৩ খ্রি.) এবং ইমাম হুসাইনের পরিচয় ও তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণ [Introduction to Yazid (680-683 AD) and Imam Hossain and Causes of the Conflict Between Them]

ইয়াজিদের পরিচয়

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া (রা)-এর পুত্র এবং কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের পৌত্র ইয়াজিদ। মৃত্যুর পূর্বে মুয়াবিয়া (রা) ৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মুয়াবিয়া (রা) ইন্তেকাল করলে ইয়াজিদ নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেয়। তিনি ৬৮০ থেকে ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিরিয়া ও ইরাক ইয়াজিদের আনুগত্য স্বীকার করে। এস. এম. ইমামুদ্দিনের মতে, মুয়াবিয়া (রা) জোরপূর্বক মক্কা ও মদিনা থেকেও ইয়াজিদের অনুকূলে আনুগত্য আদায় করেন। আবদুল্লাহ বিন ওমরকে ১০,০০০ (দশ হাজার) দিনার উপহার দিয়ে আনুগত্য আদায় করা হয়। কিন্তু ইমাম আল হুসাইন, আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ও তাদের মতাবলম্বীরা ইয়াজিদের আনুগত্য অস্বীকার করেন।

ইমাম হুসাইনের পরিচয়

ইমাম হুসাইন ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ও বীর যোদ্ধা হযরত আলি (রা) এবং মাতা হযরত ফাতেমা (রা) ছিলেন মহানবি (স)-এর ছোট মেয়ে। ইমাম হুসাইন মহানবি (স)-এর প্রিয় দৌহিত্র ছিলেন। ইমাম হাসান তার ভাই। আমর ইবনুল আসের সাহায্যে মুয়াবিয়া (রা) হযরত আলিকে (রা) প্রতারিত করে খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন। তবে ইমাম হাসানের সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তি অনুসারে মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর ইমাম হুসাইনের খিলাফত লাভের শর্ত ছিল। মুয়াবিয়া (রা) শর্ত ভঙ্গ করে তার অসৎ ও মদ্যপায়ী পুত্র ইয়াজিদকে সিংহাসনে বসান। ইমাম হুসাইন ছিলেন পিতার মতো সৎ, ন্যায় নীতিবান, ধার্মিক ও সহজ-সরল। তিনি দুরাচার ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এর ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ফলে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে কারবালার যুদ্ধে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

দ্বন্দ্বের কারণ

মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর তিন জন ব্যক্তি খিলাফতের দাবি উত্থাপন করেন। তারা হলেন মুয়াবিয়া (রা)-এর মনোনীত ইয়াজিদ, হযরত আলির (রা)-এর ছেলে ইমাম হুসাইন এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের পরিস্থিতির কারণে নিরব থাকেন এবং হুসাইনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব হয় ইয়াজিদ ও ইমাম হুসাইনের মধ্যে। এ দ্বন্দ্বের পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। যেমন—

চুক্তিভঙ্গ: ইমাম হাসানের সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তি অনুযায়ী মুয়াবিয়া (রা)-এর পর ইমাম হুসাইনের খলিফা হওয়ার কথা। মুয়াবিয়া (রা) এ শর্ত ভঙ্গ করে তার অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে খলিফা মনোনীত করেন। ফলে ইসলামি সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

মুসলিম বিশ্বের আগ্রহ: ক্ষমতায় আরোহণের জন্য মুয়াবিয়া (রা)-এর কৌশল, সামরিক অভিযান ইত্যাদির কারণে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইয়াজিদকে মনোনয়নের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাতিল হয়ে যায়। এতে মুসলিম বিশ্ব ইমাম হুসাইনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। সাধারণ মানুষ তার মতো ধার্মিক ব্যক্তিকেই নেতা হিসেবে কামনা করছিল।

চরিত্রগত পার্থক্য: ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 'ইয়াজিদ ছিল পাপাসক্ত, অত্যাচারী, মদ্যপায়ী ও হৃদয়হীন। অন্যদিকে ইমাম হুসাইন ছিলেন ধর্মপরায়ণ, উদার, নম্র, সৎ ও অকপট।' ঐতিহাসিক সেডিলট (Sedillot) বলেন, 'তার (হুসাইনের) মধ্যে একটিমাত্র গুণের অভাব ছিল। তা হলো ষড়যন্ত্র ফাঁদবার কৌশল।'[১১] এরূপ চরিত্রগত পার্থক্যের কারণে হুসাইন এবং ইয়াজিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাই স্বাভাবিক ছিল।

---

[১১] The only quality that he lacked was the spirit of intrique which characterised the descendants of Ommaya.

মক্কা ও মদিনাবাসীর অনুপ্রেরণা: মদিনা থেকে রাজধানী কুফা হয়ে দামেস্কে স্থানান্তরিত হওয়ায় ফলে মদিনার প্রাধান্য লোপ পায়। কিন্তু তখনও মক্কা-মদিনা ইসলাম চর্চার প্রাণকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হতো। উমাইয়াদের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাসহ নানা অনৈসলামিক কাজের জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং আলি (রা)-এর অনুসারীরা হুসাইনকে আরও বেশি সমর্থন দেয়। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন 'জীবিত আলি অপেক্ষা মৃত আলি কার্যকর প্রমাণিত হলো।'[১২]

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের দুরভিসন্ধি: ইয়াজিদের খিলাফতের প্রথম দিকে উচ্চাভিলাষী আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের হযরত হুসাইনকে সমর্থন দেন। তিনি খলিফা হওয়ার জন্য মনে মনে গোপন ইচ্ছা পোষণ করতেন। তিনি হুসাইনকে নিজের পথ থেকে সরানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইবনে জুবায়ের হুসাইনকে অপসারণের জন্য কৌশলে হুসাইনকে নানাভাবে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। মক্কা, মদিনা ও কুফার আলি সমর্থকরাও হুসাইনকে সমর্থন দেয়। ফলে তিনি ইয়াজিদের সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন।

উমাইয়া ও হাশেমি দ্বন্দ্ব: মহানবি (স)-এর জন্মের অনেক আগে থেকে কুরাইশ বংশের হাশেমি ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যে কাবাঘর পরিচালনার নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। মহানবি (স)-এর মক্কা বিজয়ের পর উমাইয়ারা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর থেকে হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত দুই গোত্রের মধ্যে সদ্ভাব বজায় ছিল। কিন্তু উমাইয়া গোত্রের সদস্য ওসমান (রা)-এর খিলাফত লাভের ফলে পুরনো দ্বন্দ্ব পুনরায় জেগে ওঠে। উমাইয়ারা প্রশাসনের বড় বড় পদ লাভের পাশাপাশি অনেক ভূমি জায়গির হিসেবে পায়। ফলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। তাদের প্রভাব হাশেমিরা সহ্য করতে পারেনি। আবার আলি (রা) খিলাফত লাভ করলে উমাইয়ারা শত্রুতা শুরু করে। হাশেমি ও উমাইয়াদের এ দ্বন্দ্ব হুসাইন এবং ইয়াজিদের মধ্যে সংঘর্ষে ভূমিকা রাখে।

কুফাবাসীর আমন্ত্রণ ও বিশ্বাসঘাতকতা: কুফাবাসী ইয়াজিদের কুশাসন থেকে মুক্তির জন্য হুসাইনকে আমন্ত্রণ জানায়। তারা উমাইয়াদের কুশাসনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং হুসাইনকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। তাদের আমন্ত্রণে হুসাইন অনুচরবর্গসহ কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু ইতোমধ্যে ইয়াজিদ কুফাবাসীর ওপর প্রবল চাপ প্রয়োগ করলে তাদের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। তারা হুসাইনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কারবালার যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে।

মুসলিমের হত্যা: কুফার অবস্থা জানার জন্য ইমাম হুসাইন তার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিলকে কুফায় পাঠিয়েছিলেন। কুফার শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহর হাতে তিনি নিহত হন। এটিও ইমাম হুসাইন ও ইয়াজিদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইয়াজিদের শাসনকাল কত ছিল?
২. ইমাম হুসাইনের পিতা কে ছিলেন?
৩. ইমাম হুসাইন কার দৌহিত্র ছিলেন?
৪. কাবাঘর পরিচালনার নেতৃত্ব নিয়ে কাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল?
৫. ইয়াজিদের কুশাসন থেকে মুক্তির জন্য কারা হুসাইনকে আমন্ত্রণ জানায়?
৬. ইয়াজিদের সময় কুফার শাসনকর্তা কে ছিলেন?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ইমাম হুসাইন ও ইয়াজিদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণগুলো ছক আকারে লেখো।

---

[১২] Ali dead proved more effective than Ali living. Ref: P.K. Hitti, History of the Arabs, p.182

পাঠ ৬

কারবালার যুদ্ধ (৬৮০ খ্রি.) এবং পরবর্তী ইতিহাসে এর প্রভাব ও গুরুত্ব

[The Battle of Karbala (680 AD) and Its Impacts and Importance on the Subsequent History]

কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয় বরং গোটা বিশ্বের ইতিহাসে একটি মর্মান্তিক ঘটনা। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে পাপাসক্ত প্রথম ইয়াজিদের শাসনামলে কুফার শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ কারবালার প্রান্তরে মহানবি (স)-এর প্রিয়তম দৌহিত্র ইমাম হুসাইনকে অনেক স্বজনসহ নির্মমভাবে হত্যা করে। এটি ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়গুলোর একটি। পরবর্তী ইতিহাসে এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কারবালার যুদ্ধের কারণ

রাজধানী স্থানান্তর ও মক্কা মদিনার প্রাধান্য লোপ: মদিনার পরিবর্তে দামেস্কে খিলাফতের রাজধানী স্থাপিত হলে ইসলামের মূল আদর্শের প্রাণকেন্দ্র মক্কা ও মদিনার প্রাধান্য লোপ পায়। মক্কা ও মদিনার সৎ ও ধর্মভীরু সাহাবিগণ উমাইয়াদের ক্ষমতা লিপ্সা, অনাচার ও বিলাস-ব্যসনের তীব্র নিন্দা করেন। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, হারেম প্রথা, মদ্যপান ও অশ্লীলতা ধর্মপ্রাণ মুলসমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। এ কারণে মক্কা ও মদিনার অধিবাসীরা ইমাম হোসেনকে সমর্থন করেন।

কারবালার প্রান্তর

সন্ধিচুক্তির অবমাননা: খলিফা মুয়াবিয়া (রা) ও ইমাম হাসানের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তিতে মুয়াবিয়া (রা)-এর পর ইমাম হুসাইনের খলিফা হওয়ার শর্ত ছিল। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা) এ শর্ত ভঙ্গ করে ৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তার অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ফলে খিলাফতের ন্যায়সংগত দাবিদার কে এই নিয়ে আলিপন্থি এবং মুয়াবিয়া (রা) পন্থি মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক বিরোধের সূচনা হয়। মুয়াবিয়া (রা) সন্ধিচুক্তি অবমাননা করার ফলে হুসাইন ও তার অনুসারীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন।

উমাইয়া ও হাশেমি দ্বন্দ্ব: মুয়াবিয়া (রা)-এর মনোনয়ন অনুসারে তার পুত্র ইয়াজিদ খলিফা হলে কুরাইশ বংশের উমাইয়া ও হাশেমি গোত্রের দ্বন্দ্ব পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে হাশেমিরা হুসাইনকে সমর্থন করেন। এ সুযোগে স্বার্থান্বেষী আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের হযরত হুসাইনের ওপর থেকে নৈতিক সমর্থন প্রত্যাহার করে নিজে মদিনার খলিফা হবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তিনি হুসাইনকে নিজের পথ থেকে অপসারণ করার জন্য তাঁকে নানাভাবে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে থাকেন। এ সময় মক্কা ও মদিনায় অবস্থানরত আলির (রা) সমর্থকরা ইমাম হুসাইনকে সমর্থন করে তাকে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে এবং যুদ্ধের জন্য তাগিদ দিতে থাকে। তাই ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, 'জীবিত আলী অপেক্ষা মৃত আলী অধিকতর কার্যকর প্রমাণিত হলো।'[১৩] ফলে খিলাফতের দাবির প্রশ্নে ফয়সালার জন্য হুসাইন ও ইয়াজিদের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

---

[১৩] Ali dead proved more effective than Ali living. –Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, P.182

কুফাবাসীর আমন্ত্রণ ও বিশ্বাসঘাতকতা: চঞ্চল ও অস্থির মস্তিষ্কের অধিকারী কুফাবাসী ইয়াজিদের অপশাসন থেকে মুক্তির জন্য ইমাম হুসাইনের সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা উমাইয়াদের কুশাসনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ইমাম হুসাইনকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। কিন্তু ইয়াজিদ কুফাবাসীর ওপর প্রবল চাপ প্রয়োগ করলে তারা ইমাম হুসাইনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কারবালার যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। অন্যদিকে, কুফার অবস্থা জানার জন্য ইমাম হুসাইন তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিমকে কুফায় পাঠালে এর শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহর চক্রান্তে তিনি নিহত হন। ফলে কারবালার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

কারবালার বিষাদময় ঘটনা

ইমাম হুসাইনের কুফা যাত্রা ও কারবালায় অবরুদ্ধ হওয়া: ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াজিদের সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে কুফাবাসী ইমাম হুসাইনকে খলিফা হওয়ার আহ্বান জানায়। তারা তাকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কুফায় আসার আমন্ত্রণ করে। ইমাম হুসাইন কুফার প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য তার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিলকে সেখানে পাঠান। মুসলিম সেখানে পৌঁছে অবস্থা অনুকূল বলে ইমাম হুসাইনকে পত্র লেখেন। তার পত্রে কুফাবাসীর সমর্থনের আশ্বাস পেয়ে ইমাম হুসাইন ২০০ অনুচরসহ সপরিবারে ৬০ হিজরির শাবান মাসে কুফার দিকে যাত্রা করেন। পথে তিনি তার দূত মুসলিমের নিহত হওয়ার সংবাদ পান। এদিকে ইমাম হুসাইনের কুফা যাত্রার সংবাদে ইয়াজিদ কুফার শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহকে তার গতিরোধ করার নির্দেশ দেন। ওবায়দুল্লাহর নির্দেশে ওমর বিন সাদ হুসাইনকে কুফা প্রবেশে বাধা দান করে এবং মূল শহরে ঢুকতে না পেরে হুসাইন কুফার ২৫ মাইল উত্তরে ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন।

হুসাইনের শান্তির প্রস্তাব: কুফাবাহিনীর সেনাপতি ইমাম হুসাইনকে ইয়াজিদের নামে আনুগত্যের শপথ গ্রহণের নির্দেশ দেয়। তারা হুসাইনকে শপথগ্রহণ করাতে ব্যর্থ হলে শিবিরে পানি সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেয়। এরূপ অবস্থায় হুসাইন ওবায়দুল্লাহর কাছ তিনটি প্রস্তাব দেন। যথা- ১. তাঁকে হয় মদিনায় ফিরে যেতে দেওয়া হোক; অথবা ২. তাকে তুর্কি সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেওয়া হোক; অথবা ৩. ইয়াজিদের সাথে আলোচনার জন্য তাকে দামেস্কে পাঠানো হোক। ঐতিহাসিক মুর বলেন, 'এ অনুরোধ রক্ষা করা হলে উমাইয়াদের মঙ্গল হতো।'[১৪] কিন্তু ইমাম হুসাইনের শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ হুসাইনকে ইয়াজিদের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দেন। কিন্তু হুসাইনের পক্ষে উবায়দুল্লাহর এরূপ নির্দেশ মানা সম্ভব ছিল না। তিনি এ অবমাননাকর প্রস্তাব মানা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয় বলে মনে করেন এবং যুদ্ধের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তুত হন।

কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা: ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মহররম কারবালার প্রান্তরে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এটি ছিল একটি চরম অসম যুদ্ধ। ইমাম হুসাইনের বাহিনীতে মাত্র ৭২ জন যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। অন্যদিকে, ইয়াজিদের বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারেরও বেশি। যুদ্ধে হুসাইনের ভ্রাতুষ্পুত্র কাশিম প্রথমে শাহাদাতবরণ করেন। পিপাসার্ত হুসাইন শিশুপত্র আসগরকে নিয়ে ফোরাত নদীতে পানির জন্য অগ্রসর হলে আসগর তার কোলেই তীরবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ফলে হুসাইন শেষবারের মতো শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইমাম হুসাইনের প্রচণ্ড বিক্রমে ইয়াজিদ বাহিনীর সেনারা ভীত হয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু অকস্মাৎ একটি তীর হুসাইনের বক্ষ বিদীর্ণ করলে তিনি ধরাশায়ী হন। নিষ্ঠুর সীমার অর্ধমৃত হুসাইনের ঘাড়ের ওপর তরবারি চালিয়ে তার মস্তকটি বিচ্ছিন্ন করে। ঐতিহাসিক গিবন বলেন, "হুসাইনের মৃত্যুর বিয়োগান্ত দৃশ্য নিথর পাঠকের মধ্যে সহানুভূতির উদ্রেক করবে।"[১৫] কারবালার বেদনাবিধুর ঘটনার মধ্য দিয়ে মহানবি (স)-এর প্রিয় দৌহিত্রের জীবনাবসান ঘটল। হুসাইনের অসুস্থ পুত্র জয়নাল আবেদিন ছাড়া তার শিবিরে আর কোনো পুরুষ জীবিত রইল না। ইমাম হুসাইনের হত্যাকাণ্ডের পর ইয়াজিদ বিচলিত বোধ করেন। সম্ভাব্য গোলযোগের আশঙ্কায় তিনি ইমামের দেহ তার বোন জয়নবের কাছে হস্তান্তর করলে তা কারবালাতেই সমাহিত করা হয়।

---

[১৪] Well had it been for the Omayyad house, if the prayer had been agreed to.–Ref: William Muir, *The Chaliphate*

[১৫] The tragic scene of the death of Husayn will awaken the sympathy of the coldest reader.

কারবালার হত্যাকাণ্ডের গুরুত্ব ও প্রভাব

ইসলামের ইতিহাসে কারবালার যুদ্ধ একটি মর্মান্তিক ঘটনা। ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসে এর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

উমাইয়া-হাশেমি দ্বন্দ্ব: কারবালার হত্যাকাণ্ড ইসলামি জগতের সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করে। এ ঘটনা খিলাফত ও মুসলিম সালতানাতের ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করে। হাশেমি ও উমাইয়া বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এ হত্যাকাণ্ডের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়।

শিয়া সম্প্রদায়ের জন্মলাভ: ঐতিহাসিকদের মতে, কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ডের ফলেই শিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। শিয়ারা উমাইয়াবিরোধী মতবাদ গঠন করে। তাই ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, 'হুসাইনের রক্ত তার পিতার রক্ত অপেক্ষাও বেশি করে শিয়া মতবাদ গঠনের কার্যকরি বীজ বলে প্রমাণিত হলো।'[১৬] কারবালার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ইসলামি অপ্রতিরোধ্য ঐক্যে ফাটল ধরায়। জাতীয় জীবনেও এটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং পুনরায় মুসলমান-মুসলমান ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব দানা বাধতে থাকে। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়।

হারবার যুদ্ধ ও মদিনার অবমাননা: কারবালার হত্যাকাণ্ডে মদিনাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ইয়াজিদের পদচ্যুতি ঘোষণা করে এবং তাদের শাসনকর্তাকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করে। ইয়াজিদ মুসলিম বিন উকবার নেতৃত্বে মদিনা আক্রমণ করেন। তিনি ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট হারবার যুদ্ধে মদিনাবাসীকে পরাজিত করেন এবং মদিনাকে অপবিত্র করেন। তাই ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 'যে শহর নবিকে আশ্রয়দান করেছিল এবং যা তাঁর জীবন ও নবুয়ত দ্বারা পবিত্র হয়েছিল তা এক্ষণে নগণ্যভাবে অপমানিত হলো।'[১৭]

মক্কা অবরোধ ও কাবাগৃহের ধ্বংসসাধন: ইয়াজিদ ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর হুসাইন বিন নুবাইয়ের নেতৃত্বে মক্কা অবরোধ করে কাবা ও অন্যান্য ধর্মীয় স্থাপনার বিশেষ ক্ষতি করেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, 'অবরোধের ফলে কাবাগৃহে অগ্নি সংযোজিত হয়। পবিত্র কৃষ্ণপ্রস্তর ত্রিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং কাবাগৃহ কান্নারত নারীর ভগ্ন হৃদয়ে রূপলাভ করে।'[১৮]

পারস্য জাতীয়তাবোধের উন্মেষ: কারবালা যুদ্ধের পরবর্তী ফল হিসেবে আরব জাতীয়তাবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রতিবেশী পারস্য অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। ইমাম হুসাইন (রা)-এর স্ত্রী সাসানীয় বংশের কন্যা ছিলেন। এ কারণে পারস্যবাসী হুসাইন (রা)-এর পুত্র আলীকে (জয়নুল আবেদীনকে) খলিফা হিসেবে সমর্থন করে। বার্নার্ড লুইস বলেন, "এ ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। এর পরবর্তী ফলাফল ছিল বিস্ময়কর।" সৈয়দ আমীর আলীর মন্তব্য করেন, "কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ড ইসলামি দুনিয়ার সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করে এবং পারস্যে এক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়, যা পরবর্তীকালে উমাইয়াদের ধ্বংসসাধনে আব্বাসি বংশধরদের সহায়তা করে।"

জেনে রাখো

কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠী নিজ ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত যে চেতনা লালন করে তাই জাতীয়তাবাদী চেতনা। জাতীয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণে ব্যক্তি নিজেকে একটি নির্দিষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করে এবং সেই জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সাথে একাত্মবোধ অনুভব করে।

---

[১৬] The blood of Al-Husayn even more than that of his father, proved to be the seed of the Shiite, `church'. Shiism was born on the tenth of Muharram. –Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.191

[১৭] Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*

[১৮] In the course of the sieze the Ka'bah itself caught fire and was burned to the ground. The Black Stone was split in three pieces and the house of Allah looked like torn bosoms of mourning women. –Ref: P.K. Hitti. *History of the Arabs*, p.192

উমাইয়াদের পতনের বীজ বপন: ঐতিহাসিক আমীর আলীর মতে, 'কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ড ইসলামি জগতের সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করে এবং পারস্যে এক জাতীয় চেতনাবোধের উন্মেষ ঘটায়।' এ মর্মান্তিক ঘটনা ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। তাই ঐতিহাসিক বার্নাড লুইস বলেন, 'প্রত্যক্ষ গুরুত্ব যা-ই থাকুক না কেন, কারবালার যুদ্ধের পরবর্তী ফলাফল সত্যই বিস্ময়কর।' প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনার মধ্যেই উমাইয়াদের পতনের বীজ বপিত হয়েছিল। কারবালার যুদ্ধের পর খিলাফতে আলি (রা) এর বংশধরদের পক্ষে খিলাফতের দাবি জোরালো হয়।

ইসলামের ইতিহাসে কারবালার ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়স্পর্শী। সত্য, ন্যায় ও ইসলামি রাষ্ট্রনীতির জন্য কারবালা প্রান্তরে হুসাইনের করুণ মৃত্যু মুসলিম শাসকদের কাছে এক মহান আদর্শের উৎস হয়ে আছে। ধূর্ত ও অসৎ ইয়াজিদের আনুগত্য না করে হুসাইন তার মহান আদর্শের ওপর অবিচল থেকেছেন। সত্যের জন্য তিনি নিজেকে কুরবানি করেছেন, যা বিশ্বের সত্যাশ্রয়ী মানুষের জন্য এক মহান শিক্ষা। কারবালার হত্যাকাণ্ড মুসলিম জাহানে রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি করে। গোটা মুসলিম বিশ্বে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা কেবল খিলাফতের ভাগ্যই নির্ধারণ করেনি। খিলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পরেও এর প্রভাব বহাল থাকে। বস্তুত শিয়া মতবাদের উন্মেষসহ এটি মুসলিম বিশ্বের ওপর স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কারবালার যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
২. কারবালার যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?
৩. ইমাম হুসাইনের চাচাতো ভাই মুসলিমকে কোথায় হত্যা করা হয়?
৪. কারবালা প্রান্তর কোথায় অবস্থিত?
৫. কারবালার যুদ্ধে প্রথম কে শাহাদাতবরণ করেন?
৬. ইমাম হুসাইনের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে কে?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. কারবালা যুদ্ধের কারণ চিহ্নিত করে একটি চার্ট তৈরি করো।
২. কারবালার যুদ্ধকে বিষাদময় বলার কারণ ছক আকারে লেখো।

গ. দলীয় কাজ

কারবালার যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল— দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণ করো।

পাঠ ৭

খলিফা আবদুল মালিকের সাম্রাজ্য পুণর্গঠন ও সুদৃঢ়ীকরণ(৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) [The Consolidation and Expansion of the Empire by Khalifa Abdul Malik (685-705 AD)]

পরিচিতি ও খিলাফত লাভ

আবদুল মালিক ছিলেন প্রথম মারওয়ানের পুত্র। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের পঞ্চম খলিফা। উল্লেখ্য, ইয়াজিদের পর ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়া (রা) উমাইয়া খিলাফত লাভ করেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের সুফিয়ানি শাখার শেষ খলিফা। তার স্বল্পকালীন শাসনামলের পর হাকামের পুত্র মারওয়ান ৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। মারওয়ানের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে উমাইয়া খিলাফতে 'হারবীয়' বা 'মারওয়ানি' শাখার রাজত্বের সূচনা ঘটে। ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মারওয়ান মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজ পুত্র আবদুল মালিককে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল মালিক দামেস্কের উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে আবদুল মালিক উমাইয়া বংশের শাসন সুদৃঢ় করেন। এজন্য তাকে উমাইয়া বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, 'তিনি উৎসাহী, ষড়যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত এবং ধর্মভয় বিবর্জিত ছিলেন। স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য তিনি অসাধারণ দক্ষতার সাথে আত্মনিয়োগ করেন।'[১১] আবদুল মালিককে রাজেন্দ্র বা 'Father of kings' বলা হয়। কেননা তার চার পুত্র পরবর্তী সময়ে উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, 'আবদুল মালিক ও তার উত্তরাধিকারী চারপুত্রের শাসনামলে দামেস্ক শৌর্যবীর্য ও গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে।'

বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা ও উমাইয়া শাসন সুদৃঢ়ীকরণ

খলিফা আবদুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করে চারদিক থেকে নিজেকে শত্রু পরিবেষ্টিত দেখতে পান। সিংহাসনের দাবিদার খালিদ বিন ইয়াজিদ ও আমর বিন সাইদের বিদ্রোহ, হেজাজে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের প্রতিদ্বন্দ্বী খিলাফত প্রতিষ্ঠা, ইরাকে মুসাবের বিদ্রোহ, ইরাক, পারস্য ও মদিনায় খারেজি ও আলি (রা)-এর অনুসারীদের বিদ্রোহ, কুফায় মুখতারের নেতৃত্বে অনুশোচনাকারী দলের উমাইয়া বিরোধী তৎপরতা এবং রোমানদের আগ্রাসী কর্মকাণ্ড আবদুল মালিকের ক্ষমতা তথা উমাইয়া শাসনের জন্য বিরাট হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে তিনি বিচলিত না হয় ধৈর্য, কৌশল ও সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে উমাইয়া খিলাফতের ভিত্তি সুসংহত করেন।

মুখতারের বিদ্রোহ দমন (৬৮৬-৬৮৭ খ্রি.): আল মুখতার ছিলেন আবু বকর (রা) এর সেনাপতি আবু উবায়দার পুত্র। তিনি শিয়া মতাবলম্বী এবং ইমাম হাসানের সহচর ছিলেন। তিনি কারবালা হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণকারী হিসেবে 'প্রায়শ্চিত্তকারী' দলে যোগ দেন। মুখতার এ দলের সাহায্যে ইরাক ও পারস্য নিজের প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। এক সময় তিনি মক্কায় নিজেকে খলিফা ঘোষণাকারী আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের সাথে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ তাকে ফন্দিবাজ ভেবে তার সাথে ঘনিষ্ঠতা করেননি। খলিফা আবদুল মালিক এ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ওবায়দুল্লাহ ইবন জিয়াদকে মুখতারের বিরুদ্ধে পাঠান। ৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে জাব নদীর (দজলার শাখা নদী) তীরে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ প্রথম জাবের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে আবদুল মালিকের সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ নিহত হন। কারবালার কসাই সীমার ও ওবায়দুল্লাহকে হত্যা করে ইমাম হোসেনের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয়। জাবের যুদ্ধে জয়লাভের পর মুখতার মেসোপটেমিয়া দখল করেন। এরপর তিনি পুনরায় আবদুল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে তার সাথে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন। কিন্তু আবদুল্লাহ মুখতারকে বিশ্বাস করেননি। তিনি তার ভাই বসরার আমির মুসাবকে মুখতারের বিরুদ্ধে পাঠান। ৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মুসাব তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। ফলে আবদুল মালিক তার এক চরম শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রক্ষা পান।

---

[১১] Abdul Malik was energetic, intriguing and unscruplous, he applied himself with extraordinary ability to strengthen his position. Ref: Syed Ameer Ali: A Short History of the Saracens, p. 93

খালিদ ও আমরের বিদ্রোহ দমন (৬৮৯ খ্রি.): আবদুল মালিক সিংহাসনের দাবিদার খালিদ বিন ইয়াজিদকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের দলভুক্ত করেন। এ দিকে আবদুল মালিকের বাবার চাচাতো ভাই আমর বিন সাঈদ ৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। আবদুল মালিক তাকে প্রলোভন দেখিয়ে রাজপ্রাসাদে ডেকে এনে হত্যা করেন।

মুসাবের বিরুদ্ধে অভিযান (৬৯১ খ্রি.): আবদুল মালিক তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের প্রতিনিধি ও ইরাকের শাসনকর্তা মুসাবের বিরুদ্ধে অভিযানের পূর্বে বাইজান্টাইন ও কুফাবাসীর সমর্থন আদায় করেন। তিনি সাপ্তাহিক ১,০০০ (এক হাজার) স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার অঙ্গীকারে বাইজান্টাইনদের সাথে সন্ধি করেন। অন্যদিকে, প্রলোভন দেখিয়ে কুফাবাসীরও সমর্থন আদায় করেন। এরপর তিনি স্বয়ং ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে মুসাবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলে মুসাব পরাজিত ও নিহত হন। সমগ্র ইরাক পুনরায় উমাইয়া শাসনভুক্ত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের বিরুদ্ধে অভিযান (৬৯২ খ্রি.): মক্কা ও মদিনায় আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবদুল্লাহর জন্য আবদুল মালিক নিজেকে অনিরাপদ ভাবেন। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে মক্কা ও মদিনা অভিযানের নির্দেশ দেন। ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে আরাফাতের যুদ্ধে আবদুল্লাহ পরাজিত ও নিহত হন। আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর আবদুল মালিক মুসলিম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হন। পি. কে. হিট্টি বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের মৃত্যুর সাথে সাথেই পুরোনো বিশ্বাসের সাথে সর্বশেষ যোগসূত্র চিরতরে তিরোহিত হলো এবং ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পন্ন হলো।"

খারেজি বিদ্রোহ দমন (৬৯৯ খ্রি.): ধর্মান্ধ খারেজিরা শাবীব ইবনে ইয়াজিদের নেতৃত্বে বসরা, কুফা, মসুল প্রভৃতি শহরে আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। প্রথমে মুহাল্লিবের সহায়তায় আবদুল মালিক তাদেরকে দমন করেন। ৬৯৫-৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে খারেজিরা নাফি ইবনে আহরাকের নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহ করলে ৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মাধ্যমে তাদের দমন করা হয়। এতে খারেজি নেতা আহরাকসহ বহু খারেজি প্রাণ হারায়।

ইবনে আসাতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ: ৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে সিজিস্তানের উমাইয়া গর্ভনর আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল আসাত খলিফা আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তার এ বিদ্রোহ আবদুল মালিকের জন্য এক ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করে। এ সময় কাবুলের রাজা জুনবিল খলিফাকে কর দিতে অস্বীকার করেন। তখন তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে এ নিয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও ইবনে আসাতের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ৭০১ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে টাইগ্রিস নদীর তীরে মাসকিন নামক স্থানে উভয়ের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হাজ্জাজের প্রেরিত সুসজ্জিত বাহিনী ময়ূর বাহিনী নামে পরিচিত ছিল। ইবনে আসাত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জুনবিলের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে হাজ্জাজ জুনবিলকে স্বপক্ষে আনেন, যার ফলে ইবনে আসাতকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। এভাবে কাবুল আবদুল মালিকের শাসনাধীনে আসে।

সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য জয় (৬৯২ খ্রি.): আবদুল মালিক একসময় বাইজান্টাইনদের ১,০০০ (এক হাজার) স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে অপমানজনক সন্ধি করেছিলেন। কারণ তিনি গৃহযুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল মালিক এ সন্ধি বাতিল করে গ্রিকদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ান পরাজিত হন। এরপর দক্ষিণ আর্মেনিয়া, সাইপ্রাস মুসলিম দখলে আসে। উভয়ের মধ্যে কয়েক বছর যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিশাল এলাকা মুসলমানদের দখলে আসে।

এশিয়া মাইনর ও মধ্য এশিয়ায় অভিযান (৬৯৩ খ্রি.): আবদুল মালিকের সময় ৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়া মাইনরে মুসলিম অভিযান চালানো হয়। বাইজান্টাইন বাহিনী এন্টিওক দখল করলে মুসলিম বাহিনী তাদের বিতাড়িত করে এরজুরাম দখল করে। আবদুল মালিক কাবুলের একজন হিন্দু রাজাকে (রাতবিল) পরাস্ত করে এ এলাকা মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

উত্তর আফ্রিকা জয় (৬৯৮ খ্রি.): খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর সময় উকবা বিন নাফি ইফরিকিয়া বা উত্তর আফ্রিকা জয় করে কায়রোয়ান নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বার্বার নেতা কুসায়লা উকবাকে হত্যা করে ওই অঞ্চল থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করেন। সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপনের পর ৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে জুহাইরের নেতৃত্বে খলিফা আবদুল মালিক ইফরিকিয়ায় অভিযান পাঠান। তিনি বার্বার নেতা কুসায়লাকে হত্যা করে ইফরিকিয়া পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু বার্বার ও বাইজান্টাইনদের অতর্কিত আক্রমণে জুহাইর পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর ৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে হাসান বিন নোমানের নেতৃত্বে আরেকটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করা হয়। নোমান শত্রুদের পরাজিত করে কার্থেজ ও বার্কা দখল করেন। এভাবে আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত উমাইয়া আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

কাহিনার পতন (৭০৩ খ্রি.): এ সময় কাহিনা নামে একজন নারী সেনাপতির নেতৃত্বে উত্তর আফ্রিকার পরাজিত বার্বারগণ একতাবন্ধ হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর এই নারী মুসলিম বাহিনীর সাথে লড়াই করে টিকে ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে কাহিনা উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা হাসান বিন নোমানকে পরাজিত করেন। পরে ব্যাপক অভিযানের মাধ্যমে ৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে হাসান কাহিনাকে পরাজিত ও নিহত করেন। মুসলিম বাহিনীকে ২৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সরবরাহ করার শর্তে মুসলিম সেনাপতি হাসান বার্বারদের সাথে সন্ধি করেন। ফলে উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহ প্রশমিত হয় এবং প্রায় ১২,০০০ বার্বার গোত্রীয় সদস্য ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করে। পি. কে. হিট্টি বলেন, "অবশেষে এ নায়িকাকে চাতুরির মাধ্যমে পরাস্ত করা হয়। একটি কূপের কাছে তাকে হত্যা করা হয়। কূপটি এখনও তার নামানুসারে 'বির আল-কাহিনা' নামে পরিচিত।"[২০] দীর্ঘ বিশ বছর শক্তিশালী ও সুদৃঢ়ভাবে শাসন পরিচালনা করে খলিফা আবদুল মালিক ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত খ্রিষ্টাব্দে আবদুল মালিক দামেস্কের উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন?
২. রাজেন্দ্র বা 'Father of kings' বলা হয় কাকে? */ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০১৯/*
৩. আবদুল মালিকের সময় মক্কা ও মদিনার শাসক কে ছিলেন?
৪. আবদুল মালিকের সময়কার খারেজি বিদ্রোহ দমন করেন কে?
৫. ইবনে আসাতের বিরুদ্ধে হাজ্জাজের প্রেরিত সুসজ্জিত বাহিনী কী নামে পরিচিত ছিল?
৬. কোন খলিফা সর্বপ্রথম মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করেন? */ঢা. বো., ব. বো., য. বো. ২০২২/*

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. আবদুল মালিক যেসব সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন তার একটি তালিকা তৈরি করো।
২. উমাইয়া শাসন সুদৃঢ়ীকরণে আবদুল মালিকের কৃতিত্বের একটি চার্ট তৈরি করো।

---

[২০] 'The heroine was at last defeated by treachary and killed near a well that still bears her name, Bir al-Kahinah.' Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 213

পাঠ ৮

খলিফা আবদুল মালিকের শাসন নীতি ও সংস্কার
Administrative Policy and Reforms of Khalifa Abdul Malik

শুধু উমাইয়া সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়ীকরণ ও সম্প্রসারণ নয়, খলিফা আবদুল মালিক শাসননীতি প্রণয়ন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কারেও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দেন। ঐতিহাসিক স্কুলার বলেন, "আবদুল মালিকের রাজত্বকাল ইসলামের ইতিহাসে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ ছিল।" তার গৃহীত শাসননীতি ও সংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

আরব জাতীয়তাবাদী নীতি প্রবর্তন: খলিফা আবদুল মালিকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ (Glorious Age of the Umayyad)। তার শাসননীতির মূল বিষয় ছিল আরব জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ। তিনি শাসনক্ষমতায় বসে দেখলেন যে, মূলত পারসিক ও রোমানরা উমাইয়া খিলাফতের প্রশাসন পরিচালনা করছে। এআবস্থায় প্রশাসনে বিজাতীয় প্রভাব হ্রাস এবং আরব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খলিফা রাজকীয় দফতরসমূহে কেবল আরবি ভাষাভাষীদের চাকরি দেওয়ার বিধান চালু করেন। অবশ্য এর দ্বারা প্রশাসনে যে আরব জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নয়। বহু অনারব দ্রুত আরবি ভাষা রপ্ত করে প্রশাসনে তাদের প্রাধান্য বজায় রাখেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, 'প্রশাসনকে আরবীয়করণ, প্রথম বিশুদ্ধ আরবি মুদ্রার প্রচলন, ডাক বিভাগের উন্নতি সাধন এবং জেরুজালেমে ইসলামের তৃতীয় পবিত্র স্থাপত্য 'কুব্বাতুস সাখরা' নির্মাণ এ যুগের আরব জাতীয়তাবাদের সাক্ষ্য দেয়।'[২১]

সরকারি অফিসে আরবি ভাষা প্রচলন: খলিফা আবদুল মালিক সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ফারসি, সিরীয় ও গ্রিকসহ প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার পরিবর্তে আরবিকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেন। ৬৯৬-৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এ মর্মে একটি আদেশ জারি করেন। সালিহ বিন আব্দুর রহমান নামে জনৈক পারসিক মুসলমানের পরামর্শে তিনি সরকারি কাজে আরবি ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। ফলে সিরিয়া ও ইরাকের প্রদেশসমূহে আরবি ভাষায় সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। পরে মিসর ও পারস্যেও আরবি ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করে। পি. কে. হিট্টি বলেন, "এ যুগেই প্রশাসনের জাতীয়করণ বা আরো স্পষ্ট করে বললে আরবীয়করণ হয়।"[২২] এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে- ১. আঞ্চলিক ভাষাসমূহের পরিবর্তে অফিস-আদালতে দলিল-পত্রাদি আরবি ভাষায় সংরক্ষণের নিয়ম চালু হয়; ২. বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকায় শাসনকার্যে যে অসুবিধা হতো তার অবসান হয়; ৩. বিশুদ্ধ আরব শাসন প্রচলিত হওয়ায় আরবি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়; ৪. এ ব্যবস্থার ফলে সাম্রাজ্যের অনারব অমুসলমানরা কর্মচ্যুত হলে তাদের স্থলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে আরব মুসলমানরা নিযুক্ত হন।

আরবি মুদ্রার প্রচলন: মুদ্রা হলো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। আবদুল মালিকের রাজত্বের সময় পর্যন্ত তিন ধরনের মুদ্রা ছিল। **যেমন:** বাইজান্টাইনে Dinarious, পারসিক Darkmah এবং দক্ষিণ ইয়ামেনে Athene নামক মুদ্রা চালু ছিল, ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমস্যা হতো। মুদ্রা বিনিময়ের সমস্যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে অসুবিধা দেখা দিত। এছাড়া বাজারে অনায়াসে জাল মুদ্রা লেনদেন হতো। এসব অসুবিধা লক্ষ করে খলিফা আবদুল মালিক সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি মুদ্রার প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। জাতীয় মুদ্রা প্রচলনের জন্য ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দামেস্কে একটি কেন্দ্রীয় টাকশাল স্থাপন করেন। আমীর আলী বলেন, 'আবদুল মালিক ইসলামে সর্বপ্রথম টাকশালের প্রবর্তন করেন।'[২৩] খলিফা আবদুল মালিক দিনার, দিরহাম ও ফালুস নামের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। মুদ্রাগুলোকে জাতীয়করণের জন্য এতে ক্রুসের পরিবর্তে আরবি বর্ণমালা লেখা হয়।

আবদুল মালিকের সময়কার মুদ্রা

---

[২১] His era witnessed the nationalizing, or Arabicizing of the administration, the introduction of the first purely Arab coinage, the development of the postal service and the creation of such monument as the Dome of the Rock in Jerusalem the third holiest sanctuary in Islam. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 206

[২২] His era witnessed the nationalizing or Arabicizing, of the administration. –Ref: P.K. Hitti. *History of the Arabs*, p. 206

[২৩] Abdul Malik was first to open a mint in Islam. –Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.101

আরবি লিপির উন্নতি বিধান: রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করার ফলে গোটা সাম্রাজ্যে প্রচলন হয় আরবি ভাষার। ফলে এর প্রকৃত উচ্চারণের জন্য আরবি লিপির সংস্কার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। খলিফা আবদুল মালিকের পূর্বে আরবি লিপির দুটি বড় ত্রুটি ছিল। যেমন এতে শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল। হরকতের অভাবে একই শব্দের বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণ হতো। আরবি ভাষা সহজভাবে লিখন ও পঠনের ক্ষেত্রে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সহযোগিতা করেন। তিনি আরবি লিপিতে হরকত ব্যবহার ও একই হরফের বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণের জন্য নোকতার ব্যবহার প্রবর্তন করেন। ফলে আরবি ভাষার পঠন ও লিখন সহজতর হয় এবং অনারবরা সহজেই আরবি শিখতে ও বলতে সক্ষম হয়।

রাজস্ব সংস্কার: খলিফা আবদুল মালিক রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে রাজ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটানোর জন্য কিছু হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরামর্শে কিছু নীতি গ্রহণ করেন। যেমন— ১. ইসলাম গ্রহণ করলেও মাওয়ালিদের জিজিয়া ও খারাজ দিতে হবে, ২. সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেও তাদের গ্রামে গিয়ে স্ব-স্ব পেশায় নিযুক্ত হতে হবে, ৩. মুসলমানরা যে জমি ক্রয় করেছে তার জন্য তাদেরকে আগের মতো প্রচলিত কর দিতে হবে, ৪. অনাবাদি জমি ও জলাভূমির জল নিষ্কাশন করে সেগুলো চাষ করতে হবে। এ জন্য কৃষকদের কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। পতিত ও অনাবাদি ভূমি চাষযোগ্য করা হলে তিন বছরের জন্য তার রাজস্ব মওকুফ করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এসব বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাজ্যের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক সংকট কেটে যায়।

ডাক বিভাগের সংস্কার: খলিফা আবদুল মালিক পারসিকদের পদ্ধতি অনুযায়ী ডাক চালান (Relay of Horses) প্রথার প্রচলন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বড় রাস্তার পাশে ডাকচৌকি নির্মাণ করেন। ডাক বিভাগের কাজ ছিল- ১. সরকারি চিঠিপত্র, আদেশ-নিষেধ আদান-প্রদান; ২. সরকারি কর্মচারীদের ডাক গাড়ির মাধ্যমে স্থানান্তর ; ৩. প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত সৈন্য ও রসদ দ্রব্যাদি সরবরাহ এবং ৪. গোয়েন্দা বিভাগের কাজ সম্পাদন। এ জন্য ডাক বিভাগকে 'খলিফার কান এবং চোখ' (Ear and Eyes of the Caliph) বলা হতো।

রেজিস্ট্রি বিভাগের সংস্কার: খলিফা মালিকের আরেকটি বড় কৃতিত্ব হলো দামেস্কে 'দিউয়ানুল রাসায়েল' মহাফেজখানা বা দস্তাবেজখানা প্রবর্তন। এ দফতরে খলিফার আদেশ, নিষেধ, চুক্তিপত্র, নথিপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হতো।

বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার: খলিফা আবদুল মালিক নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য 'দিউয়ানুল কাযা' নামে একটি দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রদেশে বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য তিনি কাজি নিয়োগ দেন। কেন্দ্রীয় বিচারালয়ে 'কাজি-উল-কুজ্জাত' বিচারকাজ সম্পাদন করতেন। খলিফা নিজে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করতেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আবদুল মালিকের শাসননীতির মূল বিষয় কী ছিল?
২. সরকারি অফিসে আরবি ভাষার প্রচলন করেন কে?
৩. কোন খলিফা প্রথম রাজকীয় টাকশাল নির্মাণ করেন কে? *[সকল বোর্ড ২০২২; ২০১৫]*
৪. সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন কে? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৫. খলিফা আবদুল মালিক কাদের পদ্ধতি অনুযায়ী ডাক চালান প্রথার প্রচলন করেন?
৬. খলিফা আবদুল মালিক কোথায় মহাফেজখানা বা দস্তাবেজখানা চালু করেন?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আবদুল মালিকের সংস্কারমূলক কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৯

খলিফা আবদুল মালিকের চরিত্র ও কৃতিত্ব
Character and Achievements of Khalifa Abdul Malik

চরিত্র

উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা খলিফা আবদুল মালিক ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, দৃঢ়সংকল্প, সাহসী ও উদ্যমী একজন ব্যক্তি। তিনি একই সাথে ছিলেন দক্ষ কূটনীতিক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। খিলাফত লাভের পূর্বে তিনি ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। কিন্তু খিলাফত লাভের পর তিনি নিজের খেয়ালখুশি মতো রাজ্য শাসন করেছেন বলে ঐতিহাসিকদের অনেকেই তার সমালোচনা করেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাকে লোভী ও নিষ্ঠুর বললেও সৈয়দ আমীর আলী তাকে ফ্রান্সের শাসক শার্লিমেন, রাশিয়ার জার মহামতি পিটার এবং রোমের সম্রাট দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ানের চেয়ে মহানুভব শাসক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক রেজা-ই-করিম বলেন, 'আমর বিন সাঈদের কাহিনিটি বাদ দিলে আবদুল মালিকের প্রত্যেক কাজেই বুদ্ধিমত্তা, উদারতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে হাজ্জাজের নিষ্ঠুর কার্যাবলি আবদুল মালিকের খিলাফতের এক বিরাট কলঙ্ক।'[২৪] খলিফা আবদুল মালিক একজন কবি ছিলেন এবং কবি ও জ্ঞানী-গুণীদের উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তায়াযুক নামে এক খ্রিষ্টান ব্যক্তি ছিলেন খলিফার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। সারজিয়াস নামের আর একজন খ্রিষ্টান তার পরামর্শক ছিলেন।

খলিফা আবদুল মালিকের দোষ-গুণের বিচার করলে তার গুণের পরিমাণই বেশি হবে। তিনি নীতিবহির্ভূত যে কাজগুলো করেছিলেন, মধ্যযুগে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একজন দক্ষ শাসকের সেগুলোর প্রয়োজন ছিল। তিনি তার অসামান্য বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি দিয়ে উমাইয়া বংশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে উমাইয়া খিলাফতকে সুসংহত করেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, 'আবদুল মালিক ও তার চার পুত্রের শাসনে দামেস্কে এই রাজবংশ ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌছায়।'[২৫] এ জন্য তাকে নিঃসন্দেহে উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতাও বলা যায়।

কৃতিত্ব

বিদ্রোহ দমন: আবদুল মালিক বুদ্ধিমত্তার সাথে সাম্রাজ্যের সব বিদ্রোহ দমন করেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ ও মুখতারের বিবাদের সুযোগে তিনি ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে মুখতারের বিরুদ্ধে পাঠান। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ নিহত হন এবং পরবর্তীতে বসরার আমির মুসাবের হাতে মুখতার নিহত হয়। এভাবে মালিকের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তার অপর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বারা ধ্বংস হয়। এরপর তিনি সিংহাসনের দাবিদার খালিদ বিন ইয়াজিদকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের দলে টানেন এবং আমর বিন সাইদকে কৌশলে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করে নিজ হাতে হত্যা করেন। মুসাবকে দমন করার জন্য খলিফা নিজে যুদ্ধাভিযানে গেলে মুসাব ভীত হয়ে সেনাপতি মুহাল্লাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। যুদ্ধে মুসাব নিহত হন। তার ছিন্ন মস্তক দামেস্কে প্রেরণ করা হয়। আবদুল মালিক এরপর বার্বার নেতা কুসাইলা ও কাহিনার বিদ্রোহ দমন করেন।

আবদুল মালিক তার চরম প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে দমনের জন্য জেরুজালেমে 'কুব্বাতুস সাখরা' (Dome of the Rock) তৈরি করে সেখানে মুসলমানদের হজ পালনের নির্দেশ দেন। কিন্তু তার এ উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তবে তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে পাঠিয়ে তিনি আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরকে পরাজিত ও হত্যা করেন। এরপর হাজ্জাজের ওপর খারেজিদের দমন করার ভার দেওয়া হলে তিনি তাদের দমন করে তাদের ঘাঁটিগুলোও ধ্বংস করে দেন।

---

[২৪] সূত্র: *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ২২২

[২৫] Under Abdul Malik's rule and that of the four sons who succeeded him the dynasty at Damascus reached the meridian of its power and glory. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.206

বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ: আবদুল মালিক যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন বিশৃঙ্খলার সুযোগে বাইজান্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ান নতুন করে উমাইয়াদের বিরোধিতা শুরু করে। তারা লেবাননে আক্রমণ চালিয়ে কিছু এলাকা দখল করে। খলিফা নিজের অবস্থান নিরাপদ করে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে জাস্টিনিয়ান পরাজিত হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন

উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে আবদুল মালিক ছিলেন বিদ্যান ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। তিনি শিল্প, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির একজন উদার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ঐতিহাসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। কাব্যপ্রিয় মানুষ হিসেবে তিনি সমকালের বিখ্যাত আরবি কবি আল জারিব, ফারাজদাক ও আখতাল প্রমুখকে উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। নির্মাতা হিসেবে আবদুল মালিকের কৃতিত্ব অপরিসীম। দজলা নদীর পশ্চিম তীরে সামরিক শহর 'ওয়াসিত' ও আল আকসা মসজিদ তার স্থাপত্য কীর্তির উজ্জ্বল নিদর্শন। তবে স্থাপত্য শিল্পে তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে 'কুব্বাতুস সাখরা' Dome of the Rock নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। মক্কায় নিজেকে খলিফা ঘোষণাকারী আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের সাথে পাল্লা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাবাগৃহের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবদুল মালিক ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমে মহানবি (স)-এর মিরাজের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র পাথরের ওপর অষ্টাকোণাকৃতির এ স্থাপত্যকীর্তিটি নির্মাণ করেন। খলিফা আবদুল মালিক তার অনুসারীদের মক্কার পরিবর্তে এখানে হজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জেনে রাখো

দজলা নদীটি টাইগ্রিস নামেই বেশি পরিচিত। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার একটি নদী। নদীটি তুরস্কে (বর্তমান নাম তার্কিয়ে) উৎপত্তি লাভ করে ইরাকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং শাত আল আরব নামে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। দজলা নদীর দৈর্ঘ্য ১৯০০ কি.মি. এবং নদী বিধৌত অববাহিকায় এর আয়তন ১,১০,০০০ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি। এই দজলা এবং ফোরাত নদীর অববাহিকায়ই বিখ্যাত মেসোপটেমীয় সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে।

সার্বিক দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে বলা যায়, আবদুল মালিক তার অসামান্য নৈপুণ্য দ্বারা মুয়াবিয়া (রা) প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া খিলাফতের সংহতি বিধান করে একে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এর সীমানাও সম্প্রসারণ করেন। তাই ন্যায়সংগতভাবে তাকে উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কাকে?
২. খলিফা আবদুল মালিক কোন বংশের শাসক ছিলেন? *[ঢা. বো., ব. বো., য. বো. ২০২২]*
৩. বার্বার নেত্রী কাহিনাকে দমন করেন কে?
৪. মক্কা ও মদিনার শাসক আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরকে পরাজিত ও হত্যা করেন কে?
৫. কুব্বাতুস সাখরা নির্মাণ করেন কে? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
৬. কুব্বাতুস সাখরা কোথায় নির্মাণ করা হয়?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আবদুল মালিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ১০

খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ, প্রাথমিক কার্যাবলি ও খিলাফত সম্প্রসারণ: (৭০৫-৭১৫ খ্রি.)

Khalifa Walid Bin Abdul Malik Ascension to the Throne, Initial Activities and Expansion of the Khilafat: (705-715 AD)

পরিচয় ও সিংহাসনে আরোহণ

আল ওয়ালিদ ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আবদুল মালিকের পুত্র। খলিফা আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তার মনোনয়ন অনুসারে আল ওয়ালিদ ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কের সিংহাসন লাভ করেন। আল ওয়ালিদের দাদা প্রথম মারওয়ান (৬৮৩-৬৮৫) মৃত্যুর আগে তার দুই পুত্র আবদুল মালিক ও আবদুল আজিজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সে হিসেবে মালিকের পর আবদুল আজিজের খলিফা হওয়ার কথা। ৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল মালিক তার পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলে আবদুল আজিজ এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তবে আবদুল মালিকের শাসনকালেই আবদুল আজিজ মারা যান এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আল ওয়ালিদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার দশ বছরের রাজত্বকাল উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলে খ্যাত।

প্রাথমিক কার্যাবলি

পিতাকে সমাধিস্থ করে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আল ওয়ালিদ দামেস্কের মসজিদ প্রাঙ্গানে বিপুল জনতার সামনে এক ভাষণ দান করেন। পিতার অনুকরণে তিনি সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করে পূর্বাঞ্চলের শাসনভার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং পশ্চিমাঞ্চলের শাসনভার মুসা বিন নুসায়েরের ওপর ন্যস্ত করেন।

ওমর বিন আবদুল আজিজকে নিয়োগ: আল ওয়ালিদ তার চাচাতো ভাই ধর্মপরায়ণ ওমর বিন আবদুল আজিজ বা দ্বিতীয় ওমরকে হেজাজের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি সেখানে মজলিশ-উস-শুরা গঠন করেন। এ শুরার সদস্য ছিলেন মক্কা-মদিনার আলেম ওলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাদের সহযোগিতায় তিনি বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা পুনঃনির্মাণ করেন। মদিনার মসজিদ ও মহানবি (স)-এর স্ত্রীদের বাসগৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। এ কাজের জন্য সিরিয়া থেকে নির্মাণ শ্রমিক আনা হয়। বাইজান্টাইন সম্রাট এ ধর্মীয় কাজে অনেক স্বর্ণ, ৪০টি উট বোঝাই মোজাইক এবং ১০০ (একশত) কারিগর পাঠান। ওয়ালিদের নির্দেশে ওমর হজ যাত্রীদের সুবিধার জন্য যাতায়াতের পথে অট্টালিকা, নতুন পয়ঃপ্রণালি ও কূপ খনন করেন। পরবর্তীকালে মক্কা নগরী পরিদর্শনকালে খলিফা ওয়ালিদ ওমরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তার জনকল্যাণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থার কথা জেনে বহুলোক ইরাক প্রদেশ থেকে হেজাজে আশ্রয় নেয়। ওমরের সুনামে ঈর্ষান্বিত হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলিফার কাছে তার সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করেন। খলিফা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে ওমরকে বরখাস্ত করে মক্কা ও মদিনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাসক নিযুক্ত করেন।

মধ্য এশিয়ায় কুতায়বাকে নিয়োগ: ইয়াজিদ বিন মুহাল্লিব আবদুল মালিকের সময় ৭০১ খ্রিষ্টাব্দে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মধ্য এশিয়া অভিযানের বিজয়ী সেনাপতি। প্রথম দিকে হাজ্জাজ ও ইয়াজিদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু ইয়াজিদের হিমারীয়ঘেঁষা নীতির কারণে হাজ্জাজ তার ওপর ক্ষিপ্ত হন। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অপব্যবহারের অভিযোগ এনে হাজ্জাজ ইয়াজিদ ও তার ভাইকে কারারুদ্ধ করেন। পরে আল ওয়ালিদের ভাই জেরুজালেমের ওয়ালি সুলায়মান তাদেরকে মুক্ত করেন। হাজ্জাজ ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে কুতায়বা বিন মুসলিমকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ওয়ালিদের ভাই মাসলামাহকে এশিয়া মাইনরে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তার নেতৃত্বে এশিয়া মাইনরের বিশাল অঞ্চল আরব মুসলিমদের অধিকারে আসে।

খলিফা আল ওয়ালিদের খিলাফত সম্প্রসারণ

ইসলামের ইতিহাসে বিজেতা হিসেবে খলিফা আল ওয়ালিদ বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। পি. কে. হিট্টির মতে, "খলিফা ওমর (রা) ও ওসমান (রা)-এর আমলে সিরিয়া, ইরাক, পারস্য ও মিসর বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। এখন আবদুল মালিক ও ওয়ালিদের অধীনে আবার মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের

দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়।" আল ওয়ালিদ তার পিতার মতো সুদক্ষ ও বীরযোদ্ধা ছিলেন না। তবে সৌভাগ্যক্রমে তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, কুতায়বা-বিন মুসলিম, মুসা-বিন-নুসায়ের ও তারিক বিন জিয়াদের মতো কয়েকজন সুদক্ষ সেনাপতির সহযোগিতা লাভ করেন। দশ বছরের রাজত্বকালে কয়েকজন সুযোগ্য সেনানায়কের সহযোগিতায় খলিফা প্রথম ওয়ালিদ মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে মধ্য এশিয়ার ফারগানা থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

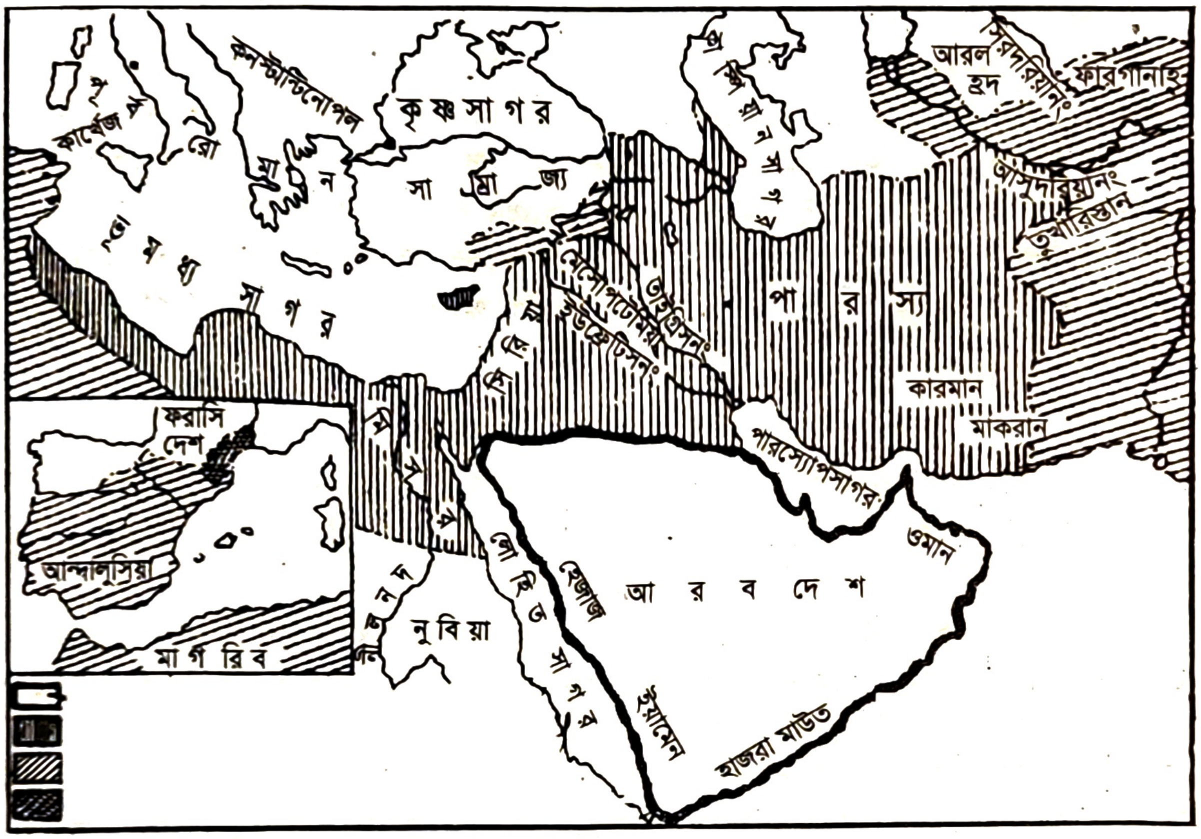
কন্সটান্টিনোপল
কৃষ্ণসাগর
কার্থেজ
রোমান সাম্রাজ্য
ভূমধ্যসাগর
কাস্পিয়ান সাগর
আরল হ্রদ
সিরদরিয়া নং
ফারগানা
আমুদরিয়া নং
তুখারিস্তান
মেসোপটেমিয়া
তাইগ্রিস নং
ইউফ্রেটিস নং
পারস্য
সিরিয়া
কারমান
মাকরান
ফরাসি দেশ
আন্দালুসিয়া
মাগরিব
মিশর
পারস্যোপসাগর
ওমান
নীলনদ
নুবিয়া
লোহিত সাগর
হিজাজ
আরব দেশ
ইয়েমেন
হাজরা মাউত

খলিফা আল ওয়ালিদের সাম্রাজ্য

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল ওয়ালিদ কত খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন?
২. কার রাজত্বকাল উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলে খ্যাত?
৩. খলিফা আল ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা কে ছিলেন?
৪. কার নেতৃত্বে এশিয়া মাইনরের বিশাল অঞ্চল আরব মুসলিমদের অধিকারে আসে?
৫. কুতায়বা বিন মুসলিম, মুসা বিন নুসায়ের ও তারিক বিন জিয়াদ কোন খলিফার সেনাপতি ছিলেন?
৬. খলিফা আল ওয়ালিদ ইসলামের ইতিহাসে কী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সিংহাসন লাভের পর খলিফা আল ওয়ালিদের প্রাথমিক কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে ছকে উল্লেখ করো।

পাঠ ১১ ও ১২

খিলাফত সম্প্রসারণে খলিফা আল ওয়ালিদের অভিযানসমূহ

The Expeditions of Khalifa Al Walid in the Expansion of the Khilafat

মধ্য এশিয়া বিজয় (৭০৫-৭১৪ খ্রি.)

খলিফার সুযোগ্য পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে কুতায়বা বিন মুসলিমকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলে মধ্য এশিয়ায় মুসলিম রাজ্য বিস্তারে নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়। খলিফা আবদুল মালিকের রাজত্বকালে ইবনুল আসাত, মুহাল্লিব ও ইয়াজিদ প্রমুখ সেনাপতি মধ্য এশিয়ার কিছু অংশ উমাইয়া সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ট্রান্স অক্সিয়ানায় বসবাসকারী তুর্কিরা বিদ্রোহ করে মুসলিমদের অতিষ্ঠ করে তুললে খলিফার নির্দেশে কুতায়বা ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে ৫৪০০০ সৈন্যের বাহিনীসহ তুখারিস্তান, বলখ ও ফারগানার দিকে অগ্রসর হন। তিনি এখানে চীন সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্রকে পরাজিত করে পাইকুন্দ নামক একটি বাণিজ্যকেন্দ্র দখল করেন। পরবর্তী বছর কুতায়বা পুনরায় বুখারার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বুখারার রাজা ওয়ারদান দুইদিন যুদ্ধের পর পলায়ন করলে মুসলিম বাহিনী বুখারায় প্রবেশ করে কিন্তু নগরে ঢুকতে ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার জন্য হাজ্জাজ কুতায়বাকে নতুন করে বুখারা আক্রমণের নির্দেশ দেন। কুতায়বা তামিম গোত্রের সাহায্য নিয়ে বুখারা অবরোধ করেন এবং সম্মিলিত আক্রমণে বুখারা নগরী উমাইয়াদের দখলে আসে। পরবর্তী সময়ে (৭০৬-৭০৯ খ্রি.) বুখারার পার্শ্ববর্তী প্রদেশটিও উমাইয়াদের অধিকারে এসেছিল।

এরপর কুতায়বা ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে আমু দরিয়া নদী (Oxus) অতিক্রম করে খাওয়ারিজমে পৌঁছলে সেখানকার শাহ খলিফার বশ্যতা স্বীকার করে তার সাথে সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এরপর তিনি সমরখন্দ দখল করেন। কুতায়বা ৭১০-৭১৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে খোজান্দা, শাশ, তাসখন্দ এবং ফারগানা দখল করে চীন সীমান্তে পৌঁছান। ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাশগড় জয় করে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ইতোমধ্যে খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যু হলে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। ইসলামের ইতিহাসে মধ্য এশিয়া বিজয় একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যময় ঘটনা। কেননা এ বিজয়ের ফলে সেখানকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তুর্কি ও মোঙ্গলরা ক্রমশ ইসলাম গ্রহণ করে। মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা চীন সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়।

সিন্ধু বিজয় (৭১২ খ্রি.)

উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) খিলাফত লাভের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সাম্রাজ্যের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময় পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশপাল হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উৎসাহ ও প্রেরণায় তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবরা ভারতের সিন্ধুতে অভিযান পরিচালনা করে।

সিন্ধু অভিযানের কারণসমূহ: আরবদের সিন্ধু বিজয় এক যুগান্তকারী ও চমকপ্রদ ঘটনা। আরবদের সিন্ধু অভিযানের পেছনে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ এ দু'ধরনের কারণই সক্রিয় ছিল।

পরোক্ষ কারণ: আরবদের সিন্ধু অভিযানের বেশ কিছু পরোক্ষ কারণ ছিল।

প্রথমত, আরবদের সিন্ধু বিজয় ছিল উমাইয়াদের সম্প্রসারণবাদী রাজ্যবিস্তার নীতিরই অংশ। অতুলচন্দ্র রায় বলেন, "ভারতের বাইরে সামরিক সাফল্য আরবদের রাজ্যগ্রাসী করে তুলেছিল এবং ভারত আক্রমণের পশ্চাতে তাদের লক্ষ্য ছিল রাজ্যবিস্তার করা।"

দ্বিতীয়ত, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হাতছানি আরবদের সিন্ধু অভিযানের অন্যতম কারণ ছিল। ভারতের ধনৈশ্বর্য লাভ করার জন্য মুসলিম খলিফারা ইতোপূর্বে বেশ কিছু অভিযান প্রেরণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সিন্ধু অভিযান চালানো হয় বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

তৃতীয়ত, সিন্ধুরাজসহ ভারতীয় রাজন্যবর্গের মুসলিমবিরোধী বৈরী মনোভাব ও উস্কানি মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ অবস্থায় সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সিন্ধু আক্রমণ প্রয়োজন ছিল।

চতুর্থত, মুসলমানদের পারস্য অভিযানকালে সিন্ধুরাজ সৈন্য দিয়ে পারসিকদের সহযোগিতা করেছিলেন। সিন্ধুরাজের এ কাজের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানরা সিন্ধু আক্রমণ করে।

পঞ্চমত, সিন্ধুরাজ দাহির একদল বিদ্রোহী আরবকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে খলিফা ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরকে সমুচিত শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে সিন্ধু অভিযান পরিচালনা করেন।

ষষ্ঠত, সিন্ধু অভিযানের পেছনে ধর্মীয় অনুপ্রেরণারও বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

সপ্তমত, 'চাচনামা' গ্রন্থ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়, রাজা দাহিরের শাসনামলে সিন্ধুতে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা চলছিল। সিন্ধুর এ দুর্বলতার সুযোগে নিজেদের সাফল্যের সম্ভাবনা দেখায় আরব মুসলমানরা সিন্ধু অভিযানে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

প্রত্যক্ষ কারণ: সাম্রাজ্যবাদী শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উপরে আলোচিত কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ধু আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তবে সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যুদের মুসলমানদের ৮টি জাহাজ লুটের ঘটনা ছিল সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ। জানা যায়, সিংহলের (শ্রীলঙ্কা) রাজা আটটি উপঢৌকনপূর্ণ জাহাজ খলিফা ওয়ালিদ ও হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এসব জাহাজে সিংহলে পাঠান বাণিজ্যরত মৃত আরব বণিকদের পরিবার-পরিজনও ছিল। যাত্রাপথে জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে উপস্থিত হলে সেগুলো জলদস্যুরা লুট করে। হাজ্জাজ রাজা দাহিরের কাছে এর ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। দাহিরের ঔদ্ধত্যে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু অভিযানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

সিন্ধু অভিযানের ঘটনা

খলিফা ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে ওবায়দুল্লাহ ও বুদায়েল নামক দু'জন সেনাপতির নেতৃত্বে সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে পরপর দু'টি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তার দু'টি অভিযানই ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় হাজ্জাজ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তার জামাতা সতেরো বছর বয়সী তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে পুনরায় অভিযান প্রেরণ করেন। সাহসী বীর সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম ৬০০০ সিরীয় ও ইরাকি সৈন্য, ৬০০০ উষ্ট্রারোহী এবং ২০০০ রসদবাহী উষ্ট্র নিয়ে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুর দিকে যাত্রা করে মাকরানে উপস্থিত হওয়ার পর এখানকার শাসনকর্তা হারুনের সহায়তায় তিনি ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে দেবল বন্দর আক্রমণ করেন। রাজা দাহিরের নির্যাতনে অতিষ্ঠ স্থানীয় জাঠ ও মেঠদের অনেকেই আরব বাহিনীতে যোগ দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। ফলে মুসলিম বাহিনী সহজেই দেবল জয় করতে সক্ষম হয়।

দেবল অধিকারের পর মুসলিম বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় নিরুন, সিহরাওয়ান এবং সিস্তান জয় করে। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী দাহিরের বাহিনীর সাথে রাওয়ারে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হন। মুসলিম বাহিনীর হাতে রাওয়ার দুর্গের পতন ঘটলে দাহির পত্নী রানিবাঈ প্রাসাদের অন্য নারীদের নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেন। রাওয়ার জয়ের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ আক্রমণ করেন এবং জয়সিংকে পরাজিত করে ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী সিন্ধুর রাজধানী আলোর জয় করে। রাজধানী আলোর অধিকারের পর সিন্ধু শক্তির শেষ উৎস সমৃদ্ধ নগরী মুলতান অবরোধ করেন বিন কাসিম। তীব্র প্রতিরোধ মোকাবিলা করে ৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী মুলতান জয় করে। মুলতান বিজয়ের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম কনৌজ জয়ের পরিকল্পনা নেন। কিন্তু অভিযানের আগে খলিফা ওয়ালিদ তাকে রাজধানী দামেস্কে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু এবং সিন্ধুর পরবর্তী অবস্থা

ঐতিহাসিক আলী বিন হামিদের মতে, মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরের দুই কন্যা সুরুজ দেবী ও পরিমল দেবীকে বন্দি করে খলিফা ওয়ালিদের দরবারে প্রেরণ করলে তারা খলিফার কাছে অভিযোগ করে যে, সেনাপতি তাদের সাথে অশালীন আচরণ করেছে। এতে খলিফা রাগান্বিত হয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে লবণ মাখানো গরুর চামড়ায় সেলাই করে রাজধানীতে হাজির করার নির্দেশ দেন। এভাবে আনার সময় রাস্তায় সেনাপতির মৃত্যু হয়। পরে রাজকুমারীদ্বয় তাদের অভিযোগ মিথ্যা বলে

জানায়। এতে খলিফা খুবই মর্মাহত হন। তিনি রাজকুমারীদের মৃত্যুদণ্ড দেন। রাজকুমারীদ্বয়কে ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে রাজপথে তাদের দণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু ইবনে খালদুন ও বালাজুরি এবং আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, এ বর্ণনা সত্য নয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম খলিফা সুলায়মান কর্তৃক কারাবুন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বালাজুরির বর্ণনা মতে, বিন কাসিমের মৃত্যুর পর সিন্ধুবাসী অশ্রু বিসর্জন করেছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম মাত্র সোয়া তিন বছর সিন্ধুতে অবস্থান করে ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান এবং তার মৃত্যুর পর ৭৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সিন্ধুদেশে আরবদের আধিপত্য বজায় ছিল। পরবর্তী সময়ে সেখানে আরব প্রাধান্য লোপ পায়। কারণ— ১. খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যুর পর পরবর্তী খলিফারা সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি বর্জন করে সাম্রাজ্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন, ২. সিন্ধুদেশ ছিল অনুর্বর। এটা দখলে রাখা লাভজনক নয় বলে আরবরা এর প্রতি উদাসীন ছিলেন, ৩. স্থানীয় হিন্দুরা আরবদেরকে সবসময় বিদেশি শত্রু বলে মনে করত। তাদের ধর্ম ও রীতিনীতির সাথে আরবদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এরূপ পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতি এবং শক্তিশালী যোদ্ধা জাতি রাজপুতদের প্রবল বিরোধিতার জন্য সিন্ধুতে আরবদের দীর্ঘ সময় অবস্থান করা সম্ভবপর হয়নি। তারা সেখানে শিয়া-সুন্নি প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া তারা একমত হয়ে কোনো কাজ করতে পারেনি। ফলে সমগ্র সিন্ধুদেশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ও গুরুত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ঐতিহাসিক টড, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং মোহাম্মদ মোহর আলী প্রমুখ ইতিহাসবিদ আরবদের সিন্ধু বিজয়কে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন। স্ট্যানলি লেনপুল এবং ঈশ্বরী প্রসাদ প্রমুখের মতে, ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে এ বিজয়ের বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। লেনপুল বলেন, ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি অধ্যায়মাত্র। এ বিজয়ের কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। (The Arab conquest of Sind is an episode in the history of India and of Islam, a triumph without results- S. Lanepoole) সামগ্রিকভাবে সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল হলো—

রাজনৈতিক ফলাফল: সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল বিবেচনা করলে স্ট্যানলি লেনপুল ও ঈশ্বরী প্রসাদের উপরের মন্তব্য সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় ভারতে রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। আরব আধিপত্য কেবল সিন্ধু ও মুলতানের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল। এজন্য সম্ভবত এ বি এম হবিবুল্লাহও সিন্ধু বিজয়কে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যহীন বলেছেন। তবে সিন্ধু বিজয়কে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ভারতের ইতিহাসে 'একটি অধ্যায়' বলাটা একেবারে সংগত বলে মনে হয় না। কারণ সিন্ধু বিজয় তাৎক্ষণিকভাবে ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও আরব বিজয়ের পথ ধরেই গজনভি ও ঘুরিরা ভারতে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল হন।

ধর্মীয় ফলাফল: এ. এল. শ্রীবাস্তব উল্লেখ করেছেন, 'সিন্ধু বিজয়ের সূত্র ধরে ভারতবর্ষে ইসলামের বীজ রোপিত হয়েছিল।' টমাস আরনল্ড বলেন, ধর্মপ্রচারক ও বণিকদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে ইসলামের প্রসার ঘটে।

অর্থনৈতিক ফলাফল: ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সিন্ধু ছিল অপেক্ষাকৃত অনুর্বর। এখান থেকে সরাসরি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব ছিল না। তবে এ বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিসর বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক ফলাফল: আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে মুসলমানরা হিন্দুদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আরব মুসলমানদের অনেকে বিজিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং স্থানীয় নারীদের বিয়ে করে। আরব বসতি ও আন্তঃবিবাহের ফলে আরবদের মধ্যে সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি প্রবেশ করে। অন্যদিকে, সিন্ধুবাসীর জীবনেও অনেক আরবীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পড়ে। আর্য ও সেমিটিক জাতির সংমিশ্রণে নতুন জাতির উদ্ভব ঘটে।

সাংস্কৃতিক ফলাফল: সিন্ধু বিজয়ের সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ প্রসঙ্গে হ্যাভেল বলেন, "রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয় তুলনামূলকভাবে তাৎপর্যহীন ঘটনা ছিল। কিন্তু সামগ্রিক ইসলামি সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিবেচনায় এ বিজয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ ছিল উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি। দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, সংগীত, স্থাপত্য, চিত্রশিল্পে ভারতীয়দের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের এসব শাখার সাথে আরব মুসলমানদের পরিচয় ঘটে এবং তা আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাব মুসলিম জ্যোতির্বিদ্যায় পরিলক্ষিত হয়।" পি. কে. হিট্টির মতে, "ভারতীয় গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত'-এর প্রভাব মুসলিম জ্যোতির্বিদ্যায় ওপর পড়ে। ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়।" ভারতীয়দের কাছ থেকেই আরবরা গাণিতিক সংখ্যা 'শূন্য, এর সাথে পরিচিত হয়। আব্বাসি শাসনামলে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু মূল্যবান ভারতীয় ভেষজ বিষয়ক গ্রন্থের সাথেও মুসলমানরা পরিচিত হয়।

আরব মুসলমানরাই কেবল ভারতীয়দের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, বরং ভারতীয়রাও আরবদের ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মুসলমানদের মাধ্যমে ভারতীয়দের সামনেও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের এক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। হিন্দু-মুসলমান ভাববিনিময় ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে নতুন সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত হয়। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "একেশ্বরবাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মুসলমানরা হিন্দু সমাজে একটি অভিনব স্পৃহা প্রবর্তন করেন।"

সুতরাং বলা যায়, আরবদের সিন্ধু বিজয় নিষ্ফল নয়। এ বিজয়ের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ বিজয়ের ফলেই ইন্দো-মুসলিম সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়।

উত্তর আফ্রিকা বিজয়

খলিফা আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর ওয়ালিদের শাসনামলে বার্বাররা মুসলমানদের বশ্যতা মানতে চায়নি বলে ওয়ালিদ ৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে মুসা বিন নুসায়েরকে আফ্রিকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। নতুন শাসনকর্তার বীরত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতাহেতু রোমানদের প্ররোচনায় বার্বারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মুসা তা কঠোর হস্তে দমন করেন এবং বার্বারদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করে তাদের শ্রদ্ধা এবং আস্থা অর্জন করেন। রোমানদের উস্কানিতে বার্বারা বারবার বিদ্রোহী হয়ে উঠত বলে মুসা রোমানদের সমগ্র উত্তর আফ্রিকা থেকে তাড়িয়ে দেন। ফলে মরক্কো এবং তাঞ্জিয়ারসহ সমগ্র আফ্রিকাতে শান্তি স্থাপিত হয় এবং মুসলিম শাসন সুদৃঢ় হয়। ভূমধ্যসাগরের দ্বীপসমূহ থেকে রোমানরা আরবদের উপনিবেশগুলোতে মাঝে মাঝে হামলা করত বলে মুসা সেগুলো দখল করার জন্য নৌপথে আক্রমণ চালান। তিনি রোমানদের কাছ থেকে মের্জকা, মিনর্কা, ইভিকা প্রভৃতি দ্বীপ জয় করে মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খলিফা আল ওয়ালিদের সময় মধ্য এশিয়া জয় করেন কে?
২. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু বিজয় করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
৩. মুসলিম অভিযানের সময় সিন্ধুর রাজা কে ছিলেন?
৪. সিন্ধুর কোন বন্দরে মুসলিম জাহাজ লুট হয়েছিল?
৫. আরবদের সিন্ধু বিজয় কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল?
৬. কোন মুসলিম সেনাপতি উত্তর আফ্রিকা জয় করেন?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

দুটি দলে ভাগ হয়ে খলিফা আল ওয়ালিদের সময়কার সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কিত দুটি স্লাইড তৈরি করো।

পাঠ ১৩

উমাইয়াদের স্পেন বিজয় (৭১১ খ্রি.)
Conquest of Spain by the Umayyad (711 AD)

খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে আরব মুসলমানদের স্পেন বিজয় উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত স্পেন এ সময় নানা নামে পরিচিত ছিল। কারও কাছে এটি ছিল 'আইবেরীয় উপদ্বীপ' এবং আরব মুসলমানদের কাছে 'আন্দালুসিয়া'। উমাইয়াদের স্পেন বিজয় ছিল নাটকীয় ঘটনা। এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। যুদ্ধের ক্ষিপ্রগতি ও বিজয়ের পূর্ণ সফলতার জন্য পি. কে. হিট্টি স্পেন অভিযানকে 'মধ্যযুগীয় সমর ইতিহাসে এক অপূর্ব স্থান দখলকারী ঘটনা' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উমাইয়াদের স্পেন অভিযানের সময় সেখানকার রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল চরম বিপর্যস্ত।

রাজনৈতিক অবস্থা: মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ভিসি গথিক বংশীয় রাজা রডারিকের কুশাসন ও কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার কারণে দেশের অভ্যন্তরে নানা শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। অভিজাত শ্রেণির মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, রাজনীতিতে যাজক শ্রেণির হস্তক্ষেপ ও অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার, সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলেছিল।

সামাজিক অবস্থা: উমাইয়া অভিযানের প্রাক্কালে স্পেনের সমাজ অভিজাত শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও নিম্নবিত্ত শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। অভিজাত শ্রেণিতে ছিলেন রাজা, উচ্চ অমাত্যবর্গ, ধর্মযাজক ও সামন্ত প্রভুগণ। প্রকৃতপক্ষে এরাই ছিলেন শাসক শ্রেণি। আর বাকি সবাই ছিলেন শাসিতের দলে। শাসিতদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও নিম্নবিত্তদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। অভিজাত শ্রেণির লোকেরা করভার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। অন্যদিকে, দরিদ্র নিম্নশ্রেণির লোকেরা করভারে ন্যুজ হয়ে পড়েছিল। এককথায় বলতে গেলে নিম্নশ্রেণির সার্ফ (ভূমিদাস) বর্গাদার, ক্রীতদাস ও ইহুদিদের ভাগ্য অভিজাত শ্রেণির ইচ্ছাধীন ছিল। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, 'ভূমিদাস হোক বা ক্রীতদাস হোক মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের স্বাধীনতা লাভ বা মুক্ত সূর্যালোক ভোগ করার আশা ছিল না।'

অর্থনৈতিক অবস্থা: তখন স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থাও সুখকর ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা এমনকি কৃষি ব্যবস্থার প্রতি শাসক শ্রেণির সীমাহীন উপেক্ষা ও উদাসীনতা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে ফেলে। এরূপ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় অর্থের যথেচ্ছ অপব্যবহার, সম্পদের সুষম বণ্টনে কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়া, নিবর্তনমূলক করারোপ ইত্যাদি স্পেনের অর্থনীতিকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। আর্থিক দৈন্যে নিপতিত প্রজাকূলের সুযোগ-সুবিধার প্রতি শাসকগোষ্ঠীর সীমাহীন উদাসীনতার কারণে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় অবস্থা: সে সময় স্পেনের রাজধর্ম ছিল খ্রিষ্ট। পরধর্মের প্রতি চরম অসহিষ্ণু সেখানকার খ্রিষ্টানরা ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি প্রচণ্ড আক্রোশপরায়ণ ছিলেন। ভিসি গথিক শাসনে ইহুদিদের কেবল স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনেই বাধা দেওয়া হতো না, তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনেও কোনো স্বাধীনতা ছিল না। সামান্য অপরাধে তাদের হত্যা এবং ধর্মান্তকরণের মতো ঘৃণ্য শাস্তি প্রদান করা হতো। এস. এম. ইমামুদ্দিন এর মতে, ৬১২-৬২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে স্পেনে ৯০ হাজার ইহুদিকে বলপূর্বক খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তকরণ করা হয়েছিল।

স্পেন বিজয়ের কারণ

স্পেন বিজয়ের পেছনে খলিফা আল ওয়ালিদ এবং তার সেনাপতি মুসা বিন নুসায়েরের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে কাজ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এর পেছনে আরও কারণ ছিল।

প্রথমত, এ সময় স্পেনের রাজা ছিলেন গথিক রাজবংশীয় শেষ রাজা রডারিক। তিনি ছিলেন প্রজানিপীড়ক ও দুরাচারী শাসক। তার কুশাসনে অতিষ্ঠ ভূমিদাস, ক্রীতদাস এবং ইহুদি সম্প্রদায় মুক্তির জন্য অধীরভাবে প্রহর গুণছিল। এ সময় জিব্রালটারের দক্ষিণ পার্শ্বে আরব মুসলিম শাসনাধীনে উত্তর আফ্রিকায় সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সংবাদ তাদের কানে এসে পৌঁছেছিল। ঐতিহাসিকদের তথ্যানুযায়ী স্পেনের নিপীড়িত মানুষ তখন তাদের মুক্তির জন্য মুসা বিন নুসায়েরের দ্বারস্থ হলে তিনি তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে যান।

দ্বিতীয়ত, আরব মুসলিম শাসিত উত্তর আফ্রিকার একেবারে কাছে সিউটা দ্বীপের শাসনকর্তা ছিলেন কাউন্ট জুলিয়ান। তিনি ছিলেন রাজা রডারিক কর্তৃক বলপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত স্পেনের রাজা উইটিজার জামাতা। শ্বশুর উইটিজাকে সিংহাসনচ্যুত করে ক্ষমতা দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজা রডারিকের সাথে কাউন্ট জুলিয়ানের বৈরী সম্পর্ক ছিল। তদুপরি রাষ্ট্রীয় প্রথা অনুযায়ী তিনি তার কন্যা ফ্লোরিন্ডাকে রাজকীয় আদব-কায়দা শেখানোর জন্য রাজপ্রাসাদে পাঠালে রডারিক ফ্লোরিন্ডার শ্লীলতাহানি করে। এ ঘটনায় উভয়ের মধ্যকার শত্রুতা চরম আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় শ্বশুর হত্যা ও কন্যার অপমানের প্রতিশোধ নিতে কাউন্ট জুলিয়ান পশ্চিমাঞ্চলীয় ইফরিকিয়ার শাসনকর্তা মুসা বিন নুসায়েরকে স্পেন আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান।

স্পেন অভিযানের ঘটনা

স্পেনের নিপীড়িত জনগণ এবং কাউন্ট জুলিয়ানের আবেদনে সাড়া দিয়ে মুসা বিন নুসায়ের খলিফা আল ওয়ালিদের অনুমতি নিয়ে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে স্পেনে অভিযান প্রেরণ করেন। তারিক জিব্রালটার প্রণালী পাড়ি দিয়ে স্পেনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের এক পর্বতে অবতরণ করেন। তার নামানুসারে এ পর্বতের নামকরণ করা হয় 'জাবাল আত তারিক' বা তারিকের পাহাড়। এখান থেকে মুসলিম সেনাদল স্পেনের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করে। রাজা রডারিক ১,২০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল সেনাদল নিয়ে মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করেন। গোয়াডলকুইভার নদীর তীরবর্তী মেডিনা-সিডোনিয়ায় তারিকের নেতৃত্বাধীন মাত্র ১২,০০০ সৈন্য রডারিকের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে স্পেনীয় রাজকীয় বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। পালিয়ে যাওয়ার সময় রাজা রডারিক নদীতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী সিডোনিয়া, কারমোনা এবং ইসিজা জয় করে স্পেনে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর উমাইয়া সেনাবাহিনী মালাগা, কর্ডোভা, গ্রানাডা ও টলেডো জয় করে। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুসা বিন নুসায়ের স্পেনে পৌছান। তার এবং তারিকের নেতৃত্বে আরব মুসলিম সেনাবাহিনী একে একে সারাগোসা, আরগন, বার্সেলোনা, লিওন, গ্যালিসিয়া, কাতালোনিয়া প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে। বর্তমান পর্তুগাল জয় করে তারা এর নাম দেন 'আল গারব'। বিজয় গৌরবে উদ্দীপ্ত হয়ে এরপর মুসা বিন নুসায়ের ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনা নেন। তবে এ সময় রাজধানী দামেস্ক থেকে খলিফা ওয়ালিদ তাকে ডেকে পাঠালে ফ্রান্স অভিযান পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। রাজধানীতে ফেরার আগে মুসা তার পুত্র আবদুল আজিজকে বিজিত স্পেনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

স্পেন বিজয়ের ফলাফল

খলিফা ওয়ালিদের স্পেন বিজয় ইসলামের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। স্পেনের রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের ওপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

রাজনৈতিক: স্পেন বিজয়ের ফলে ইউরোপে ইসলাম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেভিলকে রাজধানী করে মুসলমান শাসকেরা স্পেনে একটি সুসংহত রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। স্পেনের রাজনীতিতে রাজা, ধর্মযাজক এবং সামন্ত অভিজাত শ্রেণির যে প্রভাববলয় তৈরি হয়েছিল নতুন প্রশাসনের আওতায় তার বিলুপ্তি ঘটে। শোষিত-নিপীড়িত সাধারণ মানুষ মুক্তির আস্বাদন লাভ করে।

সামাজিক: আরবদের স্পেন বিজয় সেখানকার সামাজিক জীবনে এক বিপ্লব ঘটায়। সমাজ থেকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের অবসান ঘটে। জনগণের মানবিক অধিকার নিশ্চিত হয়। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ফলে সুবিধাভোগী অভিজাত ও যাজক শ্রেণির দৌরাত্ম্যের অবসান ঘটে। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্থনৈতিক: আরবদের বিজয়ের ফলে স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম শাসকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কৃষির উন্নতি বিধান করা হয়। নিম্নশ্রেণির লোকদের করভার লাঘব করা হয়। মুসলমানরা সিরিয়া এবং মিসর থেকে নতুন নতুন ফসলের চারা স্পেনে নিয়ে যায় এবং চাষাবাদ করে। অনেক পতিত জমি চাষাবাদের উপযোগী করে তোলা হয়। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে স্পেন ক্রমশ অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়।

সাংস্কৃতিক: উমাইয়াদের স্পেন বিজয়ের সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলিম শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেন সমকালীন ইউরোপের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। বলা হয় যে, মুসলিম স্পেন ইউরোপকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান দেয়। ফলে ইউরোপে নবজাগরণের সূচনা হয়। মুসলিম স্পেনের পরবর্তী রাজধানী কর্ডোভা 'ইউরোপের বাতিঘর' নামে খ্যাতি লাভ করে। ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল বলেন, "মুরদের (Moor-স্পেনের আরব মুসলমান) প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা রাজ্য মধ্যযুগের এক পরম বিস্ময়। সমগ্র ইউরোপ যখন বর্বর, অন্তর্দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত, এ রাজ্য তখন পাশ্চাত্যের সম্মুখে উজ্জ্বল আলো বিকিরণকারী জ্ঞান ও সভ্যতার মশাল তুলে ধরেছিল।"

ধর্মীয়: আরবদের বিজয়ের ফলে স্পেনের ধর্মীয় ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের সুবাতাস প্রবাহিত হয়। বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের কু-রীতির অবসান ঘটে। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলমানরা স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ লাভ করে। মুসলিম শাসনামলে নতুন গির্জা নির্মাণে কোনো বাধা প্রদান করা হয়নি এবং উপাসনার জন্য গির্জায় ঘণ্টা বাজানোতেও কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। সর্বত্র ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বিরাজ করে।

আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে আরবদের স্পেন বিজয় ইসলামের তথা ইউরোপের ইতিহাসের এক চমকপ্রদ ঘটনা। সৈয়দ আমীর আলীর ভাষায়, 'স্পেনে মুসলিম শাসন থেকে আধুনিক যুগের শাসকদের শিক্ষা গ্রহণ করার অনেক বিষয় আছে।' প্রায় আটশত বছর মুসলমানরা গৌরবের সাথে স্পেন শাসন করে। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আরব মুসলমানদের কাছে স্পেন কী নামে পরিচিত?
২. স্পেন কোথায় অবস্থিত?
৩. মুসলমানরা কত খ্রিষ্টাব্দে স্পেন জয় করে?
৪. স্পেন বিজয়ী মুসলিম বীর কে ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
৫. মুসলমানদের অভিযানের সময় স্পেনের রাজা কে ছিলেন?
৬. রাজা রডারিক কোন বংশের শাসক ছিলেন?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের আগে সেখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছক আকারে লেখো।
২. মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের কারণ চিহ্নিত করে একটি চার্ট তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ফলাফল নিয়ে একটি স্লাইড তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে উপস্থান করো।

পাঠ ১৪

খলিফা আল-ওয়ালিদের চরিত্র ও কৃতিত্ব
Character and Achievements of Khalifa Al-Walid

খলিফা আল-ওয়ালিদ পিতা আবদুল মালিকের মতো একজন সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তার সময় ইসলামি সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। পি. কে. হিট্টি বলেন, "উমাইয়া বংশের সবচেয়ে বড় নির্মাতা ছিলেন আবদুল মালিকের পুত্র আল-ওয়ালিদ, যার শাসনামলে তুলনামূলক শান্তি এবং সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল।"[২৬]

চরিত্র

রাজোচিত গুণের অধিকারী: খলিফা ওয়ালিদ ৯ বছর ৭ মাস শাসন করে ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার মধ্যে অনেক রাজোচিত এবং শ্রদ্ধা উদ্রেককারী গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি গৌরবর্ণ, দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। ওয়ালিদ কূটনৈতিক দক্ষতা ও মৌলিকতার দিক থেকে পিতার সমকক্ষ না হলেও বিজেতা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাতা, নির্মাতা ও অন্যান্য অনেক রাজোচিত গুণের অধিকারী ছিলেন।

দয়ালু ও সুযোগ্য শাসক: ঐতিহাসিক মাসুদি ও ইবনুল আসিরের মতে, আল-ওয়ালিদ ছিলেন স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী। ঐতিহাসিক উইল (Weil) বলেন, 'যদিও মুসলমান ঐতিহাসিকেরা হাজ্জাজকে সমর্থন করার জন্য তাকে স্বেচ্ছাচারী বলে অভিহিত করেন, তবুও আমাদের দৃষ্টিতে তিনি আমিরুল মুমিনিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও যোগ্যতম ছিলেন।'[২৭] সৈয়দ আমীর আলীর মতে, ওয়ালিদ যে তার পিতামহ মারওয়ান এবং পিতা আবদুল মালিক অপেক্ষা দয়ালু ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটা নিশ্চিত যে, তার বংশের অনেকের চেয়ে তিনি অনেক হৃদয়বান ছিলেন।

আদর্শ ও বিচক্ষণ শাসক: খলিফা প্রথম ওয়ালিদ পরোপকারী, মহানুভব ও আদর্শ খলিফা হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখেছেন। অন্যদিকে, তিনি বিচক্ষণ, দূরদর্শী, কর্তব্যপরায়ণ, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন শাসক ছিলেন। তার আমলে বিজিত ভারত ও স্পেনের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেন। শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ, স্থাপত্যশিল্পের উন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভের জন্য তার শাসনকালকে উমাইয়া বংশের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।

কৃতিত্ব

শাসনকর্তা পদে নিয়োগ ও রদবদল: খলিফা আল-ওয়ালিদ তার পিতার নীতি অনুসরণ করেন। পিতার নির্দেশমতো হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা পদে বহাল রাখেন। তিনি পিতৃব্য পুত্র ধর্মপ্রাণ ওমর বিন আবদুল আজিজকে হেজাজের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। সেখানে ওমর বিন আবদুল আজিজ প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং এটির পরামর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

রাজ্য বিস্তার: ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, 'খলিফা ওমর ও ওসমানের আমলে সিরিয়া, ইরাক, পারস্য এবং মিসর বিজয়ের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর আবদুল মালিক এবং আল-ওয়ালিদের অধীনে আবার মুসলিম সাম্রাজ্য বিজয়ের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়।'[২৮] আল-ওয়ালিদ হাজ্জাজ, কোতায়বা, তারিক ও মুসার মতো বিখ্যাত

---

[২৬] The greatest Umayyad builder, however was al-Walid, son of Abd-al-Malik, whose rule was one of comparative peace and opulence. –Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 221

[২৭] Although Mussulman historians, because of his supporting Hajjaj, call Walid a tyrant, he is in our eyes, the greatest and in every respect the most powerful and illustrious ruler amongst all the Commanders of the Faithful.

[২৮] The acquisition of Syria, Iraq, Persia and Egypt under Umar and Othman brought to an end the first stage in the History of Moslem conquest, the second now begins under Abdul Malik and Al Walid –Ref: *History of the Arabs*, p. 206

রণনিপুণ সেনাপতিদের সাহায্য লাভ করেছিলেন এবং তাদের অসাধারণ শৌর্য-বীর্য এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বহুস্থানে আরব অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা ওয়ালিদের ভাই মাসলামা ও পুত্র আব্বাসের সহায়তায় কোতায়বা মধ্য এশিয়ার বোখারা, সমরখন্দ দখল করেন। ৭১০-৭১৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোতায়বা খোজান্দা, তাসখন্দ ও ফারগানা দখল করে চীন সীমান্তে পৌছেন। ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাশগড় জয় করে সমগ্র মধ্য এশিয়া অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদিকে সিন্ধুর রাজা দাহিরের ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আদেশে সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু অধিকার করেন। অন্যদিকে, সেনাপতি মুসা মেয়র্কাসহ কয়েকটি নৌপথে আক্রমণ চালিয়ে মেয়র্কাসহ কয়েকটি দ্বীপ রোমানদের কাছ থেকে জয় করে মুসলিম শাসনভুক্ত করেন। ওয়ালিদের সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত ও নিহত করে স্পেন জয় করেন। এভাবে তার সাম্রাজ্য একদিকে আটলান্টিক থেকে পিরেনিজ এবং ভারতের সিন্ধু থেকে আরম্ভ করে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তাই ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেন, 'এমনকি ওমরের শাসন আমল বাদ না দিলেও এমন কোনো আমল ছিল না যখন ইসলাম বিদেশে এতটা সম্প্রসারিত ও সংহত হয়েছিল।'[২৯]

আরবীয় সামন্ত প্রথার উন্নতি: খলিফা আল-ওয়ালিদ আরবীয় সামন্ত প্রথার ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। তার সময়ে যে সব কৃষক গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরামর্শে আবার তাদেরকে গ্রামে ফিরিয়ে আনা হয়। এভাবে তিনি ইরাকের গ্রাম এবং কৃষি রক্ষা করেন। ভবিষ্যতে যেন কৃষকেরা আর গ্রাম ছেড়ে যেতে না পারে সে জন্য তিনি গ্রামগুলোকে চিহ্নিত করেন এবং খাল খননের মাধ্যমে অনুর্বর এলাকাগুলো উর্বর করে তোলার ব্যবস্থা করেন।

নৌবাহিনীর উন্নতি: সামরিক সংগঠক হিসেবেও খলিফা ওয়ালিদ ছিলেন উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তার আমলে মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রতিষ্ঠিত নৌবাহিনী চরম উন্নতি লাভ করেছিল। তিনি নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করেন এবং একে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। এর মধ্যে প্রথম ভাগকে সিরিয়ায়, দ্বিতীয় ভাগকে তিউনিশিয়ায়, তৃতীয় ভাগকে আলেকজান্দ্রিয়ায়, চতুর্থ ভাগকে ব্যাবিলনে এবং পঞ্চম ভাগকে নীলনদে রোমানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সার্বক্ষণিক প্রহরারত রাখেন।

শ্রেষ্ঠ নির্মাতা: খলিফা ওয়ালিদ একজন নির্মাতা হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি মক্কা-মদিনার মসজিদগুলোকে সুপরিসর ও সুশোভিত করে নির্মাণ করেন। তার আমলে সুন্দর সুন্দর সৌধ ও মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ওয়ালিদ দামেস্কের জুমা মসজিদ নির্মাণ করে বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন।

শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক: উমাইয়া বংশের মধ্যে আল-ওয়ালিদই সর্বপ্রথম সাহিত্য, কলা ও শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তৎকালীন খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ ইবনে সুরায়েজ এবং মাবাদ তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। ওয়ালিদ নিজেও একজন কবি ও কাব্যপ্রেমিক ছিলেন। কবি আল ফারাজদাক তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তিনি সভাকবির পদ অলংকৃত করেছিলেন। তার আমলে বসরা, কুফা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও কুরআন-হাদিসের আলোচনা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তার আমলে অসংখ্য সুন্দর সৌধ ও মসজিদ নির্মাণ করেন।

জনহিতকর কার্যাবলি: খলিফা ওয়ালিদ সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাস্তাঘাট তৈরি করেন এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য কূপ খনন করেন। তিনি সীমান্ত রক্ষার জন্য অনেক দুর্গও নির্মাণ করেন। ওয়ালিদের অনেক বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং অক্ষম ও দুর্বল লোকদেরকে বায়তুল মাল থেকে নির্দিষ্ট হারে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি অন্ধ,

---

[২৯] There is no other reign, not excepting even that of Omar, in which Islam so spread abroad and was consolidated.–Ref: William Muir, *The Chaliphate, It Rise, Decline and Fall*

পঙ্গু এবং উন্মাদদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে তাদের আহার, বাসস্থান ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। তিনি এতিম বালক-বালিকাদের লালন-পালন ও শিক্ষা দীক্ষার জন্য এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে হাটবাজার পরিদর্শন করে দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ করতেন।

ঐতিহাসিক মুর নির্মাণ বলেন, 'আদ্যোপান্ত আলোচনা করে দেখলে আমরা দেখব যে, খিলাফতের ইতিহাসে আল-ওয়ালিদের খিলাফতকাল অপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল খিলাফতকাল আর নেই।'[৩০] ঐতিহাসিক গিবন আল-ওয়ালিদের গুণাবলি ও কৃতিত্বের সার্বিক দিক মূল্যায়ন করে তাকে তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলে অভিহিত করেছেন। রাজ্য সম্প্রসারণ, প্রশাসনিক পুনর্গঠন, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলাসহ সার্বিক দিক বিবেচনা করে আল-ওয়ালিদের রাজত্বকালকে উমাইয়া খিলাফতের 'স্বর্ণযুগ' (Golden Age) বলা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল-ওয়ালিদ কত বছর রাজত্ব করেন?
২. কার সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে?
৩. আল-ওয়ালিদ নৌবাহিনীকে কয় ভাগে বিভক্ত করেন?
৪. দামেস্কের জুমা মসজিদ কে নির্মাণ করেন?
৫. উমাইয়া শাসকদের মধ্যে কে প্রথম সাহিত্য, কলা ও শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষকতা করেন?
৬. আল-ওয়ালিদ কত খ্রিষ্টাব্দে মারা যান?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আল ওয়ালিদের কৃতিত্বপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করে একটি চার্ট তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

মোহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ফুটবল জগতে আবির্ভূত হয়ে একের পর এক শিরোপা জিততে শুরু করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নামকরা খেলোয়াড়দের হাত ধরে বিদেশ থেকেও শিরোপা জয় করতে সক্ষম হয়। অবশ্যই এসব জয়ের পেছনে বর্তমান অধিনায়কের চেয়ে আগের অধিনায়কের ভূমিকাও কম নয়। কারণ বর্তমান অধিনায়ক একটি সংগঠিত দল পেয়েছিলেন।

১. উদ্দীপকের বর্তমান অধিনায়কের সাথে কোন দিক দিয়ে আল ওয়ালিদের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
২. আল ওয়ালিদের আগের খলিফা সাম্রাজ্য বিজয়ের পথকে সহজ করে দিয়েছে— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

---

[৩০] Looking at it from first to last, we shall not find in the annals of the Caliphate a more glorious reign than that of Al-Walid.
–Ref: Willium Muir, *The Chaliphate*

পাঠ ১৫

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জীবন ও কর্ম
The Life and Works of Hajjaj Bin Yusuf

পরিচয় ও কর্মজীবন

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন আরব প্রশাসক, রাজনীতিবিদ ও উমাইয়া খিলাফতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তিনি বর্তমান সৌদি আরবের মক্কার পার্শ্ববর্তী তায়েফ নগরীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি আনুমানিক ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তায়েফের একটি মক্তবের শিক্ষক হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) ও ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) খিলাফতকালে বিদ্রোহ দমন ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উমাইয়া খিলাফতের চরম দুর্দিনে হাজ্জাজ মসি ছেড়ে অসি হাতে নেন এবং নিজের মেধা ও কর্মদক্ষতার বলে উমাইয়া বংশকে বিপদমুক্ত করেন। হাজ্জাজের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে খলিফা আবদুল মালিক তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেন। তিনি আজীবন নিষ্ঠার সাথে নিজের কর্তব্য পালন করে ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বিদ্রোহ দমন : খলিফা আবদুল মালিকের শাসনামলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। কারবালা যুদ্ধের পর (৬৮০ খ্রি.) মক্কায় নিজেকে খলিফা ঘোষণাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর হেজাজ, ইরাক, মিসর এবং সিরিয়ার কিছু অংশের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। পারস্যে খারেজি ও উত্তর আফ্রিকায় বার্বার বিদ্রোহ মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করে। এছাড়া রোমান আক্রমণের আশঙ্কা উমাইয়া বংশের অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন করে তোলে। এ অবস্থায় আবদুল মালিক ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে হাজ্জাজকে সর্বপ্রথম ইবনে যুবাইরের বিদ্রোহ দমনের জন্য হেজাজে (বর্তমান সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চল) পাঠান। আরাফাতের যুদ্ধে বিদ্রোহী ইবনে যুবাইর পরাজিত ও নিহত হন। তার মৃত্যুর পর আবদুল মালিক নিজেকে মুসলিম জগতের একচ্ছত্র খলিফা বলে ঘোষণা করেন। খলিফা হাজ্জাজকে তিনি হেজাজের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। দুই বছরের মধ্যে হাজ্জাজ সমগ্র হেজাজ ও ইয়েমেনের ওপর খলিফার নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করেন। এ সময় ইরাকে হযরত আলির (রা) সমর্থক (শিয়া) এবং খারেজি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে। তাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য খলিফা আবদুল মালিক ৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হাজ্জাজকে ইরাকের প্রদেশপাল বা গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। হাজ্জাজ একদিন হঠাৎ করে মাত্র বারজন উষ্ট্রারোহীসহ ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হয়ে চরম ভয় দেখিয়ে ভাষণ দেন। এতে বিদ্রোহীদের অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করে। হাজ্জাজের শাসন দক্ষতায় খুশি হয়ে আবদুল মালিক তাকে ৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতের সমগ্র পূর্বাঞ্চলের (ইরাক, সিজিস্তান, কাবুল, খোরাসান) শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হাজ্জাজ কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে ওয়াসিত নামের একটি স্থানে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি খিলাফতের সমগ্র পূর্বাঞ্চলের শাসক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি: হাজ্জাজ বিন ইউসুফ শুধু বিদ্রোহই দমন করেননি, তার সুযোগ্য নেতৃত্বে সেনাপতি ইয়াজিদ বিন মুহাল্লিব ও কুতায়বা বিন মুসলিম মধ্য এশিয়ায় উমাইয়া সাম্রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। তারই আদেশে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু ও মুলতান দখল করেন।

শাসন সংস্কার: শাসক এবং সংস্কারক হিসেবে হাজ্জাজ যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। তার পরামর্শে খলিফা আবদুল মালিক শাসনব্যবস্থায় বেশকিছু পরিবর্তন আনেন। ইসলামি আইন অনুসারে কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি জিজিয়া (নিরাপত্তা কর) এবং খারাজ (ভূমি কর) থেকে অব্যাহতি পেতেন। অনেক অমুসলিম এ সুযোগ গ্রহণের জন্য ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে রাষ্ট্রের আয় কমে যায়। এজন্য হাজ্জাজের পরামর্শে আবদুল মালিক অনারব নতুন মুসলিমদের ওপর খারাজ ও জিজিয়া আরোপ করেন। ফলে রাষ্ট্রের আয় অনেকটা বৃদ্ধি পায়। কৃষির উন্নয়নে হাজ্জাজ

তার শাসনাধীন অঞ্চলে খাল খনন করেন ও হালচাষের সুবিধার্থে ষাঁড়-গরু জবাই নিয়ন্ত্রণ করেন। এছাড়া কৃষকদের দুই লাখ দিরহাম অগ্রিম কৃষিঋণ বিতরণ করেন। এসব কার্যক্রম কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রথমবারের মতো মুসলিম বিশ্বের জন্য বিশেষ মুদ্রা চালু করেন। হাজ্জাজের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির অনেক উন্নতি হয়। তার চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেছেন, 'নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি, বহিঃশত্রুর হুমকি, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মধ্যে হাজ্জাজ অদম্য সাহস ও দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে দীর্ঘ ২০ বছরের শাসনকালে ইরাক, আরব ও খোরাসানে শান্তি-সমৃদ্ধি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সাম্রাজ্যের শক্তিকে অক্ষুণ্ন রাখেন।'

ইতিহাসে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অবস্থান

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ দীর্ঘ ২০ বছর উমাইয়া খিলাফতের পূর্বাঞ্চলে অতি দক্ষতার সাথে শাসনকাজ পরিচালনা করেন। তিনি ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে ৫৩ বছর বয়সে মারা যান। তিনি বুদ্ধিমান শাসক ছিলেন। প্রয়োজনে হাজ্জাজ কঠোরতা অবলম্বন করতেন। তার এ নীতির ফলেই মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। কিছু ঐতিহাসিক হাজ্জাজকে দুরাত্মা, নৃশংসতার অবতার এবং 'আরবদের নিরো' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি অনেক মদিনাবাসী এবং এমনকি মহানবি (স)-এর জীবিত সাহাবিদের ওপরও অত্যাচার করেছিলেন। হাজ্জাজ তার শাসনকালে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, ১,২০,০০০ এবং সৈয়দ আমীর আলীর মতে, ১,৫০,০০০ লোককে নানা প্রকার অভিযোগে হত্যা করেন। হাজ্জাজের মৃত্যুর সময় ৫০,০০০ নারী ও পুরুষ কারাগারে ছিল। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, হাজ্জাজের নিষ্ঠুরতার ফলে সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ও গোলযোগের অবসান ঘটেছিল বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তার হাতে নির্যাতিত ইরাকি ও পারসিকরা উমাইয়া বংশের ধ্বংসসাধনে তৎপর হয়ে ওঠে। সংকটে পড়া উমাইয়া বংশের অস্তিত্ব রক্ষায় এবং সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে হাজ্জাজের অবদান ছিল অসামান্য। তার কঠোর শাসনের বদৌলতেই খুলাফায়ে রাশেদিনের পর মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। খলিফা আবদুল মালিক সেজন্য তার উত্তরাধিকারী পুত্র ওয়ালিদকে হাজ্জাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "হাজ্জাজ জগতের বুকে আমাদের নাম রাখতে সক্ষম হয়েছেন।" (Hajjaj had made our names to be heard in the world.)

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কোন খিলাফতে প্রশাসক হিসেবে কাজ করেন?
২. কোন পেশা দিয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কর্মজীবন শুরু হয়?
৩. আরাফাতের যুদ্ধে বিদ্রোহী ইবনে যুবাইরকে পরাজিত ও নিহত করেন কে?
৪. সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন কে?
৫. পবিত্র কুরআন শরিফে হরকত সংযোজন করেন কে?
৬. 'আরবদের নিরো' বলে খ্যাতি পান কে?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি স্লাইড তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ১৬

খলিফা সুলায়মানের জীবন ও কর্ম (৭১৫-৭১৭ খ্রি.)
Life and Works of Khalifa Sulaiman (715-717 AD)

পরিচয়

সুলায়মান ছিলেন খলিফা আবদুল মালিকের পুত্র এবং আল ওয়ালিদের ভাই। ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা ওয়ালিদ মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি সুলায়মানকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনয়ন করেন। তার মনোনয়ন অনুযায়ী সুলায়মান ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র দুই বছর খিলাফত পরিচালনা করেন।

সুলায়মানের নীতি

খলিফা সুলায়মান তার পূর্বপুরুষদের নীতি গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তিনি ইরাকের প্রশাসন থেকে হাজ্জাজের নিয়োজিত লোকজনকে বরখাস্ত করেন এবং হাজ্জাজ প্রবর্তিত অতিরিক্ত করের বিলোপসাধন করেন। এভাবে তিনি ইরাকিদের সহানুভূতি লাভ করতে চেয়েছিলেন। সুলায়মান হিমারীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল নীতি এবং মুদারীয়দের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নীতি গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তার এ নীতি উমাইয়াদের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হাজ্জাজের আত্মীয়স্বজন ও সমর্থকদের প্রতি দুর্ব্যবহার: খলিফা আল ওয়ালিদ যখন পিতার মনোনয়ন অমান্য করে সুলায়মানের পরিবর্তে নিজ পুত্রকে মনোনয়ন দিতে মনস্থ করেন তখন হাজ্জাজ খলিফার এ পরিকল্পনার সমর্থক ছিলেন। ওয়ালিদের পুত্রের মৃত্যু হলে সুলায়মান খিলাফত লাভ করেন। কিন্তু তিনি ওয়ালিদের পুত্রের সমর্থকদের সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। এ অসন্তোষ হাজ্জাজ ও তার আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধেও প্রকাশ পায়।

সুলায়মানের কাছে ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবের আশ্রয়গ্রহণ: ইয়েমেনিদের প্রতি অনুকূল মনোভাব দেখানোর কারণে হাজ্জাজ মুহাল্লাবের পুত্রদেরকে বরখাস্ত করেছিলেন। তিনি তহবিল আত্মসাতের অভিযোগে তাদেরকে বন্দি করে তাদের প্রতি নির্মম অত্যাচার করেন। মুহাল্লাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াজিদ পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ওয়ালিদের রাজত্বকালে তিনি প্যালেস্টাইনে সুলায়মানের কাছে আশ্রয়গ্রহণ করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম ও কুতায়বাকে হত্যা: সুলায়মান সামান্য অভিযোগে হাজ্জাজের জামাতা সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিমকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। কুতায়বাও খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাকে পরাজিত করে হত্যা করা হয়। মক্কার শাসনকর্তার পদ থেকে খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল কাসরীকে বরখাস্ত করা হয়। সুলায়মানের নির্দেশে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজের আত্মীয়স্বজনের সম্পত্তি ও জমি বাজেয়াপ্ত করেন। স্পেন বিজয়ী বীর মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক বিন জিয়াদকে তিনি পদচ্যুত করেন। অনাহারে তাদের মৃত্যু হয়।

মধ্য এশিয়ায় অভিযান: সুলায়মান ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবকে প্রথমে ইরাক ও পরে খোরাসানের শাসক হিসেবে নিয়োগ দেন। ইয়াজিদ খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েই জুরযান ও তাবারিস্তানের শাসকবর্গ ও বিভিন্ন গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। সামান্য বাধাদানের পর জুরযানের লোকেরা তার নিকট আত্মসমর্পণ করে। এরপর ইয়াজিদ তাবারিস্তানের শাসকের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু তাবারিস্তানের আক্রমণে তিনি পিছু হটে আসতে বাধ্য হন। পেছন দিক থেকে আবার জুরযানের জনগণ বিদ্রোহ করলে তিনি কেবল শহর লুণ্ঠন করে খোরাসানে ফিরে আসেন।

স্পেন ও সিন্ধুনীতি: এ সময় স্পেনবিজয়ী মুসার পুত্র আবদুল আজিজ স্পেনের (ভকিল) শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। কিন্তু খলিফা সুলায়মান আবদুল আজিজকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। আবদুল আজিজের হত্যার পর কায়রোয়ানের গভর্নর আলহুর নামক একজন মুদারীয়কে স্পেনের ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ করেন। খলিফা সুলায়মান মুহাম্মদ বিন কাসিমের পদচ্যুতির পর মুহাল্লাবের পুত্র হাবিব বিন মুহাল্লাবকে সিন্ধুর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

কনস্টান্টিনোপল অভিযান: খলিফা সুলায়মানের আমলে আরবরা কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের শেষ চেষ্টা চালায়। সুলায়মান লিও তৃতীয় আইসরিয়া নামের একজন বিদ্রোহী গ্রিক সেনাপতির প্ররোচনায় কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মনস্থ করেন। ৭১৬ খ্রিষ্টাব্দে এ উদ্দেশ্যে সুলায়মান তার ভাই মাসলামার নেতৃত্বে বাইজান্টাইনের রাজধানীর বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। গ্রিক সেনাপতি লিও সুলায়মানের বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এ সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় মাসলামা বাইজান্টাইন অবরোধ করেন। দীর্ঘ আট মাস ধরে এ অবরোধ চলে। ফলে গ্রিকরা সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এ মুহূর্তে গ্রিক সম্রাট থিওডোরিয়াস মারা যান এবং গ্রিকরা লিওকে সম্রাট পদে নির্বাচন করে। লিও গোপনে মুসলিম বাহিনী ত্যাগ করে কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশ করে। লিও আরব বাহিনীর সব দুর্বলতা সম্পর্কে জানতেন। ফলে সহজেই আরবদের কাছ থেকে রাজধানী উদ্ধার করে নেন। লিও-এর বিশ্বাসঘাতকতায় মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে। এ সময় খলিফা সুলায়মানের মৃত্যু হয়। নতুন খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেই কনস্টান্টিনোপল থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

খলিফা সুলায়মানের চরিত্র

খলিফা সুলায়মান রাজত্বের অল্পদিনের মধ্যে ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে দাবিক নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একাধারে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নিষ্ঠুর ও অকর্মণ্য এবং অন্যদিকে, তিনি সদাশয় ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি ধার্মিক, জ্ঞানী ও দয়ালু লোকদের কথা মন দিয়ে শুনতেন। তিনি বন্ধুর প্রতি সদয় এবং শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুর ছিলেন। সুলায়মানের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে খলিফা আল ওয়ালিদের সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম, মুসা বিন নুসাইর, মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রমুখ নিহত হন। এর ফলে আরবদের বিজয়াভিযান বন্ধ হয়ে যায়।

আশীর্বাদের চাবি: খলিফা সুলায়মানের অনেক নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও তিনি ধার্মিক ও দরবেশদের শ্রদ্ধা করতেন। এ ছাড়া তিনি পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে চাচাতো ভাই ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান ওমর বিন আবদুল আজিজকে মনোনয়ন দেন। তবে যে কাজটির জন্য তিনি 'আশীর্বাদের চাবি' হিসেবে আখ্যা পান তা হলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বন্দি করা হাজার হাজার বন্দিকে মুক্তিদান। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "যে কাজের জন্য তিনি লোকদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন এবং যার জন্য তিনি 'মিফতাহুল-খায়র' বা আশীর্বাদের চাবি আখ্যাপ্রাপ্ত হন তা হলো পূর্বাঞ্চলের অত্যাচারী শাসনকর্তা হাজ্জাজের কারাগারের দ্বারসমূহ উন্মোচন।"[৩১]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খলিফা সুলায়মান কত খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন?
২. 'আশীর্বাদের চাবিকাঠি' বলা হয় কাকে?
৩. সিন্ধু বিজয়ী বীর মুহাম্মদ বিন কাসিমকে হত্যা করার নির্দেশ দেন কে?
৪. কার আমলে আরবরা কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের শেষ চেষ্টা চালায় ?
৫. খলিফা সুলায়মান কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
৬. হাজ্জাজের বন্দি করা হাজার হাজার বন্দিকে মুক্তি দেন কে?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খলিফা সুলায়মানের জীবন ও কাজের উল্লেখযোগ্য পাঁচটি দিক ছক আকারে উপস্থাপন করো।

---

[৩১] The act which won him most effections of the people and the title of the key of Blessing (Miftah al-Khair) was his opening the prision-doms of the tyrant Hajjaj all over the East.–Ref: Syed Ameer Ali, A Short History of the Saracens, p.125

পাঠ ১৭

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের ক্ষমতা লাভ এবং তার শাসন নীতি ও সংস্কারসমূহ (৭১৭-৭২০ খ্রি.) [Obtaining the Power of Khilafat by Omar Bin Abdul Aziz and His Administrative Policy and Reforms (717-720 AD)]

পরিচিতি ও ক্ষমতা লাভ

খলিফা সুলায়মান মৃত্যুর আগে ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে পিতৃব্য মিসরের শাসনকর্তা আবদুল আজিজের পুত্র ওমরকে শাসক মনোনয়ন দেন। মনোনয়ন অনুযায়ী সুলায়মানের মৃত্যুর পর ওমর বিন আবদুল আজিজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব উমাইয়া শাসক থেকে চারিত্রিক গুণাবলি, ধর্মপালন ও শাসনকার্যে একেবারেই পৃথক ছিলেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক, দয়ালু, সুবিচারক, উদার, সরল ও শান্তিপ্রিয় মানুষ। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের মা ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর দৌহিত্রী। শাসনকার্য পরিচালনায় খুলাফায়ে রাশেদিনের নীতি অনুসরণ করায় এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা)-এর প্রতিফলন থাকায় সুন্নি মুসলমান সমাজ তাকে ইসলামের 'পঞ্চম খলিফা' এবং 'দ্বিতীয় ওমর' নামে অভিহিত করে থাকেন। উমাইয়া শাসকদের মধ্যে ব্যতিক্রমী উন্নত ও মহৎ চারিত্রিক গুণাবলির জন্য তাকে 'উমাইয়া সাধু' (Umayyad Saint) বলা হয়ে থাকে।

শাসন নীতি

প্রশাসনিক নীতিসমূহ: উমাইয়া খলিফাদের বেশিরভাগের মধ্যেই সম্প্রসারণবাদী, স্বেচ্ছাচারী, স্বজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ওমরের শাসন নীতি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি তার পূর্ববর্তী খলিফাদের কলুষিত নীতি ত্যাগ করে দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ, গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত একটি সর্বজনীন প্রশাসন প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ দিতেন। দল-মত নির্বিশেষে তারা দুর্নীতিমুক্ত থেকে প্রশাসন পরিচালনা করছেন কি না তা তদারক করতেন। প্রজাবৎসল খলিফা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রজানিপীড়ন পরিহার এবং উদারভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতিরিক্ত করারোপ করে প্রজাসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি না করতে খলিফা শাসনকর্তাদের কঠোর নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস: ওমর বিন আবদুল আজিজ একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। সাম্রাজ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা তার শাসন নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এজন্য খলিফা হিমারীয় ও মুদারীয়দের মধ্যকার বিরোধ অবসানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে মুদারীয় গোত্রের আদি বিন আরতাতকে বসরায়, আবদুল হামিদকে কুফায়, ওমর বিন হুরাইরাকে মেসোপটেমিয়ায় এবং জাবের বিন আবদুল্লাহকে খোরাসানে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। অন্যদিকে, হিমারীয় গোত্রের সামাহ বিন আবদুল মালিককে স্পেনে এবং ইসমাইল বিন আবদুল্লাহকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। খলিফা দ্বিতীয় ওমর একটি দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। দুর্নীতির দায়ে স্পেনের শাসনকর্তা আল হুরকে বরখাস্ত করা হয়। একই অভিযোগে খোরাসানের ইয়াজিদ বিন মুহাল্লিব পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ হন।

হাশেমীয় নীতি: পূর্বের উমাইয়া রীতি ছিল আলি (রা) ও তার বংশধরদের জুম্মার দিনে খুৎবায় অভিসম্পাত দেওয়া। দ্বিতীয় ওমর তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং এ কুপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করেন। প্রথম মারওয়ান মদিনার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ফিদক নামে একটি বাগান আত্মসাৎ করেছিলেন। খলিফা মহানবি (স)-এর পরিবারের লোকদেরকে তা ফিরিয়ে দেন। খলিফা আবদুল মালিক মক্কায় অবস্থিত তালহার যে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, দ্বিতীয় ওমর তাও তালহার সন্তানদের কাছে হস্তান্তর করেন। এছাড়া তিনি হাশেমিদের রাজকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে শিয়া সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করেন।

খারেজিদের প্রতি নীতি: ধর্মান্ধ খারেজি সম্প্রদায় ছিল উমাইয়াদের চরম শত্রু। তা সত্ত্বেও খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় দেন। তিনি কুফার গভর্নর আবদুল হামিদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "যদি খারেজিরা দেশে গোলযোগ সৃষ্টি বা রক্তপাত না করে তবে তাদের আক্রমণ করবে না।" খলিফা দ্বিতীয় ওমর খারেজিদের প্রতি এরূপ উদারনীতি গ্রহণ করায় তারা তার অনুগত হয় এবং উমাইয়াদের মধ্যে কেবল তাকেই খলিফা হিসেবে মেনে নেয়।

মাওয়ালি নীতি: অনারব নওমুসলিমরা 'মাওয়ালি' নামে পরিচিত। উমাইয়া শাসনের এতদিন পর্যন্ত মাওয়ালিদের দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমানের মর্যাদা দেওয়া হতো। কিন্তু দ্বিতীয় ওমর তাদের প্রতি এ নীতি পরিহার করেন। তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে মাওয়ালিদের নিয়োগ দেন। উপরন্তু তাদের ওপর ধার্যকৃত জিজিয়াকরসহ অতিরিক্ত কর রহিত করেন। উমাইয়ারা আফ্রিকার বার্বারদের কাছ থেকে যে নিষ্ঠুর শিশু কর আদায় করত সে করও তিনি রহিত করেন।

অনাড়ম্বর নীতি: দ্বিতীয় ওমর প্রজাকল্যাণকামী শাসক হিসেবে আড়ম্বরহীন প্রশাসন গড়ে তোলেন। তিনি প্রথমে রাজকীয় অশ্বগুলো নিলামে বিক্রি করেন। ব্যক্তিগত সম্পদ এমনকি তার স্ত্রী বিবি ফাতিমার অলংকারাদি রাজকীয় কোষাগারে জমা দেন। তিনি ওমর (রা)-এর মতোই শত তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করতেন।

ধর্মীয় নীতি: দ্বিতীয় ওমর একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি মনে করতেন, প্রথমে তিনি মুসলমান, এরপর আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা। তিনি নিজেকে খলিফার চেয়ে মুসলিম ভাবতে বেশি পছন্দ করতেন। ইসলামের প্রচারকল্পে তিনি ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে খারাজ ও জিজিয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। এ ছাড়া তাকে আরও পেনশন দেওয়া হবে। ফলে শুধু খোরাসান, পারস্যই নয় বরং বার্বার সম্প্রদায় থেকে শুরু করে মিসর পর্যন্ত বহুলোক ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় ওমরের নীতির ফলে মার্ভ, নিশাপুর, খোরাসান এবং খাওয়ারিজম ইত্যাদি ইসলামি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। তবে তার ধর্মীয় নীতির কারণে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ কমে যায়।

অমুসলিম নীতি: দ্বিতীয় ওমর অমুসলিম প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। এস এম ইমামুদ্দিন বলেন, "একজন গোঁড়া মুসলমান হিসেবে ওমর অমুসলিমদের প্রতি প্রশাসনিক অবিচার করেননি।"[৩২] যদিও এ সময় নতুন গির্জা, অগ্নিমন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল তথাপি পুরোনোগুলো ধ্বংস করা হয়নি। বরং সেগুলো সংস্কার এবং নিজ নিজ ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। খলিফা আইলা, সাইপ্রাস ও নাজরানের খ্রিষ্টানদের ওপর ধার্য জিজিয়ার পরিমাণ হ্রাস করেন। নাজরানের খ্রিষ্টানদের আর্থিক দুর্গতি বিবেচনা করে তাদের দেওয়া কর বার্ষিক ২০০০ খণ্ডের পরিবর্তে ২০০ বস্ত্র খণ্ডে হ্রাস করেন।

বৈদেশিক নীতি: দ্বিতীয় ওমর উমাইয়াদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করে সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানে মনোযোগ দেন। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, "যে বিশাল সাম্রাজ্য ওমরের দায়িত্বে সমর্পণ করা হয়েছে এটি দৃঢ়ীকরণেই তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন, সম্প্রসারণে নয়।" তার নীতিই ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিধান। এ লক্ষ্যে তিনি আগে পরিচালিত অভিযানসমূহ বন্ধ করে দেন। পরবর্তী সময়ে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সম্ভাবনা থাকলেও তিনি সেখানে অবরোধ তুলে নেন। অবশ্য তিনি বাইজান্টাইনে আত্মরক্ষার জন্য তুর্কিদের আক্রমণ করেন। ইরাকে হারুরিয়া সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে উমাইয়া গভর্নর আবদুল হামিদকে অস্বীকার করলে তিনি হামিদকে তা দমনের জন্য নির্দেশ দেন ও অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে তাদেরকে সহায়তা করেন।

---

[৩২] Umar being an orthodox Muslim did not deviate from administering justice over the non-Muslims. –Ref: S. M. Imamudin, *A Short History of the Muslim*

রাজস্ব সংস্কার: ঐতিহাসিক এস এম ইমামুদ্দিন বলেন, 'ওমরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল তার অর্থনৈতিক সংস্কার।'[৩৩] ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব-এই তিন নীতির অনুসারী হয়ে তিনি মাওয়ালিদের ওপর থেকে জিজিয়া ও খারাজ কর রহিত করেন। খলিফা নির্দেশ দেন যে মুসলমানদের যাকাত দিতে হবে এমনকি ভূমি থেকে ১/১০ ভাগ উশর দিতে হবে। অমুসলমানদের নিয়মিতভাবে জিজিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অনারব মুসলমানগণ জিজিয়া ও খারাজ থেকে মুক্তি পায়। এর ফলে কিছুদিন পর রাজকোষে অর্থ সংকট দেখা দিলে তিনি ঘোষণা করেন যে, অমুসলিমরা ১০০ হিজরির পর মুসলমানের কাছে জমি বিক্রি করতে পারবেন না। যদি কোনো অমুসলিম মুসলমান হয় তবুও জমি বিক্রি করতে পারবে না। ওমর আরও নির্দেশ দেন যে, নও মুসলিমরা তাদের পৈত্রিক ভূমি নিজেদের ভোগদখলে রাখবে এবং আগের মতো খারাজ প্রদান করবে। রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান রাজস্ব হ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি বন্ধকী ব্যবস্থা চালু করেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও ওমরের নীতি সফল হয়নি। এর ফলে রাষ্ট্রের রাজস্ব অনেক কমে যায় এবং শহরে অনুচর সংখ্যা বেড়ে সেনাদলের বহর বাড়তেই থাকে।"[৩৪] সাম্রাজের রাজস্ব ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে খলিফা তার রাজস্ব কর্মচারীদের যথাযথভাবে জিজিয়া আদায়ের নির্দেশ দেন। বিত্তবান নাগরিকদের তাদের অতিরিক্ত সম্পদের অংশবিশেষ রাজকোষে জমা দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এমনকি খলিফা নিজেও তার ব্যক্তিগত সম্পদের প্রায় সবটুকুই রাজকোষাগারে জমা দেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ওমর বিন আবদুল আজিজ কত খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফতে বসেন?
২. উমাইয়া শাসকদের মধ্যে ব্যতিক্রমীধর্মী ছিলেন কে?
৩. কোন উমাইয়া খলিফা খারেজিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় দেন?
৪. অনারব নওমুসলিমরা কী নামে পরিচিত?
৫. অমুসলমানদের জিজিয়া ও খারাজ থেকে অব্যাহতি দেন কে?
৬. দ্বিতীয় ওমর নামে কে পরিচিত ছিলেন?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

অমুসলিমদের কল্যাণে ওমর বিন আবদুল আজিজের গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছক আকারে লেখো।

গ. দলীয় কাজ

কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসন নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিয়ে একটি স্লাইড তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

---

[৩৩] The most important concern of Umar-II was, however, financial reform. –Ref: S. M. Imamuddin, *A Short History of the Muslim*

[৩৪] Though inspired by the best of intentions, Umar's policy was not successful. It diminished the revenues of the state and increased the number of clients in the cities. –Ref: *History of the Arabs, p. 219*

পাঠ ১৮

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের চরিত্র ও কৃতিত্ব
Character and Achievements of Khalifa Omar Bin Abdul Aziz

চরিত্র

উমাইয়া বংশের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী এক শ্রেষ্ঠ ও মহান শাসক ছিলেন খলিফা আবদুল আজিজ বা দ্বিতীয় ওমর। উমাইয়া খলিফাদের রাজত্বকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দেশজুড়ে ক্ষমতার সংঘর্ষ, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতা। এমন সময় সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী, কর্তব্যপরায়ণ ও প্রজাবৎসল খলিফা হিসেবে দ্বিতীয় ওমরের সিংহাসনে আরোহণ এক ভিন্ন অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন।

খলিফা আবদুল আজিজ অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। পার্থিব ধনরত্নের প্রতি তার কোনো আসক্তি ছিল না। তিনি ওমর (রা)-এর মতো তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন। খলিফার স্ত্রী ফাতিমা পিতা ও ভাইদের কাছ থেকে যেসব অলংকার পেয়েছিলেন তা বিক্রি করে সে অর্থ তিনি রাজকোষাগারে জমা দেন। এস এম ইমামুদ্দিন বলেন, বিশাল সাম্রাজ্যের খলিফা হয়েও তিনি নিজের ও পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য মাত্র দুই দিরহাম অর্থ বায়তুল মাল গ্রহণ করতেন।[৩৫] আবদুল আজিজ বিশ্বাস করতেন, বায়তুল মাল প্রজাদের সম্পদ। খলিফা শুধু এর রক্ষক। মুহম্মদ রেজা-ই-করিম বলেন, "এ সময়টি ছিল খিলাফত আমলের রক্তপাত, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার একটি বিরামকাল, খলিফা ছিলেন জাতির ও ধর্মের কল্যাণ চিন্তায় নিমগ্ন।" *(সূত্র: আরব জাতির ইতিহাস, পৃ-২৪০)*

খলিফা আবদুল আজিজ কুরআন ও হাদিসের বিধান অনুসারে জীবনযাপন ও শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। ধনী, দরিদ্র, আরব-অনারব, আরব মুসলিম, নওমুসলিম, হিমারীয়-মুদারীয় এরূপ ভেদাভেদ তিনি পছন্দ করতেন না। পি. কে. হিট্টি বলেন, "ওমর ধর্মতত্ত্ববিদদের প্রভাবাধীন ছিলেন। উমাইয়া যুগের অধর্ম ও অনাচারের পরিপন্থি হওয়া এবং কঠোর সংযমের জন্য তিনি যুগ যুগ ধরে খ্যাতি অর্জন করেন।" রেজা-ই-করিম বলেন, "তিনি ছিলেন অতিরিক্ত ধর্মভীরু। খিলাফতের ইতিহাসের মধ্যে ওমরের রাজত্বকালই পাঠককে বেশি আনন্দ দেয়।" (পূর্বোক্ত পৃ. ২৪০)। বিরল এ ধর্মভীরুতার জন্য তাকে 'উমাইয়া সাধু' (Ummaya Saint) বলা হয়। নিষ্কলুষ চরিত্রের জন্য খ্যাতি অর্জনের কারণেই তাকে 'পঞ্চম ধর্মপ্রাণ খলিফা' বলা হয়।

কৃতিত্ব

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের রাজত্বকাল (৭১৭—৭২০ খ্রি.) স্বল্পস্থায়ী হলেও এ সময় ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। রেজা-ই-করিম বলেন, "ওমরের রাজত্বকালে দেশে বিপ্লব, বিদ্রোহ ও যুদ্ধের অভাব সত্ত্বেও এই সময় লক্ষ করার মতো অনেক কিছুই আছে।" খিলাফতের ইতিহাসের মধ্যে তার রাজত্বকালই পাঠককে বেশি আনন্দ দেয়। "খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের আগেই খলিফা আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে ওমর বিন আবদুল আজিজ হেজাজের গভর্নর হিসেবে বিশেষ প্রশাসনিক কৃতিত্বের পরিচয় দেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর বিভিন্ন নীতি গ্রহণ ও প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে তিনি প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছিলেন। সমরনীতির পরিবর্তে সমগ্র রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণের কৃতিত্বের দাবিদার। তিনি উদার, নিরপেক্ষ ও জনকল্যাণমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

খলিফা দ্বিতীয় ওমরের রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র ছিল মানবতার সেবা ও প্রজাপালন। তিনি প্রাদেশিক গভর্নরদের কল্যাণকামী শাসনব্যবস্থার রূপরেখা অনুসরণের নির্দেশ দেন। তিনি হাশেমি, খারেজি, মাওয়ালি সকলের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করেন। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে খারেজিরা একমাত্র তারই আনুগত্য স্বীকার করেন। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ মাওয়ালিদের ওপর থেকে জিজিয়া কর রহিত করেন। জিজিয়া থেকে অব্যাহতি লাভের আশায় ওই সময় অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। এতে আরবে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

---

[৩৫] Umar was a 'mabuth' the expected saint, after a century. Ref: S. M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims*, p. 60

ওমর বিন আবদুল আজিজ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে সমগ্র রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি সংস্কারমূলক কার্যকলাপের দ্বারা সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। পি. কে. হিট্টি বলেন, "তিনি খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের ধর্মমন্দির সংস্কারের অনুমতি দেন। স্পেনের উত্তর সারাগোসায় একটি নতুন গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেন। গুতায় নির্মিত সেন্ট থমাসের গির্জা পুনঃব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। আইলা ও সাইপ্রাসের খ্রিষ্টানদের কর লাঘব করা হয়।" রাষ্ট্রে শাসন সুদৃঢ়ীকরণ ও সংহতির ক্ষেত্রে তার রাজত্বকাল গুরুত্বপূর্ণ। জনহিতকর কাজেও খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। সুষম রাজস্ব নির্ধারণের লক্ষ্যে তিনি ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। প্রজাকল্যাণার্থে আদমশুমারির ব্যবস্থা করা হয়। খলিফা রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও সংস্কার করে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর করেন।

জেনে রাখো

জিজিয়া হলো একটি নিরাপত্তা কর। ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম প্রজাদের এ কর দিতে হতো। কারণ ইসলামি রাষ্ট্রে তাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এর পরিবর্তে নিরাপত্তা প্রদানের বিনিময়ে তাদের ওপর জিজিয়া কর আরোপ করা হয়। অপরদিকে খারাজ হলো অমুসলিম প্রজাদের প্রদত্ত ভূমি কর। আর মুসলিম প্রজাদের প্রদত্ত ভূমি করকে বলা হয় উশর। শরিয়তের বিধান অনুসারে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে সে জিজিয়া ও খারাজ থেকে অব্যাহতি পাবে।

দ্বিতীয় ওমর অল্প বয়সে পবিত্র কুরআন শরিফ মুখস্থ করে হাফিজ-ই-কুরআন হয়েছিলেন। ধর্মশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন বলে তাকে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ আলেমদের অন্যতম বলে ধরা হতো। তিনি ইসলামি শরিয়তের প্রতিটি অনুশাসন নিখুঁতভাবে পালন, কুরআন-হাদিস চর্চা এবং ইসলাম প্রচারকে তার মৌলিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। তিনি আলেম-উলেমাদের যথেষ্ট সম্মান করতেন। তাদের সাহায্যে তিনি সিন্ধু, আফ্রিকা, স্পেন প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। গভীর ধর্মানুরাগ ও ধর্মপ্রচারে একনিষ্ঠতার জন্য তাকে 'মুজাদ্দিদ' বা ধর্ম সঞ্চারকও বলা হয়। ন্যায়পরায়ণতা, সততা, ধার্মিকতা, নীতিবোধ, সহিষ্ণুতা, সরলতা প্রভৃতি গুণ বিচারে তিনি সত্যিই 'উমাইয়া সাধু' ছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ওমর বিন আবদুল আজিজ কাদের আদর্শ ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন?
২. বায়তুল মাল কাদের সম্পদ?
৩. ওমর বিন আবদুল আজিজ বায়তুল মাল থেকে কত দিরহাম অর্থ নিতেন?
৪. 'উমাইয়া সাধু' কাকে বলা হয়? *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]*
৫. 'পঞ্চম ধর্মপ্রাণ খলিফা' হিসেবে কে পরিচিতি লাভ করেন?
৬. খলিফা দ্বিতীয় ওমরের রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র কী ছিল?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১৯

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসন নীতির সমালোচনা এবং উমাইয়া বংশের পতনে তার দায়বদ্ধতা [Criticism of the Policies of Khalifa Omar Bin Abdul Aziz and His Liability on the Fall of the Umayyad Dynasty]

শাসন নীতির সমালোচনা

ধর্মীয় নীতি: খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ নতুন ইসলাম গ্রহণকারী অনারবদের জিজিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ঘোষণা দেন। ফলে অনেক অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে সরকার জিজিয়া লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। অমুসলিমদের জানমালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তার বিনিময়ে জিজিয়া দিতে হতো খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ খারাজ বৃদ্ধি করলেও অর্থনৈতিক সুবিধার বিনিময়ে ইসলাম প্রচারের নীতি ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ তার ধর্মীয় নীতির ফলে বহু বার্বার ও পারসিক অমুসলিম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নয়, বরং আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এতে সাম্রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় ওমরের যুক্তি হলো, 'আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স)- কে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন, খাজনা আদায়কারী হিসেবে নয়।' অল্প সময়ের রাজত্বকালে সকল জাতি-ধর্মের লোকজনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তার অন্যতম কৃতিত্ব। এ উদার ও শান্তিপূর্ণ নীতি পরবর্তী উমাইয়া শাসকেরা বজায় রাখলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হতো না।

সমর নীতি: দ্বিতীয় ওমর সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করেন। তিনি শক্তি প্রয়োগের 'Blood on Iron Policy' পছন্দ করতেন না। এর কারণ সামরিক দুর্বলতা নয়, বরং সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অধিক আগ্রহ। অনেক ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেন যে, সম্প্রসারণ নীতি বর্জনে সামরিক শক্তি হ্রাস পায় এবং সৈন্যবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়লে পরবর্তী সময়ে শিয়া, খারেজি, বার্বার, মাওয়ালিদের বিদ্রোহ দমন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এরূপ অভিযোগ সত্য নয়, কারণ পরবর্তী খলিফা হিশামের সময় আবদুর রহমান বীর বিক্রমে ফ্রান্সের মধ্যভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে কৌশলগত নির্বুদ্ধিতার জন্য টুরসের যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের কাছে পরাজিত হন। খলিফা আজিজ তার পূর্ববর্তী খলিফা সুলায়মানের সামরিক নীতি অনুসরণ করেন। অতএব, সামরিক দুর্বলতাকে দায়ী করলে প্রথমে তার নীতিকে দায়ী করা উচিত।

কর নীতি: অনেক ঐতিহাসিক তার রাজস্ব নীতির সমালোচনা করেছেন এবং তার নীতিকে উমাইয়া খিলাফতের পতনের জন্য দায়ী করেছেন। রাজস্ব ঘাটতির ফলে উমাইয়াদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে বলে অনেকে মন্তব্য করেন। রাজস্ব হ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় ওমর বন্ধকীব্যবস্থা চালু করেছিলেন। ঐতিহাসিক ভন ক্রেমার দ্বিতীয় ওমরের রাজস্বনীতির সমালোচনা করে বলেন, "আবদুল মালিক ও হাজ্জাজ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে শৃঙ্খলা আনয়ন করেন ওমরের গৃহীত পদক্ষেপ তা বিনষ্ট করে এবং তার তিরোধানে উমাইয়া বংশের পতন ত্বরান্বিত হয়।" তবে তার এ অভিমতকে অনেক ঐতিহাসিক সমর্থন করেন না। "দ্বিতীয় ওমর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শাসন সংস্কার করলেও তার নীতি সফল হয়নি।" পি. কে. হিট্টি বলেন, 'মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও ওমরের নীতি সফল হয়নি। এর ফলে রাষ্ট্রের রাজস্ব অনেক কমে যায় এবং শহরে অনুচর সংখ্যা বেড়ে সেনাদলের বহর বাড়তেই থাকে।'[৩৬] রাজস্বনীতির ব্যর্থতার জন্য মনে করা হয় এ সংস্কার ছিল উমাইয়াদের ধ্বংসের কারণ।

প্রশাসনিক নীতি: ওমরের নীতি ছিল উমাইয়াদের পরিপন্থি। তিনি যে নীতিতে সর্বজনীনভাবে কর্মচারী নিয়োগ করেন তা উমাইয়াদের পতনের জন্য দায়ী ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি উমাইয়াবিরোধী লোক নিয়োগ করেন এবং শিয়াদের নিযুক্ত ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। পরে সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া হলে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

মাওয়ালি নীতি: খুলাফায়ে রাশেদিনের মতো দ্বিতীয় মাওয়ালিদের অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা করেন। পরবর্তীতে অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে উমাইয়াদের পতনে তারাও সাহায্য করে। খলিফা তাদের যে সুযোগ দেন সেগুলো অযৌক্তিক ছিল না। পরের উত্তরাধিকারীগণ যদি তার নীতি অনুসরণ করতেন তাহলে মাওয়ালি, হাশেমি ও আলির সমর্থকরা কখনও উমাইয়াবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিত না।

---

[৩৬] Though inspired by the best of intentions, Umars Policy was not successful. It diminished the revenues of the state and increased the number of clients in the cities. -Ref: P. K. Hitti, History of the Arabs, p. 219

উমাইয়া বংশের পতনে খলিফার দায়বদ্ধতা

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার শাসনকালের প্রত্যেকটি দিক বিবেচনা করলে উমাইয়া বংশের পতনের জন্য খলিফা দ্বিতীয় ওমর পুরোপুরি দায়ী নন। তিনি মাওয়ালিদের ওপর অন্যায়ভাবে আরোপ করা জিজিয়া ও খারাজ রহিত করেছিলেন। এর ফলে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে এবং খারাজ ও জিজিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি পায়। এজন্য রাজস্ব আয় কমে যায় এবং অর্থের অভাবে সেনাবাহিনী দুর্বল হয়। এ কারণে অনেকে দ্বিতীয় ওমরকে উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী করে। কিন্তু তা পুরোপুরি সঠিক নয়। কারণ তার উত্তরাধিকারীরা যদি তার অনুসৃত নীতি অনুসরণ করত, তাহলে মাওয়ালি, হাশেমি ও আলির সমর্থকরা কখনও উমাইয়া বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিত না।

খলিফা দ্বিতীয় ওমর উমাইয়া, হাশেমি, আরব-অনারব, হিমারীয়-মুদারীয় দ্বন্দ্ব নিরসন করার চেষ্টা করেন এবং অনেকাংশে সফল হন। উইলিয়াম মুর বলেন, 'ওমরের রাজত্বকালে কোনো চাঞ্চল্যকর ঘটনা না থাকলেও আকর্ষণীয় ঘটনার অভাব ছিল না। রক্তপাত, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিভীষিকার মধ্যে তার শাসনকাল উপশমের ভূমিকা পালন করেছে।' খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজকে উমাইয়া বংশ পতনে দায়ী করে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয় সেগুলোর ঐতিহাসিক সত্যতা পাওয়া যায় না। কারণ ওমরের মৃত্যুর পর যদি তার নীতি অনুসৃত হতো, তাহলে আলির সমর্থক ও আব্বাসিরা ক্ষুব্ধ হতো না। তাদের আন্দোলনের জন্য দায়ী পরবর্তী দুর্বল শাসকেরা, খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ নন। তার মৃত্যুর পর পূর্বের অসাম্য ও ভেদাভেদ আরব সমাজে নতুন করে শুরু হওয়ায় উমাইয়াবিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে এবং উমাইয়াদের পতন হয়। রাজস্ব হ্রাসের যে অভিযোগ করা হয় তা পূরণে দ্বিতীয় ওমর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ১০০ হিজরির পর থেকে তিনি মুসলমানদের জন্য খারাজি ভূমি ক্রয় নিষিদ্ধ করেন। মুসলমানদের যথাযথভাবে উশর এবং জাকাত দানের নির্দেশ দেন। এক পর্যায়ে তিনি মুসলিম-অমুসলিম সবার ওপর খারাজ আরোপ করেন।

দ্বিতীয় ইয়াজিদ (৭২০-৭২৪ খ্রি.): দ্বিতীয় ওমরের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ইয়াজিদ ক্ষমতায় বসেন। তিনি ছিলেন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের পুত্র। তার শাসনামলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইয়াজিদ ইবনে আল-মুহাল্লাবের বিদ্রোহ। বিদ্রোহের প্রথম দিকে কিছুটা সফল হলেও পরবর্তীতে যুদ্ধে তিনি নিহিত হন। দ্বিতীয় ইয়াজিদের সময়ে পুরোনো হিমারীয় ও মুদারীয় দ্বন্দ্ব আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এসময় খলিফার দুর্বলতা ও অযোগ্যতার কারণে খারিজি, বার্বারসহ তুর্কিদের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ফলে উমাইয়া বিরোধীরা শক্তি অর্জন করে ও আব্বাসী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এ রকম বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়েই তার শাসনামল শেষ হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন উমাইয়া শাসক সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করেন?
২. বায়তুল মালকে জনগণের সম্পদ বলে ঘোষণা করেন কে? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]*
৩. রাজস্ব হ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় ওমর কী চালু করেছিলেন?
৪. উমাইয়া, হাশেমি, আরব-অনারব, হিমারীয়-মুদারীয় দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা করেন কে?
৫. দ্বিতীয় ওমরের শাসনকাল কত ছিল?
৬. ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসনকাল কীরূপ ছিল?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসন নীতি উমাইয়া বংশের পতনে দায়ী কি না এ নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

পাঠ ২০

খলিফা হিশামের শাসন নীতি, চরিত্র ও কৃতিত্ব (৭২৪-৭৪৩ খ্রি.) এবং পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ [Ruling Policy, Character and Achievements of Khalifa Hisham (724-743 AD) and Next Umayyad Caliphs (Khalifa)]

হিশাম বিন আবদুল মালিক ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে উমাইয়া খিলাফতের প্রদীপকে শেষবারের মতো প্রজ্বলিত করেছিলেন। ঐতিহাসিকেরা খলিফা হিশামকে 'উমাইয়া বংশের শেষ গৌরব' বলে অভিহিত করেছেন। খ্যাতনামা আরব ঐতিহাসিক মাসুদি এবং অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি বলেন, "শাসনদক্ষতা ও রাজনৈতিক চাতুর্যে খলিফা হিশাম মুয়াবিয়া (রা) এবং আবদুল মালিকের পর উমাইয়া বংশের তৃতীয় ও সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন।"[৩৭]

শাসন নীতি

গোত্রীয় কলহের অবসান: খলিফা হিশামের রাজত্বকালে হিমারীয় ও মুদারীয়দের মধ্যে কলহ চরম আকার ধারণ করে। খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদের সময় খলিফার অনুগ্রহপুষ্ট মুদারীয়গণ ভীষণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। হিশাম সম্ভবত তাদের প্রাধান্য খর্ব করার উদ্দেশ্যেই হিমারীয়দের সমর্থন জানান এবং মুদারীয়দের দমন করেন।

অযোগ্য শাসনকর্তাদের অপসারণ: খলিফা হিশাম তার পূর্ববর্তী খলিফার আমলে নিয়োগকৃত অযোগ্য ও অদক্ষ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কুশাসনে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ফলে খলিফা তাদেরকে বরখাস্ত করে যোগ্য শাসক নিয়োগ করেন। তিনি খালিদ বিন আবদুল্লাহকে ইরাকের ও আসাদ আল কাসরিকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

ইরাকে বিদ্রোহ দমন: ইরাকের নবনিযুক্ত শাসনকর্তা খালিদ কৌশলে হিমারীয় ও মুদারীয় সংঘর্ষ বন্ধ করেন। খালিদের সুশাসনে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা তার ওপর আস্থা স্থাপন করেছিল। এ সময় ইরাকের কয়েকটি অঞ্চলে খারেজিরা বিদ্রোহী হয়ে উঠলে খালিদ কঠোরহাতে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন। দীর্ঘ পনেরো বছর সুনামের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে তিনি অর্থ আত্মসাৎ অথবা আলির বংশধরদের প্রতি অনুরক্তির সন্দেহে খলিফা কর্তৃক পদচ্যুত হন।

খালিদের পদচ্যুতির পর ৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে ইউসুফ বিন ওমর ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি হাজ্জাজের আত্মীয় ছিলেন। এ সময় জায়িদ নামে হযরত আলির জনৈক বংশধর মদিনা থেকে কুফায় এসে খিলাফত দাবি করেন। কুফাবাসী তাকে সমর্থন করে। এটা জানতে পেরে গভর্নর ইউসুফ কুফাবাসীকে কঠোর ভাষায় ভয় দেখালে তারা তার পক্ষ ত্যাগ করে। তবুও মাত্র ২১৮ জন সমর্থকসহ জায়িদ কুফায় বিদ্রোহ করলে ইউসুফ তাকে পরাজিত ও নিহত করেন। জায়িদের মৃত্যুর ফলে আব্বাসি আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তার মৃত্যু উমাইয়া বংশের সর্বনাশের কারণ হয়েছিল।

খোরাসান ও মধ্য এশিয়ার বিদ্রোহ দমন: ইরাকে শান্তি স্থাপিত হলেও খোরাসান ও মধ্য এশিয়ায় অনেকগুলো বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইসলাম গ্রহণ করলে জিজিয়া দিতে হবে না এ প্রতিশ্রুতিতে আমু দরিয়ার পূর্ব দিকে অবস্থিত সগোদের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে খলিফা হিশাম তাদের ওপর জিজিয়া কর চাপিয়ে দিলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় খলিফা হিশাম আসাদ আল কাসরিকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন। আসাদ আল কাসরি সগোদের অধিবাসীদের সমর্থনকারী তুর্কি নেতা খাকানকেও পরাজিত ও নিহত করেন। আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের খাজারগণ ইরাক ও মসুল আক্রমণ করে উমাইয়া শাসনকর্তাকে হত্যা করে। হিশাম প্রথমে শহীদ আল হাবসিকে এবং পরে মাসলামা ও মারওয়ানকে সেখানে পাঠিয়ে খাজারদের বিদ্রোহ দমন করেন।

উত্তর আফ্রিকার বিদ্রোহ দমন: পারস্য, আরব উপদ্বীপ, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলের খারেজিগণকে যখন খলিফা কঠোরভাবে দমনে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক সে সময়ে একদল খারেজি উত্তর আফ্রিকায় গিয়ে বার্বারদের সহায়তায় সেখানে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৭৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তারা তাঞ্জিয়ারের শাসনকর্তাকে নিহত করে রাজধানী কায়রোয়ান আক্রমণ করে। তাদের হাতে আরব সেনাপতি হাবিব পরাজিত ও নিহত হন। এ যুদ্ধে বহুসংখ্যক আরব অশ্বারোহী এবং বীরযোদ্ধা নিহত হয়েছিল বলে এটি ইসলামের

---

[৩৭] After Muawiyah and Abd-Malik, Hisham was rightly considered by Arab authorities the third and last statesman of the house of Umayyah. –Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 222

ইতিহাসে 'সম্ভ্রান্তদের যুদ্ধ' (Battle of the Nobles) নামে পরিচিত। এ দুঃসংবাদ পেয়ে খলিফা সেনাপতি কুলসুমকে যেখানে পাঠান। সেনাপতি কুলসুমও তাদের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। তার সৈন্যদলের একাংশ স্পেনে চলে যায় এবং অন্য অংশ কায়রোয়ানে ফিরে আসে। এ অবস্থায় ৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হিশাম সেনাপতি হানজালাকে উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। মূর্তির যুদ্ধে (Battle of Idols) হানজালা খারেজিদের পরাজিত করে উত্তর আফ্রিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ যুদ্ধে ১,৮০,০০০ বার্বার নিহত হয়েছিল। এ সময় মুসলিম নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরীয় সিসিলি দ্বীপের রাজধানী সাইরাকিউস এবং সার্ডিনিয়া দখল করেন। এরই মধ্যে ৭৩৩-৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার সুদান বিজিত হয়।

স্পেনে শান্তি প্রতিষ্ঠা: খলিফা হিশাম উমাইয়া বংশকে সংকটমুক্ত করার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় ওমরের শাসনামলে আস সাম তুলুসের যুদ্ধে খ্রিষ্টান রাজা ডিউকের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। হিশাম পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য আনবাসাকে সেখানকার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেন। আনবাসা পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে কারাকাসোনা, নিমিজসহ সমগ্র দক্ষিণ ফ্রান্স অধিকার করেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করলে স্পেনে প্রায় ৬ বছর অরাজকতা চলতে থাকে। অবশেষে খলিফা ৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের বিশৃঙ্খল অবস্থায় আব্দুর রহমান আল গাফিকিকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি বিদ্রোহ দমন করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

ফ্রান্সের ঘটনা: আব্দুর রহমান হিশামের নির্দেশে ফ্রান্সের নেতা চার্লস মার্টেলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি পিরেনিজ পবর্তের অপরদিকে সগদে আরব শাসনকর্তা মনুজাকে (ওসমান ইবনে আবু নেজা) পরাজিত ও নিহত করেন। এরপর তিনি ইউডিজকে পরাজিত করে একুন্ডটন ও বারগা প্রদেশ দখলপূর্বক ফ্রান্সের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন। ইউডিজ ফ্রাঙ্কিশ রাজা চার্লস মার্টেলের সহায়তায় আব্দুর রহমানের গতিরোধ করলে ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে টুরস নামক স্থানে দুই দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। কিন্তু দলীয় কোন্দল, সেনাপতির আদেশ অমান্য প্রভৃতি কারণে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে এবং আব্দুর রহমান নিহত হন। এ যুদ্ধকে ইসলামের ইতিহাসে 'বালাত-উশ-সুহাদা' বা 'শহিদদের মঞ্চ' নামে অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'যখন পৃথিবীজোড়া এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রায় আরবদের হস্তগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখন টুরসের প্রান্তরে তারা তা হারিয়ে ফেলেন।'[৩৮]

হিশামের চরিত্র ও কৃতিত্ব

খলিফা হিশাম সুদীর্ঘ ২০ বছর যোগ্যতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তার মৃত্যুর সাথে সাথে উমাইয়া বংশের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে। খলিফা হিশাম একজন আদর্শ মুসলমান ছিলেন। তিনি ইসলামের একনিষ্ঠ রক্ষক হিসেবে দ্বিতীয় ওমরের গৃহীত পদক্ষেপগুলো চালু রাখেন এবং রাজদরবার থেকে সব ধরনের অনৈসলামিক কার্যক্রম বিলুপ্ত করেন।

শাসনদক্ষতা ও রাজনৈতিক চাতুর্য: খলিফা হিশাম আরব সাম্রাজ্যের সীমা স্পেন থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে হিশাম চারদিকে বিভিন্ন বিদ্রোহ দেখতে পান। মুদারীয় এবং হিমারীয় সংঘর্ষ উমাইয়া বংশের ভিত দুর্বল করে ফেলে। তুর্কি, খারেজি, বার্বাররা উমাইয়া বংশের মূলোচ্ছেদ করার জন্য রাজ্যময় বিদ্রোহের বীজ রোপণ করে। শিয়া এবং আব্বাসিরা ও উমাইয়াদের হাত থেকে খিলাফত কেড়ে নেওয়ার জন্য বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এরূপ প্রতিকূল অবস্থায়ও হিশাম বিচলিত না হয়ে একজন বিজ্ঞ রাজনীতিকের মতো সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কঠোর হাতে প্রায় সব বিদ্রোহীকে তিনি দমন করে উমাইয়া বংশকে অকাল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি মুয়াবিয়া (রা), আবদুল মালিক, ওয়ালিদের মতো দক্ষ শাসক না হলেও পতনের যুগে উমাইয়া বংশের গৌরব বাতি শেষবারের মতো জ্বালিয়ে ওঠাতে পেরেছিলেন। এ জন্য তাকে উমাইয়া বংশের শেষ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ বলা হয়।

ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ: মানুষ হিসেবে হিশাম ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। রক্ষণশীল ধর্মীয় ক্ষেত্রে, তিনি বিরুদ্ধ মতবাদ সহ্য করতেন না। এজন্য চিন্তার স্বাধীনতার প্রবক্তা কাদেরিয়া সম্প্রদায়কে তিনি বিভিন্নভাবে নির্যাতন করেন।

---

[৩৮] On the plains of Tours the Arabs lost the empire of the world when almost in their grasp. –Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the saracens.* p.151

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক: খলিফা হিশাম শিল্প ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভনক্রেমার বলেন, 'হিশাম ইবনে আবদুল মালিক উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য শাসকদের একজন ছিলেন। তিনি যেমন সুযোগ্য যোদ্ধা ছিলেন, তেমনি সুপণ্ডিতও ছিলেন।' তিনি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য খাল খনন, দুর্গ নির্মাণ ও প্রমোদউদ্যান তৈরি করেছিলেন। রুসাফা প্রাসাদ তার স্থাপত্যশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ

দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৭৪৪ খ্রি.): হিশামের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ওয়ালিদ শাসনক্ষমতায় বসেন। তার সময়ে রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

তৃতীয় ইয়াজিদ (এপ্রিল ৭৪৪- সেপ্টেম্বর ৭৪৪): দ্বিতীয় ওয়ালিদের পর তৃতীয় ইয়াজিদ শাসক হন। তিনি দামেস্ক ও ফিলিস্তিনের বিদ্রোহ দমন করেন। মাত্র ছয় মাস রাজত্বের পর তিনি ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ইব্রাহিম (৭৪৪-কয়েক মাস): তৃতীয় ইয়াজিদের পর ভাই ইব্রাহিম ক্ষমতায় বসেন। তিনি ছিলেন দুর্বল, অযোগ্য শাসক। তৃতীয় ইয়াজিদের মৃত্যুর সংবাদ শুনে দ্বিতীয় মারওয়ান সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হলে দামেস্ক ও বালবেকের মধ্যবর্তী উপত্যকায় সংঘটিত আইন আল জারের যুদ্ধে দ্বিতীয় মারওয়ানের কাছে পরাজিত হয়ে ইব্রাহিম ক্ষমতা হারান।

দ্বিতীয় মারওয়ান (৭৪৪-৭৫০ খ্রি.): ইব্রাহিমকে ক্ষমতাচ্যুত করে খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান ৬০ বছর বয়সে ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের শেষ ও চৌদ্দতম খলিফা। এ সময় তার সাম্রাজ্যে চরম বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। সর্বোপরি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধে তিনি আব্বাসিদের হাতে পরাজিত হলে উমাইয়া শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নসর বিন সাইয়্যারের সংস্কার: শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের শাসনামলে (৭৪৪-৫০ খ্রি.) খোরাসানের গভর্নর নসর বিন সাইয়্যার ভূমি ব্যবস্থাপনায় এক বিরাট সংস্কার সাধন করেন। তিনি মাওয়ালিদের জিজিয়া থেকে রেহাই দেন এবং জিম্মিদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এস এ কিউ হুসাইনী বলেন, 'এসব পদক্ষেপ যদি আগে নেওয়া হতো তাহলে অনেক অবিচার ও সমস্যাকে এড়ানো যেত।'[৩৯]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কাকে 'উমাইয়া বংশের শেষ গৌরব' বলে অভিহিত করা হয়?
২. খলিফা হিশাম কত বছর ক্ষমতায় ছিলেন?
৩. 'সম্ভ্রান্তদের যুদ্ধ' (Battle of the Nobles) কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
৪. আব্দুর রহমান আল গাফিকিকে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন কে?
৫. ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত টুরসের যুদ্ধকে ইসলামের ইতিহাসে কী বলা হয়?
৬. টুরসের যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের শাসক কে ছিলেন?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খলিফা হিশাম যে সব বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

---

[৩৯] If this had been done earlier, many of the difficulties could have been avoided. –Ref: S. A. Q. Husaini, *Arab Administration*, p.138

পাঠ ২১

উমাইয়া খিলাফতের পতনের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
The Causes, Events and Results of the Fall of the Umayyad Khlilafat

উমাইয়া খিলাফতের পতনের কারণ

খলিফা মুয়াবিয়া (রা) ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। ৯০ বছর রাজত্ব করার পর ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি আন্দোলনের মাধ্যমে এ খিলাফতের অবসান ঘটে। ঐতিহাসিকেরা উমাইয়া খিলাফতের পতনের জন্য নানা কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। নিচে এসব কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

প্রাকৃতিক নিয়ম: চতুর্দশ শতকের প্রখ্যাত আরব ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের মতে, 'যেকোনো রাজবংশের স্থিতিকাল একশ বছর।' তার সংজ্ঞানুযায়ী, সব রাজবংশকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা এবং ক্রমাবনতি ও পতন- এ তিনটি নির্দিষ্ট অধ্যায়কে অতিক্রম করতে হয়। উমাইয়াদের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। এ বংশ মুয়াবিয়া (রা)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। আবদুল মালিক ও ওয়ালিদের সময় তা উন্নতি ও বীরত্বের শিখরে আরোহণ করে। এরপর এ খিলাফতের ক্রমাবনতি শুরু হয় এবং ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে এর চূড়ান্ত পতন ঘটে।

খলিফাদের সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব: উমাইয়া যুগে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় খলিফার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। খলিফারা যোগ্যতার কথা চিন্তা না করে নিজ নিজ পুত্রদের পরবর্তী খলিফা নিয়োগ করতেন। এতে অনেক সময় অযোগ্য ব্যক্তিরা খলিফা নিযুক্ত হতেন। এসব অযোগ্য শাসকের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে রাজকাজ পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। ফলে এ সময় অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

খলিফাদের অযোগ্যতা ও বিলাসিতা: উমাইয়া বংশের মোট ১৪ জন শাসক শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এদের মধ্যে মুয়াবিয়া (রা), আবদুল মালিক, আল ওয়ালিদ, দ্বিতীয় ওমর ছাড়া প্রায় সব উমাইয়া শাসক অযোগ্য ও অদক্ষ ছিলেন। তাদের নৈতিক অধঃপতন সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। প্রথম ইয়াজিদকে 'মদ্যপায়ী ইয়াজিদ' বলা হয়। দ্বিতীয় ইয়াজিদ তার রাজসভায় গায়ক মাবাদের সংগীতে বিভোর হয়ে নৃত্য করতেন। ফলে নৈতিকভাবে এ খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে।

খলিফাদের অনৈসলামিক ও নিষ্ঠুর কার্যকলাপ: সাম্রাজের বিস্তৃতি ও সম্পদ বৃদ্ধির ফলে পরবর্তী দুর্বল খলিফারা সুন্দরী দাসী ও নারী নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এসব অনাচার ও ব্যভিচারে শাসক পরিবারের কলুষিত হয়। এমনকি তৃতীয় ইয়াজিদ ও তার উত্তরাধিকারী দাসীপুত্র ছিলেন। এসব খলিফা জুমার নামাজ পড়তেন না এবং রমজান মাসে রোজা রাখতেন না। এরূপ আচরণে মুসলমানরা তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে।

মন্ত্রীদের স্বার্থপরতা: উমাইয়া খিলাফত আমলে প্রশাসনে মন্ত্রীদের ক্ষমতা ও দৌরাত্ম্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষ করে উমাইয়া শাসনের শেষ দিকে অযোগ্য ও দুর্বল খলিফারা মন্ত্রীদের হাতে খিলাফতের প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত করে নিজেরা আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সুযোগে স্বার্থান্ধ মন্ত্রীরা উমাইয়া রাজবংশ বা খিলাফতের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের সুবিধা বিবেচনায় রেখে ইচ্ছামাফিক রাষ্ট্রীয় শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। এমনকি এরা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। মন্ত্রীরা এসব স্বার্থপর তৎপরতার কারণে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় নৈরাজ্য বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত তা উমাইয়া রাজবংশ পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ ও অসহযোগিতা: উমাইয়া সাম্রাজ্য ছিল একটি সামরিক শক্তিনির্ভর রাষ্ট্রশক্তি। কেবল খিলাফত সম্প্রসারণ নয়, খলিফার কর্তৃত্ব ও আধিপত্য সুরক্ষায় সেনাবাহিনীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। উমাইয়াদের গৌরবের যুগে এ সেনাবাহিনী খলিফা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়ক শক্তি হিসেবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে। তবে পরবর্তীতে খলিফাদের অযোগ্যতা, নিজস্বার্থে সেনাবাহিনীকে ব্যবহারের অপপ্রয়াস ইত্যাদি নানা কারণে খলিফাদের প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্য প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, খলিফাদের বেপরোয়া বিলাসী জীবনযাপনের ফলে রাজকোষে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় অনেক সময় সেনাবাহিনীর বেতন পরিশোধ করা হতো না। ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিত। এমনকি তারা খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনে দায়িত্ব পালন না করে অনেক সময় শত্রুদের সহযোগিতা করত। সেনাবাহিনীর এরূপ তৎপরতা উমাইয়া রাজবংশের পতনকে দ্রুততর করেছিল।

অনারব মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য: উমাইয়া বংশের অধিকাংশ শাসকই অনারব মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। তারা অনারব মুসলমানদেরকে আরব মুসলমানদের মতো সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিকক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেননি। অমুসলমানদের মতো তাদেরকে খারাজ দিতে হতো। অনারব মুসলমানদের প্রতি উমাইয়া খলিফাদের এরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের পতনের অন্যতম কারণ।

উমাইয়া ও হাশেমি দ্বন্দ্ব: উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কুরাইশ বংশের দুইটি শাখা উমাইয়া ও হাশেমিদের মধ্যকার বিরোধও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। হাশেমিদের থেকে উমাইয়ারা জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করায় হাশেমিরা প্রথম থেকেই উমাইয়া শাসনের বিরোধিতা করে। উমাইয়ারাও হাশেমিদের দমনের জন্য তাদের ওপর অনেক অত্যাচার করলে হাশেমিরা তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। তাছাড়া হেজাজি আরব (মুদারীয়) ও ইয়েমেনি আরবদের (হিমারীয়) মধ্যকার দীর্ঘদিনের কলহ উমাইয়া সাম্রাজ্যের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। উমাইয়া শাসকগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ কলহ দমন না করে এক পক্ষকে সমর্থন দান করে অপর পক্ষকে শায়েস্তা করেন। ফলে আরবরা দুইটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। এ দ্বন্দ্ব উমাইয়া খিলাফতকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষোভ: উমাইয়া খিলাফতকালে কুরআন ও হাদিসের নীতি উপেক্ষিত হওয়ায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা, এমনকি সুন্নি মুসলমানরাও উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাই তারা যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। অন্যদিকে, খলিফা পদ থেকে হযরত আলির (রা) অপসারণ এবং উমাইয়াগণ কর্তৃক খুৎবাতে হযরত আলি ও তার বংশধরদের বিরুদ্ধে নিন্দা ও কুৎসা রটনা, কারবালার হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি জঘন্য ও নিষ্ঠুর কাজের জন্য শিয়া সম্প্রদায়ের মনে গভীর শোকের সূত্রপাত ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। শিয়া সম্প্রদায় সব সময় উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং উমাইয়াবিরোধী আব্বাসি আন্দোলনে জোরালোভাবে অংশ নেয়।

খারেজি বিদ্রোহ: আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে খারেজি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তাদের প্রথম থেকেই অবিশ্রান্ত বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ উমাইয়া শাসকদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উমাইয়াদের পতন ঘটানোই ছিল খারেজিদের প্রধান লক্ষ্য। খারেজিদের মতে, উমাইয়াদের খিলাফত ছিল অবৈধ।

হিমারীয়-ও মুদারীয় দ্বন্দ্ব: পরস্পরবিরোধী স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে উত্তর আরবীয় মুদারীয় ও দক্ষিণ আরবীয় হিমারীয়দের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছিল। খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় এ বিরোধ ধামাচাপা ছিল। কিন্তু উমাইয়া খলিফারা নিজ নিজ স্বার্থে পুনরায় এদের মধ্যে বিরোধ উস্কে দেন। খলিফাগণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে এ বিরোধ দমন না করে এক পক্ষকে আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহারের ঘৃণ্য খেলায় মেতে ওঠেন। তবে চূড়ান্ত বিচারে এর ফল উমাইয়া রাজবংশের জন্য কোনো শুভ ফল বয়ে আনেনি, বরং এটি তাদের পতনের আরেকটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

ধর্মবেত্তা ও বুদ্ধিজীবী মহলের বিরোধিতা: বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, শাসনব্যবস্থায় মজলিস-উস-শুরার বিলুপ্তি সাধন, খলিফাদের বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণতকরণ, কারবালার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, মক্কা-মদিনায় লুটতরাজ ও এর অপবিত্রকরণ, দুর্নীতি এবং খলিফাসহ শাসকগোষ্ঠীর অনৈসলামিক জীবনযাপন ইত্যাদি নানা কারণে তৎকালীন ধর্মপ্রাণ মুসলমান নাগরিক এবং ধর্মবেত্তা ও বুদ্ধিজীবী মহল দারুণভাবে মর্মাহত হন। তারা উমাইয়া খলিফাদের প্রতি এতটাই অসন্তুষ্ট হন যে, তাদের কখনো সহযোগিতা করতে এগিয়ে যাননি বরং অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছেন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক ধর্মবেত্তা ও বুদ্ধিজীবী মহলের এ বিরোধিতা উমাইয়াদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

জনসমর্থনের অভাব: খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের ইসলামি সাধারণতন্ত্রের পরিবর্তে উমাইয়াদের রাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা, খলিফাদের স্বেচ্ছাচারিতা, জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি উদাসীনতা ইত্যাদি নানা কারণে তারা জনসমর্থন হারায়। এটি তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

সাম্রাজ্যের বিশালতা: উমাইয়া খিলাফত ছিল মুসলিম জাহানের সম্প্রসারণের যুগ। এসময় আরব মুসলমানদের বিজয় এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। এ বিশাল-বিস্তৃত সাম্রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার মতো যোগ্যতা খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক পরবর্তী খলিফাদের মধ্যে প্রথম হিশাম ছাড়া আর কারও ছিল না। এর ফলে দূরবর্তী ও সীমান্তবর্তী প্রদেশসমূহে প্রায়ই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হতো। এসব বিদ্রোহ দমনের ক্ষমতা অধিকাংশ খলিফারই ছিল না। আর এসব বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা ক্রমশ রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি: উমাইয়া রাজবংশের পতনে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতিও অনেকাংশে দায়ী ছিল। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের রাজস্ব নীতির ফলে এমনিতেই সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। এ অবস্থায় পরবর্তী খলিফাগণ বিলাস-ব্যাসন এবং অনুৎপাদনশীল খাতে প্রচুর অর্থের অপচয় করলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। এর ফলে সেনাদের বেতন বকেয়া পড়ে। এতে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অর্থাভাবে জনকল্যাণমূলক কাজ না করায় জনরোষ বৃদ্ধি পায়। এসবই শেষ পর্যন্ত উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের মূলে কাজ করে।

অমুসলিম প্রজাদের উমাইয়াবিরোধী তৎপরতা: উমাইয়া সাম্রাজ্যে বসবাসরত অমুসলিম প্রজারা ধর্মীয় ও নানারকমের নাগরিক সুবিধা ভোগ করলেও নানা কারণে তারা উমাইয়া রাষ্ট্রশক্তির প্রতি অনুগত ছিলেন না। তারা নানাভাবে কেন্দ্রীয় প্রশাসনবিরোধী কাজ করেন। তারা উমাইয়াবিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন যোগায় বলেও ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

ওমর বিন আবদুল আজিজের নীতি: খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ সিংহাসনে আরোহণ করে খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রবর্তিত নীতিসমূহ গ্রহণ করেন। তিনি আলি (রা) বংশীয়দের প্রতি সদাচরণ করেন এবং তাদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি মাওয়ালি ও জিম্মিদের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত কর রহিত করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, ওমর বিন আবদুল আজিজের এসব নীতি কিছুটা হলেও উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী ছিল।

উমাইয়া খিলাফতের পতনের ঘটনাবলি

আব্বাসি আন্দোলন: ইমাম হাসানের প্রতি মুয়াবিয়া (রা)-এর বিশ্বাসঘাতকতা, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ইত্যাদি আলির সমর্থকদের ক্ষুব্ধ করে। তাছাড়া আরব ও অনারব মুসলমানদের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতি, বিজিত জাতির সদস্যদের, বিশেষ করে পারসিকদের সরকারি চাকরির বড় বড় পদ ও সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে অপসারিত করা, হিমারীয় ও মুদারীয় দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি উমাইয়া খলিফাদের রাষ্ট্রের প্রতি অবহেলা প্রভৃতি কারণে আব্বাসি আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনকারীরা মুহাম্মদ বিন আলির মাধ্যমে খিলাফতে হাশেমি বংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য 'আব্বাসি মতবাদ' নামে একটি মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। এ মতবাদ অনুযায়ী খিলাফতের দায়িত্ব আলী বংশীয়দের হাতে প্রদান করা উচিত এবং হযরত আলির ঔরসজাত পুত্র আল হানিফার ওপর ইমামতির দায়িত্ব অর্পিত হওয়া উচিত। কারণ, ইমাম হুসাইনের নাবালক পুত্র জয়নুল আবেদীন ইমামতি করার অনুপযুক্ত। এরপর আব্বাসিরা সর্বদলীয় প্রচারণা শুরু করে কুরাইশদের হাশেমি গোত্রের পক্ষে খিলাফতের দাবি করতে থাকে। এরপর ইবনে আব্বাসের পুত্র আলির মৃত্যুর পর মুহাম্মদ বিন আলী নেতৃত্ব গ্রহণ করে আব্বাসিদের প্রচারণা এগিয়ে নিতে থাকেন এবং এ লক্ষ্যে তিনি হযরত ফাতেমার বংশধরদের নিজ দলে আনতে সক্ষম হন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আগেই তিনি ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। মৃত্যুর আগে মুহাম্মদ বিন আলী ইব্রাহিম, আবুল আব্বাস এবং আবু জাফর নামে তিন পুত্রকে পর্যায়ক্রমে উত্তরাধিকারী করে যান। এ সময় আবু মুসলিম নামে একজন দাঈ (প্রচারক) খোরাসানে আব্বাসি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ব্যাপক প্রচার চালান। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, 'আবু মুসলিম খোরাসানি ম্যাকিয়াভেলির মতো দূরদর্শী ছিলেন।'[৪০] আবু মুসলিম রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সেনাপতি কাহতাবার মাধ্যমে খোরাসান ও ফারগনা দখল করতে সক্ষম হন। ইতোমধ্যে ইব্রাহিম উমাইয়াবিরোধী কাজের জন্য বন্দি হন এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু আবু মুসলিম আন্দোলন চালিয়ে যান এবং সেনাপতি কাহতাবা ও খালিদ বিন

---

[৪০] Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p. 172

বার্মাককে ইরাকে প্রেরণ করেন। এখানে তুমুল যুদ্ধের পর সেনাপতি কাহতাবা মৃত্যুবরণ করেন। কাহতাবার পুত্র হাসান বিন কাহতাবা ইরাকের শাসনকর্তাকে পরাজিত করে কুফা অধিকার করেন। এরপর আব্বাসি বাহিনী নিহাওয়ান্দ ও মেসোপটেমিয়া জয় করে ইব্রাহিমের মনোনয়ন অনুসারে ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে কুফার এক মসজিদে আবুল আব্বাসকে খলিফা বলে ঘোষণা করা হয়। আবুল আব্বাস ভ্রাতৃহত্যা এবং উমাইয়া নৃশংসতার প্রতিশোধ নেবেন বলে শপথ গ্রহণ করেন এবং 'আস সাফফাহ' (রক্তপিপাসু) উপাধি গ্রহণ করেন। এ সময়ই আবু মুসলিমের সেনাপতি আবু আয়ুন মারওয়ানের পুত্রকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

জাবের যুদ্ধ ও উমাইয়াদের চূড়ান্ত পতন: খোরাসান, ইরাক ও পারস্যের পতন এবং পুত্রের পরাজয় প্রভৃতি কারণে উমাইয়া খলিফা মারওয়ান আব্বাসিদের নিশ্চিহ্ন করার দৃঢ় সংকল্প করেন। খিলাফত পুনরুদ্ধারের জন্য মারওয়ান ১,২০,০০০ সৈন্য নিয়ে দজলা নদী অতিক্রম করে জাব নদীর দিকে অগ্রসর হন। ইতোমধ্যে আবু আয়ুন আবুল আব্বাসের প্রেরিত সৈন্যের সাহায্য পান এবং এ সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতি হন আবুল আব্বাসের এক পিতৃব্য আবদুল্লাহ। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি জাব নদীর পূর্ব তীরে কুসাফ নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধ অনেক দিন ধরে চলে। কিন্তু উমাইয়া খলিফা মারওয়ান শেষ পর্যন্ত আব্বাসিদের আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।

উমাইয়া খিলাফতের পতনের ফলাফল: পরাজিত মারওয়ান প্রথমে মসুল ও এরপর হারবান হয়ে দামেস্কে পালিয়ে যান। অবশেষে তিনি প্যালেস্টাইন হয়ে মিসরের দিকে পালানোর সময় তিনি আব্বাসি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন এবং নিহত হন। মারোয়ানের মৃত্যুর সাথে সাথে উমাইয়া বংশের দীর্ঘ ৯০ বছরের শাসনের অবসান ঘটে এবং শুরু হয় আব্বাসি শাসন। ঐতিহাসিক জাবের যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "এই স্মরণীয় যুদ্ধ উমাইয়া শাসনের সমাপ্তি ঘটায়।"[৪২]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়াদের পতন ঘটে? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯]*
২. উমাইয়ারা কত বছর রাজত্ব করে?
৩. কোন আন্দোলনের মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটে?
৪. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে উমাইয়াদের পতন হয়?
৫. কাদের কাছে উমাইয়ারা পতন হয়?
৬. উমাইয়াদের শেষ শাসক কে ছিলেন?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

উমাইয়া খিলাফত পতনের কারণগুলো চিহ্নিত করে পয়েন্ট আকারে লেখো।

গ. দলীয় কাজ

আব্বাসি আন্দোলনই উমাইয়াদের পতনের জন্য দায়ী— বিষয়টির ওপর একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

---

[৪২] *History of the Arabs*

পাঠ ২২

উমাইয়া শাসনামলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
Socio-Economic Conditions During Umayyad Reign

উমাইয়া রাজবংশ ৯০ বছর মুসলিম বিশ্ব শাসন করে। এ সময় খুলাফায়ে রাশেদিনের অনুসৃত রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়। রাজ্য সম্প্রসারণের ফলে প্রথমদিকে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। শাসকগোষ্ঠী নববিজিত অঞ্চলের জনসাধারণের সংস্পর্শে আসে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খলিফা দ্বিতীয় ওমর ছাড়া প্রায় সব খলিফাই বিলাসী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েন। এর ফলে রাষ্ট্রের প্রশাসন, আর্থ-সামাজিক এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। নিচে উমাইয়া শাসনামলের আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

অর্থনৈতিক অবস্থা

রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস: উমাইয়া আমলের প্রথম দিকে নতুন নতুন সমৃদ্ধ অঞ্চল বিজিত হওয়ায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। এসময় রাষ্ট্রের প্রধান আয়ের উৎস ছিল যাকাত, জিজিয়া (অমুসলিম নাগরিকদের দেয় নিরাপত্তা কর), খারাজ (অমুসলিম কৃষকদের দেয় ভূমি কর), উশর (মুসলিম কৃষকদের দেয় ভূমি কর), উশুর (বাণিজ্য কর) খুমস (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ) এবং আল-ফে (খাস ভূমি) ইত্যাদি। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে খলিফাদের ভোগ-বিলাসের কারণে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ সংকট দেখা দিলে খলিফারা ঘাটতি পূরণে করের আওতা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন কর আরোপ করেন। এসব করের মধ্যে ছিল উৎসব কর, বার্বারদের কাছ থেকে আদায় করা শিশু কর এবং জাহাজ ও যন্ত্র নির্মাণ শিল্প থেকে আদায়কৃত কর। এছাড়াও আশ্রিত ও পরাজিত রাষ্ট্রসমূহ থেকে চুক্তিভিত্তিক বাধ্যতামূলক কর আদায় করা হতো। খলিফা আবদুল মালিকের সময় থেকে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধির জন্য মাওয়ালি বা অনারব মুসলিম প্রজাসাধারণের কাছ থেকেও এ কর আদায় করা হতে থাকে। অবশ্য খলিফা দ্বিতীয় ওমর এ নীতির পরিবর্তন করেন। ফলে সাময়িক সময়ের জন্য মাওয়ালিরা এ কর প্রদান থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন।

বায়তুল মাল: খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল জাতীয় সম্পদ। কিন্তু উমাইয়া খলিফাগণ বায়তুল মালকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করেন এবং এর যথেচ্ছ ব্যবহার দ্বারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থাকে শোচনীয় করে তোলেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য: আরবগণ ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উমাইয়া যুগেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। এ সময় অনারব মুসলিম তথা মাওয়ালিরাও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করা লোকদের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল।

ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থা: উমাইয়া আমলে আরব মুসলমানরা নতুন নতুন এলাকা জয় করে। ফলে তারা প্রচুর চাষাবাদযোগ্য ভূমির মালিক হয়। খলিফারা বিজিত এলাকার আবাদযোগ্য ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করেন। তারা জলসেচ এবং অন্যান্য সংস্কারমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রচুর অনাবাদি জমিকে কৃষির উপযোগী করে তোলেন। কৃষি উৎপাদনে অসংখ্য কৃষি শ্রমিক ও দাস নিয়োগ করা হয়। এর ফলে ইরাক এবং সিরিয়াসহ বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি দ্রব্য উৎপাদনে বিপ্লব সাধিত হয়।

কৃষিপণ্য: উমাইয়া আমলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গম, ধান, বার্লি, তুলা ও বিভিন্ন রকমের শাক-সবজি। এ ছাড়াও আপেল, বাদাম, আঙুর, লেবু, জলপাই এবং তরমুজ ইত্যাদি ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো।

কৃষক ও সাধারণ মানুষের অবস্থা: উমাইয়া আমলে শাসক ও অভিজাত গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল। কিন্তু কৃষক, দাস-দাসী এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষি উৎপাদন করে অন্যের আহারের ব্যবস্থা করলেও সমাজে কৃষিজীবীরা আর্থিকভাবে চরম দুর্দশাগ্রস্ত ছিল।

মুদ্রা: প্রথম পর্যায়ে উমাইয়াদের নিজস্ব কোনো নিয়মিত ও স্বীকৃত মুদ্রা ছিল না। অথচ মুদ্রা হলো সবচেয়ে কার্যকর বিনিময় মাধ্যম। মুদ্রা হলো শাসক ও সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বেরও প্রতীক। খলিফা আবদুল মালিক প্রথম উমাইয়াদের নিজস্ব নিয়মিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেন। এজন্য দামেস্কে একটি রাজকীয় টাকশাল তৈরি করা হয়। আবদুল মালিক মুদ্রার জালিয়াতি রোধেও প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

দিউয়ানুল খারাজ: সুষ্ঠুভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উমাইয়া খলিফারা দিউয়ানুল খারাজ নামে একটি পৃথক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিবুল খারাজ পদবিধারী কর্মকর্তা ছিলেন এ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা।

সামাজিক অবস্থা

সমাজে নারীর স্থান: উমাইয়া আমলে সমাজে নারীদের জন্য পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজে নারীদের বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তালহার কন্যা আয়শা, ইমাম হুসাইনের কন্যা সখিনা, প্রথম ওয়ালিদের স্ত্রী উম্মুল বানীন বুদ্ধিমত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাপসী রাবেয়া বসরির বিশেষ খ্যাতি ছিল। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলীর মতে, "তৎকালীন ধার্মিক লোকদের মধ্যে তিনি (রাবেয়া) অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণিত হয়েছেন।"[৪৩] তাছাড়া আবৃত্তি, কবিতা রচনাসহ সাহিত্যে তৎকালীন নারীদের দক্ষতা ছিল। সমাজে নারীরা সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করত।

পোশাক-পরিচ্ছদ: উমাইয়া আমলে এক প্রকার আঁটসাঁট পোশাক প্রচলিত ছিল। লোকে সামর্থ্য ও শ্রেণি-পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন মান ও প্রকৃতির পোশাক পরত। উমাইয়ারা সাধারণত ঢিলা পায়জামা, কোর্তা, চোখা জুতা ও পাগড়ি পরিধান করত। মহিলারা ঢিলা পায়জামা কামিজ ও বক্ষের ওপর ব্যবহার করত। বেদুইনরা কটিবন্ধ, কাঁধে ক্ষুদ্র চাদর এবং মাথায় মস্তকাবরণ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। তখনও সর্বজনীনভাবে বোরকা পরার নিয়ম প্রচলিত হয়নি।

দরবারের কার্যক্রম: উমাইয়া আমলে সাধারণত রাজধানীর কেন্দ্রীয় মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমার নামাজের ইমামতি করতেন খলিফারা। তবে মুয়াবিয়া (রা), আবদুল মালিক, তৃতীয় ইয়াজিদ এবং ওমর বিন আবদুল আজিজ ছাড়া অন্যান্য খলিফারা এ দায়িত্ব পালন করতেন না। খলিফারা উচ্চ আদালতের বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। তাদের দরবারের কার্যক্রম ছিল খুবই জাঁকজমকপূর্ণ।

খলিফাদের ভোগবিলাস ও শখ: উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে একমাত্র খলিফা দ্বিতীয় ওমর ছাড়া বাকি সব খলিফাই ছিলেন আড়ম্বরপ্রিয়। প্রথম ইয়াজিদের সময় থেকে সমাজে মদপান প্রচলিত হয়। সমাজে উপপত্নী প্রথার প্রচলন ছিল। উমাইয়া খলিফাদের সময় হেরেমপ্রথা মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। খলিফারা ভোগবিলাস, গীতবাদ্য ও নৃত্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে অনেকে শিকার পছন্দ করতেন। তবে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে ঘোড়দৌড়, পাশা, মোরগযুদ্ধ প্রভৃতি খেলা প্রচলিত ছিল। উমাইয়াদের শেষ দিকে পোলো খেলার প্রচলন দেখা যায়, যা পারস্য থেকে আমদানি হয়েছিল। তারা দাবা ও তাস খেলাও জানত। খলিফা হিশামের সময় প্রাক-ইসলামি ও ইসলামি যুগের সবচেয়ে বড় ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হয়।

সামাজিক শ্রেণিবিভাগ

উমাইয়া সমাজে চার শ্রেণির লোক ছিল। যথা— ক. অভিজাত সম্প্রদায়, খ. মাওয়ালি, গ. জিম্মি এবং ঘ. দাস সম্প্রদায়।

অভিজাত সম্প্রদায়: উমাইয়া আমলে রাজবংশ, আমলাবর্গ, বিজেতাগণ এবং সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারবর্গ অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মনোরম পরিবেশে সুনির্মিত অট্টালিকাতে অভিজাত সম্প্রদায়ের আমলারা, বিজেতারা এবং সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারবর্গ বাস করতেন। তাদের প্রাসাদভবন স্বর্ণ ও মার্বেল পাথর দিয়ে নির্মিত ছিল এবং মেঝে ও দেয়ালগুলো কারুকার্যখচিত ছিল।

---

[৪৩] Ref: Syed Ameer Ali, *History of the Saracens*

মাওয়ালি সম্প্রদায়: উমাইয়া সমাজের নবদীক্ষিত অনারবীয় মুসলমানরাই হলেন মাওয়ালি। ইসলামের সেবায় তাদের অবদান থাকলেও তারা আরব মুসলমানদের মতো সুযোগ-সুবিধা পেতেন না। ইসলাম গ্রহণ করার পরও তাদেরকে জিজিয়া ও খারাজ দিতে হতো। তবে উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে ওমর বিন আবদুল আজিজ তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি তুলে দেন। তবে আরবীয়দের সাথে বৈষম্যের কারণে মাওয়ালিরা এক সময় উমাইয়া শাসনের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং আব্বাসি আন্দোলনে যোগদান করে উমাইয়া বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

জিম্মি: খ্রিস্টান, ইহুদি, অগ্নি উপাসক এবং অন্যান্য আশ্রিত অমুসলিমরা আরব সমাজে জিম্মি নামে পরিচিত ছিল। উমাইয়া আমলে এ জিম্মিরা সমাজে তৃতীয় স্থানের অধিকারী ছিল। উমাইয়া আমলে চাষাবাদ সাধারণত তারাই করত। সে জন্য তারা খারাজ বা ভূমিকর প্রদান করত। যতদিন পর্যন্ত জিম্মিরা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকত ততদিন তারা সকল প্রকার স্বাধীনতা ভোগ করত। তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে নিযুক্ত হতো। উমাইয়া খলিফারাও তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন। ৬৭৯ খ্রি. এডেসার বৃহৎ গির্জাটির একটি অংশ ধসে গেলে মুয়াবিয়া (রা) তা পুনঃনির্মাণের আদেশ দেন। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের আমলে জিম্মিদের প্রভাব সাময়িকভাবে হ্রাস পায়।

দাস সম্প্রদায়: উমাইয়া সমাজে সর্বনিম্ন স্তরে ছিল দাস সম্প্রদায়। উমাইয়া শাসনামলে যুদ্ধবন্দি ব্যক্তিরাই দাস হিসেবে পরিগণিত হতো। দাসরা রাজপরিবার, বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হতো। সমাজে দাসদাসী কেনাবেচা একটি লাভজনক ব্যবসা ছিল। তবে উমাইয়া আমলে দাসদের জীবনমান খুব খারাপ ছিল না। ঐতিহাসিক ডাউসি বলেন, "দাসদের অবস্থা সর্বদা সহনীয় এবং প্রায়ই সুখকর ছিল।"

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন খিলাফত মুসলিম জাহানের সম্প্রসারণের যুগ ছিল?

২. অমুসলিম কৃষকদের দেওয়া ভূমি করকে কী বলা হয়?

৩. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গনিমতের এক-পঞ্চমাংশকে কী বলা হয়?

৪. বায়তুল মালকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করেন কারা?

৫. বিনিময়ের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম কী?

৬. উমাইয়া আমলে কোন নারী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. উমাইয়া আমলের রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসগুলো চিহ্নিত করো।

২. উমাইয়া আমলের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২৩

উমাইয়া প্রশাসন ব্যবস্থা
Administration of the Umayyad

ইসলামের প্রাথমিক যুগে, বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় যে ধর্মভিত্তিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল উমাইয়া শাসনামলে তা ব্যহত হয়। উমাইয়া শাসনামলে খলিফা সাম্রাজ্যের সকল ক্ষমতার উৎস ছিলেন। নিজেদের কার্যাবলির জন্য জনসাধারণ বা অন্য কারও কাছে তারা দায়ী থাকতেন না। মজলিশ-উস-শূরা বিলোপ করে খলিফা সকল ক্ষমতার অধিকারী হন। তারা বায়তুল মাল জনগণের সম্পত্তির পরিবর্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেন। রাষ্ট্র পরিচালনার এসব মৌলিক পরিবর্তন উমাইয়া প্রশাসনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা

খলিফার অবস্থান: উমাইয়া প্রশাসনে শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিল খলিফার অবস্থান। তিনি একাই শাসন, বিচার ও সামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিয়োগদান বা পদচ্যুত করতে পারতেন। উমাইয়া খলিফারা খুলাফায়ে রাশেদিনের সহজ-সরল জীবন পরিত্যাগ করে পারসিক ও রোমানদের মতো জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসী জীবনযাপন করতেন। তাদের দরবার ও রাজপ্রাসাদ অত্যন্ত জাঁকজকমপূর্ণ ছিল।

দিওয়ানুল জুন্দ বা সামরিক বিভাগ: খলিফা প্রথম ওমরের সময় প্রথমবারের মতো ইসলামে এ বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু উমাইয়া শাসনামলে এসে এ বিভাগের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। উমাইয়া শাসনামলে সেনাবাহিনীকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-কেন্দ্রীয় বাহিনী, ২টি শাখা বাহিনী, অগ্রবর্তী বাহিনী ও পশ্চাৎ বাহিনী। এস. এ. কিউ. হুসাইনী বলেন, “এটি হচ্ছে একই রকম বিখ্যাত দিওয়ান যা প্রথম ওমর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর কাঠামোটি যা ওমর (রা) রেখে যান তা উমাইয়া আমলে এসে অনেক পরিবর্তিত হয়।” [৪৪]

দিওয়ান আল খারাজ বা ভূমিরাজস্ব বিভাগ: উমাইয়া যুগে কেন্দ্রীয় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ছিল খুবই গুরুত্বপুর্ণ একটি বিভাগ। এ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে ‘সাহিব আল-খারাজ’ (Director of the Finance Department) বলা হতো। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, এটি বর্তমান অর্থ বিভাগের মতো ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব এ বিভাগে সংরক্ষিত থাকতো। এ বিভাগের মাধ্যমে উমাইয়া খলিফারা সাম্রাজ্যের যাবতীয় জনহিতকর কার্যাবলি সম্পন্ন করতেন।

দিওয়ানুল রাসায়েল বা পত্র আদান-প্রদান বিভাগ: খলিফা আবদুল মালিক দিওয়ানুল রাসায়েল বা পত্র আদান-প্রদান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। উমাইয়াদের আমলে রাষ্ট্রীয় আদেশাবলি লিখন এবং বিভিন্ন প্রকারের দলিল-পত্রাদি সংরক্ষণের কার্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য এ বিভাগ গড়ে তোলা হয়। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, ‘প্রাদেশিক বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ ও শাসনকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ভার এ পত্র যোগাযোগ বিভাগের ওপরই ন্যস্ত ছিল।’[৪৫]

দিওয়ানুল বারিদ বা ডাক বিভাগ: খলিফা মুয়াবিয়া (রা) দিয়ানুল বারিদ বা ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি রাষ্ট্রের সংবাদ আদান প্রদানের জন্য কাজ করত। এস এম ইমামুদ্দিন বলেন, “মুয়াবিয়া (রা) ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন, আবদুল মালিক এর উন্নতি সাধন করেন এবং ওয়ালিদ-এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করেন।”[৪৬]

প্রথমদিকে সরকারি কার্যাদি সম্পন্নের জন্য ডাক বিভাগের সৃষ্টি হলেও পরবর্তী সময়ে সাধারণ জনগণও এর সুবিধা লাভ করেছিল। এ বিভাগ গুপ্তচরের কাজও সম্পাদন করত। ডাক বিভাগের প্রধানকে ‘সাহিব আল-বারিদ’ বলা হতো।

---

[৪৪] It was the same great Diwan established by Umar I. The form in which 'Umar had left under went much change in the hands of the Umayyads. –Ref: S A Q Husaini, *Arab Administration*, p.95

[৪৫] The board of correspondence, which was vested with the control of provincial affairs and all communications from the governors. (Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*. p.191

[৪৬] Muawiyah introduce postal service, Abd-al-Malik exteended in throughout his empire and Walid made full use of it. –Ref: S.M. Imamuddin, *Arab Muslim Administration*, p.60

বিচার বিভাগ: সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক বিচার বিভাগ আব্বাসি আমলে প্রতিষ্ঠিত হলেও উমাইয়া শাসনামলে খুলাফায়ে রাশেদিনের মতো একটি বিচার বিভাগ ছিল। খলিফা ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারক। তিনি ইচ্ছা করলে কাউকে শাস্তি প্রদান আবার শাস্তি মওকুফ করতে পারতেন। তবে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়গুলো তারা ধর্মীয় অনুশাসন মতোই সম্পন্ন করতেন।

ধর্ম সংক্রান্ত বিভাগ: খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়কার ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে উমাইয়া শাসনামলে ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হতো। এস. এ. কিউ. হুসাইনী বলেন, "উমাইয়া আমলের ধর্মীয় প্রশাসন ব্যবস্থাপনা খুলাফায়ে রাশেদিনের মতোই ছিল।"[৪৭] এ সময় শাসকবৃন্দ নিজ উদ্যোগে 'দাঈ' বা ধর্ম প্রচারক প্রেরণ না করলেও দেশ বিজয়ের ফলে ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হয়। এ সময় সাম্রাজ্যের বহুস্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়। নিয়মিত কোনো ধর্ম বিভাগ না থাকলেও এ বিভাগের মাধ্যমে যাকাতের টাকা আদায় ও বণ্টন করা হতো।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

প্রাদেশিক বিভাগ: উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বৃহত্তম আকার ধারণ করে। এতে বড় সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র থেকে শাসন করা সম্ভবপর নয় ভেবে উমাইয়ারা তাদের সাম্রাজ্যকে প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করেন। এ কারণে উমাইয়ারা সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে (ইকলিম) ভাগ করেন। উমাইয়াদের প্রদেশগুলো হলো— আরব, ইরাক, জাজিরা, সিরিয়া, মিসর, আল-মাগরিব, পূর্ব প্রদেশ, আল-দাইলাম, আল বিরাব, আল-জিবাল, খুজিস্তান, ফারস, কিরমান ও সিন্ধু। প্রদেশগুলোকে সর্বমোট ৭৯টি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। তবে শাসনকার্যের সুবিধার্থে এ প্রদেশগুলোকে ৫টি বড় প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল সেগুলোর শাসনকর্তাকে রাজপ্রতিনিধি (ভাইসরয়) বলা হতো। এ প্রদেশগুলো হলো—

১. আরব দেশের প্রদেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল— হেজাজ, ইয়েমেন, ওমান ও হাজর। এগুলোর রাজধানী ছিল মক্কা।

২. ইরাকের প্রদেশসমূহ কুফা, বসরা, ওয়াসিত ও মাদায়েন। এগুলোর রাজধানী ছিল কুফা।

৩. নিম্ন ও উচ্চ মিসর নিয়ে গঠিত প্রদেশ। এর রাজধানী ছিল ফুসতাত।

৪. জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজার বাইজানের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত প্রদেশ। এর রাজধানী ছিল মসুল।

৫. উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স, সিসিলি ও ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চল। এর রাজধানী ছিল কায়রোয়ান।

দিওয়ান আল-জুনূদ বা সামরিক বিভাগ: উমাইয়া শাসনামলে কেন্দ্রের মতো প্রদেশগুলোতেও স্বতন্ত্র দিওয়ান আল-জুনূদ বা সামরিক বিভাগ ছিল। প্রদেশসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হতো। এস এ কিউ হুসাইনী বলেন, 'দিয়ানুল জুনূদ প্রদেশের সামরিক কার্যাদি সম্পাদন করত।'[৪৮] প্রাদেশিক সেনাবাহিনীতে একজন সেনাপতি থাকলেও ওয়ালি বা প্রাদেশিক গভর্নরই ছিলেন এর প্রধান।

দিওয়ান আল-রাসায়েল বা যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন বিভাগ: কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও অন্যান্য প্রদেশসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য প্রদেশগুলোতেও কেন্দ্রের মতো 'দিওয়ান আল-রাসায়েল' বা যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এস এ কিউ হুসাইনী বলেন, 'দিয়ানুল রাসায়েল ছিল মুখ্য সচিবালয় যা অন্যান্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের কাজ করতো।'[৪৯]

---

[৪৭] The religious organisation under the Umayyads remained almost the same as under the pious Khalifahs. –Ref: S.A. Q. Husaini, *Arab Administraion*, p.107

[৪৮] Diwan's-Junud performed military services in the province –Ref: Dr. S.A.Q Husaini, *Arab Administration*, p.118

[৪৯] Diwanu's-Rasail was the chief secretariat which dealt with all correspondence and co-ordinated the work of all departments. –Ref: Dr. S. A. Q. Husaini, *Arab Administration*, p.118

দিওয়ান আল-মুস্তাগিল্লাহ বা রাজস্ব বিভাগ: উমাইয়া যুগে প্রদেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য 'দিওয়ান আল-মুস্তাগিল্লাহ' বা রাজস্ব বিভাগ গঠন করা হয়। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন 'আমিল'। কখনও কখনও আমিলের ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্নরের চেয়ে বেশি ছিল। প্রদেশের সকল রাজস্ব আয় হিসাব-নিকাশ করে প্রদেশের জন্য একটি অংশ রেখে আমিল বাকি অর্থ কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা করতেন। এ তিনটি প্রাদেশিক দপ্তর ছাড়া আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র দপ্তর ছিল।

আল বারিদ বা ডাক বিভাগ: উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া (রা) রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য সাম্রাজ্যে 'আল বারিদ' বা ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা আবদুল মালিকের সময় ডাক বিভাগের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। তিনি কেন্দ্রীয় রাজধানী দামেস্কের সাথে প্রাদেশিক রাজধানীগুলোর দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করেন। এ বিভাগ সংবাদ আদান প্রদানের পাশাপাশি সাম্রাজ্যে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা খলিফাকে অবহিত করত।

দিওয়ান আল খারাজ: উমাইয়া শাসনামলে খারাজি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে প্রদেশসমূহে 'দিওয়ান আল-খারাজ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন 'সাহিবুল খারাজ' নামক একজন কর্মকর্তা।

বিচার বিভাগ: উমাইয়া শাসনামলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার মতো প্রদেশেও বিচার বিভাগ ছিল। এ সময় প্রদেশসমূহে খুলাফায়ে রাশেদিনের মতো বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হতো। খলিফা প্রদেশসমূহে কাজি নিয়োগ দিতেন। কাজিকে কুরআন, হাদিস, মুসলিম আইন ও ধর্মশাস্ত্রে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হতে হতো। পি. কে. হিট্টির মতে, "অমুসলিমরা তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় প্রধানের নিয়ন্ত্রণে স্বশাসন ভোগ করতেন। কাজিরা ফৌজদারি মামলার বিচারকার্য ছাড়াও ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচালনা, প্রতিবন্ধী ও অনাথদের সম্পত্তির দেখাশোনা করতেন।"

ধর্ম সংক্রান্ত বিভাগ: খুলাফায়ে রাশেদিনের ধর্ম ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে উমাইয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ধর্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হতো। প্রাদেশিক গভর্নররা সাম্রাজ্যে বহু মাদ্রাসা, মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার সাধন করতেন। ওয়ালিদের উদ্যোগে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁদের বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হতো।

প্রাদেশিক পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা: উমাইয়া শাসনামলে প্রাদেশিক পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন ওয়ালি। এ ছাড়াও আমিল, সাহিব-আল-খারাজ, কাতিব, সাহিব-আল-আহদান ও কাজি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উমাইয়া প্রশাসনে শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে কার অবস্থান ছিল?
২. কোন আমলে মজলিশ-উস-শূরা বিলোপ করা হয়?
৩. উমাইয়া খলিফারা কাদের মতো জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসী জীবনযাপন করতেন?
৪. সাহিব আল-খারাজ কে?
৫. দিয়ানুল বারিদ বা ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন কে?
৬. উমাইয়ারা সাম্রাজ্যকে কতটি ইকলিমে (প্রদেশ) ভাগ করেন?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. উমাইয়াদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর একটি ছক তৈরি করো।
২. উমাইয়া আমলের প্রদেশসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২৪

উমাইয়া যুগে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা
Practice of Literature, Learning and Cultural Activities of the Umayyad Period

উমাইয়া যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা-দীক্ষা: উমাইয়া যুগে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন ছিল না। তবে এ সময় ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সাম্রাজ্যের মসজিদগুলোই ছিল শিক্ষা বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র। কুরআন ও হাদিসকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সে যুগের প্রধান প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা এবং মিসর। এ সময় কেউ মাতৃভাষায় লিখতে ও পড়তে পারলেই তাকে শিক্ষিত বলা হতো। শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী জনসাধারণকে মসজিদে কুরআন ও হাদিস শিক্ষা দেওয়া হতো। ইসলামের সাবেক শিক্ষকেরাই ছিলেন কুরআন পাঠক। উমাইয়া শিক্ষা বিস্তারের এ ধারায় কুফায় আল-যাহহাক ইবন মুজাহিয, (মৃ. ৭২৩) প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। পি. কে. হিট্টির মতে, এ স্কুল ছিল অবৈতনিক। এ সময় বসরায় এক বেদুইন একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ স্কুলটিও ছিল অবৈতনিক। খলিফাদের পুত্রদের শিক্ষার জন্য সিরিয়ার কুমায়েরুল আমরুহা এবং বাদিরাহ নামক স্থানে বিশেষ স্কুল ছিল। সেখানে শিক্ষা সমাপ্ত হলে 'আল কামিল' উপাধি দেওয়া হতো। সে সময়ে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করার প্রথাও ছিল।

আরবি ব্যাকরণের উৎপত্তি ও চর্চা: ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে দলে দলে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এ সময় তাদের অনেকে সরকারি চাকরি লাভ করে। এসব নওমুসলিমের কুরআন পাঠের চাহিদা, বিজেতাদের সাথে কথোপকথন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরবি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পারস্যের সীমান্ত অঞ্চলে আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা শুরু হয়। তাই এ সময়ই বসরায় আরবি ব্যাকরণের কিংবদন্তী স্রষ্টা আবু আল-আসওয়াদ আল দুয়ালি (মৃ. ৬৮৮ খ্রি.)-এর আবির্ভাব ঘটে। বিখ্যাত আরব জীবনীকার ইবনে খাল্লিকানের বর্ণনা থেকে জানা যায়, খলিফা আলি (রা)-এর পরামর্শে আল-দুয়ালি ব্যাকরণের কর্তা, ক্রিয়া এবং অব্যয়-এ ৩ টির সূত্র চালু করেন। পদের সূত্র ও ব্যবহার শুরু করেন। পি. কে. হিট্টির মতে, আরবি ব্যাকরণ এরপর থেকেই ধীরে ধীরে দীর্ঘ বিকাশের দিকে এগিয়ে যায়। এরপর আরবি ব্যাকরণের বিকাশে এগিয়ে আসেন বসরার বিখ্যাত বৈয়াকরণ আল খলিল ইবন আহমাদ (মৃ. ৭৮৬ খ্রি.)। তিনি আরবি অভিধান 'কিতাব আল-আইন' লেখেন। পরবর্তীকালে তার ছাত্র পারস্যের সিবাওয়াইহ (মৃ. ৭৯৩ খ্রি.) 'আল কিতাব' নামে প্রথম আরবি ব্যাকরণের গ্রন্থ রচনা করেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, 'আল কিতাব' থেকেই আরবি ভাষার যাবতীয় গবেষণার যাত্রা শুরু হয়েছিল।[৫০]

কুরআন, হাদিস ও ফিকহ্ চর্চা: উমাইয়া শাসনামলে কুফা ও বসরাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় প্রথা ও বিধি-ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। কুরআন পাঠ এবং এর ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার ফলে ভাষাতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব ও হাদিসের ওপর গবেষণা শুরু হয়। বসরাকে কেন্দ্র করে এ চর্চা শুরু হয়েছিল। আল-হাসান বসরি এবং ইবনে শিহাব আল জুহরির (মৃ. ৭৪২) মতো হাদিসবেত্তা ও আইনশাস্ত্রবিদরা এ গবেষণা কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আশশাবি, ইবন-শিহাব আল জুহরি এবং হাসান আল বসরি প্রমুখ আলেম কুরআন, হাদিস ও ফিকহ্ (আইন) শাস্ত্রের চর্চা করে আরবের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। কুফার অধিবাসী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ প্রায় ৮৪৮টি হাদিসের বর্ণনা

---

[৫০] Al-kitab (the book), which has ever since been the basis of all native studies of the subject. –Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*. p. 242

করেছেন। ইমাম হাসান আল বসরি বসরায় একটি ধর্মদর্শন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। মুতাজিলা মতবাদের প্রবর্তক বিখ্যাত দার্শনিক ওয়াসিল বিন আতা তারই শিষ্য ছিলেন। ইমাম হুসাইনের পৌত্র ইমাম জাফর সাদিক এ যুগেরই একজন প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ছিলেন। কুফায়ও এ সময় কুরআন, হাদিস ও ফিকহ্ শাস্ত্রের চর্চা শুরু হয়েছিল। উমাইয়া আমলে কুফায় বিখ্যাত ফকিহ ও হাদিসবেত্তা ছিলেন আমির ইবন-শহারিল, ইবনে মাসুদ, ইমাম আবু হানিফা প্রমুখ।

ইতিহাস: আরবের ইতিহাস শুরু হয় প্রবাদ আকারে। তখন যুদ্ধের ঘটনাবলি নিয়ে 'মাগাজি' এবং হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনী ও তার সাহাবিদের ছোট ছোট কাহিনি ও প্রবাদ নিয়ে 'সিরাহ' নামক ইতিহাস রচিত হয়েছিল। উমাইয়া খলিফারাও ইতিহাস রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। উমাইয়া আমলের প্রথম দিকে শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবেত্তা ছিলেন আবিদ ইবনে শরিয়া। তিনি মুয়াবিয়া (রা)-এর আমন্ত্রণে বাগদাদে গিয়ে তদানীন্তন আরব্য বংশের প্রাচীন সব রাজাদের বংশবৃত্তান্ত শুনিয়েছিলেন। তার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ, 'কিতাব আল-মুলক ও ওয়া আখবার আল মাদইন'। এ ছাড়া এ সময়ের বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ছিলেন ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বি (মৃ. ৭২৮ খ্রি.) এবং ওবায়েদ। কুফার হিসাম আল কালবি এ সময় একশত উনত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা পরবর্তীকালের ইতিহাস গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি এখনও সংরক্ষিত আছে। সে সময়ে আল জুহরিও একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন।

চিকিৎসা ও রসায়নশাস্ত্র: উমাইয়া শাসনামলে কুফা ও বসরাকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানচর্চা বিকশিত হতে থাকে। এ সময় আরবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তখনকার আরবদের মতে, বিজ্ঞান ছিল দুই প্রকার, যথা- শরীর-সংক্রান্ত ও ধর্ম-সংক্রান্ত। আরবরা গ্রিক ও পারসিকদের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে চিকিৎসা করার জ্ঞানলাভ করে। সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার ছিলেন তায়েফের অধিবাসী হারিস। উমাইয়া প্রথম খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন ইবনে উমাল, হাজ্জাজের গৃহচিকিৎসক তাসাদুক এবং মারওয়ানের গৃহচিকিৎসক ছিলেন মাসার গ্রাওয়াহ। তারা গ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রেও দক্ষ ছিলেন। মাসার গ্রাওয়াহ গ্রিক ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। গ্রিক ও পারসিক চিকিৎসাশাস্ত্রকে কেন্দ্র করে এ সময় কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা শুরু হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন রোগের ওষুধ আবিষ্কারে এ কেন্দ্র দুটি বিরাট ভূমিকা রেখেছিল বলে জানা যায়। এ সময়ে বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন ইবনে উছাল এবং তারজুক। এ সময়ে রসায়ন বিদ্যাতেও উমাইয়ারা ব্যাপক উন্নতি করেছিল। প্রথম ইয়াজিদের পুত্র খালিদ গ্রিকদের রসায়নশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ, চিকিৎসা পুস্তক এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পুস্তকসমূহ আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। এ সময় ইমাম সাদিক রসায়ন ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ লিখে সুনাম অর্জন করেন।

উমাইয়া যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা

কাব্য ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা: উমাইয়া খলিফারা কবিতা ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করে আরব জাতির ঐতিহ্য সমুন্নত রেখেছিলেন। জাহেলিয়া যুগের 'কাসিদা' নামক প্রেমের কবিতা অবলম্বনে উমাইয়া শাসনামলে বহু প্রেমের কাব্য ও আখ্যান রচিত হয়। প্রেমের কবিতা রচনায় ওমর ইবন আবি রাবিয়া ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাকে সে যুগের 'কবিসম্রাট' বলা হয়। তার সমকক্ষ ছিলেন ইয়েমেনের কবি জামিল। তিনি 'লায়লা-মজনু' আখ্যান নিয়ে অনেক কবিতা রচনা করেন। প্রেমের কবিতা ছাড়াও সে যুগে রাজনৈতিক কবিতার চর্চা করা হতো। মুয়াবিয়া (রা)-এর পুত্র ইয়াজিদের মনোনয়ন নিয়ে মিসকিন আল দারিমি কবিতা রচনা করেছিলেন। সে যুগে ব্যঙ্গাত্মক বিষয়, প্রাক-ইসলামি প্রেক্ষাপট নিয়েও কবিতা রচিত হতো। সে সময়ে ব্যঙ্গ কবি হিসেবে জারি, প্রাক-ইসলামি যুগের কবিতা সংকলক হিসেবে হাম্মাদ আল রাবিয়াহ, সভাকবি হিসেবে আল ফারাজদাক বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কবি হামমাদ আল রাবিয়াহ ২৯০০ পঙক্তিসমৃদ্ধ দীর্ঘ কাসিদা আবৃত্তি করে খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের কাছ থেকে ১,০০,০০০ দিরহাম পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

কবিতা চর্চা: সে সময় উকাজ মেলার অনুকরণে কুফা ও বসরার তিন মাইল দূরে 'মিরদ' নামে মেলা বসত। এখানে খ্যাতনামা কবিরা মজলিশ বসাতেন। উমাইয়া শাসনামলে বাগ্মিতা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিরা বাগ্মিতার অনুশীলন করতেন। সেনাপতি সৈন্যদলকে উৎসাহিত করতে এবং শাসকেরা শাসনকে জোরদার করতে ও সরকারি নীতিসমূহ জনসাধারণের সামনে ব্যাখ্যা করতে বাগ্মিতার আশ্রয় নিতেন। কুফা ও বসরার প্রশাসক যিয়াদ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বক্তা। এ ছাড়া ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী। মালিক ইবনে দীনার বলেছেন, 'হাজ্জাজের বক্তৃতা মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে। তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বক্তা আমি দেখিনি। বক্তব্যের অকাট্য যুক্তিতে তিনি সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করতেন।' সাধক হাসান বসরিও ছিলেন একজন সুবক্তা।

সংগীত চর্চা: উমাইয়া খিলাফতকালে বাইজান্টাইনদের অনুকরণে হেরেম প্রথা প্রচলিত হওয়ার সাথে সাথে গান-বাজনাও চালু হয়। উমাইয়া খলিফারা সংগীতানুরাগী ছিলেন। তখন মুখান্নাসন নামে এক ব্যক্তি সংগীতশিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। মদিনার তুবায়েসকে ইসলামি সংগীতের জনক বলা হয়। তুবায়েসের শিষ্য সুবায়েজ ইসলামের শ্রেষ্ঠ চারজন গায়কের অন্যতম ছিলেন। মক্কার সাইদ বিন মিসজাহ উমাইয়া যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। গায়ক হিসেবে মাবাদও বিশাল খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি খলিফা প্রথম ওয়ালিদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। গায়িকা হিসেবে মদিনার জামিলা, দ্বিতীয় ইয়াজিদের হেরেমের গায়িকা হাবিবা ও সাল্লামার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধর্মীয় ও দার্শনিকদলের বিকাশ: উমাইয়া শাসনামলে কয়েকটি ধর্মীয় দার্শনিক দলের উদ্ভব হয়। এ দলগুলো ছিল সত্যানুসন্ধিৎসু ও গভীর চিন্তাশীল। এ দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিয়া, মুতাজিলা, আশারিয়া প্রভৃতি। শিয়াদের মধ্যে ইমাম জাফর সাদিকের প্রচারিত দার্শনিক মতবাদ মদিনায় ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। সে সময়ে এ মতবাদগুলোর শোনার প্রবক্তাদের বক্তৃতা জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে দার্শনিক ও ছাত্ররা আসত। মুতাজিলা মতবাদের ওয়াসিল বিন আতা মানবীয় ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন।

উমাইয়া শাসনামলে ইতিহাস, দর্শন, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমানরা জ্ঞানচর্চা শুরু করে। আব্বাসি আমলে মুসলমানরা যে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল, তার সূচনা হয়েছিল উমাইয়া যুগেই।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উমাইয়া যুগে কেমন শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন ছিল?
২. উমাইয়া যুগে শিক্ষা বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র কী ছিল?
৩. 'আল কিতাব' নামে প্রথম আরবি ব্যাকরণ রচিত হয় কাদের সময়ে?
৪. উমাইয়া শাসনামলে কোথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়?
৫. কাদের ইতিহাস প্রবাদ আকারে শুরু হয়?
৬. কাদের সময়ে কুফা ও বসরায় মিরদ মেলা বসত?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. উমাইয়া আমলের শিক্ষাব্যবস্থার নানা দিক নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।
২. উমাইয়া আমলের বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ও রসায়নবিদদের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২৫

উমাইয়া আমলের শিল্প ও স্থাপত্য
Art and Architecture During Umayyad Reign

উমাইয়া খলিফারা খ্যাতি ও ভোগ-বিলাসের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। চৌদ্দজন উমাইয়া খলিফার মধ্যে যোগ্যতম দশজন খলিফাই স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কম-বেশি খ্যাতিলাভ করেছেন। উমাইয়া যুগে খিলাফতের সম্প্রসারণের সাথে সাথে গ্রিক, পারসিক, রোমীয় স্থাপত্যকীর্তির প্রভাবে আরব স্থাপত্যশিল্পে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

ধর্মীয় ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত খ্যাতি লাভ ছাড়াও ইসলামকে গৌরবান্বিত করা উমাইয়াদের একটি উদ্দেশ্য ছিল। উমাইয়া আমলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নির্মাণ উপকরণের সহজলভ্যতা ও কারিগরের দক্ষতার ফলেই স্থাপত্যের এত অধিক অগ্রগতি সাধিত হয়। সিরিয়াতেই এ সময়ের স্থাপত্য কীর্তিরাজির অধিকাংশ নির্মাণ করা হয়। বাইজান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঐশ্বর্যপূর্ণ স্থাপত্যশিল্পের সংস্পর্শে এসে উমাইয়া খলিফাগণ নিজেদের সভ্যতাকে পরিপূর্ণ করেন। ধর্মীয় ইমারত ও প্রাসাদ এ দুই ধরনের অট্টালিকা নির্মাণেই বিশেষ তারা খ্যাতি লাভ করেছেন।

ধর্মীয় ইমারতসমূহের মধ্যে ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আবদুল মালিকের নির্মিত কুব্বাতুস সাখরা বা Dome of the Rock একক ও অনন্য। নির্মাণের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও কাবাঘরের প্রতিভূ হিসেবে নির্মিত হওয়ায় এটি ধর্মীয় ইমারত বলেই পরিগণিত হয়। এ. বি. এম হোসেনের মতে, "হাদিস অনুসারে হারাম শরীফস্থিত মারিয়া পাহাড়ের শীর্ষ হতে মহানবি (স) মিরাজ গমন করেছিলেন বলে এই স্থানকেই খলিফা আবদুল-মালিক উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করলেন এবং এই স্থানেই কুব্বাতুল সাখ্‌রা নির্মাণের আদেশ দিলেন।" (*সূত্র: আরব স্থাপত্য*, পৃ. ৩৯)। এটি এক গম্বুজবিশিষ্ট অষ্টকোণাকার একটি অপূর্ব ইমারত। এর মধ্যভাগে অবস্থিত একটি বিশালাকার পাথরে পদচিহ্ন রয়েছে। এটি এক চিহ্নকে বেষ্টিত করে একটি গোলাকার ও দুটি অষ্টকোণাকার প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে মক্কার পবিত্র হজ পালনের বিকল্প হিসেবে জেরুজালেমের কুব্বাতুল সাখ্‌রা এ মুসলমানদের আকৃষ্ট করার জন্য তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ পথের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আবদুল মালিকের চেষ্টা বিফল হয়। বাইজান্টাইন রীতির প্রভাবে নির্মিত এ ইমারত স্থাপত্যশৈলী ও অলংকরণের দিক থেকে ইসলামি স্থাপত্যকলার এক অত্যাশ্চর্য নিদর্শন।

মসজিদ নির্মাণের ওপর ভিত্তি করেই উমাইয়া আমলে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বত্রই উমাইয়া আমলে নির্মিত দামেস্ক মসজিদ ও আল আকসা মসজিদকে আদর্শ মসজিদরূপে পরিগণিত করা হয়। খলিফা আল ওয়ালিদের নির্মিত দামেস্ক মসজিদ ইসলামি স্থাপত্যের ইতিহাসে প্রথম আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ মসজিদ। উমাইয়া আমলের মসজিদের আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ নকশার মধ্যে ছিল নামাযগৃহ ও উন্মুক্ত অঙ্গন, একটি বেষ্টিত স্থান বা সাহান, মিম্বর, মিনার, মিহরাব, অযুখানা। আল আকসা মসজিদও উমাইয়া আমলে পুনঃনির্মিত ও সম্প্রসারিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।

উমাইয়া প্রাসাদ স্থাপত্যের ইতিহাস প্রকৃতই প্রাক-ইসলামি মধ্যপ্রাচ্যের স্থানীয় স্থাপত্য ইতিহাস। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন উমাইয়া প্রাসাদের সন্ধান পাওয়া যায়। খলিফা আল ওয়ালিদের নির্মিত বাসর আল মিনিয়া প্রাসাদ (৭০৫-৭১৫)। এটি উমাইয়া প্রাসাদ স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এ খলিফার সময়ে আরও নির্মিত হয়েছে জাবাল সাইজ প্রাসাদ (৭০৫-৭১৫), আনজার প্রাসাদ (৭০৫-৭১৫)। কুসায়ের আম্‌রার (৭১১-৭৪০) স্নানাগার মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের প্রথম উল্লেখযোগ্য হাম্মাম। ইতিহাসের দিক থেকে এটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকেও তেমনি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। জর্ডানের রাজধানী আম্মানের প্রায় পঞ্চাশ মাইল পূর্বে কুসায়ের আম্‌রা অবস্থিত। এ ছাড়া উমাইয়া আমলের অন্য প্রাসাদগুলো হলো মুওয়াক্কার (৭২২), হাম্মাম আস সারাখ (৭২৫-৭৩০), কাসর আল হাইর আল গারবী (৭২৭), কাসর আল হাইর আল শরকী (৭২৯), খিরবাত আল মাফজার (৭২৪-৭৪৩), মাশাত্তা (৭৪৩), কাসর আত তুবা (৭৪৩), কাসর বায়ির (৭৪৩)। এই প্রাসাদসমূহের সমস্তই বর্তমান সিরীয়-জর্ডান মরুভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। এগুলোকে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ খলিফাদের খামারবাড়ি বা বাগানবাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে এই প্রাসাদগুলো দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যথা—

প্রথমত, এগুলো উমাইয়া খলিফাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে ধারণা দেয়।

দ্বিতীয়ত, সামগ্রিকভাবে এর দ্বারা মুসলিম লোক শিল্পের সূচনা হয়। বহির্দিক থেকে উমাইয়া প্রাসাদগুলো রোমান দুর্গের মতো নির্মিত হলেও এগুলোর অভ্যন্তরীণ কক্ষবিন্যাস ভিন্ন প্রকৃতির ছিল।

উমাইয়া প্রাসাদসমূহ ছিল চুনা পাথরে নির্মিত। এ ছাড়া বেলে পাথর, ইটও ব্যবহার করা হতো। খিলান ও ছাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। উমাইয়া স্থাপত্যসমূহের অলংকরণ অতি চমৎকার ও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। খোদাই কার্য, মোজাইক, ফ্রেসকো এবং পলেস্তারা ছাঁচ- এই চার পদ্ধতিতেই সাধারণত অলংকরণ করা হতো। অলংকরণ নকশায় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় শৈলীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উমাইয়া স্থাপত্যে সিরীয় শিল্প ঐতিহ্যের প্রভাবই বেশি ছিল। উমাইয়াদের কাজের কেন্দ্রস্থল সিরিয়া হওয়ায় সিরীয় কারিগরদের দ্বারাই ইমারতসমূহ বেশিরভাগ নির্মিত হয়েছিল। তবে ইরাক এবং পারস্য থেকেও কারিগর আনা হয়েছিল বলে কিছু মেসোপটেমীয়-পারসিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শহরের বিকাশ: উমাইয়া শাসনামলে বেশ কয়েকটি শহরের উৎপত্তি ঘটে। নিরাপত্তার জন্য শহরগুলো প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। বিভিন্ন ব্যবসা ও ব্যবসা সমিতি শহরের বিভিন্ন অঞ্চল বা রাস্তায় অবস্থিত থাকত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর লোকের নির্দিষ্ট অঞ্চল, বাড়িঘর, মসজিদ, বাজার এবং কবরস্থান ছিল। শহরের প্রবেশদ্বারে প্রহরীর ব্যবস্থা থাকত। উমাইয়া শাসনামলে দামেস্ক বিশ্বের অন্যতম মনোরম নগরী ও মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। শাসকেরা এটিকে জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা, ঝরনা এবং উদ্যান দ্বারা সুসজ্জিত করেছিল। মসজিদগুলোর মিনার ও শ্বেতগম্বুজ ঝলমল করত। মসুলে উমাইয়া শাসনকর্তা একটি কলেজ, একটি গ্রন্থশালা এবং নিজের অবস্থানের জন্য অনন্য সুন্দর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাছাড়া দামেস্কের তৎকালীন পানি সরবরাহ প্রণালি আজও প্রাচ্যে অতুলনীয় এবং তা উমাইয়া শাসকদের অমর কীর্তি। খলিফার প্রাসাদ স্বর্ণ ও মার্বেল পাথরে ঝলমল করত। মেঝে ও দেয়ালগুলো মূল্যবান কারুকার্যখচিত ছিল। দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারা ও জলপ্রপাত মহলসমূহের চতুর্দিকে মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করত।

খেলাধুলা: উমাইয়া আমলে পাশা এবং তাস খেলার প্রচলন ছিল। মোরগ লড়াই প্রথম ওয়ালিদ ও আবদুল আজিজের সময় আইনত বন্ধ থাকলেও প্রচলিত ছিল। তবে আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধুলার মধ্যে ঘোড়দৌড় সর্বশ্রেণির মানুষের প্রিয় ছিল। খলিফারাও ঘোড়দৌড় খেলার আয়োজন করতেন। রাজকুমারীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে ঘোড়া পরিচালনা করতেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মোট কত জন খলিফা উমাইয়া খিলাফত পরিচালনা করেন?
২. কুব্বাতুস সাখরা জেরুজালেমে কত খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করা হয়?
৩. কোন আমলে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে?
৪. বাসর আল মিনিয়া প্রাসাদ কার সময়ে নির্মিত হয়?
৫. মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের প্রথম উল্লেখযোগ্য হাম্মাম কোনটি?
৬. উমাইয়া শাসনামলে কোন নগরী বিশ্বের অন্যতম মনোরম নগরীতে পরিণত হয়?

উত্তরের জন্য ২৭৮ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

উমাইয়া আমলে নির্মিত বিখ্যাত ইমারতগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১:	১. ৬৬১; ২. মুয়াবিয়া (রা); ৩. মুয়াবিয়া (রা)-এর কূটকৌশল; ৪. দামেস্কে; ৫. আলি (রা)-এর দ্বিতীয় পুত্র হুসাইন (রা); ৬. মুয়াবিয়া (রা)।
পাঠ-২:	১. ৬০২; ২. আবু সুফিয়ান; ৩. মক্কা বিজয়ের পর (৬৩০ খ্রি.); ৪. মুয়াবিয়া (রা)-কে; ৫. মুয়াবিয়া (রা); ৬. সেনাপতি উকবা বিন নাফি।
পাঠ-৩:	১. মুয়াবিয়া (রা); ২. মুয়াবিয়া (রা); ৩. রেজিস্ট্রি বিভাগ; ৪. মুয়াবিয়া (রা); ৫. ১২; ৬. দিওয়ান-আল-খারাজ বা ভূমি রাজস্ব বিভাগে।
পাঠ-৪:	১. বিশ বছর; ২. মুয়াবিয়া (রা); ৩. ফজরের নামাজের পর; ৪. পুত্র ইয়াজিদকে; ৫. প্রশাসনিক; ৬. আমর ইবনুল আস।
পাঠ-৫:	১. ৬৮০-৬৮৩ খ্রি.; ২. হযরত আলি (রা); ৩. মহানবি (স)-এর; ৪. কুরাইশ বংশের হাশেমি ও উমাইয়া গোত্র; ৫. কুফাবাসী; ৬. ওবায়দুল্লাহ।
পাঠ-৬:	১ ৬৮০.; ২. ইমাম হুসাইন এবং ইয়াজিদ; ৩. কুফায়; ৪. ইরাকে; ৫. ইমাম হাসানের পুত্র কাশিম; ৬. সীমার।
পাঠ-৭:	১. ৬৮৫; ২. আবদুল মালিককে; ৩. আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের; ৪. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ; ৫. ময়ূর বাহিনী; ৬. আবদুল মালিক।
পাঠ-৮:	১. আরব জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ; ২. উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক; ৩. আবদুল মালিক; ৪. আবদুল মালিক; ৫. পারসিকদের; ৬. দামেস্কে।
পাঠ-৯:	১. আবদুল মালিককে; ২. উমাইয়া; ৩. আবদুল মালিক; ৪. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ; ৫. আবদুল মালিক; ৬. জেরুজালেমে।
পাঠ-১০:	১. ৭০৫; ২. আল-ওয়ালিদের; ৩. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ; ৪. আল-ওয়ালিদের; ৫. আল-ওয়ালিদের; ৬. বিজেতা।
পাঠ-১১ ও ১২:	১. কুতায়বা বিন মুসলিম; ২. ৭১২; ৩. দাহির; ৪. দেবল; ৫. সাংস্কৃতিক; ৬. মুসা বিন নুসায়ের।
পাঠ-১৩:	১. আন্দালুসিয়া; ২. ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে; ৩. ৭১১; ৪. তারিক বিন জিয়াদ; ৫. রডারিক; ৬. গথিক রাজবংশীয়।
পাঠ-১৪:	১. প্রায় দশ (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) বছর; ২. আল-ওয়ালিদের; ৩. পাঁচ; ৪. আল-ওয়ালিদ; ৫. আল-ওয়ালিদ; ৬. ৭১৫।
পাঠ-১৫:	১. উমাইয়া; ২. শিক্ষকতা; ৩. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ; ৪. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ; ৫. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ; ৬. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।
পাঠ-১৬:	১. ৭১৫; ২. উমাইয়া খলিফা সুলায়মানকে; ৩. খলিফা সুলায়মান; ৪. খলিফা সুলায়মান; ৫. ৭১৭; ৬. খলিফা সুলায়মান।
পাঠ-১৭:	১. ৭১৭; ২. ওমর বিন আবদুল আজিজ; ৩. ওমর বিন আবদুল আজিজ; ৪. মাওয়ালি; ৫. ওমর বিন আবদুল আজিজ; ৬. ওমর বিন আবদুল আজিজ।
পাঠ-১৮:	১. খুলাফায়ে রাশেদিনের; ২. প্রজাদের; ৩. দুই; ৪. ওমর বিন আবদুল আজিজকে; ৫. ওমর বিন আবদুল আজিজ; ৬. মানবতার সেবা ও প্রজাপালন।
পাঠ-১৯:	১. ওমর বিন আবদুল আজিজ; ২. ওমর বিন আবদুল আজিজ; ৩. বন্ধকী ব্যবস্থা; ৪. ওমর বিন আবদুল আজিজ; ৫. ৭১৭-৭২০ খ্রি.; ৬. শান্তিপূর্ণ।
পাঠ-২০:	১. খলিফা হিশামকে; ২. ২০ বছর; ৩. ৭৩৮; ৪. খলিফা হিশাম; ৫. বালাত-উশ-সুহাদা বা শহিদদের মঞ্চ; ৬. চার্লস মার্টেল।
পাঠ-২১:	১. ৭৫০; ২. ৯০ বছর; ৩. আব্বাসি আন্দোলন; ৪. জাবের; ৫. আব্বাসিদের; ৬. দ্বিতীয় মারওয়ান।
পাঠ-২২:	১. উমাইয়া খিলাফত; ২. খারাজ; ৩. খুমস; ৪. উমাইয়া খলিফারা; ৫. মুদ্রা; ৬. তাপসী রাবেয়া বসরি।
পাঠ-২৩:	১. খলিফার; ২. উমাইয়া; ৩. পারসিক ও রোমানদের; ৪. ভূমি রাজস্ব কর্মকর্তা; ৫. মুয়াবিয়া (রা); ৬. ১৪টি।
পাঠ-২৪:	১. ধর্মভিত্তিক; ২. মসজিদ; ৩. উমাইয়াদের; ৪. কুফা ও বসরায়; ৫. আরবদের; ৬. উমাইয়াদের।
পাঠ-২৫:	১. ১৪ জন; ২. ৬৯১; ৩. উমাইয়া; ৪. আল ওয়ালিদের; ৫. জর্ডানের কুসায়ের আম্‌রার; ৬. দামেস্ক।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

উমাইয়া বংশ	উমাইয়া বংশ আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশের একটি শাখা। কুরাইশ গোত্রের বিখ্যাত দলপতি আবদুল মান্নাফ ছিলেন (মহানবি (স)-এর পঞ্চম উর্ধ্বতন পুরুষ)। আবদুল মান্নাফের ছয় পুত্রসন্তানের অন্যতম ছিলেন আবদুস শামস। তিনি মহানবি (স)-এর প্রপিতামহ হাশিমের সহোদর ভাই ছিলেন। আবদুস শামসের পুত্র উমাইয়া এবং তার নামানুসারেই খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'উমাইয়া বংশ' নামে পরিচিতি লাভ করে। উমাইয়া বংশ প্রধান দু'টি শাখায় বিভক্ত– (ক) সুফিয়ানি এবং (খ) মারওয়ানি। সুফিয়ানি শাখাকে হারবীয় শাখাও বলা হয়।
রাজতন্ত্র	ইংরেজি Monarchy শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্র বলতে নির্বাচন ছাড়া বংশানুক্রমিক বা মনোনয়ন পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করাকে বোঝায়। রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধানকে রাজা বলা হয়। রাজার মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে বা ভাই রাজা হন। বর্তমান বিশ্বে দুই ধরনের রাজতন্ত্র চালু রয়েছে। যথা: ১. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র; ২. সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। সৌদি আরবে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র চালু রয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চালু আছে।
আরব আলেকজান্ডার	উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর সেনাপতি উকবা বিন নাফিকে আরব আলেকজান্ডার বলা হয়। ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত বীর উকবা বিন নাফিকে খলিফা মুয়াবিয়া (রা) ১০,০০০ সৈন্যসহ উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। উকবা কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের পরাজিত করেন এবং লিবিয়া ও তিউনিশিয়া দখল করে কায়রোয়ান নগরীতে উত্তর আফ্রিকার রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর উকবা আরও অগ্রসর হয়ে আলজেরিয়া ও মরক্কো দখল করে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। রাজ্য বিস্তারে এ অসাধারণ বীরত্বের জন্যই উকবা বিন নাফি ইসলামের ইতিহাসে আরব আলেকজান্ডার নামে পরিচিত।
কারবালার যুদ্ধ	ইরাকের কারবালা প্রান্তরে ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের (১০ মহররম, হিজরি ৬০) ইয়াজিদ বাহিনী এবং ইমাম হুসাইনের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধই ইতিহাসে কারবালার যুদ্ধ নামে পরিচিত। খলিফা মুয়াবিয়া (রা) এবং মহানবি (স)-এর দৌহিত্র ইমাম হাসানের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধির শর্ত ভঙ্গই ছিল কারবালা যুদ্ধের প্রধান কারণ। শর্ত অনুযায়ী ইমাম হুসাইনের খলিফা হওয়ার কথা ছিল। মুয়াবিয়া (রা) শক্তির শর্ত ভঙ্গ করে পুত্র ইয়াজিদকে উমাইয়া খিলাফতের খলিফা মনোনয়ন করেন। ফলে ইয়াজিদ ও হুসাইনের মধ্যকার বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এক পর্যায়ে তা যুদ্ধে রূপ নেয়। এটি ছিল একটি চরম অসম যুদ্ধ। ইমাম হুসাইনের বাহিনীতে মাত্র ৭২ জন যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। অন্যদিকে, ইয়াজিদের বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারেরও বেশি। যুদ্ধে হুসাইনের ভ্রাতুষ্পুত্র কাশিম প্রথমে শাহাদাতবরণ করেন। পিপাসার্ত হুসাইন শিশুপুত্র আসগরকে নিয়ে ফোরাত নদীতে পানির জন্য অগ্রসর হলে আসগর তার কোলেই তীরবিদ্ধ হন। ফলে হুসাইন শেষবারের মতো শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইমাম হুসাইনের প্রচণ্ড বিক্রমে ইয়াজিদ বাহিনীর সেনারা ভীত হয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু অকস্মাৎ একটি তীর হুসাইনের বক্ষ বিদীর্ণ করলে তিনি ধরাশায়ী হন। নিষ্ঠুর সীমার অর্ধমৃত হুসাইনের ঘাড়ের ওপর তরবারি চালিয়ে তার মস্তকটি বিচ্ছিন্ন করে। ইমাম হুসাইনের হত্যাকাণ্ডের পর ইয়াজিদ বিচলিত বোধ করেন। সম্ভাব্য গোলযোগের আশঙ্কায় তিনি ইমামের দেহ তার বোন জয়নবের কাছে হস্তান্তর করলে তা কারবালাতেই সমাহিত করা হয়।
রাজেন্দ্র	উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিককে রাজেন্দ্র বা Father of kings বলা হয়। খলিফা আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তার চার পুত্র পর্যায়ক্রমে উমাইয়া খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। এরা হলেন- আল ওয়ালিদ (৭০৫–৭১৫ খ্রি.) সুলাইমান (৭১৫–৭১৭ খ্রি.), দ্বিতীয় ইয়াজিদ (৭২০–৭২৪ খ্রি.) এবং হিশাম (৭২৪–৭৪৩ খ্রি.)। তারা সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে উমাইয়া খিলাফতকে সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন,"আবদুল মালিক এবং তার উত্তরাধিকারী চার পুত্রের শাসনকালে দামেস্কের এ রাজবংশ শৌর্যবীর্য ও গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে।" এ কারণে আবদুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয়।

কুব্বাতুস সাখরা	৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমে মহানবি (স)-এর মিরাজের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র পাথরের ওপর উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক অষ্টকোণাকৃতির যে স্থাপত্যটি নির্মাণ করেন, তাই কুব্বাতুস সাখরা বা ডোম অব দি রক নামে পরিচিত। খলিফা আবদুল মালিক তার চরম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে কুব্বাতুস সাখরা নির্মাণ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের মক্কা ও মদিনায় সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পবিত্র কাবাগৃহ মক্কায় অবস্থিত হওয়ায় প্রত্যেক বছর বিপুলসংখ্যক মুসলমান এখানে হজ পালন করতে যেত। হজযাত্রীদেরকে মক্কা থেকে জেরুজালেমের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য আবদুল মালিক কুব্বাতুস সাখরা Dome of the Rock নির্মাণ করেন। তিনি নিজের অনুসারীদের মক্কার পরিবর্তে এখানে হজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
বালাত উশ শুহাদা	মুসলিম সেনাপতি আবদুর রহমান আল গাফেকির সাথে ফ্রান্সের খ্রিষ্টানদের সংঘটিত টুরসের যুদ্ধ ইতিহাসে বালাত উশ শুহাদা নামে পরিচিত। সেনাপতি আবদুর রহমান আল গাফেকি খলিফা হিশামের নির্দেশে ফ্রান্সের তৎকালীন রাজা চার্লস মার্টেলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি আরব শাসনকর্তা মনুজা ও ইউডিজকে পরাজিত করে একুইটন ও বারগা প্রদেশ দখল করে ফ্রান্সের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন। ইউডিজ ফ্রাঙ্কিশ রাজা চার্লস মার্টেলের সহায়তায় আব্দুর রহমানের গতিরোধ করেন। ফলে টুরস নামক স্থানে তাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দলীয় কোন্দল, সেনাপতির আদেশ অমান্য প্রভৃতি কারণে এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে এবং আবদুর রহমান আল গাফেকি মৃত্যুবরণ করেন। অনেক মুসলিম সৈন্য শহিদ হওয়ায় এ যুদ্ধকে ইসলামের ইতিহাসে 'বালাত উশ শুহাদা' নামে অভিহিত করা হয়।
উমাইয়া সাধু	ব্যতিক্রমী মহৎ চারিত্রিক গুণাবলির জন্য উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজকে উমাইয়া সাধু বলা হয়। উমাইয়া খলিফাদের রাজত্বকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দেশজুড়ে ক্ষমতার সংঘর্ষ, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতা। এমন সময় সরল অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী কর্তব্যপরায়ণ ও প্রজাবৎসল খলিফা হিসেবে ওমর বিন আবদুল আজিজের সিংহাসনে আরোহণ এক ভিন্ন অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি ইসলামি মূল্যবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রেমের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এরূপ উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ধর্মভীরুতার জন্যই খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজকে উমাইয়া সাধু বলা হয়।
মাওয়ালি	মাওয়ালি বা মাওয়ালা একটি আরবি পরিভাষা যা দ্বারা অনারব মুসলিমদের বোঝানো হতো। মূল শব্দ মাওয়ালা (মাওয়ালির একবচন) বলতে বোঝায় আত্মীয়, মিত্র বা বন্ধু হিসেবে সমমাত্রিক সম্পর্ক। কিন্তু এক সময় এর অর্থ বদলে গিয়ে প্রভু, অভিভাবক এরূপ অসমান সম্পর্ক বোঝানো হতো। (مَوْلَا) শব্দের বিপরীত হলো মাওয়ালি (مَوَالِى)। মাওলা শব্দের অর্থ হলো নেতা,আশ্রয়দাতা বা অভিভাবক; আর মাওয়ালি শব্দের অর্থ হলো আশ্রিত। উমাইয়া যুগের আরব শাসকরা 'সকল মুসলমান ভাই ভাই' মহানবি (স) এর এই বাণী অনুসরণের পরিবর্তে অনারব মুসলমানদেরকে আশ্রিত হিসেবে অমুসলমান জিম্মির মতো মনে করে তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করতে থাকে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও অনারব মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য জিজিয়া ও খারাজ দিতে হতো এবং তারা সরকার ও সামরিক বাহিনীতে স্থান পেত না। উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ তাদের প্রতি এ বৈষম্যমূলক নীতি রহিত করেন। তবে আরবীয়দের সাথে বৈষম্যের কারণে তারা এক সময় উমাইয়া শাসনের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং আব্বাসি আন্দোলনে যোগদান করে উমাইয়া বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে।
জিম্মি	জিম্মি ইসলামি আইনের একটি পরিভাষা। এ শব্দ দ্বারা ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের বোঝানো হয়। খ্রিষ্টান, ইহুদি, অগ্নি উপাসক এবং অন্যান্য আশ্রিত মুসলমানগণ সমাজে জিম্মি নামে পরিচিত। উমাইয়া আমলে এ জিম্মিরা সমাজে তৃতীয় স্থানের অধিকারী ছিল। উমাইয়া আমলে চাষাবাদ সাধারণত তারাই করত। সে জন্য তারা খারাজ বা ভূমিকর প্রদান করত। জিম্মিরা যতদিন পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকত ততদিন তারা সকল প্রকার স্বাধীনতা ভোগ করত। ধর্মবেত্তাদের মতে, তারা নিজস্ব আইন-কানুন পূর্ণরূপে মেনে চলতে পারলেও ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের ওপর কিছু বিধিনিষেধও আরোপিত হবে। মুসলিমদের ওপর আরোপিত কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব জিম্মিদের পালন করতে হয় না এবং মুসলিমদের কিছু রাজনৈতিক সুবিধা জিম্মিদের ওপর প্রযোজ্য হয় না।

■ একনজরে উমাইয়া খিলাফতের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি

সময় (খ্রি.)	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
৬৬১	হযরত আলি (রা)-এর ইন্তেকালের পর দামেস্কে মুয়াবিয়া (রা) উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম প্রচলিত ধারার বাইরে এসে প্রশাসনব্যবস্থায় নতুনত্ব আনেন। এ কারণে তাকে মুসলিম প্রশাসনব্যবস্থার রূপকার বলা হয়।
৬৭৯	মুয়াবিয়া (রা) নিজের পুত্র ইয়াজিদকে খলিফা মনোনীত করে ইসলামে রাজতন্ত্রের সূত্রপাত করেন।
৬৮০	ইয়াজিদের ক্ষমতারোহণ। ইমাম হুসাইন (রা)-এর সাথে দ্বন্দ্ব। কারবালার প্রান্তরে নিষ্ঠুরভাবে ইমাম হুসাইন (রা) ও তার অনুচরবর্গকে হত্যা করা হয়। এটি ইসলামের ইতিহাসের হৃদয়বিদারক ঘটনাবলির একটি।
৬৮৫	উমাইয়া খলিফা হিসেবে আবদুল মালিক ক্ষমতারোহণ করেন।
৬৯৬	আবদুল মালিক আরবীয়করণ নীতি গ্রহণ করেন।
৭০৫	আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-ওয়ালিদ ক্ষমতায় আরোহণ করেন।
৭১১	তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে মুসলমানরা স্পেন বিজয় করে যা ইসলামের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।
৭১২	মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলমানরা সিন্ধু বিজয় করে। এভাবে ভারতে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে।
৭১৭	দ্বিতীয় ওমর নামে খ্যাত ওমর বিন আবদুল আজিজ ক্ষমতারোহণ করে শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনেন এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের আদলে সর্বত্র ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করেন।
৭৫০	আব্বাসি প্রচারণা, উমাইয়া শাসকদের দুর্বলতা, রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণির উমাইয়াবিরোধী তৎপরতার ফলে উমাইয়া সাম্রাজ্যে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তা চরম পরিণতি লাভ করে যুদ্ধের মাধ্যমে। উমাইয়াদের পতন ঘটে এবং আবুল আব্বাস বাগদাদে আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

প্রশ্ন-১. উমাইয়ারা কোন বংশের শাখা?
উত্তর: উমাইয়ারা কুরাইশ বংশের শাখা।

প্রশ্ন-২. কত খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৩. উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
উত্তর: উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুয়াবিয়া (রা)।

প্রশ্ন-৪. উমাইয়াদের প্রথম খলিফা কে?
[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯]
উত্তর: উমাইয়াদের প্রথম খলিফা মুয়াবিয়া (রা)।

প্রশ্ন-৫. মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম কে রাজতন্ত্রের সূচনা করেন?
উত্তর: মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম রাজতন্ত্রের সূচনা করেন মুয়াবিয়া (রা)।

প্রশ্ন-৬. উমাইয়া খিলাফতে মোট কতজন শাসন ছিলেন?
উত্তর: উমাইয়া খিলাফতে মোট ১৪ জন শাসক ছিলেন।

প্রশ্ন-৭. উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী কোথায় ছিল?
[ঢা. বো.; দি. বো.; কু. বো.; চ. বো.; সি. বো. ২০১৯]
উত্তর: উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী ছিল বর্তমান সিরিয়ার দামেস্কে।

প্রশ্ন-৮. উমাইয়া খিলাফত কত বছর স্থায়ী ছিল?
উত্তর: উমাইয়া খিলাফত প্রায় ৯০ বছর (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) স্থায়ী ছিল।

■ মুয়াবিয়া (রা)-এর পরিচয়, শাসনব্যবস্থা, চরিত্র ও কৃতিত্ব

প্রশ্ন-৯. মুয়াবিয়া (রা) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: মুয়াবিয়া (রা) কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-১০. মুয়াবিয়া (রা)-এর পিতার নাম কী?
উত্তর: মুয়াবিয়া (রা)-এর পিতার নাম আবু সুফিয়ান।

প্রশ্ন-১১. আরবদের প্রথম রাজা কে ছিলেন? *[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; ঢাকা বোর্ড ২০১৭]*
উত্তর: আমির মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন আরবদের প্রথম রাজা।

প্রশ্ন-১২. কোন স্থানে হযরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনে সালিশ বসে?

উত্তর: 'দুমাতুল জন্দল' নামক স্থানে হযরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনে সালিশ বসে।

প্রশ্ন-১৩. কে সর্বপ্রথম মুসলিম নৌ-বাহিনী গঠন করেন? *[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*

উত্তর: ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমানের (রা) অনুমতিক্রমে মুয়াবিয়া (রা) সর্বপ্রথম মুসলিম নৌ-বাহিনী গঠন করেন।

প্রশ্ন-১৪. মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনকালে রেজিস্ট্রি বিভাগকে কী বলা হতো?

উত্তর: মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনকালে রেজিস্ট্রি বিভাগকে বলা হতো দিওয়ান আল খাতাম।

প্রশ্ন-১৫. মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনকালে ডাক বিভাগকে কী বলা হতো?

উত্তর: মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনকালে ডাক বিভাগকে বলা হতো 'দিওয়ান আল বারিদ'।

প্রশ্ন-১৬. উকবা বিন নাফি কে ছিলেন?

উত্তর: উকবা বিন নাফি ছিলেন মুয়াবিয়া (রা)-এর সেনাপতি, যিনি উত্তর আফ্রিকায় বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন-১৭. উকবা বিন নাফির উপাধি কী ছিল?

উত্তর: উকবা নাফির উপাধি ছিল আরব আলেকজান্ডার।

■ কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার কারণ ও পরবর্তী ইতিহাসে এর প্রভাব

প্রশ্ন-১৮. কত খ্রিস্টাব্দে কারবালার প্রান্তরে ঐতিহাসিক যুদ্ধ শুরু হয়?

উত্তর: ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ মহররম কারবালার প্রান্তরে ঐতিহাসিক যুদ্ধ শুরু হয়।

প্রশ্ন-১৯. কে ইমাম হুসাইনকে হত্যার আদেশ দেন?

উত্তর: কুফার শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ইমাম হুসাইনকে হত্যার আদেশ দেন।

প্রশ্ন-২০. কারবালা কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

উত্তর: কারবালা ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত।

প্রশ্ন-২১. কারবালার যুদ্ধে সর্বপ্রথম শহিদ হন কে?

উত্তর: কারবালার যুদ্ধে সর্বপ্রথম শহিদ হন ইমাম হাসান (রা)-এর ছেলে কাশিম।

প্রশ্ন-২২. কে ইমাম হুসাইনের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন?

উত্তর: সীমার ইমাম হুসাইনের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন।

■ উমাইয়া শাসন সুদৃঢ়ীকরণে খলিফা আবদুল মালিকের শাসন নীতি ও সংস্কারসমূহ

প্রশ্ন-২৩. উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর: উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আবদুল মালিক।

প্রশ্ন-২৪. খলিফা আবদুল মালিক কোন বংশের শাসক ছিলেন? *[ঢা. বো., ব. বো., য. বো. ২০২২]*

উত্তর: খলিফা আবদুল মালিক উমাইয়া বংশের শাসক ছিলেন।

প্রশ্ন-২৫. কোন উমাইয়া শাসককে রাজেন্দ্র বা Father of Kings বলা হয়? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]*

উত্তর: উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিককে রাজেন্দ্র বা Father of Kings বলা হয়।

প্রশ্ন-২৬. কোন খলিফা সর্বপ্রথম মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করেন? *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*

উত্তর: উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক সর্বপ্রথম মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করেন।

প্রশ্ন-২৭. কোন খলিফা সর্বপ্রথম টাকশাল স্থাপন করেন?

উত্তর: উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক সর্বপ্রথম টাকশাল স্থাপন করেন।

প্রশ্ন-২৮. কুব্বাতুস সাখরা কী? অথবা ডোম অব দি রক কী? *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮; ঢাকা বোর্ড ২০১৭]*

উত্তর: ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমে মহানবি (স) এর মিরাজের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র পাথরের ওপর উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক অষ্টকোণাকৃতির যে স্থাপত্যটি নির্মাণ করেন, তাই কুব্বাতুস সাখরা বা ডোম অব দি রক নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২৯. Dome of the Rock কে নির্মাণ করেন?

উত্তর: উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক Dome of the Rock নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন-৩০. কোন উমাইয়া খলিফা আরব জাতীয়তাবাদী নীতি গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর: উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক আরব জাতীয়তাবাদী নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

■ খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের খিলাফত সম্প্রসারণ

প্রশ্ন-৩১. উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজেতা কে ছিলেন?

উত্তর: উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজেতা ছিলেন আল ওয়ালিদ।

প্রশ্ন-৩২. কার রাজত্বকাল উমাইয়া খিলাফতের স্বর্ণযুগ ছিল?

উত্তর: খলিফা আল ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের রাজত্বকাল ছিল উমাইয়া খিলাফতের স্বর্ণযুগ।

প্রশ্ন-৩৩. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কে ছিলেন? *[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*

উত্তর: খলিফা আল ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

প্রশ্ন-৩৪. খলিফা আল ওয়ালিদের স্পেন বিজয়ী সেনাপতির নাম কী ছিল?

উত্তর: খলিফা আল ওয়ালিদের স্পেন বিজয়ী সেনাপতির নাম ছিল তারিক বিন জিয়াদ।

প্রশ্ন-৩৫. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু জয় করেন? */সকল বোর্ড ২০১৫/*

উত্তর: মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু জয় করেন।

প্রশ্ন-৩৬. স্পেনে মুসলিম শাসনের সূচনা হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?

উত্তর: স্পেনে মুসলিম শাসনের সূচনা হয় ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন-৩৭. কোন উমাইয়া শাসকের সময় ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে?

উত্তর: উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সময় ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

প্রশ্ন-৩৮. আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কাকে?

উত্তর: উমাইয়া খলিফা সুলায়মানকে (৭১৫-৭১৭ খ্রি.) আশীর্বাদের চাবি বলা হয়।

■ খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ-এর রাজস্ব সংস্কার ও শাসন নীতি

প্রশ্ন-৩৯. পঞ্চম খলিফা বলা হয় কাকে?

উত্তর: উমাইয়া খলিফা ওমর বিন-আবদুল আজিজকে পঞ্চম খলিফা বলা হয়।

প্রশ্ন-৪০. উমাইয়া সাধু পুরুষ কে ছিলেন? */দি. বো., কু. বো.. চ. বো., য. বো., ব. বো., ২০২৩; ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮/*

উত্তর: ওমর বিন আবদুল আজিজ ছিলেন উমাইয়া সাধু পুরুষ।

প্রশ্ন-৪১. কে বায়তুল মালকে মুসলমানদের সম্পদ বলে ঘোষণা দেন? */ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫/*

উত্তর: ওমর বিন আবদুল আজিজ বায়তুল মালকে মুসলমানদের সম্পদ বলে ঘোষণা দেন।

প্রশ্ন-৪২. জিজিয়া কী?

উত্তর: মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের দেওয়া নিরাপত্তা করই হলো জিজিয়া।

প্রশ্ন-৪৩. মাওয়ালি কারা?

উত্তর: ইসলামি রাষ্ট্রের নবদীক্ষিত অনারব মুসলমানদেরকে মাওয়ালি বলা হয়।

প্রশ্ন-৪৪. খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ মাওয়ালিদের কোন কর থেকে মুক্তি দেন?

উত্তর: খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ মাওয়ালিদের জিজিয়া (নিরাপত্তা কর) ও খারাজ (ভূমিকর) থেকে মুক্তি দেন।

■ উমাইয়া খিলাফতের ক্রমাবনতি ও পতনের কারণ

প্রশ্ন-৪৫. ঐতিহাসিকেরা খলিফা হিশামকে কী বলে অভিহিত করেন?

উত্তর: ঐতিহাসিকেরা খলিফা হিশামকে 'উমাইয়া বংশের শেষ গৌরব' বলে অভিহিত করেন।

প্রশ্ন-৪৬. খলিফা হিশাম কত বছর উমাইয়া খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন?

উত্তর: খলিফা হিশাম ২০ বছর উমাইয়া খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রশ্ন-৪৭. উমাইয়াদের শেষ খলিফা কে ছিলেন? */রা. বো.. য. বো., ব. বোর্ড ২০১৯; রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বোর্ড. ২০১৮/*

উত্তর: উমাইয়াদের শেষ খলিফা ছিলেন দ্বিতীয় মারওয়ান।

প্রশ্ন-৪৮. উমাইয়া খিলাফতের চূড়ান্ত পতন ঘটে কোন যুদ্ধের মাধ্যমে?

উত্তর: উমাইয়া খিলাফতের চূড়ান্ত পতন ঘটে জাবের যুদ্ধের মাধ্যমে।

প্রশ্ন-৪৯. কত খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটে? */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩; ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো, সি. বো. ২০১৯/*

উত্তর: ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটে।

■ উমাইয়াদের প্রশানিক ব্যবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা

প্রশ্ন-৫০. উমাইয়াদের প্রশাসনিক কাঠামো কী ছিল?

উত্তর: উমাইয়াদের প্রশাসনিক কাঠামো ছিল রাজতান্ত্রিক।

প্রশ্ন-৫১. উমাইয়া যুগে ভূমি রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে কী বলা হতো?

উত্তর: উমাইয়া যুগে ভূমি রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হতো 'সাহিব আল-খারাজ'।

প্রশ্ন-৫২. উমাইয়া আমলে পত্র আদান-প্রদান বিভাগের নাম কী ছিল?

উত্তর: উমাইয়া আমলে পত্র আদান-প্রদান বিভাগের নাম ছিল- 'দিওয়ানুল রাসায়েল'।

প্রশ্ন-৫৩. উমাইয়া যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনী কয়ভাগে বিভক্ত থাকত?

উত্তর: উমাইয়া যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনী পাঁচভাগে বিভক্ত থাকত।

প্রশ্ন-৫৪. খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর সময়ে ডাক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে কী বলা হতো?

উত্তর: খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর সময়ে ডাক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হতো 'সাহিব আল-বারিদ'।

প্রশ্ন-৫৫. উমাইয়া শাসনামলে প্রদেশের শাসনকর্তাকে কী বলা হতো?

উত্তর: উমাইয়া শাসনামলে প্রদেশের শাসনকর্তাকে বলা হতো 'ওয়ালি'।

প্রশ্ন-৫৬. খলিফা প্রথম ওমর (রা)-এর সময়ে সামরিক বিভাগের নাম কী ছিল?

উত্তর: খলিফা প্রথম ওমর (রা)-এর সময়ে সামরিক বিভাগের নাম ছিল দিওয়ানুল জুনদ্।

প্রশ্ন-৫৭. আরবি ভাষায় হরকত ও নোকতা সংযোজন করেন কে?

উত্তর: আরবি ভাষায় হরকত ও নোকতা সংযোজন করেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

প্রশ্ন-৫৮. কোন উমাইয়া খলিফা আরবিকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দান করেন?

উত্তর: উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক আরবিকে সরকারি ভাষার মার্যাদা দান করেন।

প্রশ্ন-৫৯. কোন উমাইয়া খলিফা সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি মুদ্রার প্রবর্তন করেন?

উত্তর: উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি মুদ্রার প্রবর্তন করেন।

প্রশ্ন-৬০. উমাইয়া সমাজে কয় শ্রেণির লোক ছিল?

উত্তর: উমাইয়া সমাজে চার শ্রেণির লোক ছিল।

প্রশ্ন-৬১. মাওয়ালিদের ওপর থেকে বৈষম্যমূলক নীতি তুলে দেন কে?

উত্তর: মাওয়ালিদের ওপর থেকে বৈষম্যমূলক নীতি তুলে দেন উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ।

প্রশ্ন-৬২. জিম্মি কাদের বলা হতো?

উত্তর: খ্রিস্টান, ইহুদি, অগ্নি উপাসক এবং অন্যান্য আশ্রিত মুসলমানদের জিম্মি বলা হতো।

প্রশ্ন-৬৩. উমাইয়া যুগে সমাজের সবচেয়ে নিম্নস্তরে ছিল কোন সম্প্রদায়?

উত্তর: উমাইয়া যুগে সমাজের সবচেয়ে নিম্নস্তরে ছিল দাস সম্প্রদায়।

■ উমাইয়া আমলে শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ

প্রশ্ন-৬৪. উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম অত্যাশ্চর্য ও অতুলনীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন কী ছিল?

উত্তর: উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম অত্যাশ্চর্য ও অতুলনীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন ছিল জগদ্বিখ্যাত 'কুব্বাতুস সাখরা (Dome of the Rock)।

প্রশ্ন-৬৫. উমাইয়া শাসনামলে কায়রোয়ানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন কে?

উত্তর: সেনাপতি উক্‌বা বিন নাফি উমাইয়া শাসনামলে কায়রোয়ানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন-৬৬. কুব্বাতুস সাখরা (Dome of the Rock) কোথায় নির্মাণ করা হয়? *ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯/*

উত্তর: কুব্বাতুস সাখরা (Dome of the Rock) জেরুজালেমে নির্মাণ করা হয়।

প্রশ্ন-৬৭. দামেস্ক মসজিদ নির্মাণ করেন কে?

উত্তর: উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ দামেস্ক মসজিদ নির্মাণ করেন।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. মুয়াবিয়া (রা)-কে আরব বিশ্বের প্রথম রাজা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। */ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো, সি. বো. ২০১৯; সকল বোর্ড ২০১৮/*

উত্তর: মুয়াবিয়া (রা) উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্রের প্রচলন করেন, তাই তাকে আরবদের প্রথম রাজা বলা হয়।

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা উচ্চাভিলাষী মুয়াবিয়া (রা) খিলাফত লাভের পর সাধারণতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর সাথে স্বাক্ষরিত সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে ৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে বসরার শাসনকর্তা মুগিরার প্ররোচনায় নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্র চালু করেন। পরবর্তী সময়ে আব্বাসি খলিফাসহ অন্যান্য মুসলিম শাসকেরা মুয়াবিয়া (রা)-এর নীতি অনুসরণ করেন। এজন্য তাকে আরবদের প্রথম রাজা বলা হয়।

প্রশ্ন-২. খলিফা আলি (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: খলিফা আলি (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ ছিল হাশেমি ও উমাইয়া বংশগত দ্বন্দ্ব।

মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের দুইটি শাখা হাশেমি ও উমাইয়া গোত্র প্রায় একশ বছর ধরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন উমাইয়া বংশোদ্ভূত আর হযরত আলি (রা) ছিলেন হাশেমি গোত্রের সদস্য। তাই হযরত আলি (রা)-এর খিলাফত লাভ উমাইয়াদের ক্ষুব্ধ করে। খলিফা আলি (রা) সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা)-কে পদত্যাগ করতে বললে তিনি খলিফার আদেশ অমান্য করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন।

প্রশ্ন-৩. ইমাম হুসাইন ও ইয়াজিদের দ্বন্দ্বের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ইয়াজিদ ও হুসাইনের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ হলো খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

ইমাম হাসানের সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিতে মুয়াবিয়া (রা)-এর পর ইমাম হুসাইনের খলিফা হবার শর্ত ছিল। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা) এ শর্ত ভঙ্গ করে তার অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় তিনিই মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আরোহণ করেন। ফলে ইসলামি সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। খিলাফতের ন্যায্য দাবিদার ইমাম হুসাইনকে আলি (রা)-এর অনুসারীরা সমর্থন করলে হুসাইন ইয়াজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য লাভের আশায় কুফা যাত্রা করেন। ফলে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

প্রশ্ন-৪. কারবালার হত্যাকাণ্ডকে বিষাদময় ঘটনা বলা হয় কেন?

উত্তর: কারবালার হত্যাকাণ্ডে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নবি করিম (স)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসেনের শিরশ্ছেদ করা হয়। তাই এ হত্যাকাণ্ডকে বিষাদময় ঘটনা বলা হয়।

৬০ হিজরির ১০ মহররম কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেনের বাহিনী ও ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। ইয়াজিদ বাহিনী ফোরাত নদীর পাড় দখল করে ইমাম হোসেনের শিবিরকে পানি থেকে বঞ্চিত করে। ফলে পানির অভাবে ইমাম শিবিরে হাহাকার শুরু হয়। ইমাম হোসেন নিজপুত্র শিশু আসগরকে নিয়ে ফোরাত নদীতে পানির জন্য গেলে আসগর শরবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। পরে পাপিষ্ঠ সীমার অনেক কষ্ট দেওয়ার পর তরবারি দ্বারা ইমাম হোসেনের শিরশ্ছেদ করে। নবি করিম (স)-এর দৌহিত্রের এ নির্মম হত্যাকাণ্ডকে তাই বিষাদময় ঘটনা বলা হয়।

প্রশ্ন-৫. দিওয়ান আল খাতাম বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: দিওয়ান আল খাতাম বলতে উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর গঠিত রেজিস্ট্রি বিভাগকে বোঝায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে প্রাদেশিক সরকারের লিখিত সংযোগ সাধনের জন্য খলিফা মুয়াবিয়া (রা) 'দিওয়ান আল খাতাম' বা রেজিস্ট্রি বিভাগ নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার যেসব হুকুমনামা প্রদেশিক সরকারকে প্রদান করত সেগুলো জাল হওয়া ঠেকাতে এবং সেগুলো সংরক্ষণের জন্য এ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রশ্ন-৬. দিওয়ানুল বারিদ কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডাক বিভাগই 'দিয়ানুল বারিদ' হিসেবে পরিচিত।

'দিওয়ানুল বারিদ' এর শাব্দিক অর্থ ডাক বিভাগ। দিয়ানুল বারিদ রাষ্ট্রের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য কাজ করত। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য মুয়াবিয়া (রা) প্রতি ১২ মাইল অন্তর একটি করে ডাকঘর স্থাপন করেন। ঘোড়া ও উটের সাহায্যে এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে সংবাদ আদান-প্রদান করা হতো। এ বিভাগকে বলা হতো 'দিওয়ানুল বারিদ' এবং এর প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হতো 'সাহিব উল বারিদ'।

প্রশ্ন-৭. ডাক বিভাগের উন্নতিতে খলিফা আবদুল মালিকের কী পদক্ষেপ ছিল?

উত্তর: খলিফা আবদুল মালিক ডাক ব্যবস্থার সংস্কার করে এ বিভাগের উন্নয়ন করেন।

উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের শাসনামলে ডাক বিভাগের ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়। তিনি পারসিকদের পদ্ধতি অনুসরণ করে ডাক চালান প্রথার প্রচলন করেন। সাম্রাজ্যের বড় বড় রাস্তার পাশে তিনি ডাকচৌকি নির্মাণ করেন। ডাক বিভাগের কাজ ছিল- ১. সরকারি চিঠিপত্র ও আদেশ নিষেধ আদান-প্রদান; ২. সরকারি কর্মচারীদের ডাকগাড়ির মাধ্যমে যাতায়াত; ৩. প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত সৈন্য ও রসদ দ্রব্যাদি সরবরাহ এবং ৪. গোয়েন্দা বিভাগের কাজ সম্পাদন। এসব কাজের জন্য ডাক বিভাগকে খলিফার কান এবং চোখ বলা হতো।

প্রশ্ন-৮. দিয়ানুল রাসায়েল কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের সময়কালে সরকারি কাগজপত্র সংরক্ষণকারী দপ্তর হচ্ছে দিয়ানুল রাসায়েল।

উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করার পর উমাইয়া শাসনকে সুদৃঢ়ীকরণের জন্য বেশ কিছু যুগোপযোগী পদক্ষেপ নেন। এদের একটি হলো দিওয়ানুল রাসায়েল নামক নতুন দপ্তর স্থাপন। সেখানে খলিফার আদেশ, নিষেধ, দস্তাবেজ, চুক্তিপত্র, নথিপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হতো।

প্রশ্ন-৯. মুয়াবিয়া (রা) সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন কেন?

উত্তর: শাসনকার্যের সুবিধার জন্য খলিফা মুয়াবিয়া (রা) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীতে সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

মুয়াবিয়ার সময় কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে আরবি ভাষায় এবং প্রাদেশিক সচিবালয়গুলোতে আরবি, গ্রিক ও ফারসি ভাষার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করা হতো। কেন্দ্রীয় সচিবালয় প্রাদেশিক সচিবালয়গুলোর কার্যক্রমের ওপর নজরদারি করত। প্রাদেশিক সচিবালয়গুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হতো কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের নির্দেশে।

প্রশ্ন-১০. মুয়াবিয়া (রা) কেন নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন?

উত্তর: মুয়াবিয়া (রা) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শক্তিশালী নৌবহরের মোকাবিলা করার জন্য নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা। হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলে তিনি নৌবাহিনী গঠন করেন। ভূমধ্যসাগরে গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালীন ৫০০ জাহাজসহ একটি নৌবহর প্রস্তুত করেন। মুয়াবিয়া (রা) খলিফা হওয়ার পর মুসলিম নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করেন।

প্রশ্ন-১১. খলিফা আবদুল মালিকের আরবি ভাষা জাতীয়করণ বিষয়ে ধারণা দাও। *[ঢাকা বোর্ড ২০১৭]*

উত্তর: রাষ্ট্রে আরব জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে আবদুল মালিক আরবি ভাষা জাতীয়করণের উদ্যোগ নেন।

খলিফা আবদুল মালিক আর জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং রাষ্ট্রে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ফারসি, সিরীয় ও গ্রিকসহ প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা বাদ দিয়ে আরবিকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেন এবং সরকারি কাজে ও হিসাবপত্র লিপিবন্ধ করার ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। ৬৯৫-৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এ মর্মে একটি আদেশ জারি করেন। এর ফলে আরবরা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে চাকরি লাভ করে।

প্রশ্ন-১২. খলিফা আবদুল মালিক কেন আরবি লিপি সংস্কার করেছিলেন?

উত্তর: খলিফা আবদুল মালিক আরবি ভাষার সহজতর লিখন ও পঠনের মাধ্যমে অনারব অঞ্চল আরবীয়করণ করতে আরবি লিপি সংস্কার করেছিলেন।

খলিফা আবদুল মালিকের আগে আরবি লিপির দুটি বড় ত্রুটি ছিল। প্রথমত হরকতের অভাবে একই শব্দের বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণ হতো। দ্বিতীয়ত নোকতা না থাকাতে একই আকৃতির বর্ণগুলোর পার্থক্য সৃষ্টি করা যেত না। একারণে আরবি ভাষার সহজতর লিখন ও পঠনের জন্য আবদুল মালিক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সহযোগিতায় বর্ণমালায় হরকত ও নোকতা প্রবর্তন করেন।

প্রশ্ন-১৩. কুব্বাতুস সাখরা বা Dome of the Rock কী?

[সকল বোর্ড ২০১৯]

উত্তর: ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমে মহানবি (স) এর মিরাজের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র পাথরের ওপর উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক অষ্টকোণাকৃতির যে স্থাপত্যটি নির্মাণ করেন, তাই কুব্বাতুস সাখরা বা ডোম অব দি রক নামে পরিচিত।

খলিফা আবদুল মালিক তার চরম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে কুব্বাতুস সাখরা নির্মাণ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের মক্কা ও মদিনায় সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পবিত্র কাবাগৃহ মক্কায় অবস্থিত হওয়ায় প্রত্যেক বছর বিপুলসংখ্যক মুসলমান এখানে হজ পালন করতে যেত। হজযাত্রীদেরকে মক্কা থেকে জেরুজালেমের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য আবদুল মালিক কুব্বাতুস সাখরা Dome of the Rock নির্মাণ করেন। তিনি নিজের অনুসারীদের মক্কার পরিবর্তে এখানে হজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-১৪. খলিফা আবদুল মালিকের আরব জাতীয়তাবাদ নীতি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: খলিফা আবদুল মালিকের আরব জাতীয়তাবাদ নীতি বলতে রাষ্ট্রে আরব জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন ঘটানো এবং সুস্থ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তার গৃহীত পদক্ষেপকে বোঝায়।

আবদুল মালিকের শাসননীতির মূল বিষয় ছিল আরব জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ। তিনি শাসনক্ষমতায় বসে দেখলেন যে, আরব মুসলিমরা রাজ্যশাসন করলেও মূলত অনারব জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে পারসিক ও রোমানরা উমাইয়া খিলাফতের প্রশাসন পরিচালনা করছে। এমতাবস্থায় প্রশাসনে বিজাতীয় প্রভাব হ্রাস এবং আরব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খলিফা রাজকীয় দফতরসমূহে কেবল আরবি ভাষাভাষীদের চাকরি দেওয়া বিধান চালু করেন। অবশ্য এর দ্বারা প্রশাসনে যে আরব জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নয়। বহু অনারব দ্রুত আরবি ভাষা রপ্ত করে প্রশাসনে তাদের প্রাধান্য বজায় রাখেন।

প্রশ্ন-১৫. আবদুল মালিককে কেন উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়?

উত্তর: সাম্রাজ্যের সকল বিদ্রোহ দমন করে উমাইয়া বংশের শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর জন্য আবদুল মালিককে উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে কুফার শাসনকর্তা মুসাবের বিদ্রোহ এবং ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে হেজাজে নিজেকে খলিফা ঘোষণাকারী আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের বিদ্রোহ সফলভাবে দমন করেন। এর ফলে কারবালা যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়া উমাইয়াবিরোধী বিদ্রোহের অবসান ঘটে। এছাড়া প্রশাসনের আরাবীয়করণ করে আবদুল মালিক উমাইয়া খিলাফতের ভিত মজবুত করেন। এজন্য তাকে উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

প্রশ্ন-১৬. খলিফা আবদুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয় কেন? *[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯; সকল বোর্ড ২০১৮]*

উত্তর: উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) চারজন পুত্র পরবর্তী সময়ে খলিফা হওয়ায় তাকে রাজেন্দ্র বা Father of Kings বলা হয়।

৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আবদুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রি.), সুলায়মান (৭১৫-৭১৭ খ্রি.), দ্বিতীয় ইয়াজিদ (৭২০-৭২৪ খ্রি.) এবং হিশাম (৭২৪-৭৪৩ খ্রি.) উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। এজন্য আবদুল মালিককে রাজেন্দ্র বা Father of Kings বলা হয়।

প্রশ্ন-১৭. আল ওয়ালিদকে শ্রেষ্ঠ বিজেতা বলা হয় কেন?

উত্তর: মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারে অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ার কারণে আল ওয়ালিদকে শ্রেষ্ঠ বিজেতা বলা হয়।

আল ওয়ালিদ দশ বছরের রাজত্বকালে কয়েকজন সুযোগ্য সেনানায়কের সহযোগিতায় মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে মধ্য এশিয়ার ফারগানা থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের (রা) পর তার সময়ই মুসলিম খিলাফত সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়। এজন্য আল ওয়ালিদকে শ্রেষ্ঠ বিজেতা বলা হয়।

প্রশ্ন-১৮. হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫; ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]

উত্তর: হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন প্রশাসক, রাজনীতিবিদ ও উমাইয়া খিলাফতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আরবের মক্কার পার্শ্ববর্তী তায়েফ নগরীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ও ওয়ালিদের খিলাফতকালে পূর্বাঞ্চলীয় শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিদ্রোহ দমন ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি উমাইয়া বংশকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করে সমৃদ্ধি ও গৌরবের পথে পরিচালিত করেন। তিনি আজীবন নিষ্ঠার সাথে নিজের কর্তব্য পালন করে ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

প্রশ্ন-১৯. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিখ্যাত ছিলেন কেন?

[ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]

উত্তর: হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একজন শ্রেষ্ঠ উমাইয়া প্রশাসক। উমাইয়া শাসন সুরক্ষায় তিনি অনন্য অবদান রেখে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

উমাইয়া শাসনামলের বিভিন্ন সময়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হেজাজ, ইরাক ও পূর্বাঞ্চলের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতবর্ষের সিন্ধুসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল জয় করেন। তিনি রাজস্বব্যবস্থা সংস্কার ও কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এছাড়া তিনি আরবি বর্ণমালায় হরকত সংযোজন করেন, যা তাকে ইতিহাসে বিখ্যাত করেছে।

প্রশ্ন-২০. খলিফা সুলাইমানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন?
[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯; সকল বোর্ড ২০১৬]

উত্তর: ইরাকের বন্দিদের মুক্তিদানের জন্য খলিফা সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়।

উমাইয়া শাসনামলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুফা ও বসরায় ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা)-এর অনুসারীদের বিদ্রোহ দমন করে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি ইরাকের হাজার হাজার মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। খলিফা সুলায়মান ক্ষমতায় আরোহণের পর হাজ্জাজের বন্দিকৃত কয়েদিদের মুক্ত করে দেন। এ কারণে তাকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়।

প্রশ্ন-২১. উমাইয়া বংশের ব্যতিক্রমী খলিফা সম্পর্কে কী জানো?

উত্তর: উমাইয়া বংশের ব্যতিক্রমী খলিফা ছিলেন ওমর বিন আবদুল আজিজ।

মুয়াবিয়া (রা) থেকে শুরু করে সুলায়মান পর্যন্ত উমাইয়া খলিফাদের রাজত্বকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দেশ জুড়ে ক্ষমতার সংঘর্ষ, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতা। এমন সময় সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও প্রজাবৎসল খলিফা হিসেবে ওমর বিন আবদুল আজিজ সিংহাসনে আরোহণ এক ভিন্ন অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। উমাইয়া শাসকদের মধ্যে ব্যতিক্রমী উন্নত ও মহৎ চারিত্রিক গুণাবলির জন্য তাকে উমাইয়া সাধু বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২২. মাওয়ালি নীতি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: উমাইয়া খলিফারা মাওয়ালিদের (নওমুসলিম) জন্য যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তাকেই মাওয়ালি নীতি বলা হয়।

উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমরের আগ পর্যন্ত মাওয়ালিদের দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমানের মর্যাদা দেওয়া হতো। খলিফা আবদুল মালিক তাদের ওপর জিজিয়া ও খারাজ আরোপ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় ওমর ক্ষমতায় আরোহণ করে তাদের প্রতি এ নীতি পরিহার করেন। তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে মাওয়ালিদের নিয়োগ দেন। এছাড়া তাদের ওপর অতিরিক্ত কর রহিত করেন। উমাইয়ারা আফ্রিকানদের কাছ থেকে যে নিষ্ঠুর শিশুকর আদায় করত তাও তিনি রহিত করেন।

প্রশ্ন-২৩. ওমর বিন আবদুল আজিজকে পঞ্চম ধার্মিক খলিফা বলা হয় কেন?

উত্তর: খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ উমাইয়া শাসনামলে খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনব্যবস্থা চালু করায় তাকে ইসলামের পঞ্চম ধার্মিক খলিফা বলা হয়।

উমাইয়া খলিফাদের শাসনব্যবস্থা ছিল ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ সিংহাসনে আরোহণ করে তাদের এ শাসননীতির স্থলে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শাসন চালু করেন। তিনি অপরাপর উমাইয়া খলিফাদের ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতা পরিহার করে প্রজাদের কল্যাণে শাসন পরিচালনা করেন। এমনকি নিজের স্ত্রীর গহনাদিও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করেন। ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক শাসক হিসেবে ওমর বিন আবদুল আজিজ ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। এসব কারণে তাকে খুলাফায়ে রাশেদিনের পর পঞ্চম ধার্মিক খলিফা বলা হয়।

প্রশ্ন-২৪. উমাইয়া সাধু বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: উমাইয়া সাধু বলতে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজকে বোঝানো হয়।

উমাইয়া খলিফাদের রাজত্বকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দেশজুড়ে ক্ষমতার সংঘর্ষ, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতা। এমন সময় সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী, কর্তব্যপরায়ণ ও প্রজাবৎসল খলিফা হিসেবে ওমর বিন আবদুল আজিজের সিংহাসনে আরোহণ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রেম ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। এরূপ উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ধর্মভীরুতার জন্যই খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজকে উমাইয়া সাধু বলা হয়।

প্রশ্ন-২৫. খলিফা হিশামকে কেন উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ বলা হয়?

উত্তর: খলিফা হিশাম বেশ দক্ষতা ও রাজনৈতিক চাতুর্যের মাধ্যমে সব বিদ্রোহ দমন করে উমাইয়া বংশকে শক্তিশালী করেছিলেন বলে তাকে উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ বলা হয়।

খলিফা হিশাম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দীর্ঘ ২০ বছর উমাইয়া খিলাফত পরিচালনা করেন। তবে সিংহাসনে আরোহণ করে হিশাম চারদিকে বিভিন্ন বিদ্রোহ দেখতে পান। এরূপ প্রতিকূল অবস্থায়ও হিশাম বিচলিত না হয়ে একজন বিজ্ঞ রাজনীতিকের মতো সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। খুব কঠোর হাতে প্রায় সকল বিদ্রোহীদের তিনি দমন করে উমাইয়া বংশকে অকালে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

প্রশ্ন-২৬. খলিফাদের সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাবকে উমাইয়াদের পতনের কারণ বলা হয় কেন?

উত্তর: খলিফাদের সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাবে অনেক অযোগ্য খলিফা ক্ষমতায় আসেন এবং উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যা উমাইয়াদের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

উমাইয়া যুগে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যোগ্যতা ও সর্বসম্মতির পরিবর্তে উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত হতেন। খলিফার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলিফারা যোগ্যতার ভিত্তিতে চিন্তা না করে নিজ নিজ পুত্রদের পরবর্তী খলিফা নিয়োগ করতেন। যার ফলস্বরূপ অনেক সময়ই অযোগ্য ব্যক্তিরা ক্ষমতায় আসেন। তাদের অপশাসন উমাইয়া শাসনের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খুলাফায়ে রাশেদিনের পর কারা খিলাফত পরিচালনা করে?
ক. উমাইয়ারা খ. আব্বাসিরা
গ. খারেজিরা ঘ. ফাতেমিরা

২. কত খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ৬৬১ খ. ৬৮১
গ. ৭৫০ ঘ. ৯১০

৩. উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. আবু বকর (রা) খ. মুয়াবিয়া (রা)
গ. আবদুল মালিক ঘ. ওমর (রা)

৪. মুয়াবিয়া (রা)-এর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় কার সময় থেকে?
ক. ওমর (রা)-এর খ. আলি (রা)-এর
গ. ওসমান (রা)-এর ঘ. আবু বকর (রা)-এর

৫. মুয়াবিয়া (রা) কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু করেন?
ক. গণতান্ত্রিক খ. রাজতান্ত্রিক
গ. সমাজতান্ত্রিক ঘ. পুঁজিবাদী

৬. কত খ্রিষ্টাব্দে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক. ৬৫৭ খ. ৬৫৯
গ. ৬৬১ ঘ. ৬৬৩

৭. মুয়াবিয়া (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন?
ক. ৬৬০ খ. ৬৬১
গ. ৬৬২ ঘ. ৬৬৩

৮. মুসলিম নৌ-বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. মুয়াবিয়া (রা) খ. মারওয়ান
গ. আবদুল আজিজ ঘ. ইয়াজিদ

৯. মুয়াবিয়া (রা) কত মাইল অন্তর একটি ডাকঘর স্থাপন করেন?
ক. ১০ খ. ১২
গ. ১৪ ঘ. ১৬

১০. মুয়াবিয়া (রা)-এর সময় ডাক বিভাগ কোন নামে পরিচিত ছিল?
ক. সাহিব উল বারিদ খ. সুলতান উল বারিদ
গ. দিওয়ানুল বারিদ ঘ. মালিক উল বারিদ

১১. মুয়াবিয়া (রা)-এর সময় ডাক বিভাগের কর্মকর্তাকে কী বলা হতো?
ক. দিওয়ান উল বারিদ খ. মালিক উল বারিদ
গ. মিজান উল বারিদ ঘ. সাহিব উল বারিদ

১২. কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
ক. ৬৮০ খ. ৬৮১
গ. ৬৮২ ঘ. ৬৮৫

১৩. কারবালা কোন দেশে অবস্থিত?
ক. তুরস্কে খ. ইরানে
গ. ইরাকে ঘ. মিসরে

১৪. কুব্বাতুস সাখরা কে নির্মাণ করেন?
ক. মুয়াবিয়া (রা) খ. আবদুল মালিক
গ. আল-ওয়ালিদ ঘ. হিশাম

১৫. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখেন। তার সাথে নিচের কোন উমাইয়া শাসকের মিল রয়েছে?
ক. আবদুল মালিকের খ. সুলায়মানের
গ. ওয়ালিদের ঘ. মারওয়ানের

১৬. আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটান কোন খলিফা?
ক. আবদুল মালিক খ. মুয়ারিয়া (রা)
গ. আল ওয়ালিদ ঘ. হিশাম

১৭. ইসলামের প্রথম কিবলা কোথায় ছিল?
ক. মক্কা (কাবা) খ. জেরুজালেম
গ. কুফা ঘ. মদিনা

১৮. উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন?
ক. মুয়াবিয়া (রা) খ. আবদুল মালিক
গ. আল ওয়ালিদ ঘ. সুলায়মান

১৯. আরবরা ভারত বিজয় করে কোন খলিফার শাসনামলে?
ক. মুয়াবিয়া (রা)-এর খ. আবদুল মালিকের
গ. আল ওয়ালিদের ঘ. সুলাইমানের

২০. সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম বীরের নাম কী
ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম খ. তারিক বিন জিয়াদ
গ. কুতায়বা বিন মুসলিম ঘ. মুসা বিন নসায়ের

২১. সুলায়মানকে 'আশীর্বাদের চাবি' বলা হয় কেন?
ক. আইয়ুবকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায়
খ. আজিজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায়
গ. দাউদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায়
ঘ. রাজবন্দিদের মুক্তিদান করায়

২২. খলিফা দ্বিতীয় ওমরকে 'পঞ্চম খলিফা' বলা হয় কেন?
ক. ৪র্থ খলিফার পরে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলে
খ. উমাইয়া খিলাফতের ৫ম খলিফা ছিলেন বলে
গ. তিনি পঞ্চম বার খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে
ঘ. খুলাফায়ে রাশেদিনের নীতি অনুসরণ করেন বলে

২৩. উমাইয়া যুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি?
ক. দামেস্ক মসজিদ খ. আল আকসা মসজিদ
গ. কুব্বাতুস সাখরা ঘ. সবুজ রাজ প্রাসাদ

২৪. কোন আন্দোলনের মাধ্যমে উমাইয়াদের পতন ঘটে?
ক. খারেজি আন্দোলন
খ. আব্বাসি আন্দোলন
গ. জাকাত বিরোধী আন্দোলন
ঘ. কুফার আন্দোলন

২৫. কত খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়াদের পতন ঘটে?
ক. ৭১২ খ. ৭৩৫
গ. ৭৫০ ঘ. ৭৫৭

২৬. উমাইয়া যুগের সর্বশেষ খলিফা ছিলেন?
ক. দ্বিতীয় ইয়াজিদ খ. তৃতীয় ইয়াজিদ
গ. দ্বিতীয় ওয়ালিদ ঘ. দ্বিতীয় মারওয়ান

২৭. উমাইয়া খিলাফতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
ক. বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
খ. প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
গ. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
ঘ. সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২৮. দুমাতুল জন্দলের সালিশির রায়ের ফলে—
i. মুয়াবিয়া (রা)-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
ii. মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট হয়
iii. হযরত আলি (রা)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. খলিফা আবদুল মালিক আরবিকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান করেন—
i. রাষ্ট্রকে আরবীয়করণ ও জাতীয়করণের জন্য
ii. সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য
iii. গৃহযুদ্ধ অবসান করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০. মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ফলে—
i. সামাজিক বৈষম্যের বিলোপ ঘটে
ii. স্পেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে
iii. বিধর্মীরা ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩১ ও ৩২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশের জেলেরা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মাছ শিকারের সময় প্রায়ই জলদস্যুদের কবলে পড়ে। সরকার জলসীমার নিরাপত্তা রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে কোস্টগার্ড গঠন করে।

৩১. বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের মতো ইসলামের কোন শাসক সর্বপ্রথম এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?
ক. মুয়াবিয়া (রা) খ. আমর ইবনুল আস
গ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ঘ. মুসা বিন নুসায়ের

৩২. উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বাংলাদেশেও—
i. উপকূল রক্ষা পাবে
ii. সমুদ্রাভিযান সহজ হবে
iii. বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৩ ও ৩৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভারতে মুসলিম শাসকদের মধ্যে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশ সর্বপ্রথম স্বাধীন মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তিনি জানতেন পৃথক মুদ্রা ছাড়া শাসকের কর্তৃত্বে পূর্ণতা আসে না। ইলতুৎমিশ কর্তৃক প্রবর্তিত মুদ্রার নাম 'রুপাইয়া'।

৩৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রা প্রচলনের সাথে নিচের কোন শাসকের মিল রয়েছে?
ক. মুয়াবিয়া (রা) খ. আবদুল মালিক
গ. আল ওয়ালিদ ঘ. হিশাম

৩৪. স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রচলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়—
i. দেশের সার্বভৌমত্ব
ii. শাসকের কর্তৃত্ব
iii. রাজনৈতিক দূরদর্শিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে সকল প্রকার অন্যায় কর আদায় বন্ধ করে দেয়। অবৈধভাবে দখল করা সম্পদ-সম্পত্তি বৈধ মালিককে ফেরত দেয় এবং অনেকের ওপর আরোপিত বৈধ করও মওকুফের ব্যবস্থা করে।

৩৫. উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত কর্মকাণ্ডের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য দেখা যায়?
ক. মুয়াবিয়া (রা)
খ. আবদুল মালিক
গ. আল ওয়ালিদ
ঘ. ওমর বিন আবদুল আজিজ

৩৬. উদ্দীপকে সরকারের কর্মকাণ্ডে উক্ত খলিফার যে গুণটির প্রতিফলন দেখা যায় তা হলো—
ক. দূরদর্শিতা খ. দক্ষতা
গ. ন্যায়পরায়ণতা ঘ. সরলতা

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৭. সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলি (রা)-এর পরাজয়ের কারণ কী? */সকল বোর্ড ২০২৫/*

ক. মুয়াবিয়ার কুটকৌশল
খ. আলি (রা)-এর নমনীয়তা
গ. সেনাপতির দুর্বলতা
ঘ. প্রতিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা

৩৮. উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী কোথায় স্থাপিত হয়? */সকল বোর্ড ২০২২, ২০১৭, ২০১৫/*

ক. মদিনা খ. দামেস্ক
গ. কুফা ঘ. বাগদাদ

৩৯. সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি মুদ্রা প্রথম প্রবর্তন করেন কোন খলিফা? */সকল বোর্ড ২০২৫, ২০২৩/*

ক. হযরত মুয়াবিয়া (রা) খ. আবদুল মালিক
গ. ১ম ওয়ালিদ ঘ. ২য় ওমর

৪০. কোন খলিফা সর্বপ্রথম রাজকীয় টাকশাল স্থাপন করেন? */সকল বোর্ড ২০২২, ২০১৫/*

ক. মুয়াবিয়া (রা) খ. আবদুল মালিক
গ. আল ওয়ালিদ ঘ. ওমর বিন আবদুল আজিজ

৪১. কোন মুসলিম সেনাপতি স্পেন জয় করেন? */সকল বোর্ড ২০১৯/*

ক. তারিক বিন জিয়াদ
খ. মুহাম্মদ বিন কাসিম
গ. ওকবা বিন নাফি
ঘ. কুতাইবা বিন মুসলিম

৪২. খলিফা প্রথম ওয়ালিদ কোন ৩টি মহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করেছিলেন? */সকল বোর্ড ২০২৩/*

ক. এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা
খ. ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া
গ. আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকা
ঘ. অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, এশিয়া

৪৩. উমর বিন আবদুল আজিজকে 'উমাইয়া সাধু' বলার কারণ কী? */সকল বোর্ড ২০২৫/*

ক. উমাইয়াদের স্বার্থ রক্ষার জন্য
খ. দেখতে সাধুর মতো ছিলেন বলে
গ. আব্বাসিদের বিরোধিতার কারণে
ঘ. খুলাফায়ে রাশেদিনের অনুসরণের জন্য

৪৪. আব্দুল মালিকের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য সংস্কারসমূহ হলো— */সকল বোর্ড ২০২২/*

i. আরবি মুদ্রা চালুকরণ
ii. আরবি লিপির উৎকর্ষ সাধন
iii. কুরআন সংকলন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৫. নিচের কারা উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সেনাপতি ছিলেন? */সকল বোর্ড ২০১৮/*

i. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ
ii. তারিক বিন জিয়াদ
iii. মুসা বিন নুসায়ের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৬ ও ৪৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

পতিত সরকার নিজেদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতার একমাত্র মালিক মনে করত। ফলে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র ভেঙে পড়ে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। কর্তৃত্ববাদী প্রশাসন বিরোধী মতকে নিষ্পেষণ করে। বিক্ষুব্ধ মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। */সকল বোর্ড ২০২৫/*

৪৬. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকার ব্যবস্থার সাথে ইসলামে প্রথম কোন শাসক বংশের সাজুয্য দেখা যায়?

ক. কুরাইশ খ. উমাইয়া
গ. আব্বাসি ঘ. ফাতেমি

৪৭. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসন-মানসিকতার মতো পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে খিলাফতে—

i. অসন্তোষ দেখা দেয়
ii. মর্যাদা নষ্ট হয়
iii. অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইসলাম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার জনাব জহিরুল ইসলাম। তার মৃত্যুর পর তার সন্তানগণ পর্যায়ক্রমে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। */সকল বোর্ড ২০২২/*

৪৮. ইসলাম সাহেবের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার মিল পাওয়া যায়?

ক. আবদুল মালিক খ. আল ওয়ালিদ
গ. সুলায়মান ঘ. হিশাম

উদ্দীপকটি পড়ে ৪৯ ও ৫০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সম্রাট আলেকজান্ডারের রাজত্বকালে গ্রিকদের অগ্রযাত্রা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় বিস্তৃত হয়। তিনি একজন দিগ্বিজয়ী হিসেবে সুপরিচিত। */সকল বোর্ড ২০১৭/*

৪৯. সম্রাট আলেকজান্ডারের মতো কোন উমাইয়া শাসক সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন?

ক. ইয়াজিদ
খ. প্রথম ওয়ালিদ
গ. ওমর বিন আবদুল আজিজ
ঘ. হিশাম

৫০. উদ্দীপকের মতো উক্ত শাসকের কর্মকাণ্ডের ফলে কী ঘটেছিল?

ক. শত্রুসংখ্যার বৃদ্ধি   খ. মুসলমানদের অসন্তুষ্টি
গ. ইসলামের প্রসার   ঘ. রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫১ ও ৫২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইব্রাহিম একজন মহান শাসক ছিলেন। ধর্মভীরু মুসলিম শাসক হলেও পর ধর্মের প্রতি তিনি খুবই সহনশীল ছিলেন। তিনি অমুসলিমদের উপর থেকে করের বোঝা কমিয়ে দেন। *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

৫১. উদ্দীপকের শাসক নিচের কোন শাসকের প্রতিচ্ছবি?

ক. মুয়াবিয়া (রা)   খ. আবদুল আজিজ
গ. আল-ওয়ালিদ   ঘ. ওমর বিন আবদুল আজিজ

৫২. উক্ত শাসককে বলা যায়—

i. প্রজাবৎসল
ii. ন্যায়পরায়ণ   iii. ধর্মনিরপেক্ষ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	খ	৪	ক	৫	খ	৬	ক	৭	খ	৮	ক	৯	খ	১০	গ	১১	ঘ	১২	ক
১৩	গ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	খ	১৮	খ	১৯	গ	২০	ক	২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	খ
২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ক	৩০	খ	৩১	ক	৩২	ঘ	৩৩	খ	৩৪	ঘ	৩৫	ঘ	৩৬	গ
৩৭	ক	৩৮	খ	৩৯	খ	৪০	খ	৪১	ক	৪২	ক	৪৩	ঘ	৪৪	ক	৪৫	ঘ	৪৬	খ	৪৭	ঘ	৪৮	ক
৪৯	খ	৫০	গ	৫১	ঘ	৫২	ক																

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দুমাতুল জন্দলের সালিশের ফলাফল সংক্ষেপে লেখো।

২. খলিফা আলি (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

৩. মুসলিম বিশ্বে কীভাবে উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্রের সূচনা হয়? ব্যাখ্যা করো।

৪. কারবালার যুদ্ধের ফলাফল কীরূপ ছিল?

৫. ময়ূর বাহিনী সম্পর্কে ধারণা দাও।

৬. স্থাপত্য ক্ষেত্রে খলিফা আল ওয়ালিদের অবদান সংক্ষেপে লেখো।

৭. খলিফা আবদুল মালিক মাওয়ালিদের ওপর জিজিয়া ও খারাজ আরোপ করেছিলেন কেন?

৮. খলিফা হিশামকে কেন উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ বলা হয়?

৯. উমাইয়া সমাজে জিম্মিদের অবস্থান ব্যাখ্যা করো।

১০. মিরদ মেলা সম্পর্কে ধারণা দাও।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ইলখানি সুলতান গাজান খান গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা এবং দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ডাক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেন। তিনি সরকারি পত্রাবলি প্রস্তুত ও প্রেরণের জন্য একটি পৃথক দপ্তর সৃষ্টি করেছিলেন। মূলত সরকারি পত্রাদির জাল প্রতিরোধ করার জন্যই তাঁর ব্যবস্থা কার্যকর ছিল।

[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

ক. কোন খলিফা সর্বপ্রথম মুসলিম নৌ-বাহিনী গঠন করেন?

খ. দিওয়ান-আল-খারাজ কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. কোন উমাইয়া খলিফা গাজান খানের ন্যায় ডাক বিভাগ গঠন করেছিলেন? বর্ণনা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আমির মুয়াবিয়ার রাষ্ট্রীয় পত্রাদি সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করো।

২. রাজা প্রথম জর্জ ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের সূচনা করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পরই তিনি রাজতন্ত্র সুদৃঢ়করণের স্বার্থে সংস্কারমূলক কার্যক্রমে হাত দেন। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রশাসনকে ঢেলে সাজান। এছাড়া স্কটল্যান্ড, উস্টারশায়ার, ম্যানচেস্টার প্রভৃতি কান্ট্রিতে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্ষেত্র বিশেষে উদারতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেখালেও একজন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ কূটনীতিক হিসেবে তিনি রাজতন্ত্রের জাঁকজমকতা ও আড়ম্বরতায় বিশ্বাসী ছিলেন। *[ঢা. বো., য. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩]*

ক. মুসলিম নৌ-বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা কোন খলিফা?

খ. 'জিজিয়া' কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. রাজা প্রথম জর্জের শাসন নীতির সাথে খলিফা হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর (রা) শাসন নীতির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে খলিফা হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর (রা) প্রশাসনিক সংস্কারের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করো।

৩. ঢাকার ঐতিহ্যবাহী হোসনী দালান থেকে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট দিনে বের হয় তাজিয়া মিছিল। নানাভাবে সজ্জিত হয়ে সব একই ধ্বনি উচ্চারণ করে এ মিছিলে অংশ নেয়। কেউ ছোরা দিয়ে আঘাত করে শরীর থেকে রক্ত ঝরায়, আবার কেউ নানা বিলাপের মাধ্যমে মিছিলকে এক শোকর‍্যালিতে পরিণত করে। এছাড়া উক্ত দিনে অনেকে মিছিলের মধ্যে নানা সাজে সজ্জিত হয়ে নিজেদের আকুতি প্রকাশ করে। নানা প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে আতাতের এক শোকাবহ ঘটনাকে জীবন্ত করে উপস্থাপিত করা হয় এ মিছিলে।

ক. আবদুল মালিকের পিতার নাম কী ছিল?
খ. দিওয়ানুল বারিদ কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের ঘটনা তোমার পঠিত কোন ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত ঘটনা ইসলামের ঐক্যের ফাটলকে আরও প্রকট করেছিল— মতামত দাও।

৪. যোগ্যতম একজন সাধু যখন একটি শহরে এসে ক্ষমতাসীনদের রোষানলে পড়ে নিহত হন তখন ঐ শহরে তাঁর ভক্ত শ্রেণির অধিকাংশ তাঁকে ত্যাগ করেন। অথচ শাসক বদল হলে পরবর্তীতে এই ভক্ত শ্রেণি ঐ সাধু ব্যক্তির নামে দল গঠন করে এবং হত্যার প্রতিশোধ নেয়। নতুন শাসক উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাদের কঠোর হাতে দমন করেন। শাসক নিজ বংশের ক্ষমতা স্থায়ীকরণ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে সমগ্র দেশে একই মুদ্রা ও একই ভাষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। তিনি রাজস্ব নীতিতেও পরিবর্তন এনে রাজকোষ সমৃদ্ধ করেন।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]

ক. ইসলামের ইতিহাসে কাকে 'রাজেন্দ্র' বা 'Father of kings' বলা হয়?
খ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
গ. উদ্দীপকের ভক্ত শ্রেণির সাথে কুফার 'অনুশোচনাকারী' দলটির সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের নতুন শাসকের কর্মকাণ্ডের আলোকে খলিফা আবদুল মালিকের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করো।

৫. স্পেনীয়রা কৃষিপ্রধান দেশ ব্রাজিল দখল করে সেখানে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্পেনিশ চালু করে। তাছাড়া খ্রিষ্টানদের কৃষিজমি ক্রয় বন্ধ ঘোষণা করে এবং তাদের উপর যে কর রেয়াত প্রচলিত ছিল তা রহিত করে। ফলে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে জনগণের যে রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল সেসব থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]

ক. খলিফা আবদুল মালিক কোন বংশের শাসক ছিলেন?
খ. সংক্ষেপে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরিচয় দাও।
গ. উদ্দীপকে দাপ্তরিক ভাষা প্রচলনের মতো খলিফা আবদুল মালিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে স্পেনের গৃহীত পদক্ষেপের আলোকে খলিফা আবদুল মালিকের রাজস্ব সংস্কার আলোচনা করো।

৬. রাজা জুলিয়াস সিজার বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে বহু প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত থাকায় তিনি সর্বত্র একই রোমান মুদ্রা প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেন। সরকারি কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় কাজে রোমান ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। অন্য ভাষাভাষী মানুষও যাতে সহজে রোমান ভাষা আয়ত্ত করতে পারে সেজন্য তিনি রোমান লিপির সংস্কার সাধন করেন।

ক. কাকে রাজেন্দ্র বলা হয়?
খ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিখ্যাত ছিলেন কেন?
গ. উদ্দীপকে রাজা জুলিয়াস সিজারের মুদ্রা সংস্কারের সাথে খলিফা আবদুল মালিকের কোন শাসন সংস্কারের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. রাজা জুলিয়াস সিজারের মতো খলিফা আবদুল মালিকও ভাষার ক্ষেত্রে প্রভূত সংস্কার করেছিলেন— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

৭. ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার প্রচলন করেন। ফলে ভারতের মুসলমানদের বৃহদাংশ ইংরেজি না জানার কারণে চাকরি হারান। মুদ্রার ক্ষেত্রেও তারা প্রচলিত মুদ্রা বাতিল করে নতুন উপনিবেশিক মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করেন।

[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

ক. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কে ছিলেন?
খ. খলিফা আবদুল মালিককে 'রাজেন্দ্র' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ. ব্রিটিশ মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কারের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার সংস্কার কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে খলিফা আবদুল মালিকের ভাষা সংস্কারের উদ্দেশ্য ও ফলাফলের বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করো।

৮. মেনেস প্রাচীন মিসরের শক্তিশালী ফারাও ছিলেন। তিনি মিসরের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে নিজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকোষকে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করতেন। তিনি প্রথম মিসরে নৌবাহিনীর পত্তন করে গ্রিকদের অনেক দীপাঞ্চল নিজ রাজভুক্ত করেছিলেন। মিসরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন তার ভগ্নিপতি। তার শাসনকাল ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ধর্ম-কর্মে একনিষ্ঠ হলেও তিনি ছিলেন কুটিল চরিত্রের অধিকারী। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি যে কোনো জঘন্য কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। তার একমাত্র পুত্র ছিল পাপাসক্ত, অত্যাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং অকর্মন্য। মেনেস মৃত্যুকালে তার পাপাসক্ত ছেলেকে মিসরের সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকার নিযুক্ত করেন।

[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]

ক. উমাইয়া সাধু পুরুষ কে ছিলেন?
খ. রাজেন্দ্র বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ফারাও মেনেসের সাথে তোমার পঠিত কোন উমাইয়া খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার পুত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

৯. সুলতানি ও মুঘল আমলে ভারতে ফার্সি ভাষায় সরকারি কার্যক্রম চলত। কিন্তু পলাশি যুদ্ধের পর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। শাসনক্ষেত্রে ব্রিটিশরা ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করে। এরই প্রেক্ষিতে তারা ভারতে ইংরেজি শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। অফিস-আদালতসহ সবখানে ইংরেজি ভাষা চালু করা হয়। অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসায় তারা ইংরেজি সংস্কৃতি চালু করে।
[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯]
ক. উমাইয়া খিলাফতের পতন হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
খ. মুয়াবিয়া (রা)-কে কেন আরবদের প্রথম রাজা বলা হয়?
গ. উদ্দীপকে খলিফা আবদুল মালিকের কোন সংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পদক্ষেপ আবদুল মালিকের আরবীয়করণ নীতির প্রতিচ্ছবি— মূল্যায়ন করো।

১০. বাংলাদেশের ফুটবল জগতে আবাহনী স্পোর্টিং ক্লাব অত্যন্ত সুপরিচিত। ক্লাবটি আবির্ভূত হয়ে একের পর এক শিরোপা জিততে শুরু করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নামকরা কয়েকজন অভিজ্ঞ ও চৌকশ খেলোয়াড়ের হাত ধরে দেশি-বিদেশি শিরোপা জয় করতে সক্ষম হয়। বর্তমান অধিনায়কের দূরদর্শী নেতৃত্বে ও বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়দের চোখ ধাঁধানো নৈপুণ্যে আবাহনী স্পোর্টিং ক্লাবটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষদের হারিয়ে মূল্যবান ও মর্যাদাসম্পন্ন শিরোপা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। অবশ্যই এসব জয়ের পেছনে বর্তমান অধিনায়কের চেয়ে পূর্বের অধিনায়কের ভূমিকাও কম নয়। কেননা বর্তমান অধিনায়ক একটি সুসংগঠিত দল পেয়েছিলেন।
[ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]
ক. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
খ. কাকে এবং কেন 'রাজেন্দ্র' বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের বর্তমান অধিনায়কের সাথে কোন অর্থে খলিফা আল ওয়ালিদের মিল করা যেতে পারে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'আল ওয়ালিদের আগের খলিফা সাম্রাজ্য বিজয়ের পথকে সহজ করে দিয়েছে'— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

১১. রাজা ধর্মপাল রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। তবে তার পুত্র দেবপাল ক্ষমতায় আরোহণ করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি পূর্ব ও দক্ষিণে অনেকগুলো সফল অভিযানের মাধ্যমে বিশাল পাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। দেবপালের প্রতিটি অভিযানে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন তার দুইজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কিছুসংখ্যক দক্ষ সেনাপতি।
[ঢাকা বোর্ড ২০১৭]
ক. কাকে আরব বিশ্বের প্রথম রাজা বলা হয়?
খ. খলিফা আবদুল মালিককে 'রাজেন্দ্র' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের রাজা ধর্মপালের সাথে খলিফা আবদুল মালিকের কোন কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের রাজা দেবপালের মতোই খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক শ্রেষ্ঠ বিজেতা ছিলেন— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

১২. চেঙ্গিস খান শুধু তার নিজস্ব বীরত্বে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে পারেননি। তার দক্ষ সেনাপতিদের রণনিপুণতাই তার সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতির প্রধান কারণ ছিল। তাছাড়া সাম্রাজ্য বিস্তার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তার বিশাল সাম্রাজ্যকে তিনি উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল নামক দুইটি প্রধান উইং-এ বিভক্ত করে সেখানে দুইজন দক্ষ প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন। তারা দুইজনই পরস্পর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রাজ্য বিস্তার করতেন। তবে এদের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রতিনিধি মঙ্গু খান ছিলেন খুবই নৃশংস। *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*
ক. সর্বপ্রথম কোন খলিফা মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করেছিলেন?
খ. হিমারীয়-মুদারীয় দ্বন্দ্বের কারণ ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের মঙ্গু খানের সাথে প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলের কোন প্রাদেশিক গভর্নরের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. চেঙ্গিস খানের মতো খলিফা প্রথম ওয়ালিদও মূলত দক্ষ সেনাপতিদের কারণে খিলাফতের সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন— বিশ্লেষণ করো।

১৩. মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খান বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। তার দক্ষ সেনাপতিদের রণনিপুণতায় তিনি বিশাল ভূখণ্ডের অধিকারী হন। *[রা. বো., য. বো., সি. বো. ২০১৯]*
ক. উমাইয়াদের প্রথম খলিফা কে?
খ. ডোম অব দি রক কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত খলিফার তিনটি মহাদেশে অভিযান বিশ্লেষণ করো।

১৪. জনাব আলী আজম দয়ালু, সদাশয় ও প্রজাবৎসল খলিফা। তিনি চারিত্রিক দিক দিয়ে ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। কর ব্যবস্থার সংস্কার করে তিনি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন। তিনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের শাসনকার্যে নিয়োগ করে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তার বৈদেশিক নীতি ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিধান। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

ক. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. খলিফা সুলাইমানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে কোন উমাইয়া খলিফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনা করো।

১৫. ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ়করণে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্যবিস্তার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই বড় কোনো সামরিক অভিযান পরিচালনা করেননি। ফিরোজ শাহের এসব নীতি তাঁর বংশের পতনকে অনেকাংশেই ত্বরান্বিত করেছিল।

ক. 'সিন্ধু' বিজয়ী সেনাপতির নাম কী?

খ. খলিফা সুলায়মানকে 'আশীর্বাদের চাবি' বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে কোন উমাইয়া শাসকের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত খলিফার শাসননীতি উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী ছিল বিশ্লেষণ করো।

১৬. 'ক' বিভাগের মেয়র একজন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তি। তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন। বিলাসিতা মনে করে তিনি তার বরাদ্দকৃত সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতেন না। এমনকি বাসায় কোন কাজের লোকও রাখেন না। তার স্ত্রী নিজের হাতে রান্না করেন। তিনি তার স্ত্রীর সব রকমের গহনাপত্র বিক্রয় করে রাজকোষের জমা দেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ইসলামের রীতিনীতি মেনে চলার চেষ্টা করেন। জনগণের কল্যাণ সাধনাই নিজের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেন।

ক. কুব্বাত তুস সাখরা কে নির্মাণ করেন?

খ. দিওয়ান-উল-বারিদ সম্পর্কে কী জানো?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়রের সাথে কোন খলিফার কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত খলিফার কর্মকাণ্ড কোন দিক দিয়ে মেয়রের কর্মকাণ্ডের চেয়ে অধিক প্রশংসনীয়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১৭. মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সফল সম্রাট আওরঙ্গজেব। একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তিনি দুনীতি, অনৈসলামিক ও অনৈতিক কাজ নিষিদ্ধ করেন। তিনি সর্বজনীন প্রশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেন। আওরঙ্গজেব তার সময়ের প্রায় ৮০ প্রকারের বেআইনি কর রহিত করেন। তিনি যাকাত, উশর ইত্যাদি মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক করেন এবং অমুসলিমদের জন্য জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। এছাড়া ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামি শিক্ষার প্রসারে তিনি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তবে তিনি দাক্ষিণাত্যে সমর অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন। আর এ অভিযানে অনেক মন্দির ধ্বংস করা হয় এবং মন্দিরের ধন-সম্পদ লুট করা হয়।

ক. কাকে 'আশীর্বাদের চাবি' বলা হয়?

খ. খলিফা আবদুল মালিককে উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ (র)-এর কর্মকাণ্ডের মিল ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সম্রাট আওরঙ্গজেবের কিছু কর্মকাণ্ড উক্ত শাসকের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না— যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করো।

১৮. ডা. মাহাথির মোহাম্মদ আধুনিক মালয়েশিয়ার প্রধান রূপকার হিসেবে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি সব নীতি, পদ্ধতি, প্রাত্যহিক সব কাজ, আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুনঃপরীক্ষা করেন। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ওয়ার্ক ফ্লো-চার্ট আর অফিস ম্যানুয়াল চালু করেন। ব্যবসায় এবং রাজনীতিতে ফুটপাতের লোক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের লোকেরা দেশ ও নিজেদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দারিদ্র্য বিমোচন নীতি গ্রহণ করেন। শাসক হিসেবে সফল মাহাথির মোহাম্মদ ছিলেন ইসলামের প্রতি খুবই অনুরাগী। তবে তার মধ্যে কোনোরূপ ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তাই সুশাসক হিসেবে তিনি সমধিক খ্যাত।

ক. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কে ছিলেন?

খ. জিজিয়া কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের ডা. মাহাথির মোহাম্মদের সাথে ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসননীতির কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের দারিদ্র্য বিমোচন নীতির আলোকে ওমর বিন আবদুল আজিজের 'মাওয়ালি নীতি' পর্যালোচনা করো।

১৯. ইলখানি সুলতান গাজান খান একজন প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। তিনি জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে সকল প্রকার অন্যায় কর নিষিদ্ধ করেন। তার শাসন নীতি ছিল প্রজাকল্যাণ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা। তিনি অত্যন্ত ন্যায়বান, সচ্চরিত্রের অধিকারী, পরিশ্রমী শাসক ছিলেন সত্য, তবে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরোধিতা, বহুজাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রের দুর্বলতা, ইলখানিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব ইত্যাদি কারণে ইলখানি সাম্রাজ্যটি খুব স্থায়ী হয়নি। *[ঢা. বো., য. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩]*

ক. কত সালে উমাইয়া খিলাফতের পতন হয়?

খ. কোন উমাইয়া খলিফাকে আশীর্বাদের চাবি বলা হতো এবং কেন?

গ. গাজান খানের শাসন নীতির সাথে কোন উমাইয়া খলিফার শাসন নীতির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কারণগুলোর আলোকে উমাইয়া খিলাফতের পতনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করো।

২০. জনাব শাহজাহান খান কলাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, সদাশয় ও জনদরদী ব্যক্তি এবং চারিত্রিক দিক দিয়ে ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ। তিনি ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধকে হৃদয়ে ধারণ করতেন। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তিনি গরিব জনগণের বিভিন্ন খাজনা মওকুফ করেন এবং কর ব্যবস্থার সংস্কার করে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন। ভিন্ন মতাবলম্বীদের শাসনকার্যে নিয়োগ করে তিনি এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। *[ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে?

খ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিখ্যাত ছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে কোন উমাইয়া খলিফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'উক্ত খলিফার শাসননীতি ছিল জনকল্যাণমুখী'— বিশ্লেষণ করো।

২১. একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্মুখ সময়ে আমাদের সেনাবাহিনীর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। অথচ স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার সেই সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে রাখে। অন্যদিকে দেশ গঠনে কিছু উদারনৈতিক কার্যক্রম অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে এবং ভুল অর্থনীতির মারপ্যাচে দিনে দিনে দেশ তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়। ফলে দেশের পতনের জন্য সকলে সেই ১ম সরকারকেই দায়ী করে। *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৪]*

ক. কে বায়তুল মালকে মুসলমানদের সম্পদ বলে ঘোষণা করেন?

খ. "মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করার জন্য নবিকে পাঠানো হয়েছে— খতনা করানোর জন্য নয়"— কথাটি খলিফা দ্বিতীয় উমর কোন প্রেক্ষিতে বলেছিলেন? ব্যাখ্যাসহ লেখো।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বাংলাদেশের প্রথম সরকারের গৃহীত সেনাবাহিনীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি খলিফা দ্বিতীয় উমরের খিলাফত কালেও প্রদর্শিত হয়েছিল— ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রাষ্ট্র পরিচালনায় উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপের মতো খলিফা ২য় উমরও কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন বলেই উমাইয়া খিলাফতের পতন তরান্বিত হয়েছিল— উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

২২. সুলতান নাসিরউদ্দিন একজন মহান শাসক ছিলেন। ধর্মভীরু শাসক হলেও পরধর্মের প্রতি তিনি কখনই বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। বরং খুবই সহনশীল ছিলেন। তিনি অমুসলিমদের উপর থেকে করের বোঝা কমিয়ে দিয়ে নানারকম সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপসহীন। *[রা. বো., য. বো., সি. বো. ২০১৯]*

ক. উমাইয়াদের শেষ খলিফার নাম কী?

খ. 'রাজেন্দ্র' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সুলতানের কর্মকাণ্ড কোন উমাইয়া খলিফার কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'উক্ত খলিফা উমাইয়া বংশের পতনের জন্য কতটুকু দায়ী?' তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো।

২৩. 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো'— কথাটি শাহরিয়ার তুষার ছোট বেলা থেকেই গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি ছাত্রজীবনে ছিলেন তুখোড় ছাত্রনেতা। দেশের প্রধানমন্ত্রী মেধাবী তুষারের গুণে মুগ্ধ হয়ে তার সাথে নিজ মেয়ের বিয়ে দেন। অনেক দামি দামি স্বর্ণালংকার দেন মেয়েকে। জনগণের ব্যাপক সমর্থনে তুষার এবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি তার স্ত্রীকে আদেশ দিলেন, তার পিতার দেয়া দামি দামি স্বর্ণালংকার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে কেননা ওগুলো জনগণের টাকায় কেনা ছিল। তবে তার গৃহীত নীতি, তার বংশের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। *[রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৭]*

ক. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. কারবালার কাহিনিকে মর্মান্তিক বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে শাহরিয়ার তুষারের সাথে উমাইয়া যুগের কোন খলিফার চরিত্রের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তিনি কি উমাইয়া খিলাফত পতনের জন্য দায়ী ছিলেন? ব্যাখ্যা করো।

২৪. ভারতে সুলতানি শাসনামলে সমগ্র সাম্রাজ্য ১২টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। সুলতান প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন এবং তারা তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য সুলতানের কাছে জবাবদিহি করতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা বাৎসরিক উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দিতেন। দিল্লির সুলতানরা কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করতেন না এবং অন্যায়ভাবে জনগণকে কর দিতে বাধ্য করতেন না। কৃষি উন্নয়নেও তারা বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

ক. কারবালা প্রান্তর কোথায় অবস্থিত?
খ. মুয়াবিয়া (রা) কেন রাজধানী কুফা থেকে দামেস্কে স্থানান্তর করেন?
গ. দিল্লির সুলতানি আমলের সাথে উমাইয়াদের প্রাদেশিক শাসনের কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে দিল্লি সুলতান ও উমাইয়া শাসকদের গৃহীত পদক্ষেপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

৬. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২৫. পলাশপুরের সুলায়মান গাজী ১৫ বছর ধরে বিদেশে চাকরি করেছেন। এত বছরে তিনি অঢেল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। এ বছর দেশে ফিরে তিনি বিয়ে করে সংসারী হন। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো এতো সম্পত্তির মালিক হয়েও তিনি অতি সাধারণভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান করেছেন। তিনি কম দামের সাধারণ ফার্নিচার দিয়ে ঘর সাজিয়েছেন। এছাড়া খাওয়া-দাওয়া পোশাক পরিচ্ছদেও সুলায়মান বিলাসিতা পছন্দ করেছেন না। তিনি ১৫ বছরে অর্জিত অর্থের বেশিরভাগই বাবার প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় দান করে দেন।

◀ সমন্বিত অধ্যায় ৩ ও ৪

ক. কোন খলিফা সর্বপ্রথম টাকশাল গঠন করেন?
খ. আল ওয়ালিদকে শ্রেষ্ঠ বিজেতা বলা হয় কেন?
গ. সুলায়মান গাজীর সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের মানসিকতার সাদৃশ্য দেখাও।
ঘ. উমাইয়া শাসকদের 'সুলায়মান গাজীর বিপরীতমুখী জীবনাচরণের জন্যই উমাইয়া খিলাফতের পতন হয়েছে'— মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই করো।

২৬. সাগর ও সীমান্ত দুই বন্ধু। তারা উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে গল্প করছিল। সাগর বলে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হঠকারিতার মাধ্যমে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে এ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সীমান্ত বলে, প্রায় ১৪-১৬ জন শাসক এই বংশ শাসন করেন। এই রাজবংশ প্রায় ৯০ বছর টিকে ছিল। শেষ খলিফা ছিলেন দ্বিতীয় মারওয়ান। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খুলাফায়ে রাশেদিনের রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তে একটি নতুন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

◀ সমন্বিত অধ্যায় ৩ ও ৪

ক. খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর পিতার নাম কী?
খ. বায়তুল মাল বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে কোন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা খুলাফায়ে রাশেদিনের রাষ্ট্রীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন— পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো।

২৭. হরতাল, লুটতরাজ, নির্যাতন, গ্রেফতার, হত্যা ও রাহাজানি 'ক' দেশের নিত্যদিনের বিষয়। দেশের দুর্নীতি, মিথ্যা মামলা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি নিয়ে মোহসিন সাহেব খুবই চিন্তিত। তাই তিনি জাহিদ সাহেবকে বললেন, 'ক' দেশের এ করুণ অবস্থা কীভাবে দূর হবে? তখন জাহিদ সাহেব বললেন, এজন্য 'ক' দেশের শাসকগোষ্ঠীর মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে এবং জনজীবনে স্বস্তি ফিরে আসবে। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ৩ ও ৪*

ক. 'খিলাফত' অর্থ কী?
খ. খলিফা সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন?
গ. 'ক' দেশের শাসনের সাথে উমাইয়া যুগের শাসনের কোন ধরনের মিল তুমি খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'ক' দেশের শাসনব্যবস্থার এ করুণ পরিণতি থেকে উত্তরণের জন্য খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ অনুসরণ জরুরি— তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন কর? যৌক্তিক মত দাও।

২৮. গাজী ওসমান তার গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনিই গ্রামের সালিশ-বিচার করে থাকেন। তিনি অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন। সম্প্রতি তার ছোট ছেলে গ্রামের একটি মেয়েকে উত্ত্যক্ত করলে তিনি সালিশে ছেলেকে ১০০টি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনযাপন করেন। তিনি নিষ্ঠার সাথে ইসলাম ধর্মের বিধিবিধানসমূহ পালন করেন। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ৩ ও ৪*

ক. উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কাকে?
খ. হযরত ওমর (রা) আদমশুমারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন কেন?
গ. তোমার পঠিত কোন উমাইয়া খলিফার সাথে উদ্দীপকের গাজী ওসমান সাহেবের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গাজী ওসমান সাহেবের কর্মকাণ্ড খলিফা ওমর (রা)-এর আদর্শকে ধারণ করে— বিশ্লেষণ করো।

৫

আব্বাসি খিলাফত

The Abbasid Khilafat

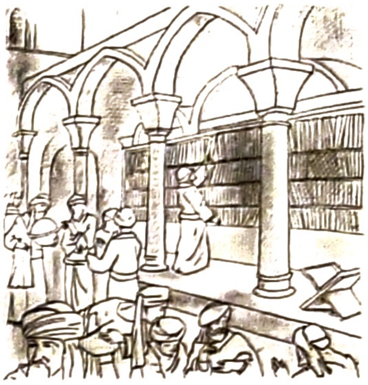

বায়তুল হিকমাহ (৮৩০ খ্রি.)

প্রধান প্রধান শব্দ

- আব্বাসি
- আস-সাফ্ফাহ
- দারুস সালাম
- বার্মাকি
- বায়তুল হিকমা
- বুয়াইয়া
- সেলজুক
- মুতাজিলা মতবাদ
- ক্রুসেড
- জেরুজালেম

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধে শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করে আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ আব্বাসি খিলাফতের ভিত্তি স্থাপন করেন। ৭৫০-১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আব্বাসি বংশের সর্বমোট ৩৭ জন শাসক শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আস-সাফ্ফাহ এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেও একে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন আবু জাফর আল-মনসুর। তাই তাকেই আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এ বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক বিখ্যাত আরব্যোপন্যাসের গল্পকথার নায়ক হারুন-অর-রশীদ। এছাড়া খলিফা আল-মামুনের শাসনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে আরববিশ্ব উন্নতির সর্বোচ্চ শেখরে পৌছেছিল। ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে তার প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমাহ (জ্ঞানগৃহ) উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং গবেষণার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। আব্বাসি খলিফারা সাম্রাজ্যবিস্তার, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শিল্পকলা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় অবদান রেখে বিশ্বে মুসলমানদের এক অনন্য মর্যাদায় উপনীত করেছেন। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের আক্রমণে আব্বাসি বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- আব্বাসি আন্দোলন ও আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা
- আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহর চরিত্র ও কৃতিত্ব
- আব্বাসি শাসন দৃঢ়করণে আল-মনসুরের অনুসৃত নীতি ও পদক্ষেপসমূহ
- খলিফা হারুন-অর-রশীদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি এবং তার কৃতিত্ব
- বার্মাকিদের উত্থান, পতন ও অবদান
- আল-আমিন ও আল-মামুনের মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ ও তাদের সাফল্য-ব্যর্থতার কারণ
- সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আল-মামুনের অবদান
- বুয়াইদ ও সেলজুকদের পরিচয়, উত্থান, কার্যাবলি ও অবদান
- ক্রুসেডের কারণ ও ফলাফল
- ক্রুসেডে সালাহউদ্দিন আইয়ুবির ভূমিকা ও অবদান
- আব্বাসি খিলাফত পতনের কারণ ও প্রেক্ষাপট
- আব্বাসি আমলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
- আব্বাসি আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	আব্বাসিদের পরিচয়, আব্বাসি আন্দোলন, আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা (৭৫০ খ্রি.)
পাঠ ২	আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহর পরিচয়, চরিত্র ও কৃতিত্ব (৭৪০-৭৫৪ খ্রি.)
পাঠ ৩ ও ৪	খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরের পরিচয়, চরিত্র ও কৃতিত্ব (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)
পাঠ ৫	শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবু জাফর আল-মনসুর
পাঠ ৬ ও ৭	খলিফা আল-মাহদী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.) ও আল-হাদীর (৭৮৫-৭৮৬ খ্রি.) পরিচয় ও কৃতিত্ব
পাঠ ৮	খলিফা হারুন-অর-রশীদের অভ্যন্তরীণ নীতি (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)
পাঠ ৯	খলিফা হারুন-অর-রশীদের বৈদেশিক নীতি
পাঠ ১০	খলিফা হারুন-অর-রশীদের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ১১	বার্মাকিদের পরিচয়, উত্থান ও পতন
পাঠ ১২	খলিফা আমিন ও মামুনের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ
পাঠ ১৩	খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন: শাসন নীতি, বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)
পাঠ ১৪	খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ১৫	আব্বাসি খলিফা আল-মুতাসিমের সিংহাসনে আরোহণ ও কৃতিত্ব (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)
পাঠ ১৬	বুয়াইয়াদের পরিচয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাদের অবদান (৯৪৫-১০৫৫ খ্রি.)
পাঠ ১৭	বুয়াইয়া সুলতান আজাদুদ্দৌলাহর (৯৬৭-৯৮৩ খ্রি.) কৃতিত্ব ও বুয়াইয়াদের পতন (১০৫৫ খ্রি.)
পাঠ ১৮	আব্বাসি খিলাফতে সেলজুক তুর্কিদের উত্থান ও কার্যাবলি (১০৫৫-১১৯৪ খ্রি.)
পাঠ ১৯	সুলতান আলপ-আরসালানের পরিচয় ও কৃতিত্ব (১০৬৩-১০৭২ খ্রি.)
পাঠ ২০	সেলজুক সুলতান মালিক শাহের পরিচয় ও কৃতিত্ব
পাঠ ২১	আব্বাসি খিলাফতে সেলজুক সুলতানদের অবদান এবং তাদের পতন
পাঠ ২২ ও ২৩	ক্রুসেড: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল (১০৯৫-১২৯১ খ্রি.)
পাঠ ২৪	সালাহউদ্দিন আইয়ুবির পরিচয়, চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ২৫	আব্বাসি খিলাফতের পতন ও এর ফলাফল
পাঠ ২৬	আব্বাসিদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা
পাঠ ২৭	আব্বাসি শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
পাঠ ২৮	আব্বাসি শাসনামলে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা
পাঠ ২৯ ও ৩০	আব্বাসি শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা

পাঠ ১

আব্বাসিদের পরিচয়, আব্বাসি আন্দোলন এবং আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা (৭৫০ খি.) [Introduction to the Abbasid,The Abbasid Movement and The Establishment of Abbasid Khilafat (750 AD)]

আব্বাসিদের পরিচয়

আব্বাসিরা মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমি শাখা থেকে উদ্ভূত। কুরাইশ বংশের অন্য শাখাটি উমাইয়া নামে খ্যাত। মহানবি (স)-এর চাচা আল-আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশেমের নাম থেকেই আব্বাসি বংশের নামকরণ হয়েছে। আল-আব্বাস চার পুত্র আবদুল্লাহ, ফজল, উবায়দুল্লাহ ও কায়সানকে রেখে ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে (৬৫৭ খ্রি.) এবং কারবালার যুদ্ধে (৬৮০ খ্রি.) এরা হাশেমি গোত্রে হযরত আলি (রা) এবং তার বংশধরদের সমর্থন করেন। আত্মীয়তার দিক থেকে উমাইয়াদের তুলনায় মহানবি (স)-এর নিকটতর হওয়ায় আব্বাসিরা নিজেদের মুসলিম খিলাফতের বৈধ দাবিদার বলে মনে করতেন।

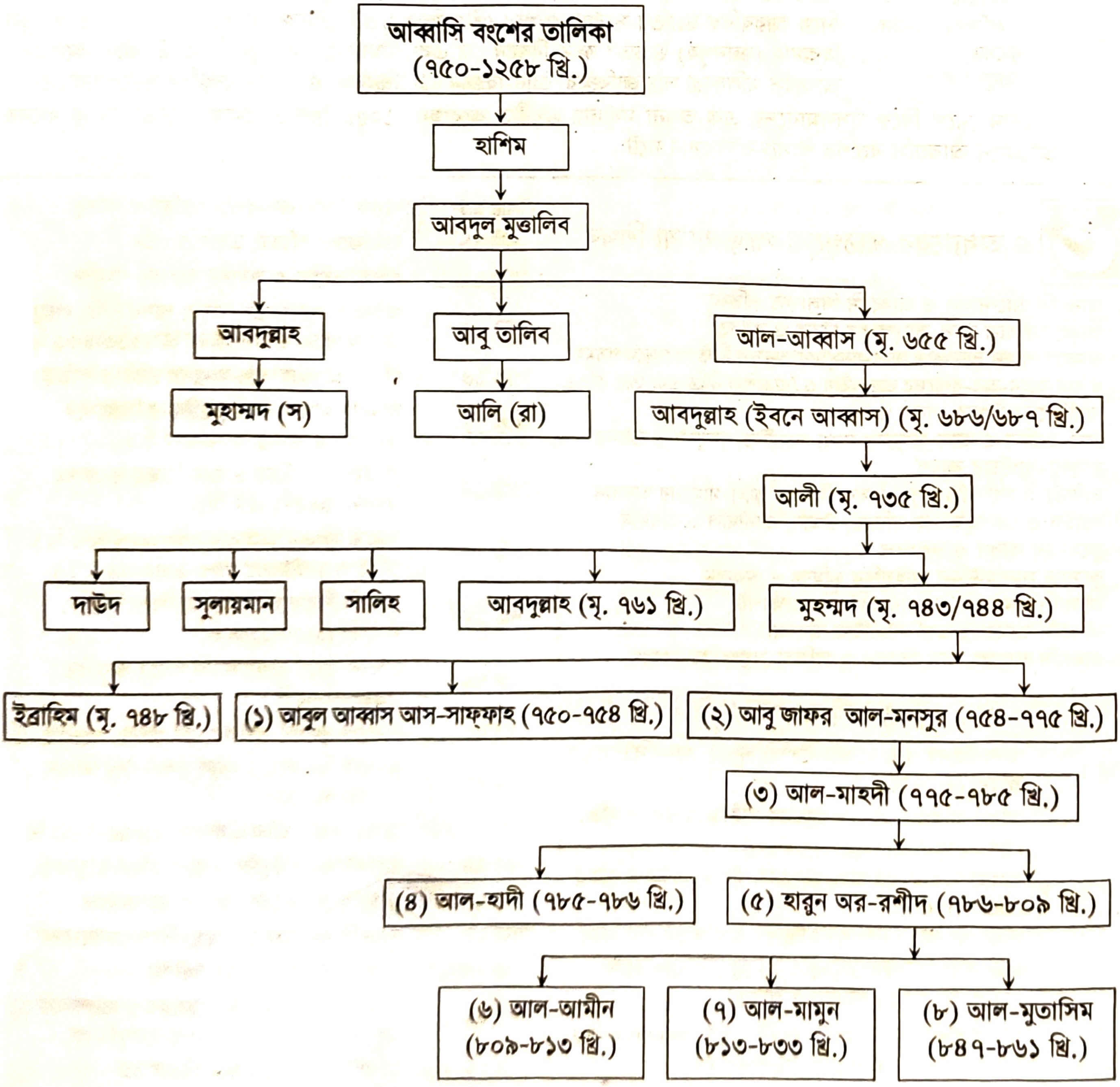
আব্বাসি বংশের তালিকা (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)
হাশিম
আবদুল মুত্তালিব
আবদুল্লাহ
আবু তালিব
আল-আব্বাস (মৃ. ৬৫৫ খ্রি.)
মুহাম্মদ (স)
আলি (রা)
আবদুল্লাহ (ইবনে আব্বাস) (মৃ. ৬৮৬/৬৮৭ খ্রি.)
আলী (মৃ. ৭৩৫ খ্রি.)
দাউদ
সুলায়মান
সালিহ
আবদুল্লাহ (মৃ. ৭৬১ খ্রি.)
মুহম্মদ (মৃ. ৭৪৩/৭৪৪ খ্রি.)
ইব্রাহিম (মৃ. ৭৪৮ খ্রি.)
(১) আবুল আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহ (৭৫০-৭৫৪ খ্রি.)
(২) আবু জাফর আল-মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)
(৩) আল-মাহদী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.)
(৪) আল-হাদী (৭৮৫-৭৮৬ খ্রি.)
(৫) হারুন অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)
(৬) আল-আমীন (৮০৯-৮১৩ খ্রি.)
(৭) আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)
(৮) আল-মুতাসিম (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)

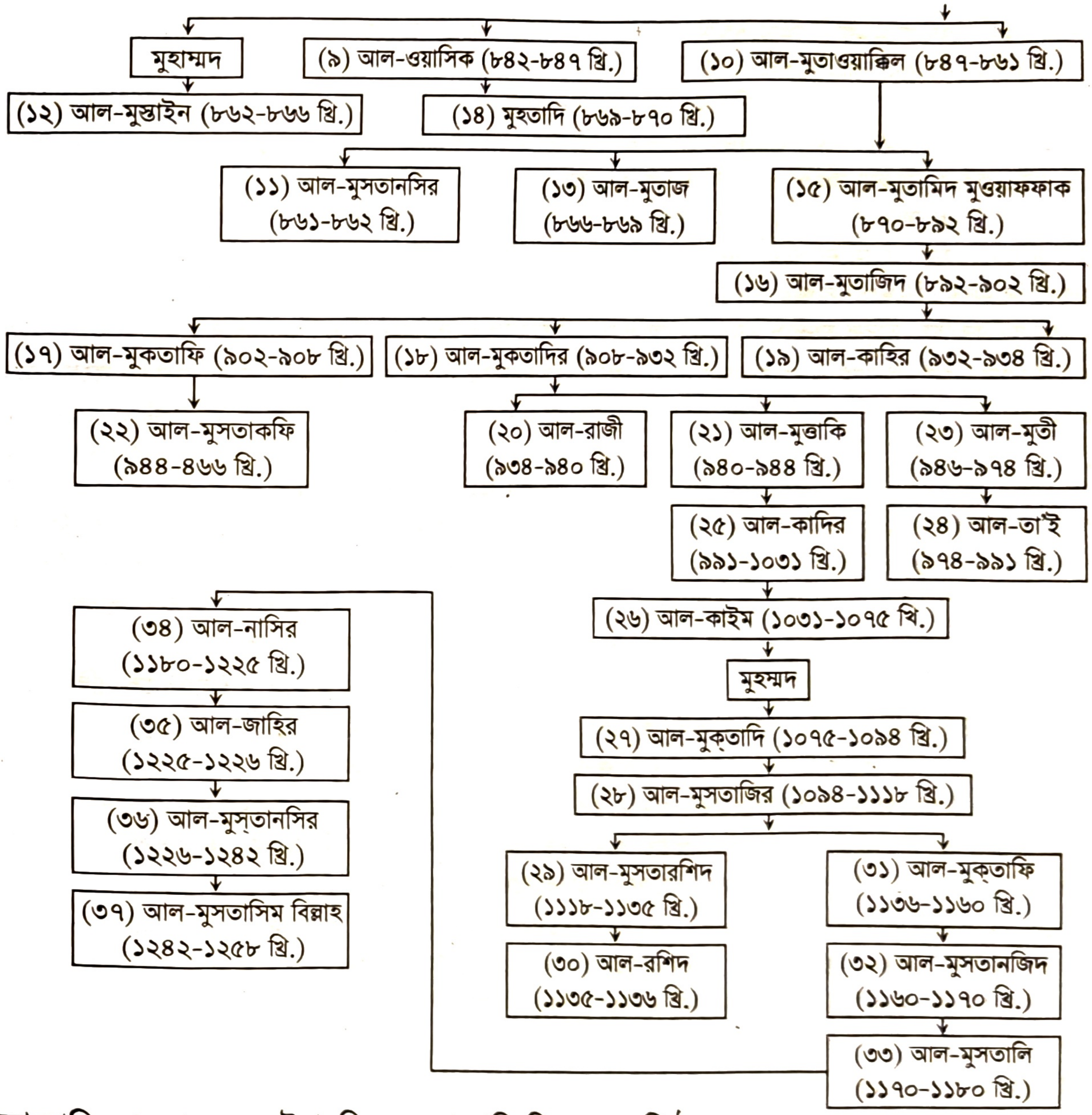
মুহাম্মদ
(৯) আল-ওয়াসিক (৮৪২-৮৪৭ খ্রি.)
(১০) আল-মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)
(১২) আল-মুস্তাইন (৮৬২-৮৬৬ খ্রি.)
(১৪) মুহতাদি (৮৬৯-৮৭০ খ্রি.)
(১১) আল-মুসতানসির (৮৬১-৮৬২ খ্রি.)
(১৩) আল-মুতাজ (৮৬৬-৮৬৯ খ্রি.)
(১৫) আল-মুতামিদ মুওয়াফফাক (৮৭০-৮৯২ খ্রি.)
(১৬) আল-মুতাজিদ (৮৯২-৯০২ খ্রি.)
(১৭) আল-মুকতাফি (৯০২-৯০৮ খ্রি.)
(১৮) আল-মুকতাদির (৯০৮-৯৩২ খ্রি.)
(১৯) আল-কাহির (৯৩২-৯৩৪ খ্রি.)
(২২) আল-মুসতাকফি (৯৪৪-৪৬৬ খ্রি.)
(২০) আল-রাজী (৯৩৪-৯৪০ খ্রি.)
(২১) আল-মুত্তাকি (৯৪০-৯৪৪ খ্রি.)
(২৩) আল-মুতী (৯৪৬-৯৭৪ খ্রি.)
(২৫) আল-কাদির (৯৯১-১০৩১ খ্রি.)
(২৪) আল-তা'ই (৯৭৪-৯৯১ খ্রি.)
(২৬) আল-কাইম (১০৩১-১০৭৫ খি.)
মুহম্মদ
(২৭) আল-মুক্তাদি (১০৭৫-১০৯৪ খ্রি.)
(২৮) আল-মুসতাজির (১০৯৪-১১১৮ খ্রি.)
(২৯) আল-মুসতারশিদ (১১১৮-১১৩৫ খ্রি.)
(৩০) আল-রশিদ (১১৩৫-১১৩৬ খ্রি.)
(৩১) আল-মুক্তাফি (১১৩৬-১১৬০ খ্রি.)
(৩২) আল-মুসতানজিদ (১১৬০-১১৭০ খ্রি.)
(৩৩) আল-মুসতালি (১১৭০-১১৮০ খ্রি.)
(৩৪) আল-নাসির (১১৮০-১২২৫ খ্রি.)
(৩৫) আল-জাহির (১২২৫-১২২৬ খ্রি.)
(৩৬) আল-মুস্তানসির (১২২৬-১২৪২ খ্রি.)
(৩৭) আল-মুসতাসিম বিল্লাহ (১২৪২-১২৫৮ খ্রি.)

আব্বাসি আন্দোলনের ঘটনাবলি এবং আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা

আবদুল্লাহ ও আলীর উমাইয়া বিরোধী তৎপরতা: আল-আব্বাসের জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুল্লাহ ও তার অপর তিন ভাই উমাইয়াদের অধার্মিকতা ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সোচ্চার ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মৃত্যুর পর তার পুত্র আলী পরিবারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে আলীর মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মদ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। মুহাম্মদ বিন আলী যোগ্য ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনিই ছিলেন আব্বাসি আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা এবং উমাইয়া বংশের পতন ঘটিয়ে আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রথম পরিকল্পনাকারী।

আব্বাসি আন্দোলনের সূচনা: মুহাম্মদ বিন আলী তার পূর্বপুরুষের উমাইয়াবিরোধী মনোভাবকে আন্দোলনে পরিণত করেন। আব্বাসি আন্দোলনকে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য তিনি ঘোষণা করেন, ইমাম হুসাইনের শাহাদত বরণের পর ইসলামের ধর্মীয় কর্তৃত্ব তার পুত্র আলী অথবা জয়নুল আবেদীনের ওপর ন্যস্ত না হয়ে হুসাইনের বৈমাত্রেয় ভাই মুহাম্মদ আল-হানাফিয়ার ওপর অর্পিত হয়েছে। মুহাম্মদ আল-হানাফিয়ার ইন্তেকালের পর তার পুত্র হাশেম নেতৃত্বলাভ করেন। নিঃসন্তান হাশেম মৃত্যুর আগে ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করেন আব্বাসি বংশের তৎকালীন নেতা মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে।

উমাইয়া বিরোধী সর্বদলীয় জোট গঠন: মুহাম্মদ বিন আলীর ব্যাপক সাংগঠনিক শক্তি ছিল। তিনি কৌশল হিসেবে ঘোষণা করেন, মহানবি (স) তথা ফাতেমি বংশের দাবি প্রতিষ্ঠা করাই আব্বাসি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। ফলে উমাইয়াদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন খারেজি, শিয়া, খোরাসানি, মাওয়ালি ইত্যাদি গোষ্ঠী এই আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায় এবং উমাইয়াবিরোধী জোট গঠন করে। এই জোট সম্পর্কে ঐতিহাসিক পি কে হিট্টি বলেন, "শিয়া, খোরাসানি এবং আব্বাসি শক্তির একত্রীকরণে উমাইয়া বংশের অন্তিমকাল উপস্থিত হয় এবং শেষোক্ত সম্প্রদায় এটি তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে কাজে লাগায়।"[1] আব্বাসি দাঈ বা প্রচারকদেরকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিয়ে একটি সিনেট গঠন করা হয়। ঐ সিনেট পরিচালনার জন্য ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্সিল গঠন করা হয় যার প্রধান ছিলেন স্বয়ং মুহাম্মদ বিন আলী। উদ্দেশ্য সিদ্ধির আগেই ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন আলী মৃত্যুবরণ করেন। তবে মৃত্যুর আগে তিনি তার তিন পুত্র ইব্রাহিম, আবুল আব্বাস এবং আবু জাফরকে পর্যায়ক্রমিক উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

আবু মুসলিমের বিপ্লবী প্রচারণা ও খোরাসান দখল: আব্বাসি আন্দোলনকে বিপ্লবে পরিণত করার সেরা কারিগর ছিলেন আবু মুসলিম খোরাসানি নামে আরব বংশোদ্ভূত এক পারসিক মাওয়ালি। আমীর আলী বলেন, "তার অপরিবর্তনীয় শিষ্টাচার ও সৌজন্য শত্রুগণকে অনুরঞ্জিত করত এবং সমর্থন লাভে সহায়তা করত; অন্যপক্ষে তার সৈন্যদল গঠন এবং শাসনকার্য পরিচালনার দক্ষতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।"[2] মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তার পুত্র ইব্রাহিম আব্বাসি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আবু মুসলিম খোরাসানি তার অধীনে প্রচারকাজ শুরু করেন। বস্তুত আবু মুসলিমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই খোরাসান উমাইয়াবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। খোরাসানের উমাইয়া শাসনকর্তা নসর ইবনে সাইয়্যার যখন কিরমানে খারিজি বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুন আবু মুসলিম নিজেকে 'আল-হাশিম' (হাশিমিদের রক্ষক) বলে ঘোষণা করেন এবং আব্বাসিদের কালো পতাকা উত্তোলন করে রাজধানী মার্ভ ও ফারগানাসহ সমগ্র খোরাসান দখল করেন।

ইমাম ইব্রাহিমের গ্রেফতার ও হত্যাকাণ্ড: খোরাসানের পতনের পর উমাইয়া খলিফা মারওয়ান ইব্রাহিমকে বন্দি করার আদেশ দেন। উমাইয়াবিরোধী ইব্রাহিমকে বন্দি ও পরে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর আগে ইব্রাহিম তার দুই ভাই আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ এবং আবু জাফর আল-মনসুরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

আবু মুসলিমের ইরাক দখল: ইমাম ইব্রাহিমের হত্যার পর আবু মুসলিম তার সেনাপতি কাহতাবা এবং খালিদ বার্মাককে প্রাচীন রাজেস বা রাই শহর অভিমুখে পাঠান। উমাইয়া শাসক ইয়াজিদ আবু মুসলিমের কাছে পরাজিত হলে ইরাকের রাজধানী কুফা তার অধিকারে আসে। নিহাওয়ান্দ ও মেসোপটেমিয়াও আব্বাসিদের দখলে আসে।

আবুল আব্বাসকে খলিফা ঘোষণা: কুফা দখলের পর হাসান ইবনে কাহতাবার সাথে যোগ দেন আবু সালমা আল-খাল্লাল নামক এক ফাতেমি সমর্থক। তারা দুজনে পরবর্তী জুম্মার দিনে খলিফা নির্বাচনের জন্য জনগণকে কুফা মসজিদে সমবেত হতে আহ্বান জানান। ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ নভেম্বর শুক্রবার আবুল আব্বাস কৃষ্ণবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে কুফা মসজিদে উপস্থিত হলে আবু সালমা আল-খাল্লাল ওরফে জাফর তাকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন।

জাবের যুদ্ধ এবং উমাইয়াদের পতন: আবু মুসলিমের অপর এক সুদক্ষ সেনাপতি আবু আয়ুন দ্বিতীয় মারওয়ানের পুত্র আব্দুল্লাহকে পরাজিত করেন। পুত্র আব্দুল্লাহর পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য খলিফা ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে ১,২০,০০০ সৈন্যসহ টাইগ্রিস নদী (দজলা) অতিক্রম করে জাব নদীর দিকে অগ্রসর হন। ইতোমধ্যে আবুল আব্বাসের পিতৃব্য আবদুল্লাহ ইবনে আলীর নেতৃত্বে একদল সৈন্য আবু আয়ুনের সাহায্যার্থে পাঠানো হয়। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি একরকম বিনাযুদ্ধেই আব্বাসিদের বিজয় নিশ্চিত হয়। পি কে হিট্টি বলেন, "সমগ্র সিরিয়া এ যুদ্ধের পর আব্বাসিদের পদানত হয়।"[3] দ্বিতীয় মারওয়ান দামেস্কে এসে পুনরায় সৈন্যবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে পলায়নের সময় তাকে বর্শাবিদ্ধ করে হত্যা করা হয় (৫ আগস্ট ৭৫০ খ্রি.)। কুফায় আবুল আব্বাসের কাছে মারওয়ানের ছিন্ন মস্তক পাঠানো হলে তিনি সানন্দে 'আস-সাফ্ফাহ' বা 'রক্তপিপাসু' উপাধি গ্রহণ করেন। এভাবে আব্বাসিরা মহানবি (স)-এর বংশধর তথা 'আহলে বায়াত'-এর স্বার্থরক্ষার স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ফলে মুসলিম বিশ্বে আব্বাসি নামে নতুন রাজবংশের যাত্রা শুরু হয়।

---

[1] The zero hour in the life of the Umayyad dynasty approached when a coalition was effected between the Shiite, Khurasanian and Abbasid forces which was utilized by the last for their own advantage. –Ref : P. K. Hitti, *History of the Arabs*, page-283

[2] His unvarying urbanity and condescension conciliated enemies and secured adherents; whilst the capacity for organising the troops and administering public affairs extorted admiration. –Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.172

[3] After the battle of Zab Syria lay at the feet of the Abbasid victors. –Ref : P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.285

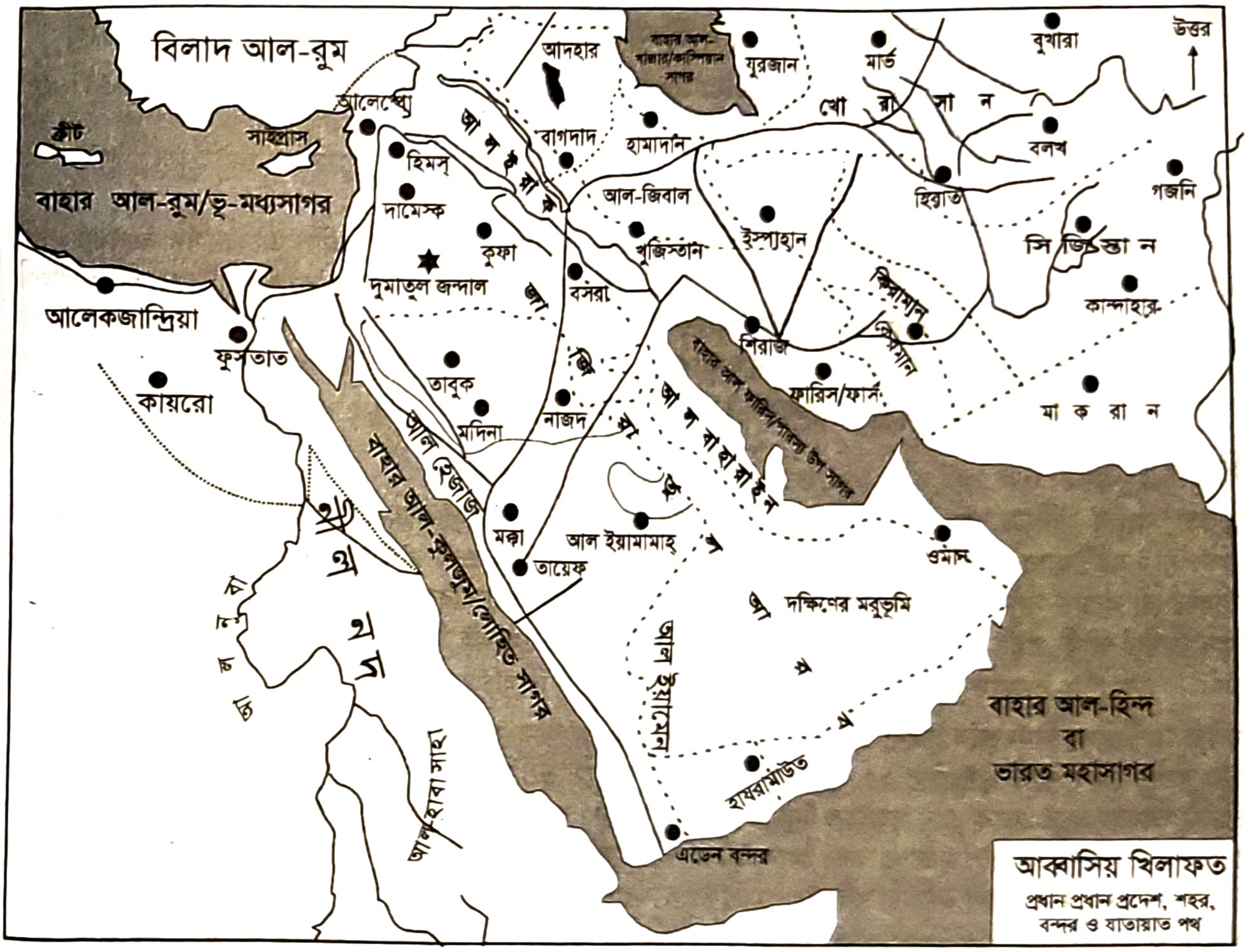
বিলাদ আল-রুম
ক্রীট
সাইপ্রাস
বাহার আল-রুম/ভূ-মধ্যসাগর
আলেকজান্দ্রিয়া
ফুসতাত
কায়রো
আলেপ্পো
হিমস্
দামেস্ক
কুফা
দুমাতুল জন্দাল
বসরা
তাবুক
মদিনা
নাজদ
আল হিজাজ
মক্কা
তায়েফ
আল ইয়ামামাহ
বাহার আল-কুলজুম/লোহিত সাগর
আদহার
বাহার আল-খাজার/কাস্পিয়ান সাগর
যুরজান
মার্ভ
বুখারা
উত্তর
খো রা সা ন
বাগদাদ
হামাদান
আল-জিবাল
খুজিস্তান
ইস্পাহান
বলখ
হিরাত
গজনি
সি জি স্তা ন
কিরমান
কান্দাহার
শিরাজ
ফারিস/ফার্স
মা ক রা ন
ওমান
দক্ষিণের মরুভূমি
আল ইয়ামেন
হাযরামাউত
এডেন বন্দর
আল হাবাসাহ
বাহার আল-হিন্দ
বা
ভারত মহাসাগর
আব্বাসিয় খিলাফত
প্রধান প্রধান প্রদেশ, শহর, বন্দর ও যাতায়াত পথ

আব্বাসি খিলাফত: নবম শতক (বন্দর ও যাতায়াত পথ)

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আব্বাসিরা কুরাইশ বংশের কোন শাখা থেকে উদ্ভূত?
২. কার নাম থেকে আব্বাসি বংশের নামকরণ করা হয়েছে?
৩. আব্বাসি আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা কে?
৪. আব্বাসি আন্দোলনকে বিপ্লবে পরিণত করেন কে?
৫. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়?
৬. কত খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আব্বাসি আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনার একটি পর্যায়ক্রমিক তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২

আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহর পরিচয়, চরিত্র ও কৃতিত্ব (৭৫০-৭৫৪ খ্রি.)

Introduction, Character and Achievements of Abul Abbas As-Saffah (750-754 AD)

পরিচয়

আব্বাসি বংশের প্রথম শাসক আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ ছিলেন মহানবি (স)-এর চাচা আল আব্বাসের বংশধর। তার পিতা মুহম্মদ বিন আলী। আব্বাসি আন্দোলনের মাধ্যমে ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ নভেম্বর ইরাকের কুফা মসজিদে তাকে খলিফা ঘোষণা করা হয়। পরে আবু মুসলিম ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করলে উমাইয়া বংশের পতন ঘটে। ৫ আগস্ট মারওয়ানের ছিন্ন মস্তক দেখে আবুল আব্বাস 'আস-সাফ্ফাহ' বা 'রক্তপিপাসু' উপাধি গ্রহণ করেন। আব্বাসি খিলাফতের এই প্রতিষ্ঠাতা ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

চরিত্র

নিষ্ঠুরতা: আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফার কর্মকাণ্ডে নিষ্ঠুরতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আবুল আব্বাস শুধু নিষ্ঠুরই ছিলেন না, অঙ্গীকারের বরখেলাপকারী; এমনকি বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন। তবে ঐতিহাসিক উইল-এর এই মন্তব্যকে অস্বীকার না করেও বলা যায়, মধ্যযুগীয় রাজাদের মধ্যে এরূপ চরিত্র অস্বাভাবিক ছিল না। ঐতিহাসিক পি কে হিট্টি, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ তার বিশ্বাসঘাতকতাকে মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপট থেকেই বিবেচনা করেছেন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন– "মধ্যযুগীয় রাজাদের কাছে নরহত্যা আদৌ ন্যক্কারজনক বলে বিবেচিত হতো না।"[৪]

উমাইয়া বংশীয়দের নির্মমভাবে নিধন: খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আস-সাফ্ফাহর প্রধান লক্ষ্য ছিল উমাইয়া বংশীয়দের নির্মূল করা। তিনি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জুন ফিলিস্তিনের আবু ফুট্রুসে ৮০ জন উমাইয়া বংশের লোককে সমঝোতার নামে ভোজের আমন্ত্রণ করে ডেকে এনে সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। বসরাতেও অনুরূপভাবে হত্যাযজ্ঞ সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, আস-সাফ্ফাহর আদেশে মৃতদের কবর থেকে উঠিয়ে নিয়ে হাড়গুলো ভস্মীভূত করে বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মুয়াবিয়া এবং দ্বিতীয় উমর ছাড়া সকল উমাইয়া খলিফার সমাধি ধ্বংস করা হয়।

চারিত্রিক দৃঢ়তা: সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "সকল নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও সাফ্ফাহকে সদাশয়, কর্তব্যপরায়ণ এবং ভোগাসক্তিবিহীন নরপতি বলে মনে করা হতো।"[৫] সে যুগে সমাজে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার প্রথা বিদ্যমান থাকলেও আস-সাফ্ফাহর সালমা নামক একজনমাত্র স্ত্রী ছিল। পি কে হিট্টি বলেন, "আস-সাফ্ফাহ আরবে ইসলামের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল এবং দীর্ঘতম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।"[৬] প্রজাদরদী, বিদ্যোৎসাহী, কর্তব্যপরায়ণ ও চরিত্রবান হিসেবেও তিনি খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন।

জনকল্যাণকামী: আস-সাফ্ফাহ একজন প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। তিনি কুফা থেকে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ মহাসড়ক নির্মাণ করেন। এছাড়া হজযাত্রীদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে দূরত্ব নির্দেশক মাইলফলক স্থাপন ও সরাইখানা নির্মাণ করেন।

শিল্প-সাহিত্যানুরাগী: আস-সাফ্ফাহ শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি জ্ঞানী-গুণী ও কবি-সাহিত্যিকদের সমাদর করতেন। তার খিলাফতে ইমাম আবু হানিফা প্রথম ফিকাহশাস্ত্রের চর্চা শুরু করেন।

কৃতিত্ব

বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও দমন: আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ উমাইয়া ও বিদ্রোহী মনোভাবাপন্নদের দমনের জন্য নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকের মনে ক্ষমতাচ্যুত উমাইয়াদের প্রতি সহমর্মিতা ছিল। উমাইয়া রাজবংশের সমর্থকেরা দামেস্ক, হিমস, কিন্নিসিরিন, ফিলিস্তিন এবং মেসোপটেমিয়ায় সাফ্ফাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইরাকে উমাইয়া রাজপ্রতিনিধি ইয়াজিদ ইবনে হুবাইয়া ক্ষমতা আঁকড়ে থাকেন। তখন আস-সাফ্ফাহ সেনাপতি হাসান-ইবন-কাহতাবা এবং ভাই আবু জাফরকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করান।

---

[৪] The shedding of human blood had in general nothing revolting to a prince of the Middle Ages. –Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.209

[৫] Yet, with all his cruelty, Saffah was regarded as a generous sovereign, attentive to his duties, and not given to self indulgence. –Ref: Syed Ameer Ali, *A Short history of the Saracens*, p.209

[৬] Al-Saffah became the founder of the most celebrated and longest-lived Arab dynasty in Islam. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.288

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস: প্রাথমিক বাধা-বিপত্তি এবং বিদ্রোহের মূলোৎপাটনের পর আস-সাফ্ফাহ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে তিনি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন। আস সাফ্ফাহ নিজের পরিবারের সদস্য কিংবা যে সকল লোক তার বংশের শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের ঐ সব পদের দায়িত্ব দেন। খালিদ ইবনে বার্মাককে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আস-সাফ্ফাহকে খলিফা বলে ঘোষণা করতে বিশেষভাবে সহায়তাকারী আবু সালামা খাল্লালকে নিযুক্ত করা হয় উজির পদে। আব্বাসি খিলাফতের কাঠামোকে সুসংহত করার জন্য আস-সাফ্ফাহ তার ভাই ও উত্তরাধিকারী আবু জাফরকে ইরাক, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি পিতৃব্য দাউদ ইবনে আলীকে হেজাজের ও আব্দুল্লাহ ইবনে আলীকে সিরিয়ার শাসনকর্তার পদ প্রদান করেন। সুলাইমান ইবনে আলী নামে অন্য একজন পিতৃব্যকে বসরা ও এর অধীনস্থ অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন। তখ্তবখ্শ (Kingmaker) আবু মুসলিমকে খোরাসানের এবং সেনাপতি আবু আয়ুনকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

নতুন রাজধানী স্থাপন: খলিফা আস-সাফ্ফাহ তার নিজের ও বংশের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে কুফা থেকে আল-হাশেমিয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সেখানে 'আল-হাশেমিয়া' নামে একটি দুর্গ প্রাসাদও নির্মাণ করেন তিনি।

শাসনকালের নিন্দিত ঘটনা

আবু সালামা খাল্লালের হত্যাকাণ্ড আস-সাফ্ফাহর শাসনকালের একটি চরম নিন্দিত ঘটনা। আবু মুসলিম একসময় আবু সালামার প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। আবু সালামা খাল্লাল একদিন রাতে খলিফার প্রাসাদ থেকে ফেরার সময় আবু মুসলিমের নিয়োজিত দুর্বৃত্ত দল তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

মৃত্যু ও উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ প্রায় সাড়ে চার বছর রাজত্ব করার পর বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে মৃত্যুবরণ করেন। হিরার অনতিদূরে আম্বর নামক স্থানে তার মৃত্যু হয়। আস-সাফ্ফাহ মৃত্যুকালে মুহাম্মদ নামে এক পুত্র এবং রাইতা নামে এক কন্যা রেখে যান। মৃত্যুর আগে আস-সাফ্ফাহ তার ভাই আবু জাফরকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং ভাইয়ের পুত্র ঈসাকে তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কুফা মসজিদে কাকে আব্বাসি বংশের প্রথম খলিফা ঘোষণা করা হয়?

২. 'আস-সাফ্ফাহ' বা 'রক্তপিপাসু' উপাধি ছিল কার?

৩. কাকে পরাজিত করে আবুল আব্বাস আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন?

৪. আস-সাফ্ফাহর প্রধান লক্ষ্য কী ছিল?

৫. আবুল আব্বাস ফিলিস্তিনের আবু ফুট্রুসে উমাইয়া বংশের কত জন লোককে হত্যা করেন?

৬. আবুল আব্বাস কুফা থেকে কোথায় রাজধানী স্থানান্তর করেন?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং এর শক্ত ভিত প্রতিষ্ঠায় আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহর ভূমিকার একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ৩ ও ৪

খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরের পরিচয়, চরিত্র ও কৃতিত্ব (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) [Introduction, Character and Achievements of Khalifa Abu Jafar Al-Mansur (754-775 AD)]

পরিচয়

আবুল আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহ ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তার ভাই আবু জাফরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। এ সময় আবু জাফর মক্কায় অবস্থান করছিলেন। ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি দ্রুত কুফায় ফিরে আসেন এবং 'আল-মনসুর' বা 'বিজয়ী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আবু জাফর দীর্ঘ ২১ বছরের শাসনামলে সাম্রাজ্যের শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের জন্য অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাই তাকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। আবু জাফর আল-মনসুর ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার নিকটবর্তী এক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।

চরিত্র

দৈহিক আকৃতি ও ব্যক্তিত্ব: আল-মনসুর দীর্ঘদেহী, শ্মশ্রুবিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ ও সুশ্রী চেহারার অধিকারী ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে মূলত ধার্মিক, আদর্শবাদী, ন্যায়পরায়ণ, পরিশ্রমী ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তবে তার বিরুদ্ধে কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞতার অভিযোগও ছিল।

ব্যক্তি হিসেবে: ব্যক্তি হিসেবে আল-মনসুর ছিলেন একজন স্নেহশীল মানুষ। পিতা হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। পুত্রের জন্য আলাদা প্রাসাদ নির্মাণের বিষয়টি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া তিনি ছিলেন খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তি। তাই ঐতিহাসিক মুর বলেন, "যদি আমরা তার চরিত্রের বিশ্বাসঘাতকতা ও নিকৃষ্ট গুণ ভুলে যাই তাহলে মনসুর সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন ভিন্নরূপ হবে।"

শাসক হিসেবে: শাসক হিসেবে আল-মনসুর ছিলেন নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক। আর এ কারণেই তিনি আব্বাসিয়দের ক্ষমতায় বসানো চাচা আব্দুল্লাহ, আলিবংশীয় ব্যক্তিবর্গ, এমনকি অকৃত্রিম বন্ধু আবু মুসলিমকেও হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। ঐতিহাসিক মুর বলেন, মনসুরের চরিত্রে উৎকৃষ্ট গুণাবলির সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাসঘাতক এবং নিষ্ঠুর হিসেবে ইতিহাসের রায় তার বিপক্ষেই যাবে।[৭] ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলীর মতে, "নিষ্ঠুর স্বার্থপর এবং বিবেকহীন মনসুর কোনো ব্যক্তিকে নিজের বা নিজ বংশের পক্ষে সামান্যতম বিপজ্জনক বলে মনে করলেই তার প্রাণনাশ না করে ছাড়তেন না।"

আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আল-মনসুরের কৃতিত্ব

বিদ্রোহ দমন ও শাসন সুদৃঢ়করণ: সিংহাসনে আরোহণ করেই আবু জাফর আল-মনসুর তার চাচা 'জাবের যুদ্ধ বিজেতা' আবদুল্লাহ্ বিন আলীর রোষানলে পড়েন। এর জেরে তিনি আবু মুসলিম খোরাসানিকে পাঠিয়ে আবদুল্লাহ্কে নাসিবিনের যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি করেন। সাত বছর কারাভোগের পর আবদুল্লাহ্কে লবণের ভিত্তির ওপর নির্মিত এক প্রাসাদে স্থানান্তর করা হয়।

আকস্মিক বৃষ্টিপাতে প্রাসাদটির ভিত্তি গলে যায় এবং এর ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে হতভাগ্য বন্দি আবদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। আল-মনসুর এরপর নিজের শাসনের জন্য হুমকি মনে করায় আবু মুসলিমকেও কৌশলে রাজদরবারে ডেকে এনে হত্যা করেন। আবু মুসলিমের হত্যাকাণ্ড আব্বাসি শাসনের ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক ঘটনা। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেন, "মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক আবু মুসলিম তার অসাধারণ ধীশক্তি, তৎপরতা এবং বীরত্বের দ্বারা উমাইয়াদের

---

[৭] With all his good qualities, neverthless, the verdict must be against Mansur as a treacherous and cruel man. –Ref: W. Muir, *The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall*, pp. 467-68

ধ্বংসস্তূপের ওপর আব্বাসি শাসন প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের ধ্যান-ধারণার অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করেন।" তা সত্ত্বেও আব্বাসি বংশের ভবিষ্যৎ বিপদের কথা চিন্তা করে আবু জাফর আল-মনসুর তাকে হত্যার মতো হীন কাজটি করেন। ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মাজুসি সম্প্রদায়ের নেতা সানবাদের নেতৃত্বে পারসিকরা আবু মুসলিম খোরাসানির বর্বরোচিত হত্যার প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন আল-মনসুর এক বিশাল সেনাবাহিনী পাঠালে সানবাদ পরাজিত ও নিহত হন। সানবাদের বিদ্রোহ দমনের পর তিনি ৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রাওয়ান্দিয়া এবং ৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করেন। রাওয়ান্দ্রিয়ারা আল-মনসুরকে আল্লাহর অবতার মনে করত। তারা তাকে খাদ্য ও পানীয় দাতা ঈশ্বর বলে প্রচার করতে থাকে। এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে আবল-মুনসুর তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন। আল-মনসুর এরপর আরও কয়েকটি অভিযান চালান। আব্বাসি আন্দোলনে সহায়তাকারী আলির বংশধরদের হাতে ক্ষমতা প্রদান না করায় ক্ষুব্ধ আলি বংশীয় সমর্থক শিয়া মুসলিমদের ইমাম মুহাম্মদ (আন-নফস-উজ জাকিয়া বা পবিত্র আত্মা নামে খ্যাত) ও ইব্রাহিম যথাক্রমে মদিনা ও বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আল-মনসুর তাদের পরাজিত ও হত্যা করে আব্বাসি রাজবংশকে বিপদমুক্ত করেন। মদিনা, কুফা ও বসরায় মুহাম্মদ ও ইব্রাহিমের অসংখ্য সমর্থককে হত্যা করা হয়। ইমাম হাসান (রা) ও ইমাম হুসাইন (রা)-এর বংশধরদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এমনকি ইমাম জাফর আস্-সাদিকের মতো ধার্মিক পুণ্যাত্মার ওপর নির্যাতন চালানো হয়। হানাফি মাজহাবের প্রবর্তক ইমাম আবু হানিফা (র) ও মালেকি মাজহাবের প্রবর্তক ইমাম মালিক (র)-কে কারারুদ্ধ করে চাবুক মারা হয়। আলি বংশীয় এবং তাদের সমর্থকদের দমনে খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর যে নির্মমতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাকে ইতিহাসবিদেরা আব্বাসি খিলাফতের একটি কলঙ্কজনক দিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

জেনে রাখো

মাজহাব হলো ইসলামি ফিকাহ বা আইন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি ইসলামি বিধি-বিধান সম্পর্কিত মতবাদ। এর অর্থ চলার পথ, ধর্মমত বা বিশ্বাস। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর ইসলাম প্রচারের পর আনুমানিক প্রায় দেড়শত বছরের মধ্যে অসংখ্য মাজহাবের উৎপত্তি হয়। ২০০৪ সালের ৯ নভেম্বর জর্ডানের আম্মানে অনুষ্ঠিত আম্মান বার্তা সম্মেলনে বিশ্বের ৫০টি দেশের ২০০ জন মুসলিম আলেম বর্তমান সময়ের জন্য পালনীয় আটটি মাজহাবের অনুমোদন দেন। এগুলো হলো— ১. হানাফি (সুন্নি), ২. মালেকি (সুন্নি), ৩. শাফেয়ি (সুন্নি), ৪. হাম্বালি (সুন্নি), ৫. জাহেরি (সুন্নি), ৬. জাফরি (শিয়া, ইসমাইলিসহ), ৭. জায়েদি (শিয়া) এবং ৮. ইবাদি (খারেজি)। এগুলোর মধ্যে হানাফি মাজহাব ইসলামের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মাজহাব বলে অধিকাংশ ইসলামি চিন্তাবিদেরা মনে করেন।

রাজ্যবিস্তার: অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের পর আবু জাফর আল-মনসুর আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির জন্য ৭৫৯-৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে পুত্র মাহদীকে অভিযানে পাঠিয়ে তাবারিস্তান ও গিলান জয় করেন। এ অঞ্চল জয় করার পরই তিনি কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম-উত্তরে অবস্থিত দায়লামকে আব্বাসি সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। খালিদ বিন বার্মাককে এখানকার শাসক নিযুক্ত করে খলিফা এশিয়া মাইনরে আব্বাসি শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করেন। আল-মনসুরের সময় স্পেন প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উমাইয়া খলিফা হিশামের পৌত্র আব্দুর রহমান আব্বাসিদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থান ঘুরে অবশেষে তিনি ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া রাজ্য (আমিরাত) প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার বহুধাবিভক্ত স্পেনের ওপর আবদুর রহমান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আল-মনসুর স্পেনে অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হন। আবদুর রহমান আব্বাসি সেনাপতিকে পরাজিত করে তার ছিন্ন মস্তকটি আল-মনসুরের দরবারে পাঠিয়ে দেন। আব্দুর রহমানের ঔদ্ধত্য ও নৃশংসতায় খলিফা মনসুর বিস্মিত হয়ে তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' (The Falcon of the Quraish) বলে অভিহিত করেন। অবশ্য তার রাজত্বের শেষের দিকে আফ্রিকায় আব্বাসি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

এদিকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে খলিফার ব্যস্ততার সুযোগে রোমানরা আব্বাসি সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মালাতিয়া দুর্গ দখল করে নেয়। ৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা সেনাপতি সালেহ ও আব্বাসের নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রোমান সম্রাট চতুর্থ কনস্টানটাইন বার্ষিক করদানে সম্মত হন। মালাতিয়া দুর্গ পুনরায় আব্বাসি অধিকারে আসে।

বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা: প্রশাসনকে সুবিন্যস্ত, গতিশীল ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে খলিফা আল-মনসুর ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্ক থেকে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। দজলা (টাইগ্রিস) নদীর পশ্চিম তীরে ৪৮ লক্ষ ৮৩ হাজার দিরহাম ব্যয় করে সুপরিকল্পিত এক নগরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। হিট্টির ভাষায়, "নতুন জায়গায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় ভৌগোলিক দিক দিয়ে প্রাচ্যের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ তৈরি হলো।"[৮] এ নতুন নগরীর নামকরণ করা হয়েছিল দার-আস-সালাম (শান্তির নিবাস)। অনেকে খলিফার নামানুসারে একে মানসুরিয়া বলেও আখ্যায়িত করেন।

সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি: সামরিক শক্তিই সাম্রাজ্যের মূলভিত্তি— এ সত্যকে অনুধাবন করে আল-মনসুর একটি সুপ্রশিক্ষিত শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন। এ ছাড়া সাম্রাজ্যের সকল দপ্তরের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হচ্ছে কি না, শত্রু কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হতে পারে কি না, কেউ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রসহ কোনোরূপ রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত কি না ইত্যাদি জানার জন্য তিনি গুপ্তচর নিয়োগ করেন। ফলে সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ভিত্তি ও নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা

অনুবাদ বিভাগ স্থাপন: খলিফা আল-মনসুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিভিন্ন সভ্যতার ও ভাষার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য তিনি একটি অনুবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ইবন মুকাফ্ফা সংস্কৃত থেকে সর্বজনবিদিত পশুপক্ষীর গল্প (Animal fables) আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। আল-মনসুরের নির্দেশেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ 'খণ্ডকা-খাদ্যকা' এবং উপদেশমূলক গল্পপুস্তক 'হিতোপদেশ' আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন: আল-মনসুরের রাজত্বকালে গণিতশাস্ত্রের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। মনসুর নিজেও গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তার আমলে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের প্রভাবে আরবি ভাষায় জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ প্রণীত হতে থাকে। আল-মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আরব জ্যোতির্বিদ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-ফাজারি জ্যোতির্বিদ্যার ওপর লিখিত সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ (জ্যাতির্বিদ্যা বিষয়ক) সিদ্ধান্ত (Siddhanta) আরবিতে অনুবাদ করেন। মনসুরের দরবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন ইবন মুকাফ্ফা (Ibn-Muqaffa)। খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় ইবনে মুকাফ্ফা 'খুদাইনামা' নামক পাহলভী ভাষায় লিখিত রূপকথা, ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ সিয়ার আল-মুলুক আল আযম (Siyar Al-Mulk Al-Ajam) নামে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। খলিফা আল-মনসুর এরিস্টটল, ইউক্লিড, টলেমি প্রমুখ খ্যাতনামা গ্রিক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞদের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থও আরবি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন।

অন্যান্য কৃতিত্ব

কুরআন-হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলন: পবিত্র আল কুরআনের প্রাসঙ্গিক টীকা-টিপ্পনী অথবা তাফসিরের চর্চা এবং হাদিস অথবা মহানবি (স)-এর বাণীসমূহ সংকলনের ব্যবস্থা করে আল-মনসুর খ্যাতি অর্জন করেন। একই সাথে তিনি প্রাচীন কবিতাসমূহের সংরক্ষণের উদ্যোগও গ্রহণ করেন।

স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা: আল-মনসুরের আমলে পারসিক (ইরানি) স্থাপত্যের প্রভাবে আব্বাসি স্থাপত্যশিল্পের উন্মেষ ঘটে। ৭৬২-৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ৪৮,৮৩,০০০ দিরহাম ব্যয়ে সুরম্য বাগদাদ নগরী নির্মাণ তারই অবিস্মরণীয় কীর্তি। বাগদাদকে তখন 'মদিনা-আস-সালাম' বা শান্তির শহরও বলা হতো। এ ছাড়া তিনি কাসর-আল-খুলদ (Qasr-Al-Khuld) এবং রুসাফা (Rusafa) নামে দুটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ক্রেসওয়েলের মতে, আল-মনসুর ৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে রাক্কায় একটি রাজপ্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন।

---

[৮] Ref: *History of The Arabs*

নতুন সভ্যতার জনক: খলিফা মনসুর ছিলেন একটি নতুন সভ্যতার জনক। তার খিলাফতে আরবীয়, ভারতীয়, গ্রিক এবং ইরানি সভ্যতার সংমিশ্রণে যে নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই নতুন সভ্যতা ইসলামি সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুন্নি মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা: আব্বাসি আন্দোলনে শিয়া মুসলিমরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের থেকে সিংহাসন নিরাপদ রাখার জন্য আল মনসুর সুন্নি মতবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের মতো সুন্নি ধর্মীয় নেতাদের অপমান করলেও সুন্নি মতবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন। এ কাজটি রাজনৈতিক বিবেচনায় সঠিক ছিল বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন। পি.কে. হিট্টি বলেন, “মুয়াবিয়ার নীতিমালা যেভাবে উমাইয়াদের পথ প্রদর্শন করে সেভাবে আল মনসুরের নীতিসমূহ অনেক যুগ ধরে তার বংশধরদের পরিচালিত করে।”

জনকল্যাণকর শাসন প্রতিষ্ঠা: একজন প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবে আল-মনসুর সাম্রাজ্যে বহু নগর, সরাইখানা, সড়ক ও চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজের উন্নয়নের জন্যও তিনি নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এসব উদ্যোগ সাম্রাজ্যের জনগণের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ (৭৫০-৭৫৪ খ্রি.) শুধু আব্বাসি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, রাজ্যবিস্তার, প্রশাসনিক সংস্কার এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে তার ভাই আবু জাফর আল-মনসুর এ বংশের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন। আবু জাফর রাজ্যের ভিত্তি সুসংহত করার পাশাপাশি বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনার চেষ্টা করেন। তাই তাকেই আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা দেওয়া হয়। পি. কে. হিট্টি আল-মনসুরকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, “আস-সাফ্ফাহ আব্বাসি বংশ প্রতিষ্ঠা করলেও আবু জাফর আল-মনসুর ছিলেন আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।”[১]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?
[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; ঢা. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯; সকল বোর্ড ২০১৬]
২. ‘আল-মনসুর’ শব্দের অর্থ কী?
৩. আব্বাসিদের রাজধানী ছিল কোথায়? *[রা. বো., কু. বো., চ. বো. ২০১৮]*
৪. বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন কে? *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*
৫. কারা আল-মনসুরকে খোদার অবতার বলে মনে করত?
৬. আল-মনসুর ধর্মীয় কোন মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরের কৃতিত্বপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করে একটি চার্ট তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ না আবু জাফর আল-মনসুর তা নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

---

[১] Al-Munsur was the real founder of the dynasty. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.290

পাঠ ৫

শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবু জাফর আল-মনসুর
Abu Jafar Al-Mansur as a Patron of Education and Culture

খলিফা আল মনসুর শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার সময়ে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবযাত্রার সূচনা হয়। নিচে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে আল মনসুরের অবদান তুলে ধরা হলো—

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা: আবু জাফর আল-মনসুর সিংহাসনে আরোহনের (জুন, ৭৫৪ খ্রি.) পর থেকে আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। এ সময়ে প্রজাসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তারের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে বিশেষ করে কুফা, বসরা, মসুল, দামেস্ক, বাগদাদ, দিয়ার বকর, আলেপ্পো, হিমস, হামা প্রভৃতি স্থানে সরকারি অর্থে বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের বিনামূল্যে খাতা, কলম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হতো।

প্রাচীন আরবি কবিতাসমূহ সংকলন: ঐতিহাসিক সয়ূতি বলেন, কবিতা আরবদের সর্বজনীন পরিচয়ের 'জাতীয় দলিল'। প্রাচীনকালের যুদ্ধের ঘটনা, বংশগৌরব, বীরত্বপূর্ণ কাহিনি, যুগের বিবরণ, মরুর উপকারী প্রাণী উটের বিস্ময়কর গুণাবলি, নারী, প্রেম ও যৌনতা সম্পর্কিত বিষয়াদি ছিল প্রাচীন আরব কাব্যের প্রধান উপজীব্য। আর. এ. নিকলসনের মতে, "কবিতা সেই যুগে শুধু কিছুসংখ্যক সংস্কৃতিমনা সুধীর বিলাসিতার বস্তুই ছিল না, বরং এটা ছিল তাদের সাহিত্য প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম।"[১০] তাই নিজেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আরবদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য খলিফা মনসুর প্রাচীন আরবি কবিতাসমূহ পুস্তকাকারে লিপিবন্ধ করার উদ্যোগ নেন।

গণিতশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন: খলিফা আল-মনসুরের রাজত্বকালে গণিতশাস্ত্রের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। মনসুর নিজেও গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। গণিতশাস্ত্রের অগ্রগতিতে তার অবদান ছিল অসামান্য। বীজগণিত, পরিসংখ্যানসহ গণিতের বিভিন্ন শাখায় তিনি মৌলিক গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেন। পরবর্তীকালে আল খাওয়ারিজমি, ঈসা-আল-মাহানি, তাইয়ের-আল-সারাকশি, ছাবিত-বিন-কুরবাহ, আল-বাত্তানি, আবুল ওয়াকা, আল-বেরুনি প্রমুখ গণিতশাস্ত্রে যে অসামান্য অবদান রাখেন তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন খলিফা আল-মনসুর।

জ্যোতির্বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা: খলিফা মনসুর জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির জন্য ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। ফলে জ্যোতির্বিদ্যায় আরবের মুসলমানরা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। মনসুরের আমলেই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক আরবি গ্রন্থ প্রণীত হতে থাকে। তার পৃষ্ঠপোষকতায়ই আরব জ্যোতির্বিদ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-ফাজারি সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ্যার ওপর লিখিত গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত' (Siddhanta) আরবিতে অনুবাদ করেন। মনসুরের রাজদরবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ছিলেন ইবন মুকাফ্ফা (Ibn-Muqaffa)।

ইতিহাস সংরক্ষণ: খলিফা মনসুর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেন। তিনি প্রাক-ইসলামি যুগ, মহানবি (স)-এর যুগ, খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগ ও উমাইয়া আমলের ইতিহাস সংকলনের বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় ইবনে মুকাফ্ফা 'খুদাইনামা' নামক পাহলভী ভাষায় লিখিত রূপকথা, ইতিহাস ও জীবনী পুস্তকটি সিয়ার আল-মুলক আল-আযম (Siyar Al-Mulk Al-Ajam) নামকরণ করে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন।

দর্শনশাস্ত্র: 'ইসলামি দর্শনই প্রকৃত দর্শন'— এই বিশ্বাসের আলোকে আল-মনসুর দর্শনশাস্ত্রের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হন। তিনি এরিস্টটল, ইউক্লিড, টলেমি প্রমুখ গ্রিক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞদের বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো আরবি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তার শাসনামলে মুসলিম চিন্তাবিদ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক প্রমুখ মানবজীবনের প্রকৃত মূল্য, স্রষ্টার উদ্দেশে সৃষ্টির করণীয় প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিক মতামত প্রকাশ করেন।

---

[১০] R.A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs*

অনুবাদ বিভাগ স্থাপন: বিভিন্ন সভ্যতা ও ভাষার গ্রন্থাদি আরবি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য খলিফা আল-মনসুর একটি অনুবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রিক, পারসিক, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় লিখিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হওয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ইবন মুকাফ্‌ফা সংস্কৃত থেকে ফারসি ভাষায় অনূদিত 'কালীলা ও দীমনা' নামক সেকালের সর্বজনবিদিত পশু-পক্ষীর গল্প (Animal fables) গ্রন্থটি আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। হিট্টির মতে, 'কালীলা ও দীমনা' আরবি ভাষায় লিখিত সর্বপ্রাচীন সাহিত্য।

কুরআন-হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলন: মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক টীকা-টিপ্পনী অর্থাৎ তাফসিরের চর্চা এবং মহানবি (স)-এর বাণীসমূহ সংকলনের ব্যবস্থা করে আল-মনসুর খ্যাতি অর্জন করেন।

নারী শিক্ষার দ্বার উন্মোচন: খলিফা মনসুর শিক্ষা গ্রহণ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা প্রদান করেন। মনসুরের দুজন পিতৃব্য কন্যা তার আমলে বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা: আল-মনসুরের আমলে আব্বাসি স্থাপত্যশিল্পের উন্মেষ ঘটে যাতে পারস্যের স্থাপত্যের ব্যাপক প্রভাব ছিল। ৭৬২-৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ৪৮,৮৩,০০০ দিরহাম ব্যয়ে সুরম্য বাগদাদ নগরী নির্মাণ তারই অবিস্মরণীয় কীর্তি। একে 'মদিনা-আস-সালাম' বা শান্তির শহরও বলা হতো। এ ছাড়া মনসুর কাসর-আল-খুলদ (Qasr-Al-Khuld) এবং রুসাফা (Rusafa) নামে দুটি দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ক্রেসওয়েলের (K.A.C. Creswell) মতে, আল-মনসুর ৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে রাক্কায় একটি রাজপ্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। রাক্কার বাগদাদ ফটকের ভল্ট, খিলান, অলঙ্করণ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে প্রাচীন পারস্য স্থাপত্যকীর্তি থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। এসব স্থাপনা আল-মনসুরের শিল্প অনুরাগের প্রমাণ দেয়।

জেনে রাখো

মানবমুক্তির দিশারি হযরত মুহাম্মদ (স) প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন মদিনায়। মদিনায় বসবাসকারী সব ধর্মের মানুষকে একই পতাকাতলে নিয়ে আসার জন্য তিনি বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদিনা সনদ' প্রণয়ন করেন। এ সনদে জাতি-ধর্ম-বর্ণ সব মানুষের অধিকার সংবলিত ৪৭টি ধারা ছিল। এ ধারাগুলোর অনুসরণ ও বাস্তবায়ন মদিনাকে শান্তির শহরে পরিণত করেছিল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন আব্বাসি খলিফা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের বিনামূল্যে খাতা, কলম ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ প্রদান করেন?

২. কার সময় থেকে আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়?

৩. 'সিদ্ধান্ত' (Siddhanta) কোন বিষয়ের ওপর লিখিত গ্রন্থ?

৪. আল-মনসুরের দরবারের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ কে ছিলেন?

৫. ফারসি ভাষায় অনূদিত 'কালীলা ও দীমনা' গ্রন্থের বিষয়বস্তু কী?

৬. ভারতীয় গ্রন্থ 'খণ্ডকা-খাদ্যকা' কার সময়ে আরবি ভাষায় অনূদিত হয়?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর যেসব অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

২. শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে আবু জাফর আল-মনসুরের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ছক আকারে লেখো।

পাঠ ৬ ও ৭

খলিফা আল-মাহদী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.) এবং আল-হাদীর (৭৮৫-৭৮৬ খ্রি.) পরিচয় ও কৃতিত্ব [Introduction and Achievements of Khalifa Al-Mahdi (775-785 AD.) and Al-Hadi (785-786 AD)]

খলিফা আল-মাহদীর পরিচয়

আল-মাহদী ৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতা উম্মে সালমা এবং পিতা খলিফা আল-মনসুর। প্রথম যৌবনে তিনি সাফ্ফাহর কন্যা রাইতাকে ও পরবর্তী সময়ে বার্বার তরুণী খায়জুরানকে বিবাহ করেন। পিতা মনসুরের মৃত্যুর পর তারই মনোনয়ন অনুসারে আল-মাহদী ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের আব্বাসি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "তিনি স্বভাবত দয়ালু ও মহানুভব ছিলেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই পিতার শাসনকালের নিষ্ঠুরতার প্রতিকার সাধন করতে যত্নবান হন।"[১১] আল-মাহদী মাসান্দানে শিকাররত অবস্থায় আহত হয়ে ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩ আগস্ট ৪৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

খলিফা আল-মাহদীর কৃতিত্ব

বন্দিদের মুক্তি প্রদান ও দেহরক্ষী বাহিনী গঠন: মাহদীর রাজনীতি তার পিতা মনসুরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। দয়ালু ও মহানুভব শাসক হিসেবে তিনি অমার্জনীয় অপরাধের জন্য দণ্ডিত অপরাধী ছাড়া অন্য সকল ব্যক্তিকে কারাগার থেকে মুক্তিদান করেন। তিনি উমাইয়া খলিফা ইব্রাহিমের পুত্র হাসানকে কারামুক্ত করে বৃত্তি প্রদান করেন। পিতা মনসুর কর্তৃক মহানবি (স)-এর বংশধরদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন। আল মাহদী মদিনাবাসীকেও সম্মানিত করেন। তিনি মদিনার আনসারদের মধ্য থেকে ৫০০ লোককে দেহরক্ষী মনোনীত করেন ও জায়গির প্রদান করেন।

বিদ্রোহ দমন: উদার ও শান্তিপূর্ণ নীতিতে বিশ্বাসী হলেও খলিফা মাহদী রাষ্ট্রের সংহতির স্বার্থে প্রয়োজনে কঠোর ও রক্তপাত নীতি গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন না। তিনি খোরাসানের বিদ্রোহী নেতা ইউসুফকে বন্দি করে তার হাত-পা ছিন্ন করার নির্দেশ দেন (৭৭৬-৭৭৭ খ্রি.)। খলিফা মাহদীর রাজত্বকালে খোরাসানে হাশিম বিন হাকিম বা 'মুকান্না' নামে এক খর্বাকৃতি কুদর্শন ব্যক্তি নিজেকে 'নবি' বলে দাবি করেন। মুকান্নার অনুসারীরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করত এবং এজন্য তাদেরকে বলা হতো মুবাইয়া বা শ্বেতবস্ত্র পরিধানকারী। খলিফা মাহদী কয়েকটি অভিযান চালিয়ে মুকান্না ও তার অনুসারীদের পরাজিত করলে মুকান্না কীশ নামক শহরে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেন। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে পারস্যে খসরু নওশিরওয়াঁর রাজত্বকালে মাজদাক নামে এক ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব হয়েছিল। তার প্রচারিত মতের অনুসারীদেরই জিন্দিক বলা হতো। পারস্য সম্রাট মাজদাককে দমন করলেও তার প্রাচীন নাস্তিকতাবাদী সাম্যবাদ মাহদীর রাজত্বকালে খোরাসান, পশ্চিম পারস্য এবং ইরাকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। মাজদাকের ঐ মতবাদ সামাজিক বন্ধন শিথিল ও শাসন কর্তৃত্ব দুর্বল করা এবং যথেচ্ছভাবে মানবরিপুর তাড়না অনুসরণকে বৈধতা দেয়। মাহদী কঠোর হাতে এই মতের অনুসারীদের দমন করেন। এরপর ৭৮৪-৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মরুভূমিতে বসবাসকারী যাযাবরদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা লুণ্ঠন ও অরাজকতার মাধ্যমে অশান্তি সৃষ্টি এবং নামাজ ত্যাগ করেছিল। খলিফা মাহদী তাদেরও শক্ত হাতে দমন করেন।

বাইজান্টাইনদের প্রতিরোধ: বাইজান্টাইনরা খলিফা মনসুরের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে ৭৭৯-৮০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম রাজ্যের সীমান্তে লুণ্ঠন শুরু করে। তারা মারআশ (জার্মানিসিয়া) দখল করে সেখানে অগ্নিসংযোগ করে এবং এর অধিবাসীদের হত্যা করে। পি কে হিট্টি বলেন, "আব্বাসি সাম্রাজ্যের তৃতীয় খলিফা আল-মাহদীর (৭৭৫-৭৮৫) আমলে

---

[১১] Naturally humane and generous, immediately on his accession to the throne he endeavoured to remedy the harshness and rigour of his father's rule. –Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.229

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও খিলাফতের মধ্যকার শতাব্দীর বেশি সময়ের পুরনো বিরোধ আবার শুরু হয়।”[১২] বাইজান্টাইনদের প্রতিরোধ করার জন্য খলিফা সেনাপতি হাসান ইবনে কাহতাবাকে প্রেরণ করলে তারা পশ্চাদপসরণ করে। হাসান কয়েকটি রোমান শহর ধ্বংস করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি মুসাকে বাগদাদে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে মসুল হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হন। সিরিয়ার আলেপ্পোকে রাজকীয় বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র করা হয়। মাহদী তার পুত্র হারুনকে ইসা ইবন মুসা, আবদুল মালিক ইবনে সালিহ এবং হাসান ইবন কাহতাবা প্রমুখ সেনাপতিসহ সম্মুখে প্রেরণ করেন। ইয়াহহিয়া ইবনে খালিদ ছিলেন এই বাহিনীর সহকারী সেনাপতি। হারুনের এ অভিযানের ফলে সামালিয়নসহ কয়েকটি স্থান মুসলিম বাহিনীর দখলে আসে। এরপর খলিফা মাহদী পুত্র হারুনকে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানসহ সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই মেগাথাকোমিস নামক এক সেনাপতির নেতৃত্বে বাইজান্টাইনরা আবার মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে। হারুন তাদের প্রতিরোধ করার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হন। বাইজান্টাইন বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয়। হারুন তখন সৈন্যদল নিয়ে তাদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের দিকে যাত্রা করেন। চতুর্থ লিওর বিধবা রানী আইরিন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে চুক্তি করতে রাজি হন। তিনি বার্ষিক কর দিতে ও বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাগমনে সাহায্য করার জন্য পথ প্রদর্শক ও রসদ দানে সম্মত হন।

বাগদাদ নগরীর উন্নতিসাধন: মাহদী বাগদাদ নগরীর জৌলুস আরও বৃদ্ধি করেন। তিনি বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের সেখানে আমন্ত্রণ জানান। ফলে বাগদাদ জ্ঞানচর্চা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। মুহাদ্দিস শায়িয়াহ বিন আবি ওহাব, সুফিয়ানসওরী, ইব্রাহিম বিন আদহাম ও দাউদ তায়ী, কবি বাসার-বিন-বায়দ, ব্যকরণবিদ খলিল আহম্মদ প্রমুখ মাহদীর সময় বাগদাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন।

জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি: খলিফা মাহদী বহুমুখী জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত এবং ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করেন। আস সাফ্‌ফাহর সময়ে মক্কার পথে শুধু কাদেসিয়া ও জুবালার মধ্যে ৩০০ মাইল অংশে সরাইখানা (যাত্রীদের বিশ্রামাগার) নির্মিত হয়েছিল। খলিফা মাহদীর আদেশে পবিত্র মক্কা-মদিনা নগরীদ্বয় পর্যন্ত সমগ্র পথে কূপ ও জলাধার সমন্বিত বড়, আরামদায়ক গৃহ নির্মিত হয়। এ ছাড়া তীর্থযাত্রী ও পথচারীদের নিরাপত্তার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। খলিফা প্রতি বছর কাবা শরিফের জন্য গিলাফ পাঠানোরও ব্যবস্থা করেন।

হজ উপলক্ষ্যে দান-খয়রাত: ৭৭৬-৭৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা মাহদী জাঁকজমকের সাথে মক্কায় হজব্রত পালন করেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি হিজাজের লোকদের ৩০,০০০,০০০ দিরহাম দান করেন। তিনি মক্কাবাসীর মধ্যে ১,৫০,০০০ খণ্ড বস্ত্র বিতরণ করেন। খলিফার আদেশে 'মসজিদ-ই-নববি' (মদিনা মসজিদ) পুনর্নির্মিত ও সুসজ্জিত হয়।

ডাক বিভাগের উন্নতি সাধন: মাহদী ডাক বিভাগের উন্নতি সাধন করেন। তিনি 'আমীন' নামক এক শ্রেণির কর্মচারীর মাধ্যমে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ অবগত হতেন।

বৈদেশিক নীতি: খলিফা মাহদী চীন সম্রাট, তিব্বতের রাজা, এমনকি ভারতীয় রাজাদের সাথে দূত বিনিময় করতেন। এটা তার সম্মান বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ও মৃত্যু: ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মাহদী মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যথাক্রমে পুত্র মুসা ও হারুনকে তার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন।

---

[১২] The more than century-old struggle between the caliphate and the Byzantine empire was resumed by the third caliph, Al-Mahdi (775 –785). –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.299

আল-হাদীর পরিচয় ও কৃতিত্ব

আল-মাহদীর মৃত্যুর পর তার মনোনীত উত্তরাধিকারী পুত্র মুসা আল-হাদী উপাধি ধারণ করে ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'আল-হাদী' অর্থ হলো পথপ্রদর্শক। হারুন-অর-রশীদ তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও পরে তা মিটে যায়।

খারেজি ও আলিপন্থিদের বিদ্রোহ: আল-হাদীর স্বল্পকালীন শাসনে সাম্রাজ্যে কিছু বিশৃঙ্খলা হয়। মেসোপটেমিয়ার খারেজি এবং মক্কা ও মদিনার আলিপন্থিরা বিদ্রোহ করে। আল-হাদির সময়ে খারেজিদের দমন করার পর আলিপন্থিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। মক্কার কাছে ফায় নামক স্থানে এক সংঘর্ষের মাধ্যমে আলিপন্থিদেরও দমন করা হয়। আলি (রা)-এর বংশের ইদ্রিস নামক জনৈক ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে মিসরের মধ্য দিয়ে মরক্কোর তাঞ্জিয়ারে পৌছান। বার্বারদের সহায়তায় তাঞ্জিয়ারে তিনি ইদ্রিসীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

মাতা খায়জুরানের সাথে সম্পর্কের অবনতি: আল হাদী তার মাতা খায়জুরানকে শাসনকাজে হস্তক্ষেপের তেমন সুযোগ দেননি। কারণ খায়জুরান পুত্র হারুনের খিলাফত লাভের পক্ষে ছিলেন। আল-মাহদীর সময় তিনি যে সুযোগ পেয়েছিলেন হাদীর সময় তা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

মনিকিয়ান ও জিন্দিক সম্প্রদায়কে ধ্বংস: পিতার অন্তিমকালের পরামর্শ অনুযায়ী আল-হাদী ধর্মদ্রোহী মনিকিয়ান (Manichaean) সম্প্রদায়কে দমন করেন। রেজা-ই-করিম বলেন, "এ কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, এই ইসলামবিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক হাশেমি বংশের লোকও ছিল।" আল-মাহদী জিন্দিক সম্প্রদায়ের অনেক লোককে হত্যা করে তাদের দমন করেন। কারণ তারা ইসলামবিরোধী বিভিন্ন প্রচারণা চালাত।

মৃত্যু ও উত্তরাধিকারী মনোনয়ন: ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের কাছের ঈশাবাদ নামক স্থানে নৌ বিহারকালে আল-হাদী মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি পিতার অন্তিম ইচ্ছানুসারে ভাই হারুনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

আল-হাদীর শাসনকালে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল। তার শাসনকালেও সাম্রাজ্যে পারস্যের (প্রাচীন ইরান) প্রভাব প্রবলভাবে লক্ষণীয়। রাজ্যের সব সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান তথা জনগণের সার্বিক জীবনাচরণে পারস্যের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম সাম্রাজ্য অনেক এগিয়ে যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল-মাহদী কত খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি সিংহাসনে আরোহণ করেন?
২. আল-মাহদীর পিতা কে ছিলেন?
৩. কার শাসনকালে খোরাসানে 'মুকান্না' নামে এক ব্যক্তি নিজেকে 'নবি' দাবি করেন?
৪. 'আল-হাদী' অর্থ কী?
৫. হারুন-অর-রশীদের মায়ের নাম কী? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]*
৬. ধর্মদ্রোহী মনিকিয়ান এবং জিন্দিক সম্প্রদায়কে দমন করেন কে?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খলিফা আল-মাহদী যেসব বিদ্রোহ দমন করেন সাল এবং প্রতিপক্ষের নামসহ সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৮

খলিফা হারুন-অর-রশীদের পরিচয় ও অভ্যন্তরীণ নীতি (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)
Introduction and Internal Policies of Khalifa Harun-Ar-Rashid (786-809 AD)

পরিচয়: খলিফা হারুন-অর-রশীদ ১৪৭ বা ১৪৮ হিজরিতে ইরানের রায় শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম খলিফা আল-মাহদী ও মাতার নাম খায়জুরান। তার শাসনামলকে ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

সিংহাসনে আরোহন: খলিফা আল-হাদীর মৃত্যুর পর ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে হারুন তিনি আল-হাদীর পুত্রকে কৌশলে বশীভূত করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। হারুনের বয়স তখন ২৫ বছর। ইয়াহহিয়াকে তিনি প্রধান উজির নিযুক্ত করেন। ইয়াহহিয়ার দুই পুত্র ফজল ও জাফরকে রাজদরবারে বিশেষ পদ দেওয়া হয়। হারুন-অর-রশীদ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে রাজ্যে সংহতি বৃদ্ধি করেন।

খারেজি বিদ্রোহ দমন: হারুনের রাজত্বের শুরুতেই খারেজিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৭৮৭—৮৮ খ্রিষ্টাব্দে খারেজিরা মেসোপটেমিয়ার শাসনকর্তা আবু হোরায়রাকে পরাজিত করে রাজধানী দখল করে নেয়। খলিফা এক অভিযান প্রেরণ করে তাদের দমন করেন। এই সময় অপর একটি বিদ্রোহ দেখা দেয় নাসিবিনের ওলীদ বিন তারিকের নেতৃত্বে। বিদ্রোহীরা আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং মেসোপটেমিয়ার হুলওয়ান পর্যন্ত চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এবারও খলিফার বাহিনী রাষ্ট্রদ্রোহী ওলীদকে পরাজিত ও হত্যা করে বিদ্রোহ দমন করে (৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দ)। ওলীদের মৃত্যুর পর তার বোন লায়লা (মতান্তরে আল ফারিয়া) খারেজিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি উপর্যুপরি কয়েকটি সংঘর্ষে খলিফার বাহিনীকে পরাজিত করেন। লায়লা আরবের 'জোয়ান অব আর্ক' নামে পরিচিতি লাভ করেন। সুন্দরী ও কবি হিসেবে খ্যাতি ছিল তার। খলিফার পক্ষ থেকে বোঝানো হলে পরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান লায়লা। এরপর খারেজিরা পারস্যের হিরাত পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও পারস্যের শাসনকর্তা আলী ইবন ঈশা-সে বিদ্রোহ দমন করেন।

মধ্য এশিয়ায় শান্তি স্থাপন: খলিফা হারুন মধ্য এশিয়ায় দক্ষতার সাথে শাসন পরিচালনা করে শান্তি স্থাপন করেন। ৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র কাবুল ও কান্দাহার আব্বাসি শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাম্রাজ্যের সীমা হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। খলিফা মধ্য এশিয়াকে সুসংহত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন: তিনি এশিয়া মাইনরের সীমান্ত অঞ্চলগুলোকে সাধারণ প্রদেশ থেকে পৃথক করে সুরক্ষিত অঞ্চল বা আওয়াসিম বলে ঘোষণা করেন। এ অঞ্চলে খলিফা একজন সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি সিরিয়ার তারসাসে (Tarsus) (বর্তমানে তুরস্কে) পুনরায় বসতি স্থাপন করে এলাকাটিকে সুরক্ষিত করেন।

মুদারীয় ও হিমারীয় বিদ্রোহ দমন: রাসুল (স)-এর সময় থেকেই মুদারীয়-হিমারীয় দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। এর ধারাবাহিকতায় ৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুদারীয় এবং হিমারীয় গোত্রের মধ্যে সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। খলিফার আদেশে সেনাপতি মুসা বিন ঈসা সিরিয়ায় এবং সেনাপতি দাউদ মুহাল্লাবী সিন্ধুতে এ বিদ্রোহ দমন করেন।

মসুলের বিদ্রোহ দমন: ৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে আতাফ নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে সমগ্র মসুল খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। স্বয়ং খলিফা যুদ্ধ পরিচালনা করে ঐ বিদ্রোহীদের দমন করেন। তিনি মসুলের প্রাচীরগুলো ভেঙে দিয়ে ভবিষ্যতে যাতে তারা আর বিদ্রোহ করতে না পারে সে ব্যবস্থা করেন।

আলি বংশীয়দের প্রতি নীতি: আস-সাফফাহ ও আল-মনসুরের সময় নানাভাবে নির্যাতিত আলিপন্থিরা ন্যায়সঙ্গত কারণে খলিফা হারুনের সময়ে বিদ্রোহ করেন। আল মনসুরের রাজত্বকালে আলি বংশীয় ইব্রাহিম ও মুহাম্মদকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়। তাদের ভাই ইয়াহহিয়া ৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে দাইলাম প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। খলিফা ইয়াহইয়াকে নিবৃত্ত করার জন্য জুরজান ও পারস্যের শাসনকর্তা ফজল বার্মাকিকে প্রেরণ করেন। শিয়া মুসলিম ফজল বার্মাকি যুদ্ধের পরিবর্তে ইয়াহইয়াকে খলিফার সাথে মৈত্রীচুক্তি স্থাপন করতে বাধ্য করেন। কিন্তু সন্দেহপরায়ণ হারুন আলি বংশীয়দের হাতে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ইয়াহইয়াকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানিয়ে কৌশলে কারারুদ্ধ করেন। একই লক্ষ্যে তিনি যুগশ্রেষ্ঠ তাপস আলি বংশীয় মুসা আল কাজিমকে বন্দি করে বাগদাদের অধ্যক্ষ সিন্দী ইবনে শাহিকের বোনের প্রহরাধীনে রাখেন। কয়েক বছর কারাভোগের পর মুসা আল-কাজিম ৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

উত্তর আফ্রিকায় আগলাবীয় শাসন প্রতিষ্ঠা ও শান্তি স্থাপন: ৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হারুন প্রখ্যাত সেনাধ্যক্ষ হায়সামাকে উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা নিয়োগ করলে সেখানে শান্তি ও সংহতি ফিরে আসে। এই সময়ে দক্ষিণ আলজেরিয়ার জাব অঞ্চলের শাসনকর্তা ইব্রাহিম ইবনে আগলাবকে বাৎসরিক ৪০,০০০ দিনার কর প্রদানের অঙ্গীকারে উক্ত প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করা হয়। মূলত হায়সামার পরামর্শেই খলিফা এটি করেছিলেন। ফলে উত্তর আফ্রিকায় স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। অন্যদিকে ইব্রাহিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আগলাবি বংশ পরবর্তী ১০৯ বছর পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকা শাসন করে।

আর্মেনিয়ার খাজার বিদ্রোহ দমন: গ্রিকদের সাথে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ অসভ্য খাজার উপজাতি গ্রিকদের প্ররোচনায় উত্তর দিক থেকে আর্মেনিয়া আক্রমণ করে। তাদের নিষ্ঠুর ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ছিল নজিরবিহীন। খলিফার দুইজন শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক ৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে অভিযান চালিয়ে খাজারদের দমন করেন।

বার্মাকিদের ধ্বংস সাধন: বিখ্যাত বার্মাকি উজির পরিবার দীর্ঘ সতেরো বছর পরম নিষ্ঠা, অবিচল আনুগত্য ও আত্মত্যাগ এবং অসামান্য কর্মনৈপুণ্যের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে হারুনের রাজত্বের গৌরব, মর্যাদা ও সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেন। কিন্তু ফজল বিন রাবির ব্যক্তিগত শত্রুতা ও উচ্চাভিলাষ, বার্মাকিদের অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্য, উজির জাফরের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, বোন আব্বাসাকে বার্মাকি জাফরের গোপনে বিয়ে করা এবং সর্বোপরি লোকের নানারকম কথার প্রভাবে খলিফা হারুন বার্মাকিদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ হন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "তিনি সন্দেহের অন্ধরোষ ও স্বৈরশাসকসুলভ ক্রোধ এবং অবিরত অপবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে বহুপুরুষের বিশ্বস্ত সেবার কথা ভুলে গেলেন।"[১৩] খলিফা হঠাৎ একরাতে মসরুর নামক তার এক নৈশ অনুচর দ্বারা জাফরের শিরশ্ছেদ করালেন। বৃদ্ধ ইয়াহইয়া, ফজল, মুসা ও মুহাম্মদকে রাক্কায় কারারুদ্ধ করা হয়। বাজেয়াপ্ত হয় তাদের সমুদয় সম্পত্তি। ৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহহিয়া এবং ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফজল কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিক পি কে হিট্টি বলেন, "এভাবেই খালিদ বিন বার্মাকি স্থাপিত উজির পরিবারকে সমূলে বিনাশ করা হয়।"[১৪] মুসা ও মুহাম্মদকে পরবর্তী খলিফা মুক্তি দেন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "এই ঘটনা হারুন-অর-রশীদের গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বকালের জ্যোতিকেই শুধু ম্লান করেনি, বরং তার ভবিষ্যৎ জীবনকে অনুশোচনা ও কৃতঘ্নতাজনিত বিবেক দংশনে তমসাচ্ছন্ন করে রেখেছিল।"

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খলিফা হারুন-অর-রশীদ কত বছর বয়সে আব্বাসি খিলাফতে বসেন?
২. রাজমাতা খায়জুরানকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সম্মানিত করেন কে?
৩. খলিফা হারুন-অর-রশীদ কাকে প্রধান উজির নিযুক্ত করেন?
৪. আরবের 'জোয়ান অব আর্ক' নামে পরিচিত কে?
৫. ইব্রাহিম ইবনে আগলাব কোথায় আগলাবীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন?
৬. বিখ্যাত বার্মাকি উজির পরিবারকে ধ্বংস করেন কে?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খলিফা হারুন-অর-রশীদ যে সকল বিদ্রোহ দমন করেন তার একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[১৩] The faithful services of generations were forgotten in the blind fury of suspicion and despotic anger, influenced by persistent calumny. –Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracens*, p.245

[১৪] Thus the celebrated house founded by Khalid Al-Barmaki fell, never to rise again. –Ref : P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.296

পাঠ ৯

খলিফা হারুন-অর-রশীদের বৈদেশিক নীতি
The Foreign Policy of Khalifa Harun-Ar-Rashid

বাইজান্টাইন নীতি

হারুনের সাথে আইরিনের সংঘর্ষ ও সন্ধি: ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে হারুন-অর-রশীদ সিংহাসনে আরোহণ করেই বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হন। খলিফা হারুন-অর-রশীদের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা হলো বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। পূর্ববর্তী খলিফা মাহদীর রাজত্বকালে বাইজান্টাইন সম্রাজ্ঞী আইরিনের সাথে যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তারা তা ভঙ্গ করে ৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে। বাইজান্টাইনদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য হারুন তারসাসে (Tarsus) তৎকালীন সিরিয়া এবং বর্তমান তুরস্কে একটি পৃথক সরকার গঠন করেন এবং ভূমধ্যসাগরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ৭৯১-৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে নৌ-বাহিনীর সহায়তায় ক্রিট ও সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করেন। এরপর তিনি ৭৯৭-৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে ইফিসাস ও আনসিরা শহর দখল করেন। অবশেষে রোমান সম্রাজ্ঞী আইরিন কর (Tax) প্রদানে সম্মত হয়ে চার বছরের জন্য (৭৯৯-৮০২ খ্রি.) শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন।

নাইসিফোরাসের সাথে সম্পর্ক: ৮০২ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের অর্থমন্ত্রী নাইসিফোরাস সম্রাজ্ঞী আইরিনকে সিংহাসনচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন। নাইসিফোরাস ক্ষমতা দখল করে মুসলিমদের সাথে করা পূর্বের সন্ধি ভঙ্গ করেন। তিনি ৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হারুনকে এক অপমানজনক পত্র লিখে সম্রাজ্ঞী আইরিন কর্তৃক প্রদত্ত কর ফেরত পাঠাবার দাবি জানান। ঐ অপমানজনক পত্র পাঠ করে খলিফা হারুন খুবই ক্ষুব্ধ হন। ক্রোধ প্রশমিত হলে তিনি ঐ পত্রের অপর পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ জবাব দেন– "আমিরুল মুমেনীন হারুনের কাছ থেকে রোমকদের কুকুর নাইসিফোরাসের প্রতি– আমি তোমার পত্র পাঠ করেছি, উত্তর চক্ষে দেখবে, কর্ণে শুনবে না।" এরপর হারুন নাইসিফোরাসকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এশিয়া মাইনর অভিমুখে যাত্রা করে সোজা বাইজান্টাইনদের দুর্গ হিরাক্লিয়ায় পৌঁছেন। ৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে গর্বিত রোমান সম্রাট এখানে হারুনের মোকাবিলা করে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং সন্ধি স্বাক্ষর করেন।

দ্বিতীয় অভিযান ও সন্ধি: খলিফা হারুন রাক্কায় গিয়ে স্থিতিলাভ করতে না করতেই নাইসিফোরাস সন্ধি ভঙ্গ করে পুনরায় মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করেন। নাইসিফোরাসের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা শোনামাত্রই খলিফা হারুন প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তুষারাচ্ছন্ন টরাস পর্বত অতিক্রম করে আবার তার সম্মুখীন হলেন। যুদ্ধে এবারও নাইসিফোরাস শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। ঐতিহাসিক গিবন উল্লেখ করেন– "তার (নাইসিফোরাসের) যাবতীয় নীতি ও যুদ্ধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো এবং চল্লিশ হাজার সৈন্যের মৃতদেহ ভরা রণক্ষেত্র থেকে বিশ্বাসঘাতক এ গ্রিকরাজ তিনটি ক্ষতচিহ্নসহ পালিয়ে যান।"[১৫] এবারও বিশ্বাসঘাতক নাইসিফোরাস কর প্রদানে সম্মত হয়ে সন্ধি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সহৃদয় খলিফা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। কিন্তু পরে খলিফা হারুনকে রাইয়ে (প্রাচীন রাজেস) বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত দেখে নাইসিফোরাস আবার মুসলিম রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করেন। খলিফা হারুনের পুত্র কাশিম তাকে পরাজিত করেন।

নাইসিফোরাসের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযান ও সন্ধি: ৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হারুন ট্রান্সঅক্সিয়ানায় বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকার সময় নাইসিফোরাস মুসলিম রাজ্যের সীমান্ত আক্রমণ করেন। হারুন পুত্র মামুনকে রাক্কায় রেখে ১,৩৫,০০০ সৈন্য নিয়ে উত্তর দিকে অভিযানে বের হন। যুদ্ধ হলে নাইসিফোরাসের পাঠানো সৈন্যবাহিনী শোচনীয়রূপে পরাজিত হয়। হিরাক্লিয়া হারুনের অধিকারে আসে। রোমান সম্রাট পুনরায় স্বভাবসুলভ ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন এবং অপরিণামদর্শী খলিফা হারুন এবারও তা মঞ্জুর করলেন। খলিফা হারুনের অদূরদর্শী বদান্যতার ফল ভালো হয়নি। ৮০৮-৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে নাইসিফোরাস প্রতিজ্ঞা

---

[১৫] His stratagems of policy and war were exhausted, and the perfidious Greek escaped with three wounds from a field of battle overspread with forty thousand of his subjects. –Ref: Edward Gibbon, *The Decline and Fall of the Roman Empire*.

ভঙ্গ করে আবার মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু খলিফা হারুন পূর্বাঞ্চলের খোরাসানে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়নি। ঐ অভিযানে হারুন অসুস্থ হয়ে ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তার পক্ষে আর বাইজান্টাইনদের মোকাবেলা করা সম্ভব হয়নি। গ্রিকদের বিরুদ্ধে বারবার জয়লাভ খলিফার রণনৈপুণ্য ও সমরকুশলতার পরিচয় বহন করে। কিন্তু বারবার তাদের ক্ষমা করে খলিফা তার অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

ফ্রান্সের প্রতি নীতি: আব্বাসি খলিফা হারুনের খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে ফ্রান্সের সমসাময়িক খ্যাতিমান নৃপতি শার্লিমান (Charlemagne) তার দরবারে দূত পাঠিয়েছিলেন। জবাবে খলিফা হারুনও শার্লিমানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ৭৯৭-৮০৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রাষ্ট্রদূত ও উপঢৌকন আদান-প্রদান করেন। শার্লিমান হারুনের কাছে যে সমস্ত মূল্যবান উপঢৌকন পাঠান তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ, সুগন্ধিদ্রব্য এবং একটি জলঘড়ি (Water Clock)। ফ্রান্সের নৃপতি শার্লিমান এবং হারুনের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের মূলে বিশেষ একটি কূটনৈতিক কারণ ছিল। একদিকে শার্লিম্যান বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে হারুনকে মিত্র হিসেবে পেতে উদগ্রীব ছিলেন। অন্যদিকে হারুনও স্পেনের নবপ্রতিষ্ঠিত উমাইয়া রাজত্বের বিরুদ্ধে শার্লিমানকে মিত্র হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি এই দুই মহান নৃপতি সম্পর্কে বলেন– “নবম শতাব্দীর শুরুতে দুইজন বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট ইতিহাসের দিগন্তে দেখা দেন– পাশ্চাত্যে শার্লিমান আর প্রাচ্যে খলিফা হারুন-অর-রশীদ। দুজনের মধ্যে হারুন নিঃসন্দেহে অধিকতর শক্তিশালী ও উন্নততর সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন।”[১৬]

চীনের সাথে সম্পর্ক: হারুনই প্রথম মুসলিম শাসক যিনি চীনা শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। হারুন চীনের সম্রাট ফাগফুরের (Faghfur) পাঠানো রাষ্ট্রদূতকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান এবং চীনের সাথে আরবদের বন্ধুত্বের ঘোষণা দেন। হারুন তখন থেকে নিয়মিত চীন সম্রাটের সাথে দূত ও উপহার আদান-প্রদান করতেন।

ভারতের সাথে সম্পর্ক: খলিফা হারুন ভারতবর্ষের কোনো এক রাজার সাথেও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তবে তখন ভারতবর্ষে অনেকগুলো পৃথক রাজ্য থাকায় ঠিক কোন শাসকের সাথে তিনি সম্পর্ক গড়ে তোলেন তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। পি. কে. হিট্টি শুধু 'The King of India'-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খলিফা হারুন-অর-রশীদ প্রথম বিদেশি কোন শক্তির বিরুদ্ধাচরণে পড়েন?
২. খলিফা হারুন-অর-রশীদের রাজত্বকালে বাইজান্টাইন সম্রাজ্ঞী কে ছিলেন?
৩. সম্রাজ্ঞী আইরিনকে সিংহাসনচ্যুত করে কে রোমান ক্ষমতা দখল করেন?
৪. রোমান সম্রাট নাইসিফোরাস কোন আব্বাসি খলিফার সাথে সন্ধি স্বাক্ষর করেন?
৫. আব্বাসি খলিফা হারুনের সমসাময়িক ফ্রান্সের শাসক কে ছিলেন?
৬. খলিফা হারুন চীনের কোন সম্রাটের সাথে দূত ও উপহার আদান-প্রদান করতেন?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

১. খলিফা হারুন-অর-রশীদের বৈদেশিক নীতি সফল হয়েছিল কি না এ প্রশ্নে দুটি দলে ভাগ হয়ে পক্ষে-বিপক্ষে পাঁচটি করে যুক্তি দাও।
২. ‘পাশ্চাত্যে শার্লিমান আর প্রাচ্যে হারুন-অর-রশীদ’– এ উক্তিটির একটি তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করো।

---

[১৬] The ninth century opened with two imperial names standing supreme in world affairs: Charlemagne in the West and Harun Al-Rashid in the East. Of the two, Harun undoubtedly the more powerful and represented the higher culture. –Ref : P.K. Hitti, *History of the Arabs*, P.298

পাঠ ১০

খলিফা হারুন-অর-রশীদের চরিত্র ও কৃতিত্ব
Character and Achievements of Khalifa Harun-Ar-Rashid

চরিত্র

ধার্মিকতা: খলিফা হারুন-অর-রশীদ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তিনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে বহু নফল নামাজ পড়তেন। তিনি নয়বার পবিত্র হজব্রত পালন করেন। ব্যক্তিজীবনে বড় একটি সময় কাটাতেন ধর্মোপদেশ শুনে। তার দরবারের উল্লেখযোগ্য আলেম ছিলেন সুফিয়ান সওরী, সুফিয়ান বি-উনায়না, ফুদাইল-নি-আয়াজ প্রমুখ।

ন্যায়বিচার ও দানশীলতা: খলিফা হারুনের ন্যায়বিচার ও দানশীলতার খ্যাতি আরব বিশ্বের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি দৈনিক ১০০০ দিরহাম দান করতেন। প্রতিবার হজ পালনের সময় প্রজাসাধারণের মাঝে অকাতরে ধন-সম্পদ দান করতেন। হজ যাত্রীদের পানির কষ্ট দূর করার জন্য ৮০২ খ্রিষ্টাব্দে তার স্ত্রী জুবাইদা ফোরাত হতে মক্কা পর্যন্ত 'নহর-ই-জুবাইদা' খাল খনন করেন।

ভালো-মন্দের মিশ্রণ: খলিফা হারুন-অর-রশীদের চরিত্রের মধ্যে ছিল ভালো-মন্দের মিশ্রণ। তিনি বিরোধীদের প্রতি কঠোর থাকলেও প্রজাসাধারণ ও বন্ধুদের কাছে ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয়। তবে তিনি অন্যের কথায় অতিমাত্রায় কান দিতেন বলে অকৃত্রিম বন্ধু বার্মাকি পরিবারের ধ্বংসসাধন করেছিলেন। এটি ছিল হারুনের চরিত্রের এক দুর্বল দিক। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, হারুন-অর-রশীদ ছিলেন ধর্মীয় কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান, জীবনযাপনে মিতব্যয়ী, দানশীলতায় উদার। তিনি রাজকীয় আড়ম্বরে পরিবেষ্টিত থাকতেও পছন্দ করতেন।

কৃতিত্ব

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন: খলিফা হারুন-অর-রশীদ ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে একের পর এক অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। তিনি সাফল্যের সঙ্গে সেগুলো দমন করেন। হারুনের রাজত্বকালের শুরুতেই খারেজিরা যথারীতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তিনি ৭৮৭-৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মেসোপটেমিয়ার রাজধানী দখল করে তাদের দমন করেন। খলিফা ৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনাধ্যক্ষ হায়সামাকে উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা নিয়োগ করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে মুদারীয় এবং হিমারীয় গোত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে হারুনের সেনাপতি মুসা সিরিয়ায় এবং সেনাপতি দাউদ মুহাল্লাবী সিন্ধুতে তা দমন করেন। হারুন ৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে দাইলাম প্রদেশ ও ৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মসুলের বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য ইমাম মুসা আল কাজিমকে বন্দি করেন। হারুন ৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বর্বর খাজার উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করেন।

বৈদেশিক নীতি: হারুন-অর-রশীদের রাজত্বকালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু রাজা-বাদশাহ তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হন। তিনি চীনের সম্রাট ফাগফুর (Faghfur), ফ্রান্সের সম্রাট শার্লিমান (Charlemagne) এবং বাইজান্টাইন সম্রাট আইরিন ও নাইসিফোরাসের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তবে প্রথমোক্ত দুইজনের সাথে তার সম্পর্ক শান্তি ও সম্মানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও শেষোক্ত দুইজনের সাথে সম্পর্ক ছিল সংঘাত-সংঘর্ষে পরিপূর্ণ।

শাসনব্যবস্থা সংস্কার: খলিফা হারুন বিভিন্ন প্রদেশে যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। মুলার বলেন– "পারস্যের প্রথার ভিত্তিতে পৃথক বিভাগ (দিওয়ান), বিশেষভাবে সৈন্যবাহিনী, রাজস্ব ও আয়কর, ডাক এবং প্রদেশসমূহ নিয়ে একটি সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। নবম ও দশম শতাব্দীতে তা ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে থাকে।" হারুনের শাসনব্যবস্থা ইসলামি শরিয়তের মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হতো।

বাগদাদের সমৃদ্ধিকরণ: খলিফা হারুনের সময় বাগদাদ ঐশ্বর্যপূর্ণ ও সুষমামণ্ডিত এক নগরে পরিণত হয়। তখন আরবজগত তথা সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর ছিল বাগদাদ। পি. কে. হিট্টি বলেন, "ইতিহাস ও উপন্যাসে বর্ণিত বাগদাদের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলো হারুনের খিলাফতকালেই দেখতে পাওয়া যায়।"[১৭]

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা: খলিফা হারুনের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, সংগীত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানরা অসামান্য অবদান রাখেন। এই সময় ব্যাকরণবিদ আসমাই, চিকিৎসক জিব্রিল, অনুবাদক হাজ্জাজ, ঐতিহাসিক ওয়াকিদি, কবি আবু নোয়াস, পণ্ডিত আবদুল্লাহ, ঈসা প্রমুখের জ্ঞানচর্চায় বাগদাদ বিশ্বের অন্যতম সেরা জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়।

---

[১৭] History and legend unite in placing the most brilliant period of Baghdad during the caliphate of Harun-Al-Rashid (786-809). –Ref: P.K. Hitti, *Histroy of the Arabs*, p.301

জনকল্যাণে অবদান: প্রজারঞ্জক, জনদরদি এবং মহানুভব খলিফা হিসেবে হারুনের খ্যাতি ছিল। প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি রাতে ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। পি কে হিট্টির মতে, তিনিই সর্বপ্রথম আরব সাম্রাজ্যে হাসপাতাল নির্মাণ করেন। সে সময়ে সমগ্র রাজ্যে ৩৪টি হাসপাতাল ছিল।

ইতিহাসে স্মরণীয়: রূপকথার রাজা, ইসলাম ও আরব ইতিহাসের অত্যুজ্জ্বল চরিত্র খলিফা হারুন-অর-রশীদের সাড়ে তেইশ বছরের রাজত্বকাল (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) এশিয়ায় সারাসিনীয় শাসনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগের সাক্ষ্য বহন করে। ঐতিহাসিকেরা হারুন-অর-রশীদকে আব্বাসি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান খলিফা বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক খোদা বকশ্ বলেন, "খলিফাদের ইতিহাসে হারুন-অর-রশীদ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের এ উভয় ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।"[১৮] সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "ঐতিহাসিক সমালোচনার কষ্টিপাথরে হারুন-অর-রশীদকে যেভাবেই বিচার করা হোক না কেন, তিনি বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ও শাসকগণের অন্যতম বলে বিবেচিত হবেন।"[১৯] শান্তি, সংহতি ও ঐশ্বর্যে ভরা হারুনের খিলাফতকাল ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়। তার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য গৌরবের স্বর্ণশিখরে উন্নীত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক উইলিয়াম ম্যুর বলেন, "আব্বাসি গোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভবত হারুনই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। আবু জাফরের চরিত্রের নিষ্ঠুরতার দিক বাদ দিলে কেবল তাকেই হারুনের সাথে তুলনা করা যায়।"

বার্মাকিদের ধ্বংসসাধন: দীর্ঘ সতের বছর পরম নিষ্ঠা, অবিচল আনুগত্য ও আত্মত্যাগ এবং অসামান্য কর্মনৈপুণ্য দিয়ে বার্মাকি উজিররা আব্বাসি শাসনের শক্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ফজল বিন রাবির ব্যক্তিগত শত্রুতা ও উচ্চাভিলাষ, বার্মাকিদের অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্য, ষড়যন্ত্রের পর বার্মাকি জাফর কর্তৃক হারুনের বোন আব্বাসাকে গোপনে বিবাহ এবং নানা সন্দেহ ও লোকজনের নানারকম কথার প্রভাবে খলিফা হারুন বার্মাকিদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ হন। তিনি এর জেরে আকস্মিকভাবে জাফরের শিরশ্ছেদ করান। বৃদ্ধ ইয়াহহিয়া, ফজল, মুসা ও মুহাম্মদকে রাক্কায় কারারুদ্ধ করা হয়। তাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এভাবে খলিফা হারুন নিজের জন্য ঝুঁকি মনে করে বার্মাকিদের চরমভাবে দমন করেন। একদিক থেকে দেখলে এটি হারুনের কৃতিত্ব। কারণ তিনি তার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে পেরেছিলেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, "এভাবেই খালিদ বিন বার্মাকি প্রতিষ্ঠিত উজির পরিবারকে সমূলে বিনাশ করা হয়।"[২০] বার্মাকিদের নির্মূলের ঘটনা খলিফা হারুনের কৃতিত্বকে অনেকাংশেই ম্লান করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন আব্বাসি খলিফা দৈনিক ১০০০ দিরহাম দান করতেন?
২. খলিফা হারুনের স্ত্রী জুবাইদা কত খ্রিষ্টাব্দে 'নহর ই-জুবাইদা' খাল খনন করেন?
৩. কার সময়ে বাগদাদ সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়?
৪. কোন খলিফাকে 'রূপকথার রাজা' বলা হয়? */সকল বোর্ড ২০২৫; ২০১৭/*
৫. আব্বাসি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে?
৬. কোন ঘটনা খলিফা হারুনের কৃতিত্বকে ম্লান করে?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. খলিফা হারুন-অর-রশীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো একটি চার্টে উপস্থাপন করো।
২. খলিফা হারুন-অর-রশীদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বসমূহ চিহ্নিত করে একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[১৮] Both in the East and West, Harun-Ar-Rashid had acquired an indisputable primacy in the history of the Caliphs. –Ref: Khuda Baksh, *Politics in Islam*

[১৯] Weigh him as carefully as you like in the scale of historical criticism, Harun-Ar-Rashid will always take rank with the greatest sovereigns and rulers of the world. –Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.251

[২০] Thus the celebrated house founded by Khalid Al-Barmaki fell, never to rise again. –Ref : P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.296

পাঠ ১১

বার্মাকিদের পরিচয়, উত্থান ও পতন
Introduction, Rise and Fall of Barmakids

বার্মাকিদের পরিচয়

বার্মাকিরা ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। জার্মান ঐতিহাসিক গিলমানের (Carolyn Ives Gilman) মতে, বার্মাকি উজিরদের পূর্বপুরুষ জাফর বলখের বৌদ্ধমন্দিরের প্রধান পুরোহিত থাকায় তার উপাধি ছিল বার্মাক (Barmak)। এর অর্থ প্রধান বা নেতা। জাফর স্ত্রী ও পুত্র খালিদসহ ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিম কর্তৃক মধ্য এশিয়া বিজয়ের সময় যুদ্ধবন্দিরূপে ধরা পড়েন। পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করে মুক্তি পান। একপর্যায়ে জাফর পরিবার আব্বাসি আন্দোলনে যোগ দিয়ে আব্বাসি খলিফাদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে। আব্বাসি আন্দোলন থেকে শুরু করে এই বংশের প্রতিষ্ঠা, বিরোধীদের বিদ্রোহ দমন ও প্রশাসন পরিচালনায় বার্মাকিদের অবদান ছিল বিশাল। হারুন-অর-রশীদের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করায় বার্মাকিদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। দীর্ঘ সতেরো বছর (৭৮৭-৮০৩ খ্রি.) ধরে অবিচল আনুগত্য, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ এবং অসাধারণ কর্মনৈপুণ্যের নজির স্থাপন করেন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "একটানা সতেরো বছর বার্মাকি পরিবার বিশ্বস্ততা ও অসাধারণ দক্ষতা দ্বারা এই রাজবংশের সেবা করে গেছে।"[২১] কিন্তু বার্মাকি উজিরদের অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্যে সন্দিহান হয়ে খলিফা হারুন তার রাজত্বের শেষদিকে এই বংশের ধ্বংসসাধন করেন।

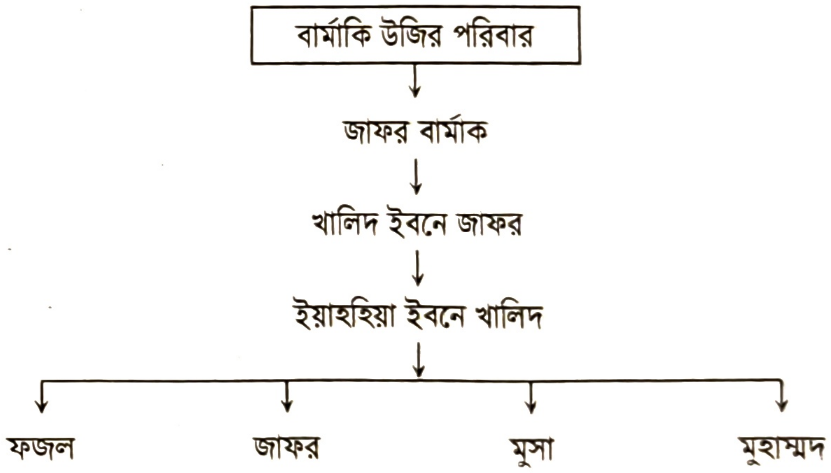

বার্মাকিদের উত্থান

আব্বাসি আন্দোলনে যোগদান ও খালিদের উচ্চ রাজপদ লাভ: জাফর বার্মাকির পুত্র খালিদ বার্মাক আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে তার কর্মদক্ষতা ও রণকুশলতার জন্য যথেষ্ট প্রভাব এবং খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি আবু মুসলিমের বাহিনীতে যোগদান করে আব্বাসিদের অভিযান এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহ (৭৫০-৭৫৪ খ্রি.) খালিদকে রাজস্ব বিভাগের প্রধান কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। খলিফা মনসুরের (৭৫৪-৭৫ খ্রি.) রাজত্বকালেও খালিদ স্বপদে বহাল ছিলেন। মনসুর তাকে মেসোপটেমিয়ার শাসনকর্তার পদে বসান। ৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সফলভাবে মসুলের শিয়া বিদ্রোহ দমন করায় খলিফা তাকে তাবারিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। খলিফা মাহদীর রাজত্বকালে (৭৭৫-৮৫ খ্রি.) খালিদ গ্রিক সম্রাজ্ঞী আইরিনকে দমনে যুবরাজ হারুনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। পুরস্কারস্বরূপ মাহদী তাকে উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন।

---

[২১] For seventeen years the family of Barmek had served the monarch with unswerving fidelity and extraordinary ability. –Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.243

বিখ্যাত বার্মাকি উজির পরিবারের সূচনা: খালিদ বিন জাফরের সুযোগ্যপুত্র ইয়াহহিয়ার সময় বিখ্যাত বার্মাকি উজির পরিবারের সূচনা হয়। খলিফা মনসুর ইয়াহহিয়াকে আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। খলিফা মাহদী তাকে পুত্র হারুনের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। হারুন শ্রদ্ধাভরে ইয়াহহিয়াকে 'পিতা' বলে সম্বোধন করতেন। ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মাহদীর মৃত্যুর পর আল-হাদী সিংহাসনে বসে পিতার মনোনয়নকে উপেক্ষা করে হারুনের স্থলে তার পুত্র জাফরকে মনোনীত করার চেষ্টা করলে রাজমাতা খায়জুরান এবং উপদেষ্টা ইয়াহহিয়া এর বিরোধিতা করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আল-হাদী ইয়াহহিয়াকে কারারুদ্ধ করেন। হারুন ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেই ইয়াহহিয়াকে মুক্তি দেন এবং প্রধান উজির (Wazir) পদে নিযুক্ত করেন। এভাবে বার্মাকি উজির পরিবারের সূচনা হয়। ইয়াহহিয়া প্রজার মঙ্গলের জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। তিনি খলিফাকে সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে রাজ্যশাসনে সহায়তা করেন। তবে ৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজমাতা খায়জুরানের মৃত্যুর পর ইয়াহহিয়া হতোদ্যম হয়ে পড়েন এবং অবসর গ্রহণ করেন।

উজিরপদে ফজল: ফজল ছিলেন ইয়াহহিয়ার চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তিনি ও তার ভাই জাফর, মুসা ও মুহাম্মদ যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আব্বাসি খিলাফতের সেবা করেন এবং এর গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ইয়াহহিয়ার অবসর গ্রহণের পর তার পুত্র বাল্যবন্ধু ফজলকে ৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে উজিরের পদ দান করেন হারুন। ইতোপূর্বে ফজল খোরাসান ও মিসরে যোগ্যতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি দাইলামে আলি (রা)-এর বংশধর ইয়াহহিয়া বিন আবদুল্লাহর বিদ্রোহ দমন করে খলিফার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন।

বার্মাকিদের স্বর্ণযুগ: বার্মাকি বংশ জাফর বিন ইয়াহহিয়ার শাসনকালে স্বর্ণযুগে উপনীত হয়। জাফরের নেতৃত্বে আব্বাসি সাম্রাজ্যে বার্মাকি বংশ অসীম ক্ষমতা লাভ করে। তারা শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য ও জনকল্যাণকর কার্যক্রমের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। জাফর সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালীন বিবদমান হিমারীয় ও মুদারীয় গোত্রের কলহ দমনের চেষ্টা চালান। পরবর্তীকালে তিনি প্রধান উজিরের পদ অলঙ্কৃত করেন।

বার্মাকিদের পতন

বার্মাকিরা দীর্ঘ সতেরো বছর দ্বিধাহীন আনুগত্যের সাথে কঠোর পরিশ্রম করে আব্বাসি সাম্রাজ্যকে সমৃদ্ধি ও উন্নতির শীর্ষে পৌছে দেন। তাদের আকস্মিক পতন ইসলামের ইতিহাসে একটি করুণ ঘটনা।

বার্মাকিদের পতনের কারণ: পারস্যবাসী (অর্থাৎ অনারব) বার্মাকি বংশ হারুনের খিলাফতে প্রধান উজিরের পদে অধিষ্ঠিত হলে আরব আমিররা তাদের প্রভাব হারাতে থাকেন। অন্যদিকে ফজল বিন রাবীর ব্যক্তিগত শত্রুতা ও উচ্চাভিলাষ, বার্মাকিদের অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্য, প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পর বার্মাকি জাফরের হারুন-অর-রশীদের বোন আব্বাসাকে গোপনে বিয়ে করা এবং লোকজনের নানারকম কথার প্রভাবে খলিফা হারুন বার্মাকিদের প্রতি অসন্তুষ্ট ও সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন। এটিই তাদের পতনের সূচনা করে।

জেনে রাখো

'শিয়া' আরবি শব্দ। এর অর্থ দল, সমর্থক, অনুসারী প্রভৃতি। ইসলামের ইতিহাসে 'শিয়া' বলতে মহানবি (স)-এর জামাতা আলি (রা)-এর সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত দলকে বোঝায়। অর্থাৎ 'শিয়া' হচ্ছে সেই গোষ্ঠী যারা মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলি (রা)-কে খিলাফতের একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী বলে মনে করে। তারা ইমামতে বিশ্বাসী। তারা মনে করে, ইমাম স্বর্গীয়ভাবে নিয়োগকৃত।

বার্মাকিরা ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। তাই সুন্নি আব্বাসিদের দরবার ও খিলাফতে তাদের বিপুল প্রতিপত্তি সাম্রাজ্যের সুন্নি অভিজাতদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাই তারা বার্মাকিদের ধ্বংসসাধনে নানাভাবে খলিফাকে প্রভাবিত করেন। এ প্রসঙ্গে গৃহাধ্যক্ষ ফজল বিন রাবির ব্যক্তিগত আক্রোশের কথাও বলা যেতে পারে। বলা হয় যে, ফজল নিজে প্রধান উজির হওয়ার প্রত্যাশায় বার্মাকিদের বিরুদ্ধে খলিফাকে উসকে দেন। তিনি বার্মাকিদের সাথে আলি (রা) বংশীয়দের সম্পর্কের কথা বলে খলিফাকে উত্তেজিত করেন। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন, 'বার্মাকিদের সুখ্যাতি ও বিপুল ধনসম্পদ তাদের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রয়োজনের সময় খলিফাকেও তাদের মুখাপেক্ষী হতে হতো।'

উল্লিখিত কারণগুলো বার্মাকিদের সম্পর্কে খলিফা হারুনের মনে চরম ঈর্ষা ও সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "তিনি অবিরত অপবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সন্দেহের অন্ধ রোষ ও স্বৈরশাসকসুলভ ক্রোধবশে বহুপুরুষের বিশ্বস্ত সেবার কথা ভুলে গেলেন।"[২২] জাফরের শিরশ্ছেদ করা হয়। বৃদ্ধ ইয়াহহিয়া, ফজল, মুসা ও মুহাম্মদকে রাক্কায় কারারুদ্ধ করা হয়। তাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহহিয়া এবং ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফজল কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে তাদের পতন দেখে পি কে হিট্টি বলেন, "এভাবেই খালিদ বিন বার্মাক প্রতিষ্ঠিত উজির পরিবারের চিরতরে পতন ঘটে।"[২৩]

বার্মাকিদের অবদান: আব্বাসি বংশের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে এ বংশের সুদৃঢ় অবস্থান তৈরিতে বার্মাকি উজিররা অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা খালিদ বার্মাকি আব্বাসি বংশ প্রতিষ্ঠায় আবু মুসলিমের সহকারী হিসেবে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এরপর খালিদ আব্বাসিদের রাজস্ব বিভাগের সংস্কার সাধন করে এ শাসক বংশের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করেছিলেন। খলিফা আল-মনসুরের সময় খালিদ আল-মানসুরিয়া শহরের সমৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিলেন। খালিদ গ্রিক সম্রাজ্ঞী আইরিনের বিরুদ্ধে খলিফা হারুনকে সাহায্য করেন। খালিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াহহিয়া খলিফা হারুনের রাজত্বকালে প্রজাদের উন্নতি বিধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ইয়াহহিয়ার চার পুত্র ফজল, জাফর, মুসা ও মুহাম্মদ আব্বাসি খিলাফতের সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছিলেন। বার্মাকি উজিরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও দানে সাম্রাজ্যে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, খাল, নালা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মিত হয়। বার্মাকিরা শিল্পকলা ও সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। উজির জাফরের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ঐতিহাসিকরা তাকে 'আহল আল-কালাম' বা 'লেখকগোষ্ঠীর জনক' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? *[ঢা. বো.,দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]*

২. বার্মাকিরা কোন মতাবলম্বী ছিল?

৩. বার্মাক অর্থ কী? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]*

৪. কার নেতৃত্বে আব্বাসি সাম্রাজ্যে বার্মাকি বংশ অসীম ক্ষমতা লাভ করে?

৫. হারুন-অর-রশীদের বোন আব্বাসাকে গোপনে বিয়ে করেন কে?

৬. 'আহল আল-কালাম' বা 'লেখকগোষ্ঠীর জনক' বলা হয় কাকে?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. বার্মাকি উজির পরিবারের সদস্যদের নামের একটি চার্ট তৈরি করো।

২. আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও এর সমৃদ্ধি অর্জনে বার্মাকি উজির পরিবারের অবদানের একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[২২] The faithful services of generations were forgotten in the blind fury of suspicion and despotic anger, influenced by persistent calumny. –Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracens,* p.245

[২৩] Thus the celebrated house founded by Khalid Al-Barmaki fell, never to rise again. –Ref : P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p.296

পাঠ ১২

খলিফা আমিন এবং মামুনের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ
The Civil War Between Khalifa Amin and Mamun

ভবিষ্যতে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে উত্তরাধিকারের সংঘাত এড়ানোর জন্য খলিফা হারুন-অর-রশীদ বেঁচে থাকতেই পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্যের বিলিব্যবস্থা-সংক্রান্ত একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। চুক্তিপত্রটি পবিত্র কাবাগৃহে সংরক্ষণ করা হয়। তবে তার এ সতর্ক পদক্ষেপ আব্বাসি খিলাফতকে সংঘাতের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। খলিফার ইন্তেকালের পর তার নির্দেশনামতে পুত্র আল-আমিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথমদিকে ভাইয়েরা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও অচিরেই তাদের মধ্যে, বিশেষ করে আমীন ও মামুনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় যা, শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়।

গৃহযুদ্ধের কারণ

উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতির অভাব: এক বা একাধিক উত্তরাধিকারী মনোনয়নের প্রথা আব্বাসি যুগে বিভেদ ও জটিলতার সৃষ্টি করে। খলিফা হারুন ৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে স্ত্রী জুবাইদা ও তার ভাই ঈসা ইবন জাফরের প্ররোচনায় তার পাঁচ বছর বয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদকে 'আল-আমিন' (বিশ্বাসী) এবং ৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তার জ্যেষ্ঠপুত্র আব্দুল্লাহকে 'আল-মামুন' (বিশ্বস্ত) উপাধি প্রদান করেন এবং তৃতীয় পুত্র কাশিমকে মুতামিন (যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে) উপাধি দিয়ে দিয়ে পরপর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্য খলিফা হারুন তার জীবদ্দশাতেই এই তিন পুত্রের অধীনে সাম্রাজ্যকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করেন। গিলমান বলেন, "তার বিভেদ দূরীকরণের পরিকল্পনা বিভেদকেই ত্বরান্বিত করে।" পি. কে. হিট্টি বলেন, "আল-আমিনের হত্যার মধ্য দিয়েই এ তিক্ত দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটে।"[২৪]

আমিন কর্তৃক মামুনের সেনাবাহিনী ও অর্থ আত্মসাৎ: ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হারুন বিদ্রোহ দমনের জন্য পূর্বাঞ্চলে গিয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তার সাথে থাকা ধনসম্পদ ও সৈন্যবাহিনী মামুনকে অর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মামুনের বৈমাত্রেয় ভাই আমিন খিলাফত লাভ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে ঐ অর্থসম্পদ ও সেনাবাহিনীকে নিজের হস্তগত করেন।

চরিত্রগত পার্থক্য: বৈমাত্রেয় ভাই হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আমিন ও মামুনের মধ্যে কিছুটা চরিত্রগত পার্থক্য ছিল। আমিন ছিলেন ভোগবিলাসপ্রিয় ও চঞ্চল স্বভাবের। অন্যদিকে মামুন ছিলেন কর্মঠ ও সবার কাছে প্রিয়। তারা দুজনে একই ধরনের শিক্ষা লাভ করলেও বাস্তবজীবনে ঐ শিক্ষা দুই ভাইয়ের ওপর আলাদা ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "মামুনের গ্রহণেচ্ছু মন সব শিক্ষাকে আয়ত্ত করে মনে স্থান দিত; অন্যদিকে আমিনের চঞ্চল ও আমোদপ্রিয় বাহ্যিক চাকচিক্যময় চরিত্রে এর কোনো প্রভাব পড়ত না।"[২৫]

আমিনের আমোদপ্রিয়তা ও রাজকার্যে অবহেলা: পুঁথিগত বিদ্যার্জনের ফলে আমিন হয়ে ওঠেন শাসনকাজের অযোগ্য। এছাড়া তিনি ছিলেন দায়িত্বহীন ও বিলাসপ্রিয়। সিংহাসনে বসেও তিনি মদ পানের অভ্যাস ও লোভ-লালসা ত্যাগ করতে পারেননি। উজির ফজল বিন রাবির ওপর শাসনভার ছেড়ে দিয়ে তিনি নৃত্য এবং নৌবিহারে মেতে থাকতেন। অপরদিকে প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত মামুন তার প্রদেশে বিবেচনাপূর্ণ ও উদার শাসন প্রবর্তন করে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

আরব ও পারসিক আমিরদের দ্বন্দ্ব: পিতা হারুন এবং মাতা জুবাইদার দিক থেকে আমিন ছিলেন খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত। অন্যদিকে মামুনের মাতা ছিলেন পারস্যবাসী ক্রীতদাসী মারাজিল। পারস্যবাসীরা তাই মামুনকে 'ভাগ্নে' হিসেবে সমর্থন করত। ফলে দুই ভাইয়ের রক্তকে কেন্দ্র করে আরব ও পারসিক আমিররা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন এবং দ্বন্দ্বে ইন্ধন জোগাতে থাকেন। ঐতিহাসিক পি কে হিট্টির মতে, "এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব পরিশেষে নবদীক্ষিত মুসলমানদের, বিশেষ করে স্বকীয় জাতীয়তাবোধ ও কৃষ্টিসম্পন্ন পারস্যবাসীর সাথে আরবীয় মুসলমানদের সংঘাত অনিবার্য করে তোলে।"[২৬]

---

[২৪] ...After a bitter struggle which ended in the assassination of al-Amin. –Ref : P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.318

[২৫] Mamun's receptive mind imbibed and assimilated knowledge that was imported to him, it had no effect on the volatile and pleasure loving character of Amin. –Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.255

[২৬] Ref : P. K. Hitti, *History of the Arabs*

ফজল বিন রাবির স্বার্থপরতা ও খিলাফত দখলের বাসনা: আমিনের উজির উচ্চাভিলাষী রাবি বুঝতে পারেন যে, দুর্বল চরিত্রের আমিনের ক্ষমতায় থাকার অর্থ হলো সর্বময় ক্ষমতা তার হাতে থাকা। রাবি তাই যে কোনোভাবেই আমিনকে খিলাফতে অধিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করতেন। পক্ষান্তরে ফজল ইবন সহল পারস্যবাসী আমিরদের নেতৃত্ব দান করে তাদের 'ভাগ্নে' মামুনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস চালান।

আমিন কর্তৃক মামুনের পদচ্যুতি ও পিতার মনোনয়ন লঙ্ঘন: মামুনের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কুচক্রী রাব্বি এবং আলী বিন ঈসা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এ অবস্থায় তাদের কুমন্ত্রণায় খলিফা আমিন মামুনকে বাগদাদে ডেকে পাঠান। কিন্তু মামুন তার প্রদেশ খোরাসানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার যুক্তি দিয়ে মার্ভ ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। খলিফার আদেশ অমান্য করায় মামুনকে খোরাসানের শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণের আদেশ জারি করা হয়। মামুন যাতে কখনই খিলাফত লাভ করতে না পারেন সে জন্য রাব্বির পরামর্শে আমিন পিতার মনোনয়ন লঙ্ঘন করে মামুনকে বাদ দিয়ে নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র মুসাকে 'নাতিক বিল.হক' এবং দ্বিতীয় পুত্রকে 'কায়িস বিল হক' উপাধি দান করে পরপর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। ফলে আমিন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

গৃহযুদ্ধের ঘটনা

বিরোধ চরমে ওঠার পর ৮১২ খ্রিষ্টাব্দে আমিন ও মামুনের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। খলিফা আমিন আলী ইবন ঈসার নেতৃত্বে ৫০,০০০ সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী রায়ের (প্রাচীন রাজেস) দিকে পাঠালে মামুনের সেনাপতি তাহির বিন হোসাইন তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। যুদ্ধে আলী ইবনে ঈসা নিহত হলে খলিফা আমিন সেনাপতি আবদুর রহমানের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বাহিনী প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান ও কাতিয়ার ইবন কাদিয়ার নেতৃত্বে প্রেরিত আমিনের দু'টি বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন মামুনের সেনাধ্যক্ষ তাহির। এর মধ্যে মামুনের প্রধান সেনাপতি হারসামা মার্ভ থেকে বিশাল পারসিক বাহিনী নিয়ে হুলওয়ানে ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং তাহিরকে আহওয়াজ এবং সুসার দিকে পাঠান। এ পরিস্থিতিতে মামুন 'আমীরুল মুমেনীন' (বিশ্বস্তদের নেতা) উপাধি গ্রহণ করেন (৮১২ খ্রি.) এবং সমগ্র পারস্যবাসী তাকে খলিফা বলে স্বীকার করে নেয়। মামুনের বাগদাদ অবরোধ অবশ্যম্ভাবী দেখে সে বছরই আমিনের সেনাপতি হোসাইন বিন আলী ইবন ঈসা বিশ্বাসঘাতকতা করে সিরীয় সৈন্যদের প্ররোচিত করে বাগদাদ দখল করেন। অন্যদিকে মামুনের সেনাপতিরা সমগ্র আব্বাসি সাম্রাজ্য তাদের করায়ত্ত করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। সেনাপতি তাহির দজলা নদীর পূর্বাঞ্চল অধিকার করে আহওয়াজে প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। এরপর তিনি ইয়েমেন (ইয়ামামা), বাহরাইন, ওমান এবং উত্তরে ওয়াসিত অধিকার করে মামুনের অবস্থানকে সুসংহত করেন। নিরুপায় হয়ে আমিন মা জুবাইদা ও পরিবার-পরিজনসহ ফোরাত নদীর পশ্চিমে মনসুর নির্মিত মদিনা-আল-মনসুর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন আমিনের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেওয়া হলে ভাইয়ের ওপর পূর্ণ আস্থা থাকায় তিনি এতে রাজি হন। কিন্তু একদল উগ্রপন্থি পারসিক রাতের অন্ধকারে আমিনের মাথা কেটে তাকে হত্যা করে। ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদে মামুন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তিনি হত্যাকারীদের তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা করেন এবং আমিনের পরিবারের জন্য রাজকীয় বন্দোবস্ত করেন।

গৃহযুদ্ধের ফলাফল

আমিন ও মামুনের মধ্যকার গৃহযুদ্ধের ফলে ইসলামের ইতিহাসে আরব প্রাধান্য তথা আরব জাতীয়তাবাদের বিলুপ্তি ঘটে। আব্বাসি খিলাফতে আরবি ভাষা ও তাদের ইসলাম ধর্মই কেবল বেঁচে থাকে। প্রশাসনের সর্বত্র পারসিক চিন্তা-চেতনা ও রীতি-নীতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এস এম ইমামুদ্দীন বলেন, "উমাইয়াদের ক্ষমতাচ্যুতির ফলে আরবদের ওপর পারসিকরা আংশিক বিজয়লাভ করে; কিন্তু আমিনের ওপর মামুনের প্রভুত্ব বিস্তার আরবদের ওপর তাদের সম্পূর্ণ বিজয় সূচিত করে।"[২৭] অন্যদিকে মামুনের এ জয়ের মধ্য দিয়ে বাগদাদ শিক্ষা-সংস্কৃতির এক তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয়।

---

[২৭] Ref : S.M. Imamuddin, *A Political History of the Muslims*, Vol-II

খলিফা মামুনের সফলতার কারণ

মামুনের উন্নত চরিত্র: আব্বাসি খলিফা মামুন ছিলেন অসাধারণ চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন মার্জিত ও রুচিশীল। মানুষ ও শাসক হিসেবে ছিলেন সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও আদর্শবান। মামুন সুশাসনের মাধ্যমে প্রজাদের জন্যকল্যাণ ও সুখ বয়ে এনেছিলেন। তার অনেক জনসমর্থন ছিল। এগুলো যুদ্ধে মামুনকে সাফল্য এনে দিয়েছিল।

আমিনের সমর্থকদের অযোগ্যতা ও স্বার্থপরতা: খলিফা আল-মামুনের উজির ফজল বিন সাহল এবং সেনাপতি তাহির বিন হুসাইন ছিলেন সুদক্ষ ও রণকুশলী। অপরদিকে আমিনের উজির ফজল বিন রাবি এবং সেনাপতি আলী ইবন ঈসা ছিলেন অযোগ্য ও অদূরদশী। তারা মূলত অর্থের বিনিময়ে আমিনের পক্ষ নেন। ফলে দায়সারাভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু মামুনের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা তাকে 'ভাগ্নে' বলে বিবেচনা করে এবং নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করেন। ফলে আমিনের পরাজয় ঘটে।

পারসিকদের সহযোগিতা: আমিন ও মামুনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তা পারসিক ও আরবদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা এক পর্যায়ে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। মামুন তার মায়ের দিক থেকে অর্থাৎ পারসিকদের পূর্ণ সাহায্য পান। আরব শিয়া মুসলিমরাও তার পাশে এসে দাঁড়ায়। ফলে আমিনের বিরুদ্ধে মামুন সহজে জয়লাভ করেন।

ন্যায়ের বিজয়: আমিন ছিলেন অযোগ্য। তিনি নানা ধরনের অন্যায় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকতেন। তার তুলনায় মামুন অধিক সৎ, যোগ্য, কর্মঠ, জ্ঞানী ও প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। ফলে গৃহযুদ্ধে তার বিজয় সূচিত হয়।

খলিফা আমিনের ব্যর্থতার কারণ

আমিনের কুশাসন ও চরিত্রের দুর্বলতা: আমিনের পতনের জন্য তার ব্যক্তিগত চরিত্রই অনেকাংশে দায়ী। তিনি রাজকাজের চেয়ে হেরেম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বেশি। প্রায়ই মদের ঘোরে বিভোর হয়ে থাকতেন। ফলে তার উজির ফজল বিন রাবি রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তার কুশাসনে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

সুন্নি সম্প্রদায়ের অসহযোগিতা: আমিন ছিলেন অসৎ, অযোগ্য ও হেরেমপ্রিয় শাসক। কুশাসন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য তিনি আরবদের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হন। আমিনের অনৈসলামিক কার্যকলাপের কারণে সুন্নি মুসলিমরাও তাকে ত্যাগ করে। ফলে পারসিক শক্তিতে উজ্জীবিত মামুনের কাছে তার পরাজয় ঘটে।

অদূরদর্শিতা: আমিন ভালোভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার চেয়ে আমোদ-প্রমোদকে তিনি বেশি প্রাধান্য দিতেন। শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার উদ্যোগ নেওয়ার মতো বিচক্ষণতা আমিনের ছিল না। ফলে তার পরাজয় ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খলিফা হারুন-অর রশীদ কত খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন?
২. 'আল-মামুন' শব্দের অর্থ কী?
৩. খলিফা আল-মামুনের মাতা কে ছিলেন?
৪. কত খ্রিষ্টাব্দে আমিন ও মামুনের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়?
৫. কারা খলিফা আমিনকে হত্যা করে?
৬. আমিন ও মামুনের মধ্যকার গৃহযুদ্ধে কে জয় লাভ করেন?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. খলিফা আমিন ও মামুনের মধ্যকার গৃহযুদ্ধের কারণগুলো চিহ্নিত করে পয়েন্ট আকারে লেখো।
২. গৃহযুদ্ধে খলিফা আল-মামুনের সফলতার কারণগুলো ছক আকারে লেখো।

পাঠ ১৩

খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন: শাসন নীতি, বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) [Khalifa Abdullah Al-Mamun: Administrative Policy, Foundation of Baitul Hikmah and Practice of Wisdom (813-833 AD)]

খলিফা আল-মামুনের ক্ষমতা গ্রহণ ও শাসন নীতি

ভাইয়ের সঙ্গো সংঘাতে জয়লাভ করে আবদুল্লাহ আল-মামুন ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি সিংহাসনে আরোহণ করেন। আব্বাসি খলিফাদের মধ্যে মামুন ছিলেন অন্যতম বিদ্বান। ক্ষমতা উপভোগের চেয়ে জ্ঞানচর্চায় তার আগ্রহ বেশি ছিল। মামুন সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথম ৬ বছর (৮১৩-৮১৯ খ্রি.) প্রধানমন্ত্রী ফজল বিন সাহলের ওপর শাসনভার দিয়ে খোরাসানের রাজধানী মার্ভে দর্শনবিদ্যাসহ জ্ঞানচর্চায় রত থাকেন। রাজধানীতে খলিফার অনুপস্থিতি এবং প্রধানমন্ত্রী ফজলের অদক্ষ শাসনে সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। ইরাকে মুহাম্মদ বিন তাবাতাবা, মক্কায় ইবনে সাদেক ও ইয়েমেনে ইব্রাহিম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী ফজল এসব বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন। এমনকি বাগদাদে বিদ্রোহীরা খলিফা মামুনের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে মনসুর বিন মাহদীকে এবং মক্কায় আলি বংশীয়রা ইবরাহিম বিন মাহদীকে খলিফারূপে বরণ করে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে খলিফা মামুন মার্ভ থেকে রাজধানীতে ফিরে এসে আবার নিজের হাতে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যের সুশাসনের উদ্দেশ্যে তিনি সেনাপতি তাহিরকে খোরাসান এবং তাহিরের পুত্র আবদুল্লাহকে সিরিয়া ও মিসরের প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ করেন। খলিফার সময়োচিত পদক্ষেপে বাগদাদে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্নর আবদুল্লাহ বিন তাহির বিদ্রোহী নসর উকায়লীকে পরাজিত করে মেসোপটেমিয়া এবং মিসরের বিদ্রোহের অবসান ঘটান। আবদুল্লাহ আব্দুর রহমানের নেতৃত্বাধীন খারেজি বিদ্রোহীদের দমন করে খোরাসানে এবং ইব্রাহিমকে পরাজিত করে ইয়েমেনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বাঞ্চলে খলিফা মামুনের নিযুক্ত শাসনকর্তা তাহির ৮২১ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে একরকম স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে থাকেন। তিনি সেখানে একটি নতুন রাজবংশের ধারাও প্রবর্তন করেন যা তার নামানুসারে 'তাহেরি বংশ' নামে পরিচিতি লাভ করে। খলিফা মামুনের রাজত্বকালে বাবেক যুররাসী নামে এক দস্যু সর্দার রাজ্যের উত্তরে মাজেন্দ্রান, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ায় ব্যাপক লুটতরাজ শুরু করে। বাবেক একপর্যায়ে রোমান সম্রাট থিউফিলাসের সাথে জোট বেঁধে আব্বাসিবিরোধী তৎপরতা শুরু করলে খলিফা স্বয়ং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মামুনের কাছে পরাজিত হয়ে রোমান সম্রাট সন্ধি সম্পাদনে বাধ্য হন। মামুনের সময় আব্বাসিরা ভূমধ্যসাগরের সিসিলি ও ক্রিট দ্বীপ জয় করে। অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলে আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত আব্বাসি আধিপত্য সম্প্রসারিত হয়।

বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা

বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা: খলিফা মামুনের নির্মিত বায়তুল হিকমাহ (জ্ঞানগৃহ) আব্বাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। বৃহৎ পরিসরে উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য তিনি ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে এ জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞানচর্চার জন্য মামুন বায়তুল হিকমাহতে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ ব্যুরো এই তিনটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করেন। হুনাইন-ইবন-ইসহাককে এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বায়তুল হিকমাহকে "ইসলামের প্রথম উন্নত উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করেন।"[২৮]

অনুবাদ কার্যাবলি: খলিফা মামুন বায়তুল হিকমাহর অনুবাদ দপ্তরে গ্রিক, সিরীয়, পারসিক, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ সংগ্রহ করে সেগুলো আরবিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এ সময় যেসব লেখকের গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয় তার মধ্যে ছিলেন প্লেটো, এরিস্টটল, লিউক, কোস্টার, গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি প্রমুখ। এ ছাড়া মানকাহ ও দুবান নামক পণ্ডিতের ওপর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার পুস্তক এবং ঈসা বিন ইয়াহহিয়া, মুসা বিন খালিদের ওপর বিভিন্ন পারসিক আকর গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদের ভার দেন।

---

[২৮] The first prominent institution for higher learning in Islam. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.410

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা: শিক্ষার বিস্তারের জন্য খলিফা মামুন বাগদাদে একটি মহাবিদ্যালয় (কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ সকলের জন্য উন্মুক্ত করে তিনি শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখেন। কলেজটির ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ও লা-খারাজ সম্পত্তি দান করেন।

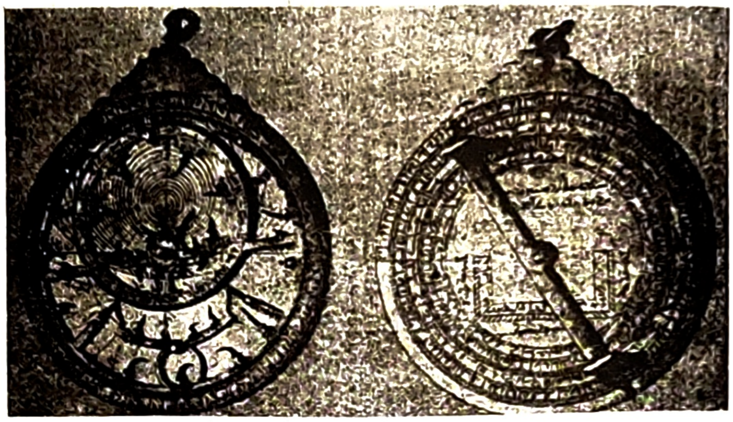

জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত প্রাচীন যন্ত্র

সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা: মামুনের খিলাফত সারাসিনীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। যথার্থভাবেই একে 'Augustan Age of Islam' বলা হয়েছে। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "তার বিশ বছরব্যাপী শাসনকাল, চিন্তাধারার প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্ধিত স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে।"[২৯]

জ্যোতির্বিদ্যায় অবদান: আব্বাসি শাসনামলে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণার জন্য মামুন তাদমীরে শামসিয়া নামক স্থানে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সিন্ধ-বিন-আলী, খালিদ-বিন-আব্দুল মালিক, ইয়াহইয়া-বিন-আল-মনসুর মামুনের সময় স্বনামধন্য জ্যোতির্বিদ ছিলেন।

গণিতশাস্ত্রের উন্নতিতে অবদান: খলিফা মামুনের শাসনামলে গণিতশাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি নিজে একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন। এ সময়কার বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ছিলেন 'হিসাবুল-জবর-ওয়াল মুকাবালাহ' গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মদ-বিন-মুসা আল-খাওয়ারিজমি (৭৮০-৮৫০ খ্রি.)। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থটি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিতে অবদান: খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময় রসায়নশাস্ত্রেরও ব্যাপক সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। পি. কে. হিট্টি বলেন, "আরবরা মেটেরিয়া মেডিকা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের পরে রসায়নশাস্ত্রেই সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে।"[৩০] ইউহান্না-বিন-মোসাওয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.) ছিলেন খলিফা মামুনের দরবারের শ্রেষ্ঠ রসায়ন শাস্ত্রবিদ। রসায়নশাস্ত্রে বিখ্যাত জারীর ভস্মীকরণ (Calcination) ও লঘুকরণ (Reduction) সূত্র দুটি তিনিই আবিষ্কার করেন। এ যুগে ইউহান্না-বিন-মোসাওয়াহ প্রণীত 'দাখালউল আইন' গ্রন্থটি ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম আরবি পুস্তক। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান অনুবাদক ছিলেন হুনাইন-ইবন-ইসহাক।

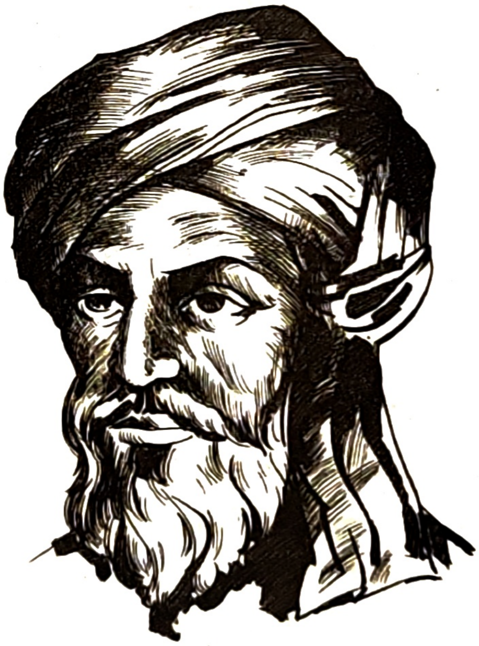

মুসা আল খাওয়ারিজমি

ভূগোলশাস্ত্রের উন্নতিতে অবদান: খলিফা মামুনের সময় আল-খাওয়ারিজমি 'সুরাতুল আরদ' নামে প্রাচীনতম ভৌগোলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ৬৯ জন বিশেষজ্ঞের সহায়তায় পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানচিত্র অঙ্কন করেন। মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় আবুল হাসান নামের একজন বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও নৌকম্পাস তৈরি করেন।

---

[২৯] The twenty years of his reign have left enduring monuments of the intellectual development of the Muslims in all directions of thought. –Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.274

[৩০] After materia medica, astronomy and mathematics, the Arabs made their greatest scientific contribution in chemistry. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.380

ইতিহাসশাস্ত্র ও সাহিত্যে অবদান: খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় আল-ওয়াকিদী 'মাগাযী' এবং ইবনে সাদ 'তাবাকাত' নামের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। হিশাম আল কালবী (৮১৯ খ্রি.), আলী বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ মাদায়েনী প্রখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা ছিলেন। মামুনের রাজসভার কবি আব্বাস তখনকার ফারসি ভাষার একজন প্রধান কবি ছিলেন। কবি আল-আতাহিয়া ধর্মীয় কবিতা রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

দর্শনশাস্ত্রের উন্নতিতে অবদান: আব্বাসি যুগে দর্শন ও অধিবিদ্যার ব্যাপক চর্চা হয়। দার্শনিক আল-কিন্দি (৮১৩-৮৭৩ খ্রি.) খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি 'এরিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব' আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং মুসলিম দর্শনের সাথে প্লেটো ও এরিস্টটলের মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। আল-কিন্দি ২৬১টি দর্শন গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। খলিফা আল-মামুন যুক্তিবাদী মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

সিহাহ-সিত্তাহ সংকলনে অবদান: সিহাহ-সিত্তাহ বা ছয়টি নির্ভুল হাদিস গ্রন্থ আব্বাসি যুগেই প্রণীত হয়েছিল। পারস্যবাসী ইমাম বুখারি (৮১০-৮৭০ খ্রি.) খলিফা মামুনের রাজত্বকালে 'বুখারি শরিফ' প্রণয়ন করেন। ইমাম বুখারি ১৬ বছর ধরে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ৬০ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে ৭২৭৫টি হাদিসকে তিনি নির্ভুল বলে গ্রহণ করে তার গ্রন্থে সংকলন করেন।

কাগজের কারখানা স্থাপন: খলিফা হারুন-অর-রশীদের সময় ৭৯৪-৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে প্রথম কাগজ কারখানা স্থাপিত হয়। মামুনের সময় চীনাদের সাহায্যে বাগদাদে নতুন নতুন কাগজের কারখানা স্থাপন করা হয়। কাগজ ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা অসম্ভব- এ উপলব্ধি থেকেই তা করা হয়।

হস্তলিপি শিল্পের উন্নয়ন: আল মামুনের সময় হস্তলিপি শিল্পেরও বিকাশ ঘটে। তার সময় ইমাম হাম্বলির বাণীগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য এ শিল্পের চর্চা শুরু হয়। আর রায়হানি ছিলেন মামুনের দরবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হস্তলিপিবিশারদ। তিনি একটি বিশেষ ধরনের লিপিকলা উদ্ভাবন করেছিলেন, যা তার নামানুসারে 'রায়হানি নামে' পরিচিত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আবদুল্লাহ আল-মামুন কত খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি সিংহাসনে আরোহণ করেন?
২. খলিফা মামুন কাকে তার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন?
৩. বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা করেন কে? */সকল বোর্ড ২০১৫/*
৪. কত খ্রিষ্টাব্দে বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়?
৫. কাকে বায়তুল হিকমার মহাপরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়?
৬. 'হিসাবুল-জবর-ওয়াল মুকাবালাহ' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. বায়তুল হিকমাহর কাজগুলো চিহ্নিত করে ছক আকারে লেখো।
২. শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে খলিফা আল-মামুনের কৃতিত্বের একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ১৪

খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের চরিত্র ও কৃতিত্ব
Character and Achievements of Khalifa Abdullah Al-Mamun

চরিত্র

খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন আবু জাফর কুনিয়াত ছিলেন পারসিক মাতা মারাজিলের সন্তান। তিনি ছিলেন সুঠামদেহী, সুশ্রী এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারার অধিকারী। বিনয়ী, কর্মঠ মামুন সবার কাছে প্রিয় ছিলেন। প্রাথমিক জীবনে তিনি রাজগৃহের উজির ইয়াহইয়ার কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামরিক শিক্ষালাভ করেন। তিনি ব্যাকরণবিদ খলিল বসরি, ধর্মতত্ত্ববিদ ও ফকিহ ইমাম মালিক এবং সমকালীন বিখ্যাত সাহিত্যিকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেন। শান্ত ও সংযত স্বভাবের খলিফা আল মামুন ন্যায়নিষ্ঠ ও মহানুভব শাসক ছিলেন। মামুন নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন এবং রমজান মাসে রোজা পালনের পাশাপাশি তেত্রিশবার পবিত্র কুরআন খতম করতেন।

কৃতিত্ব

খলিফা আল-মামুন আরবের আব্বাসি বংশ, এমনকি সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। একজন প্রতিভাবান শাসক হিসেবে তিনি আব্বাসি রাজবংশের ঐতিহ্য রক্ষা করেন ও এর সীমানা বৃদ্ধি করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আল-মামুন আব্বাসি খিলাফতকে গৌরবের এক অনন্য চূড়ায় উন্নীত করেন।

বিদ্রোহ দমন: খলিফা আমিনের করুণ মৃত্যুর (৮১৩ খ্রি.) অল্পকাল পরে উমাইয়া বংশোদ্ভূত নসর-বিন-শাবাস নামের উকাইল গোষ্ঠীর এক ব্যক্তি আমিনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে মামুনের বিরুদ্ধে মেসোপটেমিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মামুন তাকে দমন করতে সেনাপতি তাহিরকে পাঠান। কিন্তু তাহির নসরের কাছে পরাজিত হন। এরপর নসর দীর্ঘ পাঁচ বছর রাজকীয় বাহিনীর সাথে বিরোধ চালিয়ে যাওয়ার পর সেনাপতি হাসানের কাছে পরাস্ত হন। তবে তাকে বন্দি করা সম্ভব হয়নি। এরপর সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্রোহের সুযোগে ইবনে তাবাতাবা (Tabataba) নামে হযরত আলীর (রা) জনৈক বংশধর কুফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবু সায়রা নামের জনৈক দস্যু তাকে সাহায্য করে। কিন্তু সায়রা ক্ষমতালোভে তাবাতাবাকে হত্যা করে আব্বাসিবিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি সেনাপতি হারসামা এক যুদ্ধে আবু সায়রাকে পরাজিত করে হত্যা করেন। অন্যদিকে ইরাকে বিশৃঙ্খলার সুযোগে হেজাজে ইমাম জাফর আস-সাদিকের জনৈক পুত্র মক্কায় নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। কিন্তু পরে তিনি আত্মসমর্পণ করলে খলিফা মামুন স্বভাবসুলভভাবে তাকে ক্ষমা করেন।

নবিবংশীয়দের হাতে খিলাফত হস্তান্তর: ধর্মপ্রাণ খলিফা মামুন চেয়েছিলেন নবিবংশীয়দের হাতে খিলাফত প্রত্যর্পণ করতে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি নবিবংশীয় ইমাম মুসা-আল-কাজিমের পুত্র ফাতেমীয় ইমাম তৃতীয় আলীকে মদিনা থেকে ডেকে পাঠান এবং তাকে আর-রিজা-বিন আল মুহাম্মদি উপাধি দান করে খিলাফতের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন।

মামুনের বাগদাদ অভিযান এবং অরাজকতা দমন: হারসামার মৃত্যু ঘটায় এবং আর-রিজাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় বাগদাদে এক সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মামুন কালবিলম্ব না করে সসৈন্যে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। ৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইমাম আলী-আর-রিজা মৃত্যুবরণ করেন। ৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে মামুন বিজয়ীর বেশে বাগদাদে প্রবেশ করেন। সাথে সাথে সকল বিশৃঙ্খলা থেমে যায়।

মেসোপটেমিয়া ও মিসরে বিদ্রোহ দমন: এদিকে নসর বিন শাবাস আবার বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে আব্দুল্লাহ বিন তাহির ৮২২ খ্রিষ্টাব্দে তাকে পরাজিত ও বন্দি করে বাগদাদে খলিফার কাছে পাঠান। মামুন তাকে ক্ষমা করে দেন।

সিসিলি ও ক্রিট দ্বীপ জয়: উত্তর আফ্রিকার আগলাবি বংশের শাসনকর্তা জিয়াদাতুল্লাহ ৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে ভূমধ্যসাগরের সিসিলি দ্বীপ খলিফার শাসনাধীনে আনেন। অতঃপর মিসরের শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ ৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে একই অঞ্চলের ক্রিট দ্বীপ জয় করেন। এ সময় ইয়েমেন ও খোরাসানে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমন এবং বিদ্রোহীদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

খলিফাকে হত্যার ষড়যন্ত্র: ৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আব্বাসির নেতৃত্বে খলিফা মামুনকে হত্যার এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। মামুন প্রধান ষড়যন্ত্রকারীদের উচিত শাস্তি দেন।

দস্যু বাবেক ও বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ: মামুনের রাজত্বের প্রারম্ভে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ছিল। সে সুযোগে খুররামী সম্প্রদায়ের ম্যাজিয়ান শাখার বাবেক নামের জনৈক দস্যু দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় একটি দুর্গ দখল করে রাজ্যের উত্তরাংশে ব্যাপক লুটতরাজ আরম্ভ করে। বাবেক এক সময় গ্রিক সম্রাট থিওফিলাসের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে এবং বহু মুসলমানকে হত্যা করে। খলিফা একে একে তিনটি যুদ্ধে শত্রুকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করেন যে, বাইজান্টাইন সম্রাট সন্ধি করতে বাধ্য হন।

রাজ্য পরিষদ গঠন: সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনার জন্য খলিফা আল-মামুন রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠন করেন। পরিষদের সদস্য হিসেবে খলিফা মুসলমান ছাড়াও ইহুদি, খ্রিষ্টান, সাবিয়ী ও জেরোস্ট্রীয় ধর্মাবলম্বীদের স্থান দিতেন।

অর্থনৈতিক উন্নতি: খলিফা আল-মামুন একজন বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি তিনি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানেও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বার্থে খলিফা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নকে উৎসাহিত করেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, "আল-মামুনের রাজধানী বাণিজ্য, শিল্পোন্নয়ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে গৌরব অর্জন করে।" খলিফা মামুন কৃষিকাজের উন্নয়নের জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি ভূমি জরিপ, জল নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধার জন্য খাল খননের ব্যবস্থা করেন।

বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা: খলিফা মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমাহ (জ্ঞানগৃহ) ছিল আব্বাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রধান প্রতীক। ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত তখনকার এই জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটিতে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ ব্যুরো এই তিনটি পৃথক বিভাগ ছিল। হুনাইন ইবন ইসহাক বায়তুল হিকমাহর মহাপরিচালক ছিলেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি এটিকে "ইসলামের প্রথম উচ্চশিক্ষার উন্নত প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করেন।"[৩১]

অগাস্টান যুগ: মামুনের শাসনকাল ছিল আব্বাসি তথা আরবদের জন্য অলঙ্কারস্বরূপ। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "তার বিশ বছরব্যাপী শাসনকাল চিন্তাধারার প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে।"[৩২] মামুনের শাসনকালে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। এ সময় বাগদাদ খ্যাতনামা রোমান সম্রাট অগাস্টাসের শাসনামলের মতো শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। এজন্য সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "মামুনের খিলাফত সারাসিনীয় ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। যথার্থভাবেই এটিকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়েছে।"[৩৩] অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, শুধু ইসলামের ইতিহাসেই অনন্য নয়, বিশ্বের ইতিহাসেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন জাগরণ ও উন্নতি অতি বিরল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন খলিফা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আব্বাসি খিলাফতকে গৌরবের অনন্য চূড়ায় উন্নীত করেন?
২. কত খ্রিষ্টাব্দে আল-মামুন বিজয়ীর বেশে বাগদাদে প্রবেশ করেন?
৩. আল মামুনের শাসনকালে উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা জিয়াদাতুল্লাহ কোন দ্বীপ দখল করেন?
৪. বায়তুল হিকমাহ অর্থ কী? */সকল বোর্ড ২০২৫; ২০১৫/*
৫. কোথায় বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা করা হয়?
৬. কার শাসনকালকে 'Augustan Age of Islam' বলা হয়?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. খলিফা আল-মামুনের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বসমূহ চিহ্নিত করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।
২. খলিফা আল-মামুন যেসব বিদ্রোহ দমন করেন তার একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[৩১] The first prominent institution for higher learning in Islam. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.410

[৩২] The twenty years of his reign have left enduring monuments of intellectual development of the Muslims in all directions of thought. – Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.274

[৩৩] Mamun's Caliphate constitutes the most glorious epoch in Saracenic history and has been justly called the Augustan age of Islam. –Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.274

পাঠ ১৫

আব্বাসি খলিফা আল-মুতাসিমের সিংহাসনে আরোহণ ও কৃতিত্ব (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) [Ascention and Achievements of Abbasid Khalifa Al-Mutasim (833-842 AD)]

সিংহাসনারোহণ: মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে খলিফা মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) তার ভাই আবু ইসহাক মুহাম্মদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ফরমান জারি করেন। এ ফরমান অনুসারে আবু ইসহাক মুহাম্মদ ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আল-মুতাসিম বিল্লাহ ('আল্লাহকে আঁকড়ে ধারণকারী') উপাধি গ্রহণ করে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুতাসিম নয় বছর রাজত্বের পর ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

আব্বাস ও সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ দমন: খলিফা মামুন তার পুত্র আব্বাসকে উত্তরাধিকারী মনোনীত না করায় তিনি অসন্তুষ্ট হন। আব্বাস সেনাবাহিনী ও জনগণের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাই সেনাবাহিনী প্রথমে তার মনোনয়নের জন্য প্রবল দাবি জানায়। কিন্তু এক পর্যায়ে আল-আব্বাস নিজেই পিতার অন্তিম ইচ্ছার কথা স্মরণ করে পিতৃব্যের কাছে আনুগত্যের শপথগ্রহণ করেন। এর পর সেনাবাহিনীও তাদের দাবি প্রত্যাহার করে আব্বাসের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।

তুর্কিবাহিনী গঠন: আরব ও পারসিক সৈন্যদের দ্বন্দ্ব মামুনের আমলে ব্যাপক রূপ ধারণ করে এবং ক্রমে পারসিক খোরাসানিরা সাম্রাজ্যে অপ্রতিহত প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এ অবস্থায় সামরিক বাহিনীতে ভারসাম্য রক্ষা ও নিজের নিরাপত্তা বিধানের তাগিদে আল মুতাসিম তুর্কি মামলুক, মধ্য এশিয়ার ফারগানা, ইয়েমেনীয় বা মাগরিব ও মিসরের উচ্চভূমি থেকে আগত বেতনভুক্ত সৈন্যদের দিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন। এটি তুর্কিবাহিনী নামে পরিচিত হয়। এ বাহিনী স্বয়ং খলিফার তত্ত্বাবধানে ছিল এবং খলিফা ছাড়া অন্য কারও হুকুম তারা মানত না। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "এটি মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, অনতিবিলম্বে তারা রোমান সাম্রাজ্যের দেহরক্ষী সৈন্যদলের অনরূপ ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের খেয়ালখুশিমতো খলিফাকে সিংহাসনে বসাত ও সিংহাসনচ্যুত করত।"[৩৪]

রাজধানী স্থানান্তর: তুর্কি বাহিনীর অত্যাচারে রাজধানীর লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে খলিফা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং বাগদাদের ষাট মাইল উত্তর-পশ্চিমে সামাররা (মতান্তরে সুররামান রা'আ) নামের স্থানে চলে গিয়ে সেখানে রাজধানী স্থানান্তর করেন (৮৩৬ খ্রি.)।

ভারতীয় জাঠদের দমন: ভারতীয় জাঠগোষ্ঠী কীভাবে ভারতবর্ষ থেকে ইরাকে গিয়েছিল ইতিহাসে এ বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাদের সংখ্যা ছিল ১৭০০০। জাঠদের লুটপাটের কারণে খলিফা মুতাসিম তাদের বিরুদ্ধে উযাইফের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল পাঠান। উযাইফের হাতে তারা পরাজিত ও উৎখাত হয়।

বাবেককে দমন: মুতাসিমের রাজত্বকালে দুর্বৃত্ত বাবেক আবার পারস্যের মাজেন্দ্রানে আবির্ভূত হয়ে লুটতরাজসহ নানাবিধ অন্যায়-অত্যাচার শুরু করে। তাকে দমন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। খলিফা মুতাসিম আফসীন নামের এক দক্ষ তুর্কি সেনাপতিকে বাবেকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কয়েকটি যুদ্ধের পর বাবেকের আশ্রয়স্থল অধিকার করেন আফসিন। বাবেক ও তার ভাই আর্মেনিয়ায় পলায়ন করলেও এক আর্মেনীয় সর্দার তাদের পাকড়াও করে আফসিনের কাছে সমর্পণ করেন। পরে সাজা দেওয়ার জন্য তাদের বাগদাদে নেওয়া হয়।

বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ: খলিফার সেনাপতি আফসিন যখন মাজেন্দ্রানে বাবেকের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত তখন বাবেকের মিত্র বাইজান্টাইন সম্রাট থিউফিলাস মুসলিম বাহিনীর একাগ্রতা নষ্ট করার চেষ্টা চালান। থিউফিলাস কাপাডোসিয়া আক্রমণ করে মুসলিম অঞ্চল ধ্বংস করেন। তিনি মুসলিমদের নগরসমূহ লুণ্ঠন করে পুড়িয়ে দেন। পুরুষদের হত্যা এবং স্ত্রীলোক ও শিশু-কিশোরদের দাসে পরিণত করা হয়। এ বর্বরতার সংবাদে মুতাসিম দ্রুত বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে

---

[৩৪] And it is not surprising that before long they assumed the part of the praetorian guards of the Roman Empire, deposing and setting up sovereigns at their own will and pleasure –Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.282

অভিযান করেন। তার অগ্রগামী সৈন্যদল অ্যানসিয়ার কাছে থিউফিলাসকে পরাজিত করে এমোরিয়াস পৌঁছায় এবং পঞ্চাশ দিন অবরোধের পর তা দখল করতে সমর্থ হয়। গ্রিক শক্তির বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার উদ্দেশ্যে মুতাসিম প্রপন্টিস ও বসফরাসের দিকে অভিযান চালনার নির্দেশ দেন। কিন্তু নিজের শিবিরের এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র ফাঁস হলে মুতাসিমকে অভিযান স্থগিত করে থিওফিলাসের সাথে সন্ধি করতে হয়।

আরব সেনাপতিদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ: কয়েকজন আরব সেনাপতি তুর্কিদের প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত এবং তাদের নিজেদের প্রতি খলিফার ব্যবহারে বিরক্ত ছিলেন। বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে তারা মুতাসিমকে হত্যা করার জন্য অল্পবয়স্ক ও বিপথগামী আব্বাসের সাথে ষড়যন্ত্র করেন। ষড়যন্ত্রটি ফাঁস হয়ে গেলে আব্বাস ও তার সাথে জড়িত আরব সেনাপতিদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ম্যাজিয়ান শাসনকর্তার বিদ্রোহ দমন: ৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাজিয়ানের শাসনকর্তা মাজিয়ার তাবারিস্তানে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। খলিফা সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে তাহিরকে মাজিয়ারের বিদ্রোহ দমন করতে পাঠান। তাহির ব্যর্থ হলে মুতাসিম আফসীনকেই পূর্বাঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করতে বাধ্য হবেন এ ধারণার বশবর্তী হয়ে আফসীন ম্যাজিয়ান দলপতিকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্ররোচিত করেন। কিন্তু তাহির শেষ পর্যন্ত মাজিয়ারকে পরাজিত ও বন্দি করে বাগদাদে পাঠান। পরে মাজিয়ারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

সেনাপতি আফসিনকে দমন: মাজিয়ার খলিফার কাছে আফসিনের বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রকাশ করে দেন। তিনি আফসিনের পাঠানো চিঠিও খলিফাকে দেখান। এ রকম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য খলিফা আফসিনকে তার গৃহে বন্দি করে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে দেন। ফলে এ বিখ্যাত বীর ৮৪০ সালে অনাহারে মৃত্যুবরণ করেন।

মুতাজিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা: মুতাসিম তার ভাই মামুনের অনুকরণে মুতাজিলা দার্শনিক মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মুতাজিলা মতবাদে কুরআনকে আল্লাহর সৃষ্ট গ্রন্থ বলে মনে করা হয়। আর এ কারণে এর সমর্থকরা বেশ আলোচিত। খলিফা মুতাসিম এ মতবাদ প্রচারের জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালান। এ কারণে হাম্বলি মাজহাবের প্রবর্তক ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বলকে নির্যাতন করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'আল-মুতাসিম বিল্লাহ' শব্দের অর্থ কী?
২. আল-মুতাসিম বিল্লাহ কত খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন?
৩. কোন আব্বাসি খলিফা তুর্কিবাহিনী গঠন করেন?
৪. বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বিখ্যাত বীর আফসিনকে শাস্তি দেন কে?
৫. খলিফা আল মুতাসিম বিল্লাহ কোন ধর্মীয় মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন?
৬. মুতাজিলা মতবাদের প্রবর্তক কে?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খলিফা আল-মুতাসিমের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বসমূহ ছক আকারে লেখো।

পাঠ ১৬

বুয়াইয়াদের পরিচয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের অবদান (৯৪৫-১০৫৫ খ্রি.) Introduction and Contribution in Wisdom of the Buwayhid (945-1055 AD)

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে আবুল আব্বাস আস্-সাফফাহর প্রতিষ্ঠিত আব্বাসি খিলাফত ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল আক্রমণে ধ্বংস হয়। তবে এ বংশের ক্রমাবনতির সূচনা নবম শতকের শেষার্ধেই। আব্বাসি খিলাফতের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার সুযোগে নবম শতাব্দী থেকেই এর অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুদয় ঘটে। এসব রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে ছিল বুয়াইয়া ও সেলজুক।

বুয়াইয়াদের পরিচয়

বুয়াইয়া রাজবংশের আদি পরিচয় সম্পর্কে জানা যায়, বুয়াইয়ারা মধ্য এশিয়ার একটি উপজাতি। তারা কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলে আল-বুরজ মালভূমি এবং পারস্যের তাবারিস্তান ও গিলানের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ দাইলামে বাস করত। দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে এ বংশের আবু সুজা বোখারার সাসানীয় রাজবংশের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। পি. কে. হিট্টির মতে, "আবু সুজা 'বুয়াইয়া' উপাধি ধারণ করে প্রাচীন সাসানীয় রাজবংশের উত্তরাধিকার দাবি করে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকেন।" সুজার বংশের লোকেরা ৯৩৪-৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণে অভিযান চালিয়ে সাসানীয়দের কাছ থেকে বর্তমান ইরাকের শিরাজ, ইস্পাহান, খুজিস্তান, কেরমান, আহওয়াজ ইত্যাদি স্থান দখল করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় শিরাজে।

বুয়াইয়া রাজবংশের বংশ তালিকা (৯৪৫-১০৫৫ খ্রি.)

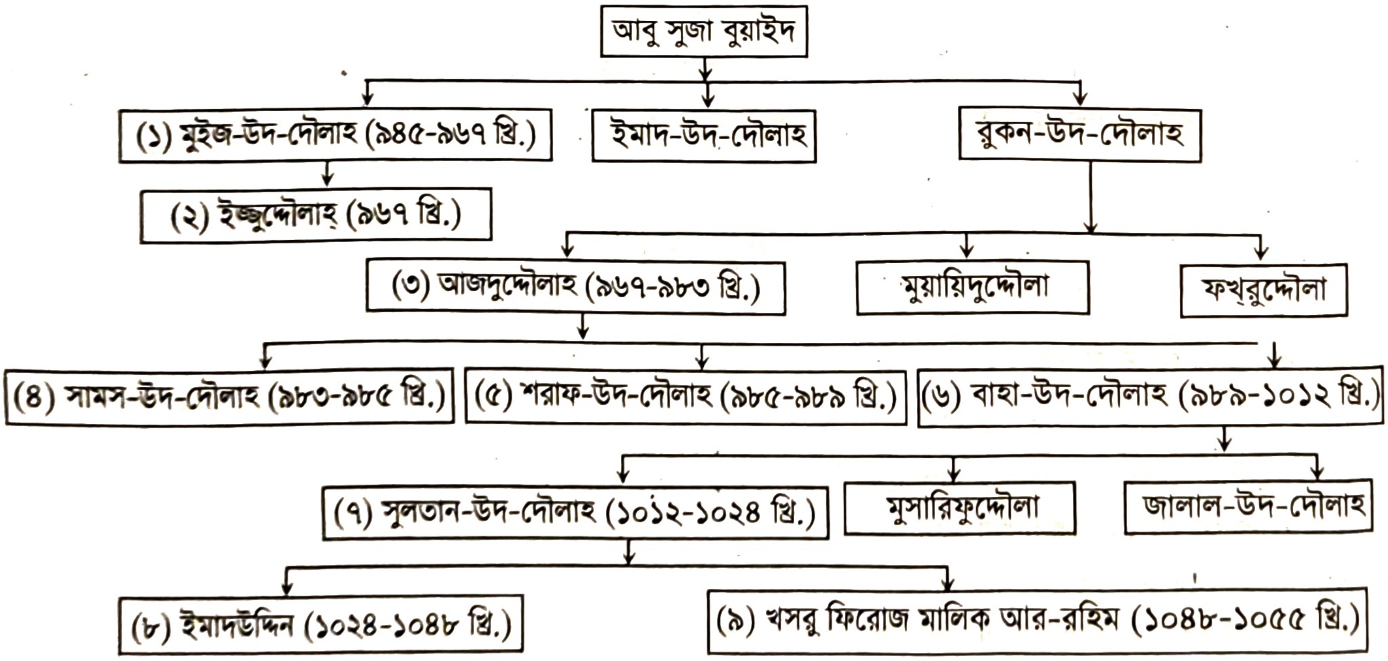
আবু সুজা বুয়াইদ
(১) মুইজ-উদ-দৌলাহ (৯৪৫-৯৬৭ খ্রি.)
ইমাদ-উদ-দৌলাহ
রুকন-উদ-দৌলাহ
(২) ইজ্জুদ্দৌলাহ্ (৯৬৭ খ্রি.)
(৩) আজদুদ্দৌলাহ (৯৬৭-৯৮৩ খ্রি.)
মুয়ায়িদুদ্দৌলা
ফখরুদ্দৌলা
(৪) সামস-উদ-দৌলাহ (৯৮৩-৯৮৫ খ্রি.)
(৫) শরাফ-উদ-দৌলাহ (৯৮৫-৯৮৯ খ্রি.)
(৬) বাহা-উদ-দৌলাহ (৯৮৯-১০১২ খ্রি.)
(৭) সুলতান-উদ-দৌলাহ (১০১২-১০২৪ খ্রি.)
মুসারিফুদ্দৌলা
জালাল-উদ-দৌলাহ
(৮) ইমাদউদ্দিন (১০২৪-১০৪৮ খ্রি.)
(৯) খসরু ফিরোজ মালিক আর-রহিম (১০৪৮-১০৫৫ খ্রি.)

বুয়াইয়া আমিরদের ইতিহাস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের অবদান

আহম্মদ কর্তৃক বুয়াইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা: শিরাজ থেকে দাইলামি শাসকেরা আব্বাসি সাম্রাজ্যের ওপর সবেগে চড়াও হয় এবং ইরাকের আল ওয়াসিত দখল করে। এ সময় তারা রাজধানী বাগদাদ আক্রমণ করতে উদ্যত হয় এবং সেখানকার খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এ অবস্থায় তৎকালীন দুর্বল ও বিলাসপ্রিয় আব্বাসি খলিফা মুসতাকফী (৯৪৪-৪৬) তুর্কি বাহিনীর ঔদ্ধত্য ও দৌরাত্ম্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আবু সুজা বুয়াইয়ার কনিষ্ঠ পুত্র আহম্মদকে রাজধানীতে আহ্বান করেন।

এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে আহম্মদ ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাগদাদে প্রবেশ করলে তুর্কি আমীর আবু জাফর এবং তুর্কি বাহিনী ভয়ে পলায়ন করে। এভাবে আহম্মদ বাগদাদে প্রবেশ করে শাসক বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। আহম্মদের পিতা বুয়াইয়ার নামানুসারে এর নামকরণ হয় বুয়াইয়া বংশ। খলিফা আহম্মদকে তার আমির-উল-উমারাহ নিযুক্ত করেন এবং 'মুইজ-উদ-দৌলাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মুইজ-উদ-দৌলাহ (৯৪৫-৯৬৭ খ্রি.): মুইজ উদ-দৌলাহ খলিফাকে তুর্কিদের হাত থেকে মুক্ত করেন বটে কিন্তু অচিরেই খলিফার দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বসেন। এমনকি একসময় খলিফার সার্বভৌমত্বকে খর্ব করে তিনি সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। মুইজ রাজ্যের মুদ্রায় তার নামাঙ্কন করেন এবং খুৎবায় খলিফার নামের সাথে তার নাম উচ্চারণ করাতে তাকে বাধ্য করেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, খলিফা মুইজের হাতের পুতুলে পরিণত হন। মুইজ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "ফ্রান্সের মেরোভিঞ্জিয়ান রাজাদের শাসনকালে চার্লস মার্টিলের যেরূপ মর্যাদা ছিল, তার মর্যাদাও সেরূপ ছিল। কারণ তিনিই প্রকৃত ক্ষমতাসীন ছিলেন। খলিফা তার আশ্রিতমাত্র ছিলেন এবং তিনি রাজকোষ থেকে দৈনিক ৫০০০ দীনার বৃত্তি পেতেন।"[৩৫]

বুয়াইয়ারা শিয়া মুসলিম ছিলেন। নিজ ধর্মমতের প্রতি নিষ্ঠাবান মুইজ-উদ-দৌলাহ ইমাম হাসান ও হোসেনের (রা) শাহাদাতবরণের শোকাবহ দিন ১০ মহররম 'আশুরা' উদ্‌যাপনসহ বেশ কিছু শিয়া রীতি প্রবর্তন করেন। বিদ্যানুরাগী হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। মুইজ-উদ-দৌলা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মাসুদি, দার্শনিক আল-ফারাবি ও আবুল কাসিম এবং ভাষাতত্ত্ববিদ দীনওয়ারি তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। মানুষ হিসেবে নিষ্ঠুর এবং বিশ্বাসঘাতক হলেও বুয়াইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুইজ-উদ-দৌলাহ বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তার উদার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এ সময় মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন অগ্রগতির দ্বার উন্মোচন করেন।

ইজ্জুদৌলাহ (৯৬৭ খ্রি.): ৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে মুইজ-উদ-দৌলাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র বখতিয়ার 'ইজ্জুদৌলাহ' উপাধি গ্রহণ করে আমীর-উল-উমারাহ পদে অধিষ্ঠিত হন। সাত বছর পর আব্বাসি খলিফা আল-মুতী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে আমিরের আদেশে তার পুত্র আবু বকর আবদুল করিমের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। আবদুল করিম 'আত্-তাই বিল্লাহ্' (আল্লাহর অনুগত) উপাধিপ্রাপ্ত হয়ে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। এদিকে ইজ্জুদৌলাহ আল-মুতীর খিলাফতকালে ইরাকে একদল তুর্কির আক্রমণে পিতা রুকনুদ্দৌলাহ বিপদগ্রস্ত হন। তখন পিতৃব্যপুত্র আজদুদ্দৌলাহ সাহসিকতার সাথে রুকুনদ্দৌলাকে উদ্ধার করে ইরাকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। পিতা রুকনুদ্দৌলাহর সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি ইজ্জুদৌলাহকে পদচ্যুত করে হত্যা করেন।

আজদুদ্দৌলাহ (৯৬৭-৯৮৩ খ্রি.): আজদুদ্দৌলাহ বুয়াইয়া আমিরদের স্থাপিত ইরাক ও পারস্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে সংঘবদ্ধ করে খলিফা হারুনের সাম্রাজ্যের মতো একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উচ্চাভিলাষী শাসক ছিলেন। আজদুদ্দৌলাহ পূর্ববর্তী আমিররা শুধু 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকলেও তিনিই সর্বপ্রথম 'সুলতান' এবং 'শাহানশাহ' উভয় উপাধি গ্রহণ করেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, "ইসলামি দুনিয়ায় আজদুদ্দৌলাই প্রথম শাসক যিনি শাহানশাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।"[৩৬]

---

[৩৫] His position was like that of Charles Martel under the Merovingian kings of France, for he was the virtual sovereign, whilst the caliph was merely his dependent, receiving a daily allowance of 5000 dinars from the public treasury. –Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.303

[৩৬] Adud was the first ruler in Islam to begin the title Shahanshah – Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.472

সামস-উদ-দৌলাহ (৯৮৩-৯৮৫) ও শরাফ-উদ-দৌলাহ (৯৮৫-৯৮৫ খ্রি.): ৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আজদুদ্দৌলাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র সামস-উদ-দৌলাহ ('সাম্রাজ্যের তরবারি') আমির-উল-উমারাহ মনোনীত হন। তিনি 'শামস-উল-মিল্লাত' বা 'ধর্মের সূর্য' উপাধি গ্রহণ করেন। ৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে শরাফ তার ভাই সামস-উদ-দৌলাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে আমির-উল-উমারাহ পদ দখল করেন। বুয়াইয়া সুলতান শরাফ-উদ-দৌলাহ জ্ঞানী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, "সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতায় আজদুদ্দৌলাহ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তার পুত্র শরাফ-উদ-দৌলাহ তা অনুসরণ করেছিলেন।"[৩৭] তিনি আব্বাসি খলিফা আল মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) অনুসরণে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। তার আমলে বাগদাদ শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। বহু গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

বাহা-উদ-দৌলাহ (৯৮৯-১০১২ খ্রি.): ৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে শরাফ-উদ-দৌলাহর মৃত্যুর পর তার ভাই আবু নসর 'বাহা-উদ-দৌলাহ ওয়া জিয়াউল-মিল্লাত (রাজ্যের আলো ও ধর্মের জ্যোতি) উপাধি নিয়ে তার উত্তরাধিকারী হন। ৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আব্বাসি খলিফা আত-তাইকে পদচ্যুত করে তার ভাই আবুল আব্বাস আহম্মদকে 'আল-কাদির বিল্লাহ' উপাধি দিয়ে বাগদাদের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। বাহা-উদ-দৌলাহ মুতাজিলা মতবাদের বিরোধী ছিলেন। তার খ্যাতনামা মন্ত্রী সাবুর-ইবন-আবদাশী বাগদাদে ৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ১০,০০০ পুস্তক সংবলিত একটি পাঠাগারসহ আকর্ষণীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। বাহা-উদ-দৌলাহ ১০১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন।

পরবর্তী বুয়াইয়াবৃন্দ: বাহা-উদ-দৌলাহর পর থেকে বুয়াইয়াদের অধঃপতন শুরু হয়। এ সময় সুলতানুদ্দৌলাহ (১০১২-১০২৪ খ্রি.) ইমাদ উদ্দিন (১০২৪-১০৪৮ খ্রি.) এবং মালিক আর রহিম (১০৪৮-৫৫ খ্রি.) আমীরুল উমারাহ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সেলজুক বংশের তুঘ্রিল বেগ বাগদাদ দখল করে বুয়াইয়া আমির মালিক আর রহিমকে বন্দি করলে বুয়াইয়া যুগের অবসান ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বুয়াইয়াদের আদিবাস কোথায় ছিল?

২. বুয়াইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

৩. বুয়াইয়া কোন ধর্মাবলম্বী ছিল?

৪. ১০ মহররম 'আশুরা' উদ্‌যাপনসহ বেশ কিছু শিয়া রীতি প্রবর্তন করেন কে?

৫. 'আত্-তাই বিল্লাহ্' (আল্লাহর অনুগত) উপাধি ছিল কার?

৬. কোন বুয়াইয়া শাসক প্রথম 'সুলতান' এবং 'শাহানশাহ' উভয় উপাধি গ্রহণ করেন?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. শাসনকালের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বুয়াইয়া আমিরদের একটি তালিকা তৈরি করো।

২. জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় বুয়াইয়া আমিরদের অবদানের একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[৩৭] The precedent for literary and scientific pratronage set by Adul al-Dawlah was followed by his son Sharaf-al-Dawlah. Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.472

পাঠ ১৭

বুয়াইয়া সুলতান আজদুদ্দৌলাহর কৃতিত্ব (৯৬৭-৯৮৩ খ্রি.) ও বুয়াইয়াদের পতন (১০৫৫ খ্রি.) [Achievements of the Buwayhid Sultan Adud-Al-Dawlah (967-983 AD) and Their Fall (1055 AD)]

আজদুদ্দৌলাহর কৃতিত্ব

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা: বুয়াইয়া বংশের নয়জন আমির-উল-উমারাহর মধ্যে আজদুদ্দৌলাহ ছিলেন শ্রেষ্ঠ। পি. কে. হিট্টি বলেন, "রোকনের পুত্র আজদুদ্দৌলাহর সময়ে বুয়াইয়া শক্তি সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। আজদুদ্দৌলাহ কেবল বুয়াইয়াদের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, সেই সময়েরই বিখ্যাত শাসক ছিলেন।"[৩৮] ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টি. ডব্লিউ. আরনল্ড (Thomas Walker Arnold) এর মতে, "বুয়াইয়া রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। ৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর আগে তিনি কাস্পিয়ান সাগর থেকে পারস্য উপসাগর এবং ইস্পাহান থেকে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত ভূ-ভাগের মালিক হন, ইরাকে প্রাধান্য কায়েম করেন এবং বাগদাদের খলিফার প্রভু হন।"[৩৯]

সুলতান ও শাহানশাহ উপাধি গ্রহণ: আজদুদ্দৌলাহ একজন উচ্চাভিলাষী শাসক ছিলেন। তার পূর্ববর্তী আমিররা শুধু 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকলেও তিনিই সর্বপ্রথম 'সুলতান' এবং 'শাহানশাহ' উভয় উপাধি গ্রহণ করেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, "ইসলামি দুনিয়ায় আজদুদ্দৌলাহই প্রথম শাসক যিনি শাহানশাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।"[৪০] এছাড়া খলিফা আত-তাই তাকে 'তাজ-উল-মিল্লাত' (ধর্মের মুকুট) উপাধি দিয়ে রাজকীয় সম্মান দেন।

খলিফার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন: বুয়াইয়া রাজপুত্রকে আব্বাসি সিংহাসনে বসানোর জন্য আজদুদ্দৌলাহ নিজের কন্যার সাথে খলিফা আত-তাইয়ের বিয়ে দেন এবং তিনি নিজেও খলিফার এক কন্যাকে বিয়ে করেন।

খলিফার সার্বভৌমত্বে আঘাত: ক্ষমতালিপ্সু সুলতান আজদুদ্দৌলাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী খলিফাকে অবমাননা করতে দ্বিধা করেননি। খিলাত, মণিমুক্তাখচিত মুকুট, রাষ্ট্রীয় পতাকা, তরবারি, ব্রেসলেট প্রভৃতি প্রদানের জন্য তিনি খলিফাকে বাধ্য করেন। ঐতিহাসিক টি. ডব্লিউ. আরনল্ড এর মতে, (তার জন্য) খলিফা আরও কিছু করেছিলেন। তিনি শুক্রবারের খুৎবাতে আজদুদ্দৌলাহর নাম পাঠের আদেশ দিয়েছিলেন।[৪১]

জনহিতকর কার্যাবলি: আজদুদ্দৌলাহ স্বার্থপর এবং ক্ষমতালোভী হলেও প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। তিনি বহু মসজিদ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ এবং খাল খনন করেন। তিনি ইরাকের সেচব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। শিরাজের নিকটবর্তী নদী খনন করে নাব্যতা বৃদ্ধি করেন। এছাড়া কূর ও দজলা নদীর তীরে বাঁধ নির্মাণ করে সেখানকার অধিবাসীদের বন্যার হাত থেকে রক্ষা করেন। আজদুদ্দৌলাহ ৯৭৮-৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে 'আল-বিমারিস্তান আল-আজুদি' নামে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন, যা ছিল ঐ সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা: বুয়াইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক আজদুদ্দৌলাহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উদার ছিলেন। তিনি নিজে একজন সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। বিশ্ববিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী এবং সুধীবৃন্দ তার রাজদরবারের শোভাবর্ধন করেছিলেন। আজদুদ্দৌলাহর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রে। বাগদাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হাসপাতাল 'আল-বিমারিস্তান আল-আজুদি' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ১০০,০০০ দিনার ব্যয়ে নির্মিত এ হাসপাতালে ২৪ জন চিকিৎসক ছিলেন। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণী হলেন— 'কিতাব-উল-উজাহ'- এর রচয়িতা আবু ফরিসী, 'আরবদের হেরোডোটাস' খ্যাত ঐতিহাসিক আবুল হাসান আল-মাসুদি, 'মুআল্লিম-আস-সানী' বা দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে খ্যাত দার্শনিক আল-ফারাবি, 'মাসালিক আল-মামালিক' এর রচয়িতা ভূগোলবিদ আল-ইস্তাখারি ও বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাবিদ ইখওয়ান-উস-সাফা কবি আল-মুতানব্বি, জ্যোতির্বিদ ইবন-উস-সালাম, আবদুর রহমান সুফী, আব্দুল ওয়াফা, কিতাবুল আগানীর সংকলক আবুল ফারাজ ইস্পাহানী এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানী আলী।

---

[৩৮] The Buwayhid power reached its zenith under Adud-al-Dawlah, a son of Rukn. Adud was not only the greatest Buwayhid but also the most illustrious ruler of his time. –P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.471

[৩৯] Ref: T. W. Arnold, *The Preaching of Islam*

[৪০] Adud was the first ruler in Islam to bear the title 'Shahanshah'. – Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.472

[৪১] Ref: T. W. Arnold, *The Preaching of Islam*

স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা: সুলতান আজদুদ্দৌলাহ স্থাপত্যশিল্পের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হযরত আলি (রা)-এর কবরস্থান বলে কথিত নাজাফে তিনি একটি অপূর্ব সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। তার খ্রিষ্টান উজির নসর ইবন হারুন রাজ্যে অনেক দৃষ্টিনন্দন গির্জা ও মঠ নির্মাণ করেন।

বুয়াইয়াদের পতনের কারণ

শিয়া-সুন্নি সংঘাত: বুয়াইয়াদের পতনের প্রধান কারণ ছিল শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব। শিয়া মতাবলম্বী বুয়াইয়া সুলতানরা সুন্নি আব্বাসি খলিফাকে তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন। শিয়া সুলতানরা খলিফার মতো খুৎবায় তাদের নাম পাঠ, মুদ্রায় নাম অঙ্কিত করা, বিশেষ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান, মুকুট, বাজুবন্দ, পতাকা ও তরবারি ব্যবহার করায় সুন্নি মতাবলম্বীরা অপমানবোধ করেন। ফলে সুন্নি আব্বাসিরা রাজনীতিতে শিয়া প্রভাবের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন।

আরব-পারসিক দ্বন্দ্ব: আব্বাসি খিলাফতের প্রথম দিকে শিয়া বার্মাকি উজির পরিবারের পতনের পর আবার শিয়া বুয়াইয়া বংশের উত্থান ঘটে। এ সময় আব্বাসি প্রশাসনে আরবদের তুলনায় পারসিকদের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বুয়াইয়া সুলতানদের এরূপ বৈষম্যমূলক নীতি আরবদের ক্ষুব্ধ করে তোলে।

বুয়াইয়া আমিরদের নিষ্ঠুরতা: বুয়াইয়া আমিরদের স্বেচ্ছাচারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থান্বেষী তৎপরতা, নিষ্ঠুরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, গোত্রীয় কলহ প্রভৃতি তাদের অধঃপতন ডেকে আনে। ক্ষমতালোভী ও বিবেকশূন্য মুইজ-উদ-দৌলাহ খলিফা মুসতাকফীকে অন্ধ করতেও দ্বিধা করেননি। মুইজ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, “ফ্রান্সের মেরোভিঞ্জিয়ান রাজাদের শাসনকালে চার্লস মার্টিলের যেরূপ মর্যাদা ছিল, তার মর্যাদাও সেরূপ ছিল। কারণ তিনিই প্রকৃত ক্ষমতাসীন ছিলেন। খলিফা তার আশ্রিত মাত্র ছিলেন।”[৪২]

সেলজুক তুর্কিদের বাগদাদ অভিযান ও বুয়াইয়াদের পতন: শিয়া মতাবলম্বী বুয়াইয়া আমিররা বাগদাদের দুর্বল আব্বাসি খলিফাদের রক্ষা করতে এসে যে চরম স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা গ্রহণ করেন তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। নীতিজ্ঞানহীন আজদুদ্দৌলাহ খলিফার সার্বভৌমত্বে চরম আঘাত হানতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। এক পর্যায়ে তারা রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা দখল করলে দেশজুড়ে অশান্তি দেখা দেয়। বুয়াইয়া আমিরদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের সুযোগে সেলজুক নেতা তুঘ্রিল বেগ খলিফা কায়েস বিল্লাহর আমন্ত্রণে ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি দুর্বল বুয়াইয়া আমির মালিক-আর-রহিমকে বন্দি করলে বুয়াইয়া বংশের অবসান ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বুয়াইয়া আমিরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কে?
২. ‘তাজ-উল-মিল্লাত’ (ধর্মের মুকুট) উপাধি দেওয়া হয়েছিল কাকে?
৩. বাগদাদে ‘আল-বিমারিস্তান আল-আজুদি’ হাসপাতাল নির্মাণ করেন কে?
৪. ‘আরবদের হেরোডোটাস’ বলা হয় কাকে?
৫. দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে খ্যাত কে?
৬. বুয়াইয়াদের পতনের প্রধান কারণ কী ছিল?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. আজদুদ্দৌলাহর কৃতিত্বগুলো একটি চার্টে উপস্থাপন করো।
২. বুয়াইয়াদের পতনের কারণগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[৪২] His position was like that of Charles Martel under the Merovingian kings of France, for he was the virtual sovereign, whilst the caliph was merely his dependent, receiving a daily allowance of 5000 dinars from the public treasury. –Ref : Syed Ameer Ali, A Short *History of the Saracens, p.300*

পাঠ ১৮

আব্বাসি খিলাফতে সেলজুক তুর্কিদের উত্থান ও কার্যাবলি (১০৫৫-১১৯৪ খ্রি.)
Rise and Activities of the Seljuk Turks in Abbasid Khilafat (1055-1194 AD)

সেলজুক বংশের পরিচয় ও উত্থান

আব্বাসি খিলাফত যুগে সেলজুক বংশের (১০৫৫-১১৯৪ খ্রি.) উত্থান এক বিস্ময়কর ঘটনা। সেলজুকরা ছিলেন জাতিতে ওঘুজ তুর্কি। তাদের আদি নিবাস ছিল তুর্কিস্তানের কিরগিজ তুন্দ্রা অঞ্চলে। এ বংশের নেতা সেলজুক বিন তুকাক। তার নাম থেকেই এসেছে সেলজুক বংশের নাম। সেলজুকরা ইসলাম গ্রহণ করে একাদশ শতাব্দীতে। তারা সুন্নি মতাবলম্বী মুসলিম ছিল। এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সেলজুক বিন তুকাকের পৌত্র আত তুঘ্রিল বেগের পিতার নাম ছিল মেকাইল। এই বংশের মোট ৭ জন শাসক ছিলেন। তবে এদের মধ্যে দ্বিতীয় শাসক সুলতান আল্প-আরসালান এবং তৃতীয় শাসক মালিক শাহ ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান।

সেলজুকদের বংশ তালিকা (১০৫৫–১১৯৪ খ্রি.)

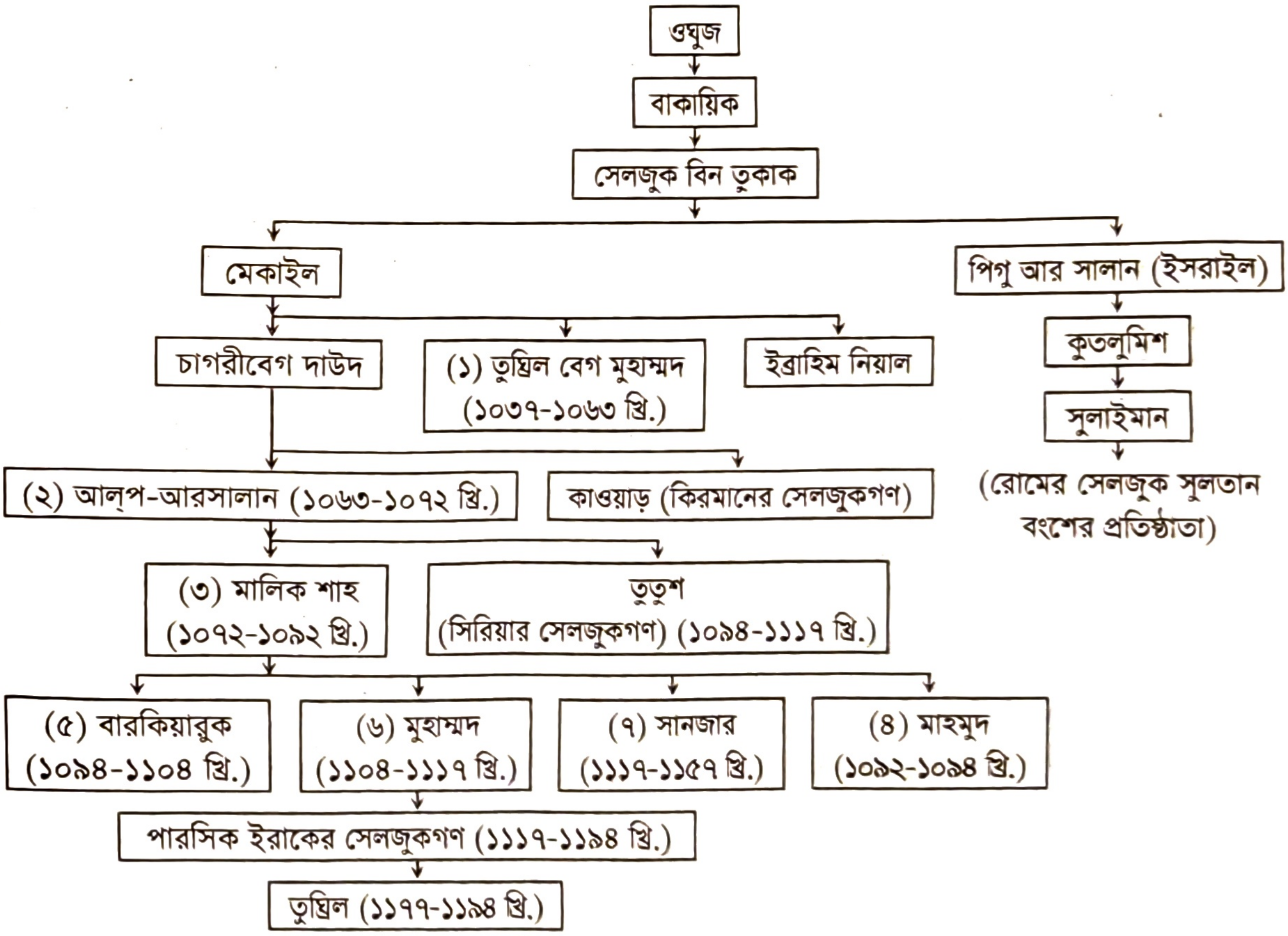
ওঘুজ
বাকায়িক
সেলজুক বিন তুকাক
মেকাইল
পিগু আর সালান (ইসরাইল)
চাগরীবেগ দাউদ
(১) তুঘ্রিল বেগ মুহাম্মদ (১০৩৭-১০৬৩ খ্রি.)
ইব্রাহিম নিয়াল
কুতলুমিশ
সুলাইমান
(রোমের সেলজুক সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠাতা)
(২) আল্প-আরসালান (১০৬৩-১০৭২ খ্রি.)
কাওয়াড় (কিরমানের সেলজুকগণ)
(৩) মালিক শাহ (১০৭২-১০৯২ খ্রি.)
তুতুশ (সিরিয়ার সেলজুকগণ) (১০৯৪-১১১৭ খ্রি.)
(৫) বারকিয়ারুক (১০৯৪-১১০৪ খ্রি.)
(৬) মুহাম্মদ (১১০৪-১১১৭ খ্রি.)
(৭) সানজার (১১১৭-১১৫৭ খ্রি.)
(৪) মাহমুদ (১০৯২-১০৯৪ খ্রি.)
পারসিক ইরাকের সেলজুকগণ (১১১৭-১১৯৪ খ্রি.)
তুঘ্রিল (১১৭৭-১১৯৪ খ্রি.)

বোখারায় সেলজুকদের আগমন: সেলজুকরা তুর্কিস্তানের কিরঘিজ তুন্দ্রা অঞ্চলের ‘Ghuzz’ (ঘুজ) বা ‘Oghuz’ (ওঘুজ) বংশের অন্তর্গত ছিল। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাদের নেতৃত্ব দান করেন সেলজুক-বিন-তুকাক নামের এক দলপতি। তার নামানুসারেই এ জাতি ও বংশ সেলজুক নামে পরিচিত হয়। আনুমানিক ৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তারা সেলজুক-বিন তুকাকের নেতৃত্বে তুর্কিস্তানের কিরঘিজ মালভূমি থেকে পারস্যের অন্তর্গত বোখারায় এসে বসতি স্থাপন করে।

গজনি রাজ্য দখল: এক পর্যায়ে সেলজুক পুত্র পিগু আরসালানের নেতৃত্বে সেলজুকরা অক্সাস (Oxus) নদী অতিক্রম করে পূর্ব পারস্যে এসে বসতি স্থাপন করে। নিজ রাজ্যের পাশে দুর্ধর্ষ শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়ে গজনির সুলতান মাহমুদ তাদের একটি দলকে দলপতি সেলজুকসহ বন্দি করেন এবং খোরাসানে নির্বাসিত করেন। ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদের মৃত্যু

হয়। সেলজুকরা ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে গজনির দুর্বল নৃপতি মাসুদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। তারা হিপ্টের যুদ্ধে মাসুদকে পরাজিত করে আদি সেলজুক নেতার পৌত্র তুঘ্রিল বেগকে দলপতি নির্বাচিত করে। দলপতি নির্বাচিত হয়ে তুঘ্রিল বেগ তার ভাই চাগরী বেগের সহযোগিতায় ১০৪০ খ্রিষ্টাব্দে গজনি রাজ্যের নিশাপুর ও মার্ভ নগর দখল করেন। ১০৪১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তারা সমগ্র গজনি রাজ্য দখল করতে সক্ষম হন।

সুলতান তুঘ্রিল বেগ (১০৫৫-১০৬৩ খ্রি.): সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা আত-তুঘ্রিল বেগ। ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে গজনির সুলতান মাহমুদের পুত্র সুলতান মাসুদকে পরাজিত করে আত্ তুঘ্রিল বেগ পারস্যে সেলজুক বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত গজনি বংশের ধ্বংসস্তূপের ওপর সেলজুক শক্তি ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১০৪৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তুঘ্রিলের নেতৃত্বে সেলজুকরা পারস্যের তাবারিস্তান, হামাদান, রাই, ইস্পাহান ও ইরাক প্রভৃতি স্থানে প্রভুত্ব কায়েম করে। পি. কে. হিট্টি বলেন, "সেলজুক তুর্কিদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ইসলাম ও খিলাফতের ইতিহাসের একটি নতুন ও উল্লেখযোগ্য যুগের সূচনা ঘটে।"[৪৩]

তুঘ্রিলের বাগদাদে প্রবেশ: আব্বাসি খলিফা কায়িম বিল্লাহর আমন্ত্রণে তুঘ্রিল ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর সসৈন্যে বাগদাদে প্রবেশ করলে বুয়াইয়া আমির মালিক-আর-রহিম পলায়ন করেন। এসময় আল-বাসাসিরী নামক একজন তুর্কি নেতা আব্বাসি খলিফা কায়িম বিল্লাহকে পদচ্যুত করলে তুঘ্রিল তাকে দমন করেন। তুঘ্রিল বাগদাদে সেলজুক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে পারস্য অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে যান। এ সুযোগে আল-বাসাসিরী আবার বাগদাদে প্রবেশ করে আব্বাসি খলিফার স্থলে মিসরের ফাতেমি বংশের শিয়া মতাবলম্বী খলিফা মুনতাসির বিল্লাহকে বাগদাদে ইসলামের ধর্মীয় নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন। এ সংবাদে তুঘ্রিল দ্রুতগতিতে বাগদাদ ফিরে আসেন এবং ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আল-বাসাসিরীকে পরাজিত ও নিহত করেন। এজন্য আব্বাসি খলিফা আল-কায়িম (১০৩১-১০৭৫ খ্রি.) তাকে 'King of the East and the West' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাজধানী স্থাপন: সুলতান হিসেবে তুঘ্রিল আব্বাসি সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও তিনি খলিফা আল-কায়িমকে শ্রদ্ধা করতেন। খলিফার কর্তৃত্বে যাতে এতটুকু বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য তিনি খোরাসানের মার্ভ নগরে রাজধানী স্থাপন করেন।

পরবর্তী সময়ে তুঘ্রিল বেগ ফাতেমিয়দের মদদপুষ্ট আরসালান আল বাসাসিরির হাত থেকে খলিফা ও তার রাজধানী বাগদাদ রক্ষার পুরস্কার হিসেবে খলিফা কায়িম বিল্লাহর কাছ থেকে সুলতান উপাধি লাভ করেন ও খিলাফতের শাসন পরিচালনার ভার অর্জন করেন। এরপর থেকে ক্রমান্বয়ে আব্বাসি খলিফা তার হাতের পুতুলে পরিণত হন। ১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তুঘ্রিল বেগ মারা যান। তিনি একজন সুদক্ষ যোদ্ধা এবং বিচক্ষণ ও প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সেলজুকরা জাতিতে কী ছিল?
২. সেলজুকরা কত শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণ করে?
৩. সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
৪. কোন বংশের ধ্বংসস্তূপের ওপর সেলজুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
৫. সেলজুক বংশ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
৬. তুঘ্রিল বেগকে 'King of the East and the West' উপাধিতে ভূষিত করেন কে?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সেলজুক বংশ প্রতিষ্ঠায় তুঘ্রিল বেগের কৃতিত্ব তালিকা আকারে তুলে ধরো।

---

[৪৩] The advent of the Seljuq Turks ushers in a new and notable era in the history of Islam and the Caliphate. –Ref : P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.473

পাঠ ১৯

সুলতান আল্‌প-আরসালানের পরিচয় ও কৃতিত্ব (১০৬৩-১০৭২ খ্রি.)
Introduction and Achievements of Sultan Alp-Arsalan (1063-1072 AD)

আল্‌প-আরসালানের পরিচয়

সেলজুক সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা তুঘ্রিলের কোনো পুত্রসন্তান না থাকায় তার মৃত্যুর পর ভাইয়ের ছেলে আল্‌প-আরসালান সেলজুকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আরসালান শব্দের অর্থ বীর সিংহ। আল্‌প-আরসালান একজন 'বীর সিংহের' মতোই দায়িত্ব পালন করেছেন। খলিফা আল-কায়িম (১০৩১-১০৭৫ খ্রি.) তাকে আজুদদ্দৌলাহ উপাধি প্রদান করেন। তিনি ১০৬৩-১০৭৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে শাসন করে সেলজুক বংশের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন। এ মহান শাসক ১০৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত একজন বিদ্রোহীর হাতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

আল্‌প-আরসালানের চরিত্র

ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর আল্‌প-আরসালানকে উদার, মহানুভব, ন্যায়পরায়ণ ও জ্ঞানী শাসক, ধার্মিক, দয়ালু , দানশীল, দরিদ্রের প্রতি সহমর্মী, নিন্দনীয় কার্যকলাপ বিমুখ এবং সর্বোপরি সাহসী বলে বর্ণনা করেছেন। রোম সম্রাটের প্রতি সদয় ব্যবহার তার মহানুভবতার পরিচয় বহন করে। তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং প্রজাহিতৈষী শাসক হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেন। মনোবল, ধর্মবল ও বাহুবলে তিনি সমান ছিলেন। দুর্বল আব্বাসি শাসক আল-কায়িমের সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। এশিয়া মাইনরে সুন্নি ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে আল্‌প-আরসালান ছিলেন অগ্রপথিক।

আল্‌প-আরসালানের কৃতিত্ব

মুসলিম প্রাচ্যে গৌরবোজ্জ্বল শাসনের সূচনা: রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্‌প-আরসালান মুসলিম প্রাচ্যে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেন। পি কে হিট্টি বলেন, তুঘ্রিল (১০৩৭-১০৬৩), তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল্‌প-আরসালান (১০৬৩-১০৭২) এবং মালিক শাহের শাসনকাল (১০৭২-১০৯২) মুসলিম প্রাচ্যে সেলজুক উত্থানের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে।[৪৪]

সাম্রাজ্য সুসংহতকরণ: আল্‌প-আরসালানের রাজত্বকালে তুর্কি উপজাতিরা দলে দলে মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করলে তার পক্ষে আব্বাসি সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল পুনর্দখল করে একটি সুসংহত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এর ফলে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। মুসলিম বাহিনী আরও শক্তিশালী এবং অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে মালাজকার্দের যুদ্ধে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা: সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুঘ্রিল পূর্বাঞ্চলের খোরাসান প্রদেশের মার্ভে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এটি রাজ্যের এক প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় বিদ্রোহ দমন ও বাইজান্টাইনদের মোকাবিলায় সমস্যা দেখা দিত। দূরদর্শী প্রশাসক হিসেবে আল্‌প-আরসালান রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ইস্পাহানে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

বাইজান্টাইনদের সাথে সংঘর্ষ ও জয়লাভ: আলপ-আরসালানের রাজত্বকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বাইজান্টাইনদের সাথে সংঘাত ও জয়লাভ। তুঘ্রিলের সময় মুসলমানদের সাথে বাইজান্টাইনদের যে সংঘর্ষের সূচনা হয় আল্‌-আরসালানের সময় তা চরম আকার ধারণ করে। তুঘ্রিল ১০৬০ খ্রিষ্টাব্দে বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদেরকে কাপাডোসিয়া ও ফ্রিজিয়া থেকে বিতাড়িত করেন। তবে এ অঞ্চলকে স্থায়ীভাবে জয় করেন আলপ-আরসালান। এর পর ১০৭১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া জয় করে আজারবাইজানে অবস্থানের সময় খবর পান যে, ডায়াজিনিস

---

[৪৪] The reigns of Tughril (1037-63), his nephew and successor Alp Arslan (1063-72) and the latter's son Malik Shah (1072-92) cover the most brilliant period of Seljuq ascendancy over the Moslem East. –Ref : P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.475

রোমানাস (আর্মানুস) নামের এক ব্যক্তি সম্রাজ্ঞী ইউডোসিয়ার কল্যাণে বধ্যভূমি থেকে মুক্তি পেয়ে বাইজান্টাইন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি বাগদাদ ধ্বংস ও সমগ্র পশ্চিম এশিয়া রোমকদের পদানত করার উদ্দেশ্যে দু'লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অকস্মাৎ এশিয়া মাইনর আক্রমণ করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে, কনস্টান্টিনোপল থেকে বিজয়াভিযান অথবা লুণ্ঠনের জন্য ইতোপূর্বে এর চেয়ে বেশি সুসজ্জিত ও বড় সৈন্যবাহিনী বের হয়নি।

মানজিকার্ট বা মালাজগির্টের যুদ্ধ ও সন্ধি: বাইজান্টাইনদের আগমনের সংবাদে বিচলিত না হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য আল্‌প-আরসালান মাত্র ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে আর্মেনিয়ার দিকে যাত্রা করেন এবং মালাজগির্টে ঘাঁটি স্থাপন করেন। মালাজগির্ট ছিল বর্তমান আর্জেরুম এবং ভ্যান নগরদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি বিখ্যাত দুর্গ। এখানে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। প্রথম দিকে মুসলমান সেনারা শত্রুর সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে পড়লেও তাদের অদম্য স্পৃহার ফলে অচিরেই বাইজান্টাইনরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। সম্রাট রোমানাস বন্দি হন। পি কে হিট্টির মতে, মালাজগির্টে বাইজান্টাইনদের বিপর্যয়ে সেলজুক নেতৃত্বাধীন মুসলমানরা সর্বপ্রথম রোমান সম্রাটের অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়। এভাবে এশিয়া মাইনরের তুর্কিকরণের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে আলাপ-আলোচনার পর সুলতান ও রোমানাসের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এ সন্ধির শর্তানুসারে রোমানাস তার কন্যাদের আল্‌প-আরসালানের পুত্রদের সাথে বিবাহ দিতে ও বন্দিত্ব মোচনের জন্য দশ লক্ষ এবং বাৎসরিক রাজস্বস্বরূপ তিন লক্ষ ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে এবং সকল যুদ্ধবন্দি ফেরত দিতে রাজি হন।

যুদ্ধের ফলাফল: মালাজকার্দের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভের ফলে এশিয়া মাইনরে বাইজান্টাইন প্রভুত্ব হ্রাস পেয়ে সেলজুক প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আরসালান যুদ্ধজয়ের পর অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার পিতৃব্যপুত্র সুলায়মান ইবন কুতলুমিশের হাতে অর্পণ করেন। সাহসী যোদ্ধা সুলায়মান রাজ্যসীমা উত্তরে হেলেসপন্ট ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করে বাইজান্টাইন সম্রাটদের কাছ থেকে কর আদায় করেন। মালাজকার্দের যুদ্ধে মুসলিম বিজয় এশিয়া মাইনরে খ্রিষ্টান প্রভুত্বের সম্ভাবনা দূর করে এবং ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটায়। এশিয়া মাইনরের তুর্কিকরণ শুধু ইসলামের রাজ্য এবং ধর্ম বিস্তারেই সহায়ক ছিল না, বরং এর ফলে পরবর্তীকালে অটোমান তুর্কিদের আবির্ভাব সুনিশ্চিত হয়। মালাজকার্দের যুদ্ধ জয়ের ঘটনাকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) জয়ের প্রথম পদক্ষেপ বলেও মনে করা হতো।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আরসালান শব্দের অর্থ কী?
২. আল্‌প-আরসালান কোথায় সুন্নি ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন?
৩. আল্‌প-আরসালান মার্ভ থেকে কোথায় রাজধানী স্থানান্তর করেন?
৪. আলপ-আরসালানের রাজত্বকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী ছিল?
৫. মালাজকার্দের যুদ্ধ কার সময়ে সংঘটিত হয়?
৬. কোন যুদ্ধের ফলে এশিয়া মাইনরে বাইজান্টাইন প্রভুত্ব হ্রাস পায়?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সুলতান আল্‌প-আরসালানের কৃতিত্বপূর্ণ কাজগুলো চিহ্নিত করো একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ২০

সেলজুক সুলতান মালিক শাহের পরিচয় ও কৃতিত্ব (১০৭২-১০৯২ খ্রি.)
Introduction and Achievements of Seljuq Sultan Malik Shah (1072-1092 AD)

পরিচয়

সেলজুক বংশের সুলতানদের মধ্যে মালিক শাহ সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। পিতা আল্‌প-আরসালানের মৃত্যুর পর আবুল ফাতাহ মালিক শাহ সেলজুক শাসক হন। আড়ম্বর, ঐশ্বর্য ও জনকল্যাণের দিক দিয়ে মালিক শাহের শাসনকাল রোমান অথবা আরব শাসনের শ্রেষ্ঠ যুগের সমকক্ষ ছিল। মালিক শাহের এ শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে যে সব বিষয় ক্রিয়াশিল ছিল বলে বিবেচনা করা হয় সেগুলো হলো—

প্রথমত, মালিক শাহের শাসনকালে সেলজুবাদের প্রভুত্ব সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে বিস্তার লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, তিনি আব্বাসি খিলাফতকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ইস্পাহান থেকে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

তৃতীয়ত, তিনি শাসনসংস্কার ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে ইসলামি বিশ্বের গৌরবের পতাকা সমুন্নত রাখেন।

মালিক শাহ ২১ বছর রাজত্বের পর ১০৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ নভেম্বর মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, "মালিক শাহের রাজত্বকালে সেলজুক ক্ষমতা সর্বোচ্চ বিন্দুতে উপনীত হয়।"[৪৫]

কৃতিত্ব

বিদ্রোহ দমন: মালিক শাহের রাজত্বের প্রথমভাগে কয়েকটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। তিনি এ সব বিদ্রোহ সাফল্যের সাথে দমন করেন। বিদ্রোহ গুলোর একটি পারস্যের (বর্তমান ইরান) তুসে তার ভাইয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল।

বাইজান্টাইনদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার: সুলতান মালিক শাহ রোমের সামন্ত রাজা সুলাইমানকে পরাজিত করে সীমান্ত পর্যন্ত সেলজুক রাজ্য বিস্তার করেন এবং অনেকগুলো দ্বীপ দখল করেন। কনস্টান্টাইন ডুকাসের পুত্রের সিংহাসন ত্যাগের পর নাইসিফোরাস বোটানিয়েটস বাইজান্টাইন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ও তার উত্তরাধিকারী অলেক্সিয়াস কমনিসাস মালিক শাহকে উর্ধ্বতন প্রভু বলে স্বীকার করে তাকে করদানে সম্মত হন। ১০৭৪-১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলাইমান গ্রিকদের এন্টিয়ক থেকে বিতাড়িত করে সুলতানের নামে নগরটি পুনরাধিকার করেন।

রাজ্যের সংহতি বিধান: সুলতান মালিক শাহ রাজ্য সম্প্রসারণ অপেক্ষা রাজ্যের সংহতি বিধানে বেশি মনোযোগী ছিলেন। চীনের সীমান্ত থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে জর্জিয়া থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত মালিক শাহের বিশাল রাজ্যের সর্বত্র সুখ ও শান্তি বিরাজ করত।

সাহিত্য ও ললিতকলার পৃষ্ঠপোষকতা: মালিক শাহের উদার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সাহিত্য ও ললিতকলা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তার সময়ে ইসলামি রাজ্যে ফারসি ভাষা চর্চার অভূতপূর্ব তৎপরতা দেখা যায়। মালিক শাহ সেলজুক সাম্রাজ্যের নগরগুলোতে অনেক উচ্চবিদ্যালয় নির্মাণ করেন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "মালিক শাহের রাজত্বকালে উদার-পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সাহিত্য ও ললিতকলা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।[৪৬]

জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ: মালিক শাহ ছিলেন একজন প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি সওদাগর ও মুসাফিরদের নিরাপত্তার জন্য বাণিজ্য ও হজযাত্রার পথের পাশে বিশ্রামাগার ও প্রহরীগৃহ নির্মাণ করেন। তিনি রাজ্যের সর্বত্র রাস্তাঘাট, মসজিদ, মাদ্রাসা, সুরম্য অট্টালিকা ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানে স্থানে পানি নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা খনন করেন। মালিক শাহ উজির নিজাম-উল-মুলকের সহায়তায় সুষ্ঠু কর ব্যবস্থার বাস্তবায়নের জন্য সামন্ততন্ত্র চালু করেন। তিনি সৈন্যদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করে তাদের কাছ থেকে নিয়মিত কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

---

[৪৫] It was Malik Shah (1072-92) under whom Seljuq power reached its meridian. -Ref : P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.476

[৪৬] During Malik Shah reign Arts and literature were fostered by a lavish patronage. -Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.316

স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা: স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে বিচার করলে মালিক শাহের রাজত্বকাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজাম-উল-মুলক প্রথম ইস্পাহানের জামে মসজিদ নির্মাণে সেলজুক স্থাপত্যরীতি প্রবর্তন করেন। সেলজুক আমলে ইরানে নির্মিত অসংখ্য মসজিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইস্পাহানের জামে মসজিদ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা: মালিক শাহের অর্থানুকূল্যে বিদ্যোৎসাহী উজির নিজাম শিক্ষার প্রসারে বাগদাদে ১০৬৫-১০৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত নিজামিয়া মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। এটি ছাড়াও তিনি রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। ইসলামের শ্রেষ্ঠ ধর্মতাত্ত্বিক এবং চিন্তাবিদ ইমাম গাজ্জালি (১০৫৮-১১১১ খ্রি.) এ মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। মহাকবি শেখ সাদী এ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা: মালিক শাহ জ্যোতির্বিজ্ঞানেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দে উজির নিজামের পরামর্শে মালিক শাহ নিশাপুরে একটি জ্যোতির্বিদ সম্মেলন আহ্বান করেন। ঐ সম্মেলনে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণীত হয়। গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য নিশাপুরে একটি মানমন্দিরও নির্মাণ করা হয়।

জালালি পঞ্জিকা প্রবর্তন: উমর খৈয়ামের নেতৃত্বে নিশাপুরের জ্যোতির্বিদরা চান্দ্র মাসের পরিবর্তে সৌর মাস অনুযায়ী গণনার প্রথা চালু করেন। প্রচলিত গণনাপদ্ধতির যাবতীয় ভুল সংশোধন করে একটি নতুন পঞ্জিকা তৈরি করা হয়। সুলতান মালিক শাহ জালাল-উদ-দৌলাহর নামানুসারে এটির নামকরণ হয় জালালি পঞ্জিকা।

নিজামুল মুলক ও তার অবদান: সেলজুক রাজত্বে শাসনকাজের সংস্কার, সমৃদ্ধি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য মালিক শাহের সুযোগ্য প্রজ্ঞাবান উজির খাজা হাসান নিজাম-উল-মুলকের অবদান ছিল অপরিসীম। আল্প-আরসালান এবং মালিক শাহের উজির হিসেবে খাজা হাসান সেলজুক বংশ তথা আব্বাসি সুন্নি খিলাফতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইবনে খাল্লিকান বলেন, “মালিক শাহের প্রায় বিশ বছরের রাজত্বকালে (১০৭৩-১০৯২ খ্রি.) নিজামুল মুলক নিজ হাতে সমস্ত ক্ষমতা এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করেন যে, সুলতানের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকা অথবা মৃগয়ায় যাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না।”[৪৭] নিজামের একনিষ্ঠ সেবা ও আনুগত্যে প্রীত হয়ে সুলতান মালিক শাহ তাকে ‘আতাবেগ’ (আমিরের শাসনকর্তা) উপাধিতে ভূষিত করেন। এজন্যই পি. কে. হিট্টি নিজামুল মুলককে ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের অলঙ্কার বলে অভিহিত করেন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, “এশিয়া যে সকল উজির ও শাসকের জন্মদান করেছিল তার মধ্যে ইয়াহহিয়া বার্মাকির পর নিজাম-উল-মুলক-ই শ্রেষ্ঠ।”[৪৮] নিজাম-উল-মুলকের ‘সিয়াসতনামা’ গ্রন্থকে (Siyasat Namah) রাজ্য শাসনপ্রণালির ওপর লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক রচনা বলে মনে করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সেলজুক বংশের সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে?
২. মালিক শাহের উজির কে ছিলেন?
৩. নিজাম-উল-মুলক নিজামিয়া মাদ্রাসা নির্মাণ করেন কোথায়?
৪. জালালি পঞ্জিকার প্রচলন করেন কে?
৫. মালিক শাহের রাজত্বকাল কত ছিল?
৬. ‘সিয়াসতনামা’ গ্রন্থের লেখক কে?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সুলতান মালিক শাহের কৃতিত্বগুলো চিহ্নিত করে একটি চার্ট তৈরি করো।

---

[৪৭] One of the ornaments of political history of Islam. –Ref : P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p.477

[৪৮] Nizam ul-Mulk was probably, after Yahya Barmeki, the ablest minister and administrator Asia has ever produced. –Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, p.315

পাঠ ২১

আব্বাসি খিলাফতে সেলজুক সুলতানদের অবদান ও তাদের পতন
Contributions of the Seljuq Sultans in the Abbasid Khilafat and Their Fall

রাজনৈতিক অবদান

রাজ্যের সংহতিবিধান, ইসলাম ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি, রাজনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে সেলজুকরা রাজ্যের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছিল। নিচে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেলজুক সুলতানদের অবদান আলোচনা করা হলো—

রাজ্যের সংহতি বিধান: পূর্ববর্তী বুয়াইয়া আমিরদের অত্যাচার আব্বাসি খিলাফতকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে এবং বিদ্রোহীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে আব্বাসি সাম্রাজ্য দিন দিন সঙ্কুচিত হতে থাকে। সেলজুক শাসকেরা বুয়াইয়াদের ধ্বংস করে আব্বাসি সাম্রাজ্যের অধঃপতন রোধ করতে সক্ষম হন। তারা অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের নির্মূল করে সাম্রাজ্যকে সুসংহত করেন। আল বাসাসিরি নামের এক বিদ্রোহী তুর্কি নেতা খলিফা কায়িম বিল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করলে তুঘ্রিল তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। সুলতান আল্প-আরসালানের সময়ে (১০৬৩-১০৭২ খ্রি.) তুর্কি উপজাতির লোকেরা দলে দলে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিলে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। সুলতান মালিক শাহ (১০৭২-১০৯২ খ্রি.) চীনের সীমান্ত থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে জর্জিয়া থেকে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত তার রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন।

বাইজান্টাইনদের ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা: সেলজুকরা ক্ষমতা গ্রহণের পর বাইজান্টাইনদের লাগাম টেনে ধরে। তুঘ্রিল দেশের পর দেশ জয় করে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তে উপনীত হন এবং ১০৬০ খ্রিষ্টাব্দে বাইজান্টাইনদের ডোসিয়া ও ফিজিয়া থেকে বিতাড়িত করেন। বাইজান্টাইনদের ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত হানেন সুলতান আল্প-আরসালান। তিনি ১০৭১ খ্রিষ্টাব্দে মালাজকার্দের যুদ্ধে বাইজান্টাইন সম্রাট ডায়োজিনিস রোমানাসকে পরাজিত ও বন্দি করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে এশিয়া মাইনরে ইসলামের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে।

রাজনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন: মালিক শাহের উজির নিজাম-উল-মুলক রাজ্য শাসনপ্রণালির ওপর 'সিয়াসত নামা' নামে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে তিনি রাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে আব্বাসি খলিফারা ও মুসলিম বিশ্ব রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা লাভ করে।

সুন্নি ইসলামের সুরক্ষা: সেলজুক সুলতানরা সুন্নি আব্বাসি খলিফাদের জাগিয়ে তোলেন। শিয়া দাইলামি সম্প্রদায়ভুক্ত বুয়াইয়া আমিররা সুন্নি ইসলামের ধ্বংসস্তূপের ওপর শিয়া ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারে তৎপর হয়েছিলেন। সেলজুক সুলতান তুঘ্রিল প্রথমেই তাদের ওপর আঘাত হানেন। ফলে সুন্নি ইসলাম ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। সেলজুকরা একটি সংঘবদ্ধ সুন্নি রাষ্ট্র কায়েম করায় পার্শ্ববর্তী ফাতেমিয় শিয়া মতামত ও প্রভাব আব্বাসি খিলাফতে প্রবেশ করতে পারেনি।

অর্থনৈতিক অবদান

সেলজুকরা আব্বাসি সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। উজির নিজাম-উল-মুলকের 'সিয়াসতনামা' গ্রন্থটিতে রাজনীতির পাশাপাশি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলির ওপরও বিশেষ আলোচনা করা হয়েছিল। বস্তুত সাম্রাজ্যের উন্নতির মূলে ছিল উজির নিজামের অর্থনৈতিক দূরদর্শিতা। তার যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে সেলজুক সাম্রাজ্যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। নিজাম সুষ্ঠু কর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সামন্ততন্ত্র চালু করেন এবং সৈন্যদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করে তাদের কাছ থেকে নিয়মিত কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

সামাজিক অবদান

সেলজুক সুলতানরা অত্যাচারী বুয়াইয়া আমিরদের দৌরাত্ম্য রহিত করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তারা জনগণের শিক্ষাদীক্ষা ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধানসহ সার্বিক মঙ্গলের জন্য নানা পদক্ষেপ নেন। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সমগ্র আব্বাসি খিলাফতে পারস্য রীতিনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-স্থাপত্যকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে আরব সমাজের পারসিককরণ হয়। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিনিময় ও মিশ্রণ ঘটে। বাগদাদের মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পারস্যের হামাদান, ইস্পাহান প্রভৃতি শহর কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এভাবে সাম্রাজ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাংস্কৃতিক অবদান

সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে সেলজুক সুলতানরা তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নিম্নরূপ:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন: সেলজুক শাসকেরা শিক্ষা-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুলতান মালিক শাহ ও তার উজির খাজা হাসান নিজাম-উল-মুলক সাম্রাজ্যের নগরগুলোতে অগণিত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা স্থাপন করেন। বিদ্যোৎসাহী নিজাম শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাগদাদে ১০৬৫-১০৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খ্যাত নিজামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

জ্ঞানী-গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা দান: সেলজুক সুলতানরা জ্ঞানী-গুণীদের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খ্যাতনামা ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ইমাম গাজ্জালি (র) নিজামের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। পারস্যের মরমী কবি ফরিদ উদ্দিন আত্তার, প্রখ্যাত দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিশারদ উমর খৈয়াম, কবি ও পরিব্রাজক নাসির-ই-খসরু, সাহিত্যিক নিজামী প্রমুখ মনীষী সেলজুক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজামের পরামর্শে মালিক শাহ নিশাপুরে একটি জ্যোতির্বিদ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং এই সম্মেলনে জ্যোতির্বিদ্যাচর্চার সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণীত হয়। নিশাপুরে একটি মানমন্দির স্থাপন করা হয়। উমর খৈয়ামের নেতৃত্বে নিশাপুরের জ্যোতির্বিদরা চান্দ্র মাসের পরিবর্তে সৌর মাস অনুযায়ী গণনার প্রথা প্রচলন করেন। প্রচলিত গণনা পদ্ধতির ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে একটি নতুন পঞ্জিকা তৈরি করা হয়। সুলতান মালিক শাহ জালালুদ্দৌলাহর নামানুসারে এর নামকরণ হয় জালালি পঞ্জিকা।

স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা: স্থাপত্যশিল্পের বিচারে মালিক শাহের রাজত্বকাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজাম-উল-মুলক প্রথম সেলজুক স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে ইস্পাহানের জামে মসজিদ নির্মাণ করেন (১০৭৫ খ্রি.)। এর অনুকরণে আরদিস্তান (১১৮০), জাওয়ারা (১১৫৩) এবং গুলপাইগানের (১১২০-১১৩৫) জামে মসজিদ নির্মিত হয়। সেলজুক আমলে পারস্যে নির্মিত হয় অসংখ্য স্থাপত্য। এসব কীর্তির মধ্যে একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত দামগান মসজিদ, সাভা মসজিদ, বিস্তাম মিনার ও রায়ের তুঘ্রিলের সমাধিসৌধ (১১৩৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সেলজুকদের স্বর্ণযুগ

তুঘ্রিল বেগ ছিলেন বাগদাদে সেলজুক বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তার প্রধান কৃতিত্ব ছিল শিয়া দাইলামি সম্প্রদায়ের বুয়াইয়া আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে সুন্নি আব্বাসিদের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং খলিফার মর্যাদা বৃদ্ধি করা। ১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তুঘ্রিল মৃত্যুবরণ করলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র আল্‌প-আরসালান সেলজুক বংশের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং খলিফার কাছ থেকে সুলতান উপাধি লাভ করেন। আরসালানের মূল কৃতিত্ব ছিল আব্বাসি সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল পুনর্দখল করে একটি সুসংহত রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং বাইজান্টাইনদের সফলভাবে মোকাবিলা করা। তিনি মালাজকার্দের যুদ্ধে (১০৭১ খ্রি.) বাইজান্টাইনদের পরাজিত করে প্রথমবারের মতো এশিয়া মাইনরে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১০৭২ খ্রিষ্টাব্দে আল্‌প-আরসালানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মালিক শাহ সেলজুক সুলতান মনোনীত হন। তার শাসনামল সেলজুক ইতিহাসের স্বর্ণযুগ নামে পরিচিত। হিট্টি বলেন, "মালিক শাহের রাজত্বকালে সেলজুক ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে।"[৪৯]

সেলজুকদের পতন

গুপ্তঘাতকদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ: শ্রেষ্ঠ সেলজুক সুলতান মালিক শাহের রাজত্বকালে ইসলামের ইতিহাসে হত্যাকারী সম্প্রদায় বা গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের (Assasains) উদ্ভব হয়। মালিক শাহের উজির নিজাম-উল-মুলকের সহপাঠী আল হাসান আল সাবাহ প্রতিষ্ঠিত এ গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় পারস্যের উত্তর-পশ্চিমে আলামুত পর্বতশিখরে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। 'পর্বতের বৃদ্ধ লোক' (The Old Man of the Mountain) নামে পরিচিত হাসান আল সাবাহ পারস্যের তুস অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। হাসান বিন সাবাহ নিজেকে দক্ষিণ আরবের হিমারীয় রাজাদের

---

[৪৯] It was Malik Shah (1072-92) under whom Seljuq power reached its meridian. –Ref : P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.476

বংশধর বলেও মনে করেন। তিনি প্রথম জীবনে সেলজুক সুলতান আল্প আরসালানের অধীনে দণ্ডদারী (Mace-bearer) হিসেবে চাকরি করেন। তিনি মালিক শাহের অধীনেও চাকরি করেন। তবে তিনি উচ্চপদ ও সম্মান লাভে ব্যর্থ হন। তাই সহপাঠী নিজামের উচ্চপদ লাভে ঈর্ষান্বিত হয়ে তিনি গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে সেলজুক রাজ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেন। ধীরে ধীরে হাসান আল সাবাহর গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের প্রভাব বাড়তে থাকে। এরা মিসরের ফাতেমি খলিফাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রাচ্যে ফাতেমি খলিফাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে ইসমাইলি মতবাদ প্রচার শুরু করেন। সেলজুক রাজদরবারকে বিপর্যস্ত করে সমস্ত রাজ্যে ত্রাস সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এ সম্প্রদায়ের সদস্যরা 'ফিদাই' নামে পরিচিত ছিল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য আল সাবাহ ১০৯০ খ্রিষ্টাব্দে এক ফিদাইকে দিয়ে নিজামকে হত্যা করেন। এ রকম সুদক্ষ শাসকের মৃত্যুর ফলে সেলজুক বংশ দুর্বল ও দিশেহারা হয়ে পড়ে।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধ: মালিক শাহের মৃত্যুর (১০৯২ খ্রি.) সঙ্গে সঙ্গে সেলজুক সাম্রাজ্যের ঐক্য বিনষ্ট হয়। মালিক শাহের পুত্ররা গৃহযুদ্ধ করে দুর্বল হয়ে পড়েন। এতে ক্ষুণ্ন হয় সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব। মালিক শাহের মৃত্যুর পর তার পত্নী তুরখানের অনুরোধে খলিফা তার শিশুপুত্র মাহমুদকে (১০৯২-৯৪ খ্রি.) নাসির-উদ-দুনিয়া ওয়াদ্দীন (দীন ও দুনিয়ার সহায়ক) উপাধি দিয়ে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু অচিরেই মাহমুদের বড় ভাই বরকিয়ারুক তাকে পদচ্যুত করেন এবং রুকনুদ্দিন উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। তবে কিছুদিন পরই তার সাথে ছোট ভাই মুহম্মদের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। মুহম্মদ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তবে ভাইদের দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে এবং তা সেলজুকদের পতন ডেকে আনে।

সেলজুকদের মূলধারার পতন: পারস্যের আদি সেলজুকরা অতি কষ্টে ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আব্বাসি খিলাফতের ওপর তাদের প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে খাওয়ারিজমের শাসক তাকোশ পারসিক ইরাকের মূল সেলজুক সুলতান তুঘ্রিল (১১৭৭-৯৪ খ্রি.) কে পরাজিত করলে সেলজুক বংশের পতন সম্পূর্ণ হয়। অন্যদিকে এশিয়া মাইনরের সেলজুকরা ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বজায় রাখে। এর পরে অটোমান (ওসমানীয় সুলতান) তুর্কিদের কাছে তারা পরাভূত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন সেলজুক সুলতানের সময়ে তুর্কি উপজাতি মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেয়?
২. 'সিয়াসতনামা' গ্রন্থটি কীসের ওপর লিখিত?
৩. কোন জাতি সুন্নি ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে?
৪. মহাকবি শেখ সাদী কোন মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন?
৫. নিজামিয়া মাদ্রাসা কখন প্রতিষ্ঠা করা হয়?
৬. গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় কার সময়ে?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সেলজুক তুর্কি সুলতানদের পতনের কারণগুলো ছক আকারে লেখো।

গ. দলীয় কাজ

কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে আব্বাসি খিলাফতে সেলজুক সুলতানদের অবদান সম্পর্কিত একটি স্লাইড তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ২২ ও ২৩

ক্রুসেড: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল (১০৯৫-১২৯১ খ্রি.)
Crusade: The Causes, Events and Results (1095-1291 AD)

ক্রুসেড

ক্রুসেড (Crusade) শব্দটি ইংরেজি 'Cross' শব্দ থেকে এসেছে। 'ক্রুসেড' এর শাব্দিক অর্থ 'ধর্মযুদ্ধ'। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশত বছর ধরে ঈর্ষাপরায়ণ বিক্ষুব্ধ খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেছিল তা-ই ইতিহাসে ক্রুসেড নামে পরিচিত। পি. কে. হিট্টি বলেন, "মুসলিম এশিয়ার বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান ইউরোপের প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন হচ্ছে এ ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড)।"[৫০] ড. আসকার ইবনে শাইখ বলেন, "ক্রুসেডের অর্থ ধর্মযুদ্ধ হলেও ১০৯৫ সাল থেকে আরম্ভ করে ১২৯১ সাল পর্যন্ত চলমান ক্রুসেডগুলো কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা, প্রচার কিংবা রক্ষার জন্য সংঘটিত হয়নি। তা ছিল ভৌগোলিক ও ধর্মীয় পরিচয়ে চিহ্নিত দুটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একের বিরুদ্ধে অন্যের সীমাহীন ঘৃণা-বিদ্বেষ, নির্মূল বাসনার প্রকাশরূপে এক উন্মত্ত রক্তখেলা।"[৫১]

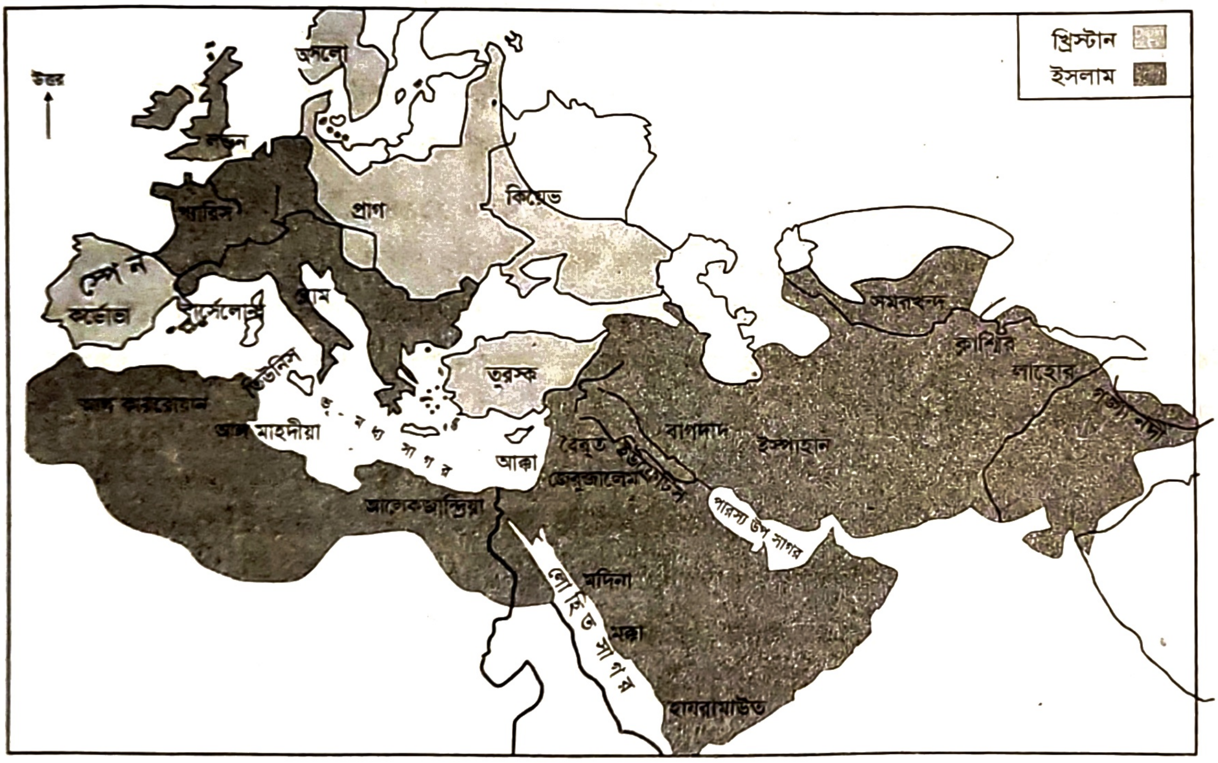
খ্রিস্টান
ইসলাম
উত্তর
অসলো
লন্ডন
প্যারিস
প্রাগ
কিয়েভ
স্পেন
কর্ডোভা
বার্সেলোনা
রোম
তিউনিস
তুরস্ক
আল কায়রোয়ান
আল মাহদীয়া
ভূমধ্য সাগর
আক্কা
বৈরুত
বাগদাদ
ইস্পাহান
জেরুজালেম
আলেকজান্দ্রিয়া
পারস্য উপসাগর
মদিনা
মক্কা
লোহিত সাগর
হাযরামাউত
সমরখন্দ
কাশ্মির
লাহোর
গঙ্গা নদী

ক্রুসেডের সময়ে ইসলাম ও খ্রিষ্টশক্তি

তাই বলা যায় যে, ক্রুসেড অর্থ ধর্মযুদ্ধ হলেও তার সঙ্গে কার্যত ধর্মের সম্পর্ক বেশি ছিল না। বরং এ যুদ্ধগুলোর পেছনে মধ্যযুগের ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ একটি বড় ভূমিকা রেখেছিল।

ক্রুসেডের কারণ

ধর্মীয় কারণ: ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর সময় আমর ইবন আল-আস জেরুজালেম জয় করেন। এর ফলে খ্রিষ্টান জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, ইসলামের পবিত্র নগর জেরুজালেম খ্রিষ্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের কাছেও পবিত্র বলে গণ্য। কারণ এটি তিনটি ধর্মের সঙ্গেই কমবেশি যুক্ত। এ কারণে ফাতেমীয় নবম খলিফা আল হাকিম ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমে খ্রিষ্টানদের পবিত্র সমাধি ও গির্জা ধ্বংস করলে তারা খুবই বিক্ষুব্ধ হয়। খ্রিষ্টানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল জেরুজালেমে তীর্থযাত্রায় আসা। প্রথমদিকের মুসলিম শাসকবৃন্দ পরধর্মসহিষ্ণু হওয়ায় খ্রিষ্টানরা সহজেই

---

[৫০] The Crusades represent the reaction of Christian Europe against Moslem Asia. –Ref : P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.635

[৫১] উৎস: ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৯১

সেখানে যেতে পারত। কিন্তু সেলজুকরা সহিষ্ণুতা না দেখিয়ে খ্রিষ্টানদের এ তীর্থযাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এর ফলে ইউরোপের ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। এইচ এইচ মাইয়ার বলেন, "এ অবস্থায় ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় আরবান গ্রিক খ্রিষ্টানদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য এ সূত্র ধরে সব ইউরোপীয় খ্রিষ্টানের কাছে ক্রুসেডে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।"[৫২]

অর্থনৈতিক কারণ: ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাগুলো মুসলমানদের দখলে চলে যাওয়ায় ১০ম শতাব্দী থেকেই ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের সাথে আরবের মুসলমানদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। এ সময় মুসলমানরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করলে ইউরোপীয়রা বাণিজ্যিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। ইউরোপীয় বণিকরা ভূমধ্যসাগরে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য পোপের অধীনে সমবেত হতে থাকে। এজন্য ধর্মকে প্রণোদনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

রাজনৈতিক কারণ: তখন ভৌগোলিকভাবে ইউরোপের তিন দিকে ছিল মুসলিম শক্তি— স্পেনে উমাইয়া, উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয় এবং আরব ভূ-খণ্ডে শক্তিশালী আব্বাসি শাসন। এ পরিস্থিতিতে সেলজুকরা ক্ষমতায় এসে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা নিজেদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। বেনজামিন জেড কেদার বলেন, "নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেয়।"[৫৩]

সামাজিক কারণ: ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ বলেন, "সামন্ততন্ত্র তার চারিত্রিক কারণেই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধকে উৎসাহিত করেছিল।" (উৎস: *বিশ্বসভ্যতা,* পৃ-১৭৫)। সামন্ততন্ত্রের প্রভাবে মধ্যযুগের ইউরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক ধরনের অরাজকতা নেমে এসেছিল। এ সময় সামন্তপ্রভুরা একে অন্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। তারা নিজেদের প্রভাব ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য ক্রুসেডকে উৎসাহিত করে।

প্রত্যক্ষ কারণ: ১০৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সেলজুকরা জেরুজালেম অধিকার করে সেখানে খ্রিষ্টানদের পবিত্র গির্জার পাশে মসজিদ তৈরি করে। এর ফলে খ্রিষ্টানরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এরই প্রতিক্রিয়ায় পোপ দ্বিতীয় আরবান খ্রিষ্টান ধর্মযাজক, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও রাজাদের এক ধর্মসভার আয়োজন করে মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম রক্ষার আহ্বান জানান। এভাবেই কয়েক শতক জুড়ে চলা মহাযুদ্ধ ক্রুসেডের সূত্রপাত হয়।

ক্রুসেডের ঘটনাপ্রবাহ

তিনটি পর্যায়ে মোট আটটি বড় রকমের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এর প্রতিটি কয়েক বছর স্থায়ী ছিল। ক্রুসেডের এই তিনটি পর্যায় হলো— (১) ১০৯৫-১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী প্রথম পর্যায়। এ সময় ক্রুসেডাররা মুসলিম দেশগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কয়েকটি রাষ্ট্র স্থাপন করে। (২) ইমামুদ্দীন জঙ্গী থেকে গাজী সালাহ্উদ্দিন পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়। এ সময় মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। (৩) তৃতীয় পর্যায়ে খ্রিষ্টানদের মধ্যে কয়েকটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে ক্রুসেডারদের প্রভুত্বের অবসান ঘটে এবং ক্রুসেড ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

প্রথম পর্যায় (১০৯৫-১১৪৪ খ্রি.): ক্রুসেডের প্রথম পর্যায়ে ফরাসি, ইতালীয় এবং জার্মান ক্রুসেডাররা ওল্টার পিটার, গডফ্রে, বল্ডুইন ও বোহেমণ্ডের নেতৃত্বে এশিয়া মাইনর দখল করে। ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেডাররা এডেসা এবং সিরিয়ার এন্টিয়ক শহর অধিকার করে। ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে তারা গডফ্রের অধীনে জেরুজালেম অধিকার করে। ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমের খ্রিষ্টান রাজা বল্ডুইন জাফা, আক্কা, হাইফা, সিডন এবং বৈরুত দখল করেন। ১১০৯ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টানরা ত্রিপলি করতলগত করে।

এ সব যুদ্ধে দশ হাজারেরও বেশি নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক প্রাণ হারায় এবং বহু মসজিদ এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। খ্রিষ্টানরা প্রথম পর্যায়ের ক্রুসেডে বিজিত মুসলিম ভূখণ্ডে চারটি ল্যাটিন রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল — এডেসা রাজ্য, এন্টিয়ক রাজ্য, ত্রিপলি রাজ্য এবং জেরুজালেম রাজ্য। সেখানে তথাকথিত ধর্মযোদ্ধারা ব্যাপক নিষ্ঠুরতা এবং অপকর্ম চালায়।

---

[৫২] Ref : H.E. Mayer, The Crusades, *Tran by J. Gillingham*, p.2

[৫৩] Ref : Benjamin Z. Kedar, *Crusade & Mission*, p.57

দ্বিতীয় পর্যায় (১১৪৪-১১৯৩ খ্রি.): ক্রুসেডের দ্বিতীয় স্তরে মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের ওপর প্রতি-আক্রমণ চালায়। এ পাল্টা আক্রমণের প্রথম নেতা ছিলেন ইমামুদ্দিন জঙ্গী (১১২৭-১১৪৬ খ্রি.)। তিনি সুলতান মাহমুদের (সেলজুক) কাছ থেকে ওয়াসিত শহর লাভ করেন এবং পরে নিজ যোগ্যতাবলে সমগ্র সিরিয়া, মসুল এবং মেসোপটেমিয়ার শাসক হন। ইমামুদ্দিন ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দে এডেসা পুনরুদ্ধার করেন এবং ক্রুসেডারদের সিরিয়া থেকে তাড়িয়ে দেন। তিনি আলেপ্পো ও হামা দখল করেন। এই বীর যোদ্ধা বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে 'আতাবেগ' উপাধি গ্রহণ করেন।

ইমামুদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র নুরুদ্দিন জঙ্গী (১১৪৬-১১৭৪ খ্রি.) আলেপ্পোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইতোমধ্যে এডেসার পতনে ইউরোপে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেন্ট বার্নার্ড মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ক্রুসেড ঘোষণা করেন। এবার জার্মানির তৃতীয় কনরাড এবং ফ্রান্সের সপ্তম লুই মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তবে নুরুদ্দিনের তীব্র আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে ক্রুসেডাররা এডেসা পুনর্দখলের বদলে বরং নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়। নুরুদ্দিন উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে ক্রুসেডারদের কাছ থেকে এন্টিয়ক ও ত্রিপলি পুনর্দখল করেন। এ সময় শুধু জেরুজালেম ছাড়া বাকি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো মুসলমানরা পুনরুদ্ধার করে। এভাবে দ্বিতীয় ক্রুসেড শেষ হয়।

১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দে নুরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী দুর্বল ও বালক মালিক শাহের শাসনামলে ক্রুসেডাররা দামেস্ক আক্রমণ করে। এসময় গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবি সিরিয়া, আলেপ্পো এবং মিসরের শাসনভার লাভ করেন। ইতোমধ্যে জর্ডানের কারাকের শাসনকর্তা রেজিনাল্ড সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করে একটি মুসলিম কাফেলা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করলে সালাহউদ্দিন তাইবেরিয়া আক্রমণ এবং তা দখল করেন। তিনি হিট্টিনের যুদ্ধে রেজিনাল্ডসহ ক্রুসেডারদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। রেজিনাল্ডসহ বহুসংখ্যক ক্রুসেডার এ যুদ্ধে নিহত হন। এর আগে ঐ বছরই সালাহউদ্দিন জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করলে ইউরোপের খ্রিষ্টান জগতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। শুরু হয় তৃতীয় ক্রুসেডের উন্মাদনা। জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা, ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস বহুসংখ্যক ক্রুসেডার যোদ্ধা নিয়ে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের জন্য টায়ারে একত্রিত হয়ে আক্কা অবরোধ ও দখল করেন। এর পর ক্রুসেডাররা আস্‌কালনের দিকে অগ্রসর হয়। রিচার্ড আক্কা অধিকারের সময় নিষ্ঠুরতার সাথে প্রায় ২,৭০০ মুসলিম যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করেন। সালাহ্‌উদ্দিন বীরবিক্রমে রিচার্ডের গতিরোধ করেন। রিচার্ড বাধ্য হয়ে সালাহ্‌উদ্দিনের সাথে ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সন্ধি চুক্তি করে স্বদেশে ফিরে যান। ক্রুসেডারদের জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় ক্রুসেডের পর খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে বিবাদের অবসান ঘটে। খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের তখন থেকে বিনা বাধায় এবং বিনা করে জেরুজালেম নগরী পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়। গাজী সালাহউদ্দিন ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ দামেস্কে ইন্তেকাল করেন।

তৃতীয় পর্যায় (১১৯৩-১২৯১ খ্রি.): সালাহ্‌উদ্দিনের মৃত্যুর দুই বছর পর পোপ তৃতীয় সেলেস্টাইন চতুর্থ ক্রুসেডের সূচনা করেন। ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেডাররা সিসিলি দখল করে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। তারা সালাহ্‌উদ্দিনের ভাই আদিলের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে স্থির হয় যে, তিন বছরের জন্য যুদ্ধ স্থগিত থাকবে। কিন্তু তিন বছর শেষ হওয়ার আগেই পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট মুসলমানদের বিরুদ্ধে পঞ্চম ক্রুসেড ঘোষণা করেন। ইংল্যান্ডের রিচার্ডসহ ইউরোপের কয়েকজন রাজা এ ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ক্রুসেডাররা এবার সিরিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর না হয়ে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করে। সেখানে তারা বহুসংখ্যক গ্রিক নর-নারীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

১২১৬ খ্রিষ্টাব্দে ষষ্ঠ ক্রুসেডেরও সূচনা করেন পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট। ক্রুসেডের সৈনিক হিসেবে এবার আড়াই লক্ষ ধর্মযোদ্ধা সিরিয়া হয়ে মিসরে যায় এবং ডামিয়েটা আক্রমণ করে। সেখানকার ৭০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় সবাইকে ক্রুসেডাররা হত্যা করে। এরপর তারা কায়রো আক্রমণ করে। তবে মুসলমানরা সাফল্যের সাথে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। নীল নদের প্লাবন এবং যুদ্ধসম্ভারে ঘাটতির কারণে ক্রুসেডাররা ডামিয়েটা ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে ১২২১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশে ফিরে যায়।

১২৩৮ খ্রিষ্টাব্দে নবম গ্রেগরি সপ্তম ক্রুসেডের সূচনা করেন। ইতোমধ্যে মালিক-উল-আদিলের বংশে দ্বন্দ্ব শুরু হলে তার পুত্র কামিল জার্মানির সম্রাটের কাছে জেরুজালেম হস্তান্তর করে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। খ্রিষ্টানরা এবার প্যালেস্টাইন আক্রমণ করে। কামিলের পুত্র ১২৩৯ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টানদের পরাজিত করে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন।

১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের নবম লুইয়ের নেতৃত্বে অষ্টম ক্রুসেড পরিচালিত হয়। কিন্তু ক্রুসেডাররা পরাজিত হয় এবং তাদের নেতা লুই মুসলমানদের হাতে বন্দি হন। মুসলমানদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে লুই মুক্তিলাভ করে দেশে ফিরে যান। এরপর মুসলমানরা কৃতিত্বের সাথে লড়াই চালিয়ে ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তাদের হারানো সকল ভূখণ্ডে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ১২১২ খ্রিষ্টাব্দে আরও একটি ব্যতিক্রমধর্মী ক্রুসেড সংঘটিত হয়। এটি 'শিশুদের ক্রুসেড' নামে পরিচিত।

ক্রুসেডের পর্যায় ও অংশগ্রহণকারীরা

পর্যায়সমূহ	প্রধান খ্রিষ্টান নেতা	প্রধান মুসলিম নেতা	যুদ্ধের ফলাফল
১ম পর্যায় ১০৯৫-১১৪৪	পোপ দ্বিতীয় আরবান, ওয়াল্টার পিটার, গডফ্রে, বল্ডুইন, বোহেমন্ড	ইমামুদ্দিন জঙ্গী	খ্রিষ্টানরা জেরুজালেম, আক্কা, জাফা, সিডন, ত্রিপলি দখল করে নেয় এবং মুসলমানরা পুনরায় আন্দ্রেস দখল করে।
২য় পর্যায় ১১৪৪-১১৯৩	জার্মান সম্রাট বারবারোসা, ফরাসি সম্রাট অগাস্টাস ও ব্রিটিশ রাজা রিচার্ড	নুরুউদ্দীন জঙ্গী এবং সালাহ্উদ্দিন আইয়ুবি	মুসলমানরা জেরুজালেম ছাড়া সকল হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে।
৩য় পর্যায় ১১৯৩-১২৯১	পোপ তৃতীয় সেলেস্টাইন, পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট, পোপ তৃতীয় গ্রেগরি	আদিল, ইসমাইল, আল-সালিয়াহ, বাইবার্স	মুসলমানরা সকল হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে এবং খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের সমাপ্তি টানে।

ক্রুসেডের সমালোচনা

মধ্যযুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রায় তিন শতাব্দীকালব্যাপী যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা তাকে **'ক্রুসেড'** বা **'ধর্মযুদ্ধ'** নামে অভিহিত করেছেন। এ যুদ্ধে অংশ নেওয়া প্রত্যেক নাইট বা বীরপুরুষকে মধ্যযুগে বীরত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে মনে করা হতো। দৃশ্যত জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য ধর্মযুদ্ধের ডাক দেওয়া হলেও বাস্তবে নতুন রাজ্য জয় ও ধনার্জনের মতো পার্থিব লাভের আশায়ই বেশিরভাগ ক্রুসেডার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য না থাকলে এ সব ক্রুসেড সংঘটিত হতো কি না সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

ঐতিহাসিক গিবন বলেন, "খ্রিষ্টান ইউরোপের অর্বাচীন, বর্বর ও অশিক্ষিত লোকেরাই ক্রুসেডে যোগদান করেছিল।[৫৪] ঐতিহাসিক মিলম্যান মাইকদ বলেন, "যুবতীদের ওপর সদর রাস্তায় বীভৎস অত্যাচার করা হতো। গায়িকারা অশ্রাব্য গানে পবিত্র ধর্মগৃহ অপবিত্র করত এবং খ্রিষ্টান যাজকেরা বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগাভাগিতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ সহকারে সেখানে উপস্থিত হতো।" মিলসের মতে, প্যালেস্টাইনের ব্যভিচারী, বিশ্বাসঘাতক এবং উৎপীড়ক খ্রিষ্টানরাই "আবার পবিত্র ভূমির রক্ষক বলে পরিগণিত হতো।" এমনকি ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারীদের দাস হিসেবে বাজারে বিক্রি করতেও তৎকালীন যাজকশ্রেণি দ্বিধাবোধ করেননি। প্রকৃতপক্ষে ক্রুসেডের ইতিহাস হলো মধ্যযুগের ইউরোপের খ্রিষ্টান যাজকশ্রেণির 'কলঙ্কের' ইতিহাস। ঐ ধরনের নৈতিকতাবিবর্জিত কার্যকলাপে পরিপূর্ণ যুদ্ধকে 'ধর্মযুদ্ধ' বলা যায় কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

ক্রুসেডের ফলাফল

ক্রুসেড তৎকালীন কোনো সাধারণ মানুষের জন্যই শান্তি আনতে পারেনি। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, "ক্রুসেডসমূহ ইতিহাসের অন্যতম চরম উন্মত্ততাপূর্ণ অধ্যায়।" (The Crusades form one of the maddest episodes in history) প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধগুলো ছিল মানবতার বিপর্যয় আর ধ্বংসলীলার প্রতীকস্বরূপ। ক্রুসেডের ফলে অসংখ্য মুসলমান প্রাণ হারিয়েছিল। পশ্চিম এশিয়ার অনেক নগরসহ বিস্তীর্ণ এলাকা শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে খ্রিষ্টানরা পবিত্রভূমি জেরুজালেম স্থায়ীভাবে দখলে নেওয়ার জন্য বিপুল ধনসম্পদ ব্যয় এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েও সফল হয়নি। ধ্বংস আর রক্তক্ষয়ই ছিল ক্রুসেডের ফল।

---

[৫৪] 'The most stupid and savage refuse of people of the Christian Europe joined the Crusades'.

অন্যদিক থেকে দেখলে ধ্বংসাত্মক ক্রুসেডের কিছু ইতিবাচক প্রভাবও ছিল। এতে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের পথ সুগম হলেও মধ্যযুগের ধর্মযাজকেরা সমাজের প্রগতির সব পথ যে রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন তা-ও স্পষ্ট হয়ে পড়ে। যাজকশ্রেণি তাদের অপরিসীম প্রভাববলেই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের সব পথ বন্ধ করে রেখেছিল। ক্রুসেডে অংশ নিয়ে বহু ইউরোপীয় দেশবিদেশ সফর করায় তাদের চিন্তাধারা প্রশস্ত হয়। এর প্রভাবে ইউরোপীয় সমাজে স্বৈরতান্ত্রিক ধর্মযাজকদের ক্ষমতা বহুলাংশে কমে যায়। এটি ওই মহাদেশের সমাজের প্রগতির পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ ছিল।

ধর্মযুদ্ধসমূহের ব্যয়ভার বহনের জন্য ইউরোপের অনেক সামন্তরাজা তাদের ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করতে কিংবা বন্ধক রাখতে বাধ্য হন। যুদ্ধশেষে তাদের অনেকেরই কোনো প্রকার আর্থিক প্রাপ্তি হয়নি। এতে বহু ব্যারন এবং নাইট সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। এই শ্রেণির বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে ইউরোপে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হতে থাকে এবং কেন্দ্রীয় রাজকীয় কর্তৃত্ব শক্তিশালী হয়।

মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ক্রুসেড চলার ফলে তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানও হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে ধর্মযুদ্ধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনেও সহায়তা করেছিল। জ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রেও ক্রুসেডের অবদান উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক টয়েনবি যথার্থই বলেছেন— "ক্রুসেডের চেতনার মধ্য থেকেই আধুনিক ইউরোপ জন্মলাভ করেছে।" (Modern Europe was born out of the spirit of the Crusade.) ঐ সময় আরবের মুসলমানরা শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। ক্রুসেডের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা তাতে প্রভাবিত হয়। হুটন ওয়েবস্টার বলেছেন, ক্রুসেডাররা মুসলমানদের "মার্জিত রুচিজ্ঞান, উন্নততর ভাবধারা ও উদার সহানুভূতি নিয়ে স্বদেশে ফিরে যায়।" এ মনোভাব পরে ইউরোপে আলোড়ন তোলা রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ ঘটাতে সহায়ক হয়েছিল। তাই আমরা বলতে পারি, ইউরোপের নবজাগরণে তথা বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে ক্রুসেডের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

ধর্মযুদ্ধের ফলে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে বাণিজ্যেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ইউরোপীয়রা মুসলমানদের উন্নত কৃষিপদ্ধতি ও বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে জানতে পারে। ইউরোপের খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের কাছ থেকে নাবিকদের কম্পাস, সুগন্ধি দ্রব্য, মসলা, মিষ্টান্ন ইত্যাদির সঙ্গেও পরিচিত হয়। এভাবে পাশ্চাত্যে আরব তথা এশীয় পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে নৌপথে বাণিজ্যের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন জলপথ আবিষ্কৃত হয়। তবে এর ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মুসলমানদের একচেটিয়া আধিপত্য ক্ষুণ্ন হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'ক্রুসেড' কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫; ২০১৬]*
২. ক্রুসেডের সময়কাল কত?
৩. কোন নগরী মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের কাছে পবিত্র বলে গণ্য?
৪. ক্রুসেডের প্রধান কারণ কী ছিল?
৫. তিনটি পর্যায়ে মোট কয়টি ক্রুসেড সংঘটিত হয়?
৬. ১২১২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত ব্যতিক্রমধর্মী ক্রুসেডটি কী নামে খ্যাত?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ক্রুসেডের কারণ অনুসন্ধান করে ছক আকারে লেখো।
২. ক্রুসেডের নাম ও সংঘটিত হওয়ার সময়কাল লিখে একটি ছক তৈরি করো।

পাঠ ২৪

সালাহউদ্দিন আইয়ুবির পরিচয়, চরিত্র ও কৃতিত্ব (১১৭৪-১১৯৩ খ্রি.)
Introduction, Character and Achievements of Salauddin Ayyubi (1174-1193 AD)

আইয়ুবি বংশ (১১৭৪-১২৫০ খ্রি.)

ফাতেমি বংশের ধ্বংসস্তূপের ওপর ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মিসর ও সিরিয়ায় তুর্কি আইয়ুবি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবি। তিনি ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সালাহউদ্দিনের পিতার নাম ছিল নাজমুদ্দিন আইয়ুব। তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা ইমামুদ্দিন জঙ্গীর একজন কর্মকর্তা ছিলেন। নাজমুদ্দিনের পুত্র সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমিদের পতনের পর মিসরে এক নতুন রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। পিতার নামানুসারে তিনি এর নামকরণ করেন "আইয়ুবি বংশ"। এ বংশের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মিসর। বারো ও তেরো শতকে এ রাজবংশ মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত।

আইয়ুবি বংশ তালিকা

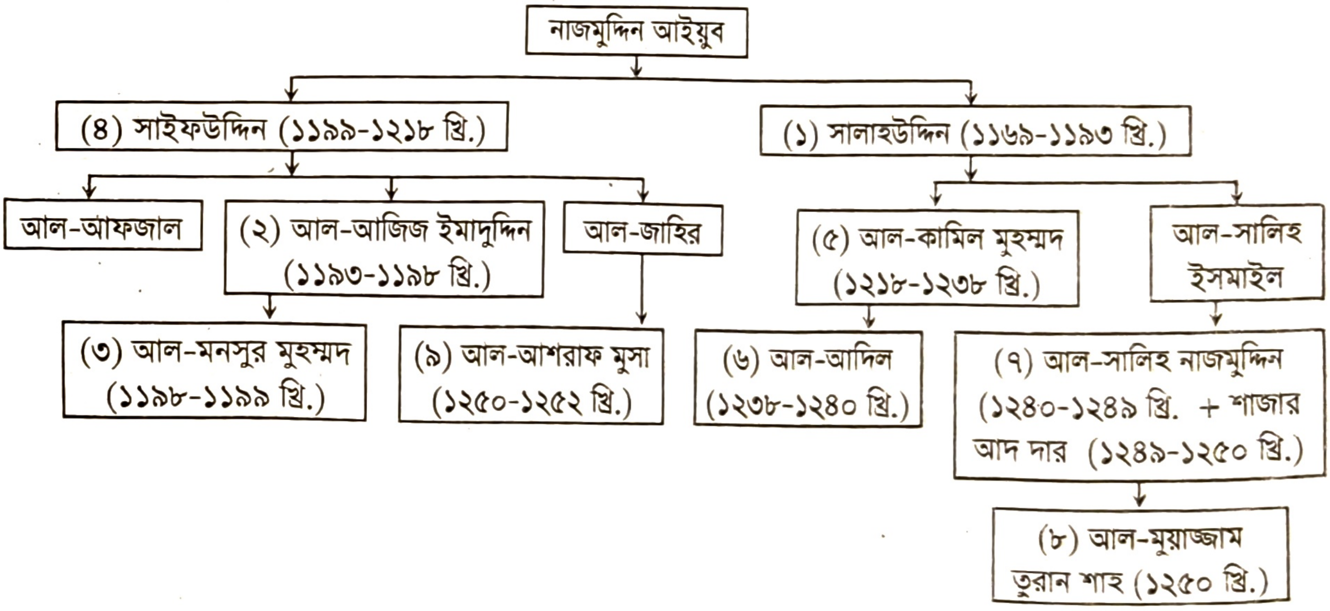
নাজমুদ্দিন আইয়ুব
(৪) সাইফউদ্দিন (১১৯৯-১২১৮ খ্রি.)
(১) সালাহউদ্দিন (১১৬৯-১১৯৩ খ্রি.)
আল-আফজাল
(২) আল-আজিজ ইমাদুদ্দিন (১১৯৩-১১৯৮ খ্রি.)
আল-জাহির
(৫) আল-কামিল মুহম্মদ (১২১৮-১২৩৮ খ্রি.)
আল-সালিহ ইসমাইল
(৩) আল-মনসুর মুহম্মদ (১১৯৮-১১৯৯ খ্রি.)
(৯) আল-আশরাফ মুসা (১২৫০-১২৫২ খ্রি.)
(৬) আল-আদিল (১২৩৮-১২৪০ খ্রি.)
(৭) আল-সালিহ নাজমুদ্দিন (১২৪০-১২৪৯ খ্রি. + শাজার আদ দার (১২৪৯-১২৫০ খ্রি.)
(৮) আল-মুয়াজ্জাম তুরান শাহ (১২৫০ খ্রি.)

সালাহউদ্দিন আইয়ুবির পরিচয়

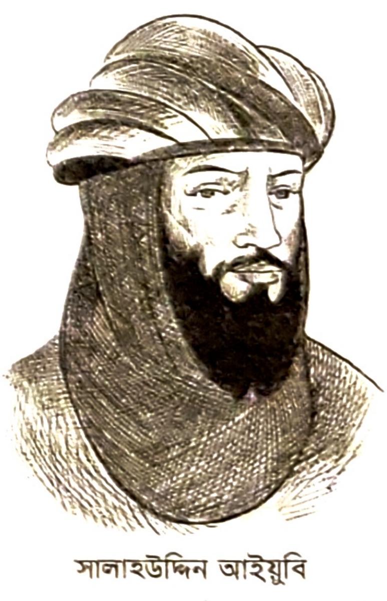
সালাহউদ্দিন আইয়ুবি

সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ১১৩৭ সালে ইরাকে দজলা নদীর তীরে অবস্থিত তিকরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম ইউসুফ। সালাউদ্দিন হলো তার উপাধি, যার অর্থ বিশ্বাসের ন্যায়পরায়ণ। তিনি ছিলেন জাতিতে কুর্দি এবং সুন্নি মতাদর্শের অনুসারী। তার বাবা ছিলেন কুর্দি নেতা নাজমুদ্দিন আইয়ুব। নাজমুদ্দিন আতাবেগ জঙ্গির অধীনে বালাবাক্কুর সেনাধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সালাউদ্দিন ১১৬৪ সালে পিতৃব্য শিরকুহের সাথে মিসর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে জয়ী হলে শিরকুহ ফাতেমি খলিফা আল-আজিজের (১১৬০-১১৭১) উজিরের পদটি করায়ত্ত করে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু খলিফা পদে আসীন হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই শিরকুহের মৃত্যু হলে (১১৬৯ খ্রি.) সালাহউদ্দিন আইয়ুবি চাচার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শাসনক্ষমতায় বসে নিজেকে একটি স্বাধীন রাজবংশের নৃপতি হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত করেন। সালাহউদ্দিন পরে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনাসহ যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেগুলো তাকে ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম সফলতম শাসক ও বীরে পরিণত করে। ক্ষমতার শিখরে থাকার সময় মিসর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, হেজাজ, ইয়েমেন এবং উত্তর আফ্রিকার অংশবিশেষ সালাহউদ্দিনের সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলামের এই খ্যাতিমান বীর ১১৯৩ সালের ৪ঠা মার্চ মাত্র ৫৫ বছর বয়সে দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন।

চরিত্র

মহানুভব: শাসক ও ব্যক্তি হিসেবে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন মহানুভব। পি. কে. হিট্টি বলেন, "সালাহউদ্দিন যেমন প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন, তেমনই ছিলেন বিনয়ী (উৎস: *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ-৭৩৭)।" তার বিনয় ও মহানুভবতার একটি বড় নিদর্শন পাওয়া যায় হিট্টিনের যুদ্ধের পর খ্রিষ্টান শাসকদের সাথে সদাচরণ ও তাদের মুক্তিদানের ঘটনা থেকে। সালাহউদ্দিনের খ্রিষ্টান শত্রুরাও তার উদারতা, মহানুভবতা ও বদান্যতার প্রশংসা করেছেন। তিনি নিজে ধার্মিক ছিলেন এবং প্রকৃত ধার্মিকের মতোই অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মানুভূতিকে সম্মান দেখাতেন।

জনকল্যাণকামী: সালাহউদ্দিন আইয়ুবি একজন জনকল্যাণকামী শাসক ছিলেন। তিনি শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং জনকল্যাণেও অবদান রাখেন। তিনি বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মসজিদ নির্মাণ করেন। সালাউদ্দিন আইয়ুবি জনগণের উপকারের জন্য বাঁধ নির্মাণ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বিদ্যানুরাগী: সালাহউদ্দিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য গুণীজনদের যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতেন। মন্ত্রিসভার দুই উচ্চশিক্ষিত উজির আল-কাজি আল-ফাযিল এবং ইমাদ আল-দীন-আল-কাতিব-আল-ইসফাহানির নিয়োগ ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে তার জ্ঞানী-গুণীর প্রতি উদারতার পরিচয় মেলে।

কৃতিত্ব

স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা: ১১৬৭ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের বিদ্রোহের সুযোগে চাচা শিরকুহের সাথে সালাহউদ্দিন মিসরে যান। যুদ্ধে শিরকুহ জয়ী হলে তিনি ফাতেমি উজিরের পদটি করায়ত্ত করে খলিফা পদে আসীন হন। কিছুদিনের মধ্যে শিরকুহের মৃত্যু হলে সালাহউদ্দিন তার স্থলাভিষিক্ত হন (১১৬৯ খ্রি.)। ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দে নূরউদ্দিন জঙ্গীর আনুগত্য অস্বীকার করে তিনি মিসরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এভাবে সালাহউদ্দিন স্বাধীন আইয়ুবি বংশের শাসনের সূচনা করেন।

শাসনক্ষমতা সুদৃঢ়করণ: সালাহউদ্দিন আইয়ুবি একজন চৌকস শাসক হিসেবে সেনাবাহিনীর সংস্কার সাধন করেন এবং সেনাবাহিনী পরিচালনার জন্য যোগ্য সেনাপতি নিয়োগ দেন। তিনি এ লক্ষ্যে অর্থ-প্রশাসনও সুদৃঢ় করেন। বিশ্বস্ত কাজী আল-ফাযিলকে কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দিলে রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়।

সুন্নি শাসনের প্রতিষ্ঠা: সালাহউদ্দিন ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে শুক্রবারের নামাজের খুৎবা থেকে ফাতেমি খলিফার নাম বাদ দিয়ে আব্বাসি খলিফার নাম যুক্ত করেন। তিনি খলিফা মুস্তাদীর কাছ থেকে ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মিসর, আল-মাগরিব, নুরিয়া, পশ্চিম আরব ও প্যালেস্টাইনের শাসকের সম্মান পান। আব্বাসী খলিফা সালাহউদ্দিনকে 'মালিক-আন-নাসির' (বিজয়ী রাজা) উপাধি প্রদান করেন।

বিদ্রোহ দমন: সালাহউদ্দিন আইয়ুবি নিজ শাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য বিদ্রোহ দমনের দিকে নজর দেন। এজন্য তিনি নুরুদ্দিন জঙ্গীর পুত্র ইসমাইলের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং হাসায় জয়লাভ করে সমগ্র সিরিয়া দখল করেন। এর ফলে আল হেজাজসহ অন্যান্য ধর্মীয় শহর মিসরের অধীনতা স্বীকার করে।

গুপ্তঘাতকদের দমন: গুপ্তঘাতকরা সালাহউদ্দিনকে দুইবার হত্যার চক্রান্ত করে ব্যর্থ হয়। তিনি ১১৭৬ খ্রিষ্টাব্দে গুপ্তঘাতকদের নেতা রশিদ আল দিন সিনানের সদর দপ্তর 'শাসিয়াদ' অবরোধ করলে তারা দমিত হয়।

ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে অভিযান: পি কে হিট্টির মতে, "মিসরে এসে সালাহউদ্দিনের জীবনে প্রধান দুটি উদ্দেশ্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তা হলো— মিসরে শিয়া সম্প্রদায়ের পরিবর্তে সুন্নি শাসন প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মযুদ্ধে ফ্রাঙ্কদের প্রতিহত করা।" গুপ্তঘাতকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর তিনি নিশ্চিন্ত মনে ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ৬ দিন অবরোধের পর ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ জুলাই টিবেরিয়াস দখল করেন।

বল্ডুইনের বিরুদ্ধে অভিযান: ফ্রাঙ্কদের সাথে মুসলমানদের একটি শান্তি চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু ফ্রাঙ্করা শান্তি চুক্তির কথা ভুলে আরব ভূখণ্ডে লুণ্ঠন শুরু করে। ফরাসি রাজা বল্ডুইন তাদের মদদ দেন। ফ্রাঙ্করা দামেস্ক ও তার আশপাশে লুটতরাজ ও বিশৃঙ্খলা চালালে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে প্যালেস্টাইন আক্রমণ করেন। তবে তিনি ফরাসি বাহিনীর হাতে পরাজিত হন।

হিট্টিনের যুদ্ধ: টিবেরিয়াস অধিকারের পর সালাহউদ্দিন আরো অগ্রসর হলে ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩-৪ জুলাই ফ্রাঙ্ক অধিপতি শাটিলনের রেজিনাল্ডের (Reginald of Chatillon) সাথে বিখ্যাত হিট্টিনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে ফ্রাঙ্ক বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং রেজিনাল্ড ২০ হাজারের মতো সৈন্যসহ সালাহউদ্দিনের হাতে বন্দি হন।

ক্রুসেডে জেরুজালেম রক্ষা: ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার করেন সালাহউদ্দিন। পবিত্র শহরটি হাতছাড়া হওয়া ইউরোপের খ্রিষ্টান জগৎ সহজে মেনে নিতে পারেনি। তাই ইউরোপের রাজন্যরা নিজেদের মধ্যকার বিরোধ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৃতীয় ক্রুসেডের ডাক দেন। খ্রিষ্টানদের পক্ষে এ ক্রুসেডে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন তৎকালীন ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী তিন শাসক জার্মান সম্রাট ফ্রেডরিক বারবারোসা, ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস। পি কে হিট্টি বলেন, "এভাবেই শুরু হয় তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৯-১১৯২)।"[৫৫] সালাহউদ্দিন জাফা ও আক্কা দখল করলেও ক্রুসেডাররা তা পুনর্দখল করে নেয়। কিন্তু সালাহউদ্দিনের বীরত্বের কারণে ক্রুসেডাররা মূল লক্ষ্য জেরুজালেম পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হয়।

মূল্যায়ন: গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবি তার রাজনৈতিক ও সামরিক সাফল্যের জন্য ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। আইয়ুবি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা, রাজ্যবিস্তার, সুন্নি ইসলাম সংহতকরণ, খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য এবং শত্রু খ্রিষ্টান বাহিনীর সাথে সদাচরণসহ বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা তিনি ইসলাম ও ইউরোপীয় ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ইউরোপে তিনি 'সালাদিন' নামে পরিচিত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আইয়ুবি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
২. কত খ্রিষ্টাব্দে মিসর ও সিরিয়ায় আইয়ুবি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়?
৩. 'সালাহউদ্দিন' শব্দের অর্থ কী?
৪. সালাহউদ্দিন আইয়ুবি কততম ক্রুসেডে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়েছেন?
৫. আব্বাসি খলিফা মুস্তাদির সালাহউদ্দিনকে কী উপাধি দেন?
৬. ইউরোপে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি কী নামে পরিচিত?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সালাহউদ্দিন আইয়ুবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ছক আকারে লেখো।
২. সালাহউদ্দিন আইয়ুবির কৃতিত্বসমূহ নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

---

[৫৫] With them, the 'third crusade' (1189-92) begin. –Ref : P. K. Hitti *I-bid*, p-648

পাঠ ২৫

আব্বাসি খিলাফতের পতন ও এর ফলাফল
Fall of the Abbasid Khilafat and Its Results

অবনতি ও পতনের কারণ

চতুর্দশ শতাব্দীর বিশিষ্ট আরব সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন বলেছিলেন, ‘একশত বছরের মধ্যেই যেকোনো রাজবংশের উত্থান-বিকাশ, চরম উন্নতি ও পতন ঘটে।’ (আল-মুকাদ্দিমা) উমাইয়াদের মতো আব্বাসিদের বেলায়ও এরকম ঘটে। আব্বাসি খিলাফত পাঁচশত বছর (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) টিকে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এর গৌরবোজ্জ্বল সময় আল ওয়াসিকের (৮৪২-৮৪৭ খ্রি.) খিলাফতকাল পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। আব্বাসি খিলাফতের পতনের উল্লেখযোগ্য কারণ হলো—

খলিফাদের অযোগ্যতা: সর্বমোট ৩৭ জন আব্বাসি খলিফার মধ্যে মনসুর, মাহদী, হারুন ও মামুন পরাক্রমশালী এবং অসাধারণ শাসনদক্ষতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী খলিফারা, বিশেষ করে আল-মুতাজিদের (৮৯২-৯০২ খ্রি.) পর অযোগ্য খলিফারা রাজকার্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে ভোগবিলাসে ডুবে থাকতেন। ফলে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়: আব্বাসি খিলাফতের বিশালতার কারণে প্রদেশের সংবাদ রাজধানী বাগদাদে পৌছতে অনেক সময় লাগত। ফলে খলিফারা সময়মতো বিদ্রোহ দমনের জন্য দূর অঞ্চলে অভিযান পাঠাতে পারতেন না। খলিফা হারুনের রাজত্বকালে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার আগলাবি বংশ, মামুনের আমলে (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) তার সেনাপতি তাহির খোরাসানে স্বাধীন তাহিরী বংশ এবং পরবর্তীকালে ইদ্রিসীয়, সামানীয়, বুয়াইয়া, সেলজুক, গজনবী প্রভৃতি স্বাধীন বংশ গড়ে ওঠে। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অভাবে পরের দিকের খলিফারা সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি ধরে রাখতে পারেননি। আব্বাসি সাম্রাজ্যের এ দুরবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন– “রোগী ইতোমধ্যেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। তা টের পেয়ে সিঁদেল চোররা দরজা ঘরে প্রবেশ করে এবং রাজকীয় সম্পত্তি থেকে স্ব-স্ব অংশ কেড়ে নেয়।”[৫৬]

সামরিক বিভাগের প্রতি অমনোযোগিতা: উমাইয়ারা একক আরব বাহিনীর সাহায্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় যে মুসলিম সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন তা আব্বাসিদের বহুজাতিক বাহিনীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐতিহাসিকেরা বলেন, আব্বাসি খলিফারা বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের ভিত্তিতে সৈন্যবাহিনী গঠন করায় বাহিনীর সংহতি ও শক্তি হ্রাস পায়।

উত্তরাধিকার নীতিতে অনিয়ম: উমাইয়াদের মতো আব্বাসি খিলাফতেও সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও রক্তপাত লেগেই ছিল। হারুনের অদূরদর্শিতার ফলে আমিন এবং মামুনের মধ্যে (৮০৯-৮১৩ খ্রি.) মর্মান্তিক গৃহযুদ্ধ হয়।

জাতিগত বিভেদ: আব্বাসি খিলাফতে হিমারীয়-মুদারীয়, পারসিক, আরব, তুর্কি ও বার্বারদের মধ্যে জাতিগত বিভেদ ও গোত্রকলহ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ: আব্বাসি যুগে শিয়া, সুন্নি, দায়লামি, কারমাতিয়ান, মুতাজিলা, ইসমাইলি, গুপ্তঘাতক, আশারি, জিন্দিক, সর্বেশ্বরবাদী, বাতিনি প্রভৃতি ধর্মমতাবলম্বীদের সংঘাত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ আব্বাসি বংশের স্থায়িত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে।

আব্বাসি খলিফাদের নৈতিক অধঃপতন: মদ ও নারীকেন্দ্রিক হেরেম সংস্কৃতি এবং এর সাথে বিলাসী জীবনযাত্রা মিলিত হয়ে পরের দিকের আব্বাসি খলিফা ও অমাত্যবর্গের নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দেয়। তখনকার অধিকাংশ আব্বাসি খলিফা ছিলেন ভোগ-বিলাসে মত্ত। তারা বিপুলসংখ্যক উপপত্নী রাখতেন যা নাগরিকদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এটি আব্বাসিদের পতনের অন্যতম কারণ।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা: শেষদিকের আব্বাসি খলিফারা জনগণকে করভারে জর্জরিত করে নিজেরা ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত থাকতেন। শাসকের দুর্বলতায় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ ও কমপক্ষে ৪০ বারের মহামারিতে জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।

---

[৫৬] The sick man was already on his death bed when the burglars burst open the doors and snatched their share of the imperial heritage. –Ref : P.K. Hitti, *History of the Arabs, p-484*

তুর্কিবাহিনীর ঔদ্ধত্য: তুর্কি ক্রীতদাসীর সন্তান আল-মুতাসিম দুর্ধর্ষ তুর্কি যুবকদের নিয়ে যে বাহিনী গঠন করেন তা এক পর্যায়ে আব্বাসিদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বাহিনীর অত্যাচারে বাগদাদ এবং আরব ও পারস্যবাসীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। তাই তারা আব্বাসিদের পতনের জন্য উঠেপড়ে লাগে।

অন্যান্য কারণ: এছাড়া আমির-উমরাহদের স্বেচ্ছাচারিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতেমি খিলাফতের উত্থান, বুয়াইয়া ও সেলজুকদের দৌরাত্ম্য, অমুসলিমদের অসন্তোষ, বাইজান্টাইনদের আক্রমণ ও ক্রুসেডের ফলে আব্বাসি সাম্রাজ্যের ভিত নড়বড় করছিল। এমন অবস্থায় ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করলে পাঁচশ বছরের আব্বাসি শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাগদাদ ধ্বংসের ফলাফল: হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংসের আগে এর লোকসংখ্যা ছিল ২০ লাখের মতো। কিন্তু এ মোঙ্গল নেতার ছয় সপ্তাহের ভয়াবহ হামলায় এদের মধ্যে ১৬ লাখই প্রাণ হারায়। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "তিন দিন ধরে নগরীর রাজপথগুলোতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় এবং দজলার পানি এর গতিপথে বহু মাইল পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়।"[৫৭] হালাকু খানের আক্রমণে আব্বাসিদের চরম পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচশত বছরের পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী আব্বাসি বংশের চিরবিলুপ্তি ঘটে। বাগদাদ মোঙ্গলশাসিত পারস্যের ইলখানি সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। পি. কে. হিট্টি বলেন, "মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম কোনো খলিফা রইল না যার নাম শুক্রবারের খুৎবায় পাঠ করা যায়।"[৫৮] আব্বাসি খিলাফতের পতনের ফলে সুন্নি ইসলাম বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং সুন্নি মুসলমানরা ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "শিক্ষার গৃহ, সভ্যতার ক্ষেত্র এবং সারাসিন জগতের চক্ষু ও কেন্দ্রভূমি বাগদাদ চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।"[৫৯] ঐতিহাসিক বার্নার্ড লুইস-এর মতে, মোঙ্গল বিজয় তাদের অধীনস্থ দূরপ্রাচ্য অর্থাৎ চীনের এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের সভ্যতাকে একত্রিত করে যা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বাধার কারণে পৃথক ছিল। বাগদাদ ধ্বংসের ফলে শিয়া-সুন্নি, মালিকি-হাম্বলি, আরব-পারসিক দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে সুযোগ বুঝে তুর্কি জাতি ক্রমে নেতৃত্বে চলে আসে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আব্বাসি খিলাফত কত বছর রাজত্ব করে?
২. আব্বাসি খিলাফতে মোট কত জন শাসক ছিলেন?
৩. ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ আক্রমণ করেন কে?
৪. আব্বাসি খিলাফত পতনের প্রধান কারণ কী ছিল?
৫. কত খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি খিলাফতের পতন ঘটে? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
৬. আব্বাসিদের শেষ খলিফা কে ছিলেন? *[রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]*

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আব্বাসি খিলাফতের পতনের কারণগুলো চিহ্নিত করে ছক আকারে লেখো।

---

[৫৭] For three days the streets ran with blood, and the water of the Tigris was dyed red for miles along its course. –Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens, P-398*

[৫৮] For the first time in its history the Muslim world was left without a caliph whose name could be cited in the Friday prayers. –Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p-487

[৫৯] Baghdad, the abode of learning, the seat of culture, the eye and centre of the Saracenic world, was ruined for ever. –Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens,* p-398

পাঠ ২৬

আব্বাসিদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা
Central and Provincial Administration of the Abbasid

আব্বাসিদের কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা

খলিফা: ড. এস. এ. কিউ. হুসাইনি বলেন, "খলিফা সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রধান ছিলেন।"[৬০] তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। রাষ্ট্রের শাসনসংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ আদেশ-নির্দেশ মূলত তার মাধ্যমেই আইনে পরিণত হতো। রাজনৈতিক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রের সকল প্রকার প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কার্যাবলি তার নির্দেশেই পরিচালিত হতো। মোটকথা, খলিফা ছিলেন আব্বাসি শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র।

মজলিশ-উস-শুরা: আব্বাসি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় খলিফা সকল ব্যবস্থার প্রধান হলেও তারা স্বৈরাচারী ছিলেন না। খলিফা 'মজলিশ-উস-শুরা' নামে একটি মন্ত্রণা পরিষদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

উজির: আব্বাসি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় খলিফার পরেই ছিল উজিরের স্থান। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, পারসিকদের মধ্যে আগে থেকেই এ পদের ব্যবহার থাকলেও মুসলমানদের মধ্যে আব্বাসিরাই প্রথম এর সৃষ্টি করেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, "এমনকি উজিররা রাজতান্ত্রিক নীতির মতো পরবর্তী উত্তরাধিকারী নিয়োগ দিতে পারতেন।"[৬১] ঐতিহাসিক আল মাওয়াদী আব্বাসি শাসনামলে দুই প্রকার উজিরের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন— অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজির (বিজারাতুত তাফবীজ) এবং সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন উজির (বিজারাতুত তানফীজ)।

হাজিব: রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় খলিফা ও উজিরের পর ছিল হাজিবের অবস্থান। ড. এস. এ. কিউ. হুসাইনির মতে, হাজিবরা খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের সমস্যার কথা শোনা, বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের খলিফার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজ করতেন। হাজিবরা মূলত খলিফার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করতেন।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর

দিওয়ান আল-জুনদ: খলিফা ওমর (রা) এ বিভাগের সৃষ্টি করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্য নিয়োগ, সৈন্যদের বেতন-ভাতা বণ্টন এবং যাবতীয় সামরিক চাহিদা পূরণ করার দায়িত্ব দিওয়ান আল-জুনদ এর ওপর ন্যস্ত ছিল।

দিওয়ান আল-খারাজ: উমাইয়া শাসনামলে এ বিভাগটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। রাষ্ট্রের রাজস্ব-সংক্রান্ত সব বিষয় যেমন, রাজস্ব নির্ধারণ ও তা আদায় করা, রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারিদের বেতন-ভাতা ও উন্নয়ন কাজের অর্থ যোগান দেওয়া এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ছিল। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন 'সাহিব আল-খারাজ'।

দিওয়ান আল-বারিদ: আব্বাসি শাসনামলে সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল ডাক বিভাগ বা দিওয়ান আল-বারিদ বিভাগ। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক যোগাযোগ ও জনগণের উপকারের জন্য ডাক বিভাগের সেবা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আব্বাসি শাসনামলে ডাক বিভাগের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। ডাক বিভাগের প্রধানকে 'সাহিব আল-বারিদ' বলা হতো।

দিওয়ান আর-রাসায়েল: উমাইয়া শাসনামলেই 'দিওয়ান আর-রাসায়েল' বা সরকারি পত্রবিনিময় বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তবে আব্বাসি শাসনামলে এসে তা আরও সম্প্রসারিত হয়। সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন, এই বিভাগের প্রধানকে 'সাহিব দিওয়ান আর-রাসায়েল' বলা হতো।[৬২] তার কর্তব্য ছিল রাজকীয় ফরমান, নিযুক্তিপত্র, বিশেষাধিকার পত্র, রাজনৈতিক পত্রাদি রচনা করা এবং খলিফা ও উজিরের অনুমোদন লাভের পর খলিফার চিহ্নযুক্ত সিলমোহর দ্বারা এগুলো গালা দিয়ে সিল করা।

---

[৬০] Khalifah was the head of the whole Empire. –Ref : Dr. S. A. Q. Husaini, *Arab Administration, p.173*

[৬১] The Wizir, even transmitting own office according to the hereditary principle. –Ref : P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.319

[৬২] Ref : Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অন্যান্য দপ্তর: আব্বাসি প্রশাসনে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ছিল। এগুলো হচ্ছে— দিওয়ান আল-খাতাম বা নিবন্ধন বিভাগ, দিওয়ান আত-তাওকী বা আদেশনামা তৈরি বিভাগ, দিওয়ান আল-আযিম্মা বা হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগ, দিওয়ান আল-দীয়া বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, দিওয়ান আল-নাফাকাত বা তত্ত্বাবধান বিভাগ, দিওয়ান আল-সাওয়াফী বা অর্পিত সম্পত্তি তত্ত্বাবধান বিভাগ, দিওয়ান আল-নযর-ফীল-মাযালিম বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ফৌজদারি আদালত, দিওয়ান আল-কাযা বা বিচার বিভাগ, দিওয়ান আশ-শুরতা বা পুলিশ বিভাগ, দিওয়ান আল-হিসবাহ বা ধর্ম ও নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপ দমন বিভাগ, দিওয়ান আল-আখরিয়া বা কৃষি বিভাগ, দিওয়ান আল-মুকাতিয়াত বা সরকারি সাহায্য বিভাগ, দিওয়ান আল-মুসাদেরীন বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ বিভাগ, দিওয়ান আল-গিলমান বা দাস-দাসী বা আশ্রিতের রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ এবং দিওয়ান-আশ-শির বা গোয়েন্দা বিভাগ।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

আব্বাসি শাসনামলে শাসনকাজের সুবিধার্থে সমগ্র সাম্রাজ্যকে কতগুলো প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। সে যুগে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পশ্চাদপদ থাকায় প্রদেশসমূহে কেন্দ্রীয় শাসনেরই অনুরূপ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। ড. এস এ কিউ হুসাইনি বলেন, “কেন্দ্রের প্রত্যেক মূল দিওয়ানকে প্রদেশসমূহের সব বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুরূপ দিওয়ান অথবা একজন কর্মকর্তা থাকতো।”[৬৩] খলিফাকে কেন্দ্র করে প্রদেশসমূহে গভর্নরবৃন্দ শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। আমির ছিলেন প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। তিনি ছিলেন প্রাদেশিক শাসনের কেন্দ্রবিন্দু। রিউবেন লেভির মতে, “উজিরের পরামর্শ অনুযায়ী খলিফা আমির নিয়োগ দিতেন।”[৬৪] প্রাদেশিক শাসনকাজ সঠিকভাবে চলা নিশ্চিত করতে আব্বাসি শাসকেরা প্রদেশসমূহে গোয়েন্দা নিয়োগ দিতেন। প্রদেশসমূহের শাসনকাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য এ বিভাগ সদা তৎপর থাকত। গোয়েন্দা বিভাগ দিওয়ান আল বারিদের একটি অঙ্গ হিসেবে গভর্নর, রাজস্ব কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রাদেশিক রাজ-কর্মচারীর কার্যকলাপের তথ্য গোপনে সংগ্রহ করে কেন্দ্রে পাঠাত। এ সব তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই খলিফারা প্রদেশসমূহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন। ড. হুসাইনির মতে, আব্বাসি খলিফা আল মামুনের শাসনামলে পুরুষ ও নারী উভয় ধরনের গোয়েন্দা নিয়োজিত ছিল। শুধু বাগদাদেই ১৭০০ জন গোয়েন্দা ছিল বলে জানা যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আব্বাসি খিলাফতে সাম্রাজ্যের প্রধান ছিলেন কে?
২. আব্বাসি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় খলিফার পরে কার স্থান ছিল?
৩. দিওয়ান আল-খারাজ বিভাগের প্রধান কে ছিলেন?
৪. দিওয়ান আল-বারিদ কী?
৫. আব্বাসিদের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা কে?
৬. আব্বাসি আমলে গোয়েন্দা বিভাগ কোন বিভাগের অঙ্গ হিসেবে কাজ করত?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আব্বাসি খিলাফতের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক দপ্তরসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[৬৩] Each of the main Diwans at the centre had a corresponding Diwan or an officer to represent it in the province. –Ref : Dr. S. A. Q. Husaini, *Arab Administration*, p.210

[৬৪] Ref : R. Levy, *The Social Structure of Islam*

পাঠ ২৭

আব্বাসি শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
The Features of the Abbasid Administration

আব্বাসিরা দীর্ঘ প্রায় ৫০০ বছর (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করে। এর বড় একটি সময় তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। আব্বাসি সাম্রাজ্যের সীমা আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব তীর থেকে সিন্ধুনদ এবং কাস্পিয়ান সাগর থেকে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ সাম্রাজ্যে নানা ধর্ম ও জাতির লোক ছিল। তবে সাম্রাজ্যে বিদ্যমান ছিল ইসলামি অনুশাসন ভিত্তিক খিলাফত ব্যবস্থা। এখানে শাসক নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল রাজতান্ত্রিক। নিচে আব্বাসিদের শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো—

খিলাফত: খুলাফায়ে রাশেদিন ও উমাইয়া শাসনামলের মতো আব্বাসি শাসনামলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল খিলাফত তথা খলিফার শাসন। খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খলিফা নির্বাচিত হলেও উমাইয়া এবং পরবর্তীকালে আব্বাসি শাসনামলে রাজতান্ত্রিক খিলাফত ব্যবস্থা চালু ছিল। এ সময় খিলাফতে খলিফার রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে ধর্মীয় ক্ষমতাও বজায় ছিল। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, খলিফা নির্বাচনের সাথে ধর্মীয় ভাবধারা জড়িয়ে থাকায় বহুকাল পরে যখন আব্বাসিদের পার্থিব ক্ষমতার শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হয় তখনও শাসকেরা নিজেদের শাসনের স্বীকৃতিতে খলিফার অনুমোদনকে বড় করে দেখতেন।

আরব আধিপত্য বিনষ্ট: আব্বাসি শাসনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা আরব আধিপত্যের অবসান। উমাইয়া যুগে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আরব মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেওয়া হতো এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হতো। অনারব মুসলমানরা রাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদা পেত এবং নানাভাবে বঞ্চিত হতো। এমনকি তারা স্বতন্ত্র সামাজিক শ্রেণি 'মাওয়ালি' হিসেবে পরিচিত ছিল। পি. কে. হিট্টি বলেন, "রাষ্ট্রীয় নীতিতে আব্বাসিরা উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে সব শ্রেণির মুসলমানকে সমান অধিকারের সুযোগ দেন। এর ফলে অনারব মাওয়ালি মুসলমানরাও রাজ্যের সেনাবাহিনী, প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চপদে স্থান করে নেয় এবং পরবর্তীকালে আরবদের স্থলে পারসিক ও তুর্কিরাও উচ্চস্থানের অধিকারী হয়ে ওঠে।"[৬৫]

ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা: উমাইয়া শাসনামলে কিছু ধর্মনিরপেক্ষতা দৃশ্যমান হলেও আব্বাসি শাসনামলে ধর্মভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ড. আলী আসগর, ড. লুৎফর রহমান ও মোখলেছুর রহমান বলেন, "ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা আব্বাসি শাসনের এক উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য।"[৬৬] নিজেদের স্বার্থেই আব্বাসিরা ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আব্বাসি খলিফারা ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন আইনকানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগে আগ্রহ প্রদর্শন করেন। তারা ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়াও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন এবং মসজিদ-মাদ্রাসা স্থাপনসহ বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাছাড়া ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে উচ্চ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হতো।

রাজতন্ত্র: উমাইয়া শাসনের মতো আব্বাসি শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল রাজতন্ত্র। উমাইয়া খলিফাদের মতো আব্বাসি খলিফারাও উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতায় বসতেন। পি. কে. হিট্টি বলেন, "উমাইয়া খলিফারা উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে যথেচ্ছাচার চালু করেছিলেন আব্বাসি খলিফারাও তাদের পুরো শাসনামলে তাই অনুসরণ করে গেছেন।"[৬৭]

সাসানীয় প্রভাব: আব্বাসি শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল পারস্যের সাসানীয় প্রভাব। আব্বাসি শাসকেরা সাসানীয় শাসনের অনুকরণে এ যুগে মুসলিম শাসন ব্যবস্থায় উজির, জল্লাদ এবং রাজকীয় জ্যোতিষের নিয়োগ দিতেন। রাজদরবারের রীতি-নীতিতেও সাসানীয় প্রভাব ছিল।

---

[৬৫] Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.289

[৬৬] তথ্যসূত্র: ড. আলী আসগর, ড. লুৎফর রহমান ও মোখলেছুর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, পৃ.১৭০

[৬৭] The ill-defined hereditary principle of succession instituted by the Umayyad caliphs was followed throughout the Abbasid regime. –Ref : P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.317

স্বেচ্ছাচারিতা: আব্বাসি শাসন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা। বিশেষ করে আব্বাসি বংশের প্রথম পাঁচজন শাসকের আমলে শাসন ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচারিতা পরিলক্ষিত হয়। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, "খলিফা সকল ক্ষমতার উৎস ছিলেন এবং রাষ্ট্র শাসন সম্পর্কিত যাবতীয় আদেশ তার কাছ থেকেই আসত। উজির খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে তার নামে সাম্রাজ্যের সব কাজ চালাতেন। আর এ সব কাজের অধিকাংশই ছিল স্বেচ্ছাচারমূলক।"[৬৮]

জেনে রাখো

স্বেচ্ছাচারিতা বলতে নিজের ইচ্ছামতো যা খুশি তাই করাকে বোঝায়। স্বেচ্ছাচারী নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের অধিকার হরণ করতেও দ্বিধা করে না। এমনকি অন্যের ওপর দমন-পীড়নও চালায়। এটি স্বৈরতন্ত্রের (Autocracy) একটি বিশেষ রূপ। এ ব্যবস্থায় শাসকশ্রেণি চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়। তারা কারও মতের তোয়াক্কা না করে নিজেদের মতকেই প্রাধান্য দেয়। তবে কখনও কখনও এর কিছু ইতিবাচক ফলও ছিল।

বৈদেশিক সুসম্পর্ক স্থাপন: আব্বাসি শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা। বিরাট সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও আব্বাসিরা উমাইয়াদের মতো রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দেননি। তারা পার্শ্ববর্তী বাইজাইন্টাইনসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও রাজ্যের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে বসবাস করতেন। শুধু আক্রান্ত হলেই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতো।

উন্নয়নে মনোযোগ: আব্বাসি খলিফারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মুসা আনসারীর *(মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি)* মতে, "আব্বাসি খলিফাগণ যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে প্রথমত সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বিভিন্ন জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে এবং অত্যন্ত নীরবে এসব জাতিসত্তার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করায় দু'এক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র আরব সাম্রাজ্য প্রধান মুসলিম অধ্যুষিত দেশে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলে কুটিরশিল্পের বিকাশ ঘটায় অসংখ্য নগর, শহর ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং সমগ্র সাম্রাজ্য বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।"

শান্তিপ্রিয়তা: আব্বাসি শাসনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল শান্তিপ্রিয়তা। মুসা আনসারী বলেন, "উমাইয়ারা ছিল সম্প্রসারণবাদী অথচ আব্বাসিরা ছিল শান্তিবাদী।"[৬৯] আব্বাসিরা তাদের সীমান্ত রক্ষার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখলেও নিজেদের গৌরবময় যুগেও সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণ করেনি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা: আব্বাসি শাসনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি শাসকবর্গের প্রবল আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দান। আব্বাসি খলিফা মামুনের শাসনামলে বায়তুল হিকমাতে দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ, মৌলিক রচনা এবং গবেষণার যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল তাই পরবর্তীকালে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আব্বাসিদের খিলাফত ব্যবস্থা কীরূপ ছিল?
২. আব্বাসিদের শাসক নির্বাচনের পদ্ধতি কী ছিল?
৩. আব্বাসি শাসনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
৪. আব্বাসি শাসন ব্যবস্থায় কাদের প্রভাব ছিল?
৫. পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আব্বাসিদের নীতি কীরূপ ছিল?
৬. আব্বাসি আমলের কোন প্রতিষ্ঠান মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আব্বাসি শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো পয়েন্ট আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

---

[৬৮] Ref: Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*

[৬৯] মুসা আনসারী, *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি* পৃ. ২৮৫

পাঠ ২৮

আব্বাসি শাসনামলে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা (Socio-Economic, Cultural Condition and the Practice of History and Literature-Culture During the Abbasid Reign)

দীর্ঘ প্রায় ৫০০ বছরের রাজত্বকালে আব্বাসিরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রশাসন, রাজস্ব, বিচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করে। এ বিষয়টি রাজ্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আব্বাসি যুগ ছিল মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি, মেধা-মননশীলতার বিকাশ ও শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির এক উল্লেখযোগ্য সময়। আব্বাসি আমলে ইতিহাস রচনা এবং আরবি ও ফারসি সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তখন নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। আরব ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস রচনায় গতানুগতিক রীতি পরিহার করে সমালোচনা ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনার ধারা সৃষ্টি করেন। নিচে তাদের সময়কার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো—

আব্বাসিদের অর্থনৈতিক অবস্থা

আব্বাসি যুগে ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। এ যুগে শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও প্রভূত প্রসার লাভ করে। এ সময় বাগদাদ, বসরা, সিরিয়া, কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়া দ্রুত বড় স্থল ও নৌ-বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। তখন মুসলিম বণিকেরা পূর্বদিকে চীন এবং পশ্চিমে মরক্কো ও স্পেনের সাথেও বাণিজ্য করতেন। চীনের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্য হতো মূলত সিল্ক বস্ত্র নিয়ে। চীনের ক্যান্টন প্রদেশের সাথে বাগদাদের সুদৃঢ় বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কুটির শিল্পেরও ব্যাপক বিকাশ হয় এ আমলে। পারস্যে ও ইরাকে বহু তাঁতকল গড়ে ওঠে যাতে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র ও কার্পেট তৈরি হতো। এছাড়া আল-কুফায় তৈরি হতো সিল্ক বস্ত্র ও মাথা ঢাকার ওড়না। ফার্মা, তাওয়জি ইত্যাদি শহরে উন্নতমানের কার্পেট এবং বুটিদার ও রেশমি বস্ত্র তৈরির কারখানা ছিল। সিরিয়া আর মিসরে তৈরি হতো কার্পেট, সাবান, তামার তৈরি বাতি, কাঁচি, সুচ, ছুরি, তরবারি, তীর, থালা-বাসন, ঝাড়বাতি ইত্যাদি। তৎকালীন সিরিয়ার সিডন, টায়ার প্রভৃতি শহর এবং মিসরে অনেক কাচ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তাছাড়া সামাররা, সমরখন্দ ও বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক কাগজকল। আব্বাসি খলিফারা সাম্রাজ্যের কৃষির ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। ইরাক, খোরাসান, মিসরে প্রচুর বার্লি ও গম, খেজুর, তুলা, তিল ও শন উৎপন্ন হতো। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হতো প্রচুর ফলমূল। এ ব্যাপক বাণিজ্য এবং কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কার্যক্রমের বদৌলতে আব্বাসি আমলে প্রশংসনীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের ফলে খলিফারা সাম্রাজ্যের উন্নয়নে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হন।

আব্বাসি সমাজ ব্যবস্থা

আব্বাসি খলিফারা বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। আব্বাসি সমাজে প্রধানত দুই শ্রেণির মানুষ ছিল। প্রথমত, শাসকগোষ্ঠী; খলিফা ছিলেন যার কেন্দ্রবিন্দু। এরপরেই সমাজে অবস্থান ছিল আমির-উমরাহ, হাজিব প্রভৃতি অভিজাত শ্রেণির মানুষের। দ্বিতীয়ত, প্রজাসাধারণ। তাদের মধ্যে বিশেষ বিভেদ ছিল না। এসময় অতীতের আরব আভিজাত্যের অহমিকার অবসান ঘটে এবং আরব-অনারব বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আব্বাসি যুগে নারীরা সমাজে উচ্চ স্থানের অধিকারী ছিল। তারা স্বাধীনতা ভোগ করত। খলিফা মনসুরের দুই চাচাতো বোন বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সম্রাজ্ঞী জুবাইদা সুকবি ছিলেন। খলিফা মামুনের স্ত্রী বুরানও ছিলেন বিদূষী নারী। আব্বাসি খলিফারা অসংখ্য দাসী রাখতেন। তাদের অনেকে দাসীর প্রেমে পড়ে তাদের মুক্তি দিয়ে বিয়েও করতেন। খলিফা মনসুরের মা ছিলেন এমন একজন পারসিক দাসী। আল-ওয়াসিক ও আল-মুহতাদীর মা ছিলেন একজন গ্রিক নারী। এ সময় মাওয়ালিরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে সমান সামাজিক সুবিধা ভোগ করত। এমনকি শাসকেরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের আরবদেরও উপরে মর্যাদা দেন। আব্বাসি খলিফারা উদারতা দেখিয়ে জিম্মিদের উচ্চ রাজপদে চাকরি দিতেন।

আব্বাসি সংস্কৃতি

আব্বাসি আমলে ঢিলা পায়জামা, প্যান্ট, কামিজ (শার্ট জাতীয়), নিচের জামা, জ্যাকেট, খাফত, কাবা, সারা শরীর আবৃত করা আবা বা জুব্বা এবং মাথায় পরার কালান্‌সুয়া ভদ্রলোকদের সাধারণ পোশাক ছিল। বিভিন্ন পেশার লোকদের পোশাকে বৈচিত্র্য ছিল। ভ্রমণ, অশ্বারোহণ ও সামরিক কুচকাওয়াজের জন্য আলাদা আলাদা পোশাক ছিল। রাতে পরারও আলাদা পোশাক ছিল। পুরুষেরা জুতা ও বুটজুতা ব্যবহার করত। ধর্মশাস্ত্রবিদ ও আইনজ্ঞরা পাগড়ি ব্যবহার করতেন। সাধারণ লোকেরা মাথায় কালান্‌সুয়া পরত। ধনাঢ্য মহিলারা মণিমুক্তা দিয়ে সজ্জিত গম্বুজাকৃতি টুপি ব্যবহার করতেন। এই টুপির নিচের অংশে মণি বসানো স্বর্ণের একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত থাকত। মহিলারা পায়ে মল (খলাখল) ও হাতে বালা ব্যবহার করতেন। সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য তারা গাল ও ঠোঁট রঙ দিয়ে রাঙাতেন। আব্বাসি শাসনামলে চেয়ার বা উচ্চাসনের প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রকোষ্ঠের তিন দিকে স্থাপিত দীবান বা সোফা আব্বাসি আমলেই প্রচলিত হয়। প্রায় সব ঘরেই তা থাকত। লোকে দীবানের পাশের টেবিলে বসে খাবার খেতো। টেবিলগুলো কাঠের তৈরি হতো এবং ঝিনুক ও কচ্ছপের খোল দিয়ে সজ্জিত থাকত। রূপা, তামা বা পিতলের তৈরি একটি বড় গোলাকার ট্রে রেকাবিসহ শাদা কাপড়ে ঢেকে প্রত্যেক টেবিলের ওপর রাখা হতো। রেকাবিগুলো রূপা অথবা চীনামাটির তৈরি হতো। খেজুর ছিল আরবদের প্রধান খাদ্য। এছাড়া তারা উট ও দুম্বার মাংস খেতো। অবস্থাপন্ন লোকদের বাড়িতে কাচের পাত্রে শরবত পান করতে দেওয়া হতো। চিনি এবং গোলাপ, রজনীগন্ধা, শিউলি, গন্ধরাজসহ বিভিন্ন ফুলের সিরাপ দিয়ে সুগন্ধি শরবত প্রস্তুত করা হতো। খেজুর অথবা কিশমিশ দিয়ে তৈরি 'নবীজ' ছিল আরেকটি প্রচলিত পানীয়। সমাজের কেউ কেউ মদ পান করতো। ঘরের ভেতরের খেলাধুলার মধ্যে শতরঞ্জ (প্রাচীন ধরনের দাবাখেলা) সর্বসাধারণের প্রিয় ছিল। তবে খলিফা হারুন তাস ও পাশাখেলা বন্ধ করে দেন। বাইরের খেলাধুলার মধ্যে প্রধান ছিল ধনুর্বিদ্যা, পোলো (চৌগান), হকি (সুলাজান), বর্শা নিক্ষেপ (জারিদ), ঘোড়দৌড়, মল্লযুদ্ধ এবং পদব্রজে ও অশ্বারূঢ় অবস্থায় তলোয়ার চালনা।

খলিফা রশীদ ও মামুন পোলো খেলায় আসক্ত ছিলেন বলে 'রাওজাতাইন' গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই টেনিস জাতীয় (লা'ব-উল-কুরা) খেলত। মেয়েরা ধনুর্বিদ্যাও চর্চা করত। নৃত্য মূলত নিচু শ্রেণির মধ্যে প্রচলিত থাকলেও তরুণ-তরুণীরা আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রায়ই নৃত্যের চর্চা করত।

শিকার অভিযান ছিল আব্বাসি খলিফা ও আমির-ওমরাহদের অন্যতম বিনোদন। পি কে হিট্টি বলেন, "আগের মতো আব্বাসি আমলেও খলিফা ও যুবরাজদের ঘরের বাইরের সেরা অবসর বিনোদন ছিল শিকার।"[৭০]

ইতিহাস চর্চা

আব্বাসি শাসনামলে ইতিহাস চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। কুফা অঞ্চলের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন হিশাম আল-কালবী। আল-ফিহরিস্ত এর বর্ণনা মতে, হিশাম আল-কালবীর ১২৯টি রচনা ছিল। এর মধ্যে ৩টির অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। পি. কে. হিট্টির মতে, আত তাবারী, ইয়াকূত ও অন্যান্য বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আল-কালবীর লেখা থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। আব্বাসি শাসনামলের শুরুর দিককার আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন মদিনার অধিবাসী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক। হিট্টির মতে, "ধর্মীয় ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকই প্রথম 'সিরাতে রসুলুল্লাহ' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।" এছাড়া 'সিরাতে রসুলুল্লাহ' রচয়িতা ঐতিহাসিক আব্দুল মালেক ইবনে হিশাম, আল-ওয়াকিদী

---

[৭০] In the Abbasid period, as in the earlier one, hunting was the favourite outdoor passtime of the caliph and princes–Ref : P. K.Hitti, *History of the Arabs*, p.340

(৭৫০-৮২২ খ্রি.), আরবদের 'হেরোডোটাস' নামে খ্যাত আবু আল-হাসান আলী আল-মাসুদি (মৃ. ৯৫৭ খ্রি.), 'আবাকাত আল-সগীর ও কবীর' ও 'তারিখে ইসলাম' এর রচয়িতা ইবনে সাদ, 'ফুতুহ মিসর ওয়াআখবারুহা' এর লেখক ইবন আবদ-আল-হাকাম (মৃ. ৮৭০/৭১ খ্রি.), 'ফুতুহ-আল-বুলদান' ও আনসাব-আল-আশরাফ' গ্রন্থদ্বয়ের লেখক পারস্যবাসী আল-বালাজুরী (মৃ. ৮৯২ খ্রি.), 'কিতাব আল মারিফ' (জ্ঞানকোষ) এর রচয়িতা ইবনে কুতায়বা (মৃ. ৮৮৯ খ্রি.), 'আল-আখবার আল-তিওতাল' এর জনক আল দিনাওয়ারি (মৃ. আনু. ৮৯৫ খ্রি.), 'তারিখ আর-রসুল-ওয়াল-মুলক' (ধর্মপ্রচারক ও রাজাদের ইতিহাস) এর জনক তাবারি (৮৩৯-৯২৩ খ্রি.), 'তারিখ আল বুলদান' এর লেখক আল ইয়াকুবি (মৃ. ৮৭২ খ্রি.), হামজা আল ইস্পাহানি (মৃ. ৯৬১ খ্রি.), আল-হামাদানি (মৃ. ৯৪৫/৪৬ খ্রি.) 'আল কামিল ফী আল তারিখ' এর লেখক ইবনুল আসির (১১৬০-১২৩৪ খ্রি.), 'মিরআত আল-জামান ফী তারিখ আল আইয়াম' এর রচয়িতা আল জাওযি (১১৮৬-১২৫৭ খ্রি), ইবনে খাল্লিকান (মৃ. ১২৮২ খ্রি.) এবং 'তাজারিব আল-উমাম' (উম্মতের অভিজ্ঞতা) এর লেখক ইবনে মিসকাওয়াইহ প্রমুখ ছিলেন এ যুগের খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা

আব্বাসি শাসনামলে সাহিত্যের প্রভূত বিকাশ হয়েছিল। এ সময় শুয়্যুবিয়াহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচিত হতো। আল-বিরুনি, হামজা আল-ইস্পাহানি, আল-যাহিজ, ইবনে জুরায়েজ, ইবন কুতায়বা বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। আব্বাসি শাসনামলে আল জাওহারি (মৃ. ১০০৮ খ্রি.) অভিধান রচনা করেন। এসময় নাটক, কাব্য ও উপন্যাস রচিত হয়েছিল। আল হরিরির বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল 'মাকামা'। আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশীদের সময়ই বিশ্বখ্যাত আরব্যোপন্যাস 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' বা 'এক হাজার এক রজনী' রচিত হয়। যুগে যুগে 'আলিফ লায়লা' বিশ্বের সব উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত ও চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। এটি বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম ধ্রুপদি সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। জ্ঞানচর্চার জন্য পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারা আব্বাসি সমাজে উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. চীনের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্যের উপকরণ কী ছিল?
২. আব্বাসি আমলে কোন শিল্পের ব্যাপক বিকাশ হয়?
৩. আব্বাসি সমাজে প্রধানত কয় শ্রেণির মানুষ ছিল?
৪. জিম্মিদের উচ্চ রাজপদে চাকরি দিতেন কারা?
৫. 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' বা 'এক হাজার এক রজনী' রচিত হয় কার সময়ে?
৬. 'ফুতুহ-আল-বুলদান' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. আব্বাসি শাসনামলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নত ছিল— পাঁচটি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করো।
২. আব্বাসি শাসনামলের ইতিহাসবিদদের নাম ও তাদের প্রণীত গ্রন্থের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২৯ ও ৩০

আব্বাসি শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা
Practice of Wisdom During the Abbasid Reign

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানদের যে অবদান তার সিংহভাগই আব্বাসিদের সময়কার। মূলত মধ্যযুগের আব্বাসি শাসনামলেই মুসলমানরা নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানচর্চা করে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষে উন্নীত হয়েছিল। তখন আব্বাসি খলিফাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞানের সব শাখা সমৃদ্ধি লাভ করে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে আব্বাসিদের অবদান

চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিতে আব্বাসি শাসকেরা সর্বদা উদারহস্ত ছিলেন। আব্বাসি খলিফা আল মনসুর ৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রোগাক্রান্ত হলে রাজবৈদ্যরা তাকে নিরাময় করতে ব্যর্থ হন। এ কারণে সাসানীয় সম্রাট নওশেরোয়াঁর প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের ডিন জারজিসকে ডেকে আনা হয় এবং দরবারের প্রধান চিকিৎসক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। পি কে হিট্টির মতে, “এই পরিবারের ৬-৭ পুরুষ বংশপরম্পরায় বাগদাদ নগরীতে প্রায় আড়াইশ বছর ধরে চিকিৎসাবৃত্তিতে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখেন।” (Ref: *History of the Arabs*, p-364)।” খলিফা হারুন অর-রশীদ এ সময় বাগদাদে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। এর মডেলে প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে প্রায় ৩৪টি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আব্বাসি আমলে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে গ্রন্থাগার, চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন, অনুশীলন ও অধ্যাপনার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল যা আধুনিক মেডিকেল কলেজের কথাই মনে করিয়ে দেয়। হাসপাতালে নারীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড এবং ডিসপেনসারি ছিল। চিকিৎসার নামে ব্যবসা প্রতিরোধের জন্য খলিফা মুকতাদির ৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে সিনান বিন সাবিতের নেতৃত্বে পেশাগত জ্ঞানের পরীক্ষা নিয়ে পাস করা ৮৬০ জন চিকিৎসককে সনদ দেওয়া হয়। এভাবে আব্বাসি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও দিকনির্দেশনায় চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। এ সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্যসেবার উন্নতির লক্ষ্যে বায়তুল হিকমাতে ইউরোপের বিভিন্ন চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। এ সময় হুনাইন বিন ইসহাক প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসাবিদ গ্যালেন, হিপোক্রাইটিসের বিভিন্ন রচনা এবং ডায়াসকোরাইডসের ‘মেটেরিয়া-মেডিকা’ অনুবাদ করেন। হুনাইন পুত্র ইসহাক শারীরবিদ্যার ওপর লিখিত গ্যালেনের ৭টি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। মুসা আনসারী বলেন, এ অনুবাদ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কারণ গ্যালেনের মূল গ্রন্থ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র আরবি সূত্র থেকেই গ্যালেনের চিকিৎসাবিজ্ঞান ইউরোপে প্রবেশ করে। *(মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, পৃ. ৩৯৩)

মৌলিক কার্যাবলি: আব্বাসি শাসনামলে অনেকেই জ্ঞানচর্চায় নতুন ও মৌলিক অবদান রেখেছেন। ইউহান্না বিন মুসওয়াই (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.) ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন খ্রিষ্টান চিকিৎসাবিদ এবং জিব্রিল বিন বখতিশুর শিষ্য। মুসা আনসারীর *(মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি)*মতে, সম্ভবত ইউহান্নাই প্রথম আরবিতে কোনো চক্ষু বিষয়ক গ্রন্থ (*আল আশনব মাকালাত ফিল আইন*) রচনা করেন। আব্বাসি শাসনামলের আর একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ও গবেষক হচ্ছেন হুনায়ন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৩ খ্রি.)। তিনি চোখের বিভিন্ন সমস্যা, এগুলোর কারণ ও প্রতিকারের উপায় নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এছাড়া আলী আল-তাবারির ‘ফিরদাউস আল-হিকমা’ (জ্ঞানের স্বর্গ), আল-রাজি (৮৬৫-৯২৫ খ্রি.), আবু বকর, মোহাম্মদ জাকারিয়া আল রাজি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অবদান রেখে ব্যাপক খ্যাতিলাভ করেন। ‘আল-শাইখ আল-রইস’ হিসেবে পরিচিত ‘কিতাব আশ-শিফা’ ও ‘আল-কানুন-ফিত তিব্ব’-এর রচয়িতা ইবনে সিনার (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) নাম বিশেষভাবে বলতে হয়। তার চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থ ইউরোপে বহুদিন পড়ানো হয়েছে। পাশ্চাত্যে তিনি পরিচিত ছিলেন আভে সিনা নামে। এ সময়কার বিখ্যাত চিকিৎসক ও গবেষকদের মধ্যে ছিলেন ‘কিতাবুল মালিক’ (রাজকীয় পুস্তক)-এর লেখক আল-মাজুসি (মৃ. ৯৯৪ খ্রি.), ‘তাজকিরাত আল-কাহহালিন’ রচয়িতা আলী ইবনে ঈসা, ‘তাকবীম আল আবদান ফী তাদবির আল ইনসান’ এর রচয়িতা ইবনে জাজলা (মৃ. ১১০০ খ্রি.) ও ‘আল-ফুরসিয়া ওয়া সিয়াত আল-খায়াল’ প্রবন্ধের লেখক ইয়াকুব ইবনে আলি হিজাম প্রমুখ।

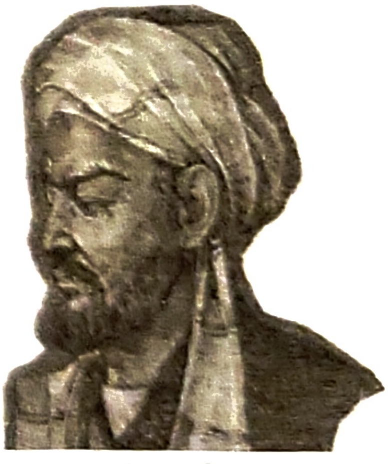

ইবনে সিনা

গণিতশাস্ত্রে আব্বাসিদের অবদান

পাটিগণিত: পাটিগণিতে মুসলমানদের অবদান ব্যাপক। আল-খাওয়ারিজমির পাটিগণিত বিষয়ক গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ দ্বাদশ শতকের ইউরোপের কাছে দশমিক সংখ্যাপদ্ধতি তুলে ধরে। 'অ্যালগরিদমো ডি নিউমারো ইনডোরাম' নামে গ্রন্থটিতে খাওয়ারিজমি ভারতীয় সংখ্যাপদ্ধতিকে বিধিবদ্ধ করেছিলেন। গণিতের 'অ্যালগরিদম' কথাটি আল খাওয়ারিজমি নামেরই ল্যাটিন সংস্করণ থেকে এসেছে। ইরাকের গণিতবিদ আবু বকর মোহাম্মদ আল-কারখি তার 'ফাকী ফিল হিসাব' গ্রন্থে পাটিগণিতের বিভিন্ন বিষয় যেমন– গুণ, ভগ্নাংশ, বর্গ, বর্গমূল নির্ণয় প্রণালী, শক্তিসংখ্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন যা আধুনিক গণিত বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

বীজগণিত: আব্বাসি শাসনামলে আল-খাওয়ারিজমি গণিতশাস্ত্রের ওপর 'আল-কিতাব আল-মুখতাসার ফি হিসাব আল-জবর ওয়াল মুকাবালা' নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। বীজগণিতের অ্যালজাবরা (Algebra) প্রতিশব্দটি এ গ্রন্থে বর্ণিত পদ্ধতি 'আল-জবর' থেকেই এসেছে। জর্জ সার্টন এর মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন গণিতশাস্ত্র সম্পর্কে যে ধারণা দেন আল-বিরুনি তা পূর্বেই দিয়েছিলেন।"[৭১] উমর আল-খৈয়াম প্রথম Binomial Theorem-এর সূত্রপাত করেন। তবে পরবর্তীকালে তা নিউটনের বলে প্রচারিত হয়। আল-খৈয়াম গ্রিক পণ্ডিত ইউক্লিডের প্রবর্তিত $(a + b)^2$ সূত্রকে $(a + b)^x$ পর্যন্ত প্রসারিত করেন। আব্বাসি শাসনামলে আল-মিসরি, আবুল ওয়াফা ও ইব্রাহিম ইবনে সীনানও বীজগণিতের বিকাশে ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন। আল-মিসরি 'তৃতীয় ঘাত' বা 'Cubic Theory' জানতেন। আবুল ওয়াফা ৪র্থ বীজগণিতের সমীকরণ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। ইবনে সিনা অধিবৃত্তের বর্গীকরণ সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন।

জ্যামিতি: পাটিগণিত ও বীজগণিতের মতো জ্যামিতির বিকাশেও ভূমিকা রাখেন আল খাওয়ারিজমি। তিনি ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, পিরামিড ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করেছেন। বিখ্যাত গণিতবিদ মুসা ইবনে সাকিবের তিন পুত্র মুহাম্মদ, আহম্মদ এবং হাসান 'সঞ্চালন জ্যামিতির' মাধ্যমে একটি কোণ তিন ভাগে ভাগ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আবুল ওয়াফা জ্যামিতির উন্নতির জন্য বহুতলক ঘনক্ষেত্রের উপপাদ্য সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদান করেন। এ সময় ইবনে হায়সাম জ্যামিতিশাস্ত্রের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

ত্রিকোণমিতি: ত্রিকোণমিতির বিকাশেও মুসলমানদের অবদান ব্যাপক। পি কে হিট্টি বলেন, "বীজগণিত ও বিশ্লেষণধর্মী জ্যামিতির মতো বিজ্ঞানের ত্রিকোণমিতি মুসলমানদের হাতে ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করেছিল।"[৭২] আল-খাওয়ারিজমি ত্রিকোণমিতির সারণি বের করেন। তিনি এর সাথে কোণ ও বাহুর তুলনা করেন। ত্রিকোণমিতির বিকাশে মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন আল ফাত্তানি। তিনি sine, co-sine, tangent, co-tangent-সহ বেশকিছু চিহ্ন প্রথমবারের মতো ব্যবহার করেন। তিনি 'sine কে 'জ্যা' এর মধ্যে স্থাপন করেন। আবুল ওয়াফা ত্রিকোণমিতির দুই কোণের sine এর সমষ্টিকে sine ও co-sine দ্বারা নির্ণয়ের সূত্র আবিষ্কার করেন। তিনি অধিবৃত্তের বর্গীকরণ এবং স্পর্শক সম্পর্কেও গবেষণা করেছিলেন। ইবনে ইউনুস ত্রিকোণমিতির বিকাশে যোগ-বিয়োগের এমন কিছু ফর্মূলা বের করেন যা 'Logarithom' আবিষ্কারের আগে অপরিহার্য ছিল। নাসিরউদ্দিন জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে ত্রিকোণমিতিকে পৃথক করেন। তিনি প্রাচীন গ্রিক ও রোমান গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিদ মেনেলাউস ও টলেমিকে অনুসরণ করে ত্রিকোণমিতিকে বিস্তৃত করেন।

ভূগোলশাস্ত্রে আব্বাসিদের অবদান

আব্বাসি শাসনামলের প্রথম দিকে পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত সিরাফের অধিবাসী সুলাইমান আল-তাজি দূরপ্রাচ্যে তার ভ্রমণ সম্পর্কে এক বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন। এর পরের অন্যতম ভূগোলবিদ হলেন আহমদ ইবনে-ফযলান ইবনে হাম্মাদ। তিনি রাশিয়া সম্পর্কে প্রথম বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা দেন এবং দেশটির প্রতি আরবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাবিত ইবন কুররা (মৃ. ৯০১ খ্রি.) গ্রিক-রোমান পণ্ডিত টলেমির লেখা 'জিওগ্রাফি' বইটি আরবি ও সিরীয় ভাষায় অনুবাদ

---

[৭১] Ref: G. Sarton, *Introduction to the History of Science*

[৭২] The science of trigonometry, like algebra and analytical geometry, was largely founded by Arabs. –Ref: P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p.572

করেছিলেন। সাযিত ইবন-কুররাকে অনুসরণ করে আল-খাওয়ারিজমি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সুরাত আল-আরদ' (পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি) রচনা করেন। আল-খাওয়ারিজমির এই বইটি প্রকাশের পাশাপাশি খলিফা মামুনের নির্দেশে ৬৯ জন পণ্ডিত 'পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি' নামে একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। এটি পৃথিবী তথা আমাদের সৌরজগৎ সম্পর্কে অঙ্কিত প্রথম মানচিত্র বলে মনে করা হয়। পারসিক পণ্ডিত ইবন খুরদাদবিহ (মৃ. ৯১২ খ্রি.) ভূগোল বিষয়ে 'আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া ভূগোল বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আরও ছিল ইয়াকুবির 'কিতাব আল-বুলদান' (বিভিন্ন দেশের বর্ণনা), ইবন রুসতার 'আল আলাক আন নাফিশা' (ভ্রমণ-সংক্রান্ত মূল্যবান বিবরণী), ইবনে কুদামা রচিত 'আল-খারাজ', আল-ইস্তাখ্‌রি রচিত মাসালিক অ-আল মামালিক, ইবনে ইয়াকুতের 'মুজাস আল-মাসালিক', আল-মাকদিসির 'আহসান আল-আকাসিম ফী মারিফাত আল-আকালিম' ইত্যাদি।

রসায়নশাস্ত্রের আব্বাসিদের অবদান

ঐতিহাসিক হামবোল্ট বলেন, "আধুনিক রসায়নশাস্ত্র মুসলমানদেরই আবিষ্কার বলা যায় এবং এক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব অতুলনীয়।" আরব রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জাবির ইবনে হাইয়ান। জাবির তার বাইশটি গ্রন্থে রসায়নশাস্ত্রের নানা বিষয়ের গবেষণামূলক আলোচনা করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'কিতাব আল রহমা', কিতাব-আল-তাজমী, আল জিবাক-আল-সারকী' ইত্যাদি। এছাড়া আল-রাজিও রসায়নের অনেক মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আব্বাসীয় আমলে রসায়নশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন— উষ্মীকরণ (Calcination), লঘুকরণ (Reduction), বাষ্পীকরণ (Evaporation), ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation), তরলীকরণ (Melting) এবং স্ফটিকীকরণ (Crystallization) প্রভৃতি সূত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আব্বাসি আমলে প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে কতটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
২. শারীরবিদ্যার ওপর লিখিত গ্যালেনের ৭টি গ্রন্থের অনুবাদ করেন কে?
৩. 'আল-কানুন-ফিত তিব্ব'-এর রচয়িতা কে?
৪. Binomial Theorem-এর সূত্রপাত করেন কে?
৫. গণিতশাস্ত্রের জনক কে?
৬. রসায়নশাস্ত্রের জনক কে?

উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে চিকিৎসাবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে আব্বাসিদের অবদান সম্পর্কিত দুটি স্লাইড তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

গ. একক কাজ

ভূগোল ও রসায়ন শাস্ত্রে যেসব মুসলিম মনীষী অবদান রেখেছেন তাদের নামের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. হাশেমি; ২. মহানবি (স)-এর চাচা আল-আব্বাস; ৩. মুহাম্মদ বিন আলী; ৪. আবু মুসলিম (আরব বংশোদ্ভূত পারসিক মাওয়ালি); ৫. জাবের যুদ্ধ (৭৫০ খ্রি.); ৬. ৭৫০।

পাঠ-২: ১. আবুল আব্বাস; ২. আবুল আব্বাসের ; ৩. দ্বিতীয় মারওয়ান (উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা); ৪. উমাইয়াদের নির্মূল করা; ৫. ৮০ জন; ৬. হাশেমিয়ায়।

পাঠ-৩ ও ৪: ১. আবু জাফর আল-মনসুর; ২. বিজয়ী; ৩. বাগদাদ; ৪. আবু জাফর আল মনসুর; ৫. রাওয়ান্দ্রিয়া সম্প্রদায়; ৬. সুন্নি।

পাঠ-৫: ১. আল-মনসুর; ২. আব্বাসি খলিফা আল-মনসুরের; ৩. জ্যোতির্বিদ্যা; ৪. ইবন মুকাফ্‌ফা; ৫. পশু-পাখির গল্প; ৬. আব্বাসি খলিফা আল-মনসুরের।

পাঠ-৬ ও ৭: ১. ৭৭৫; ২. খলিফা আল-মনসুর; ৩. আল-মাহদীর; ৪. পথপ্রদর্শক; ৫. খায়জুরান; ৬. আল-হাদী।

পাঠ-৮: ১. ২৫; ২. খলিফা হারুন-অর-রশীদ; ৩. ইয়াহহিয়া বার্মাকি; ৪. খারেজি নেত্রী লায়লা; ৫. উত্তর আফ্রিকায়; ৬. খলিফা হারুন-অর-রশীদ।

পাঠ-৯: ১. বাইজান্টাইনদের; ২. আইরিন; ৩. অর্থমন্ত্রী নাইসিফোরাস; ৪. খলিফা হারুন-অর-রশীদ; ৫. শার্লিমান; ৬. সম্রাট ফাগফুর।

পাঠ-১০: ১. হারুন-অর-রশীদ; ২. ৮০২; ৩. খলিফা হারুন-অর-রশীদ; ৪. আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশীদকে; ৫. খলিফা হারুন-অর-রশীদ; ৬. বার্মাকিদের নির্মূল।

পাঠ-১১: ১. খালিদ বার্মাকি; ২. শিয়া; ৩. প্রধান বা নেতা; ৪. জাফর বিন ইয়াহিয়াহ; ৫. জাফর বার্মাকি; ৬. জাফর বার্মাকিকে।

পাঠ-১২: ১. ৮০৯; ২. বিশ্বস্ত; ৩. পারস্য ক্রীতদাসী মারাজিল; ৪. ৮১২; ৫. উগ্রপন্থি পারসিকরা; ৬. মামুন।

পাঠ-১৩: ১. ৮১৩; ২. ফজল বিন সাহল; ৩. খলিফা আল-মামুন; ৪. ৮৩০; ৫. হুনাইন বিন ইসহাককে; ৬. মুহাম্মদ বিন মুসা আল-খাওয়ারিজমি।

পাঠ-১৪: ১. আল-মামুন; ২. ৮১৯; ৩. ভূমধ্যসাগরের সিসিলি দ্বীপ; ৪. জ্ঞানগৃহ বা গবেষণাগার; ৫. ইরাকের বাগদাদে; ৬. আব্বাসি খলিফা আল-মামুনের।

পাঠ-১৫: ১. আল্লাহকে আঁকড়ে ধারণকারী; ২. ৮৩৩; ৩. আল-মুতাসিম বিল্লাহ; ৪. খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ; ৫. মুতাজিলা; ৬. ওয়াসিল বিন আতা।

পাঠ-১৬: ১. মধ্য এশিয়া; ২. মুইজ-উদ-দৌলাহ; ৩. শিয়া; ৪. বুয়াইয়া আমির মুইজ-উদ-দৌলাহ; ৫. বুয়াইয়া আমির আবদুল করিমের; ৬. আজদুদ্দৌলাহ।

পাঠ-১৭: ১. আজদুদ্দৌলাহ; ২. বুয়াইয়া আমির আজদুদ্দৌলাহকে; ৩. বুয়াইয়া আমির আজদুদ্দৌলাহ; ৪. ঐতিহাসিক আবুল হাসান আল-মাসুদিকে; ৫. দার্শনিক আল-ফারাবি; ৬. শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব।

পাঠ-১৮: ১. ওঘুজ তুর্কি; ২. একাদশ; ৩. আত-তুঘ্রিল বেগ; ৪. গজনি; ৫. পারস্যে; ৬. আব্বাসি খলিফা আল-কায়িম।

পাঠ-১৯: ১. বীর সিংহ; ২. এশিয়া মাইনরে; ৩. ইস্পাহানে; ৪. বাইজান্টাইনদের সাথে সংঘাত ও জয়লাভ; ৫. সেলজুক সুলতান আলপ-আরসালানের; ৬. মালাজকার্দের যুদ্ধ।

পাঠ-২০: ১. মালিক শাহ; ২. নিজাম-উল-মুলক; ৩. বাগদাদে; ৪. নিজাম-উল-মুলক; ৫. প্রায় বিশ বছর (১০৭৩-১০৯২ খ্রি.); ৬. নিজাম-উল-মুলক।

পাঠ-২১: ১. আলপ-আরসালান (১০৬৩-১০৭২ খ্রি.); ২. রাজ্য শাসনপ্রণালি; ৩. সেলজুক; ৪. নিজামিয়া; ৫. ১০৬৫-১০৬৭ খ্রিষ্টাব্দে; ৬. মালিক শাহ।

পাঠ-২২ ও ২৩: ১. ধর্মযুদ্ধ ; ২. ১০৯৫-১২৯১ খ্রি.; ৩. জেরুজালেম; ৪. জেরুজালেম দখল; ৫. আটটি; ৬. শিশুদের ক্রুসেড।

পাঠ-২৪: ১. গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবি; ২. ১১৭৪; ৩. বিশ্বাসের ন্যায়পরায়ণ; ৪. তৃতীয়; ৫. মালিক-আন-নাসির (বিজয়ী রাজা); ৬. সালাদিন।

পাঠ-২৫: ১. পাঁচশত বছর (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.); ২. ৩৭ জন; ৩. মোঙ্গল নেতা হালাকু খান; ৪. হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণ; ৫. ১২৫৮; ৬. আল-মুসতাসিম বিল্লাহ।

পাঠ-২৬: ১. খলিফা; ২. উজিরের; ৩. সাহিব আল-খারাজ; ৪. ডাক বিভাগ; ৫. আমির; ৬. দিওয়ান আল-বারিদের।

পাঠ-২৭: ১. ইসলামি অনুশাসনভিত্তিক; ২. রাজতান্ত্রিক; ৩. আরব আধিপত্যের অবসান; ৪. পারস্যের সাসানীয়দের; ৫. শান্তিপ্রিয়; ৬. বায়তুল হিকমাহ।

পাঠ-২৮: ১. সিল্ক বস্ত্র; ২. কুটির শিল্পের; ৩. দুই; ৪. আব্বাসি খলিফারা; ৫. আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশীদের; ৬. আল বালজুরি।

পাঠ-২৯ ও ৩০: ১. ৩৪টি; ২. ইসহাক বিন হুনাইন; ৩. ইবনে সিনা; ৪. উমর খৈয়াম; ৫. মুসা আল-খাওয়ারিযমি; ৬. জাবির ইবনে হাইয়ান।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

আব্বাসি	আব্বাসিরা মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমি শাখা থেকে উদ্ভূত। মহানবি (স)-এর পিতৃব্য আল-আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশেমের নাম থেকে আব্বাসি বংশের নামকরণ করা হয়েছে। আল-আব্বাস তার চার পুত্রকে রেখে ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তারা উমাইয়া গোত্রের মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে হাশেমি গোত্রের হযরত আলি (রা)-এর পক্ষাবলম্বন করেন। আত্মীয়তার দিক থেকে উমাইয়াদের তুলনায় মহানবি (স)-এর নিকটতম হওয়ায় তারা নিজেদেরকে মুসলিম খিলাফতের বৈধ দাবিদার বলে দাবি করত।
আস-সাফ্‌ফাহ	নৃশংসতার জন্য আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাসকে আস-সাফ্‌ফাহ বলা হয়। আবু মুসলিম ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করলে উমাইয়া বংশের পতন ঘটে। ৫ আগস্ট মারওয়ানের ছিন্ন মস্তক দেখে আবুল আব্বাস 'আস-সাফ্‌ফাহ' বা 'রক্তপিপাসু' উপাধি গ্রহণ করেন। আব্বাসি শাসনকে শঙ্কামুক্ত করতে আবুল আব্বাস ক্ষমতায় আরোহণ করে উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেন। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জুন তিনি ফিলিস্তিনের আবু ফ্রুট্রুস নামক স্থানে উমাইয়া বংশের ৮০ জন লোককে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। বসরাতেও তিনি এরূপ হত্যাযজ্ঞ চালান। তার আদেশে উমাইয়াদের মৃতদেহ কবর থেকে উঠিয়ে হাড়গুলো ভস্মীভূত করে বায়ুতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ নৃশংস চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তাকে আস-সাফ্‌ফাহ উপাধি দেওয়া হয়।
দারুস সালাম	ইরাকের বাগদাদ (ন্যায়বিচারের উদ্যান) নগরীকে দারুস সালাম বা শান্তির শহর বলা হয়। আব্বাসি খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আবু জাফর আল-মনসুর খিলাফতের রাজধানী স্থাপনের জন্য দজলা (টাইগ্রিস) পশ্চিম তীরে এক মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে বাগদাদ নগরীর গোড়াপত্তন করেন। খলিফার নাম অনুসারে এর আর একটি নাম দেওয়া হয় মনসুরীয়া। এটি ছিল পারস্যের বিখ্যাত সম্রাট নওশিরওয়ানের গ্রীষ্মবাসের স্থান। সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আসা ১,০০,০০০ শ্রমিক ও শিল্পী দীর্ঘ চার বছর (৭৬২-৭৬৬ খ্রি.) অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাগদাদ নগরীর প্রাথমিক কাজ শেষ করেন। এতে ব্যয় হয়েছিল প্রায় ৪৮,৮৩,০০০ দিরহাম। রূপকথার ঐশ্বর্যময়ী বাগদাদ ছিল তৎকালীন বিশ্বের শিক্ষা, সভ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। মনসুরের সময় এ শহরে বসবাসকারী জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করত বলেই একে দারুস সালাম বা শান্তির শহর বলা হয়।
বার্মাকি	বার্মাকিরা পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। জার্মান ঐতিহাসিক গিলমানের (Carolyn Ives Gilman) মতে, বার্মাকি উজিরদের পূর্বপুরুষ জাফর বলখের বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত থাকায় তার উপাধি ছিল বার্মাক। এর অর্থ প্রধান বা নেতা। উল্লেখ্য জাফর স্ত্রী ও পুত্র খালিদসহ উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিম কর্তৃক মধ্য এশিয়া বিজয়ের সময় যুদ্ধবন্দিরূপে ধৃত হন। পরবর্তী সময় তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে। এরা আব্বাসি আন্দোলন থেকে শুরু করে এই বংশের প্রতিষ্ঠা, বিদ্রোহ দমন ও প্রশাসন পরিচালনায় বিশেষ অবদান রেখে খ্যাতি অর্জন করে।
বায়তুল হিকমা	খলিফা মামুন নির্মিত বায়তুল হিকমা (জ্ঞানগৃহ) আব্বাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। বৃহৎ পর্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে এই জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। জ্ঞানচর্চার জন্য মামুন বায়তুল হিকমাহতে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ ব্যুরো এই তিনটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করেন। হুনাইন-ইবন-ইসহাককে এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। খলিফা মামুন বায়তুল হিকমার অনুবাদ দপ্তরে গ্রিক, সিরীয়, পারসিক, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ সংগ্রহ করে সেগুলো আরবিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এ সময় যেসব পন্ডিতের গ্রন্থ আরবিতে অনুদিত হয় তার মধ্যে ছিলেন প্লেটো, এরিস্টটল, লিউক, কোস্টার, গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি প্রমুখ। এ ছাড়া মানকাহ ও দুবান নামক পন্ডিতের ওপর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার পুস্তক এবং ঈসা-বিন-ইয়াহহিয়া, মুসা-বিন-খালিদের ওপর বিভিন্ন পারসিক আকর গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বুয়াইয়া	বুয়াইয়ারা মধ্য এশিয়ার ছিল একটি উপজাতি। আব্বাসি খিলাফতের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার সুযোগে দশম শতকের প্রারম্ভে বুয়াইয়াদের অভ্যুদয় ঘটে। ৯৩৪-৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বুয়াইয়ারা এশিয়ার দক্ষিণে অভিযান চালিয়ে সামানীয়দের কাছ থেকে শিরাজ, ইস্পাহান, খুজিস্তান, কেরমান, আহওয়াজ প্রভৃতি স্থান দখল করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তী সময়ে আবু সুজা বুয়াইয়ার পুত্র আহম্মদ আব্বাসি খলিফা মুসতাকফীর আমন্ত্রণে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং পিতা বুয়াইয়ার নামানুসারে 'বুয়াইয়া বংশ' প্রতিষ্ঠা করেন। বুয়াইয়ারা ছিল শিয়া মুসলিম ধর্মমতের অনুসারী। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে অসামান্য অবদান রেখেছে।
সেলজুক	আব্বাসি খিলাফতের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার সুযোগে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে সেলজুক বংশ (১০৫৫-১১৯৪ খ্রি.) অন্যতম। সেলজুকরা ছিল ঘুজ তুর্কি বংশোদ্ভূত এবং তাদের আদি নিবাস ছিল তুর্কিস্তানের কিরগিজ তুন্দ্রা অঞ্চলে। এ বংশের নেতা সেলজুক বিন বাকায়িক এর নাম থেকেই এ বংশের নাম 'সেলজুক বংশ' হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে সেলজুকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আব্বাসি খিলাফতকালে সেলজুকরা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে।
মুতাজিলা মতবাদ	মুতাজিলা মতবাদ ইসলামি ধর্মতত্ত্বের একটি শাখা। এটি কারণ ও যুক্তি আলোচনার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ৮ম থেকে ১০ শতাব্দীতে বসরা ও বাগদাদে মুতাজিলা মতবাদের প্রাধান্য ছিল। মুতাজিলা তত্ত্বের অনুসারীদের মতে, কুরআন আল্লাহর সাথে একই সঙ্গে অস্তিত্বমান ছিল না বরং তা পরে আল্লাহর সৃষ্ট। উমাইয়া যুগে মুতাজিলা আন্দোলনের আবির্ভাব হয় এবং আব্বাসি যুগে এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছায়। মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামি চিন্তাবিদ হাসান আল-বসরি (রা) এর অন্যতম শিষ্য ওয়াসিল বিন আতার মাধ্যমে মুতাজিলা মতবাদের উৎপত্তি হয়। হাসান আল-বসরি (রা) একদিন শিষ্যদের সাথে আলাপকালে বলেন যে, যদি কেউ কবিরা গুনাহ করে, তাহলে সে আর কিছুতেই মুসলমান থাকবে না, কাফের হয়ে যাবে। তাঁর বক্তব্য শেষ করার আগেই ওয়াসিল বিন আতা মন্তব্য করলেন, এরূপ ব্যক্তি কাফেরও নন, মুসলমানও নন। শিষ্যের এ কথা শুনে হাসান-আল-বসরি বলেন, ইতাজিলা আন্না অর্থাৎ সে 'আমার দল ত্যাগ করেছে।' এরপর থেকে ওয়াসিল বিন আতা হাসান-আল-বসরির সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হন। পরবর্তী সময়ে ওয়াসিল বিন আতা এবং তার সঙ্গীদের নিজস্ব মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মুতাজিলা মতবাদের উৎপত্তি ঘটে।
ক্রুসেড	ক্রুসেড শব্দটির অর্থ ধর্মযুদ্ধ। খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক ক্রস থেকে 'ক্রুসেড' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ক্রুসেড বলতে মধ্যযুগে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত ধর্মযুদ্ধকে বোঝায়। মুসলিম এশিয়ার বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান ইউরোপের সীমাহীন হিংসাবিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে ক্রুসেড নামক এ যুদ্ধের মাধ্যমে। একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশত বছর ধরে চলে। তবে ধর্মের চেয়ে বাস্তবে নতুন রাজ্য জয় ও ধনার্জনের মতো পার্থিব লাভের আশায়ই বেশিরভাগ খ্রিষ্টান ক্রুসেডার এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য না থাকলে ক্রুসেড সংঘটিত হতো কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।
জেরুজালেম	জেরুজালেম শব্দের অর্থ শান্তির শহর। এটি বর্তমান প্যালেস্টাইনে (ফিলিস্তিন) অবস্থিত। এটি ভূমধ্যসাগর এবং মৃত সাগরের মধ্যবর্তী যোধাইয়ান পর্বতের নিচু মালভূমিতে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় নগরী। এ জেরুজালেম নগরীর কর্তৃত্ব নিয়ে প্রায় তিনশত বছর স্থায়ী ক্রুসেড সংঘটিত হয়। কারণ এ নগরীটি মুসলমান, খ্রিষ্টান এবং ইহুদি তিন সম্প্রদায়ের কাছেই পবিত্র নগরী বলে পরিগণিত। মুসলিমদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ বায়তুল মোকাদ্দাস এ নগরীতেই অবস্থিত। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে এ নগরী থেকেই বোরাকে চড়ে মেরাজ গমন করেন। খ্রিষ্টানদের ধর্মপ্রচারক যীশু খ্রিষ্ট এ নগরীতেই জন্ম নেন, ধর্ম প্রচার করে এবং এই জেরুজালেমেই ক্রুশবিদ্ধ হন। আবার ইহুদি ধর্মের প্রতিষ্ঠা মোজেসের পূণ্যভূমি এ জেরুজালেম। তাই ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় উভয় দিক দিয়েই এ শহরটি গুরুত্বপূর্ণ।

■ একনজরে আব্বাসি খিলাফতের ঘটনাবলি

সময় (খ্রি.)	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
৭৫০	জাবের যুদ্ধে উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয় এবং আবুল আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহ কর্তৃক আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা।
৭৫৪	আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরের ক্ষমতালাভ।
৭৬২-৭৬৬	খলিফা মনসুরের বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা।
৭৮৬	বিখ্যাত খলিফা হারুন-অর-রশীদের ক্ষমতারোহণ।
৮০৯	হারুন-অর-রশিদের পুত্র আল-আমিনের সিংহাসনারোহণ, উত্তরাধিকার নিয়ে ভাই মামুনের সাথে দ্বন্দ্ব।
৮১২	আমিন ও মামুনের সাথে সংঘর্ষে মামুনের জয়লাভ।
৮১৩	খলিফা হিসেবে আল-মামুনের অভিষেক।
৮৩০	বাগদাদে বিখ্যাত বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা।
৯৪৫	আব্বাসি শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে পারস্যে মুইজ উদ-দৌলার নেতৃত্বে বুয়াইয়া বংশের উত্থান।
১০৫৫	আব্বাসি খলিফাদের অযোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সেলজুকদের উত্থান।
১০৭২	বিখ্যাত সেলজুক শাসক মালিক শাহের ক্ষমতারোহণ।
১০৯৫	মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যকার ঐতিহাসিক ক্রুসেড সংঘটিত, যা বেশ কয়েক দফায় ২০০ বছর চলে।
১১৭৪	বিখ্যাত বীর গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবির উত্থান। ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের পরাজিত করে তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।
১২৫৮	মোঙ্গল নেতা হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস এবং আব্বাসি বংশের পতন।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ আব্বাসি আন্দোলন ও আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা

প্রশ্ন-১. আব্বাসি কারা?

উত্তর: মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমি গোত্রের সদস্য আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বংশধরেরা ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসি নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২. কার নাম অনুসারে আব্বাসি খিলাফতের নামকরণ হয়েছে?

উত্তর: আল-আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশেমের নাম অনুসারে আব্বাসি খিলাফতের নামকরণ হয়।

প্রশ্ন-৩. কত খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধের মাধ্যমে আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৪. আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা কে ছিলেন?

উত্তর: আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মুহাম্মদ বিন আলি।

প্রশ্ন-৫. আব্বাসি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর: আব্বাসি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহ।

প্রশ্ন-৬. আব্বাসি আন্দোলন কী?

উত্তর: উমাইয়াদের পতনের জন্য মুহাম্মদ (স)-এর চাচা আব্বাসের বংশধররা যে আন্দোলন করেন ইতিহাসে সেটিই আব্বাসি আন্দোলন।

প্রশ্ন-৭. আব্বাসিদের রাজধানী কোথায় ছিল?

[রা.; কু.; চ.; ব. বো. ২০১৮]

উত্তর: আব্বাসিদের রাজধানী ছিল বাগদাদে।

প্রশ্ন-৮. আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় কার ভূমিকা সবেচেয়ে বেশি ছিল?

উত্তর: আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবু মুসলিম নামে আরব বংশোদ্ভূত এক পারসিক মাওয়ালির ভূমিকা সবেচেয়ে বেশি ছিল।

প্রশ্ন-৯. আব্বাসি বংশে মোট কতজন খলিফা ছিলেন?

উত্তর: আব্বাসি বংশে ৩৭ জন খলিফা ছিলেন।

■ আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহর চরিত্র ও কৃতিত্ব

প্রশ্ন-১০. আব্বাসি বংশের প্রথম শাসক কে ছিলেন?

উত্তর: আব্বাসি বংশের প্রথম শাসক ছিলেন আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ।

প্রশ্ন-১১. আস- সাফ্ফাহ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: আস-সাফ্ফাহ শব্দের অর্থ 'রক্তপিপাসু'।

প্রশ্ন-১২. আবুল আব্বাস কত খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হিসেবে ঘোষিত হয়েছিলেন?

উত্তর: আবুল আব্বাস ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ নভেম্বর খলিফা হিসেবে ঘোষিত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন-১৩. আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

■ আব্বাসি শাসন সুদৃঢ়ীকরণে আল-মনসুরের অনুসৃত নীতি ও পদক্ষেপসমূহ

প্রশ্ন-১৪. আল-মনসুর কত খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

উত্তর: খলিফা আল-মনসুর ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রশ্ন-১৫. আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কাকে বলা হয়?
/ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; ঢা., দি., কু., চ., সি., বো. ২০১৯; সকল বোর্ড ২০১৬/

উত্তর: আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরকে।

প্রশ্ন-১৬. 'আল-মনসুর' অর্থ কী?

উত্তর: 'আল-মনসুর' অর্থ বিজয়ী।

প্রশ্ন-১৭. বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? */দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২; রা.; য.; ব. বো. ২০১৯; রা., দি., কু., চ., য., সি., ব. বো. ২০১৭; সকল বোর্ড ২০১৫/*

উত্তর: বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা আব্বাসি খলিফা আল-মনসুর।

প্রশ্ন-১৮. কত সালে বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করা হয়?

উত্তর: ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে দজলা নদীর পশ্চিম তীরে বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রশ্ন-১৯. রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে কার শাসনামলে?

উত্তর: খলিফা আল-মনসুরের শাসনামলে রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে।

প্রশ্ন-২০. 'মদিনা আস-সালাম' বা শান্তির শহর বলা হয় কোন নগরীকে?

উত্তর: 'মদিনা আস-সালাম' বা শান্তির শহর বলা হয় বাগদাদ নগরীকে।

প্রশ্ন-২১. খলিফা আল-মনসুর কোথায় রাজধানী স্থানান্তর করেন?
/ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২/

উত্তর: খলিফা আল-মনসুর বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

প্রশ্ন-২২. 'কালিলা ওয়া দিমনা' আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন কে?

উত্তর: 'কালিলা ওয়া দিমনা' আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন ইবনে মুকাফ্ফা।

প্রশ্ন-২৩. 'আল-হাদি' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: আল হাদি শব্দের অর্থ পথপ্রদর্শক।

প্রশ্ন-২৪. 'মুকান্না' অর্থ কী?

উত্তর: 'মুকান্না' অর্থ অবগুণ্ঠনাবৃত।

প্রশ্ন-২৫. খলিফা মাহদীর রাজত্বকালে কে নিজেকে নবি বলে দাবি করে?

উত্তর: খলিফা মাহদির রাজত্বকালে হাশিম বিন হাকিম নিজেকে 'নবি' বলে দাবি করে।

■ খলিফা হারুন-অর-রশীদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি এবং তার কৃতিত্ব

প্রশ্ন-২৬. খলিফা হারুন-অর-রশীদ কত খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

উত্তর: খলিফা হারুন-অর-রশীদ ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রশ্ন-২৭. খায়জুরান কে ছিলেন? */ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২/*

উত্তর: খায়জুরান ছিলেন আব্বাসি খলিফা আল-হাদী এবং হারুন-অর-রশীদের রাজমাতা।

প্রশ্ন-২৮. নাইসিফোরাস কে ছিলেন?

উত্তর: নাইসিফোরাস ছিলেন রোমান সম্রাট।

প্রশ্ন-২৯. সম্রাজ্ঞী আইরিন কে ছিলেন?
/ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫/

উত্তর: সম্রাজ্ঞী আইরিন ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের রানি।

প্রশ্ন-৩০. খলিফা হারুন কত খ্রিষ্টাব্দে ট্রান্স অক্সিয়ানায় বিদ্রোহ দমন করেন?

উত্তর: খলিফা হারুন ৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে ট্রান্স অক্সিয়ানায় বিদ্রোহ দমন করেন।

প্রশ্ন-৩১. কোন মুসলিম শাসক প্রথম চীনের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্ব ঘোষণা করেন?

উত্তর: খলিফা হারুন প্রথম চীনের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্ব ঘোষণা করেন।

প্রশ্ন-৩২. খলিফা হারুন-এর স্ত্রী জুবাইদা কোন খাল খনন করেন?

উত্তর: খরিফা হারুন-এর স্ত্রী জুবাইদা নহর-ই-জুবাইদা খাল খনন করেন।

প্রশ্ন-৩৩. সহস্র আরব্য রজনীর নায়ক কে?

[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩]

উত্তর: সহস্র আরব্য রজনীর নায়ক আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশীদ।

প্রশ্ন-৩৪. খলিফা হারুন তার জ্যেষ্ঠপুত্র আব্দুল্লাহকে কী উপাধি প্রদান করেন?

উত্তর: খলিফা হারুন তার জ্যেষ্ঠপুত্র আব্দুল্লাহকে 'আল-মামুন' উপাধি প্রদান করেন

প্রশ্ন-৩৫. 'Arabian Joan of Ark' বলা হয় কাকে?

উত্তর: খারেজি নেত্রী লায়লা বা আল-ফারিয়াকে 'Arabian Joan of Ark' বলা হয়।

■ বার্মাকিদের উত্থান, পতন ও অবদান

প্রশ্ন-৩৬. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? *[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; ঢা. বো., দি. বো., সি. বো, য. বো. ২০১৮]*

উত্তর: বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খালিদ বার্মাক।

প্রশ্ন-৩৭. বার্মাকিরা কোথাকার অধিবাসী ছিল?

উত্তর: বার্মাকিরা পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী ছিল।

প্রশ্ন-৩৮. 'বার্মাক' শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]*

উত্তর: 'বার্মাক' শব্দের অর্থ প্রধান বা নেতা।

প্রশ্ন-৩৯. জাফর বার্মাক কাকে বিয়ে করেছিলেন?

উত্তর: জাফর বার্মাক খলিফা হারুন-অর-রশীদের বোন আব্বাসাকে বিয়ে করেছিলেন।

প্রশ্ন-৪০. জাফর বার্মাকের শিরচ্ছেদ করেন কে?

উত্তর: খলিফা হারুন-অর-রশীদ জাফর বার্মাকের শিরচ্ছেদ করেন।

■ আল-আমিন ও আল-মামুনের মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ ও তাদের সাফল্য-ব্যর্থতার কারণ

প্রশ্ন-৪১. আমিন কোন বংশোদ্ভূত ছিলেন?

উত্তর: আমিন খাঁটি কুরাইশ বংশোদ্ভূত ছিলেন।

প্রশ্ন-৪২. কত খ্রিষ্টাব্দে আমিন এবং মামুনের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়?

উত্তর: ৮১২ খ্রিষ্টাব্দে আমিন এবং মামুনের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়।

প্রশ্ন-৪৩. আমিন এবং মামুনের মধ্যে সংঘর্ষে কে জয়ী হয়?

উত্তর: আমিন এবং মামুনের মধ্যে সংঘর্ষে মামুন জয়ী হন।

প্রশ্ন-৪৪. আমিন এবং মামুনের মধ্যে সংঘর্ষে মামুন কাদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

উত্তর: আমিন এবং মামুনের মধ্যে সংঘর্ষে মামুন পারসিকদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৪৫. খলিফা আল-মামুনের স্ত্রীর নাম কী?

[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]

উত্তর: খলিফা আল-মামুনের স্ত্রীর নাম বুরান।

■ সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আল-মামুনের অবদান

প্রশ্ন-৪৬. আল-মামুন কত খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি খিলাফত লাভ করেন?

উত্তর: খলিফা আল-মামুন ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি খিলাফত লাভ করেন।

প্রশ্ন-৪৭. বায়তুল হিকমাহ কী?

উত্তর: বায়তুল হিকমা খলিফা মামুন কর্তৃক নির্মিত একটি জ্ঞানগৃহ বা পরিপূর্ণ গবেষণা কেন্দ্র।

প্রশ্ন-৪৮. বায়তুল হিকমাহ (জ্ঞানগৃহ) কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: বায়তুল হিকমাহ (জ্ঞানগৃহ) ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৪৯. বায়তুল হিকমা (জ্ঞানগৃহ) কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর: আব্বাসি খলিফা মামুন বায়তুল হিকমা (জ্ঞানগৃহ) প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন-৫০. অগাস্টান যুগ বলা হয় কার শাসনামলকে?

উত্তর: আব্বাসি খলিফা মামুনের শাসনামলকে অগাস্টান যুগ বলা হয়।

প্রশ্ন-৫১. বায়তুল হিকমার মহাপরিচালক কে ছিলেন?

উত্তর: বায়তুল হিকমার মহাপরিচালক ছিলেন হুনাইন ইবনে ইসহাক।

প্রশ্ন-৫২. খলিফা মামুনের দরবারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হস্তলিপি বিশারদ কে ছিলেন?

উত্তর: খলিফা মামুনের দরবারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হস্তলিপি বিশারদ ছিলেন আর রায়হানি।

প্রশ্ন-৫৩. খলিফা মামুন মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কোথায়?

উত্তর: খলিফা মামুন তাদমীরে শামাসিয়া নামক স্থানে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

■ বুয়াইয়া ও সেলজুকদের পরিচয়, উত্থান, কার্যাবলি ও অবদান

প্রশ্ন-৫৪. বুয়াইয়া কারা ছিল?

উত্তর: বুয়াইয়ারা ছিল মধ্য এশিয়ার একটি উপজাতি।

প্রশ্ন-৫৫. বুয়াইয়া বংশের নয় জন আমির-উল-উমারার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কে?

উত্তর: বুয়াইয়া বংশের নয়জন আমির-উল-উমরার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আমির আজউদ্দৌলা।

প্রশ্ন-৫৬. 'আরসালান' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: 'আরসালান' শব্দের অর্থ বীর সিংহ।

প্রশ্ন-৫৭. 'আল-বিমারিস্তান আল-আজুদি' হাসপাতাল নির্মাণ করেন কে?

উত্তর: বুয়াইয়া শাসক আজদুদ্দৌলাহ বাগদাদে 'আল-বিমারিস্তান আল-আজুদি' হাসপাতাল নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন-৫৮. মালিক শাহের রাজত্বকালে উদ্ভূত গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় কী নামে পরিচিত?

উত্তর: মালিক শাহের রাজত্বকালে উদ্ভূত গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় 'ফিদাই' নামে পরিচিত ছিল।

প্রশ্ন-৫৯. সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর: সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুঘ্রিল বেগ।

প্রশ্ন-৬০. কার সময়ে জালালি পঞ্জিকার প্রচলন হয়?

উত্তর: সেলজুক সুলতান মালিক শাহের রাজত্বকালে জালালি পঞ্জিকার প্রচলন হয়।

প্রশ্ন-৬১. 'সিয়াসতনামা' গ্রন্থটির লেখক কে?

উত্তর: 'সিয়াসতনামা' গ্রন্থটির লেখক নিজামুল মুলক।

প্রশ্ন-৬২. পর্বতের বৃদ্ধ মানব বলা হতো কাকে?

উত্তর: হাসান বিন সাবাহকে পর্বতের বৃদ্ধ মানব বলা হতো।

প্রশ্ন-৬৩. গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের নেতা কে ছিলেন?

উত্তর: গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন হাসান বিন সাবাহ।

■ ক্রুসেডের কারণ ও ফলাফল এবং ক্রুসেডে সালাহউদ্দিন আইয়ুবির ভূমিকা ও অবদান

প্রশ্ন-৬৪. ক্রুসেড কী?

উত্তর: একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশত বছর খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালনা করে তাই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ।

প্রশ্ন-৬৫. ক্রুসেড (Crusade) শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

উত্তর: ক্রুসেড (Crusade) শব্দটি ইংরেজি শব্দ 'Cross' থেকে এসেছে।

প্রশ্ন-৬৬. ক্রুসেড (Crusade) শব্দের অর্থ কী?

[রা., দি., কু., চ., য., সি., ব. বো. ২০১৭]

উত্তর: ক্রুসেড (Crusade) শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ।

প্রশ্ন-৬৭. ক্রুসেডের কয়টি পর্যায় ছিল?

উত্তর: ক্রুসেডের তিনটি পর্যায় ছিল।

প্রশ্ন-৬৮. ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয় কীসের মধ্য দিয়ে?

উত্তর: ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয় ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে।

প্রশ্ন-৬৯. খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কত বছর ধরে ক্রুসেড পরিচালনা করে?

উত্তর: খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তিনশত বছর ধরে ক্রুসেড পরিচালনা করে।

প্রশ্ন-৭০. মিসর ও সিরিয়ায় আইয়ুবি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন কে?

উত্তর মিসর ও সিরিয়ায় আইয়ুবি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন গাজি সালাউদ্দিন আইয়ুবি।

প্রশ্ন-৭১. সালাহউদ্দিন আইয়ুবি কোন পর্যায়ের ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

উত্তর: সালাহউদ্দিন আইয়ুবি তৃতীয় পর্যায়ের ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

■ আব্বাসি খিলাফত পতনের কারণ ও প্রেক্ষাপট

প্রশ্ন-৭২. আব্বাসিদের শেষ খলিফার নাম কী? *[রা., য., ব., বো. ২০১৯]*

উত্তর: আব্বাসিদের শেষ খলিফার নাম আল-মুসতাসিম বিল্লাহ।

প্রশ্ন-৭৩. বাগদাদ নগরী ধ্বংস করেন কে?

উত্তর: মোঙ্গল নেতা হালাকু খান ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ নগরী ধ্বংস করেন।

প্রশ্ন-৭৪. আব্বাসি খিলাফত পতনের প্রত্যক্ষ কারণ কী?

উত্তর: আব্বাসি খিলাফত পতনের প্রত্যক্ষ কারণ মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের আক্রমণ।

প্রশ্ন-৭৫. কত খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে?

[ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]

উত্তর: ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

■ আব্বাসি আমলের প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ

প্রশ্ন-৭৬. আব্বাসি প্রশাসনে সাম্রাজ্যের প্রধান কে ছিলেন?

উত্তর: আব্বাসি প্রশাসনে সাম্রাজ্যের প্রধান ছিলেন খলিফা।

প্রশ্ন-৭৭. আব্বাসিরা কাদের অনুকরণে প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করেছিল?

উত্তর: আব্বাসিরা পারসিকদের অনুকরণে প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করেছিল।

প্রশ্ন-৭৮. আব্বাসি খলিফারা কোন মন্ত্রণা পরিষদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন?

উত্তর: আব্বাসি খলিফারা 'মজলিশ-উস-শুরা' নামক মন্ত্রণা পরিষদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

প্রশ্ন-৭৯. আব্বাসি শাসন ব্যবস্থায় ডাক বিভাগের প্রধানকে কী বলা হতো?

উত্তর: আব্বাসি শাসন ব্যবস্থায় ডাক বিভাগের প্রধানকে বলা হতো 'সাহিব-আল-বারিদ।'

প্রশ্ন-৮০. আব্বাসি কোন খলিফা সামন্ত প্রথার সূচনা করেন?

উত্তর: আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশীদ সামন্ত প্রথার সূচনা করেন।

প্রশ্ন-৮১. চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলা হয় কোন গ্রন্থকে?

উত্তর: চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলা হয় ইবনে সিনার 'কানুন ফিত তিব্বকে'।

প্রশ্ন-৮২. 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বলা হয় কাকে?

উত্তর: 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বলা হয় ইমাম গাজালি (র)-কে।

প্রশ্ন-৮৩. মানমন্দির কী? */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩/*

উত্তর: মানমন্দির হলো জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র।

প্রশ্ন-৮৪. ব্যালে নৃত্য কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর: ব্যালে নৃত্য আবিষ্কার করেন আব্বাসি খলিফা আল-আমিন।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. আব্বাসিদের পরিচয় দাও।

/রা., য., ব., বো. ২০১৯; রা.; কু.; চ.; ব. বো. ২০১৮/

উত্তর: আব্বাসিরা মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমি শাখা থেকে উদ্ভূত।

মহানবি (স)-এর পিতৃব্য আল-আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশেমের নাম থেকে আব্বাসি বংশের নামকরণ করা হয়েছে। আল-আব্বাস তার চার পুত্রকে রেখে ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তারা উমাইয়া গোত্রের মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে হাশেমি গোত্রের হযরত আলী (রা)-এর পক্ষাবলম্বন করেন। আত্মীয়তার দিক থেকে উমাইয়াদের তুলনায় মহানবি (স)-এর নিকটতর হওয়ায় তারা নিজেদেরকে মুসলিম খিলাফতের বৈধ দাবিদার বলে দাবি করত।

প্রশ্ন-২. আব্বাসি আন্দোলন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: উমাইয়াদের পতনের জন্য মুহাম্মদ (স)-এর চাচা আল-আব্বাসের বংশধররা যে আন্দোলন করেন ইতিহাসে সেটিই আব্বাসি আন্দোলন নামে পরিচিত।

আব্বাসি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন মুহাম্মদ বিন আলী। তিনি ঘোষণা করেন হুসাইনের শাহাদতবরণের পর ইসলামের ধর্মীয় কর্তৃত্ব মুহাম্মদ আল হানাফিয়ার ওপর অর্পিত হয়েছে। মুহাম্মদ আল হানাফির মৃত্যুর পর তার পুত্র হাশিম নেতৃত্বলাভ করেন এবং নিঃসন্তান হাশেম মৃত্যুর পূর্বে ইমামতির দায়িত্ব আব্বাসি বংশের তৎকালীন নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট অর্পণ করেন। আর উমাইয়াদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ খারিজি, মাওয়ালি ও শিয়ারা এ মতবাদের ভিত্তিতে আন্দোলনে যোগদান করলে এটি একটি তীব্র আকার ধারণ করে।

প্রশ্ন-৩. আবুল আব্বাসকে আস-সাফ্ফাহ বলা হয় কেন?

/সকল বোর্ড ২০২৩; ২০১৬/

উত্তর: নৃশংসতার জন্য আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাসকে আস-সাফ্ফাহ বলা হয়।

আবু মুসলিম ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করলে উমাইয়া বংশের পতন ঘটে। ৫ আগস্ট মারওয়ানের ছিন্ন মস্তক দেখে আবুল আব্বাস 'আস-সাফ্ফাহ' বা 'রক্তপিপাসু' উপাধি গ্রহণ করেন। আব্বাসি শাসনকে শঙ্কামুক্ত করতে আবুল আব্বাস ক্ষমতায় আরোহণ করে উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেন। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জুন তিনি ফিলিস্তিনের আবু ফুট্রুসে উমাইয়া বংশের ৮০ জন লোককে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। বসরাতেও তিনি এরূপ হত্যাযজ্ঞ চালান। তার আদেশে উমাইয়াদের মৃতদেহ কবর থেকে উঠিয়ে হাড়গুলো ভস্মীভূত করে বায়ুতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ নৃশংস চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তাকে আস-সাফ্ফাহ বলা হয়।

প্রশ্ন-৪. আবু আব্বাস-আস-সাফ্ফাহ উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেছিলেন কেন?

উত্তর: আবুল আব্বাস-আস-সাফ্ফাহ উমাইয়া বংশীয়দের ধ্বংস সাধনের লক্ষ্যে উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেন।

উমাইয়া এবং হাশেমিদের দ্বন্দ্ব ছিল খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় থেকেই। তাই হাশেমি বংশীয় আবুল আব্বাস খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেন। আস-সাফ্ফাহ ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জুন ফিলিস্তিনের আবু ফুট্রুস- এ উমাইয়া বংশের ৮০ জন লোককে আমন্ত্রণ করে এনে, সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। বসরাতেও অনুরূপ হত্যাযজ্ঞ সাধিত হয়। আস-সাফ্ফাহর আদেশে মৃত উমাইয়াদের দেহাবশেষ কবর থেকে উঠিয়ে নিয়ে হাড়গুলো ভস্মীভূত করে বায়ুতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন-৫. রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় কারা?

/ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯/

উত্তর: রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় হলো একদল উগ্রপন্থি পারসিক যারা আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরকে 'আল্লাহর অবতার' বলে প্রচার করেছিল।

খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের অতি অনুগত একটি দল তাকে 'খাদ্য ও পানীয় দাতা ঈশ্বর' বলে একটি মতবাদ প্রচার করতে থাকে। তাদের এ অনভিপ্রেত ও নাস্তিকতাপূর্ণ উন্মাদনায় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা ক্ষুদ্র হয়ে ওঠে। এতে আল মনসুর তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। আর এ দলটি তাদের ধর্মীয় মতবাদের জন্য ইতিহাসে 'রাওয়ান্দিয়া' সম্প্রদায় নামে অভিহিত।

প্রশ্ন-৬. আবু জাফর আল-মনসুরকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন?

উত্তর: সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করায় আবু জাফর আল-মনসুরকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ আব্বাসি বংশের ভিত প্রতিষ্ঠিত করলেও তিনি সাম্রাজ্যকে সুসংঘবদ্ধ কাঠামো দিতে পারেননি। কিন্তু খলিফা আল মনসুর সিংহাসনে বসে অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য সাহস, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা দ্বারা ভেতরে-বাইরের সকল বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেন। তাই তাকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

প্রশ্ন-৭. আবু মুসলিম খোরাসানি সম্পর্কে যা জান লেখো।

[রা., দি., কু., চ., য., সি., ব. বো. ২০১৭]

উত্তর: আবু মুসলিম খোরাসানি ছিলেন মুসলিম বংশোদ্ভূত একজন ইস্পাহানি (পারস্য বা ইরানের লোক)।

আব্বাসি শাসনামলে তিনি খোরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন। আব্বাসি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। আবু মুসলিমের বীরত্ব, কর্মতৎপরতা তাকে বেশ জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল। অন্যদিকে এগুলোই ছিল আবু মুসলিমের পতনের মূল কারণ। আবু মুসলিমের যোগ্যতা সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'তাহার অপরিবর্তনীয় শিষ্টাচার ও সৌজন্য শত্রুগণকে অনুরঞ্জিত করত এবং সমর্থক দল লাভে সহায়তা করত।' আব্বাসি শাসন শক্তিশালীকরণ ও বিদ্রোহীদের দমনে আবু মুসলিম খোরাসানির অবদান অপরিসীম। তার দক্ষতায় ঈর্ষান্বিত এবং আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে খলিফা আল-মনসুর তাকে হত্যা করেন।

প্রশ্ন-৮. আবু মুসলিম এত বিখ্যাত কেন?

[ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]

উত্তর: আব্বাসি খিলাফতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কারণে আবু মুসলিম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

আবু মুসলিম একটি নগণ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও সামরিক দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যের একজন নিয়ামক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি জাবের যুদ্ধে (৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করতে আব্বাসিদের বিশেষভাবে সহায়তা করেন। ফলে উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটে। পরবর্তীকালে আবু জাফর আল মনসুরের খিলাফতকালে আবদুল্লাহ খিলাফত লাভের জন্য বিদ্রোহ করলে খলিফা কর্তৃক প্রেরিত হয়ে আবু মুসলিম এ বিদ্রোহ দমন করেন। এতে আব্বাসি খিলাফত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে আবু মুসলিম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রশ্ন-৯. আলি বংশীয়দের প্রতি খলিফা মনসুরের দুর্ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; সকল বোর্ড ২০১৫]*

উত্তর: খলিফা মনসুর আলি বংশীয়দের আব্বাসি খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন। তাই তিনি তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

হযরত আলি (রা) ও ফাতিমা (রা)-এর বংশধরেরা আব্বাসি বংশের উত্থানের সময় যথাযথ সাহায্য করলেও খলিফা আল মনসুর তাদেরকে সুনজরে দেখেননি। বরং খিলাফতের সম্ভাব্য দাবিদার ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে আল মনসুর তাদেরকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হন। তাছাড়া আলির বংশধরদের প্রতি জনসাধারণের অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্য খলিফা মনসুর বিচলিত হন এবং তাদের ধ্বংস সাধনে তৎপর হয়ে ওঠেন। যার ফলে তিনি আলি বংশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন।

প্রশ্ন-১০. বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠায় আবু জাফর আল-মনসুর কীরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন?

উত্তর: বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠায় খলিফা আবু জাফর আল মনসুর খুব পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

খলিফা আল-মনসুরের সবচেয়ে গৌরবময় কীর্তি হলো বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা। প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধাসহ নানা দিক বিবেচনা করে তিনি ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে এই নগরী প্রতিষ্ঠা করে সেখানে আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী স্থানান্তর করেন। দজলা নদীর তীরে ৪৮ লক্ষ ৮৩ হাজার দিরহাম ব্যয় করে সুপরিকল্পিতভাবে বাগদাদ নগরী নির্মাণ করা হয়। প্রাচীর পরিবেষ্টিত এ নগরীর মধ্যভাগে ছিল খলিফার প্রাসাদ। এছাড়া এর ভেতর বাজার, সেনানিবাস ও মসজিদসহ অনেক অট্টালিকা ছিল। সিরিয়া ও ইরাকসহ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় এক লাখ দক্ষ শ্রমিক চার বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাগদাদ নগরী নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন-১১. নহরে জুবাইদার বিবরণ দাও। *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫; ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩; রা.; য.; ব. বো. ২০১৯; ঢা.; দি.; সি.; য. বো. ২০১৮]*

উত্তর: পবিত্র হজব্রত পালন করতে আসা লোকজনকে পথে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করে তাদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের স্ত্রী জুবাইদার উদ্যোগে যে খালটি খনন করা হয়, তাই নহরে জুবাইদা নামে পরিচিত।

মরুভূমির দেশ আরবের মক্কা নগরী মুসলিম জাতির জন্য সবচেয়ে পবিত্র স্থান। এখানে শত শত বছর ধরেই হজ মৌসুমে পবিত্র হজব্রত পালনের জন্য বহু মুসলিমের আগমন ঘটে। মধ্যযুগে সেই প্রতিকূল মরু অঞ্চলে কিন্তু এ বিপুলসংখ্যক লোকের অজু, গোসল কিংবা পানীয় জলের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না। দূরদূরান্ত থেকে

আসা হাজিদেরকে অসহনীয় দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হতো। তাদেরকে এ দুর্ভোগের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য জনহিতৈষী ও প্রজাবৎসল খলিফা হারুন-অর-রশীদের স্ত্রী জুবাইদা ৮০২ খ্রিষ্টাব্দে ১৫,০০,০০০ দিনার ব্যয়ে ফোরাত নদীর তীর থেকে মক্কা ও মদিনা পর্যন্ত নহরে জুবাইদা খালটি খনন করেন।

প্রশ্ন-১২. খলিফা হারুন-অর-রশীদকে 'রূপকথার নায়ক' বলা হয় কেন?

উত্তর: আরব্যোপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র হওয়ার কারণে খলিফা হারুন-অর-রশীদকে রূপকথার নায়ক বলা হয়।

খলিফা হারুন-অর-রশীদের শাসনামলে 'আলিফ লায়লা ওয়ালায়লা' বা 'হাজার এক রাত্রি' নামে একটি দীর্ঘ চিত্তাকর্ষক কাহিনি লেখা হয়। এটির ভিত্তি প্রাচীন পারস্যসহ বিভিন্ন দেশের প্রচলিত লোক কাহিনি। বাংলা ভাষায় এ কাহিনি 'আরব্যোপন্যাস নামেও পরিচিত। এতে কাল্পনিক চরিত্র আলাদিন, আলীবাবা ও সিন্দাবাদের পাশাপাশি আব্বাসি খলিফা হারুনকে কেন্দ্র করেও কিছু কাহিনি রয়েছে। তার সময়ে বাগদাদ নগরী গল্পের মতোই সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। এটিই সেখানে আরব্যোপন্যাস সংকলিত হওয়ার মূল কারণ।

প্রশ্ন-১৩. বার্মাকি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা দাও।

[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]

উত্তর: বার্মাকিরা ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী।

জার্মান ঐতিহাসিক গিলমানের (Carolyn Ives Gilman) মতে, বার্মাকি উজিরদের পূর্বপুরুষ জাফর বলখের বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত থাকায় তার উপাধি ছিল বার্মাক। উল্লেখ্য জাফর স্ত্রী ও পুত্র খালিদসহ উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সেনাপতি কুতাইবা ইবন মুসলিম কর্তৃক মধ্য এশিয়া বিজয়ের সময় বন্দি হন। পরবর্তী সময় তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে। এরা আব্বাসি আন্দোলন থেকে শুরু করে এই বংশের প্রতিষ্ঠা, বিদ্রোহ দমন ও প্রশাসন পরিচালনায় বিশেষ অবদান রেখে খ্যাতি অর্জন করে।

প্রশ্ন-১৪. খলিফা হারুন-অর-রশীদের বাইজান্টাইন নীতির বর্ণনা দাও।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]

উত্তর: খলিফা হারুন-অর-রশীদের গৃহীত বাইজান্টাইন নীতি তার রণনৈপুণ্য ও সমরকুশলতার পরিচয় বহন করার পাশাপাশি তার অদূরদর্শিতারও পরিচয় দেয়।

খলিফা হারুন-অর-রশীদ সিংহাসনে আরোহণকালে বাইজান্টাইন সম্রাজ্ঞী আইরিন আব্বাসিদের সাথে স্বাক্ষরিত পূর্ববর্তী সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করলে হারুন তাকে পরাজিত করে পুনরায় সন্ধি করতে বাধ্য করেন। সম্রাজ্ঞী আইরিনের অর্থমন্ত্রী নাইসিফোরাস আইরিনকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করে পুনরায় সন্ধি ভঙ্গ করলে হারুন নাইসিফোরাসের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তাকেও পরাজিত করে সন্ধি চুক্তি করেন। পরবর্তীতে নাইসিফোরাস দুইবার সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করলেও হারুন তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পুনরায় যখন তিনি মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন তখন খলিফা খোরাসানের বিদ্রোহ দমন এবং পরবর্তীতে অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়ার ফলে তার পক্ষে এ আক্রমণ মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি। তাই বাইজান্টাইন নীতি খলিফার রণনৈপুণ্যের পাশাপাশি তার অদূরদর্শিতাকে তুলে ধরে।

প্রশ্ন-১৫. খলিফা আল-আমিন ও মামুনের মধ্যকার সংঘটিত গৃহযুদ্ধের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: খলিফা আল-আমিন ও মামুনের মধ্যে শাসনক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

এক বা একাধিক উত্তরাধিকারী মনোনয়নের প্রথা আব্বাসি যুগে বিভেদ ও জটিলতার সৃষ্টি করে। খলিফা হারুন ৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে তার তিন পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। যা পরবর্তীতে নানা দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি করে। আল-আমিন ছিল খিলাফতের অযোগ্য। অন্যদিকে মামুন ছিল যোগ্য। মামুনের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে রাব্বী এবং আলী বিন-ঈশার কুমন্ত্রণায় আল-আমিন মামুনকে খোরাসানের শাসনকর্তার পদ থেকে অপসরণের আদেশ জারি করেন। যার ফলে আমিন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-১৬. গৃহযুদ্ধে আল আমিনের ব্যর্থতার কারণ বুঝিয়ে লেখো।

উত্তর: খলিফা আল-আমিন তার কুশাসন ও ব্যক্তিগত চরিত্র, সুন্নি সম্প্রদায়ের অসহযোগিতা এবং অদূরদর্শিতার কারণে গৃহযুদ্ধে ব্যর্থ হন।

আমিনের পতনের জন্য তার ব্যক্তিগত চরিত্র অনেকাংশ দায়ী। তিনি রাজকার্য অপেক্ষা হেরেম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বেশি। ফলে তার উজির ফজল বিন রাব্বী রাজ্যের সর্বেসবা হয়ে ওঠে। তার কুশাসনে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আমিনের কুশাসন ও অযোগ্যতার জন্য তিনি আরবদের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হন এবং সুন্নি জামায়াত তাকে ত্যাগ করে। এছাড়া তিনি ছিলেন স্বল্পমেয়াদি চিন্তার অধিকারী। প্রজাদের কল্যাণ সাধন করে শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার মতো বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তা তার ছিল না। আর এ সকল কারণেই গৃহযুদ্ধে তার পরাজয় ঘটে।

প্রশ্ন-১৭. খলিফা হারুন-অর-রশীদ বার্মাকিদের ধ্বংস করেছিলেন কেন?

উত্তর: বার্মাকিদের অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্য, হারুনের বোন আব্বাসাকে জাফর বার্মাকের গোপন বিবাহ প্রভৃতি কারণে খলিফা হারুন-অর-রশীদ বার্মাকিদের ধ্বংস সাধন করেছিলেন।

বার্মাকিরা দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে অবিচল আনুগত্যের সাথে কঠোর পরিশ্রম করে হারুন-অর-রশীদের রাজত্বকে গৌরবোজ্জ্বল করেছিলেন। কিন্তু তাদের অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্য তাদের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খলিফার কাছে বার্মাকিদের অপরিসীম জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে অসহ্য হয়ে ওঠে। এছাড়া ফজল বিন রাবীর ব্যক্তিগত শত্রুতা ও উচ্চাভিলাষ, জাফর বার্মাকি কর্তৃক হারুনের বোন আব্বাসাকে গোপনে বিবাহ এবং সন্দেহ ও লোকজনের নানারকম কথার প্রভাবে খলিফা হারুন বার্মাকিদের ধ্বংস করেছিলেন।

প্রশ্ন-১৮. আল-মামুনের প্রতি পারসিকদের সমর্থনদানের কারণ ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]*

উত্তর: মায়ের দিক দিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় পারসিকরা আল-মামুনকে সমর্থন দিয়েছিল।

আল-মামুনের মা মারাজিল ছিলেন একজন পারসিক ক্রীতদাসী। তাই পারসিকরা গৃহযুদ্ধে আল-মামুনকে সহায়তা করে। মূলত আমিন এবং আল-মামুনের মধ্যকার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব আরব-পারসিক দ্বন্দ্বে রূপ নিয়েছিল। আরব-পারসিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এ যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। পারস্যবাসী মামুনকে 'ভাগ্নে' হিসেবে সমর্থন দেয়। তারা জাতীয়তাবোধ ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তাকে ধরে রাখতে মামুনকে সর্বাত্মক সহায়তা করে। ফলে যুদ্ধে মামুন বিজয় লাভ করে।

প্রশ্ন-১৯. বায়তুল হিকমা বলতে কী বোঝায়? *[ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; রা., দি., কু., চ., য., সি., ব. বো. ২০১৭]*

উত্তর: আব্বাসি খলিফা আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা জ্ঞানগৃহ হলো বায়তুল হিকমা।

বায়তুল হিকমা কথাটির অর্থ জ্ঞানগৃহ। খলিফা আল-মামুন ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল হিকমা গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ বিভাগ- এ তিনভাগে বিভক্ত ছিল। সুপণ্ডিত হুনায়ন বিন-ইসহাক এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখানে গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি, পল প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীদের প্রাচীন গ্রন্থাবলি অনুবাদ করা হতো এবং অনুবাদকারীকে গ্রন্থের ওজনে স্বর্ণমুদ্রায় পারিশ্রমিক দেওয়া হতো।

প্রশ্ন-২০. খলিফা আল-মামুনের রাজত্বকালকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয় কেন?

উত্তর: শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অসাধারণ উন্নতি লাভের কারণে খলিফা আল-মামুনের রাজত্বকালকে ইসলামের অগাস্টাস যুগ বলা হয়।

রোমান সম্রাট অগাস্টানের শাসনামলের তার সাম্রাজ্যে যেমন অগ্রগতি ঘটেছিল খলিফা আল-মামুনের শাসনামলে বাগদাদও তেমনিভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাদপীঠে পরিণত হয়েছিল। মামুনের শাসনকাল ছিল আব্বাসি তথা আরবদের জন্য অলংকারস্বরূপ। শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার ও বিকাশে আল-মামুনের অবদান ছিল অপরিসীম। তার শাসনকালে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। এ কারণে আল মামুনের শাসনামলকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়।

প্রশ্ন-২১. বুয়াইয়াদের পরিচয় দাও।

উত্তর: বুয়াইয়া রাজবংশের আদি পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা মধ্য এশিয়ার একটি উপজাতি। তারা কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলে আল-বুরজ মালভূমি এবং পারস্যের তাবারিস্তান ও গিলানের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ দাইলামে বাস করত। দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে এ বংশের আবু সুজা বোখারার সাসানীয় রাজবংশের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। সুজার বংশের লোকেরা ৯৩৪-৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণে অভিযান চালিয়ে সাসানীয়দের কাছ থেকে বর্তমান ইরাকের শিরাজ, ইস্পাহান, খুজিস্তান, কেরমান, আহওয়াজ ইত্যাদি স্থান দখল করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় শিরাজে।

প্রশ্ন-২২. খলিফা মামুন ইতিহাসে কী জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন?

উত্তর: জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদানের জন্য খলিফা আল-মামুন ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

আব্বাসি খলিফা আল-মামুন প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা জ্ঞানগৃহ হলো বায়তুল হিকমা। তিনি ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ বিভাগ- এ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। সুপণ্ডিত হুনায়ন বিন-ইসহাক এর প্রথম তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখানে গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি, পল প্রমুখ মনীষীদের প্রাচীন গ্রন্থাবলি অনুবাদ করা হতো এবং অনুবাদকারীকে গ্রন্থের ওজনে স্বর্ণমুদ্রায় পারিশ্রমিক দেওয়া হতো।

প্রশ্ন-২৩. জালালি পঞ্জিকা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: উমর খৈয়ামের নেতৃত্বে নিশাপুরের জ্যোতির্বিদরা চান্দ্র মাসের পরিবর্তে সৌর মাস অনুযায়ী কাল গণনার প্রথা প্রচলন করেন যা, জালালি পঞ্জিকা হিসেবে পরিচিত।

সেলজুক সুলতান মালিক শাহের সময়ে প্রচলিত গণনাপদ্ধতির যাবতীয় ভুল সংশোধন করে একটি নতুন পঞ্জিকা তৈরি করা হয়। সুলতানের নামানুসারে এর নামকরণ হয় জালালি পঞ্জিকা।

প্রশ্ন-২৪. ইসলামের ইতিহাসে সেলজুকদের অবদান কেমন ছিল?

উত্তর: আব্বাসি খিলাফতের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার সুযোগে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে সেলজুক বংশ (১০৫৫-১১৯৪ খ্রি.) অন্যতম।

সেলজুকরা ছিল ঘুজ তুর্কি বংশোদ্ভূত এবং তাদের আদি নিবাস ছিল তুর্কিস্তানের কিরগিজ তুন্দ্রা অঞ্চলে। এ বংশের নেতা সেলজুক বিন বাকায়িক এর নাম থেকেই এ বংশের নাম 'সেলজুক বংশ' হয়েছে। আব্বাসি খিলাফতকালে সেলজুকরা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— জালালি পঞ্জিকা প্রচলন, বিমারিস্তান নামে হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি।

প্রশ্ন-২৫. মালিক শাহ্‌কে শ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয় কেন?

উত্তর: প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য মালিক শাহ্‌কে শ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়।

মালিক শাহের এ শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে যেসব বিষয় ক্রিয়াশীল ছিল বলে বিবেচনা করা হয় সেগুলো হলো— ১. মালিক শাহের শাসনকালে সেলজুকদের প্রভুত্ব সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে বিস্তার লাভ করে। ২. তিনি আব্বাসি খিলাফতকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাজধানীকে ইস্পাহান থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত করেন। ৩. তিনি শাসনসংস্কার ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে ইসলামি বিশ্বের গৌরবের পতাকা সমুন্নত রাখেন। এসব কারণে মালিক শাহ্‌কে শ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়।

প্রশ্ন-২৬. হাসান বিন সাবাহ ইতিহাসে পর্বতের বৃদ্ধ মানব নামে পরিচিত কেন?

উত্তর: হাসান বিন সাবাহ পর্বতশিখরের একটি সুরক্ষিত দুর্গে বাস করতেন বলে তিনি পর্বতের বৃদ্ধ মানব নামে পরিচিত।

সেলজুক সুলতান মালিক শাহের রাজত্বকালে ইসলামের ইতিহাসের হত্যাকারী সম্প্রদায় বা গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। আর এ গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাসান বিন সাবাহ। তিনি ইরানের উত্তর-পশ্চিমে আলামুত পর্বতশিখরে একটি সুরক্ষিত দুর্গে বাস করতেন এবং সেখান থেকেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন। পর্বতে বাস করার জন্য হাসান বিন সাবাহ পর্বতের বৃদ্ধ মানব নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২৭. সেলজুকদের পতনের কারণ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের হিংসাত্মক কার্যকলাপ, উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি কারণে সেলজুকদের পতন ঘটে।

সেলজুক সুলতান মালিক শাহের উজির নিজামুল মুলকের এক সময়ের বন্ধু হাসান বিন সাবাহ গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে। এই গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের হাতেই নিজামের মতো যোগ্য উজিরের মৃত্যুর ফলে সেলজুক বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া মালিক শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্ররা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অবশেষে সেলজুক সুলতান তুঘ্রিল ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে খাওয়ারিজমের শাসক তাকাশের কাছে পরাজিত হওয়ার মাধ্যমে সেলজুক বংশের পতন হয়।

প্রশ্ন-২৮. ক্রুসেড বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: ক্রুসেড বলতে মধ্যযুগে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত দীর্ঘকালীন ধর্মযুদ্ধকে বোঝায়।

একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশত বছর ধরে ঈর্ষাপরায়ণ ও বিক্ষুব্ধ খ্রিষ্টান জগৎ ধর্মের ডাকে বক্ষে ক্রুস চিহ্ন ধারণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালনা করে, তাই ইতিহাসে ক্রুসেড নামে পরিচিত। ক্রুসেড শব্দটির অর্থ ধর্মযুদ্ধ। খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক ক্রুস থেকে 'ক্রুসেড' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। তৎকালীন মুসলিম এশিয়ার বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান ইউরোপের সীমাহীন হিংসাবিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে ক্রুসেড নামক এ ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে।

প্রশ্ন-২৯. ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ক্রুসেডের পেছনে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান ছিল।

মহানবি (স)-এর মেরাজ গমনের স্থান এবং হযরত মুসা ও হযরত দাউদের স্মৃতি বিজড়িত জেরুজালেম মুসলমানদের এবং খ্রিষ্টানদের কাছে সমানভাবে পবিত্র। প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টান, ইহুদি ও মুসলমান এ তিনটি সম্প্রদায়ের জন্য জেরুজালেম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যার কারণে ফাতেমি নবম খলিফা আল-হাকিম ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমের খ্রিষ্টানদের পবিত্র সমাধি ও গির্জা ধ্বংস করলে তারা খুবই বিক্ষুব্ধ হয়। এছাড়া সেলজুক শাসকেরা খ্রিষ্টানদের তীর্থযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে ইউরোপের খ্রিষ্টান জগতে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পোপ দ্বিতীয় আরবানের ঘোষণা এবং সম্রাট কমনেসাসের আবেদন ক্রুসেডকে ত্বরান্বিত করেছিল, যা প্রায় দুশত বছর স্থায়ী ছিল। আটটি বড় রকমের ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল।

প্রশ্ন-৩০. ক্রুসেডের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: খ্রিষ্টানদের পবিত্র গির্জার পাশে মসজিদ নির্মাণ করা ক্রুসেডের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল।

১০৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সেলজুকরা জেরুজালেম অধিকার করে এখানে খ্রিষ্টানদের পবিত্র গির্জার পাশে মসজিদ তৈরি করে। এর ফলে খ্রিষ্টানরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এরই প্রতিক্রিয়ায় পোপ দ্বিতীয় আরবান ধর্মযাজক, অভিজাত ও খ্রিষ্টান রাজাদের এক ধর্মসভার আয়োজন করে মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম রক্ষার আহ্বান জানালে দীর্ঘ দুশো বছরব্যাপী স্থায়ী মহাযুদ্ধ ক্রুসেডের সূত্রপাত ঘটে।

প্রশ্ন-৩১. ক্রুসেডের ধর্মীয় কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেমের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা ক্রুসেডের ধর্মীয় কারণ ছিল।

৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হযরত ওমর (রা) এর সময় আমর ইবন আল-আস জেরুজালেম দখল করেন। এর ফলে খ্রিষ্টান জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমে খ্রিষ্টানদের পবিত্র সমাধি ও গির্জা ধ্বংস করলে তারা খুবই বিক্ষুব্ধ হয়। ফলে খ্রিষ্টানরা জেরুজালেমের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রুসেডে (ধর্মযুদ্ধ) যোগদান করে।

প্রশ্ন-৩২. সালাহউদ্দিন আইয়ুবি সম্পর্কে টীকা লেখো।

উত্তর: সালাহউদ্দিন আইয়ুবি হলেন মিসর ও সিরিয়ায় আইয়ুবি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও তৃতীয় ক্রুসেডের নেতা।

টাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত তিকরিতে ১১৩৭ সালে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন কুর্দি নেতা আইয়ুব। সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমি বংশের ধ্বংসস্তূপের ওপর আইয়ুবি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রুসেডারদের (১১৮৯-১১৯২) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুসলমানদের রক্ষায় তিনি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন।

প্রশ্ন-৩৩. আব্বাসি খিলাফত পতনের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আব্বাসি খিলাফতের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণ।

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করেন। মোঙ্গল বাহিনী ৪০ দিন ধরে অবরোধ চালায় এবং তারা বিশাল পাথরের খন্ড ও আগুনের গোলা নিক্ষেপের মাধ্যমে নগরীর দেওয়াল ভেঙে ফেলে। নিরুপায় খলিফা মুসতাসিম হালাকু খানের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রাণভিক্ষা চান। কিন্তু হালাকু খান অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে খলিফা ও বাগদাদের ২০ লক্ষ অধিবাসীর ১৬ লক্ষকেই হত্যা করে।

প্রশ্ন-৩৪. দিওয়ান আল-রাসায়েল কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: উমাইয়া শাসনব্যবস্থায় সরকারি পত্র আদান-প্রদানের জন্য যে বিভাগ কাজ করত সেটিই দিওয়ান আল-রাসায়েল নামে পরিচিত।

উমাইয়া শাসনামলে দিওয়ান আল-রাসায়েল বা সরকারি পত্র বিনিময় বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। তবেও আব্বাসি শাসনামলে এসে এটি আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ বিভাগ রাজকীয় ফরমান, নিযুক্তিপত্র, বিশেষাধিকার পত্র, রাজনৈতিক পত্রাদি রচনা করত এবং খলিফা ও উজিরের অনুমোদন নিয়ে প্রয়োজনীয় স্থানে প্রেরণ করত। বিভাগটির প্রধানকে বলা হয় 'সাহিব দিওয়ান আল রাসায়েল'।

প্রশ্ন-৩৫. আব্বাসিরা অনারবীয়দের প্রতি কীরূপ নীতি গ্রহণ করে?

উত্তর: আব্বাসিরা রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনারবীয়দের সমান সুযোগ প্রদানের নীতি গ্রহণ করে।

উমাইয়া শাসনামলে অনারবদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হতো। এমনকি তারা স্বতন্ত্র সামাজিক শ্রেণি 'মাওয়ালি' হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু আব্বাসিরা রাষ্ট্রীয় নীতিতে উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে সকল শ্রেণির নাগরিকদের সমান অধিকার প্রদানের নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে অনারব নাগরিকরা রাজ্যের সেনাবাহিনী, প্রশাসনসহ বিভিন্ন উচ্চপদে নিয়োগ লাভ করেন।

প্রশ্ন-৩৬. আব্বাসিদের শান্তিবাদী বলা হয় কেন?

উত্তর: সম্প্রসারণবাদী নীতির পরিবর্তে শান্তিবাদী নীতিতে অধিক গুরুত্বারোপ করার কারণে আব্বাসিদের শান্তিবাদী বলা হয়।

উমাইয়ারা ছিল ব্যাপক সম্প্রসারণবাদী। অন্যদিকে আব্বাসিরা তাদের গৌরবময় যুগেও সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণ করেনি। তারা রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এ কারণে আব্বাসিদের কয়েক দফা বাইজান্টাইনদের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হলেও কখনো আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়নি। এভাবে সম্প্রসারণবাদী নীতি পরিহার করে শান্তির নীতি গ্রহণ করায় তাদেরকে শান্তিবাদী বলা হয়।

প্রশ্ন-৩৭. দিওয়ান আল জুন্দ কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ইসলামি শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী গঠন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে বিভাগ কাজ করত সেটিই দিওয়ান আল জুন্দ নামে পরিচিত।

খলিফা হযরত ওমর (রা) দিওয়ান আল জুন্দ বিভাগের সৃষ্টি করলেও আব্বাসি শাসনামলে এসে এর ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্য নিয়োগ, সৈন্যদের বেতন ও ভাতা বণ্টন এবং যাবতীয় সামরিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব এ দিওয়ান আল জুনদের ওপর ন্যস্ত ছিল।

প্রশ্ন-৩৮. খলিফাকে আব্বাসি শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র বলা হয় কেন?

উত্তর: খলিফা সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কারণে তাকে আব্বাসি শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র বলা হয়।

আব্বাসি শাসনব্যবস্থায় খলিফা ছিলেন রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। রাষ্ট্রের শাসনসংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ আদেশ-নির্দেশ মূলত তার মাধ্যমেই আইনে পরিণত হতো। রাজনৈতিক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রের সকল প্রকার আর্থ-সামাজিক, বৈদেশিক, রাজনৈতিক কার্যাবলি তার নির্দেশেই পরিচালিত হতো। আর এ সমস্ত কারণেই খলিফাকে আব্বাসি শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র বলা হয়।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. টুরসের খ. জাবের
গ. কারবালার যুদ্ধ ঘ. কাদেসিয়ার যুদ্ধ

২. আব্বাসি খিলাফত কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
ক. ৬৬১ খ. ৭৫০
গ. ৭৮০ ঘ. ৯১০

৩. আব্বাসি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. আবুল আব্বাস খ. আল-মনসুর
গ. হারুন-অর-রশীদ ঘ. আল-মামুন

৪. 'আস-সাফফাহ' শব্দের অর্থ কী?
ক. রক্তপ্রবাহকারী খ. রক্তপাত
গ. রক্তপিপাসু ঘ. রক্তের প্রয়োজন

৫. আব্বাসি আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পেছনে কার অবদান সবচেয়ে বেশি?
ক. আবু মুসলিমের খ. আবু আয়ানের
গ. কাহতাবার ঘ. আবুল আব্বাসের

৬. 'আল-মনসুর' উপাধির অর্থ কী?
ক. প্রজাবৎসল শাসক
খ. জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক
গ. কূটনীতিবিদ
ঘ. বিজয়ী

৭. দারুস সালাম অর্থ কী?
ক. আলোর নিবাস খ. শান্তির নিবাস
গ. সৌন্দর্যের নিবাস ঘ. জ্ঞানের নিবাস

৮. 'আল-মনসুর' উপাধি ধারণ করেছিলেন কে?
ক. ঈশা খ. আবু জাফর
গ. আবু মুসা ঘ. আবদুল্লাহ

৯. আবু মুসলিম কোথাকার লোক ছিলেন?
ক. সমরখন্দের খ. ইস্পাহানের
গ. বোখারার ঘ. নজদের

১০. আল-মনসুর আবু মুসলিমকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন কেন?
ক. তার দুর্বলতার জন্য
খ. খিলাফতকে শঙ্কামুক্ত করার জন্য
গ. যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য
ঘ. সুস্পষ্ট অভিযোগের কারণে

১১. আব্বাসি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন কে?
ক. আবুল আব্বাস খ. হারুন-অর-রশীদ
গ. আল আমিন ঘ. আল-মামুন

১২. কার শাসনামলকে আব্বাসি খিলাফতের স্বর্ণযুগ বলা হয়?
ক. হারুন-অর-রশীদ খ. আবুল আব্বাস
গ. আল-মনসুর ঘ. আল-মামুন

১৩. কোন খলিফার স্ত্রী 'নহরে জুবাইদা' খনন করেন?
ক. আল-মনসুরের খ. হারুন-অর-রশীদের
গ. আল-মামুনের ঘ. আল-আমিনের

১৪. আল-মামুন কত খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন?
ক. ৮১২ খ. ৮১৩
গ. ৮১৪ ঘ. ৮১৫

১৫. আল-মামুনের খিলাফতকালে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের নাম কী?
ক. বায়তুল আমান খ. বায়তুল হিকমা
গ. বায়তুল ইজ্জত ঘ. বায়তুল মামুর

১৬. 'বায়তুল হিকমা' শব্দের অর্থ কী?
ক. জ্ঞানগৃহ খ. জ্ঞানবৃক্ষ
গ. জ্ঞানসমুদ্র ঘ. জ্ঞান সংকলন

১৭. বায়তুল হিকমা কত খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
ক. ৮২৮ খ. ৮২৯
গ. ৮৩০ ঘ. ৮৩১

১৮. খলিফা মামুন কোথায় বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. কায়রোতে খ. বাগদাদে
গ. রোমে ঘ. আনকারায়

১৯. সর্বপ্রথম এশিয়া মাইনরে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে কারা?
ক. বুয়াইয়ারা খ. সেলজুকরা
গ. আব্বাসিরা ঘ. আইয়ুবিরা

২০. সেলজুক বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন?
ক. আলপ-আরসালান খ. মালিক শাহ
গ. তুঘ্রিল বেগ ঘ. ইব্রাহিম নিয়ান

২১. 'সিয়ামত নামা' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. মালিক শাহ খ. হাসান বিন সাবাহ
গ. নিজামুল মুলক ঘ. মাহমুদ শাহ

২২. পর্বতের বৃদ্ধলোক (The old man of the mountain) কার উপাধি ছিল?
ক. নিজাম-উল-মুলক খ. সাইফুদ্দীন
গ. হাসান বিন সাবাহ ঘ. মুইজ উদ্দীন

২৩. বাগদাদ নগরী ধ্বংসের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?
ক. সেলজুকদের আক্রমণ
খ. মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের আক্রমণ
গ. সালাউদ্দিন আইয়ুবি আক্রমণ
ঘ. রোমানদের আক্রমণ

২৪. হালাকু খান কত খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ আক্রমণ করেন?
ক. ১২৫৫ খ. ১২৫৬
গ. ১২৫৭ ঘ. ১২৫৮

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২৫. আবুল আব্বাসের নিষ্ঠুরতার পরিচয় বহন করে—
i. উমাইয়া নিধন ii. আবু সালমার হত্যাকাণ্ড
iii. আবু মুসলিমের হত্যাকাণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৬. হারুনের সময়কালকে আব্বাসি যুগের শ্রেষ্ঠ সময় বলার কারণ—
i. শ্রেষ্ঠ শাসন পরিচালনা ii. উন্নয়নমুখী চিন্তাধারা
iii. প্রজা কল্যাণ সাধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৭. সেলজুকদের অবদান হলো—
i. জালালি পঞ্জিকা প্রচলন
ii. বিমারিস্তান নামে হাসপাতাল নির্মাণ
iii. ইস্পাহানের জামে মসজিদ নির্মাণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৮. ক্রুসেডের কারণ ছিল—
i. রাজনৈতিক ii. বাণিজ্যিক
iii. ধর্মীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার শাসন আমলে বাংলার স্বাধীনতা সুদৃঢ় হয়নি। পরবর্তীতে বাংলার ক্ষমতায় আসেন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। তিনিই বাংলার স্বাধীনতাকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করেন। এর ফলে বাংলা সমৃদ্ধ হতে থাকে।

২৯. ইলিয়াস শাহের সাথে কোন আব্বাসি খলিফার কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে?
ক. আবুল আব্বাস খ. আবু জাফর আল-মনসুর
গ. হারুন-অর-রশীদ ঘ. আল-মামুন

৩০. খলিফার ভূমিকার ফলে—
i. আব্বাসি খিলাফত সুদৃঢ় হয়
ii. মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে
iii. সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১ ও ৩২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জোয়ান অব আর্ক ছিলেন ফ্রান্সের একজন সাহসী ও প্রতিবাদী নারী। তিনি সরাসরি যুদ্ধ করেছেন। ধর্মান্ধ লোকেরা তাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আগুনে পুড়িয়ে মারে।

৩১. অনুচ্ছেদের নারীর সাথে আরবের কোন নারীর সাদৃশ্য বিদ্যমান?
ক. লায়লার খ. জুন্নুরায়েনের
গ. জুবাইদার ঘ. জুরাইরিয়ার

৩২. অনুচ্ছেদের নারীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরব নারীর মূল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কীসে?
ক. প্রতিবাদী চরিত্রে
খ. নেতৃত্ব দানে
গ. পরিণতিতে
ঘ. স্বভাবের দিক থেকে

উদ্দীপকটি পড়ে ৩৩ ও ৩৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে সহায়তা করার বাইরে অন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি।

৩৩. আব্বাসি শাসনামলে বাংলা একাডেমির অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল?
ক. বায়তুল হিকমাহ
খ. দারুল হিকমাহ
গ. বিজ্ঞান একাডেমি
ঘ. মারগা মানমন্দির

৩৪. উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল—
ক. ভাষা ও সাহিত্যের ওপর গবেষণা করা
খ. জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা করা
গ. পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও প্রকাশ করা
ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মুঘল শাসনামলে কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্যের ফলে সাম্রাজ্যের ভিতরে বিভিন্ন বিদ্রোহ আর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অনেক উচ্চাভিলাষী প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিজ নিজ অঞ্চল স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন। এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জন্মলাভ মুঘল বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

৩৫. উদ্দীপকের ঘটনা কোন বংশের পতনের অভ্যন্তরীণ কারণকে স্মরণ করিয়ে দেয়?
ক. সেলজুক খ. আইয়ুবি
গ. আব্বাসি ঘ. ফাতেমি

৩৬. উদ্দীপকের মুঘল বংশের মতো উক্ত বংশের কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হয়ে পড়ে—
i. দুর্বল উত্তরাধিকার শাসক থাকার কারণে
ii. সাম্রাজ্যের ব্যাপকতার কারণে
iii. প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিলাসিতার কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৭. খলিফা আল-মনসুর একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হওয়া সত্ত্বেও অকৃত্রিম বন্ধু আবু মুসলিম এর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের কারণ— */সকল বোর্ড ২০১৮/*
ক. নিজের ও বংশের নিরাপত্তা শঙ্কা
খ. ব্যক্তিস্বার্থ
গ. অর্থনৈতিক কারণ
ঘ. অনৈসলামিক কার্যকলাপ

৩৮. কোন খলিফাকে 'রূপকথার রাজা' বলা হয়? */সকল বোর্ড ২০২৫; ২০১৭/*
ক. আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ
খ. আল-মনসুর
গ. হারুন-অর-রশীদ
ঘ. আল-মামুন

৩৯. নহরে জোবায়দা কেন খনন করা হয়? */সকল বোর্ড ২০২২/*
ক. শিক্ষা বিস্তারের জন্য
খ. হজ যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য
গ. হজ যাত্রীদের পানির কষ্ট লাঘবের জন্য
ঘ. মক্কাবাসীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের জন্য

৪০. খলিফা আল-মামুন ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? */সকল বোর্ড ২০২৩/*
ক. ধর্মপরায়ণতার জন্য
খ. শাসন সুদৃঢ়করণের জন্য
গ. প্রজাহিতৈষী কাজের জন্য
ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য

৪১. 'বায়তুল হিকমা' কী? */সকল বোর্ড ২০২৫; ২০২৩; ২০১৫/*
ক. গবেষণাগার খ. রাজপ্রাসাদ
গ. প্রমোদ তরী ঘ. এক ধরনের স্থাপত্য

৪২. ক্রুসেড কী? */সকল বোর্ড ২০২৫; ২০১৬/*
ক. ধর্মযুদ্ধ খ. গৃহযুদ্ধ
গ. ধর্মীয় চিহ্ন ঘ. স্বাধীনতা যুদ্ধ

৪৩. কত খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ নগরী ধ্বংস হয়? */সকল বোর্ড ২০১৯/*
ক. ৭৫০ খ. ৯০৬
গ. ১২৫০ ঘ. ১২৫৮

৪৪. হেরোডোটাস কে ছিলেন? */সকল বোর্ড ২০১৬/*
ক. দার্শনিক খ. ইতিহাসবিদ
গ. গণিতবিদ ঘ. জ্যোতির্বিদ

৪৫. আব্বাসি বংশের উত্থান ঘটে— */সকল বোর্ড ২০১৬/*
i. হাশেমি গোত্র থেকে
ii. কুরাইশ বংশ থেকে
iii. উমাইয়া গোত্র থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৬. আবুল আব্বাসের 'আস-সাফফাহ' উপাধি গ্রহণ করার কারণ হলো— */সকল বোর্ড-২০১৮/*
i. বিরোধীদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার
ii. বিরোধীদের অনুগত করা
iii. বিরোধীদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৭ ও ৪৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

অটোমান সুলতান আব্দুল হামিদের ক্ষমতায় আরোহণের পশ্চাতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন ফুয়াদ পাশা। পরবর্তী সময়ে ফুয়াদ পাশার ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা সুলতানের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে তিনি কৌশলে ফুয়াদ পাশাকে হত্যা করেন। */সকল বোর্ড ২০১৭/*

৪৭. উদ্দীপকে বর্ণিত ফুয়াদ পাশার সাথে হত্যাকাণ্ডের শিকার কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?
ক. আবু মুসলিম খোরাসানি
খ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ
গ. মুসা বিন নুসায়ের
ঘ. আল-আমিন

৪৮. উদ্দীপকে নির্দেশিত উক্ত হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে নিহিত ছিল—
i. ক্ষমতা লিপ্সা
ii. প্রতিহিংসা
iii. প্রতিদ্বন্দ্বিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৯ ও ৫০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

পূর্ববর্তী শাসকের আমলে রফিক অত্যন্ত গোপনে দূরবর্তী একটি অঞ্চলে একজন সুযোগ্য সঙ্গীর সহযোগিতা নিয়ে ওই বংশের বিপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকে। একটি যুদ্ধে রফিক জয়লাভ করে নতুন একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন যা পাঁচ শতাধিককাল টিকেছিল। */সকল বোর্ড ২০১৬/*

৪৯. উদ্দীপকে রফিকের সাথে কোন খলিফার মিল পাওয়া যায়?
ক. ইবরাহিম খ. আবুল আব্বাস
গ. আবু জাফর ঘ. দ্বিতীয় মারওয়ান

৫০. উদ্দীপকে রফিকের সেনাপতির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কার মিল রয়েছে?
ক. আবু মুসলিম খ. আবু আইয়ান
গ. আবু সালমা ঘ. আবু হাসান

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫১ ও ৫২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

পেট্রিক লুলুম্বা দেশের ক্ষমতা গ্রহণকালে যারা তার সঙ্গী ছিল, অথচ পরবর্তীতে তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হওয়ায় তাদের সকলকেই একে একে সরিয়ে দিয়েছে। এমনকি প্রশাসনিক নিরাপত্তার জন্য তিনি চমৎকার একটি রাজধানী শহর নির্মাণ করে তা সুরক্ষিত করেন। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

৫১. উদ্দীপকে পেট্রিক লুলুম্বার সাথে কোন আব্বাসি খলিফার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়?
ক. আবুল আব্বাস খ. আল-মনসুর
গ. হারুন-অর-রশীদ ঘ. আল-মামুন

৫২. উদ্দীপকে প্রেট্রিক লুলুম্বার কার্যকলাপের মতোই উক্ত খলিফার কর্মকাণ্ড ছিল—
ক. সুদূরপ্রসারী খ. অপরিণামদর্শী
গ. জনহিতৈষী ঘ. দেশ বিধ্বংসী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৩ ও ৫৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সম্রাট শার্লিমান প্রজাদের জন্য যেমন হাসপাতাল, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ করেছেন তেমনি সাম্রাজ্য সুরক্ষার জন্য শক্তিশালী শত্রুকেও ছেড়ে কথা বলেননি। তিনি প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা দেখার জন্য ছদ্মবেশেও ভ্রমণ করতেন। *[সকল বোর্ড ২০২৩]*

৫৩. উদ্দীপকের সম্রাট শার্লিমানের সাথে কোন আব্বাসি খলিফার সামঞ্জস্য রয়েছে?
ক. আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ
খ. আবু জাফর আল-মনসুর
গ. হারুন-অর-রশিদ
ঘ. আল-মামুন

৫৪. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ড বিচারে উক্ত আব্বাসি খলিফাকে অভিহিত করা যায়—
i. রাখাল রাজা হিসেবে
ii. প্রজাহিতৈষী শাসক হিসেবে
iii. মহানুভব খলিফা হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৫ ও ৫৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর দেশে 'আয়না ঘরের' সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যেখানে বিরোধীমতের লোকদের ধরে এনে আটক, নির্যাতন ও গুম করে রাখা হতো এবং অধিকাংশকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হতো। *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

৫৫. উদ্দীপকের 'আয়না ঘরের' মতো ব্যবস্থা সেলজুক শাসনে একটি সম্প্রদায় করত, সম্প্রদায়টির নাম কী?
ক. খারেজি খ. শিয়া
গ. অ্যাসাসিন ঘ. জালাইয়ারি

৫৬. উদ্দীপকের মতো কর্মকাণ্ডের দ্বারা উক্ত সম্প্রদায় কীসের প্রকাশ ঘটাতে সচেষ্ট ছিল?
ক. প্রতিহিংসার খ. স্বার্থপরতার
গ. অসহিষ্ণুতার ঘ. অসচেতনতার

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	ক	৪	গ	৫	ক	৬	ঘ	৭	খ	৮	খ	৯	খ	১০	খ	১১	খ	১২	ক
১৩	খ	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	গ	১৮	খ	১৯	খ	২০	খ	২১	গ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ঘ
২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	খ	৩১	ক	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	ঘ	৩৫	গ	৩৬	ঘ
৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	ঘ	৪১	ক	৪২	ক	৪৩	ঘ	৪৪	খ	৪৫	ক	৪৬	ক	৪৭	ক	৪৮	গ
৪৯	খ	৫০	ক	৫১	খ	৫২	ক	৫৩	গ	৫৪	ঘ	৫৫	গ	৫৬	ক								

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আব্বাসি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
২. জাবের যুদ্ধের ফলাফল কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।
৩. আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহের ক্ষমতারোহণ সম্পর্কে লেখো।
৪. খলিফা হারুন-অর-রশীদ বার্মাকিদের ধ্বংস করেছিলেন কেন?
৫. ফ্রাংকদের প্রতি খলিফা হারুন-অর-রশীদ কীরূপ নীতি গ্রহণ করেছিলেন?
৬. আব্বাসি আমলে বার্মাকি উজির পরিবারের সূচনা হয়েছিল কীভাবে?
৭. বায়তুল হিকমার কার্যাবলি বর্ণনা করো।
৮. খলিফা আল-মামুনের শাসনামলকে অগাস্টান যুগ বলার কারণ ব্যাখ্যা করো।
৯. বুয়াইয়াদের পরিচয় দাও।
১০. আব্বাসি খিলাফত পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. চেঙ্গিস খান একজন রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর-প্রকৃতির শাসনকর্তা ছিলেন। এ জন্য তার উপাধি ছিল 'জগতের ত্রাস' বা 'বিশ্বত্রাস'। তিনি মোঙ্গল জাতিকে ঐক্যবন্ধ করে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তিনি ছিলেন ওয়াদা ভঙ্গকারী শাসক। তিনি বিজিত রাজ্যের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালাতেন। অন্যদিকে, মধ্য এশিয়ার আরেকজন শাসক শাহরুখ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

ক. আব্বাসিয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার নাম লেখো।

খ. আব্বাসিয় আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তার পরিচয় দাও।

গ. উদ্দীপকের চেঙ্গিস খানের চরিত্রের সাথে কোন আব্বাসিয় খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. খলিফা আল-মামুনের কর্মকাণ্ড শাহরুখের কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফল— যথার্থতা বিচার করো।

২. আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার কাতামা গোত্রে ইসমাঈলীয় মতবাদ প্রচার করেন। উত্তর আফ্রিকার আগলাবি শাসক জিয়াদাতুল্লাহ ইসমাঈলীয় মতবাদ প্রচারে বাধা দেয়। ফলে আবু আব্দুল্লাহর সাথে তার যুন্ধ হয়। যুন্ধে জিয়াদাতুল্লাহ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। আবু আব্দুল্লাহ আগলাবি রাজধানী কায়রোয়ান দখল করে তৎকালীন ফাতেমি ইমাম সাঈদ বিন হুসাইনকে 'আল-মাহদি' উপাধি দিয়ে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবে আবু আব্দুল্লাহর প্রচেষ্টায় উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক. 'আল-মনসুর' শব্দের অর্থ কী?

খ. বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠায় আবু জাফর আল-মনসুর কীরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন?

গ. উদ্দীপকের ঘটনা কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার ঘটনাবলিকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীর মতো এক মাওয়ালিই উক্ত বংশ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন— মতামত দাও।

৩. অটোমান সুলতান আব্দুল হামিদের ক্ষমতারোহণের পেছনে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন সেনাপতি ফুয়াদ পাশা। পরবর্তীতে ফুয়াদ পাশার সাহসিকতা, জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা সুলতানের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে সুলতান কৌশলে তাকে হত্যা করেন। *[রা. বো., য. বো. ২০১৯]*

ক. আব্বাসিদের শেষ খলিফার নাম কী?

খ. আব্বাসি কারা? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে কোন আব্বাসি খলিফার কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. আব্বাসিয়দের ক্ষমতারোহণের পেছনে উক্ত সেনাপতির অবদান মূল্যায়ন করো।

৪. রোমান রাজা ফিউডাল খুবই ধার্মিক ছিলেন। তবে রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি খুবই নৃশংস ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে ভেবে তিনি তার প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করলে সেনাপতির সমর্থকদের দ্বারা যে বিদ্রোহ দেখা দেয় রাজা তাও অতি কঠোর হাতে দমন করেন। তার ধার্মিকতার সুযোগে একদল প্রজা তাকে প্রভু বলে পূজা করতে এলে এক মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়। সৌভাগ্যক্রমে রাজা সবকিছু মোকাবিলা করতে সক্ষম হন।

[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো., ২০২৩]

ক. বাগদাদ নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন?

খ. খলিফা মনসুর কর্তৃক আলী বংশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের রাজা ফিউডালের মতো খলিফা আল-মনসুর তার কোন সেনাপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সেনাপতির বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার ফলাফল আলোচনা করো।

৫. প্রাচীন রুশ দেশীয় একজন রাজা প্রজাহিতৈষী ছিলেন। তার মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়ে দেশের অভ্যন্তরে একদল মানুষ তাকে ঈশ্বরের সাথে তুলনা করতে থাকে। এতে রাজা বিব্রতবোধ করেন। উক্ত আচরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে রাজা তাদের বন্দি করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের আচরণ ও কর্মকাণ্ডে রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাদের বন্দি করার ফলে রাজা বড় ধরনের বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়। এর ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা প্রশমিত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]

ক. বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. খলিফা আল-মামুনের 'জ্ঞানমনোস্ক' কর্মকাণ্ডের একটি উদাহরণ দাও।

গ. উদ্দীপকের সাথে খলিফা আল-মনসুরের শাসনামলের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার আলোকে বলা যায় রুশ দেশীয় রাজার মতো আল-মনসুরও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দ্বারা মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন— বিশ্লেষণ করো।

৬. দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশ ক্ষমতারোহণের পর পরই নানা ধরনের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ ও নাসির উদ্দিন কুবাচা তার সিংহাসনের বড় বাধা হয়ে দাঁড়ালে তিনি সামরিক ও কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন। প্রাথমিক বিদ্রোহ দমন করে তিনি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ, বঙ্গের বিদ্রোহ দমন করে নিজেকে আরও সুদৃঢ় করেন। রনথম্বোর, গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী, ভিলসা ও মান্দাওয়ার বিজয় করে তিনি সমরকুশলতার পরিচয় দেন। এছাড়াও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, স্থাপত্য, শিল্পের বিকাশ সাধন করে দিল্লি সালতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেন।

ক. আস- সাফফাহ শব্দের অর্থ কী?
খ. আবু আব্বাস আস-সাফফাহ উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেছিলেন কেন?
গ. উদ্দীপকের সুলতানের সাথে তোমার পঠিত খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের সুলতানের মতো উক্ত খলিফাও সমান কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন— বিশ্লেষণ করো।

৭. চেঙ্গিস খান অত্যন্ত সন্দেপ্রবণ নিষ্ঠুর ব্যক্তি ছিলেন। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি অনেক সময় অমূলক সন্দেহের বশবর্তী হয়েও তার অনেক কাছের বিশ্বস্ত মানুষকে হত্যা করেছেন। এজন্য রাজবংশ ও সাম্রাজ্য দুর্বল হয়েছে। চেঙ্গিস খানের উত্তর পুরুষ কুবলাই খান সাম্রাজ্য শাসনের সুবিধার পাশাপাশি রাজধানীর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে রাজধানী কারাকোরাম থেকে পিকিং-এ স্থানান্তর করেন এবং নতুন রাজধানীকে বিভিন্নভাবে সজ্জিত করেন।

[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২০২৩]

ক. সহস্র আরব্য রজনীর নায়ক কে?
খ. আবুল আব্বাসকে 'আস-সাফ্‌ফাহ' বলা হয় কেন?
গ. চেঙ্গিস খানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে কোন আব্বাসি খলিফার চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. "কুবলাই খান ও খলিফা আল-মনসুরের রাজধানী স্থানান্তরের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন"— বিশ্লেষণ করো।

৮. আবদুর রহমান সিংহাসন আরোহণ করে আম জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সচেষ্ট হন। কে কোথায় অন্নহীন-বস্ত্রহীন হয়ে পড়ে আছে, নিজে গিয়ে তার সাহায্য করে আসতেন। শক্তিমত্তায়ও তিনি পরাক্রমশালী ছিলেন। পার্শ্ববর্তী চিরশত্রু রাষ্ট্র তার দেশ আক্রমণ করলে তিনি বীরবিক্রমে তা প্রতিহত করেন। শত্রু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে তার দাঁতভাঙা জবাব দেন। কিন্তু এই চিরশত্রুকে তিনি একাধিকবার বাগে পেয়েও বারবার ক্ষমা করে দেন।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]

ক. খলিফা হারুন-অর-রশীদের মায়ের নাম কী?
খ. নহরে জুবাইদা'র পরিচয় সংক্ষেপে লেখো।
গ. উদ্দীপকের আবদুর রহমানের মতো প্রজাবাৎসল্যের উদাহরণ খলিফা হারুন-অর-রশীদের বেলায়ও প্রযোজ্য— ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আবদুর রহমানের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি গৃহীত যুদ্ধনীতির আলোকে খলিফা হারুন-অর-রশীদের গৃহীত নীতি বিশ্লেষণ করো।

৯. নাদির শাহ প্রজাদের সুবিধার্থে যে খাল খনন করেছিলেন তা আমাতুন বিবির খাল নামে পরিচিত। নাদির শাহের রাজ্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মানুষের মুখে মুখে। প্রজাদের প্রতি তার দরদ বিশ্ববাসী জেনে যায়। তার পার্শ্ববর্তী শক্তিধর রাজ্যের শাসক মানিক চাঁদ একবার তার রাজ্য আক্রমণ করলে নাদির শাহ এমন দাঁতভাঙা জবাব দেন যে, মানিক চাঁদ তার আনুগত্য স্বীকার করে কর প্রদানে বাধ্য হন।

[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০২২]

ক. খায়জুরান কে ছিলেন?
খ. 'বার্মাকি' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা দাও।
গ. উদ্দীপকের আমাতুন বিবির খাল-এর সাথে খলিফা হারুন-অর-রশীদের রাজত্বকালের কোন জনহিতকর কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা দাও।
ঘ. উদ্দীপকের নাদির শাহের সাথে মানিক চাঁদের সংঘর্ষের মতোই হারুন-অর-রশীদ পার্শ্ববর্তী শাসকের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে ছিলেন— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

১০. উসমানীয় সাম্রাজ্যের মহাসংকটকালে কুপ্রিলি পরিবারের অভ্যুদয় ঘটে। এই পরিবার প্রতিভাবান কয়েকজন রাজনীতিবিদের জন্ম দেয়। কুপ্রিলি উজির পরিবারের কর্মতৎপরতায় সাম্রাজ্যে স্থায়িত্ব ও শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং ভঙ্গুর সাম্রাজ্য উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। এই উজির পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্মদ কুপ্রিলি। তিনি আলবেনিয়ার কুপ্রিল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তার প্রতিষ্ঠিত পরিবার 'কুপ্রিলি উজির' নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদ স্বজনপ্রীতি করে কারা মোস্তফাকে উজির নিয়োগ করলে ১৬৫৬ সাল থেকে চলে আসা কুপ্রিলি উজির পরিবারের শাসনকালের অবসান ঘটে ১৬৮১ সালে।

[ম. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৪]

ক. সম্রাজ্ঞী আইরিন কে ছিলেন?
খ. খলিফা হারুন-অর-রশীদের বাইজান্টাইন নীতির বর্ণনা দাও।
গ. কুপ্রিলি উজির পরিবারের সাথে আব্বাসিয় কোন উজির পরিবারের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আব্বাসিয় উক্ত উজির পরিবারের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের একটি চিত্র অঙ্কন করো।

১১. ইতিহাসখ্যাত বাদশা হাসান প্রজাদের জন্য অন্তঃপ্রাণ ছিলেন। তার স্ত্রীও তীর্থযাত্রীদের পানির কষ্ট দূর করার জন্য দূরাঞ্চল থেকে পানি আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বাদশাহ তার পার্শ্ববর্তী প্রতাপশালী শত্রু সাম্রাজ্যের অধিপতিকে বারবার যুদ্ধে পরাজিত করেও তাকে ক্ষমা করে দেন।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]

ক. আব্বাসিদের রাজধানী কোথায় ছিল?

খ. আব্বাসি কারা? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের নারীর সাথে আব্বাসীয় আমলের কোন মহীয়সী নারীর কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'উদ্দীপকের শাসক ও আব্বাসীয় খলিফা-হারুন-অর রশীদ-এর শাসন বৈশিষ্ট্য একই রূপ'— মূল্যায়ন করো।

১২. অটোমান সুলতান তৃতীয় সেলিম ক্ষমতারোহণের পর বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্রের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তিনি সমরনীতি প্রয়োগ করে অস্ট্রিয়াকে সিসটোভার সন্ধি ও রাশিয়াকে জাসির সন্ধির অধীনে আসতে বাধ্য করেন। তৃতীয় সেলিম ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সাথেও তিনি মিত্রতার বন্ধনে আবন্ধ হন। সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তিনি রাজস্ব, ডাক এবং প্রদেশসমূহে একটি সুপরিকল্পিত প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিতে তিনি বিভিন্ন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি আগের কুপ্রিলি উজির পরিবারের প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে তিনি নতুন উজির পরিষদ গঠন করেন। প্রজাকল্যাণ, সেনাবাহিনীর সংস্কার ও কেন্দ্রীয় কোষাগার প্রতিষ্ঠা করে তিনি অটোমান সাম্রাজ্যের শক্তিকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেন।

ক. গৃহযুদ্ধে খলিফা আল-মামুনের সেনাপতি কে ছিলেন?

খ. খলিফা আল-আমিন ও মামুনের মধ্যকার সংঘটিত গৃহযুদ্ধের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশীদের পররাষ্ট্র নীতির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সুলতান তৃতীয় সেলিমের সংস্কারধর্মী কর্মকাণ্ড উক্ত খলিফার কর্মকাণ্ডের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে কি? যৌক্তিক মত দাও।

১৩. ইবনে আম্মার খলিফা মুতাসিমের প্রধান উজির ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। বন্ধুর মতো তারা একসাথে ঘুরে বেড়াতেন। ইবনে আম্মারের বদান্যতা অনেক সময় খলিফাকেও ছাপিয়ে যেত। জনসাধারণ খলিফার চেয়ে উজিরের দরবারে যেতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। কিন্তু একবার ইবনে আম্মারের কিছু কর্মকাণ্ড খলিফার মান-সম্মানের বিরুদ্ধে গেলে তিনি আম্মারকে বরখাস্ত করেন। আম্মারের আত্মীয়-স্বজন যারা রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন তাদেরকেও বরখাস্ত ও এদের সকলের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো. ২০২৫]

ক. 'বার্মাক' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'জাফরি প্রাসাদ' সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

গ. উদ্দীপকের ইবনে আম্মারের সাথে খলিফা হারুন-অর-রশীদের কোন উজিরের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. ইবনে আম্মারের পরিবারের দুর্দশার আলোকে খলিফা হারুন-অর-রশীদের খিলাফতে বার্মাকি পরিবারের পরিণতি পর্যালোচনা করো।

১৪. হযরত উমর ফারুক (রা) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। প্রজাবৎসল, জনদরদি এ খলিফা জনগণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য রাতের বেলা ছদ্মবেশে মদিনা শহরে ঘুরে বেড়াতেন। জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি বিধানে তিনি নিরলস কাজ করেছেন। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ তার অন্যতম অবদান। আমিরুল মুমেনিন হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত।

[য. বো., দি. বো., কু. বো, চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]

ক. খলিফা আল-মনসুর কোথায় রাজধানী স্থানান্তর করেন?

খ. আবু মুসলিম ইতিহাসে এত বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের খলিফার গুণাবলির সাথে আব্বাসি কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে প্রকাশিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও উক্ত খলিফা নানা গুণের অধিকারী ছিলেন— তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১৫. ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তার পুত্রদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে শুরু হয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ। এ ভ্রাতৃসংগ্রামে চূড়ান্তভাবে দারাশিকো ও আওরঙ্গজেবের সংগ্রামের গতি-প্রকৃতিই ছিল বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল আজমিরের কাছে দেওরায়ের যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের বাহিনীর হাতে দারাশিকো পরাজিত হন। মূলত আওরঙ্গজেবের সামরিক যোগ্যতা ও দক্ষতা, কূটনৈতিক বিচক্ষণতা, দক্ষ মনোবল ধর্মে একনিষ্ঠতাই তাকে সফলতার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে।

ক. আবু জাফর আল-মনসুর কত খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় আরোহণ করেন?

খ. খলিফা হারুন-অর-রশীদকে রূপকথার নায়ক বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের দ্বন্দ্বের সাথে আব্বাসি শাসনামলের কোন ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. এ ধরনের দ্বন্দ্বে যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিরাই সফলতা লাভ করে? উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১৬. একদল জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য এখানে প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি নতুন নতুন গবেষণার কাজেও পৃষ্ঠাপোষকতা দিয়ে থাকে। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় নতুন গবেষণায় প্রতিষ্ঠানটি যথাযথ সহযোগিতা দিতে অক্ষম। *[ঢা. বো., রা. বো.,য. বো. ২০২২; রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]*

ক. খলিফা আল-মামুনের স্ত্রীর নাম কী ছিল?

খ. আল-মামুনের প্রতি পারসিকদের সমর্থনদানের কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডের সাথে আল মামুনের কোন প্রতিষ্ঠানের সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. আব্বাসি খিলাফতে শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে আল মামুন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির অবদান এশিয়াটিক সোসাইটির তুলনায় বেশি ছিল— বিশ্লেষণ করো।

১৭. পবন চৌধুরী মরিচপাশা গ্রামের জমিদার পরিবারের সন্তান। তিনি উচ্চশিক্ষিত ও পৈতৃকসূত্রে বিশাল সম্পদের অধিকারী। এলাকার মানুষের শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশ-বিদেশের বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করে তিনি এটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তাঁর এই গ্রন্থাগারের সুনাম শুনে দূর-দূরান্ত থেকে বহু জ্ঞানপিপাসু মানুষ এখানে ছুটে আসেন। তিনি এই গ্রন্থাগার পরিচালনায় প্রচুর টাকা খরচ করেন।

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯]

ক. আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার নাম কী?

খ. 'রাওয়ান্দিয়া' সম্প্রদায় কারা? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পবন চৌধুরীর সাথে আব্বাসীয় বংশের কোন খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত খলিফার শাসনামলকে কি ইসলামের 'অগাস্টান যুগ' বলে অভিহিত করা যায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

১৮. মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব স্বীয় ভ্রাতাদের সাথে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুশাসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করাই ছিল তার শাসনামলের অন্যতম লক্ষ্য। তার সময়কাল ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কারণ তার সময়েই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করে। শিক্ষা, শিল্পকলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য মুঘল ইতিহাসে তার রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। *[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*

ক. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

খ. আবুল আব্বাসকে 'আস-সাফফাহ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন আব্বাসি খলিফার কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তোমার পঠিত উক্ত খলিফার আমলে সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম-দর্শন এবং বিজ্ঞান চর্চার কার্যক্রম বিশ্লেষণ করো।

১৯. ইলখানি বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন গাজান খান। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি ছিল তার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা। তিনি নিজেও ছিলেন একজন বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। বহু ভাষাবিদ ও বিভিন্ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পদচারণায় মুখরিত ছিল তার রাজধানী তাব্রিজ। তিনি নিজে ফারসি, আরবি, চীন, তিব্বতিসহ বিভিন্ন ভাষা জানতেন। রসায়ন শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ধাতু বিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যায় তার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি তার রাজধানীতে সমাধিস্তম্ভ, মসজিদ, হাসপাতাল, লাইব্রেরি, মানমন্দির ও কলেজসহ অসংখ্য হর্মরাজি প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনকালকে ইলখানি ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

ক. নাইসিফোরাস কে ছিলেন?

খ. ক্রুসেড কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত গাজান খানের কার্যাবলির সাথে আব্বাসি খিলাফতের কোন খলিফার কার্যাবলির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. আব্বাসি খিলাফতকে বলা হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ— উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার অবদান উল্লেখ করে বিষয়টি বিশ্লেষণ করো।

২০. ফাতেমি শাসক আল-আজিজ একাধারে জ্ঞানী-দানশীল। প্রজারঞ্জক ও শিল্প-সাহিত্যানুরাগী শাসক ছিলেন। তিনি আল আজহার মসজিদে একটি শিক্ষায়তন যুক্ত করেন। এছাড়া বহু স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও পূর্ত কাজ করেছিলেন। তিনি স্থাপত্য শিল্পেরও অন্যতম অনুরাগী ছিলেন। তার সময়ে নির্মিত সোনালী প্রাসাদ, মুক্তামঞ্চ এবং কারাফা কবরস্থানে তার মায়ের কবরের ওপর নির্মিত সুন্দর মসজিদ তার স্থাপত্য শিল্পের অনুরাগের অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমনকি বিদ্রোহ দমন, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সংহতি বিধান, প্রশাসন সুদৃঢ়করণেও তিনি অনন্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

ক. আরসালান শব্দের অর্থ কী?

খ. গৃহযুদ্ধে আল-আমিনের ব্যর্থতার কারণ বুঝিয়ে লেখো।

গ. উদ্দীপকের সাথে সেলজুক সুলতান মালিক শাহের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য দেখাও।

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে উক্ত শাসকের রাজ্যবিস্তার নীতি ও প্রশাসনিক নীতি বিশ্লেষণ করো।

২১. ফ্রান্সে মেরোভিঞ্জিয়ান রাজাদের শাসনামলে রাজাদের চেয়ে চার্লস মার্টিলের বেশি মর্যাদা ছিল। রাজারা ছিল মার্টিলের হাতের পুতুল। অথচ চার্লস মার্টিল রাজবংশের কেউ ছিলেন না। রাজারা মন্ত্রিপরিষদের সর্বাত্মক প্রভাব খর্ব করার জন্য মার্টিলকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন আর মার্টিল নিজেকে রাজাদের প্রভুতে পরিণত করেছিলেন।

ক. বায়তুল হিকমাহ কী?

খ. আব্বাসিদের পরিচয় দাও।

গ. উদ্দীপকে আব্বাসি খিলাফতের কোন বংশের শাসকদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত শাসকদের পতনের ফলে সুন্নি ইসলাম বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় – মূল্যায়ন করো।

২২. বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমার থেকে অবৈধভাবে আগত মিয়ানমারের নাগরিকদের নিয়ে ব্যাপকভাবে উদ্বিগ্ন। অনেকে মায়ানমার সরকারকে এর জন্য দায়ী করেছেন। তার কারণ তার দেশের ধর্মান্ধ কিছু গোষ্ঠী এমন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে, সেখানে মুসলমানদের থাকা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। মিয়ানমারের বর্বর ও অশিক্ষিত লোকজন এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে কোন দেশের শুধু পার্থিব লাভ ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল হয়। তারা ধর্মীয় কারণে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছে।

ক. মালিক শাহ কত খ্রিষ্টাব্দে জ্যোতির্বিদ সম্মেলন আহ্বান করেন?

খ. সালাহউদ্দিন আইয়ুবির পরিচয় দাও।

গ. মিয়ানমারের কর্মকাণ্ডের সাথে ক্রুসেডের সম্পর্ক খুঁজে তার ব্যাখ্যা প্রদান করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় প্রত্যেক ধর্মীয় যুদ্ধই মানবতার ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে– তুমি কি মন্তব্যটি সমর্থন কর? মতামত দাও।

২৩. অযোধ্যার বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ দীর্ঘদিনের। সম্রাট বাবর ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে এটি শ্রী রামের জন্মস্থান এবং তাদের জন্য পুণ্যভূমি। তারা জায়গাটি উদ্ধারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ উক্ত জায়গাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের সূচনা হয়। এই সংঘর্ষ কয়েক দশক পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর পেছনে রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বহুবিধ কারণ নিহিত ছিল।

ক. গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের নেতা কে ছিলেন?

খ. সালাহউদ্দিন আইয়ুবি বিখ্যাত ছিলেন কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংঘর্ষের সাথে আব্বাসি আমলের শেষের দিকের কোন ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ্য এর কারণ নিরূপণ করো।

ঘ. সংঘর্ষের ঘটনাটি ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির ওপর কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল? বিশ্লেষণ করো।

২৪. পত্রিকায় জেরুজালেমে ইসরাইলি সেনাদের সঙ্গে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের সংঘর্ষের খবর ছাপা হয়েছে। তা পড়ে আদিল বলল, হযরত ওমরের সময় ছাড়া জেরুজালেম সবসময় সংঘাতপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। ইউরোপের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘাতের মূলেও এর ভূমিকা ছিল। আশরাফ বলল, এ সংঘাতের ক্ষতের মধ্যে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন শান্তি ও স্বস্তির সুবাতাস।

ক. বুয়াইয়া বংশের নয় জন আমির-উল-উমারার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কে?

খ. ক্রুসেড বলতে কী বোঝ?

গ. আদিলের বক্তব্যে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আশরাফের বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

২৫. অটোমান সুলতান তৃতীয় আহম্মদের রাজত্বকাল থেকে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের ঘণ্টাধ্বনি বাজতে থাকে। পরবর্তী সুলতানদের অযোগ্যতা, বলকান অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এ পতনকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। এছাড়াও রাশিয়ার জার অটোমান সাম্রাজ্যকে The sick man of Europe নামে সংজ্ঞায়িত করেন। অনিয়ন্ত্রিত উত্তরাধিকার নীতি, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, সুলতানদের নৈতিক অধঃপতন এ পতনকে ত্বরান্বিত করে। তবে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক তুরস্ককে প্রজাতন্ত্রের রূপদানের মাধ্যমে চিরতরে অটোমান সাম্রাজ্যের বিলোপ ঘটে।

ক. হিত্তিনের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?

খ. ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে আব্বাসি বংশের পতনের পরোক্ষ কারণের সাদৃশ্য দেখাও।

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে উক্ত বংশের পতনের প্রত্যক্ষ কারণটি মূল্যায়ন করো।

২৬. কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লির সুলতানি আমলের প্রতিষ্ঠাতা। দুর্বল শাসনব্যবস্থা, জাতিগত বিরোধ, সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে সুলতানি আমলের পতন ত্বরান্বিত হয়। আর ১৫২৬ সালে সম্রাট বাবর কর্তৃক ভারত আক্রমণের মাধ্যমে সুলতানি আমলের চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং মুঘল রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক. বাগদাদ নগরী কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

খ. জালালি পঞ্জিকা বলতে কী বোঝায়?

গ. সুলতানি আমলের পতনের সাথে তোমার পঠিত আব্বাসীয় রাজবংশের কী কী সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর, সম্রাট বাবরের দিল্লি আক্রমণের ন্যায় একটি আক্রমণই আব্বাসি বংশের পতন ঘটায়? যুক্তি দাও।

২৭. আফগানদের পরাজিত করে মুঘলরা বাংলার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলে শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। পুরাতন অভিজাত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ফারসি ভাষার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এমনকি জাতীয় ও দৈনন্দিন জীবনে মুঘলদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। শাসক বংশের পরিবর্তন সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে যে প্রভাব ফেলে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মধ্যযুগে বাংলা থেকে পাওয়া যাবে।

ক. আব্বাসি খিলাফত কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

খ. সালাহউদ্দিন আইয়ুবিকে গাজি বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের ঘটনাবলির সাথে আব্বাসিদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ঘটনার সাদৃশ্য বর্ণনা করো।

ঘ. 'শাসক বংশের পরিবর্তনে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়ে'— আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠার আলোকে উক্তিটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২৮. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে বহু মৌলিক গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটির অবদানের ফলে এদেশের মানুষ ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের জ্ঞানের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করার সুযোগ পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলার আয়োজন করে এদেশের সাহিত্যপ্রেমী মানুষের মনে গভীর জায়গা করে নিয়েছে। এ মেলায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের ওপর দেওয়া হয় পুরস্কার। ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ৪ ও ৫*

ক. কার নামানুসারে আব্বাসি খিলাফতের নামকরণ করা হয়েছে?

খ. বেদুইনরা পরিশ্রমী ছিল কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পুরস্কারের সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের কোন পুরস্কারের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় আব্বাসি যুগ মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগে পরিণত হয়েছিল— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

২৯. একজন মহান শাসকের মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা মহান শাসকের আদর্শ অনুসারে যে শাসন ব্যবস্থা চালু রাখে তা পবিত্র শাসন নামে পরিচিত। পবিত্র শাসন আমলে দেশে গণতন্ত্র, ন্যায় বিচার, শাসকদের জবাবদিহিতা ছিল। কিন্তু মাত্র ৩০ বছরের মাথায় সেই শাসনের অবসান ঘটে। পরবর্তীকালে শুরু হয় রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নানান অনিয়ম, দুর্নীতি, দলীয়করণ, অবিচার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে শুরু হয় গণআন্দোলন। আর সেই গণআন্দোলন ও অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাজতান্ত্রিক শাসনের পতন ঘটে। ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ৪ ও ৫*

ক. আব্বাসি খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. বার্মাকি কারা? তাদের পরিচয় দাও।

গ. উদ্দীপকের গণঅভ্যুত্থানের সাথে উমাইয়া বিরোধী কোন আন্দোলনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত আন্দোলন ছিল পূর্ববর্তী রাজতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে জনরোষের বহিঃপ্রকাশ- উদ্দীপকের আলোক বিশ্লেষণ করো।

৩০. মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল আওরঙ্গজেব পরবর্তী সম্রাটদের অযোগ্যতা। তারা বিলাসী জীবনযাপন করতেন। তাদের বিলাসিতার কারণে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া সম্রাটদের মধ্যে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতিরও অভাব ছিল। তাই উত্তরাধিকার সংঘাতও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ৪ ও ৫*

ক. ইসলামে প্রথম টাকশালের প্রবর্তন করেন কে?

খ. আব্বাসিরা সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণ করেনি কেন?

গ. মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ এবং উমাইয়া খিলাফতের পতনের কারণের মধ্যে সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে বর্ণিত কারণেই আব্বাসিদের পতন ঘটেছিল? মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

৬

স্পেনে উমাইয়া শাসন

The Umayyad Rule in Spain

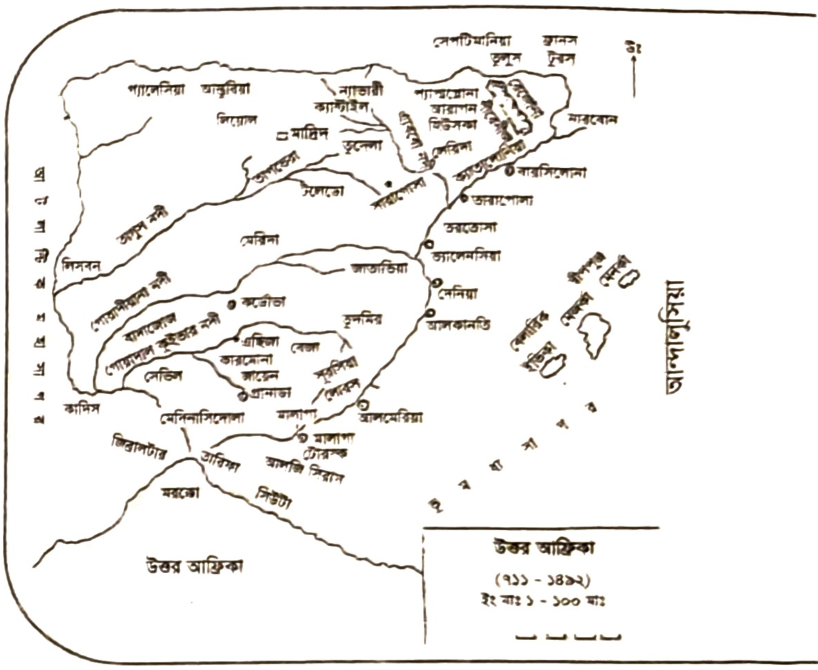
সেপটিমানিয়া
ফ্রান্স
তুলুস
ট্রিস
উঃ
গ্যালেসিয়া
আস্তুরিয়া
ন্যাভারী
ক্যাস্টাইল
প্যাম্পলোনা
আরাগন
হিউসকা
লিয়োন
মাদ্রিদ
তুলেডো
মারবোন
বার্সিলোনা
তারাগোনা
সেগোভা
সারাগোসা
তাগুস নদী
মেরিদা
তরতোসা
ভ্যালেনসিয়া
লিসবন
গোয়াদিয়ানা নদী
জাতাভিয়া
ডেনিয়া
কর্ডোভা
মুর্সিয়া
আলকানতি
গোয়াদাল কুইভার নদী
বেজা
কারমোনা
জায়েন
সেভিল
গ্রানাডা
কাদিস
মেদিনাসিদোনা
মালাগা
আলমেরিয়া
জিব্রালটার
তারিফা
আলজি সিরাস
মরক্কো
সিউটা
উত্তর আফ্রিকা
আন্দালুসিয়া
উত্তর আফ্রিকা
(৭১১ - ১৪৯২)
ইং মাঃ ১ - ১০০ মাঃ

প্রধান প্রধান শব্দ

- আন্দালুসিয়া
- জাবাল আত-তারিক
- কুরাইশদের বাজপাখি
- ওয়াসাত
- জিলট মুভমেন্ট
- আজ-জোহরা প্রাসাদ
- স্লাভ বাহিনী
- ইউরোপের বাতিঘর

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইসলাম প্রচারের আদর্শকে ধারণ করে পরবর্তী খলিফারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তারের শুভ সূচনা হয় এবং উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

এ সময় খিলাফতের সীমানা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের অনেক অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। আল ওয়ালিদের সেনাধ্যক্ষ কুতায়বা বিন মুসলিম ৭০৫-৭১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য এশিয়া এবং সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু বিজয় করেন। একই সময়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন মুসা বিন নুসায়ের। তিনি সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদের সাথে একত্র হয়ে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী দেশ স্পেনকে মুসলমানদের পতাকাতলে নিয়ে আসেন। আইবেরীয় উপদ্বীপ নামে পরিচিত এ অঞ্চলটিতে মুসলমানরা প্রায় ৭৮১ বছর (৭১১-১৪৯২ খ্রি.) শাসনকাজ পরিচালনা করে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের কারণ ও ঘটনা
- স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠায় আবদুর রহমান আদ-দাখিলের অবদান
- দ্বিতীয় আবদুর রহমানের আমলে স্পেনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ
- স্পেনে উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তৃতীয় আবদুর রহমানের কৃতিত্ব
- স্পেনে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	মুসলমানদের স্পেন বিজয় (৭১১ খ্রি.): কারণ ও ঘটনা
পাঠ ২	স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা ও খিলাফত যুগ (৭৫৬-১৪৯২ খ্রি.)
পাঠ ৩	আবদুর রহমান আদ-দাখিল: পরিচয় ও ক্ষমতায় আরোহণ (৭৫৬-৭৮৮ খ্রি.)
পাঠ ৪	আবদুর রহমান আদ-দাখিলের কৃতিত্ব ও চরিত্র
পাঠ ৫	আবদুর রহমান আল-ওয়াসাত (৮২২-৮৫২ খ্রি.)
পাঠ ৬	স্পেনের জাতীয়তাবাদী নেতা উমর বিন হাফসুন
পাঠ ৭	তৃতীয় আবদুর রহমান (৯১২-৯৬১ খ্রি.)
পাঠ ৮	সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে তৃতীয় আবদুর রহমানের কৃতিত্ব
পাঠ ৯	স্পেনে মুসলিম শাসনের পতন
পাঠ ১০	স্পেনের কর্ডোভায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ

পাঠ ১

মুসলমানদের স্পেন বিজয় (৭১১ খ্রি.): কারণ ও ঘটনা
Conquest of Spain by the Muslim (711 AD): Causes and the Fact

স্পেনের পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থান

দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের দেশ স্পেন। এটি আইবেরীয় উপদ্বীপে অবস্থিত। স্পেনের দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তে ভূমধ্যসাগর। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে পর্তুগাল এবং আটলান্টিক মহাসাগর। এর উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে পিরেনিজ পর্বতমালা এবং বিস্কে উপসাগর। মুসলিম শাসনামলে দেশটি আন্দালুসিয়া নামে পরিচিত ছিল। এর বর্তমান সাংবিধানিক নাম Kingdom of Spain. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজধানী ছিল টলেডো, মুসলিম শাসনামলে কর্ডোভা এবং বর্তমানে এর রাজধানী মাদ্রিদ।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের অবস্থা

উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সময় মুসলমানরা স্পেন জয় করে। স্পেন বিজয়ী সেনাপতির নাম তারিক বিন জিয়াদ। তিনি খলিফা ওয়ালিদের উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা মুসা বিন নুসায়েরের নির্দেশে স্পেনে অভিযান চালান ও জয় করেন। ঐতিহাসিকেরা আরব মুসলমানদের স্পেন বিজয়কে একটি সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের আগে সেখানকার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ—

রাজনৈতিক অবস্থা: মুসলমানদের অভিযানের আগে স্পেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং এগুলোর শাসনকর্তাদের মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব ও কলহ বিদ্যমান ছিল। সে সময়ে স্পেনের রাজা ছিলেন গথিক বংশের খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী রডারিক (Roderic)। উচ্চাভিলাষী ও অত্যাচারী রডারিক তার পূর্ববর্তী রাজা উইটিজাকে পদচ্যুত ও হত্যা করে বলপূর্বক সিংহাসন দখল করেন। সাম্রাজ্যের অধীন রাষ্ট্রগুলো নামেমাত্র তার বশ্যতা স্বীকার করে কর প্রদান করত। বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তারা পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত ছিল।

সামাজিক অবস্থা: সে সময়ে স্পেনের সমাজে রাজা, ক্ষুদ্ররাজ্যের শাসক, ধর্মযাজক, সামন্তরাজ, অভিজাত শ্রেণি, বর্গাদার, ভূমিদাস (সার্ফ), ক্রীতদাস প্রভৃতি শ্রেণির লোক ছিল। এদেরকে মোটামুটিভাবে শাসক ও শাসিত এই দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। রাজা, ধর্মযাজক ও অভিজাতরা ছিল শাসক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে বর্গাদার, ভূমিদাস ও ক্রীতদাসরা ছিল শাসিত শ্রেণিভুক্ত। শাসক শ্রেণি আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করত। বণিক, কৃষক প্রভৃতি পেশাজীবী লোকদের সকল প্রকার কর প্রদান করতে হতো। ফলে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। কৃষকদের নিজস্ব কোনো জমি ছিল না। ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের মানুষ বলে মনে করা হতো না।

অর্থনৈতিক অবস্থা: মুসলিম অভিযানের আগে স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থাও দুর্বল ছিল। রাষ্ট্রীয় অর্থের যথেষ্ট অপব্যবহার, বৈষম্যমূলক সম্পদ বণ্টননীতি এবং নির্যাতনমূলক রাজস্ব নির্ধারণ প্রভৃতি কারণে অভিজাত সম্প্রদায় ছাড়া মধ্য ও নিম্ন শ্রেণির লোকেরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপন করত। তাদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হতো। শিল্পের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্যের কারণে ব্যবসা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কৃষি ব্যবস্থাও দুর্দশার মুখে পড়ে। এককথায় সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে।

ধর্মীয় অবস্থা: ওই সময় স্পেনে মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। খ্রিষ্টধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য মনে করা হতো না। ইহুদিদেরকে হয় খ্রিষ্টান না হয় সেবাদাস হয়ে জীবনযাপন করতে হতো। ঐতিহাসিক এস.এম. ইমামউদ্দিনের ভাষ্যমতে, ৬১২ থেকে ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে স্পেনে ৯০ হাজার ইহুদিকে বলপূর্বক খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল।

স্পেন অভিযানের কারণ

আরব মুসলমানদের স্পেন অভিযানের পেছনে নানা কারণ ছিল। যেমন—

রাজা রডারিকের কুশাসন ও জনদুর্গতি: মুসলমানদের আগমনের আগে স্পেনের রাজা ছিলেন গথিক রাজবংশীয় রডারিক। তিনি ছিলেন অত্যাচারী শাসক। তার কুশাসনে অতিষ্ঠ ও চরম দৈন্যাবস্থায় নিপতিত শাসিত শ্রেণির সার্ফ, ক্রীতদাস এবং ইহুদি সম্প্রদায় মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছিল। এ সময় জিব্রাল্টারের দক্ষিণপাশের আরব মুসলিম শাসনাধীনে উত্তর আফ্রিকায় সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সংবাদ তারা জেনেছিল। ঐতিহাসিকদের তথ্যানুযায়ী স্পেনের নিপীড়িত মানুষ তখন তাদের মুক্তির জন্য মুসা বিন নুসায়েরের দ্বারস্থ হলে তিনি তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে যান।

কাউন্ট জুলিয়ানের আমন্ত্রণ: উত্তর আফ্রিকার নিকটবর্তী স্পেনিশ দ্বীপ সিউটার শাসনকর্তা ছিলেন কাউন্ট জুলিয়ান। তিনি ছিলেন স্পেনের রাজা উইটিজার জামাতা। শ্বশুর উইটিজাকে সিংহাসনচ্যুত করে ক্ষমতা দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজা রডারিকের সাথে কাউন্ট জুলিয়ানের বৈরী সম্পর্ক ছিল। তদুপরি স্পেনের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী রাজকীয় আচার-আচরণ শেখার জন্য স্পেনের রাজদরবারে প্রেরিত জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিন্ডাকে রডারিক শ্লীলতাহানি করলে উভয়ের মধ্যকার শত্রুতা চরম আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় কাউন্ট জুলিয়ান ইফ্রিকিয়ার (উত্তর আফ্রিকা) শাসনকর্তা মুসা বিন নুসায়েরকে স্পেন আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

স্পেন অভিযানের ঘটনা

কাউন্ট জুলিয়ানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উত্তর আফ্রিকার উমাইয়া গভর্নর মুসা বিন নুসায়ের খলিফা আল ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে তারিক বিন মালিকের নেতৃত্বে ৪০০ সৈন্য ও ১০০ অশ্বসহ চারখানা রণতরী দিয়ে স্পেনে একটি পর্যবেক্ষক দল পাঠান। পর্যবেক্ষক দলটির বিবরণ অনুকূলে হওয়ায় মুসা ৭,০০০ সৈন্যসহ বার্বার সেনানায়ক তারিক বিন জিয়াদকে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে পাঠান। তারিক তার সেনাবাহিনী এবং রণতরী নিয়ে স্পেনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে পার্বত্য এলাকায় অবতরণ করেন। তারিকের অবতরণ করা এ স্থানটি এখনও 'জাবাল আত-তারিক' (আধুনিক জিব্রাল্টার) নামে সুপরিচিত। রাজা রডারিকের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশপাল থিওডমিরকে পরাজিত করে তারিক আরও সম্মুখভাগে অগ্রসর হন এবং রাজধানী টলেডোর দিকে এগিয়ে যান। রাজা রডারিক মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ পাওয়া মাত্র ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্যসহ গোয়াডিলেট (গোয়াদাল) কুইভার নদীর তীরে মেডিনা-সিডোনিয়া রণক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হন। অপরদিকে মুসা সেনাপতি তারিকের সাহায্যার্থে আরও ৫০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে সংঘটিত এ যুদ্ধে রডারিক পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় গোয়াডিলেট নদীতে ডুবে প্রাণ হারান। এরপর মুসলিম বাহিনী মালাগা, গ্রানাডা, কর্ডোভা এবং টলেডো দখল করে। তারিকের এ গৌরবময় বিজয়ে মুসা বিন নুসায়ের খুশি হয়ে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে ১৮০০০ সসৈন্যে স্পেনে যান। তিনি নতুন অভিযান পরিচালনা করে সেভিল, মেরিডা, কারমোনা প্রভৃতি শহর জয় করেন। এভাবে ৭১২ থেকে ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিষ্টান অধ্যুষিত স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চল মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এভাবে উত্তরে পিরেনিজ পর্বত থেকে দক্ষিণে জিব্রালটার প্রণালী পর্যন্ত সমগ্র স্পেন ইসলামি শাসনের পতাকাতলে আসে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্পেন কোথায় অবস্থিত?
২. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজধানী কী ছিল?
৩. মুসলিম শাসনামলে স্পেনের রাজধানী কী ছিল? *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো.২০১৮]*
৪. স্পেন বিজয়ী সেনাপতির নাম কী? *[সকল বোর্ড ২০১৬; ২০১৫]*
৫. কোন খলিফার সময় মুসলমানরা স্পেন জয় করে?
৬. মুসলমানদের স্পেন বিজয় কত শতাব্দীর ঘটনা?

উত্তরের জন্য ৪১৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুসলমানদের স্পেন অভিযানের কারণগুলো ছক আকারে লেখো।

পাঠ ২

স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা ও খিলাফত যুগ (৭৫৬-১৪৯২ খ্রি.)
The Establishment of Umayyad Emirate in Spain and Age of Khalifat (756-1492 AD)

৭১৪-৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেন ছিল কেন্দ্রীয় খেলাফতের অধীনে উমাইয়া আমিরদের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ সময়ে স্পেনের প্রধান আমির মাগরিব অঞ্চলের উমাইয়া গভর্নর জেনারেলের অধীনে ছিলেন। স্পেনে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকালীন দামেস্কের খলিফা ছিলেন আল ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রি.)। মুসা বিন নুসায়েরের স্পেন ত্যাগের পর তার ছেলে আব্দুল আজিজ স্পেন শাসন (৭১৪-৭১৬ খ্রি.) করেন। তার উত্তরাধিকারী ছিলেন আইউব এবং আল হুর (৭১৬-৭১৮ খ্রি.)। পরবর্তীকালে আমির সামাহ বিন মালিক (৭১৮-৭২১ খ্রি.) সেভিল থেকে কর্ডোভায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এরপর তার স্থলাভিষিক্ত হন আনবাসা (৭২১-৭২৫ খ্রি.)। আনবাসার উত্তরাধিকারী ছিলেন আবদুর রহমান আল গাফেকি (৭৩০-৭৩২ খ্রি.)। গাফেকির রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো টুরসের যুদ্ধ।

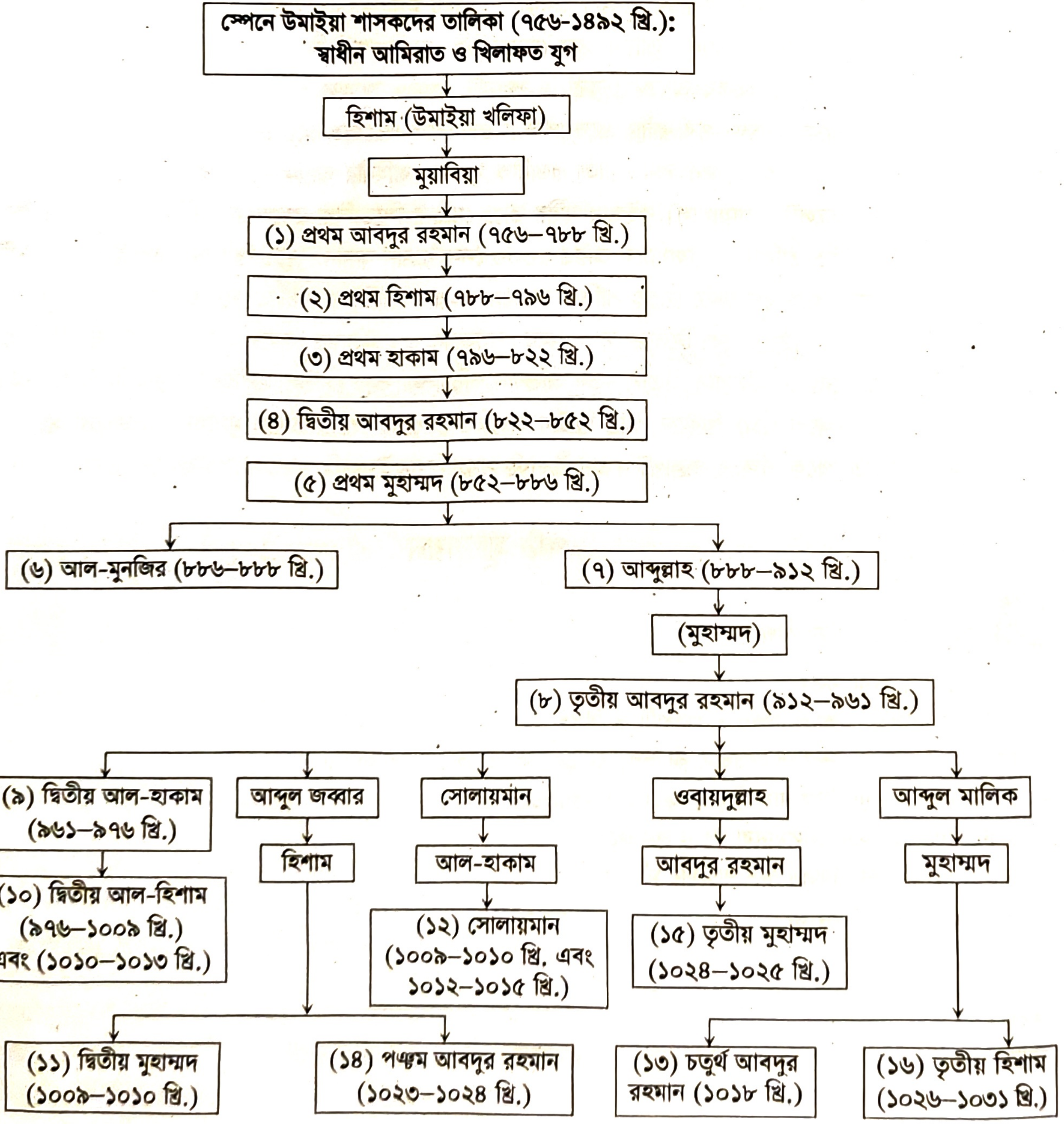
স্পেনে উমাইয়া শাসকদের তালিকা (৭৫৬-১৪৯২ খ্রি.):
স্বাধীন আমিরাত ও খিলাফত যুগ
হিশাম (উমাইয়া খলিফা)
মুয়াবিয়া
(১) প্রথম আবদুর রহমান (৭৫৬–৭৮৮ খ্রি.)
(২) প্রথম হিশাম (৭৮৮–৭৯৬ খ্রি.)
(৩) প্রথম হাকাম (৭৯৬–৮২২ খ্রি.)
(৪) দ্বিতীয় আবদুর রহমান (৮২২–৮৫২ খ্রি.)
(৫) প্রথম মুহাম্মদ (৮৫২–৮৮৬ খ্রি.)
(৬) আল-মুনজির (৮৮৬–৮৮৮ খ্রি.)
(৭) আব্দুল্লাহ (৮৮৮–৯১২ খ্রি.)
(মুহাম্মদ)
(৮) তৃতীয় আবদুর রহমান (৯১২–৯৬১ খ্রি.)
(৯) দ্বিতীয় আল-হাকাম (৯৬১–৯৭৬ খ্রি.)
আব্দুল জব্বার
সোলায়মান
ওবায়দুল্লাহ
আব্দুল মালিক
(১০) দ্বিতীয় আল-হিশাম (৯৭৬–১০০৯ খ্রি.) এবং (১০১০–১০১৩ খ্রি.)
হিশাম
আল-হাকাম
আবদুর রহমান
মুহাম্মদ
(১২) সোলায়মান (১০০৯–১০১০ খ্রি. এবং ১০১২–১০১৫ খ্রি.)
(১৫) তৃতীয় মুহাম্মদ (১০২৪–১০২৫ খ্রি.)
(১১) দ্বিতীয় মুহাম্মদ (১০০৯–১০১০ খ্রি.)
(১৪) পঞ্চম আবদুর রহমান (১০২৩–১০২৪ খ্রি.)
(১৩) চতুর্থ আবদুর রহমান (১০১৮ খ্রি.)
(১৬) তৃতীয় হিশাম (১০২৬–১০৩১ খ্রি.)

টুরসের যুদ্ধ (৭৩২ খ্রি.)

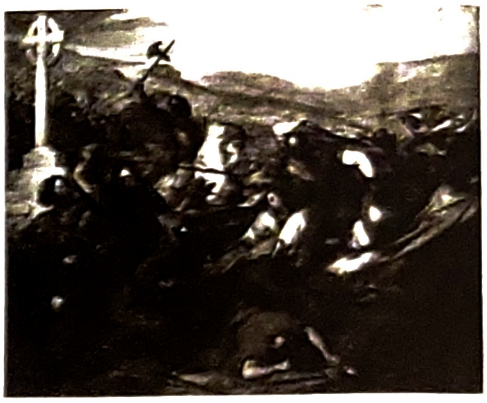

টুরসের যুদ্ধের চিত্র

৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের আমির নিযুক্ত হন আব্দুর রহমান আল গাফেকি। তিনি সমগ্র ইউরোপে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়ে ওঠেন। তার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে অ্যাকুইটেনের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি বর্ডোর ডিউক ইউডিসকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। অতঃপর আনবাসার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য টুরসে শিবির স্থাপন করেন। এতে ভীতসন্ত্রস্ত ইউডিস ফ্রান্সের রাজা চার্লস মার্টেলের সাহায্য কামনা করেন। টুরস ও পয়টিয়ার্সের মধ্যে ক্লেন ও ভিয়েন-এর সংযোগ স্থলে চার্লস মার্টেল বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। এটিই হলো টুরসের যুদ্ধ। এ যুদ্ধটি 'পইটিয়াসের যুদ্ধ' নামেও খ্যাত। ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সংঘটিত এ যুদ্ধে আবদুর রহমান আল গাফেকি পরাজিত হন। চার্লস আহত মুসলমান সেনাদের হত্যা করে 'মার্টেল হন্তা' উপাধি গ্রহণ করেন। এর ফলে ফ্রান্সসহ ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের পথ রুদ্ধ হয়।

টুরসের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ

টুরসের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল খ্রিষ্টানদের শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এছাড়া মুসলিম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বার্বার সেনাদের আনুগত্যহীনতা এবং আরবদের সাথে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রধান কারণ।

গৃহযুদ্ধ

টুরসের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের ফলে স্পেনে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ৭৩২ থেকে ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে স্পেনে ২৩ জন গভর্নর একের পর এক ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। এ সময় সমগ্র স্পেন অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে সংকটাপন্ন ছিল। এ সময় দামেস্কের উমাইয়া খিলাফতের পতন হয় । মুসলিম বিশ্বে আব্বাসি শাসনযুগের সূচনা হয়। খিলাফত লাভের পর আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ব্যাপক নিধনযজ্ঞ চালান। তবে তার হত্যাযজ্ঞ থেকে উমাইয়া বংশের আবদুর রহমান নামের এক যুবরাজ নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। তিনি দামেস্ক থেকে উত্তর আফ্রিকায় পালিয়ে যান এবং পরে জিব্রালটার অতিক্রম করে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। এ আবদুর রহমান ইতিহাসে 'আবদুর রহমান আদ-দাখিল' নামে পরিচিত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেন কেন্দ্রীয় উমাইয়া খিলাফতের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল?
২. আবদুর রহমান আল গাফেকির রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী?
৩. কত খ্রিষ্টাব্দে টুরসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
৪. টুরসের যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের রাজা কে ছিলেন?
৫. টুরসের যুদ্ধে কে পরাজিত হন?
৬. টুরসের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ কী ছিল?

উত্তরের জন্য ৪১৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

টুরসের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ ছক আকারে লেখো।

পাঠ ৩

আবদুর রহমান আদ-দাখিল: পরিচয় ও ক্ষমতায় আরোহণ (৭৫৬-৭৮৮ খ্রি.)
Abdur Rahman Ad-Dakhil: Identity and Ascending the Throne (756-788 AD)

স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠায় অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেন আবদুর রহমান আদ-দাখিল। গোত্রীয় কলহ, কোন্দল, বিরোধ, স্বার্থপরতা ও প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে খ্রিষ্টান রাজারা স্পেনের মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধার করতে শুরু করে। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে স্পেনের রাজনৈতিক মঞ্চে আবদুর রহমান আদ-দাখিলের আবির্ভাব ঘটে। ঐতিহাসিকেরা স্পেনে আবদুর রহমান আদ-দাখিলের আবির্ভাবকে ইতিহাসের এক নাটকীয় ও রোমাঞ্চকর ঘটনা বলে মনে করেন। তিনি নিতান্তই অসহায় ও কপর্দকহীন অবস্থা থেকে ক্ষমতার শীর্ষ শিখরে আরোহণ করেন।

আবদুর রহমানের পরিচয়

আবদুর রহমান ৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার অন্তর্গত দামেস্কের নিকটবর্তী আস-শামস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মুয়াবিয়া ইবনে হিশাম ইবন আবদ আল মালিক ইবনে মারওয়ান। তার উপনামগুলো হলো আদ-দাখিল, দ্যা ফ্যালকন অব কুরাইশ ও দ্যা ফ্যালকন অব আন্দালুস। তার স্ত্রীর নাম ছিল হুলাল এবং সন্তানদের নাম সুলায়মান, ওমর, প্রথম হিশাম ও আব্দুল্লাহ। আবদুর রহমান দেখতে সুদর্শন ছিলেন। তার গায়ের রং ফর্সা, চুল ছিল ঈষৎ লালিমা মিশ্রিত কালো। তিনি বেশ কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। বিপদে তিনি ধৈর্যহারা হতেন না। জীবনের কিছু সময় তিনি দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করেছেন। এ সময় তিনি অসহায় ও এতিমের মতো বনে-জঙ্গালে, মরু প্রান্তরে ও দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু তিনি হতাশায় ভেঙে না পড়ে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে একটি দেশের অধীশ্বর হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি স্পেনে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন।

ক্ষমতা দখল (৭৫৬ খ্রি.)

সর্বশেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধে পরাজিত হলে আব্বাসি প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। আব্বাসি খিলাফত সম্পূর্ণরূপে কণ্টকমুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেন। এ হত্যাযজ্ঞ থেকে খলিফা হিশামের দৌহিত্র আবদুর রহমান ইবন মুয়াবিয়া প্রাণে বেঁচে যান। তিনি ছদ্মবেশে দামেস্ক থেকে পালিয়ে প্রথমে ফোরাত নদীর তীরবর্তী শহর 'রাহ' তে আত্মগোপন করেন। অতঃপর সিরিয়া, প্যালেস্টাইন হয়ে উত্তর আফ্রিকায় গমন করেন। তবে শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে তিনি স্পেনের দিকে মনোনিবেশ করেন। স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আবদুর রহমান মরক্কোর সিউটা নগরের দক্ষিণে এক পার্বত্য অঞ্চলে মাতুলালয়ে বনু নাসর গোত্রে আশ্রয় নেন। স্পেনে ভাগ্যান্বেষণের আশায় তার বোনের মুক্ত দাস সেলিমের কাছ থেকে তিনি স্পেন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। তখন স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ায় সে সময় হিমারীয়রা স্পেনের তৎকালীন মুদারীয় শাসনকর্তা ইউসুফের কুশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাই হিমারীয় দলপতি উবায়দুল্লাহ বিন উসমান এবং আবদুল্লাহ-বিন-খালিদ আবদুর রহমানকে স্পেনে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। অনুগত ভৃত্য বদরের মারফত হিমারীয়দের কাছ থেকে সাহায্যের নিশ্চিত আশ্বাস পেয়ে আবদুর রহমান ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্পেন উপকূলের আল মুনিকার নামক স্থানে অবতরণ করেন। স্পেনে তিনি বিপুল সমর্থন ও অভিনন্দন লাভ করেন। বার্বার ও নির্যাতিত মুদারীয়রা দলে দলে তার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। এর ফলে আবদুর রহমানের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ মার্চ আবদুর রহমান আর্চিদোনার রাজধানী বিজিওতে প্রবেশ করেন। সেখানে তাকে আমির ঘোষণা করে তার নামে খুতবা পাঠ করা হয়।

মুসারার যুদ্ধ ও কর্ডোভা দখল

আবদুর রহমানের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফ আল ফিহরি শান্তি প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু আবদুর রহমান এতে সম্মত হননি। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ইউসুফের সঙ্গে আবদুর রহমানের 'মুসারা' নামক স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইউসুফ পরাজিত হলে আবদুর রহমান স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করেন। রাজধানী অধিকৃত হলে ইয়ামেনিদের ময়র

গোত্রও আবদুর রহমানের আনুগত্য স্বীকার করে। কেবল দিহর ও কায়েস গোত্র ইউসুফের পক্ষে থাকে। আবদুর রহমান অপ্রতিহত গতিতে কর্ডোভা থেকে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ইউসুফ বহু কষ্টে সেনা সংগ্রহ করে টলেডোতে আবদুর রহমানের মোকাবিলা করেন। কিন্তু ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। এর ফলে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রতিষ্ঠিত এ উমাইয়া আমিরাত ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে স্পেনে টিকে থাকে।

বিদ্রোহ দমন

কর্ডোভা দখল করে আবদুর রহমান অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে মনোনিবেশ করেন। আরবরা সবসময়ই আবদুর রহমানের বিরোধিতা করে আসছিল। এ সময় মুজারি সম্প্রদায়ের ইউসুফ ও জায়েন আমির সুমায়েল আবদুর রহমানের শাসন গ্রহণের বিরোধিতা করেন। আবদুর রহমান দশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় আরব বিদ্রোহী অভিজাতদের পরাজিত করতে সক্ষম হন। আবদুর রহমানের কৃতিত্বে ঈর্ষান্বিত হয়ে আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তার কায়রোয়ানের গভর্নর আলী ইবনে মুগিসকে তার বিরুদ্ধে পাঠান। কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে মুগিসকে পরাস্ত করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন। আবদুর রহমানের বীরোচিত সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে খলিফা আল মনসুর তাকে 'উমাইয়া বা আরবদের বাজপাখি' হিসেবে আখ্যা দেন। আবদুর রহমানের স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠা এবং তার ধারাবাহিক সাফল্যে ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু আরব দলপতি ফ্রান্সের রাজা শার্লিমানকে স্পেন আক্রমণের অনুরোধ জানান। এ অবস্থায় ৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে শার্লিমান পিরেনিজ পর্বত অতিক্রম করে স্পেন আক্রমণ করেন। ৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আবদুর রহমান সারাগোসা নগরীর উপকণ্ঠে ফ্রান্সের রাজা শার্লিমানকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে সমর্থ হন। ফলে শার্লিমান আবদুর রহমানের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। এভাবে আবদুর রহমান তার প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া আমিরাতকে সুসংহত করেন।

মৃত্যু: আবদুর রহমান আদ-দাখিল ৫৭ বছর বয়সে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সিরিয়ানদের সমর্থন পেলেও আরব অভিজাতরা তাকে সমর্থন করেনি। উত্তর আফ্রিকার বার্বাররাও স্পেনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় রাজ্যে বিভক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক রেনহার্ট ডোজি বলেন, "আবদুর রহমান তার পুরো রাজত্বকাল ধরে কখনও ইয়েমেনি, কখনও বার্বার আবার কখনও খ্রিষ্টানদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।"[১]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন কে?
২. কত খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়?
৩. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়?
৪. 'আদ-দাখিল' শব্দের অর্থ কী?
৫. কাকে পরাজিত করে আদ দাখিল কর্ডোভা দখল করেন?
৬. ফ্রান্সের কোন রাজা আবদুর রহমান আদ-দাখিলের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন?

উত্তরের জন্য ৪১৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

কঠোর পরিশ্রম আর দৃঢ় মনোবল মানুষের সাফল্য লাভের চাবিকাঠি— দলে বিভক্ত হয়ে ঐতিহাসিক উদাহরণের মাধ্যমে বক্তব্যটির পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো।

---

[১] "Throughout his reign Abdur Rahman saw his authority disputed sometimes by the Yemenies, sometimes by the Berbers and sometimes by the Christians." –Ref. Reinhart Dozy, *Spanish Islam*

পাঠ ৪

আবদুর রহমান আদ-দাখিলের কৃতিত্ব ও চরিত্র
Achievements and Character of Abdur Rahman Ad-Dakhil

স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবদুর রহমান আদ-দাখিল অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার। তার প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। আব্বাসি দ্বিতীয় খলিফা আল মনসুর প্রথম দিকে প্রচণ্ড উমাইয়া বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি স্পেনে আব্বাসি প্রচারণার জন্য নানা চক্রান্ত করেন। কিন্তু আবদুর রহমান কৃতিত্বের সাথে সব চক্রান্ত বানচাল করে দেন। আবদুর রহমানের সাহস ও দৃঢ় মনোবলের জন্য আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে **'কুরাইশদের বাজপাখি'** (The Falcon of the Quraysh) বলে অভিহিত করেছেন। তার ক্ষিপ্রতার প্রশংসায় ঐতিহাসিক এস. এম. ইমামউদ্দিন বলেন, On account of the rapidity with which he came and subjected Spain to his rule he was called the Falcon of the Quraysh by the Abbasid Khalifah Mansur. (*Ibid*-p.43)

স্বাধীন আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা

আবদুর রহমান আদ-দাখিলের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করা। দীর্ঘ ৩৩ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে তিনি শুধু অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, শান্তি-শৃঙ্খলাই স্থাপন করেননি বরং একটি দক্ষ ও কার্যকর প্রশাসন ব্যবস্থাও গড়ে তোলেন। বার্বার, ইয়েমেনি ও খ্রিষ্টানদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হলেও নিজ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং সামরিক দক্ষতার বলে এ সব বিপদ থেকে তিনি মুসলিম রাজ্য স্পেনকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। তার প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সেনাদের অন্যতম ছিলেন বদর, তামামা, হাবীব ও আসীম। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও রাজা শার্লিমানের পরাস্তকরণে এদের ভূমিকা ছিল অনন্য। আবদুর রহমান স্পেনে স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তার সেনাবাহিনীতে ২,০০,০০০ সদস্য ছিল যা মূলত বার্বার ও মুক্ত দাসদের নিয়ে গঠিত ছিল। রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য সামরিক বাহিনীই ছিল শক্তির মূল উৎস।

শ্রেষ্ঠ শাসক

স্বাধীন ও সার্বভৌম আমিরাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আবদুর রহমান ৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খুৎবায় আব্বাসি খলিফা আল মনসুরের পরিবর্তে নিজ নাম অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন।[২] তবে তিনি খিলাফতের কেন্দ্রস্থল বাগদাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে খলিফা বা আমিরুল মুমেনিন উপাধি গ্রহণ করেননি। শুধু আমির উপাধি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তিনি সমগ্র রাজ্যকে ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল গর্ভনরের ওপর। কেন্দ্রীয় প্রশাসন ছিল আমিরের হাতে। আবদুর রহমান রাজ্যে সুষ্ঠু শাসন ও ন্যায়বিচার প্রবর্তন করেন। তার সময়ে প্রধান বিচারক ছিলেন আবু আমর বিন মুয়াবিয়া। আবদুর রহমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং জ্ঞানী-গুণীদের সমাদর করতেন। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেনে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা চরম শিখরে উন্নীত হয়। তিনি সাহিত্যিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, ভাষাবিদ, আইনবিশারদদের সমাদর করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি আল মুতাহাসাসা, আইনজ্ঞ শেখ আবু মুসা হাওয়ারী ও ধর্মতত্ত্ববিদ শেখ গাজী বিন কায়েস। তিনিই স্পেনে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, "আবদুর রহমান যে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তার মধ্য দিয়ে নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে স্পেন বিশ্বসংস্কৃতির দুটি কেন্দ্রের একটিতে পরিণত হয়েছিল।"[৩]

শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক

মুসলিম স্পেনের স্বর্ণযুগের প্রথম পদক্ষেপ ছিল আবদুর রহমান আদ-দাখিলের রাজত্বকাল। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, জ্ঞানচর্চা ও শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনে আবদুর রহমান অনন্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি কর্ডোভায় রাজধানী স্থাপন করে একে মনোমুগ্ধকর করে সুসজ্জিত করেন। এ নগরীকে তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতির পাদপিঠে পরিণত করেন। নাগরিকদের সুবিধার্থে তিনি একটি বৃহৎ অনিন্দ্য সুন্দর জলাধার নির্মাণ করেন। তিনি একজন প্রকৃতিপ্রেমিক শাসক ছিলেন, যা তার প্রাসাদের চারপাশের মনোরম উদ্যান প্রমাণ করে। স্থাপত্যশিল্পের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনিই কর্ডোভা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ

---

[২] *মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস*– এস. এম. ইমামউদ্দিন, পৃষ্ঠা-৮২

[৩] *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃষ্ঠা- ৫৭৯

সম্বন্ধে ঐতিহাসিক এস. এম. ইমামউদ্দিন বলেন, "এই আমির কর্ডোভার বিখ্যাত মসজিদ নির্মাণে ৮০,০০০ দিনার ব্যয় করেন, যেটি সৌন্দর্য ও জাঁকজমকের দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্বের অন্য যে কোনো স্থাপত্যের সাথে তুলনীয়।"[৪] ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সেন্ট ভিনসেন্ট গির্জার অর্ধেক ১,০০,০০০ দিনারে ক্রয় করে এ মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। অনিন্দ্যসুন্দর এ মসজিদটি ছিল তৎকালীন স্পেনীয় মুসলমানদের জন্য গৌরবের। মার্টিন হিউমের মতে, আবদুর রহমানের রাজধানী ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জমকালো। তিনি কর্ডোভা নগরীকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন। তিনি নিজের জন্য কর্ডোভায় বিশাল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। তিনি কর্ডোভার চারদিকে প্রাকার বেষ্টিত করেন এবং 'মুনিরাতুর রুসাদা' নামে একটি প্রমোদ কানন তৈরি করেন। এ বাগানটি নানা ফুল-ফলের গাছে সুশোভিত ছিল। তার বাগানে আরবের খেজুর গাছসহ প্রাচ্যের তাল গাছও স্থান পেয়েছিল। অসংখ্য মসজিদ, হাম্মাম, দুর্গ, পুল নির্মাণ করে আবদুর রহমান মুসলিম ইতিহাসে এক অক্ষয় কীর্তিময় অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন। তিনি গোয়ালিডেট কুইভার নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

চারিত্রিক গুণাবলি

আবদুর রহমান আদ-দাখিল সদয় প্রকৃতির ও সুবিবেচক ছিলেন। নিজের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি সব সময়ই অবিচল থাকতেন। তিনি অত্যন্ত কর্মঠ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষ ছিলেন। রাজকার্য সম্পাদনে ও সকল প্রকার সমস্যা সমাধানে তিনি পরামর্শক পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি সাহসী যোদ্ধাও ছিলেন, যা অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় বিদ্রোহ দমন ও শার্লিমানের বিরুদ্ধে ভূমিকায় সহজেই অনুমেয়। তিনি দৈনিক নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন এবং রাজ্যে মদপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। দানশীলতাও তার চারিত্রিক গুণাবলির মধ্যে অন্যতম ছিল। আবদুর রহমান একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং জ্ঞানীদের সমাদর করতেন। জ্ঞানচর্চার জন্য কর্ডোভার যে বিশ্বজোড়া খ্যাতি তা মূলত আবদুর রহমানই সূচনা করেন। স্পেনের এক দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আবদুর রহমান সেখানের স্বাধীন আমির হয়েছিলেন। তিনি দৃঢ় মনোবল নিয়ে স্পেনের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং কঠোরভাবে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন ও বহিঃশত্রু বিতাড়িত করেন। শাসনক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র এমনকি নানা গঠনমূলক কাজ সবক্ষেত্রেই আবদুর রহমানের প্রতিভা ছিল সমুজ্জ্বল।

ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, "বাস্তবে আবদুর রহমান যেমন নিজেকে পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শাসক বলে প্রমাণ করেছিলেন, তেমনি পশ্চিমাঞ্চলেরও সবচেয়ে শক্তিশালী সার্বভৌম শাসক বলে নিজেকে প্রমাণ করলেন।"[৫]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয় কাকে? */রা. বো., য. বো. ব. বো. ২০১৯/*
২. আদ দাখিলকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' উপাধি দিয়েছেন কে?
৩. আবদুর রহমান আদ-দাখিলের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কী?
৪. আবদুর রহমান আদ-দাখিল কত বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন?
৫. আবদুর রহমান স্পেনের কোন নগরীকে তিলোত্তমায় পরিণত করেন?
৬. স্পেনে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন কে?

উত্তরের জন্য ৪১৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আবদুর রহমান আদ-দাখিলের কৃতিত্বগুলো নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

---

[৪] The Amir spent 80,000 dinars on building the Grand Mosque of Cordova, which rivals in beauty and grandeur the best of its kind in any part of the Muslim world. *Ibid*-p.45

[৫] *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃষ্ঠা. ৫৭৮

পাঠ ৫

আবদুর রহমান আল-ওয়াসাত (৮২২-৮৫২ খ্রি.)
Abdur Rahman Al-Oaswat (822-852 AD)

আমির আবদুর রহমান আদ-দাখিলের মৃত্যুর পর তার পুত্র হিশাম (৭৮৮-৭৯৬ খ্রি.) উমাইয়া আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। হিশামের পর তার পুত্র হাকাম (৭৯৬-৮২২ খ্রি.) আমির নিযুক্ত হন। হাকামের রাজত্বকাল স্পেনের বিখ্যাত 'ফকিহ বিদ্রোহের' জন্য উল্লেখযোগ্য। হাকাম ফকিহদের বেশ ভক্তি করতেন। কিন্তু শাসনকাজে তাদের অযথা হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। একারণেই ফকিহরা আল হাকামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। হাকাম কৌশলে তাদের বিদ্রোহ দমন করে কর্ডোভায় শান্তি ফিরিয়ে আনেন। ৮২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম হাকামের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় আবদুর রহমান স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে তিনি 'আল ওয়াসাত' বা 'মধ্যবর্তী' বা দ্বিতীয় আবদুর রহমান নামে পরিচিতি পেয়েছেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি বিভিন্ন ধরনের বিদ্রোহ ও খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। তবে দ্বিতীয় আবদুর রহমান কৃতিত্বের সাথে এসব প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা করেন।

বিদ্রোহ দমন

দ্বিতীয় আবদুর রহমান ক্ষমতায় আসীন হলে প্রথম আবদুর রহমানের পুত্র আব্দুল্লাহ তানজিয়া থেকে ফিরে এসে নিজেকে আমির হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু দ্বিতীয় আবদুর রহমান আব্দুল্লাহকে পরাস্ত করেন এবং তাকে ক্ষমা করে মুরসিয়ার শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দেন। তার শাসনামলে হিমারীয়-মুদারীয় গোত্রের দ্বন্দ্ব ও কলহ স্পেনে মুসলিম শাসনকে দুর্বল করে দেয়। এ দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করলে আবদুর রউফের নেতৃত্বে বিশাল এক সেনাবাহিনী মেরিদার যুদ্ধে বিদ্রোহীদের দমন করে। দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও নওমুসলিমরা সম্মিলিতভাবে টলেডোতে বিদ্রোহ করেন। ৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ালিদ বিন হাকাম টলেডো নগরী দখলের মাধ্যমে তাদের দমন করেন। ৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে আটটি জাহাজে নরম্যান জলদস্যুরা পর্তুগালের লিসবনের উপকূলে উপস্থিত হয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। তারা এখানে প্রায় ৪২ দিন লুটতরাজ চালায়। আব্দুল ওয়াহাব বিন ইস্তেন্দারানীর নেতৃত্বে রাজকীয় বাহিনী তাদের দমন করে।

স্পেনের উত্তর-পূর্বে প্রভাব বিস্তার: ইউরোপ থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করার জন্য শার্লিমান ও দ্বিতীয় আলফানসো এর নেতৃত্বে খ্রিষ্টানরা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে অভিযান চালায়। আমির তাদের প্রতিরোধে আব্দুল করিম বিন মুগিস ও ওবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহকে প্রেরণ করলে তারা পরাজিত ও নিহত হয়। ফলে তারা আমিরের সাথে শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

জিলট মুভমেন্ট বা ধর্মান্ধ আন্দোলন (৮৫০-৮৫২ খ্রি.) এবং ধর্মান্ধ খ্রিষ্টানদের বিদ্রোহ দমন

আমির দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনকালের শেষ দিকে কর্ডোভার একদল গোঁড়া ও ধর্মান্ধ খ্রিষ্টান ইসলাম ও আরবদের শিক্ষা ও কৃষ্টিতে আকৃষ্ট খ্রিষ্টানদের দ্রুত আরবীয়করণের বিরুদ্ধে এক উদ্ভট ও অভিনব আন্দোলন শুরু করে যা ইতিহাসে ধর্মান্ধ আন্দোলন বা Zealot Movement নামে পরিচিত। অথচ সেখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে অমুসলমানরা সকল প্রকার স্বাধীনতা ভোগ করতেন। ঐতিহাসিক এস. এম. ইমামউদ্দিন বলেন, "অমুসলিমরা সম্পূর্ণ ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করত এবং রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো লাভ করত।"[৬]

মোজারেবদের পরিচয়: অষ্টম শতাব্দীতে ইউরোপীয় শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৈন্যতায় একদল খ্রিষ্টান বিকাশমান আরবীয় জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক দিয়ে ইসলামপন্থি না হলেও রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে আরবীয় হয়ে গিয়েছিল। আরবীয় ভাবধারা, রীতিনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুসারী এ দলকে 'মোজারেব' বলা হতো।

ধর্মান্ধদের ক্ষোভের মূল কারণ: স্পেনের ধর্মান্ধদের ক্ষোভের মূল কারণ ছিল—

১. স্পেনীয় ধর্মান্ধ খ্রিষ্টানরা মনেপ্রাণে মুসলিম শাসন গ্রহণ করতে পারেনি।
২. ইসলামের সহজ-সরল সমাজ ও জীবনব্যবস্থার সাথে খ্রিষ্টান ধর্মের কঠোরতা ও বৈরাগ্যের কোনো মিল নেই।

---

[৬] They enjoyed complete religious, social and economic freedom and were given key posts in the administration of the state. Ref.: S.M. Imamuddin, *A Political History of Muslim Spain*, P.67.

৩. ইসলাম ধর্মের প্রতি তাদের যে বিদ্বেষ ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল আরবীয়করণের প্রতি। খ্রিষ্টানদের ইসলামি রীতিনীতি গ্রহণের ফলে তাদের শত শত বছরের দেশীয় সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে বসেছিল। খ্রিষ্টান ধর্মের জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করে তারা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।

আরবীয় ভাবধারা ও ইসলামের অনুশাসনের প্রতি মোজারেবদের অতি আসক্তির ফলে ধর্মান্ধ খ্রিষ্টানরা প্রকাশ্যে ইসলামবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। এরা পারফেকটাস, ইউলোজিয়াস, ফ্লোরা প্রমুখের নেতৃত্বে কর্ডোভায় তাদের আন্দোলন শুরু করে। ধর্মান্ধরা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নামে কুৎসা রটনা করত। ইসলামের সব রীতিনীতিকে তারা ঘৃণা করত। অনেকে নামাজের সময় মসজিদে প্রবেশ করে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করত। আমির দ্বিতীয় আবদুর রহমান শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনি বহু ধর্মান্ধ ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করেন। ৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে ফ্লোরা ও তার সহযোগী মেরীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম মুহাম্মদ স্পেনের ক্ষমতায় বসলে তাদের মূলোৎপাটন করতে সংকল্পবদ্ধ হন।

ফলাফল: মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে ধর্মান্ধ আন্দোলনের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। তাদের এ আন্দোলন ছিল স্পেনে উদীয়মান ইসলামি শক্তি, কৃষ্টি-কালচারকে স্পেনের বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলার প্রাথমিক মহড়া। ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, "খ্রিষ্টান ধর্মান্ধরা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়াই আত্মোৎসর্গ করেছিল। তাদের স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দানের প্রবণতা যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি এ ঘটনা তাদের নির্বুদ্ধিতা ও করুণার উদ্দীপক।" সাময়িকভাবে এ আন্দোলন দমন করা হলেও তা খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছিল।

চার ব্যক্তির বিশেষ প্রভাব

আমির দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনকালে চার ব্যক্তির বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয়। আমির এদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এরা হলেন—

ইয়াহিয়া-বিন-ইয়াহিয়া: ইয়াহিয়া-বিন-ইয়াহিয়া ছিলেন একজন মালেকি মাজহাবের ফকিহ বা ধর্মতত্ত্ববিদ। দ্বিতীয় আবদুর রহমানের ওপর এ ব্যক্তির বিশেষ প্রভাব ছিল। আমির হিশামের রাজত্বকালে ইয়াহিয়া মদিনাতে ইমাম মালিক বিন আনাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইমাম মালিকের ছাত্রদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। স্পেনে তার পাণ্ডিত্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। আমির দ্বিতীয় আবদুর রহমান তাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারে তার মতামত গ্রহণ করতেন। ইয়াহিয়ার প্রভাবে মালেকি মাজহাব রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।

আবুল হাসান-বিন-নাফে ওরফে জিরিয়াব: আবুল হাসান ইবনে নাফে ওরফে জিরিয়াব ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। তিনি পারসিক বংশোদ্ভূত ছিলেন। আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশীদের দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়ক ইসহাক মৌসুলী ছিলেন জিরিয়াবের ওস্তাদ। পরবর্তী সময়ে তিনি স্পেনে যান। দ্বিতীয় আবদুর রহমান তার সুর ও সংগীতের মাধুর্যে বিমুগ্ধ হয়ে তাকে উচ্চ রাজকীয় সম্মানসহ ২৪,০০০ স্বর্ণমুদ্রা বৃত্তি প্রদান করেন। জিরিয়াবের প্রতি আমিরের কৃপাদৃষ্টি সুপ্রসন্ন থাকায় তিনি সেসময় রাজ্যের এক প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

খোজা নাসের: নাসের ছিলেন একজন অনারব ক্রীতদাস। তবে অসামান্য প্রতিভা ও রাজকাজে বিশেষ দক্ষতার কারণে তিনি দ্বিতীয় আবদুর রহমানের উদার পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেন। আমির তাকে রাজ্যের প্রধান সচিব নিযুক্ত করে সম্মানিত করেন। রাজমহীয়সী সুলতানা তারুবারও তিনি প্রিয়ভাজন ছিলেন। এ সুবাদে রাজদরবার ও হেরেমের সর্বত্র তার অসামান্য প্রভাব ছিল। অবশ্য পরে সুলতানা তারুবার সাথে মিলিত হয়ে শাহজাদা মুহাম্মদকে বিষপ্রয়োগে হত্যার ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি আমিরের আস্থা হারান এবং এ অভিযোগেই আমির তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

সুলতানা তারুবা: সুলতানা তারুবা ছিলেন আবদুর রহমানের স্ত্রী। অপরূপ সৌন্দর্য ও মোহনীয় গুণাবলি দিয়ে তিনি আমিরকে বশীভূত করে ফেলেছিলেন। ফলে তিনি এ সময় যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হন। অবশ্য খোজা নাসেরের সাথে মিলে রাজপুত্র মুহাম্মদকে হত্যার ষড়যন্ত্রের ঘটনার পর থেকে আমির তাকে সন্দেহ করতেন। ফলে তার প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পায়।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

আমির আবদুর রহমানের রাজত্বকাল আড়ম্বর ও শান্তিপূর্ণ ছিল। তিনি ক্ষমতায় আসীন হয়ে শাসন কাঠামোকে সুবিন্যস্ত করেন। আব্দুল করিম ইবনে মুগীহ ছিলেন তার প্রধান সেনাপতি ও সুযোগ্য মন্ত্রী। তিনি বহু প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করে কর্ডোভা নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। আমির ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং শরিয়ত মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনার নির্দেশ দেন। আমির আবদুর রহমানের চরিত্রে বিভিন্ন গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি সামরিক, প্রশাসনিক, বিচার, শিল্প ও সাহিত্য এবং জনকল্যাণকর শাসন প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। ঐতিহাসিক S. M. Imamuddin বলেন, "আবদুর রহমান শুধু শিল্প ও স্থাপত্যের ধারক ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক।"[৭]

আমির তার রাজত্বকালে স্বীয় স্ত্রী তারুবা, খোজা নাসের, ফকিহ ইয়াহিয়া-বিন-ইয়াহিয়া এবং সঙ্গীতজ্ঞ জিরিয়াব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তিনি কর্ডোভাকে বাগদাদের মতো উন্নত নগরীতে পরিণত করার জন্য ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেন। তিনি বাগদাদের খলিফা আল মুতাসিমের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি কনস্টান্টিনোপল ও ন্যাভারির দরবারে দূত পাঠান। তার সময়ে জার্মান দস্যু নরমানরা মুসলিম এলাকা আক্রমণ করলে সেনাপতি রুস্তম তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করেন। দ্বিতীয় আবদুর রহমান আবদুল করিম মুসিহকে হাজিব নিযুক্ত করেন এবং মন্ত্রীদের কাজ নির্ধারণ করে দেন। তিনি নিজে একজন কবি ছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি সুসজ্জিত দরবারে বসতেন। তার দরবার ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কার রাজত্বকালে স্পেনে ফকিহ বিদ্রোহের শুরু হয়?
২. 'আল ওয়াসাত' বা 'মধ্যবর্তী' নামে পরিচিত কে?
৩. ধর্মান্ধ আন্দোলন বা Zealot Movement দমন করেন কে?
৪. স্পেনের যারা আরবীয় ভাবধারা, রীতিনীতির অনুসারী ছিল তাদের কী বলা হতো?
৫. দ্বিতীয় আবদুর রহমানের ওপর কয় ব্যক্তির প্রভাব ছিল?
৬. দ্বিতীয় আবদুর রহমানের স্ত্রীর নাম কী ছিল?

উত্তরের জন্য ৪১৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

স্পেনের ধর্মান্ধ আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

গ. বাড়ির কাজ

ভারতের মুঘল সম্রাট আকবরের রাজদরবারে বহু জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ ঘটেছিল। তাদেরকে নবরত্ন বলা হতো। এদের মধ্যে আবুল ফজল ছিলেন সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ, তানসেন সংগীতের মূর্ছনায় সম্রাটকে বিমোহিত করতেন, বীরবল সম্রাটকে গল্প শোনাতেন এবং টোডরমল সম্রাটকে রাজস্ব বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে তাদের অবদান ও প্রভাব ছিল অপরিসীম।

১. সম্রাট আকবরের মতো স্পেনের কোন মুসলিম শাসক বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো।
২. উক্ত শাসকের সুনাম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধিতে রাজদরবারের ব্যক্তিদের ভূমিকা মূল্যায়ন করো।

---

[৭] Abd al-Rahman was not only a lover of art and architecture but also a patron of science and literature. –Ref.: *A Political History of the Muslim Spain*, p-70

পাঠ ৬

স্পেনের জাতীয়তাবাদী নেতা উমর বিন হাফসুন (৮৬০-৯১৭ খ্রি.)
Spanish Nationalist Leader Umar Bin Hafsun (860-917 AD)

স্পেনের জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক ছিলেন উমর বিন হাফসুন। তিনি একাধারে তিনজন স্পেনীয় মুসলিম আমির (প্রথম মুহাম্মদ, মুনজীর ও আব্দুল্লাহ) ও একজন খলিফার (তৃতীয় আবদুর রহমান) সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন।

উমর ইবনে হাফসুনের পরিচিতি

এস. এম. ইমামউদ্দিনের মতে, উমর বিন হাফসুন ৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রোনদার নিকটবর্তী ইজনাইটে (Iznate) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন হাফস বিন উমর বিন জাফর। তার পৈতৃক আবাসভূমি ছিল স্পেনের রোবাস্ট্রো অঞ্চলে। পরবর্তী সময়ে তিনি ইসলামের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এস. এম. ইমামউদ্দিন বলেন, “উমর (স্যামুয়েল) ছিলেন একজন সুদক্ষ ও সামরিক ব্যক্তিত্ব যিনি চারজন আমিরের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। যদিও তিনি একজন লোভী ও প্রতারক ছিলেন তারপরও তিনি নিজেকে নায়ক হিসেবে প্রমাণ করেন।”[৮] ৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

উত্থানকাল

উগ্র ও বদমেজাজি উমর একদা এক উর্ধ্বতন রাজকর্মচারীকে হত্যা করে রোবাস্ট্রো পর্বতে আত্মগোপন করেন। তার বিরুদ্ধে সমন জারি করলে তিনি উত্তর আফ্রিকায় এক দর্জির গৃহে আশ্রয় নিয়ে দর্জির কাজ শুরু করেন। কর্মরত অবস্থায় এক প্রতিবেশী তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন— “তোমার দৈন্য জীবনের সচ্ছলতা আসবে কি সুই-এ ফোঁড় দিলে? দেশে ফিরে যাও এবং তরবারি হাতে নিয়ে সেখানকার উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হয়ে এক বৃহত্তর কর্মজীবনে প্রবেশ করো।” এ তেজোদীপ্ত উপদেশ শুনে উমর বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে নিজ দেশে ফিরে যান। এ সময় তিনি পিতৃব্য মোজাবিরের সাহায্য পান এবং ৪০ জন দুর্ধর্ষ দস্যুর একটি দল গঠন করেন। ইতোমধ্যে তিনি এলভিয়ার একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরও সমর্থন লাভ করেন। এ দুটি দলের শক্তির সমন্বয়ে উমর তার ক্ষমতা সুদৃঢ় করার নীতিতে সফল হন।

প্রথম মুহাম্মদের সাথে সংঘর্ষ (৮৫২-৮৮৬ খ্রি.)

উমর বিন হাফসুন রোবাস্ট্রো পার্বত্য অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করলে তৎকালীন স্পেনের উমাইয়া আমির প্রথম মুহাম্মদ তার বিরুদ্ধে দুটি অভিযান প্রেরণ করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে প্রবীণ মন্ত্রী হাশিম বিন আব্দুল আজিজ তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। উমর আমিরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। হাশিম উমরের অসাধারণ সাহসিকতা ও সাংগঠনিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ দেন। এ পদে বহু কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও উমর বিন হাফসুন নগর অধ্যক্ষের এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফলে ৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে পদত্যাগে বাধ্য হন। ৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রোবাস্ট্রো দুর্গে ফিরে গেলে পুনরায় দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে 'মুক্তির দূত' হিসেবে এ অঞ্চলে প্রচার করেন। ফলে ভাগ্যান্বেষীরা দলে দলে তার বাহিনীতে যোগদান করতে থাকে। ৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে যায়েদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে রাজকীয় বাহিনী উমরকে পরাজিত করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উমর বিন হাফসুন বিশ্বাসঘাতকতা করে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে রাজকীয় বাহিনীর বিরাট অংশ ধ্বংস করে দেন এবং যায়েদ বিন কাসিমকে হত্যা করেন।

মুনজিরের সাথে সংঘর্ষ (৮৮৬-৮৮৮ খ্রি.)

৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আসীন হয়েই মুনজির উমরের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। উমর পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন এবং কর প্রদানে স্বীকৃতি দেন। এবারও তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। অতঃপর মুনজির নিজেই ৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে রোবাস্ট্রো অবরোধ করেন। চারদিক থেকে অবরুদ্ধ দেখে উমর মুনজিরের কাছে রাজকীয় বাহিনীতে যোগদান ও শান্তিতে বসবাসের প্রস্তাব দেন। তিনি কর্ডোভাতে ফেরার জন্য আমিরের কাছে মালবাহী ১০০ খচ্চর পাঠানোর অনুরোধ করেন। মুনজির সরল বিশ্বাসে খচ্চর পাঠালে তিনি আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তবে তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই মুনজির প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে নিহত হন।

---

[৮] Umar (Samuel) was a man of great ability and military skill and for the years he faught the four Amairs. He proved to be a hero although he was treacherous and selfish. –Ref.: S.M. Imamuddin, *A Political History of the Muslim Spain*, p.91

আব্দুল্লাহর সাথে সংঘর্ষ (৮৮৮-৯১২ খ্রি.)

৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদের ক্ষমতা গ্রহণের সময় কর্ডোভার অবস্থা ছিল অরাজকতাপূর্ণ। আবদুল্লাহ ৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে দীর্ঘ ৪০ দিন যাবৎ অস্ত্র পরিচালনা করেও সুবিধা না করতে পেরে উমরের সাথে স্থায়ী শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এর শর্তানুযায়ী উমর বিন হাফসুন আমিরের প্রতিনিধি হিসেবে তার অঞ্চলে শাসন করবেন। ইতোমধ্যে আব্দুল্লাহ খিলাফতের সংকটাপন্ন অবস্থায় উমরের শরণাপন্ন হন। ধূর্ত, বিশ্বাসঘাতক উমর এটিকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং রাজকীয় বাহিনীকে পঙ্গু করার প্রয়াসী হয়ে ওঠেন। এ লক্ষ্যে উমর জায়েন অঞ্চলের শাসনকর্তা ইবনে মুসতানাহরের সাথে গোপন আঁতাত করেন। তিনি ইদিলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করার মাধ্যমে গোয়াডাল কুইভার নদীর দক্ষিণ অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আমির আব্দুল্লাহ তার দমনে সেনাপতি মালিক বিন উমাইয়াকে ৪০০০ নিয়মিত ও ১০,০০০ সংগৃহীত সৈন্য প্রেরণ করেন। ৮৯১ সালে উমর পরাজিত হলেও ৮৯২ সালে শক্তি সঞ্চয় করে হারানোরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। খ্রিষ্টান নরপতিদের সাহায্য ও সমর্থনের আশায় ৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে স্যামুয়েল নাম ধারণ করলেও তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। অবশেষে ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভায় নিজ পুত্র আবদুর রহমানকে পণ রেখে যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করেন।

তৃতীয় আবদুর রহমানের সাথে সংঘর্ষ (৯১২-৯৬১ খ্রি.)

তৃতীয় আবদুর রহমান ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে স্পেন থেকে সকল প্রকার বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা করেন। ইতোমধ্যে উমরের সমর্থন ও শক্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এ সময় তৃতীয় আবদুর রহমান তাকে গোয়াডালকুইভার নদীর তীরে ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে Tolox দুর্গে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন।

স্পেনের জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক

উমর বিন হাফসুন স্পেনের ইতিহাসে একজন প্রভাবশালী সংগঠক, সমরকুশলী ও আত্মপ্রত্যয়ী নেতার নাম। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার ফলে তিনি কোনো সম্প্রদায়েরই সমর্থন ও বিশ্বাস লাভ করতে পারেননি। মুসলিম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব শোষিত-বঞ্চিত মানুষের নেতা থাকলেও খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণের পর তিনি জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে চিহ্নিত হন। খ্রিষ্টান স্পেনবাসীর অনেকেই জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উমরের দলে যোগদান করে তার নেতৃত্বে তাদের হারানো জাতীয় জীবন, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা ফিরে পেতে প্রয়াসী হয়ে ওঠে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে উমর বিন হাফসুন ছিলেন স্পেনের জাতীয়তাবাদের একজন অগ্রনায়ক।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্পেনের জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক কে ছিলেন?
২. উমর বিন হাফসুন কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
৩. উমর বিন হাফসুন কত জন দুর্ধর্ষ দস্যুর একটি দল গঠন করেন?
৪. উমর বিন হাফসুন কোন পার্বত্য অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করেন?
৫. উমর বিন হাফসুনকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন কে?
৬. ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে কোন দুর্গে উমর বিন হাফসুনকে পরাজিত করা হয়?

উত্তরের জন্য ৪১৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

উমর বিন হাফসুনের উত্থান ও পতনের ইতিহাস সম্পর্কিত একটি ছক তৈরি করো।

পাঠ ৭

তৃতীয় আবদুর রহমান (৯১২-৯৬১ খ্রি.)
Abdur Rahman III (912-961 AD)

পরিচয়

আমির দ্বিতীয় আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মদ ৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের উমাইয়া আমিরাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চৌত্রিশ বছর রাজত্বের পর ৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হলে মুনজির স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র ২ বছর রাজত্ব করেন। ৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে তার ভাই আবদুল্লাহ স্পেনের আমিরাতের দায়িত্ব নেন। তিনি দুই যুগ স্পেন শাসন করেন। তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হলো বিদ্রোহী উমর বিন হাফসুনকে দমন। ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর তৃতীয় আবদুর রহমান স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তৃতীয় আবদুর রহমান ছিলেন আমির আব্দুল্লাহ (৮৮৮-৯১২ খ্রি.)-এর পৌত্র এবং মুহাম্মদের পুত্র। তিনি ৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ২২ বছর বয়সে পিতামহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনকালকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়। যথা– ক. আমির হিসেবে (৯১২-৯২৯ খ্রি.) ১৭ বছর এবং খ. খলিফা হিসেবে (৯২৯-৯৬১ খ্রি.) ৩৩ বছর।

আমির হিসেবে আবদুর রহমানের কর্মকাণ্ড (৯১২-৯২৯ খ্রি.)

তৃতীয় আবদুর রহমান অতি অল্প বয়সে ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে নানাবিধ রাজনৈতিক অসন্তোষ, অরাজকতার সম্মুখীন হন। এ পর্যায়ে তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে অধিক মনোযোগ দেন। তিনি বহু কৌশলে জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশের বেতনভুক্ত সৈন্যদের সমন্বয়ে একটি বিশাল ও শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলেন। এ বাহিনী স্লাভবাহিনী নামে পরিচিত ছিল। এ বাহিনীর সাহায্যে তিনি বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করেন।

সেভিল ও কারমেনির বিদ্রোহ দমন: তৃতীয় আবদুর রহমান তার পুনর্গঠিত স্লাভবাহিনীকে প্রথমেই সেভিলের বনু হাজ্জাজের বিদ্রোহ দমনে পাঠান। বনু হাজ্জাজের এ বিদ্রোহ 'আহমদ ইবনে মুসলিমাহ'-এর নেতৃত্বে প্রবল আকার ধারণ করেছিল। আমিরের রাজকীয় বাহিনী সকল প্রতিরোধ ভেঙে ৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে গোয়াডাল কুইভার নদীর তীরে শত্রুদের পরাজিত করে। অপরদিকে কারমেনির বিদ্রোহী নেতা মুহাম্মদ পরাজিত হলে আমির তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে উজির নিযুক্ত করেন।

উমর ইবনে হাফসুনকে দমন: ৯১২ সালে তৃতীয় আবদুর রহমান উমর ইবনে হাফসুনের দীর্ঘ ৪০ বছরের ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে Tolox দুর্গ দখল করেন। উমরের উত্তরাধিকারী চার পুত্র জাফর, সুলাইমান, আবদুর রহমান ও হাফস তাদের রোবাস্ট্রো দুর্গ সংরক্ষণ করতে পারেননি।

এ ছাড়াও তৃতীয় আবদুর রহমান ৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে তাফসিরের বিদ্রোহী নেতা শেখ আসলামীকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করেন। দক্ষিণাঞ্চলে এচিজা, জায়েন ও এনভিরা (৯২৩ খ্রি.) মেরিদা (৯২৮ খ্রি.) ও টলেডোবাসীর বিদ্রোহ (৯৩২) দমন করে রাজ্যে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

স্পেনের খ্রিষ্টান ও আফ্রিকায় ফাতেমিদের সাথে দ্বন্দ্ব

খ্রিষ্টানদের সাথে দ্বন্দ্ব: ৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে লিও অধিপতি দ্বিতীয় ওরডোনা মেরিডা প্রদেশ আক্রমণ করলে তৃতীয় আবদুর রহমান আহমদ বিন আবু আবদার নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী ওরডোনার বিরুদ্ধে পাঠান। যুদ্ধে পরাস্ত হলেও নেভারের রাজা সাঙ্কোর সাহায্যে ওরডোনা তুদেলা ও ভালতিয়ার বিধ্বস্ত করে। ৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে হাজি বদরের নেতৃত্বে প্রেরিত সেনাবাহিনী ওরডোনাকে পরাজিত করে। ৯২৫ সালে ওরডোনার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় রাজিরো ক্ষমতায় বসে সারাগোসার মুসলিম শাসনকর্তার সাথে তৃতীয় আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আবদুর রহমান সারাগোসা দখল করে গভর্নরকে শাস্তি প্রদান করেন। ৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে লিও রাজা ও রানী মাতা তোতা (ন্যাভারের প্রতিনিধি) যৌথভাবে 'আল-হানদেগা' বা হান্দকের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করেন।

৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ন্যাভারির রাজা সাঙ্কো (Sancho) তৃতীয় আবদুর রহমান ও তৃতীয় ওরডোনার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অস্বীকার করলে খলিফা ৯৫৪ সালে আহমদ ইবনে ইয়ালাকে বিশাল বাহিনীসহ তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠান। ৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টান বাহিনী পরাজিত হয়।

ফাতেমিদের সাথে বিরোধ: তৃতীয় আবদুর রহমানের সময়কালে কর্ডোভার মরমি কবি ও দার্শনিক ইবন মাসারা (৮৮৩-৯৩১ খ্রি.) এবং ইবনে হাওকালের প্রভাবে স্পেনে ফাতেমি বংশের একটি সমর্থক দল গড়ে ওঠে। তাছাড়া উমর ইবনে হাফসুন (৮৬০-৯১২ খ্রি.) এর বিদ্রোহে ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী (ফাতেমি বংশের প্রতিষ্ঠাতা) এর সমর্থন ছিল। আবদুর রহমান এ বিপজ্জনক অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য ৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে সিউটা দখল করেন। এরপর আল জিরিয়া ও রওয়ানের বার্বাররা এবং নুকুরের ফাতেমি বিরোধী ক্ষুদ্র মুসলিম শাসকেরা তৃতীয় আবদুর রহমানের বশ্যতা স্বীকার করে।

খলিফা হিসেবে তৃতীয় আবদুর রহমানের কর্মকাণ্ড (৯২৯-৯৬১ খ্রি.)

৯১২ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় আবদুর রহমান ক্ষমতায় আরোহণ করে রাজনৈতিক নানা অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ১৮ বছর পার করেন। সমগ্র স্পেনে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে তিনি স্পেনের একচ্ছত্র অধিপতি হতে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেমন—

১. জুমার দিনে খুৎবায় স্বীয় নাম উচ্চারণ চালু, ২. নিজ নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন এবং ৩. 'আমীরুল মুমেনিন' উপাধি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এ লক্ষ্যে তৃতীয় আবদুর রহমান ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং 'আমীরুল মুমেনিন' ও 'আল-নাসির লী-দ্বিনীল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি নিজ নামে স্বর্ণমুদ্রাও চালু করেন। খলিফা হিসেবে ঘোষণার পর মূলত আবদুর রহমান স্পেনের সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে মন দেন।

স্পেনে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কারণ

দশম শতাব্দীর তিরিশের দশকে বিশ্বে তিনটি খিলাফতের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। যথা– বাগদাদে আব্বাসি খিলাফত, মিসরে ফাতেমি খিলাফত এবং স্পেনের উমাইয়া খিলাফত। স্পেনের কিংবদন্তি শাসক তৃতীয় আবদুর রহমান আব্বাসি ও ফাতেমি খিলাফতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে স্পেনে রাজনৈতিক ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইউরোপে মুসলিম শৌর্যবীর্য স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠা ও ইসলামি কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশের জন্য নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় আবদুর রহমান স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন?

২. তৃতীয় আবদুর রহমান খলিফা হিসেবে কত বছর স্পেন শাসন করেন?

৩. কত খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

৪. 'আমীরুল মুমেনিন' ও 'আল-নাসির লী-দ্বিনীল্লাহ' উপাধি ছিল কার?

৫. মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে

৬. কত খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় আবদুর রহমান Tolox দুর্গ দখল করেন?

উত্তরের জন্য ৪১৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আমির হিসেবে তৃতীয় আবদুর রহমানের কর্মকাণ্ডগুলো ছক আকারে লেখো।

পাঠ ৮

সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে তৃতীয় আবদুর রহমানের কৃতিত্ব
Achievements of Abdur Rahman III as the Best Ruler

স্পেনের উমাইয়া বংশের খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমান সমসাময়িক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে তৃতীয় আবদুর রহমান অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী একজন শাসক। এস. এম. ইমামউদ্দিনের মতে, "তৃতীয় আবদুর রহমানের দীর্ঘ রাজত্ব ছিল স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ।"[৯] শাসক হিসেবে তিনি অসীম সাহসিকতা, বীরত্ব ও রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞা দ্বারা সকল দুর্যোগ মোকাবিলা করে খিলাফতকে শক্তিশালী ও সুসংহত করেন। যা নিম্নে বর্ণিত হলো—

দক্ষ সংগঠক: তৃতীয় আবদুর রহমান আল-নাসির স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা গুণবান ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমির আলী যথার্থই বলেছেন— "স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে আবদুর রহমান আল নাসির সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান ছিলেন।"[১০] উত্তরাঞ্চলের খ্রিষ্টান ও ফাতেমিদের স্পেন জয়ের আশা তিনি ধূলিসাৎ করে দেন। উমর বিন হাফসুনের প্রবল বিদ্রোহও তিনি দমন করেন। এসব কারণে তাকে 'Saviour of Spain' বলা হয়।

দক্ষ শাসক: এক অরাজক পরিস্থিতিতে তৃতীয় আবদুর রহমান খিলাফতে বসেন এবং রাজ্যের সব অশান্তি দূর করে সুষ্ঠু ও সুন্দর শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মতে, "এর আগে কখনও কর্ডোভা এত সমৃদ্ধ হয়নি, আর আন্দালুসিয়াও এত ধনশালী হয়নি এবং রাজ্য এত বেশি বিজয় অর্জন করেনি।" আবদুর রহমান রাজ্যে স্থায়িভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করেন। তিনি কর্ডোভা ছাড়া স্পেনের সমগ্র অঞ্চলকে ৩টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। তিনি স্লাভ ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের রাজকার্যের দায়িত্বপূর্ণ পদে যোগ্যতা অনুসারে আসীন করেন। তার সময়ে বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল ওয়ালি, সাহিব উল সুরতা, কাজী, মুহতাসিব প্রমুখ।

সামরিক সংগঠক: এস. এম. ইমামউদ্দিনের মতে, "স্পেনে উমাইয়া শাসকদের মধ্যে তৃতীয় আবদুর রহমান ছিলেন প্রশ্নাতীতভাবে দক্ষ ও সুনিপুণ ক্ষমতার অধিকারী।"[১১] ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর তিনি স্লাভ, বার্বার, খ্রিষ্টান আরব প্রভৃতি জাতির সৈন্যদের সমন্বয়ে ১,৫০,০০০ সৈন্যের একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। তার দেহরক্ষী ছিল ২২,০০০; যার মধ্যে অশ্বারোহীই ছিল ৮,০০০। ঐতিহাসিক আর. ডোজির মতে, 'তৃতীয় আবদুর রহমানের সেনাবাহিনী তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাহিনী ছিল।'

কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়ন: তৃতীয় আবদুর রহমানের সময় স্পেনে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়। সে সময়ে সেচব্যবস্থার দ্বারা অনুর্বর ও পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করেন। তৃতীয় আবদুর রহমান কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির জন্য বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তার সময়ে কমপক্ষে ১,০০০ জাহাজ ছিল। তখন কৃষি ও ব্যবসায় উন্নতির সাথে সাথে শিল্পের ব্যাপক প্রসার হয়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়। সে সময়ে একমাত্র রাজধানীতেই ১৩,০০০ তাঁতশিল্প ছিল। তার সময়ে রেশম ও পশম জাতীয় দ্রব্য স্পেন থেকে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। রাজস্ব আয়ের এক-তৃতীয়াংশ কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যয় করা হতো। এ সময় স্পেন এতটাই সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল যে সমসাময়িক ইউরোপের কোনো দেশের সাথে এর তুলনা চলে না।

---

[৯] The long reign of Abd-al-Rahman III constitutes one of the most brilliant period in the history of Muslim Spain.–Ref.: S.M. Imamuddin, *A Political History of Muslim Spain*, p.9

[১০] They had rescued Andalusia both from herself and from subjection by the foreigners. – Ref: Reinhart Dozy, *Spanish Islam*, p.90

[১১] He was unquestionably the ablest and most gifted of all the Umayyad rulers of Spain. –Ref: S.M. Imamuddin, *A Political History of Muslim Spain*, p.97

বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়ন: আবদুর রহমান আল নাসির এক বলিষ্ঠ ও বন্ধুসুলভ পররাষ্ট্রনীতির প্রবর্তন করেন। তার বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য ছিল উত্তর স্পেনের খ্রিষ্টানদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ধূলিসাৎ করা ও ভূমধ্যসাগরের ফাতেমি নৌবহরের ক্ষমতা খর্ব করা। তার দরবারে কনস্টান্টিনপোলের সম্রাট, জার্মান নৃপতি, ফ্রান্স ও ইতালির রাজারা দূত পাঠান করেন। ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই এবং রাশিয়ার পিটার ও জার্মানির ফ্রেডারিক প্রমুখ তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

জেনে রাখো

চতুর্দশ লুই (Louis XIV: 5 September 1638, -1 September 1715) লুইস দ্য গ্রেট বা সূর্যরাজা নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ত্রয়োদশ লুইয়ের পুত্র এবং ফ্রান্সে বুরবোঁ বংশের প্রতিষ্ঠাতা চতুর্থ হেনরির নাতি ছিলেন। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী চতুর্দশ লুইয়ের সময়ই ফ্রান্সে রাজতন্ত্র চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়। ক্ষমতা, কর্মদক্ষতা, শৌর্যবীর্য, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা তাকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন তার কাজের জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট দায়ী অন্য কারও কাছে নয়। এ কারণে তিনি বলতেন, 'আমিই রাষ্ট্র।' চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালকে (১৬৪৩-১৭১৫ খ্রি.) 'Le Grand Siecles' বা মহান শতাব্দী বলে উল্লেখ করা হয়।

স্থাপত্য ও শিল্পকলায় তৃতীয় আবদুর রহমানের কৃতিত্ব

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন: শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তৃতীয় আবদুর রহমানের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তার প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জগদ্বিখ্যাত। এখানে সাহিত্য, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, ফলিতবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হতো। কর্ডোভা নগরীই সমসাময়িক ইউরোপের একমাত্র নির্ভরযোগ্য শিক্ষা নিকেতনে পরিণত হয়। জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে এ সময় কর্ডোভার গ্রন্থাগারে ৬০,০০০ পুস্তক ছিল। এ সময় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ছিলেন দার্শনিক ইবনে মাসারাহ, ঐতিহাসিক ইবনুল আহমর, জ্যোতির্বিদ আহমদ বিন নসর, মাসলামা ইবনুল করীম, চিকিৎসক আবির বিন সাঈদ ও ইয়াহিয়া বিন ইসহাক।

স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ: তৃতীয় আবদুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্যশিল্পেরও চরম বিকাশ ঘটে। এ সময় রাজধানী কর্ডোভাতে ৩০০ মসজিদ, ১০০ প্রাসাদ ১,১৩,০০০ গৃহ এবং ৩৮০টি হাম্মামখানা ছিল। তিনি কর্ডোভার জামে মসজিদের পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি এ মসজিদের উত্তর দিকে একটি সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করেছিলেন, যা ২৭ ফুট চওড়া এবং ১০৮ ফুট উঁচু ছিল। তৃতীয় আবদুর রহমান কর্ডোভায় বহু প্রাসাদ ও বাগান নির্মাণ করেন। তিনি 'কসরুর রওজা' নামে একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ: স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমানের অনন্য কীর্তি ছিল আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ। আবদুর রহমান তার হেরেমের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী স্ত্রী আজ-জোহরার অনুরোধে তারই নামে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তৃতীয় আবদুর রহমান ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কর্ডোভার ৩ মাইল উত্তরে Hill of the Bride এর পাদদেশে আজ-জোহরা প্রাসাদের

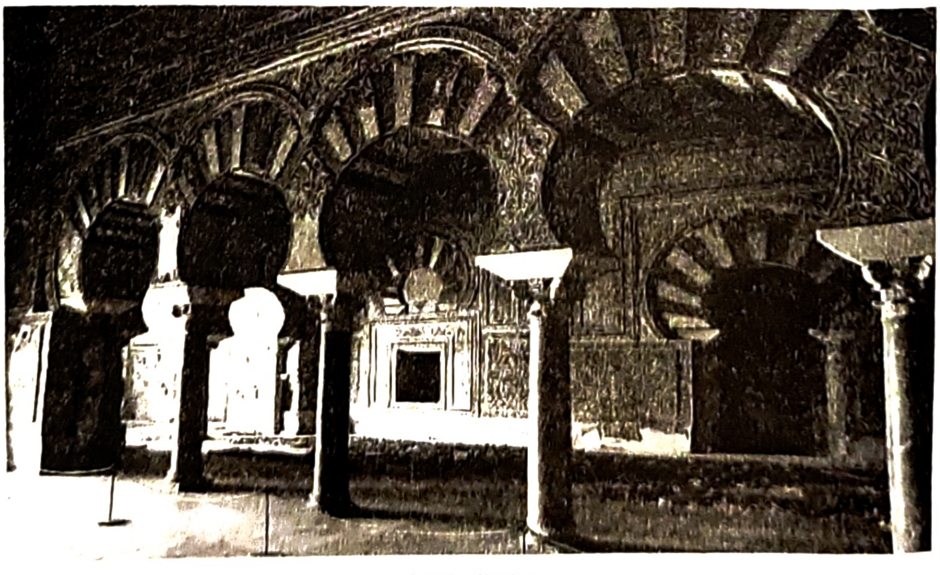

জোহরা প্রাসাদ

নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এ প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় হাকামের সময়। তিনি এ প্রাসাদ নির্মাণে প্রায় ৫০,০০,০০০ দিনার ব্যয় করেন এবং ১০,০০০ কারিগর, ওস্তাদ ও শ্রমিক নিযুক্ত করেন। মণি-মুক্তা খচিত স্তম্ভরাজি ও অপূর্ব নকশা সংবলিত কাঠের বীম, মার্বেল ও স্ফটিক পাথরে নির্মিত স্তম্ভের ওপর বৃত্তাকার গম্বুজ, চৌবাচ্চা, ঝরনা, গজদণ্ড ও আবলুস কাঠের গবাক্ষ ছিল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। এ প্রাসাদের ফটকে সম্রাজ্ঞী আজ-জোহরার একটি ভাস্কর্য ছিল।

আবদুর রহমান কেবল স্পেনের মুসলিম শাসনকেই রক্ষা করেননি, বরং তিনি সেখানে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে স্থায়ী সমৃদ্ধি দান করেছেন। ক্ষমতা লাভের সময় রাজকোষ শূন্য পেলেও আবদুর রহমানের সকল উন্নয়ন নীতিতে অতিদ্রুত রাজকোষ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার রাজ্যের বার্ষিক আয় ছিল ৬২ লক্ষ ৪৫ হাজার দিনার। এ অর্থ দিয়ে কর্ডোভাকে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধশালী নগরীতে পরিণত করা হয়। হিট্টির মতে, “ইতোপূর্বে কর্ডোভা কখনো এত সম্পদশালী রাজ্য এবং আন্দালুসিয়া এত উন্নত হিসেবে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি”।

চরিত্র

স্পেনের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে তৃতীয় আবদুর রহমান সৎ গুণাবলির জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শাসক হিসেবে তার মধ্যে সকল গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি ছিলেন একাধারে সুশাসক, সংগঠক, ন্যায়বিচারক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত দেশপ্রেমিক লোকদেরকে তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সরকারি পদ ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। আল মাক্কারি তার সম্পর্কে বলেন, “তিনি ছিলেন ধীরস্থির ও সুশিক্ষিত শাসক। তার আগে স্পেনের আর কোনো শাসক এসব গুণের অধিকারী ছিলেন না। তার বিনম্র স্বভাব, উদারতা ও সুশাসনের প্রতি ভালোবাসা সমগ্র দেশে প্রবাদে পরিণত হয়।”

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কাকে 'Saviour of Spain' বলা হয়?

২. স্লাভ বাহিনী গঠন করেন কে?

৩. কার সময়ে স্পেনের রাজধানীতে ১৩,০০০ তাঁতশিল্প ছিল?

৪. আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন কে?

৫. আজ-জোহরা প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শেষ হয় কার সময়ে?

৬. সমসাময়িক ইউরোপের একমাত্র নির্ভরযোগ্য শিক্ষা নিকেতনে পরিণত হয় কোন নগরী?

উত্তরের জন্য ৪১৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে তৃতীয় আবদুর রহমানের কৃতিত্বগুলো ছকে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৯

স্পেনে মুসলিম শাসনের পতন
Fall of the Muslim Rule in Spain

আবদুর রহমান আদ-দাখিল ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় আবদুর রহমানের সময় এ আমিরাত খিলাফতে রূপান্তরিত হয়। ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় আবদুর রহমান সেখানে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন, যা ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত সগৌরবে টিকে ছিল। ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে সমগ্র স্পেনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উত্থান হয়। তবে সর্বশেষ ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেন থেকে মুসলমানরা বিতাড়িত হয়। স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত হওয়ার বহু কারণ পরিলক্ষিত হয়। এস.এম. ইমামউদ্দিন বলেন, "অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নানা সমস্যার কারণে মুসলিম স্পেনের ধ্বংস হয়েছে এবং এর সুনাম আর খুঁজে পাওয়া যায় না।"[১২]

স্পেনে মুসলমানদের পতনের কারণগুলো প্রথমত দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা– ক. অভ্যন্তরীণ কারণ, এবং খ. বৈদেশিক কারণ

অভ্যন্তরীণ কারণ

উপজাতীয় কোন্দল: ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দের পর সমগ্র স্পেনে অসংখ্য ক্ষুদ্র বংশের উদ্ভব ঘটে। এ বংশগুলো ছিল মূলত ইয়েমেনি, সিরিয়ান, সুদানীয়, হিমারীয় ও বার্বার গোত্রভুক্ত। তাছাড়া স্পেনে মুসলিম বিদ্বেষী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক বাস করত। ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। প্রথম দিকে বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হলেও খিলাফতের শেষ দিকে শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক গভর্নররা প্রায় স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য শুরু করে। ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের ক্ষমতাও স্পেনে বেশ প্রভাব বিস্তার করে।

শাসকদের দুর্বলতা: দ্বিতীয় হাকাম পর্যন্ত উমাইয়া খিলাফত ছিল সুসংহত, সুদৃঢ় এবং প্রগতিশীল। পরবর্তী সময়ে খলিফারা দুর্বল ও হাবসিরা অধিক ক্ষমতাশালী হয়ে পড়েন। যেমন- হাজিব আল মনসুর। স্পেনীয় মুরদের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা: স্পেনে আরব মুসলিম শাসনের ভিত্তি ছিল দক্ষ ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনী। তৃতীয় আবদুর রহমান দক্ষ শক্তিশালী স্লাভ বাহিনী গঠন করলেও পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে ঐক্য বজায় ছিল না। ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফতের পতন হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের অধীনে সেনাবাহিনী বিভক্ত হয়ে পড়ে।

সুষ্ঠু উত্তরাধিকারী নীতির অভাব: স্পেনে আরব মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই উত্তরাধিকারী নীতির অভাব ছিল। এতে রাজপ্রাসাদে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে শক্তি-সামর্থ্যও দুর্বল হয়ে পড়ে।

শাসকদের বিলাসিতা: প্রথম দিকের আমির ও খলিফারা ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান থাকলেও পরবর্তী সময়ে শাসকদের মধ্যে নৈতিক স্খলন ঘটতে থাকে। স্বাধীন রাজ্যের সুলতানরা মদপানে ব্যস্ত থাকতেন। তারা শাসনকার্যে সময় দিতে না পারলেও হেরেমে আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতেন। কথিত আছে, সেভিলের শাসক আর্থ আমর আবাদন আল মুজাহিদের হেরেমে ৮০০ ক্রীতদাসী ছিল।

---

[১২] The causes of the domestic and foreign troubles, which were to sap and destroy the stability and integrity of the state are not for to seek. –*Ref:. S.M. Imamuddin, A Political History of the Muslim Spain, P-130.*

অর্থনৈতিক সংকট: স্পেনীয় মুসলিম শাসকদের স্বর্ণযুগে রাজকোষ পরিপূর্ণ থাকলেও দুর্বল ও বিলাসপ্রিয় শাসকদের জন্য অতি তাড়াতাড়িই তা শূন্য হয়ে যায়। ১০০৭ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় হিশামের সময় সৈন্যদের বেতন-ভাতা দেওয়ার মতো কোনো অর্থ ছিল না। সুলতানদের বিলাসিতা, জ্ঞানীদের ও নিজের পারিতোষিক প্রদান ও স্থাপত্য শিল্পে অজস্র অর্থ ব্যয়ে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে।

ভৌগোলিক প্রতিকূলতা: স্পেন তথা আইবেরীয় উপদ্বীপ বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থিত ছিল। কোনো শাসক পর্বত-শঙ্কুল, নদীবিধৌত ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব বেশি দিন ধরে রাখতে পারেননি। অধ্যাপক S.M. Imamuddin বলেন, "Due to physical features the roads were zig-zag and could not serve for the swift movement of armies and the more so when the journeys were not safe in the times of wear rulers."[১৩]

ভৌগোলিক প্রতিকূলতার জন্য উত্তর আফ্রিকার আক্রমণ, মিসরের ফাতেমিদের আক্রমণ, ফ্রান্সের খ্রিষ্টানদের আক্রমণ এবং স্পেনের দূরবর্তী অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন দুর্বল শাসকের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল।

বৈদেশিক কারণ

স্পেনে খ্রিষ্টান আধিপত্য বিস্তার: স্পেনে ফ্রান্সের কলোনি থাকলেও ফ্রান্সে স্পেনের মুসলমানদের কোনো কলোনি ছিল না। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনের ক্ষুদ্র রাজবংশের অঞ্চলে খ্রিষ্টানরা তাদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয় এবং মুসলমানদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ক্রমশ স্তিমিত হতে থাকে।

উমর বিন হাফসুনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন: উমর বিন হাফসুন স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়নের জন্য স্পেনীয় প্রথা, খ্রিষ্টধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতির পক্ষে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে দুর্বল শাসকদের সময়ে উমর বিন হাফসুনের এ আন্দোলন স্পেনে মুসলিম বিরোধী আন্দোলনের ইন্ধন যোগায়।

খ্রিষ্টানদের জোট: স্পেনের মুসলিম শাসনের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল দুটি- খ্রিষ্টান রাষ্ট্র ক্যাস্টাইল ও আরাগনার জোট। স্পেন থেকে মুসলমানদের চিরতরে বিতাড়িত করার জন্য তারা এ জোট গঠন করে। ১৪৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাস্টাইলের রানি ইসাবেলার সাথে আরাগনের রাজা ফার্ডিন্যান্ডের বিবাহ ছিল স্পেনের মুসলিম শাসনের জন্য একটি অশনি সংকেত।

স্পেনে মুসলমানদের চূড়ান্ত পতন

অষ্টম শতাব্দীর শুরু থেকে প্রায় ৭৮১ বছর (৭১১-১৪৯২ খ্রি.) মুসলমানরা স্পেন শাসন করেন। অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারণে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের পতন ঘটে। ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতের পতনের পর স্পেনে শতধাবিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল– ১. বনু হাম্মুদ (মালাগা ও আল জেসিরাস) ১০১০-১০৫৭ খ্রি.; ২. স্লাভ শাসন (আলমেরিয়া, মুরসিয়া ও ডেনিয়া) ১০১৩-১১১৫ খ্রি.; ৩. বনু হুদ (সারাগোসা) ১০১০-১১১৮ খ্রি.; ৪. বুন দু আল নুন-(টলেডো) ১০৩৫-১০৮৫ খ্রি.; ৫. বনু আব্বাস (সেভিল) ১০২৩-৯১ খ্রি.।

---

[১৩] *A Political History of the Muslim Spain,. P.-205.*

গ্রানাডা রাজ্যের পতন ও মুসলিম শাসনের যবনিকাপাত: স্পেনের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সর্বশেষ প্রদীপ ছিল গ্রানাডার বনু নাসির বংশ (১২৩২-১৪৯২ খ্রি.)। এ বংশের রাজত্বকালের শেষ দিকে মুসলিম রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্পেনের খ্রিষ্টান শক্তিগুলোর মধ্যে নতুন ঐক্যজোট গড়ে ওঠে। ১৪৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আরাগনের রাজা ফার্ডিনান্ড ক্যাস্টাইলের রানি ইসাবেলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হন। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "এই মিলন স্পেনে মুসলিম শাসন পতনের ঘণ্টাধ্বনি ছিল।" ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা চরম ধর্মান্ধ ও মুসলিমবিদ্বেষী ছিলেন। ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রানাডার শাসক সুলতান আলী আবু আল হাসান ক্যাস্টাইল আক্রমণ করলে পাল্টা আক্রমণে ফার্ডিনান্ড আল হামরা নগরী অধিকার করেন। সুলতান আলীর পুত্র বোয়াবদিল (আবদুল্লাহ) আল হামরা পুনরুদ্ধার করেন। তবে ক্যাস্টাইল আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি খ্রিষ্টান বাহিনীর কাছে পরাজিত ও বন্দি হন। এ পর্যায়ে ফার্ডিনান্ড ও রানি ইসাবেলার যৌথবাহিনী গ্রানাডা আক্রমণ করেন। খ্রিষ্টান বাহিনী নগরীতে পানি ও রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ইতোমধ্যে গ্রানাডার ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়। খ্রিষ্টান শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে বোয়াবদিল তার চাচা দ্বাদশ মুহাম্মদকে বিতাড়িত করে রাজক্ষমতা দখল করেন। তবে তার পক্ষে নিরাপদে রাজ্য শাসন (১৪৮৭-১৪৯২ খ্রি.) করা সম্ভব হয়নি। রাজা ফার্ডিনান্ড ও রানি ইসাবেলা গ্রানাডার সুলতান বোয়াবদিলের কাছে নগরী হস্তান্তর করার দাবি জানায়। কিন্তু সুলতান এতে সম্মত না হওয়ায় রাজা ফার্ডিনান্ড গ্রানাডা আক্রমণ ও অবরোধ করেন। দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকার পর বোয়াবদিল ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি ফার্ডিনান্ডের কাছে শর্ত সাপেক্ষে গ্রানাডা নগরী হস্তান্তর করেন। পরাজিত সুলতান বোয়াবদিল (আবদুল্লাহ) আল হামরা প্রাসাদ ত্যাগ করেন। এর মধ্য দিয়ে স্পেনে ৭৮১ বছরের (৭১২-১৪৯২ খ্রি.) মুসলিম শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্পেনে উমাইয়া খিলাফত কত খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে টিকে ছিল?
২. মুসলিম স্পেনের পতন ঘটে কবে?
৩. কখন সমগ্র স্পেনে অসংখ্য ক্ষুদ্র বংশের উদ্ভব ঘটে?
৪. সর্বশেষ কোন বংশ মুসলিম স্পেন শাসন করে?
৫. ফার্ডিন্যান্ড স্পেনের কোন প্রদেশের রাজা ছিলেন?
৬. রাজা ফার্ডিন্যান্ড কার সাথে জোট করে গ্রানাডা আক্রমণ করে?

উত্তরের জন্য ৪১৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

স্পেনে উমাইয়া খিলাফত পতনের অভ্যন্তরীণ কারণগুলো চিহ্নিত করে ছকে লেখো।

গ. দলীয় কাজ

কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে স্পেনে মুসলমানদের চূড়ান্ত পতন সম্পর্কিত একটি স্লাইড তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ১০

স্পেনের কর্ডোভায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ
Development of Wisdom in Cordova

মুসলমানরা ৭৮১ বছর শাসন (৭১১-১৪৯২ খ্রি.) করে স্পেনকে গৌরবের শিখরে সমাসীন করার গৌরব অর্জন করে। বাগদাদ ও কনস্টান্টিনোপলের মতো কর্ডোভা নগরীর উন্নতি ও শ্রী বৃদ্ধি এত উচ্চ শিখরে উঠেছিল যে তখন সমসাময়িক ইউরোপের অন্য কোনো দেশ এর সাথে তুলনীয় ছিল না। পি.কে. হিট্টির মতে, "মধ্যবর্তী ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে স্পেনের মুসলমানরা এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।"[১৪]

কর্ডোভার শ্রেষ্ঠত্ব

প্রথম আবদুর রহমান (৭৫৬-৭৮৮ খ্রি.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তীকালে তার উত্তরাধিকারীদের দ্বারা সমৃদ্ধ কর্ডোভা নগরী ছিল সমসাময়িক যুগের জগৎমণি (Jewel of the world)। সুরক্ষিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত এ শহর ২৪ মাইল দৈর্ঘ্য, ৬ মাইল প্রস্থ ও ১৪ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ছিল। তখন ২১টি শহরতলীসহ পাঁচটি আলাদা জেলা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ নগরীতে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বসবাস ছিল। ঐতিহাসিক ড্রেপার বলেন, "সূর্যাস্তের পর পথিক রাস্তার বাতির সাহায্যে দশ মাইল পদব্রজে যেত পারত। অথচ সাতশত বছর পরেও লন্ডনে কোনো সরকারি বাতির ব্যবস্থা ছিল না।" এ সময় রাজধানীতে ৩০০ মসজিদ, ১০০ প্রাসাদ, ১,১৩,০০০ গৃহ এবং ৩৮০টি হাম্মামখানা ছিল। কর্ডোভাতে ২৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অসংখ্য লাইব্রেরিসহ মানুষের চিকিৎসার জন্য ৫০টি হাসপাতাল ছিল। অনুপম হর্মরাজি, সুসজ্জিত উদ্যানমালা কর্ডোভাকে একটি 'তিলোত্তমা' নগরীতে পরিণত করেছিল। কর্ডোভায় তৃতীয় আবদুর রহমান আন-নাসির নির্মিত জোহরা প্রাসাদ ছিল আরবদের অবিস্মরণীয় কীর্তি। পি.কে. হিট্টির মতে "এ সময় উমাইয়াদের রাজধানী কর্ডোভা (ইউরোপের) সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত শহর ছিল। কনস্টান্টিনোপল ও বাগদাদসহ তদানীন্তন বিশ্বের তিনটি সভ্য (Cultured) শহরের এটি অন্যতম ছিল।

ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র

স্পেনের উমাইয়া আমির ও খলিফারা ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তারা আন্দালুসিয়ার সর্বত্র স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেভিল, কর্ডোভা, গ্রানাডা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হাজার হাজার বিদেশি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছে। এ সময়ের সাহিত্যিক আল কালি (৯০১-৯৬৭ খ্রি.) ও শিষ্য আল যুবাইদি ছিলেন অন্যতম। তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজকবি ছিলেন ইবনে আব্বাস রাব্বিহ। তার খ্যাতির মূলে ছিল 'আল-ইকদ-আল ফরিদ' নামক গ্রন্থ রচনা। এ যুগের প্রখ্যাত মনীষী ছিলেন 'তাওক আল হামামা' ও 'আল যাসল আল নিহাল' গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে হাযম। গ্রিক দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ সময়ে স্পেনের মুসলিম দার্শনিকরা যুক্তিবিদ্যায় অসামান্য অবদান রেখেছেন।

নিওপ্লেটোনিজম ও এরিস্টটলের দার্শনিক মতবাদকে ইউরোপে যারা পরিচিত করিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ইবনে বাজাহ, ইবনে তোফায়েল, ইবনে রুশদ ও ইবনে মায়মুন। কর্ডোভার গৌরব ছিলেন ইবনে রুশদ। ইবনে রুশদকে নিঃসন্দেহে সমকালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক বলা যায়। ইমাম আল গাজ্জালি যুক্তিবাদের বিরোধিতা করে 'তাহফাতুল ফালাসিফ্ফা' নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন ইবনে রুশদ তার প্রত্যুত্তরে লিখেন 'তাহফাত-আল-তাহফাত' গ্রন্থটি। চিকিৎসাবিদ্যায়ও ইবনে রুশদ-এর বিশেষ খ্যাতি ছিল। এ বিষয়ে তার একটি বিখ্যাত জ্ঞানকোষ হলো 'আল কুল্লিয়াত ফি-আলতিবসাম' গ্রন্থটি। স্পেনীয় আরব দার্শনিকদের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন ইবন আল আরাবি। পি.কে. হিট্টি ইবন-আল আরাবিকে ইসলামি সুফিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয়বাদী প্রবক্তা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

---

[১৪] Moslem Spain wrote one of the brightest chapters in the intellectual history of mediaval Europe. Ref: P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 557

বিজ্ঞান

বছরের দৈর্ঘ্য, নক্ষত্রের গতি ও আপেক্ষিক গুরুত্ব, সূর্যের কক্ষের কেন্দ্রচ্যুতি ও এর গতি নির্ধারণ, দোলক ঘড়ি, জলঘড়ি এবং ইউরোপে প্রথম মানমন্দির স্থাপন করে আল জারকালি, আল চিতরুজি প্রমুখ মুর জ্যোতির্বিদরা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। আধুনিক আলোক বিজ্ঞানের (Optics) জন্মদাতা ইবনে হায়সাম চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। এ ছাড়া ইবনে হাজম ও ইবনে ঈশার গ্রন্থগুলোকে চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গণ্য করা হতো। উদ্ভিদবিজ্ঞানে মুরদের অবদান অনস্বীকার্য। তারা পানিসেচ ও জমি চাষের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। স্পেনে তখন রসায়নশাস্ত্রের চর্চা করা হতো। আল-কেমি বা কেমিস্ট্রি শব্দটি মুসলমানদেরই দেওয়া।

ইতিহাস ও ভূগোল

ইতিহাস ও ভূগোল চর্চায় স্পেনীয় মুররা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এক্ষেত্রে ইবন আল কুতিয়ার অবদান অনস্বীকার্য। তার প্রকৃত নাম আবু বকর ইবনে উমর। এ সম্পর্কে তার লিখিত গ্রন্থের নাম ছিল 'তারিখ ইফতিতা আল আন্দালুস'। এ ছাড়াও ইবন খালাফ, ওয়াহিদ আল মারাকেকসি, আল ফাস্‌দি ও ইবনে আব্বার উল্লেখযোগ্য ছিলেন। শুধু সে সময়কার নয়, বরং সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক দার্শনিক ছিলেন ইবনে খালদুন। 'কিতাবুল ইবার' ছিল তার বিখ্যাত গ্রন্থ।

মুর স্থাপত্যশিল্প ও কারুকলা

স্পেনীয় মুররা স্থাপত্যশিল্পে ও কারুকলায় অসামান্য অবদান রেখে গেছেন, যার উজ্জল স্বাক্ষর কর্ডোভা নগরী। সেগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে কর্ডোভার জামে মসজিদ, গ্রানাডার আল হামরা প্রাসাদ, সেভিলের জিরাল্ডা মিনার। এছাড়াও সমগ্র স্পেনে অসংখ্য প্রাসাদ, মসজিদ, হাম্মাম, জলাধার, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন মুসলিম খলিফারা। মুর স্থাপত্যের অনুপম দৃষ্টান্ত আল হামরা প্রাসাদ। ইউরোপের পাদ্রিগণ যখন কাগজ হিসেবে চামড়া ব্যবহার করত তখন স্পেনে মুররা সাতিব নগরীতে কাগজ উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করেন।

কর্ডোভা জামে মসজিদের অভ্যন্তরভাগ

সংগীত

সংগীত মুরদের প্রিয় ছিল। আবদুর রহমানের সময় বাগদাদ থেকে জিরিয়াব নামে একজন সংগীতজ্ঞ আসেন যিনি আমিরের শাসনকার্যের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি কর্ডোভায় একটি সংগীত একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন।

শিক্ষার প্রসারে স্পেনীয় মুর শাসকদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন

স্পেনে মুসলিম আমলের শাসকেরা অসংখ্য মাদ্রাসা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্পেনে শিক্ষার মূলকেন্দ্র। এ আমলে সমগ্র স্পেনে সত্তরটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মুররা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, মেধা-মননশীলতা, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইউরোপে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। ঐতিহাসিক মেক কেভ জোসেফের মতে, "মুর শাসকগণ স্পেনীয় সভ্যতাকে পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং কর্ডোভাকে অন্ধকারের মাঝে একটি বাতিঘরে পরিণত করেন।"[১৫]

এছাড়াও স্পেনীয় শাসকেরা ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক অসামান্য অবদান রাখেন। সমস্ত মুসলিম দেশের মতো এখানেও আরবি ব্যাকরণ এবং কুরআন পড়া ও লেখার ওপর ভিত্তি করেই প্রাথমিক শিক্ষা গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও নারীদের শিক্ষার প্রসারেও স্পেনীয় শাসকেরা অবদান রেখেছিলেন। স্পেনীয় শাসকদের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় কুরআনের ব্যাখ্যা, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, আরবি ব্যাকরণ, কাব্য ও অভিধান, ইতিহাস ও ভূগোলের ওপর ভিত্তি করে উচ্চশিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে প্রয়াস নেওয়া হয়। ফলে কর্ডোভা, সেভিল, মালাগা ও গ্রানাডায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি স্পেনীয় শাসকেরা অনেক গ্রন্থাগারও গড়ে তুলেছিলেন। কর্ডোভার রাজকীয় গ্রন্থাগারের কাজ শুরু করেছিলেন প্রথম মুহাম্মদ (৮৫২-৫৬ খ্রি.) এবং তৃতীয় আবদুর রহমান এর পরিধি বৃদ্ধি করেছিলেন। দ্বিতীয় আল হাকাম যখন তার নিজের সংগৃহীত বইপত্র এ গ্রন্থাগারে দান করেছিলেন, তখন এটি বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছিল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুসলমানরা কত বছর স্পেন শাসন করে?
২. কোন নগরীকে জগৎমণি (Jewel of the world) বলা হয়?
৩. আজ-জোহরা প্রাসাদ কোথায় নিমার্ণ করা হয়?
৪. 'আল কুল্লিয়াত ফি-আলতিবসাম' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
৫. ইউরোপে প্রথম মানমন্দির স্থাপন করা হয় কখন?
৬. আল-কেমি বা কেমিস্ট্রি শব্দটি কারা উদ্ভাবন করে?

উত্তরের জন্য ৪১৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. শিক্ষার প্রসারে স্পেনীয় মুর শাসকদের অবদান সম্পর্কিত একটি চার্ট তৈরি করো।
২. স্পেনে উমাইয়া শাসনামলে যে সকল স্থাপত্যকর্ম তৈরি হয়েছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

---

[১৫] "He completed the Civilization of Spain and made Cordova shown like a Lighthouse upon the darkeness of Europe." Ref.: MC Cabe Joseph, *Splendoun of Muslim Spain*

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে; ২. টলেডো; ৩. কর্ডোভা; ৪. তারিক বিন জিয়াদ; ৫. উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ; ৬. অষ্টম।

পাঠ-২: ১. ৭১৪-৭৫৬; ২. টুরসের যুদ্ধ; ৩. ৭৩২; ৪. চার্লস মার্টেল; ৫. আবদুর রহমান আল গাফেকি; ৬. খ্রিষ্টানদের শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

পাঠ-৩: ১. আবদুর রহমান আদ দাখিল; ২. ৭৫৬; ৩. মুসারার; ৪. অনুপ্রবেশকারী; ৫. স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফ আল ফিহরি; ৬. শার্লিমান।

পাঠ-৪: ১. আবদুর রহমান আদ দাখিলকে; ২. আব্বাসি খলিফা আল মনসুর; ৩. স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা; ৪. দীর্ঘ ৩৩ বছর; ৫. কর্ডোভা; ৬. আবদুর রহমান আদ দাখিল।

পাঠ-৫: ১. হাকামের (৭৯৬-৮২২ খ্রি.); ২. দ্বিতীয় আবদুর রহমান; ৩. দ্বিতীয় আবদুর রহমান; ৪. মোজারেব; ৫. চার; ৬. সুলতানা তারুবা।

পাঠ-৬: ১. উমর বিন হাফসুন; ২. ৮৬০; ৩. ৪০; ৪. রোবাস্ট্রো; ৫. তৃতীয় আবদুর রহমান; ৬. Tolox দুর্গে; ।

পাঠ-৭: ১. ৯১২; ২. ৩৩; ৩. ৯২৯; ৪. তৃতীয় আবদুর রহমান; ৫. তৃতীয় আবদুর রহমান; ৬. ৯১২।

পাঠ-৮: ১. তৃতীয় আবদুর রহমানকে; ২. তৃতীয় আবদুর রহমান; ৩. তৃতীয় আবদুর রহমানের; ৪. তৃতীয় আবদুর রহমান; ৫. দ্বিতীয় হাকাম (৯৭৫ খ্রি.); ৬. কর্ডোভা।

পাঠ-৯: ১. ১০৩১; ২. ১৪৯২; ৩. ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দের পর; ৪. বনু নাসির (১২৩২-১৪৯২ খ্রি.); ৫. আরাগন; ৬. ক্যাস্টাইলের রানি ইসাবেলা।

পাঠ-১০: ১. ৭৮১ (৭১১-১৪৯২ খ্রি.); ২. কর্ডোভা; ৩. কর্ডোভায়; ৪. ইবনে রুশদ; ৫. স্পেনীয় মুরদের সময়; ৬. মুসলমানরা।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

আন্দালুসিয়া	মুসলিম শাসনামলে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের দেশ স্পেন আন্দালুসিয়া নামে পরিচিত ছিল। এটি আইবেরীয় উপদ্বীপে অবস্থিত। স্পেনের দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তে ভূমধ্যসাগর। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে পর্তুগাল এবং আটলান্টিক মহাসাগর। আর উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে পিরেনিজ পর্বতমালা এবং বিস্কে উপসাগর। এর প্রধান শহরে মধ্যে সেভিল, মালাগা, ইজিকা, জাইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর বর্তমান সাংবিধানিক নাম Kingdom of Spain। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজধানী ছিল টলেডো, মুসলিম শাসনামলে কর্ডোভা এবং বর্তমানে এর রাজধানী মাদ্রিদ।
জাবাল আত-তারিক	ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী জিব্রাল্টার প্রণালী 'জাবাল আত-তারিক' বা তারিকের পাহাড় নামে পরিচিত। প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলে স্পেন বিজয়ের জন্য পশ্চিম রণাঙ্গনের সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদকে পাঠানো হয়। তারিক স্পেনের উপকূলবর্তী এলাকা দিয়ে অর্থাৎ মূল পথ বাদ দিয়ে বিকল্প পথে স্পেনে উপস্থিত হন। তিনি জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনের পার্বত্য অঞ্চলে উপস্থিত হন। যুদ্ধ বা আশ্রয় নেওয়ার জন্য তিনি ঐ স্থানকে নিরাপদ মনে করায় আজও তা জাবাল আত-তারিক নামে পরিচিত।
কুরাইশদের বাজপাখি	প্রথম আবদুর রহমান আব্বাসি সেনাপতি আলা বিন মুগিসকে পরাজিত করে তার ছিন্ন মস্তক বাগদাদে পাঠিয়ে দেওয়ায় তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' উপাধি দেওয়া হয়। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটিয়ে আব্বাসি বংশ ক্ষমতা দখল করে। প্রথম আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ

কুরাইশদের বাজপাখি

উমাইয়াদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। তবে এ হত্যাযজ্ঞ থেকে আব্দুর রহমান নামে এক উমাইয়া যুবরাজ কৌশলে নিজেকে রক্ষা করেন। তিনি স্পেনে গিয়ে নিজ বংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আব্বাসি খলিফা মনসুর তাকে দমন করার জন্য আলা বিন মুগিসের নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান তাকে পরাজিত করে একটি চিঠিসহ তার ছিন্ন মস্তক আব্বাসি রাজধানী বাগদাদে পাঠান। তার এ সাহসিকতা ও কৃতিত্ব দেখে খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' উপাধি দেন।

ওয়াসাত

ওয়াসাত অর্থ মধ্যবর্তী। দ্বিতীয় আবদুর রহমান মুসলিম স্পেনের অপর দুইজন শাসক প্রথম আবদুর রহমান ও তৃতীয় আবদুর রহমানের মধ্যবর্তী সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন বিধায় তাকে ওয়াসাত বলা হয়। মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে আবদুর রহমান 'আদ-দাখিল' এবং 'খলিফা' উপাধি গ্রহণকারী তৃতীয় আবদুর রহমানের মধ্যবর্তী সময়ে দ্বিতীয় আবদুর রহমানের আবির্ভাব হয়েছে। আর এ মধ্যবর্তী সময়ে আবির্ভাবের কারণেই দ্বিতীয় আবদুর রহমানকে 'ওয়াসাত' বলা হয়।

জিলট মুভমেন্ট বা ধর্মান্ধ আন্দোলন

আমির দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনকালে (৮২২-৫২ খ্রি.) কর্ডোভার এক দল গোঁড়া খ্রিষ্টান যে বিদ্রোহ করেছিল তা 'ধর্মান্ধ আন্দোলন' নামে পরিচিত। স্পেনে মুসলিম শাসনামলে অনেক খ্রিষ্টান আরবদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাবধারায় মুগ্ধ হয়। তারা ইসলাম গ্রহণ না করেও আরবি ভাষা ও আরবদের রীতিনীতি অনুকরণ করে। এরা মোজারেব নামে পরিচিত। গোঁড়া খ্রিষ্টানরা তাদের ওপর ক্ষুব্ধ হয় এবং অধার্মিক বলে আখ্যা দেয়। তারা মহানবি (স) ও তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। তাদের বিদ্রোহকে শান্তিপূর্ণভাবে দমনের লক্ষ্যে আবদুর রহমান যাজকদের এক সভা আহ্বান করেন। খ্রিষ্টান নেতা গোমেজ চেষ্টা করেও ধর্মান্ধদের অপতৎপরতা বন্ধ করতে ব্যর্থ হন। বাধ্য হয়ে আবদুর রহমান বহু ধর্মান্ধ ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এক পর্যায়ে ধর্মান্ধদের নেতৃত্বদানকারী আইজাক, পারফেকটাস, ফ্লোরা ও মেরিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। দ্বিতীয় আবদুর রহমান এভাবে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আন্দোলনকে স্থিমিত করেন। পরবর্তী আমির প্রথম মুহাম্মদের শাসনামলে ইউলোজিয়াস ও আলভোরাসহ ৪৪ জন ধর্মান্ধ খ্রিষ্টান নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে ধীরে ধীরে এ আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে।

আজ-জোহরা প্রাসাদ

মুসলিম স্পেনের স্থাপত্যের ইতিহাসে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমানের অনন্য কীর্তি ছিল আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ। আবদুর রহমান তার প্রিয়তমা স্ত্রী আজ-জোহরার অনুরোধে তারই নামে এ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তৃতীয় আবদুর রহমান ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কর্ডোভার ৩ মাইল উত্তরে Hill of the Bride এর পাদদেশে আজ-জোহরা প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এ প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় হাকামের সময়। তিনি এ প্রাসাদ নির্মাণে প্রায় ৫০,০০,০০০ দিনার ব্যয় করেন এবং ১০,০০০ কারিগর, ওস্তাদ ও শ্রমিক নিযুক্ত করেন। মণি-মুক্তা খচিত স্তম্ভরাজি ও অপূর্ব নকশা সংবলিত কাঠের বীম, মার্বেল ও স্ফটিক পাথরে নির্মিত স্তম্ভের ওপর বৃত্তাকার গম্বুজ, চৌবাচ্চা, ঝরনা, গজদন্ত ও আবলুস কাঠের গবাক্ষ ছিল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। এ প্রাসাদের ফটকে সম্রাজ্ঞী আজ-জোহরার একটি ভাস্কর্য ছিল।

স্লাভ বাহিনী

স্লাভবাহিনী হলো তৃতীয় আবদুর রহমান গঠিত শক্তিশালী একটি সেনাবাহিনী। আবদুর রহমান আল নাসির বা তৃতীয় আবদুর রহমান তার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন এবং বৈদেশিক হামলা প্রতিহত করতে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি জার্মান, ফ্রাঙ্কিক, ইটালিয়া বংশোদ্ভূত এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বিদেশিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী স্লাভবাহিনী গঠন করেন। এ বাহিনী স্লাভবাহিনী নামে পরিচিত। তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত স্লাভবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন নজদ নামে একজন স্লাভ।

ইউরোপের বাতিঘর

কর্ডোভাকে 'ইউরোপের বাতিঘর' বলা হয়। উমাইয়া শাসনামলে স্পেনের রাজধানী এবং সার্বিক উন্নয়নের মূলকেন্দ্র ছিল কর্ডোভা নগরী। একে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এটি ছিল তৎকালীন ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত নগরী। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত রাজপ্রাসাদের খ্যাতি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্নানাগার, বিপণি, উদ্যান, দুর্গ, অট্টালিকা প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে এ নগরী সুসজ্জিত করা হয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা এখানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসত। ফলে জ্ঞানের আলো ওইসব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য কর্ডোভাকে 'ইউরোপের বাতিঘর' বলা হয়।

■ স্পেনে উমাইয়া শাসনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ

সময় (খ্রি.)	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
৭১১	খলিফা আল-ওয়ালিদের শাসনামলে সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদের স্পেন বিজয়ের মাধ্যমে ইউরোপে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
৭৩২	স্পেনের আমির আবদুর রহমান গাফেকি ও ফ্রান্সের রাজা চার্লস মার্টেলের মধ্যে টুরসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে গাফেকি পরাজিত হন এবং খ্রিষ্টানরা আবার মুসলমানদের উপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পায়।
৭৫৬	আব্বাসিদের হাতে ৭৫০ সালে উমাইয়াদের পতন ঘটলে আবদুর রহমান পালিয়ে গিয়ে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে তিনি স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হওয়ায় তাকে ‘কুরাইশদের বাজপাখি’ বলা হয়।
৭৭৮	ফ্রান্সের রাজা শার্লিমানের স্পেন আক্রমণ। তুমুল যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে শার্লিমানের পরাজয়।
৭৮৮	প্রথম আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর পুত্র হিশাম স্পেনের সিংহাসনে বসেন।
৭৯২	মুসলমানদের ফ্রান্স আক্রমণ এবং ফ্রান্সের বেশ কিছু অঞ্চল মুসলমানদের হস্তগত হয়।
৭৯৬	হিশামের মৃত্যু। পুত্র হাকামের ক্ষমতারোহণ, স্পেনে ফকিহদের বিদ্রোহ ও হিশাম কর্তৃক কঠোরহস্তে দমন।
৭৯৯	ফ্রান্সের সম্রাট শার্লিমেনের সাথে সংঘর্ষ হয়।
৮২২	প্রথম হাকামের মৃত্যু। পুত্র আবদুর রহমান আল-ওয়াসাত সিংহাসনে আরোহণ।
৮৫০	স্পেনে ধর্মান্ধ খ্রিষ্টানদের আন্দোলন। খ্রিষ্টানদের এ আন্দোলন ইতিহাসে ‘জিলট মুভমেন্ট’ বা ‘ধর্মান্ধ আন্দোলন’ নামে পরিচিত। আবদুর রহমান কঠোরহস্তে তাদের দমন করেন।
৮৬০	স্পেনের রাজনীতিতে ওমর ইবনে হাফসুনের উত্থান।
৯১২	তৃতীয় আবদুর রহমান স্পেনের সিংহাসনে বসেন।
৯১৪	ওরডোনা ও সাঙ্গোর সাথে যুদ্ধ।
৯১৭	ফাতেমিদের সাথে তৃতীয় আবদুর রহমানের সংঘর্ষ।
৯২৯	তৃতীয় আবদুর রহমান স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের স্থলে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। এতে করে মুসলিম বিশ্বে একই সাথে তিনটি খিলাফতের যাত্রা শুরু হয়।
৯৬১	তৃতীয় আবদুর রহমানের মৃত্যু, তার পুত্র দ্বিতীয় হাকাম ক্ষমতায় বসেন।
১০৩১	শাসকদের অযোগ্যতা, দুর্বলতা, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব, সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা ও ইউরোপীয় শক্তিগুলোর নানা তৎপরতায় স্পেনে উমাইয়া বংশের শাসনের অবসান ঘটে।
১৪৯২	কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা, অঞ্চলভিত্তিক শাসন, শাসকদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কারণে স্পেনের যুবরাজ ফার্ডিনান্ডের হাতে মুসলিম শাসনের চূড়ান্ত পতন ঘটে। ৭১১ সালে তারিক বিন জিয়াদের হাত ধরে স্পেনে যে গৌরবোজ্জ্বল শাসনের সূচনা ঘটেছিল ৭৮১ বছর পর তার চূড়ান্ত পতন ঘটে। এ সময় হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং বাকিদের স্পেন থেকে বিতাড়িত করা হয়।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের কারণ ও ঘটনা

প্রশ্ন-১. স্পেন কোন মহাদেশে অবস্থিত?
[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯; ঢা. বো. ২০১৭]
উত্তর: স্পেন ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত।

প্রশ্ন-২. স্পেন কোন উপদ্বীপে অবস্থিত?
উত্তর: স্পেন আইবেরীয় উপদ্বীপে অবস্থিত।

প্রশ্ন-৩. স্পেন ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী প্রণালির নাম কী?
[সকল বোর্ড ২০১৬]
উত্তর: স্পেন ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী প্রণালির নাম হল জিব্রাল্টার প্রণালি।

প্রশ্ন-৪. কার নামানুসারে জিব্রাল্টার বা তারিকের পাহাড় পরিচিত?
উত্তর: সেনাপতি তারিক-বিন-জিয়াদের নামানুসারে জিব্রাল্টার বা তারিকের পাহাড় পরিচিত।

প্রশ্ন-৫. জিব্রাল্টার প্রণালী কোন দুটি জলরাশিকে সংযুক্ত করেছে?
উত্তর: জিব্রাল্টার প্রণালী আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরকে সংযুক্ত করেছে।

প্রশ্ন-৬. মুসলমানরা কত খ্রিষ্টাব্দে স্পেন জয় করে?
উত্তর: মুসলমানরা ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেন জয় করে।

প্রশ্ন-৭. স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী?
[সকল বোর্ড ২০১৬]
উত্তর: স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম তারিক বিন জিয়াদ।

প্রশ্ন-৮. কোন খলিফার আমলে স্পেন বিজিত হয়?
উত্তর: উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সময়ে স্পেন বিজিত হয়।

প্রশ্ন-৯. মুসলমানদের স্পেন জয়ের সময় স্পেনের রাজা কে ছিলেন?
উত্তর: মুসলমানদের স্পেন জয়ের সময় স্পেনের রাজা ছিলেন রডারিক।

প্রশ্ন-১০. ঐতিহাসিকেরা কাকে 'ইসলামের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়েছেন?
উত্তর: ঐতিহাসিকেরা আল ওয়ালিদকে 'ইসলামের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়েছেন।

প্রশ্ন-১১. কোন শতাব্দী থেকে স্পেনে মুসলিম শাসন শুরু হয়?
উত্তর: অষ্টম শতাব্দী থেকে স্পেনে মুসলিম শাসন শুরু হয়।

প্রশ্ন-১২. মুসলিম আমলে স্পেনের নাম কী ছিল?
উত্তর: মুসলিম আমলে স্পেনের নাম ছিল আন্দালুসিয়া।

প্রশ্ন-১৩. মুসলিম শাসনামলে স্পেনের রাজধানীর নাম কী ছিল?
[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]
উত্তর: মুসলিম শাসনামলে স্পেনের রাজধানীর নাম ছিল কর্ডোভা।

■ স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠায় আবদুর রহমান আদ-দাখিলের অবদান

প্রশ্ন-১৪. স্পেনের স্বাধীন আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: স্পেনে স্বাধীন আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা আবদুর রহমান আদ-দাখিল।

প্রশ্ন-১৫. 'আদ-দাখিল' বলা হয় কাকে?
[রা. বো., দি. বো, কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো. ২০১৭]
উত্তর: স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠাকারী প্রথম আবদুর রহমানকে 'আদ-দাখিল' বলা হয়।

প্রশ্ন-১৬. টুরসের যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি কে ছিলেন?
উত্তর: টুরসের যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি ছিলেন আবদুর রহমান আল গাফেকি।

প্রশ্ন-১৭. মুসারার যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
উত্তর: মুসারার যুদ্ধ ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-১৮. কত খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-১৯. আবদুর রহমান আদ-দাখিল কে ছিলেন?
উত্তর: আবদুর রহমান আদ-দাখিল ছিলেন স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রশ্ন-২০. 'কুরাইশদের বাজপাখি' (The Falcon of the Quraysh) বলা হয়েছে কাকে? *[রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]*
উত্তর: প্রথম আবদুর রহমানকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' (The Falcon of the Quraysh) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন-২১. মুসলিম স্পেনের স্বর্ণযুগে কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণ করেন কে?
উত্তর: মুসলিম স্পেনের স্বর্ণযুগে কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণ করেন আবদুর রহমান আদ-দাখিল।

■ দ্বিতীয় আবদুর রহমানের আমলে স্পেনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ

প্রশ্ন-২২. ইতিহাসে 'আল-ওয়াসাত' বা মধ্যবর্তী নামে পরিচিত কে?
উত্তর: ইতিহাসে 'আল-ওয়াসাত' বা মধ্যবর্তী নামে পরিচিত প্রথম হাকামের পুত্র দ্বিতীয় আবদুর রহমান।

প্রশ্ন-২৩. ধর্মান্ধ আন্দোলন বা Zealot Movement দমন করেন কে?
উত্তর: আমির দ্বিতীয় আবদুর রহমান স্পেনের ধর্মান্ধ আন্দোলন বা Zealot Movement দমন করেন।

প্রশ্ন-২৪. ওমর বিন হাফসুন কে ছিলেন?

উত্তর: উমর বিন হাফসুন ছিলেন স্পেনের জাতীয়তাবাদী নেতা।

প্রশ্ন-২৫. সুলতানা তারুবা কে ছিলেন?

উত্তর: সুলতানা তারুবা ছিলেন স্পেনের মুসলিম শাসক দ্বিতীয় আবদুর রহমানের স্ত্রী।

প্রশ্ন-২৬. মুজারেব কারা? *[রা. বো., ব. বো., কু. বো., চ. বো. ২০১৮]*

উত্তর: আরব শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট স্পেনের খ্রিষ্টানদের মোজারেব বলা হয়।

■ স্পেনে উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তৃতীয় আবদুর রহমানের কৃতিত্ব

প্রশ্ন-২৭. মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে?

উত্তর: মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন তৃতীয় আবদুর রহমান।

প্রশ্ন-২৮. মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে 'Saviour of Spain' বলা হয় কাকে?

উত্তর: মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে 'Saviour of Spain' বলা হয় তৃতীয় আবদুর রহমানকে।

প্রশ্ন-২৯. অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপের বুকে কর্ডোভা নগরীকে বাতিঘরে পরিণত করেন কে?

উত্তর: তৃতীয় আবদুর রহমান অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপের বুকে কর্ডোভাকে বাতিঘরে পরিণত করেন।

প্রশ্ন-৩০. আজ-জোহরা কী?

উত্তর: আজ-জোহরা খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক স্পেনে নির্মিত একটি অনন্য প্রাসাদ।

প্রশ্ন-৩১. স্লাভবাহিনী গঠন করেন কে?

উত্তর: তৃতীয় আবদুর রহমান (আন নাসির) স্লাভবাহিনী গঠন করেন।

প্রশ্ন-৩২. তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজকবি কে ছিলেন?

উত্তর: তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজকবি ছিলেন ইবনে আব্বাস রাব্বিহ।

■ স্পেনে মুসলিম শাসনের পতন

প্রশ্ন-৩৩. কত খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে মুসলিম শাসনের পতন হয়?

উত্তর: ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে মুসলিম শাসনের পতন হয়।

প্রশ্ন-৩৪. কত খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র স্পেনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ বংশের উদ্ভব ঘটে?

উত্তর: ১৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র স্পেনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব ঘটে।

প্রশ্ন-৩৫. সেভিলের শাসক আর্থ আমর আবাদান আল মুজাহিদের হেরেমে কত জন ক্রীতদাসী ছিল?

উত্তর: সেভিলের শাসক আর্থ আমর আবাদন আল মুজাহিদের হেরেমে ৮০০ জন ক্রীতদাসী ছিল।

প্রশ্ন-৩৬. স্পেনীয় সংস্কৃতির পক্ষে জোর আন্দোলন গড়ে তুলেছিল কে?

উত্তর: স্পেনীয় সংস্কৃতির পক্ষে জোর আন্দোলন গড়ে তুলেছিল উমর বিন হাফসুন।

প্রশ্ন-৩৭. আরাগনের রাজা কে ছিলেন?

উত্তর: আরাগনের রাজা ছিলেন ফার্ডিনান্ড।

প্রশ্ন-৩৮. কত খ্রিষ্টাব্দে রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানি ইসাবেলার বিয়ে হয়?

উত্তর: রাজা ফার্ডিনান্ড ও রানি ইসাবেলার বিয়ে হয় ১৪৬৯ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন-৩৯. মুসলিম স্পেনের সর্বশেষ মুসলিম শাসক কে ছিলেন?

উত্তর: মুসলিম স্পেনের সর্বশেষ মুসলিম শাসক ছিলেন বনু নাসির বংশের বোয়াবদিল (আব্দুল্লাহ)।

প্রশ্ন-৪০. কত খ্রিষ্টাব্দে রাজা ফার্ডিন্যান্ডের কাছে গ্রানাডার হামারা প্রাসাদ হস্তান্তর করা হয়?

উত্তর: রাজা ফার্ডিনান্ডের কাছে গ্রানাডার হামারা প্রাসাদ হস্তান্তর করা হয় ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি।

■ স্পেনে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ

প্রশ্ন-৪১. কোন নগরীকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়?

উত্তর: কর্ডোভা নগরীকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

প্রশ্ন-৪২. আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের জনক কে ছিলেন?

উত্তর: আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের জনক ছিলেন ইবনে হায়সাম।

প্রশ্ন-৪৩. 'তারিখ ইফতিতা আল আন্দালুস'-এর রচয়িতা কে?

উত্তর: 'তারিখ ইফতিতা আল আন্দালুস'-এর রচয়িতা ইবন আল কুতিয়া।

প্রশ্ন-৪৪. মুসলিম শাসনের সর্বশেষ অধ্যায় কোন দুর্গ?

উত্তর: মুসলিম শাসনের সর্বশেষ অধ্যায় হলো সুরক্ষিত গ্রানাডা দুর্গ।

প্রশ্ন-৪৫. 'রাহ' কোন নদীর তীরবর্তী শহর?

উত্তর: 'রাহ' ফোরাত নদীর তীরবর্তী শহর।

প্রশ্ন-৪৬. স্পেন থেকে মুসলমানরা চূড়ান্তভাবে কত খিষ্টাব্দে বিতাড়িত হয়?

উত্তর: ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেন থেকে মুসলমানরা চূড়ান্তভাবে বিতাড়িত হয়।

প্রশ্ন-৪৭. দোলক ঘড়ি ও জলঘড়ি আবিষ্কার করে ইউরোপে ১ম মান মন্দির নির্মাণ করেন কারা?

উত্তর: দোলক ঘড়ি ও জলঘড়ি আবিষ্কার করে ইউরোপে ১ম মান মন্দির নির্মাণ করেন ম্যুররা।

প্রশ্ন-৪৮. স্পেনীয় আরব দার্শনিকদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিভাবান ছিলেন কে?

উত্তর: স্পেনীয় আরব দার্শনিকদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিভাবান ছিলেন ইবন-আল-আরাবি।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তর: মুসলিম বিজয়ের আগে স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বিশৃঙ্খল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়।

মুসলমানদের আগমনের আগে স্পেন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এসব রাজ্যের শাসনকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ বিদ্যমান ছিল। তখন স্পেনের রাজা ছিলেন গথিক বংশের খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী রডারিক। উচ্চাভিলাষী ও অত্যাচারী রডারিক ন্যায়সংগত রাজা উইটিজাকে পদচ্যুত ও হত্যা করে বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন। সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যগুলো নামেমাত্র তার বশ্যতা স্বীকার করে কর প্রদান করত। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকায় রাজনৈতিক দিক দিয়ে তারা ছিল অসংগঠিত।

প্রশ্ন-২. তারিক বিন জিয়াদ ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?

[রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো. ২০১৭]

উত্তর: মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত করে স্পেনে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

স্পেনের সিউটা দ্বীপের শাসক কাউন্ট জুলিয়ানের আমন্ত্রণ পেয়ে খলিফা আল ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার গভর্নর মুসা ইবনে নুসায়ের সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদকে স্পেনে পাঠান। তারিক ওয়দী লাক্কোর যুদ্ধে রাজা রডারিকের সম্মুখীন হন। সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের পর তারিক বিজয় লাভ করেন এবং রডারিক পরাজিত হয়ে নদীতে ডুবে প্রাণ হারান। তারিকের সুদক্ষ রণকৌশল আর সাহসী মনোভাবে স্পেন মুসলমানদের অধীনে আসে। এর ফলে স্পেন বিজয়ী বীর হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

প্রশ্ন-৩. চার্লস মার্টেল কে ছিলেন?

[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯]

উত্তর: চার্লস মার্টেল (Charles Martel) ছিলেন টুরসের যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের রাজা।

৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা চার্লস মার্টেল এবং স্পেনের উমাইয়া গভর্নর আবদুর রহমান আল গাফেকীর মধ্যে টুরসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফ্রান্সে মুসলিম শাসন বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ছিল এ যুদ্ধর অন্যতম কারণ। স্পেনের টুরস ও পয়টিয়ার্সের মধ্যে ক্লেন ও ভিয়েন-এর সংযোগস্থলে চার্লস মার্টেল বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ হয়।। চার্লস আহত মুসলমান সেনাদের হত্যা করে 'মারটেল হন্তা' উপাধি গ্রহণ করেন। এর ফলে ফ্রান্সসহ ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৪. টুরসের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: মুসলিম সৈন্যদের শৃঙ্খলাবোধের অভাবের কারণে টুরসের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয়।

৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা চার্লস মার্টেল (Charles Martel) এবং স্পেনের উমাইয়া গভর্নর আবদুর রহমান আল গাফেকির মধ্যে টুরসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফ্রান্সে মুসলিম শাসন বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ছিল এ যুদ্ধর অন্যতম কারণ। প্রথম দিকে কিছু খণ্ড যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদের অনুকূলে আসে। এসময় মুসলিম সেনাবাহিনীতে গোত্রীয় কলহ দেখা দেয়। আবদুর রহমান সেনাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফেরাতে ব্যর্থ হন। চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে বার্বার সেনারা নিজেদের কর্তব্য ভুলে গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) সংগ্রহে লিপ্ত হয়। যুদ্ধ পরিচলনা কালে আবদুর রহমান নিজেই নিহত হন। দলীয় কোন্দলের কারণে প্রতিনিধি নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়ে অবশিষ্ট মুসলিম সৈন্যরা স্পেনে ফিরে আসে।

প্রশ্ন-৫. কোনটিকে খ্রিষ্টানদের ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ বলা হয় এবং কেন?

উত্তর: ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি আবদুর রহমান আল গাফেকি ও ফ্রান্সের রাজা চার্লস মার্টেলের মধ্যে সংঘটিত টুরসের যুদ্ধকে খ্রিষ্টানদের ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ বলা হয়।

মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পর এটি কেন্দ্রীয় উমাইয়া প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এ সময় উমাইয়া গভর্নর জেনারেলের অধীনে স্পেনের আমির নিযুক্ত হতো। ৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের আমির হন আবদুর রহমান আল গাফেকি। তিনি সমগ্র ইউরোপে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। এতে খ্রিষ্টানদের সাথে তার বিরোধ সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে বর্ডোর রাজা ডিউক ইউডিসের সাথে তার শত্রুতা সৃষ্টি হলে তিনি ভীত হয়ে ফ্রান্সের রাজা চার্লস মার্টেলের সাহায্য কামনা করেন। ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর টুরস ও পয়টিয়ার্সের মধ্যে ক্লেন ও ভিয়েন সংযোগস্থলে মার্টেল বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে গাফেকি পরাজিত হন। এ যুদ্ধে জয়লাভ করে খ্রিষ্টানরা আবার মুসলমানদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।

প্রশ্ন-৬. আবদুর রহমান আদ-দাখিল কীভাবে ক্ষমতা দখল করেন?

উত্তর: আবদুর রহমান আদ-দাখিল অদম্য প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমে স্পেনের ক্ষমতা দখল করেন।

ভাগ্য বিড়ম্বিত আবদুর রহমান প্রথমে আশ্রয় লাভ করেন দক্ষিণ স্পেনে। তিনি জনগণকে নিজের প্রভাবাধীনে আনতে সক্ষম হন। মুসারার যুদ্ধে জয়লাভের পর ৭৫৬ সালের ৮ মার্চ তিনি আর্চিডোনার রাজধানী বিজিওতে প্রবেশ করেন। সেখানেই তাকে স্পেনের আমির বলে ঘোষণা করা হয় এবং তার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। ৭৫৬ সালের মাঝামাঝিতে তিনি স্পেনের দক্ষিণ জেলাগুলোতে বিনা রক্তপাতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আর এভাবেই স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৭. প্রথম আবদুর রহমানকে কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। */ঢাকা. বোর্ড ২০১৭; সকল বোর্ড ২০১৫/*

অথবা, কাকে কেন কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয়?

/ঢা.; দি.; সি.; য. বো. ২০১৮/

উত্তর: প্রথম আবদুর রহমান আব্বাসি সেনাপতি আলা বিন মুগিসকে পরাজিত করে তার ছিন্ন মস্তক বাগদাদে খলিফা আল মনসুরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ায় তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' উপাধি দেয়া হয়।

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটিয়ে আব্বাসি বংশ ক্ষমতা দখল করে। প্রথম আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ উমাইয়াদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। তবে এ হত্যাযজ্ঞ থেকে আব্দুর রহমান নামে এক উমাইয়া যুবরাজ কৌশলে নিজেকে রক্ষা করেন। তিনি স্পেনে গিয়ে নিজ বংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আব্বাসি খলিফা মনসুর তাকে দমন করার জন্য আলা বিন মুগিসের নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান তাকে পরাজিত করে একটি চিঠিসহ তার ছিন্ন মস্তক আব্বাসি রাজধানী বাগদাদে পাঠান। তার এ সাহসিকতা ও কৃতিত্ব দেখে খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' উপাধি দেন।

প্রশ্ন-৮. আবদুর রহমান আদ-দাখিল একজন শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন- এ কথাটি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা ও তার উৎকর্ষ সাধন করে আবদুর রহমান আদ-দাখিল শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

আবদুর রহমান সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তার সমগ্র রাজ্যকে ৬টি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি প্রদেশের শাসনভার গভর্নরের ওপর ন্যস্ত করেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসন ছিল আমিরের হাতে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী, ওয়াজির, হাযিব, খতিব, কাজি আল জামা, সাহিব আল শুরতা, কায়েদ প্রমুখ ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব। তিনি তার রাজ্যে সুষ্ঠু শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেনে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ও বিকাশ ঘটে। তিনি তার নিজ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং সামরিক দক্ষতা দিয়ে নিজেকে একজন শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন-৯. স্পেনের প্রথম আব্দুর রহমানকে কেন 'আদ-দাখিল' বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আব্বাসিদের কাছে ক্ষমতা হারিয়ে প্রথম আব্দুর রহমান তার অনুচর বদরকে নিয়ে অস্থায়ীভাবে উত্তর আফ্রিকায় বসবাস শুরু করেন। স্পেনে বসবাসরত সিরিয়ান জাতিভুক্ত তিন নেতার সমর্থন লাভ করে আব্দুর রহমান জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। সে সময় স্পেনের শাসক ইউসুফ আল ফিহরীর দুর্বলতার কথা জেনে আব্দুর রহমান কর্মীবাহিনী দলের সাথে ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মালাগার পূর্বে অবস্থিত আন্দালুসে অবতরণ করেন। সেখান থেকে আব্দুর রহমান সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভর করে ইউসুফ আল ফিহরীর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন এবং যুদ্ধে ইউসুফ পালিয়ে গেলে আব্দুর রহমান কর্ডোভা দখল করে স্পেনে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে জনসাধারণের কাছে 'আদ-দাখিল' বা নবাগত নামে পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন-১০. আমির আবদুর রহমানের রাজত্বকালকে স্পেনের শিল্পকলা ও স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন?

উত্তর: শিল্পকলা ও স্থাপত্য শিল্পে অনন্যসাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার কারণে আবদুর রহমানের রাজত্বকালকে স্পেনের শিল্পকলা ও স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

আমির আবদুর রহমান একজন প্রকৃতিপ্রেমী শাসক ছিলেন। তিনি তার প্রাসাদের চারপাশে মনোরম উদ্যান নির্মাণ করেন এবং নাগরিকদের সুবিধার জন্য একটি জলাধার নির্মাণ করেন। তিনিই বিশ্ববিখ্যাত কর্ডোভা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও অসংখ্য মসজিদ, হাম্মাম, দুর্গ, পুল নির্মাণ করে আবদুর রহমান মুসলিম ইতিহাসে এক অক্ষয় কীর্তিময় অধ্যায় সংযোজন করেছেন। এ কারণে তার রাজত্বকাল স্পেনের শিল্পকলা ও স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ নামে অভিহিত।

প্রশ্ন-১১. 'ধর্মান্ধ আন্দোলন' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আমীর দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনকালে (৮২২-৮৫২ খ্রি.) কর্ডোভার এক দল গোঁড়া খ্রিষ্টান যে বিদ্রোহ করেছিল তা 'ধর্মান্ধ আন্দোলন' নামে পরিচিত।

স্পেনে মুসলিম শাসনামলে অনেক খ্রিষ্টান আরবদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাবধারায় মুগ্ধ হয়। তারা ইসলাম গ্রহণ না করেও আরবি ভাষা ও আরবদের রীতিনীতি অনুকরণ করে। এরা মোজারেব নামে পরিচিত। গোঁড়া খ্রিষ্টানরা তাদের ওপর ক্ষুব্ধ হয় এবং অধার্মিক বলে আখ্যা দেয়। তারা মহানবি (স) ও তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। এছাড়া এই গোঁড়া খ্রিষ্টানরা আমীর দ্বিতীয় আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে স্পেনীয়দের উত্তেজিত করে তোলে। তাদের এসব কার্যক্রম ধর্মান্ধ আন্দোলন নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-১২. মোজারেব বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: স্পেনে মুসলিম শাসনামলে আরবীয় ভাবধারায় আকৃষ্ট ইউরোপীয় খ্রিষ্টানেরা মোজারেব নামে পরিচিত।

ইউরোপীয় শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দীনতায় একদল খ্রিষ্টান বিকাশমান আরবীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক দিয়ে ইসলামপন্থি না হলেও রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে আরবীয় হয়ে গিয়েছিল। আরবীয় ভাবধারা, রীতিনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুসরণকারী এ দলকে 'মোজারেব' বলা হতো।

প্রশ্ন-১৩. ধর্মান্ধ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: মুসলিম শাসন গ্রহণ করতে না পারা, দেশটির সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার ভয় প্রভৃতি কারণে ধর্মান্ধ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল।

স্পেনের উমাইয়া আমির দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনকালের শেষ দিকে কর্ডোভার একদল গোঁড়া ও ধর্মান্ধ খ্রিষ্টান ইসলাম ও আরবদের শিক্ষা ও কৃষ্টিতে আকৃষ্ট খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে যা ইতিহাসে ধর্মান্ত আন্দোলন নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের কারণ ছিল খ্রিষ্টানদের মনে প্রাণে মুসলিম শাসন গ্রহণ করতে না পারা। তবে ধর্মান্ধ আন্দোলনের প্রধান কারণ ছিল একদল খ্রিষ্টানের ইসলামি ভাবধারা ও ইসলামের অনুশাসনের প্রতি অত্যধিক আসক্তি। কেননা এর মাধ্যমে তাদের শত শত বছরের দেশীয় সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে বসে।

প্রশ্ন-১৪. দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকালকে 'অগাস্টান যুগ' বলা হয় কেন?

উত্তর: জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের জন্য দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকালকে অগাস্টান যুগ বলা হয়।

দ্বিতীয় হাকাম ছিলেন একজন জ্ঞানপিপাসু। তার পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক বিখ্যাত মনীষী বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি কর্ডোভার জামে মসজিদে বিভিন্ন কারুকাজ করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন এবং সুদৃশ্য মিহরাব নির্মাণ করেন। তিনি তার পিতার শুরু করা আজ-জোহরা প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও সংস্কৃতি উভয়ক্ষেত্রে অবদানের জন্য দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকালকে 'অগাস্টান যুগ' বলা হয়।

প্রশ্ন-১৫. দ্বিতীয় আবদুর রহমানের ওপর তার স্ত্রী সুলতানা তারুবা কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন?

উত্তর: দ্বিতীয় আবদুর রহমানের ওপর তার স্ত্রী সুলতানা তারুবা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

সুলতানা তারুবা ছিলেন পরমা সুন্দরী। তিনি ছিলেন একাধারে বিদুষী, সৌখিন, ষড়যন্ত্রকারী, চতুর ও উচ্চাভিলাষী। আবদুর রহমানের আরও তিনজন মদিনাবাসী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তারুবার প্রভাব ছিল সীমাহীন। তিনি সুলতানের সাথে রাজদরবারে উপস্থিত থেকে সুলতানকে রাজকার্যে সহযোগিতা করতেন এবং অন্যান্য দেশে উপঢৌকন পাঠানোর কাজটিও তিনি নিজেই করতেন। তার প্রভাব এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি শাহজাদা মুহাম্মদের স্থলে নিজের পুত্র আব্দুল্লাহকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্য ষড়যন্ত্র করেন।

প্রশ্ন-১৬. উমর বিন হাফসুনকে জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক বলা হয় কেন?

উত্তর: স্পেনীয় খ্রিষ্টানদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে তাদের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার কারণে উমর বিন হাফসুনকে জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক বলা হয়।

উমর বিন হাফসুন স্পেনের ইতিহাসে একজন প্রভাবশালী সংগঠক, সমরকুশলী ও আত্মপ্রত্যয়ী নেতার নাম। শুরুতে তিনি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শোষিত-বঞ্চিত মানুষের নেতা ছিলেন। কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণের পর তিনি জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে চিহ্নিত হন। খ্রিষ্টান স্পেনবাসীরা জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই তার দলে যোগদান করে এবং তার নেতৃত্বেই তাদের হারানো জাতীয় জীবন, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার সংগ্রামে অগ্রসর হয়। এ কারণেই উমর বিন হাফসুনকে জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক বলা হয়।

প্রশ্ন-১৭. জিরিয়াব কেন বিখ্যাত?

উত্তর: বহুমুখী প্রতিভার কারণে জিরিয়াব ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হলেন সংগীতজ্ঞ জিরিয়াব। বিভিন্ন ছন্দ ও সুরে তার এক হাজার সংগীত কণ্ঠস্থ ছিল। তার অপূর্ব মার্জিত রুচি ও উন্নত ব্যবহারিক জ্ঞানে স্পেনের ইতিহাসে এক চাঞ্চল্যকর অধ্যায় রচিত হয়। অঙ্গসজ্জা, রূপচর্চা, গৃহসজ্জা, বসন-ভূষণ, ভোজন ও আচারের অনুপম পরিবর্তন আনয়নে তার অবদানই ছিল সর্বাধিক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যে রীতি প্রবর্তন করতেন রুচিশীল জগৎ সেটাই গ্রহণ করত। স্পেনের বিভিন্ন মৌসুমে তিনি সময়োপযোগী বিভিন্ন আরামদায়ক পোশাক ব্যবহারের রীতি প্রচলন করেন। এসব কারণে তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রশ্ন-১৮. স্পেনের তৃতীয় আবদুর রহমান কেন খলিফা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: স্পেনে মুসলিম খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তৃতীয় আবদুর রহমান খলিফা উপাধি ধারণ করেন।

তৃতীয় আবদুর রহমানের সময়ে বাগদাদে আব্বাসি খিলাফত, মিসরে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ বিষয়টির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তৃতীয় আবদুর রহমান মনে করেন স্পেনেও স্থায়ীভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এজন্য তিনি নিজের নামে খুৎবা, স্বর্ণমুদ্রা ছাপিয়ে নিজেকে স্পেনের খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেন।

প্রশ্ন-১৯. স্পেনে কীভাবে স্বাধীন উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: তৃতীয় আব্দুর রহমানের স্বাধীনচেতা মনোভাব ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের পূর্ববর্তী শাসকেরা নিজেদেরকে আমির পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেও তৃতীয় আব্দুর রহমান নিজেকে একজন স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসক মনে করেন। তিনি ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র স্পেনে শান্তি-শৃঙ্খলা নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে নিজেকে একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এ লক্ষ্যে জুমার দিনে খুতবায় নিজের নাম উচ্চারণ, নিজের নামে স্বর্ণমুদ্রা জারি এবং আমিরুল মুমিনীন উপাধি গ্রহণ করেন। তার পরবর্তী শাসকেরা এই স্বাধীন উমাইয়া বংশকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করত সক্ষম হন।

প্রশ্ন-২০. Saviour of Spain কাকে বলা হয় এবং কেন?

উত্তর: তৃতীয় আবদুর রহমানকে Saviour of Spain বলা হয়।

মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে তৃতীয় আবদুর রহমান একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা গুণবান ও সুদক্ষ ছিলেন। তিনি স্পেনের উত্তরাঞ্চলের খ্রিষ্টান ও মিসরের ফাতেমিদের স্পেন জয়ের আশা ধূলিসাৎ করে দেন। এছাড়া তিনি উমর বিন হাফসুনের প্রবল বিদ্রোহ দমন করেন। এ সকল কারণে তৃতীয় আবদুর রহমানকে 'Saviour of Spain' বলা হয়।

প্রশ্ন-২১. স্লাভবাহিনী কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: স্লাভবাহিনী হলো আবদুর রহমান আন নাসির কর্তৃক গঠিত শক্তিশালী একটি সেনাবাহিনী।

আবদুর রহমান আল নাসির তার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন এবং বৈদেশিক হামলা প্রতিহত করতে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তার উপস্থিতি ও স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে সেনাবাহিনী উজ্জীবিত এবং শত্রুবাহিনী ভীত হয়। তিনি জার্মান, ফ্রাঙ্কিক ইটালিয়া বংশোদ্ভূত এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বিদেশিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী স্লাভবাহিনী গঠন করেন। তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত স্লাভবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন নজদ নামক একজন স্লাভ।

প্রশ্ন-২২. স্পেনে মুসলমানদের পতনের অভ্যন্তরীণ কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: স্পেনীয় মুসলমানদের পতনের অভ্যন্তরীণ কারণ অত্যন্ত প্রকট ছিল।

স্পেনীয় মুসলমানদের পতনের অভ্যন্তরীণ কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল উপজাতীয় কোন্দল। ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দের পর সমগ্র স্পেনে অসংখ্য ক্ষুদ্র বংশের উদ্ভব ঘটে। যাদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। ফলে স্পেনীয় মুসলমানদের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া শাসকদের দুর্বলতা, সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা, সুষ্ঠু উত্তরাধিকারী নীতির অভাবে রাজপ্রসাদে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পতনের পথকে প্রশস্ত করে। সর্বোপরি সুলতানদের বিলাসিতা, জ্ঞানীদের ও নিজেদের পারিতোষিক প্রদান ও স্থাপত্য শিল্পে অজস্র অর্থ ব্যয়ে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়লে স্পেনীয় মুসলমানদের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-২৩. স্পেনের মুসলিম শাসনের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: স্পেনের মুসলিম শাসনের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল খ্রিষ্টান রাজ্য ক্যাস্টাইল ও আরাগনার জোট গঠন।

স্পেন থেকে মুসলমানদের চিরতরে বিতাড়িত করার জন্য ক্যাস্টাইল ও আরাগনা রাজ্য জোট গঠন করে। ১৪৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাস্টাইলের রানি ইসাবেলার সাথে আরাগনের রাজা ফার্ডিন্যান্ডের বিবাহ ছিল স্পেনের মুসলিম শাসনের জন্য একটি অশনি সংকেত। তারা যৌথভাবে স্পেন আক্রমণ করে এবং ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি তারা গ্রানাডাতে প্রবেশ করে। তারা গ্রানাডা অবরোধ করে পানি ও রসদ বন্ধ করে দেয়। এরপর শর্তানুযায়ী সুলতান আবু আবদুল্লাহ খ্রিষ্টানদের কাছে গ্রানাডা হস্তান্তর করে আল হামরা ত্যাগ করে। এভাবেই স্পেনে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটে।

প্রশ্ন-২৪. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

উত্তর: কর্ডোভা মধ্যযুগে ইউরোপ মহাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে একে 'ইউরোপের বাতিঘর' বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের রাজধানী এবং সার্বিক উন্নয়নের মূলকেন্দ্র ছিল কর্ডোভা নগরী। একে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এটি ছিল তৎকালীন ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত নগরী। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত রাজপ্রাসাদের খ্যাতি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্নানাগার, বিপণি, উদ্যান, দুর্গ, অট্টালিকা প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে এ নগরী সুসজ্জিত করা হয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা এখানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসত। ফলে জ্ঞানের আলো ওইসব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য কর্ডোভাকে 'ইউরোপের বাতিঘর' বলা হয়।

প্রশ্ন-২৫. কর্ডোভা নগরীকে স্পেনের মুসলিম সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র বলা হয় কেন?

উত্তর: কর্ডোভা নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অনুপম হর্ম্যরাজি, অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ পুষ্পোদ্যান কর্ডোভাকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করে। এজন্য কর্ডোভা নগরীকে স্পেনের মুসলিম সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র বলা হয়।

অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত এ নগরী ছিল তৎকালীন যুগের জগৎমণি। চব্বিশ মাইল দীর্ঘ এবং ছয় মাইল প্রস্থ কর্ডোভায় দশ লক্ষ লোকের বসবাস। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্নানাগার, বিপনি, উদ্যান, দুর্গ, প্রাসাদ, দ্বারা আলোকিত এ কর্ডোভা নগরীকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হতো। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো। কর্ডোভা নগরীর এ শিক্ষা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাই কর্ডোভা নগরীকে স্পেনের মুসলিম সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র বলা হয়।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্পেন কোন মহাদেশে অবস্থিত?
ক. ইউরোপ খ. এশিয়া
গ. আমেরিকা ঘ. আফ্রিকা

২. মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের সময় মুসলিম বিশ্বের খলিফা কে ছিলেন?
ক. ওমর (রা)
খ. মুয়াবিয়া
গ. আল ওয়ালিদ
ঘ. আবদুল মালিক

৩. মুসলমানরা কত খ্রিষ্টাব্দে স্পেন বিজয় করে?
ক. ৭১০ খ. ৭১১
গ. ৭১২ ঘ. ৭১৩

৪. মুসলমানরা স্পেন জয়ের সময় স্পেনের শাসক কে ছিল?
ক. জুলিয়ান খ. রডারিক
গ. অচিলা ঘ. উইটিজা

৫. রাজা রডারিক কোন বংশের লোক ছিলেন?
ক. ভ্যানডালস খ. নরম্যান
গ. ভিসি গথিক ঘ. ভাইকিং

৬. কাউন্ট জুলিয়ান কে ছিলেন?
ক. উইটিজারের জামাতা
খ. উইটিজারের ভ্রাতা
গ. উইটিজারের পুত্র
ঘ. উইটিজারের ভগ্নিপতি

৭. স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত কে প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. প্রথম আবদুর রহমান
খ. প্রথম হিশাম
গ. প্রথম ইয়াজিদ
ঘ. তৃতীয় আবদুর রহমান

৮. আবদুর রহমান আদ-দাখিল ইতিহাসে কী নামে পরিচিতি লাভ করেছেন?
ক. আল আওসাত
খ. আল আসওয়াত
গ. আরবের বাজপাখি
ঘ. স্পেনের সিংহ

৯. টুরসের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
ক. ৭৩০ খ. ৭৩১
গ. ৭৩২ ঘ. ৭৩৩

১০. মুসারার যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
ক. ৭৫৫ খ. ৭৫৬
গ. ৭৫৭ ঘ. ৭৬০

১১. কর্ডোভা মসজিদ কে নির্মাণ করেন?
ক. আবদুর রহমান আর গাফেকি
খ. আবদুর রহমান আদ-দাখিল
গ. আবদুর রহমান আল আওসাদ
ঘ. তৃতীয় আবদুর রহমান

১২. 'আল ওয়াসাত' উপাধি ছিল কার?
ক. প্রথম আবদুর রহমান
খ. দ্বিতীয় আবদুর রহমান
গ. তৃতীয় আবদুর রহমান
ঘ. প্রথম হাকামের

১৩. ধর্মান্ধ আন্দোলন বলতে কী বোঝ?
ক. সামাজিক সংস্কার আন্দোলন
খ. আরবীয়করণের বিরুদ্ধে আন্দোলন
গ. ইসলামবিরোধী আন্দোলন
ঘ. অর্থনৈতিক আন্দোলন

১৪. স্পেনের নবমুসলমানদের কী বলা হয়?
ক. খারেজি খ. হাম্বলি
গ. মোজারেব ঘ. মাওয়ালি

১৫. স্পেনের জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক কে ছিলেন?
ক. আবদুর রহমান আল ওয়াসাত
খ. আবদুর রহমান আদ দাখিল
গ. উমর বিন হাফসুন
ঘ. আমির আব্দুল্লাহ

১৬. কাকে 'Saviour of Spain' বলা হয়?
ক. প্রথম আবদুর রহমানকে
খ. তারিক বিন জিয়াদকে
গ. দ্বিতীয় আবদুর রহমানকে
ঘ. তৃতীয় আবদুর রহমানকে

১৭. স্লাভ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?
ক. ইউসুফ খ. নজদ
গ. মুসা ঘ. হাফসুন

১৮. শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কর্ডোভাকে কী বলা হতো?
ক. Iron of the world
খ. Gold of the world
গ. Jewel of the world
ঘ. Diamond of the world

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৯. মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ফলে—
i. সামাজিক বৈষম্য দূর হয়
ii. সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধিত হয়
iii. সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. তৃতীয় আবদুর রহমান স্পেনের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন— এর যথার্থ কারণ হলো—
i. কর্ডোভা সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল
ii. আন্দালুসিয়ায় উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল
iii. প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত হয়েছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ে ২১ ও ২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভাগ্য বিপর্যয়ে পড়ে মুঘল সম্রাট বাবর ফারগানা থেকে বিতাড়িত হন। এরপর তিনি নিজস্ব লোকদের সহযোগিতা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাই তিনি সম্রাট উপাধি ধারণ করেন।

২১. সম্রাট বাবরের সাথে স্পেনের কোন শাসকের মিল রয়েছে?
ক. প্রথম আব্দুর রহমান খ. হাকাম
গ. মুনজির ঘ. তৃতীয় আব্দুর রহমান

২২. উক্ত শাসকের সাথে উদ্দীপকের শাসকের মিল পরিলক্ষিত হয়—
i. উপাধি গ্রহণে
ii. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়
iii. শাসন পরিচালনায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৩ ও ২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
তানজুম তার বাবার সাথে সমরখন্দ বেড়াতে গিয়ে সেখানে 'বিবি কাইয়ুম' মসজিদের স্থাপত্যিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়। তৈমুর লঙ তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ এ স্থাপত্যটি নির্মাণ করেন।

২৩. উদ্দীপকে বর্ণিত সমরখন্দের স্থাপত্য কীর্তির সাথে স্পেনের কোন স্থাপত্য কীর্তির সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. আল হামরা প্রাসাদ
খ. দার আল মূলক
গ. মদিনাতুল জাহিরা
ঘ. আজ জোহরা প্রাসাদ

২৪. উদ্দীপকে বর্ণিত স্থাপত্য কীর্তির সাথে স্পেনের ওই স্থাপত্য কীর্তির সাদৃশ্য হলো—
i. নামকরণে
ii. ব্যবহারে
iii. নির্মাণ উদ্দেশ্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫. যে সংকীর্ণ জলরাশি দুটি বৃহৎ জলরাশিকে সংযুক্ত করে এবং দুটি ভূমিকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে বলে— *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. উপদ্বীপ খ. প্রণালি
গ. হ্রদ ঘ. অন্তরীপ

২৬. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজধানীর নাম কী ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
ক. টলেডো খ. কর্ডোভা
গ. সিউটা ঘ. গ্রানাডা

২৭. মুসা বিন নুসাইর নিচের কোন অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. উত্তর আফ্রিকা খ. মধ্য আফ্রিকা
গ. দক্ষিণ আফ্রিকা ঘ. দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা

২৮. স্পেন বিজয় করেন কে? *[সকল বোর্ড ২০১৬, ২০১৫]*
ক. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খ. তারিক বিন জিয়াদ
গ. কুতাইবা বিন মুসলিম ঘ. মুহাম্মদ বিন কাসিম

২৯. মুসলিম স্পেনের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক. টলেডো খ. কর্ডোভা
গ. গ্রানাডা ঘ. মাদ্রিদ

৩০. স্পেনে ফকিহ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল— *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. ক্ষমতা দখল খ. ধর্মের বিশুদ্ধতা
গ. উমাইয়াদের বিতাড়ন ঘ. স্পেনীয়দের স্বার্থ রক্ষা

৩১. কত খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
ক. ৭৫০ খ. ৯০৯
গ. ৯২৯ ঘ. ১০৩১

৩২. তৃতীয় আবদুর রহমান 'আজ জোহরা' প্রাসাদ নির্মাণ করেন কেন? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
ক. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খ. আরাম-আয়েশের জন্য
গ. স্ত্রীর অনুরোধে ঘ. নিরাপত্তার প্রয়োজনে

৩৩. কর্ডোভাকে 'ইউরোপের বাতিঘর' বলা হয় কেন? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

ক. জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য
খ. অবস্থানের কারণে
গ. বাণিজ্যপথের জন্য
ঘ. অর্থনৈতিক কারণে

৩৪. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়— *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

i. ইউরোপ গমনের দিকনির্দেশনা এখানে ছিল বলে
ii. এখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপকে আলোকিত করেছিল বলে
iii. শহরটি আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রবিউল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাহস দেখে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে বলেন, 'বিশাল জলরাশি শত্রুর হাত থেকে আমার সিংহাসন রক্ষা করেছে।' *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

৩৫. উদ্দীপকের রবিউলের সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন শাসকের মিল রয়েছে?

ক. আবদুর রহমান আদ দাখিল
খ. তৃতীয় আবদুর রহমান
গ. আব্দুল্লাহ
ঘ. আবু জাফর আল মনসুর

৩৬. উদ্দীপকের রবিউলের প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শাসকের নাম কী?

ক. আবদুর রহমান আল গাফেকি
খ. ইউসুফ আল ফিহরী
গ. আবদুর রহমান আদ দাখিল
ঘ. ওমর বিন হাফসুন

উদ্দীপকটি পড়ে ৩৭ ও ৩৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব কলিম উদ্দিন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর গ্রামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য একটি সাহিত্য ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। ক্লাবে কবি, সাহিত্যিক ও গায়কদের ডেকে সমাদর করতেন। ক্লাবে নিয়মিত সাহিত্য চর্চা হত। *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

৩৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব কলিম উদ্দিনের সাথে স্পেনের কোন আমিরের কর্মকাণ্ডের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

ক. ১ম আবদুর রহমান
খ. ২য় আবদুর রহমান
গ. আবদুর রহমান আল গাফেকি
ঘ. ওমর বিন হাফসুন

৩৮. উক্ত আমিরের শাসনকাল ছিল—

i. শান্তিপূর্ণ
ii. সমৃদ্ধ
iii. আড়ম্বরপূর্ণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	খ	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	ক	৮	গ	৯	গ	১০	খ	১১	খ	১২	খ
১৩	গ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	ঘ	২১	ক	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	খ
২৫	খ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	খ	২৯	খ	৩০	খ	৩১	গ	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	ঘ	৩৬	গ
৩৭	ক	৩৮	ঘ																				

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো।

২. ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি কী কারণে মুসলমানদের স্পেন বিজয়কে 'মধ্যযুগীয় সমর ইতিহাসে এক অপূর্ব স্থান দখলকারী ঘটনা' বলেছেন?

৩. মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের আগে স্পেনের ধর্মীয় অবস্থা কেমন ছিল?

৪. মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের সামাজিক ফলাফল সংক্ষেপে লেখো।

৫. মুসলমানদের সহজে স্পেন বিজয়ের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

৬. টুরসের যুদ্ধের গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখো।

৭. কী কারণে মুসলমানরা টুরসের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল?

৮. ধর্মান্ধ আন্দোলনের কারণ ব্যাখ্যা করো।

৯. স্থাপত্য শিল্পে তৃতীয় আবদুর রহমানের অবদান ব্যাখ্যা করো।

১০. ইউরোপে জ্ঞানের আলো প্রসারে কর্ডোভা নগরীর ভূমিকা কীরূপ ছিল?

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মুসলমানদের বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় সমাজ ছিল বহুধাবিভক্ত। শ্রেণিভেদ প্রথা এ অঞ্চলের জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। রাজনৈতিকভাবেও এ অঞ্চলটি ছিল বিশৃঙ্খল। এ অঞ্চলটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। শাসকদের মধ্যে কোনো একতা ছিল না। সমাজে শূদ্রদের কোনো অধিকার ছিল না। আর গীতা পাঠের ক্ষেত্রেও শূদ্ররা বৈষম্যের শিকার হতো। তারা নির্দিষ্ট কিছু কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ করতে পারত না। এ অবস্থায় মুসলমানদের সাম্যের বাণী নিম্ন শ্রেণির ভারতীয়দের খুব সহজেই আকর্ষণ করে। এছাড়া সিন্ধুর রাজা দাহিরের কুশাসন ভারতে মুসলিম অভিযানের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ক. 'আদ-দাখিল' শব্দের অর্থ কী?
খ. আবদুর রহমান আদ-দাখিল কীভাবে ক্ষমতা দখল করেন?
গ. উদ্দীপকের সাথে মুসলমানদের আক্রমণের প্রাক্কালের স্পেনীয় সমাজের মিল ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অনুরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিই স্পেনে মুসলিম অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছিল— বক্তব্যটির পক্ষে যুক্তি দাও।

২. ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইয়ের শাসনামলে ফ্রান্সের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় স্বৈরাচারী মনোভাব বিরাজ করছিল। নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও ছায়া হিসেবেই মনে করতেন তিনি। তবে সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিরাজ করছিল দ্বন্দ্ব-সংঘাত। ফ্রান্সের সমাজেও নেমে এসেছিল নৈরাজ্যের ছাপ। সুবিধাভোগী শ্রেণি সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের অধিকার কেড়ে নিত। ফ্রান্সের সমাজে তখন ভূমিদাসদের করুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তাদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হতো। আর এ রকম পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিবর্গ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলে ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতন ত্বরান্বিত করেন। এভাবে তারা প্রতিষ্ঠা করেন ফরাসি প্রজাতন্ত্রের দীপশিখা।

ক. স্পেন ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী প্রণালির নাম কী?
খ. টুরসের যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি কীরূপ ছিল?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ফ্রান্সের সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে উক্ত অঞ্চলের মুসলমানদের বিজয়ের ঘটনা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

৩. আজমপুরের খান বংশের ব্যবসায়ী দাউদ খান তালুকদার বংশের হান্নান সাহেবের কাছে এক সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে জমিদারি হারান। বিজয়ী হান্নান সাহেব খান বংশের লোকদের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালান। তার অত্যাচার থেকে কোনোক্রমে রেহাই পেয়ে খান বংশের সন্তান কবির মাহমুদ মাতুলালয়ে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে ভাগ্যান্বেষণে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজনগরে স্বাধীন জামদারি প্রতিষ্ঠা করেন।

/ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৮/

ক. স্পেন কোন মহাদেশে অবস্থিত?
খ. চার্লস মার্টেল কে ছিলেন?
গ. উদ্দীপকের কবির মাহমুদের সাথে স্পেনের কোন উমাইয়া শাসকের মিল রয়েছে? আলোচনা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো।

৪. জনাব ফজলুল হক বাদশাহ আলীনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ফলে এলাকার কৃষি কাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি সরকারিভাবে বিভিন্ন ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলেন। ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতই উন্নত হয় যে, ব্যবসায়ীরা গভীর রাতে টাকা-পয়সা নিয়ে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে যাতায়াত করতে পারত। তিনি ভিক্ষাবৃত্তিও উচ্ছেদ করেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের জন্য তিনি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করেন। */রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৭/*

ক. আদ দাখিল বলা হয় কাকে?
খ. তারিক বিন জিয়াদ ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে উক্ত চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন শাসকের কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত শাসকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করা— মূল্যায়ন করো।

৫. রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে যুবরাজ আলাল রাজ্যহারা হন। বাস্তুচ্যুত যুবরাজ প্রায় অর্ধযুগ ধরে আশ্রয়ের সন্ধানে পথে-প্রান্তরে ঘুরতে থাকেন। অবশেষে বহু প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এ যুবরাজ দূরবর্তী অঞ্চলে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় লাভ করে। অতঃপর রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগ নিয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যে আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নেন এবং নিজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

/ঢা. বো. ২০১৭/

ক. স্পেন কোন মহাদেশে অবস্থিত?
খ. প্রথম আবদুর রহমানকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিহিংসার স্বরূপ প্রথম আবদুর রহমানের ক্ষেত্রে কীরূপ ছিল? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের যুবরাজ আলালের রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে প্রথম আবদুর রহমানের আমিরাত প্রতিষ্ঠার একটি তুলনামূলক বিবরণ দাও।

৬. চাগতাই বংশের শাসক শাহরুখ দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা জ্ঞানচর্চা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তিনি একজন প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন। তিনি তার প্রাসাদের চারপাশে মনোরম উদ্যান নির্মাণ করেন। শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে তিনি শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে ভূমিকা রাখে। এছাড়া তার নির্মিত 'গওহর শাদ মসজিদ' স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আর নানা-জঁমকালো অট্টালিকা নির্মাণ করে তিনি হিরাকে তৎকালীন যুগের অন্যতম আশ্চর্য নগর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সহজ-সরল ও শান্তিপ্রিয় এ শাসক দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন এবং মদপান থেকে বিরত থাকতেন।

ক. চার্লস মার্টেল কোন দেশের রাজা ছিলেন?
খ. মুসলমানদের বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনীয় সমাজের অবস্থা কীরূপ ছিল?
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে আবদুর রহমান আদ-দাখিলের কর্মকাণ্ডের মিল ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে উক্ত শাসকের চারিত্রিক গুণাবলি বিশ্লেষণ করো।

৭. ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরশাহ শুর বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমতারোহণ করেই তিনি একটি সুষ্ঠু প্রশাসনব্যবস্থা গঠন করার লক্ষ্যে সমগ্র সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে বিভক্ত করেন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে সড়ক-ই-আজম বা 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' নির্মাণ করেছিলেন। তার নির্মিত কিল্লা-ই-কুনহ মসজিদ ও সাসারামে তার সমাধি তার স্থাপত্য কীর্তিরই অন্যতম নিদর্শন। এছাড়া তিনি রাজস্ব সংস্কারে পাট্টা ও কবুলিয়ত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন এবং আশরাফি নামে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠিত এ বংশের শাসন বেশিদিন টেকেনি।

ক. 'জিলট' শব্দের অর্থ কী?
খ. মোজারেব বলতে কী বোঝায়?
গ. শেরশাহের কাজের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের আংশিক মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'উদ্দীপকের শাসকের কর্মকাণ্ড উক্ত শাসকের কর্মকাণ্ডের অনেকটাই বিপরীত— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৮. বাবর পিতৃরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে অসহায় অবস্থায় বিভিন্ন দেশে পালিয়ে বেড়ান। কখনও তিনি বনে-জঙ্গলে কখনও পর্বতে আশ্রয় নেন। এক পর্যায়ে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে তিনি অতি সহজেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার পরবর্তী শাসকদের সময় স্থাপত্য শিল্পে বেশ উৎকর্ষ সাধিত হয়। মুঘল আমলে বিখ্যাত স্থাপত্য কীর্তি হলো– তাজমহল, দিল্লি জামে মসজিদ, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই খাস ইত্যাদি।

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান হয়?
খ. তারিক বিন জিয়াদ ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?
গ. বাবরের সাথে স্পেনের কোন উমাইয়া শাসকের মিল পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. মুঘলদের মতো উক্ত শাসকের পরবর্তী শাসকেরা স্থাপত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন— বিশ্লেষণ করো।

৯. কারা জর্জ নামের একজন দেশপ্রেমিকই ১৮০৪ সালে সার্বিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন। অটোমান সুলতানদের শাসনের নাগপাশ থেকে সার্বিয়াকে মুক্ত করতেই তিনি গুপ্ত সমিতি ও গেরিলা দল গঠন করেন। এতে অটোমান শাসক তৃতীয় সেলিম ও দ্বিতীয় মাহমুদের সাথে কারা জর্জের সংঘর্ষ বাধে। তবে প্রাথমিকভাবে তিনি সফল না হলেও পরবর্তী সার্ব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরও বেগবান হতে থাকে। আর এ জাতীয়তাবাদী চেতনাই খ্রিষ্টান সার্বদের একই পতাকার নিচে এনে দিয়েছিল। তবে অটোমান শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন তীব্রতর হয় তখন ১৮১৭ সালে রাশিয়ার সহযোগিতায় সার্বিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। আর এভাবে কারা জর্জ অধিষ্ঠিত হন সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে।

ক. আজ জোহরা কে ছিলেন?
খ. আবদুর রহমান আদ-দাখিলের চারিত্রিক গুণাবলি কীরূপ ছিল?
গ. উদ্দীপকের নেতার সাথে কোন স্পেনীয় জাতীয়তাবাদী নেতার কর্মকাণ্ডের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের কারা জর্জের আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে উক্ত নেতার কর্মকাণ্ডের সাথে বৈসাদৃশ্যময়— মতামত দাও।

১০. ইরানের সাফাভি রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক শাহ তাহমাপস সিংহাসনে আরোহণ করেই কিজিলবাস সম্প্রদায়, উজবেক জনগোষ্ঠী ও বাগদাদের কালাহোর গোত্রের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। তবে এ শাসক সফলতার সাথে এ সব বিদ্রোহ দমন করেন। শুধু অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি বরং তুর্কিদের পরাজিত করে তিনি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন এবং তুর্কিদের সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। তিনি সামরিক, প্রশাসনিক, বিচার, শিল্প ও সাহিত্য এবং জনকল্যাণে অসামান্য অবদান রাখেন। তার রাজত্বকালে কোনো ধর্মবিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়নি। তবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি তা প্রতিরোধে ব্যর্থ হন।

ক. স্পেনে স্বাধীন আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা কে?
খ. শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় আবদুর রহমান আদ-দাখিল কীরূপ অবদান রাখেন?
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের রাজত্বকালের ঘটনাবলির আংশিক মিল বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের শাসকের শাসনব্যবস্থার অনেক ঘটনাই উক্ত শাসকের রাজত্বকালের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ— মতামত দাও।

১১. মিসরের প্রথম মামলুক শাসক ছিলেন মালিক আস সালিহ। তিনি ছিলেন প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনে বেশি মনোযোগী ছিলেন। তবে তিনি বিদ্রোহীদের দমনে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তার অপরূপা সুন্দরী স্ত্রী সাজার-উদ-দার ছিলেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতি এবং উচ্চাভিলাষী। তিনি স্বামীকে রাজ্য পরিচালনায় পরামর্শ দিতেন। মালিক আস সালিহ স্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতেন। এর ফলে আমির-উমরাহদের ওপর সাজার-উদ-দারের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তিনি নিজের সৌন্দর্য, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে স্বামীর ওপর যথেষ্ট প্রভাব খাটান। সাজার-উদ-দার তার প্রজ্ঞা, কর্মকুশলতার জন্য মিসরের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ক. ইতিহাসে দ্বিতীয় আবদুর রহমানের উপাধি কী ছিল?
খ. কর্ডোভাকে স্পেনের মুসলিম সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্র বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকের মালিক আস্ সালিহর চরিত্রের কোন দিকটি দ্বিতীয় আবদুর রহমানর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের সজার-উদ-দার এর সাথে সুলতানা তারুব এর কর্মকাণ্ডের একটি তুলনামূলক আলোচনা করো।

১২. ভারতের মুঘল সম্রাট আকবরের রাজদরবারে বহু জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ ঘটেছিল। তাদেরকে নবরত্ন বলা হতো। আবুল ফজল, তানসেন, বীরবল, রাজা টোডরমল প্রমুখ এদের অন্যতম ছিলেন। আবুল ফজল ছিলেন সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ, তানসেন সংগীতের মূর্ছনায় সম্রাটকে বিমোহিত করতেন, বীরবল সম্রাটকে গল্প শোনাতেন এবং টোডরমল সম্রাটকে রাজস্ব বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে তাদের অবদান ও প্রভাব ছিল অপরিসীম।

ক. উমর-বিন-হাফসুন কে ছিলেন?
খ. স্লাভবাহিনী কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. সম্রাট আকবরের মতো স্পেনের কোন মুসলিম শাসক বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত শাসকের সুনাম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধিতে রাজদরবারের ব্যক্তিদের ভূমিকা মূল্যায়ন করো।

১৩. ২০১৫ সালের অক্টোবরের দিকে জার্মানিতে শুরু হয়েছিল পেগিডা আন্দোলন (Pegida Movement)। মূলত জার্মানির সর্বত্র মুসলিমদের আধিপত্যে ভীত হয়ে এ আন্দোলনের সূচনা করে জার্মানির কিছু খ্রিস্টান ও ইহুদি নেতা। পরবর্তীকালে ফ্রান্স, ইতালি ও ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও এ আন্দোলনের প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিমবিদ্বেষী নানা স্লোগান ও পোস্টার দিয়ে সুশোভিত হয়ে খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মীয় নেতারা মিছিল, মিটিং ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তবে জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের কঠোর পদক্ষেপের কারণে এ উগ্রপন্থিদের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

ক. উমর বিন হাফসুন কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
খ. কীভাবে উমর বিন হাফসুনের উত্থান ঘটে?
গ. উদ্দীপকের সাথে মুসলমানদের স্পেন শাসনামলের কোন ঘটনার মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের মতো উক্ত আন্দোলন দমনেও একজন শাসক বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন- বিশ্লেষণ করো।

১৪. ১৯৬০ এর দশকে নাইজারে জাতীয়তাবাদী নেতা হামানি দোরই এর নেতৃত্বেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়। নাইজারবাসীকে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে জোরদার করেন। হামানি মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে বারবার ফরাসি ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। দীর্ঘ কয়েক বছর সংগ্রামের পর এ নেতার নেতৃত্বেই ১৯৬০ সালের ৩ আগস্ট স্বাধীনতা অর্জন করে নাইজারবাসী। বিশ্বের মানচিত্রে সূচিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম নাইজারের। আর তাই নাইজারবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে জাতীয়তাবাদী অগ্রনায়ক ও স্বাধীনতাকামী জ্যোর্তিময় নেতা হামানি দোরইকে।

ক. 'আল ওয়াসাত' শব্দের অর্থ কী?
খ. জিলট মুভমেন্টের কারণগুলো ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন নেতার কর্মকাণ্ডের আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের নেতা সফল হলেও উক্ত নেতা সফল হননি— বিশ্লেষণ করো।

১৫. শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যান্ড ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো অর্থনৈতিকভাবে অনেক সমৃদ্ধ দেশ। শিক্ষাদীক্ষায়ও আজ তারা অনেক অগ্রগামী। এমন একটা সময় ছিল যখন তারা ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করত না। বর্তমানে সেখানে বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে সারাবিশ্ব থেকে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে মেধাবী শিক্ষার্থী, গবেষকরা এসে জ্ঞানচর্চা করেন। *[রা. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৯]*

ক. কুরাইশদের বাজপাখি কাকে বলা হয়?
খ. দারুল হিকমাহ কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের সাথে স্পেনের তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনকালের কোনো মিল আছে কি? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভার অবস্থান মূল্যায়ন করো।

১৬. সুলতান রুকনউদ্দিন বাইবার্স ছিলেন মিশরের মামলুক বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। ক্ষমতারোহণ করেই তিনি মোঙ্গল ও ক্রুসেডারদের আক্রমণের শিকার হন। তবে তিনি এ সকল আক্রমণ সফলতার সাথে প্রতিহত করেন। তিনি আর্মেনিয়া, সিমিলিয়া সুদান ও এশিয়ার মাইনরের সেলজুক তুর্কিদের বিদ্রোহ দমন করেন। তার সময়ে কনস্টান্টিনোপল, সিসিলি, আরাগন ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি খিলাফতের পুনঃপ্রবর্তন করেন। এমনকি কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি বিধান, সামরিক শাসনের সংস্কার, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে মামলুক ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা করেন।

ক. স্পেনীয় মুসলমানদের পতন ঘটে কত খ্রিষ্টাব্দে?

খ. স্পেনে মুসলমানদের পতনের অভ্যন্তরীণ কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তৃতীয় আবদুর রহমানের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত বক্তব্যের আলোকে উক্ত শাসকের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করো।

১৭. মিসরের মামলুক সুলতান আল নাসির একজন খ্যাতিমান শাসক ছিলেন। তিনি তার রাজধানী কায়রোতে প্রাসাদ, মসজিদ, স্নানাগার, ফোয়ারা, স্কুল ও মাদ্রাসা নির্মাণ করে এটিকে একটি অনিন্দ্য সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। ৫০ কোটি দিরহাম ব্যয়ে কাসর আল আবলাক নামক প্রাসাদ নির্মাণ করে তিনি শিল্পমনের পরিচয় দেন। তার ৪৮ বছরের রাজত্বকালে মিসর শান্তি, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যে ভরপুর হয়ে ওঠে। মিসরের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে পারস্য, কনস্টান্টিনোপল, ফ্রান্স ও ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ আল নাসিরের দরবারের দূত প্রেরণ করে কূটনৈতিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন।

ক. টুরসের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?

খ. স্পেনের তৃতীয় আবদুর রহমান খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন কেন?

গ. উদ্দীপকে মামলুক সুলতান আল নাসিরের সাথে স্পেনের কোন উমাইয়া খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সুলতান নাসিরের কায়রো নগরীর মতো উক্ত শাসকও তার রাজধানীকে অনিন্দ্য সুন্দর করে গড়ে তুলেছিলেন— বিশ্লেষণ করো।

১৮. উমাইয়া বংশের শাসনামলে দামেস্ক বিশ্বের অন্যতম জাঁকজমকপূর্ণ নগরীতে পরিণত হয়েছিল। এ নগরীতে নির্মিত হয়েছিল সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও অট্টালিকা। উমাইয়া শাসকেরা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। উমর বিন আবি রাবিয়া ছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন সাইদ বিন মিসজাহ। এ সময় বিজ্ঞানের চর্চায়ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। ইমাম সাদিক রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যার বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করে খ্যাতি অর্জন করেন। শিক্ষার প্রসারে এ আমলের শাসকেরা অনেক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।

ক. মাসারার যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?

খ. আবদুর রহমান আদ-দাখিল বিদ্রোহ দমনে কীরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে স্পেনে মুসলিম শাসনামলের শিল্প-সংস্কৃতি বিকাশের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির নিরিখে শিক্ষার প্রসারে উক্ত আমলের শাসকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

১৯. একটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করে সাজিদ মহাসংকটে পড়েন হন। বয়সে নবীন হলেও এ কিশোর দূরদর্শী শাসক সব বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে দেশকে শক্তিশালী ও সুসংহত করেন। তার দক্ষ পরিচালনায় দেশ কৃষি, শিল্প, সাহিত্যসহ সব ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। তার রাজধানী ছিল তিলোত্তমা নগরী। তিনি রাজধানীতে তার স্ত্রী জিনাতের নামে 'জিনাত প্রাসাদ' নির্মাণ করেন। একে বলা হতো যুগের বিস্ময়। তার নির্মিত প্রাসাদ, গৃহ, অট্টালিকা, উদ্যান, প্রস্রবণ প্রভৃতির সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ করত। *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]*

ক. মুসলিম শাসনামলে স্পেনের রাজধানীর নাম কী ছিল?

খ. কাকে, কেন 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত 'জিনাত প্রাসাদের' সাথে স্পেনে তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক নির্মিত কোন প্রাসাদের সামাঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত তিলোত্তমা নগরীর আলোকে কর্ডোভা নগরীর সমৃদ্ধি মূল্যায়ন করো।

২০. জমিদার রাহাত লস্করের পূর্বপুরুষদের একসময় উপকূলব্যাপী জমিদারি ছিল। কিন্তু উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা, প্রজা অসন্তোষ, পারিবারিক অসন্তোষ ও কলহ প্রভৃতি কারণে তা ছোট হতে হতে একসময় একটি গ্রামকেন্দ্রিক জমিদারিতে পরিণত হয়। তবে রাহাত লস্কর জমিদার হয়ে ব্যতিক্রমী একটি লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করে শত্রুকে কঠোর হাতে দমন এবং মিত্রকে আলিঙ্গান করার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে পূর্বপুরুষদের সমস্ত এলাকাই পুনরুদ্ধার করেন। তিনি নিজেকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।
[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]

ক. মুজারিব কারা?

খ. ইসলামের ইতিহাসে কর্ডোভা এত বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের রাহাত লস্করের সাথে স্পেনের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত শাসকের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২১. আব্বাসি শাসনামলে বাগদাদ ছিল বিশ্বের মূল শিক্ষাকেন্দ্র। বাগদাদ নগরীর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য ছিল রূপকথার মতো। এ সময় বাগদাদ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার অনন্য স্থানে পরিণত হয়। আব্বাসি খলিফাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় এক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়। এসময় সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ সাধন হয় কর্ডোভা নগরীতে।

ক. তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনকাল লেখো।

খ. জিরিয়াব ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?

গ. বাগদাদ নগরীর সাথে স্পেনের কোন নগরীর সাদৃশ্য রয়েছে?

ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে স্পেনের উমাইয়া শাসকগণ কি আব্বাসিদের মতো উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২২. আব্বাসি খিলাফতে হিমারীয়-মুদারীয়, পারসিক, তুর্কি, সেমেটিক ও বার্বারদের মধ্যে জাতিগত বিভেদ ও গোত্রকলহ এ সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে। অনিয়ন্ত্রিত উত্তরাধিকার নীতি এ পতনকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। খলিফা আল মামুনের পরবর্তী দুর্বল ও অযোগ্য খলিফাদের ভোগ-বিলাসিতা এ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীণ বাজিয়েছিল। এছাড়া কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অচল অবস্থা, রাজকোষের শূন্যতা আব্বাসিদের পতনকে তরান্বিত করেছিল। অবশেষে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হালাকু খানের আক্রমণে বাগদাদ ধ্বংসের মাধ্যমে আব্বাসি বংশের দীপশিখা চিরতরে নিভে যায়। ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৬*

ক. আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের জনক কে?

খ. শিক্ষার প্রসারে স্পেনীয় মুর শাসকেরা কীরূপ অবদান রাখেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে স্পেনীয় মুসলিম শাসকদের পতনের অভ্যন্তরীণ কারণের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে উক্ত বংশের পতনের বহিঃকারণগুলো বিশ্লেষণ করো।

২৩. বাংলাদেশ থেকে মামুন রিয়াল মাদ্রিদের খেলা দেখতে স্পেনে গিয়েছিল। ওখানে গিয়ে সে জানতে পারে স্পেন একসময় মুসলমানদের অধীনে ছিল। উমাইয়া বংশের এক বিখ্যাত খলিফার শাসনামলে স্পেন মুসলমানদের অধিকারে আসে। শুধু স্পেন নয় ভারতে মুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকারও ঐ বিখ্যাত খলিফার আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন মহাদেশ বিজয়ী এ অসাধারণ বিজেতা শাসকের কথা প্রথমবারের মতো মামুন জানতে পারে। ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৬*

ক. কোন খলিফার সময়ে মুসলমানরা স্পেন জয় করে?

খ. আবদুল মালিককে 'রাজেন্দ্র' বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে কোন বিখ্যাত খলিফার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত খলিফার মতো প্রথম আবদুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— বিশ্লেষণ করো।

২৪. আফগানদের পরাজিত করে মুঘলরা ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলে শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। পুরাতন অভিজাতদের স্থলে নতুন অভিজাত শ্রেণি সৃষ্টি হয়। রাজধানী পরিবর্তিত হয়, ফার্সি ভাষার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এমনকি জাতীয় ও দৈনন্দিন জীবনে মুঘলদের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। শাসক বংশের পরিবর্তনে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে প্রভাব পড়ে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৬*

ক. Saviour of Spain বলা হয় কাকে?

খ. আবু মুসলিম ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?

গ. উদ্দীপকের ঘটনাবলির সাথে আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ঘটনার সাদৃশ্য দেখাও।

ঘ. শাসক বংশের পরিবর্তনে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়ে— স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

২৫. প্রখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ তার 'ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না' গ্রন্থে তার গ্রামের তিন শ্রেণির মানুষের কথা বলেছেন। এক শ্রেণির মানুষ ধনী। তারা কোনো কাজ করে না। কিন্তু সবাই তাদেরকে তোষামোদ করে চলে। আরেক শ্রেণির মানুষ বেশি ধনী নয়; তারাই মাঠে কাজ করে, ধান বোনে। কিন্তু তারা সব সময় ধনী মানুষের পেছনে পেছনে হাঁটে। আর সর্বশেষ শ্রেণিটি হলো গরিব; যারা সারাদিন কাজ করে। তাদের কেউ সালাম দেয় না; তারাই সবাইকে সালাম দেয়। ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৬*

ক. তারিক বিন জিয়াদ কত খ্রিষ্টাব্দে স্পেন বিজয় করেন?

খ. খলিফা মামুন বায়তুল হিকমা নির্মাণ করেছিলেন কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সমাজব্যবস্থা ও আব্বাসি শাসনামলের সমাজব্যবস্থার মধ্যে বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকটি মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি— বিশ্লেষণ করো।

৭

উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত

Fatimid Khilafat in North Africa

ফাতেমি শাসনামলের কায়রো শহর

প্রধান প্রধান শব্দ

- ফাতেমি
- ফাতেমি আন্দোলন
- দাঈ
- সাবিয়া
- ইছনা আশারিয়া
- আল-কাহিরা
- আল-আজহার
- দারাজি
- দারুল হিকমা

উত্তর আফ্রিকায় আগলাবি বংশের ধ্বংসস্তূপের ওপর উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন, যা ফাতেমি খিলাফত নামে পরিচিত। আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা শিয়া সম্প্রদায়ের প্রথম ও প্রধান রাজনৈতিক সাফল্যের পরিচয় বহন করে। ফাতেমি খিলাফতের শ্রেষ্ঠ খলিফা আল-মুইজের রাজত্বকাল থেকে এ খিলাফতের স্বর্ণযুগের শুভ সূচনা হয় এবং আল-আজিজের সময় তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। আল-মুইজের মিসর বিজয় এবং কাহিরা (কায়রো) নগরীর গোড়াপত্তন এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ফাতেমি খিলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়, যা তৎকালীন বিশ্বে বিরল। আল-আজহার মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং দারুল হিকমা (বিজ্ঞানভবন) এ সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪ জন শাসক এ খিলাফত পরিচালনা করেন। তবে দুর্বল ও অযোগ্য খলিফা এবং স্বার্থান্ধ ও কুচক্রী মন্ত্রীদের কুশাসনের ফলে খিলাফতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং এর পতনকে ত্বরান্বিত করে। অবশেষে ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবির কাছে ফাতেমি বংশের শেষ খলিফা আল-আজিদের পরাজয় ঘটে। এরই মধ্য দিয়ে ফাতেমি বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় আইয়ুবি বংশের শাসন।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- ফাতেমিদের পরিচয় ও উত্থান
- উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি
- ফাতেমি খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আল-মুইজের অবদান
- মিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে আল-আজিজ ও আল-হাকিমের অবদান
- ফাতেমিদের পতনের কারণ
- উত্তর আফ্রিকায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	ফাতেমিদের পরিচয় এবং উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ধাপ
পাঠ ২	ফাতেমি আন্দোলন এবং উত্তর আফ্রিকায় তাদের খিলাফত প্রতিষ্ঠা (৯০৯ খ্রি.)
পাঠ ৩	উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর পরিচয় ও কার্যাবলি (৯০৯-৯৩৪ খ্রি.)
পাঠ ৪	খলিফা আল-মুইজ: ক্ষমতা গ্রহণ, প্রাথমিক সমস্যা ও গৃহীত পদক্ষেপ (৯৫২-৯৭৫ খ্রি.)
পাঠ ৫	আল-মুইজের কৃতিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
পাঠ ৬	খলিফা আল-আজিজের ক্ষমতা গ্রহণ ও কার্যাবলি (৯৭৫-৯৯৬ খ্রি.)
পাঠ ৭	খলিফা আল-আজিজের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ৮	খলিফা আল-হাকিম (৯৯৬-১০২১ খ্রি.)
পাঠ ৯	ফাতেমি খিলাফতের পতন (১১৭১ খ্রি.)
পাঠ ১০	ফাতেমিদের সময় উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ

পাঠ ১

ফাতেমিদের পরিচয় এবং উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ধাপ [Introduction to the Fatimid and the Initial Phase of Establishment of Fatimid Khilafat in North Africa]

ফাতেমিদের পরিচয়

হযরত আলি (রা) এবং বিবি ফাতিমার বংশধরগণ ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত। উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত শিয়া খিলাফতের খলিফারা 'ফাতেমি' নামে একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে। তাদের এরূপ নামকরণের কারণ এ বংশের খলিফারা নিজেদের ইসলামের চতুর্থ খলিফা ও মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জামাতা হযরত আলি (রা) এবং তার স্ত্রী বিবি ফাতেমা (রা)-এর বংশধর হিসেবে দাবি করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর রাজনৈতিক উত্তরসূরি বা খলিফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজ শিয়া ও সুন্নি এ দু'টি মতাদর্শগত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের মধ্যে একটি দল খিলাফতে মহানবি (স)-এর পিতৃব্য ও জামাতা হযরত আলি (রা)-এর বৈধ অধিকারের দাবি করেন। তাৎক্ষণিকভাবে হযরত আলি (রা)-এর কাছ থেকে এ ব্যাপারে সমর্থন পায়নি। তারা হযরত আলি (রা) খুলাফায়ে রাশেদিনের চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হওয়ায় তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়। এভাবে খিলাফতে হযরত আলি (রা)-এর দাবির সমর্থনে মুসলমানদের মধ্যে যে দলের উদ্ভব ঘটে ইতিহাসে তারা 'আলাবি' বা 'শিয়াতু আলি' (আলির দল) সংক্ষেপে 'শিয়া' নামে পরিচিত।

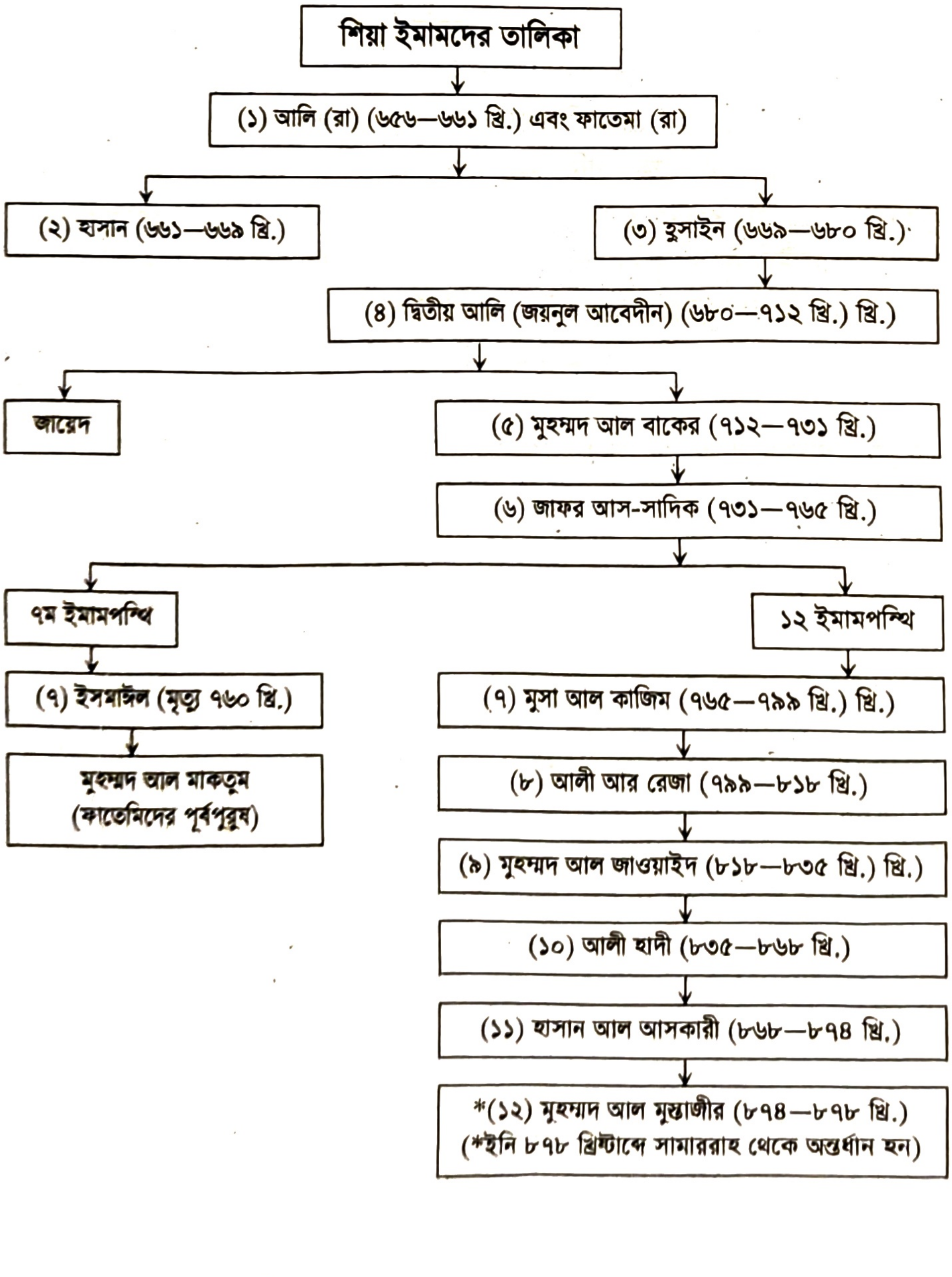
শিয়া ইমামদের তালিকা
(১) আলি (রা) (৬৫৬—৬৬১ খ্রি.) এবং ফাতেমা (রা)
(২) হাসান (৬৬১—৬৬৯ খ্রি.)
(৩) হুসাইন (৬৬৯—৬৮০ খ্রি.)
(৪) দ্বিতীয় আলি (জয়নুল আবেদীন) (৬৮০—৭১২ খ্রি.) খ্রি.)
জায়েদ
(৫) মুহম্মদ আল বাকের (৭১২—৭৩১ খ্রি.)
(৬) জাফর আস-সাদিক (৭৩১—৭৬৫ খ্রি.)
৭ম ইমামপন্থি
১২ ইমামপন্থি
(৭) ইসমাঈল (মৃত্যু ৭৬০ খ্রি.)
মুহম্মদ আল মাকতুম (ফাতেমিদের পূর্বপুরুষ)
(৭) মুসা আল কাজিম (৭৬৫—৭৯৯ খ্রি.) খ্রি.)
(৮) আলী আর রেজা (৭৯৯—৮১৮ খ্রি.)
(৯) মুহম্মদ আল জাওয়াইদ (৮১৮—৮৩৫ খ্রি.) খ্রি.)
(১০) আলী হাদী (৮৩৫—৮৬৮ খ্রি.)
(১১) হাসান আল আসকারী (৮৬৮—৮৭৪ খ্রি.)
*(১২) মুহম্মাদ আল মুন্তাজীর (৮৭৪—৮৭৮ খ্রি.)
(*ইনি ৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সামাররাহ থেকে অন্তর্ধান হন)

খলিফা হযরত আলি (রা)-এর সময়েই শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে ইমামত ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আদর্শগত মতপার্থক্যের কারণে শিয়া সম্প্রদায় নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব দল-উপদলের মধ্যে প্রধান দু'টি উপদল হলো: ১. ইছনা আশারিয়া বা দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী শিয়া দল। ২. ইসমাঈলীয় বা সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী শিয়া দল।

শিয়া ইমামদের তালিকায় উল্লেখিত ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস-সাদিক পর্যন্ত ইমামদের বিষয়ে শিয়াদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কিন্তু সাদিকের পরবর্তী ইমামকে কেন্দ্র করে শিয়ারা দ্বাদশ ও সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী— এ দুটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, ইমাম জাফর আস-সাদিক তার জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাঈলকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর আগে ইসমাঈল মারা যান। তখন জাফর আস-সাদিক তার অপর পুত্র মুসা আল-কাজিমকে ইমাম মনোনীত করেন। কিন্তু ইসমাঈলের অনুসারীরা মুসাকে সপ্তম ইমাম হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা ইসমাঈলকে সপ্তম ইমাম এবং তার পুত্র মুহাম্মদ আল-মাকতুমকে তার উত্তরসূরি বলে দাবি করেন। তারা এটাও প্রচার করেন যে, ইসমাঈলের পর থেকে জাহেরি বা প্রকাশ্য ইমামতের ইতি ঘটেছে এবং মুহাম্মদ আল-মাকতুমের মধ্য দিয়ে বাতেনি বা গোপন ইমামত যুগের সূচনা হয়েছে। শিয়াদের এ দলটিই ইতিহাসে ইসমাঈলীয় বা সাবিয়া (সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী) বলে পরিচিত। শিয়াদের এ ইসমাঈলীয় উপদলটিই উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের সুন্নি আব্বাসিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উত্তর আফ্রিকায় একটি শিয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে। এরা নিজেদের নবিকন্যা হযরত ফাতেমা (রা)-এর বংশধর হিসেবে দাবি করায় তাদের প্রতিষ্ঠিত খিলাফতটি ইতিহাসে 'ফাতেমি খিলাফত' নামে সুপরিচিতি লাভ করে। ইবনে খালদুন, ইবনুল আমির, মাকরিজি, আবুল ফিদা, পি.কে. হিট্টি ও এইচ মেমরের মতে, উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ফাতেমি বংশোদ্ভূত। অন্যদিকে, আল-সুয়ুতি, ইবনে তাগরিবারদি, ইবনে ইজহারি প্রমুখ উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকে ইহুদির সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন।

ফাতেমিদের শাসিত এলাকা পরিচিতি: ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উত্তর আফ্রিকায়। তখনকার আরবদের কাছে এ এলাকাটি 'মাগরিব' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান তিউনিসিয়া থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার ভূ-ভাগকে আবার আরবরা 'মাগরিব-উল-আকসা' (দূর প্রতীচ্য) এবং লিবিয়া ও আলজেরীয় অঞ্চলকে 'মাগরিব-উল-আওসাত' (নিকট প্রতীচ্য) বলে অভিহিত করত। বার্বার জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায় একে অনেক সময় বার্বার দেশও বলা হতো। তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়া অঞ্চলকে অনেক সময় 'মারকিশ' নামেও ডাকা হতো। এ অঞ্চল এক সময় 'ইফ্রিকিয়া' নামে পরিচিত ছিল এবং এর রাজধানী ছিল 'কায়রোয়ান'। ল্যাটিন ভাষায় ব্যাপক উচ্চারণ বিকৃতি হয়ে ইফ্রিকিয়া নামটি আফ্রিকা নামে পরিচিতি লাভ করেছে বলে ধারণা করা হয়। ফাতেমিদের শাসিত উত্তর আফ্রিকা বর্তমানে মিসর, আলজেরিয়া, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সুদান ও পশ্চিম সাহারা প্রভৃতি আধুনিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত আলি (রা) এবং বিবি ফাতিমার বংশধরগণ ইতিহাসে কী নামে পরিচিত?
২. 'ফাতেমি' খিলাফত কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
৩. কোনটিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজ শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে?
৪. কার সময়ে শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে? */সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৮; ২০১৭/*
৫. সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী শিয়া দলকে কী বলা হয়?
৬. আরবদের কাছে উত্তর আফ্রিকা কী নামে পরিচিত ছিল?

উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ছক আকারে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক ঘটনা উল্লেখ করো।

পাঠ ২

ফাতেমি আন্দোলন এবং উত্তর আফ্রিকায় তাদের খিলাফত প্রতিষ্ঠা (৯০৯ খ্রি.)
Fatimid Movement and the Establishment of their Khilafat in North Africa

হযরত আলি (রা)-এর জীবনকালেই শিয়া মতের উত্থান ঘটে। তবে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের কারবালা প্রান্তরে আলিপুত্র হুসাইনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর শিয়া বা ফাতেমি আন্দোলন নতুন গতি পায়। শিয়ারা রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী না হলেও আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয়ভাবে সমাজে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে শিয়া আন্দোলন রাজনৈতিক রূপলাভ করে এবং আব্বাসি খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠার জোর আন্দোলন চালাতে থাকে। ঐতিহাসিক ও'লিয়ারি (O'Leary) বলেন, "ইসলামি বিশ্বে আব্বাসি খলিফাদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রতিবাদস্বরূপ ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ইফ্রিকিয়াতে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"[১]

ফাতেমি আন্দোলন

নবম শতাব্দীতে ফাতেমি আন্দোলন নতুন গতি পায়। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে মায়মুন নামে পারস্য দেশীয় একজন প্রচারক ও সংগঠক পারস্যের আহওয়াজ ও সিরিয়ার সালামিয়াতে ফাতেমিদের প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন। এখান থেকে আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাঈ বা শিয়া মতাদর্শ প্রচারক পাঠানো হয়। আবদুল্লাহর সুসংগঠিত তৎপরতা ও দাঈদের কর্মনিষ্ঠার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফাতেমি বা ইসমাঈলীয় শিয়া মতবাদ ইয়েমেন, বাহরাইন, ইয়ামামা, সিন্ধু, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তারলাভ করে। তবে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনের আগে ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল্লাহ ইবনে মায়মুন মৃত্যুবরণ করেন। এ অবস্থায় তার প্রধান শিষ্য আবু আবদুল্লাহ আল-হুমায়ন ফাতেমি মতবাদ প্রচারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইয়ামেনের সানার অধিবাসী। ইতিহাসে তিনি 'আশ-শিয়ী' বা সর্বোত্তম শিয়া নামে অধিক পরিচিত। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী ছিলেন একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সংগঠক, প্রচারক ও সেনানায়ক। ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে একটি হজ কাফেলার সাথে তিনি উত্তর আফ্রিকায় যান। তিনি তার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক মাহাত্ম্য দিয়ে সেখানকার কাতামা গোত্রের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। তার সুযোগ্য পরিচালনা ও সুদক্ষ প্রচারকার্যে মুগ্ধ হয়ে কাতামা গোত্রের বার্বাররা ইসমাঈলীয় মতবাদের প্রতি দারুণভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে ইফ্রিকিয়াতে ফাতেমিদের শক্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ সময় উত্তর আফ্রিকা আগলাবি শাসনাধীনে ছিল। আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী এ বংশের শাসক জিয়াদতউল্লাহর (৯০৩-৯০৯ খ্রি.) কুশাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট বার্বারদের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারে নানাভাবে চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে তিনি জনসাধারণের কাছে ইমাম মাহদীর আগমনের প্রচারণা শুরু করেন। তিনি নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলেও প্রচার করেন। উল্লেখ্য, নিষ্ঠাবান মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবী যখন পাপাচার ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তখন পথভ্রষ্ট মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন এবং অত্যাচার-অবিচারের হাত থেকে রক্ষার জন্য ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে। দুর্দশাগ্রস্ত ইফ্রিকীয়দের কাছে ইমাম মাহদীর আগমন তত্ত্ব প্রচার করে আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী তাদের মোহমুগ্ধ করে ফেলেন। কাতামা গোত্রপতি হাসান বিন হারুন আশ-শিয়ীর প্রধান সমর্থকে পরিণত হন। এদিকে আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তিতে আতঙ্কিত হয়ে জিয়াদতউল্লাহ তার প্রচার কাজে বাধা দিলে শিয়ী অনুসারীদের নিয়ে তার সাথে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। তিনি মাজানা, সাস ও মেরিদা জয় করেন। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মার্চ অনুষ্ঠিত এক চূড়ান্ত যুদ্ধে শিয়ীর কাছে পরাজিত হয়ে জিয়াদতউল্লাহ প্রথমে ত্রিপোলি এবং পরে রাক্কাদায় পালিয়ে যান। পরে রামেলাতে তার মৃত্যু হয়। জিয়াদতউল্লাহর অনুপস্থিতিতে আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী আগলাবিদের রাজধানী রাক্কাদা দখল করে নেন।

উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা

অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার পর আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী তার ভাই আল-আব্বাসের মাধ্যমে রাজক্ষমতা গ্রহণের জন্য তদানীন্তন ফাতেমি ইমাম সাঈদ বিন আল-হুসায়নকে উত্তর আফ্রিকায় যাওয়ার জন্য সংবাদ পাঠান। তবে আব্বাসি খলিফা আল-মুকতাফি তার গুপ্তচরের মাধ্যমে সাঈদের উত্তর আফ্রিকায় যাওয়ার সংবাদ জেনে যান। খলিফার নির্দেশে সিজিলমাসার শাসনকর্তা সাঈদ ও তার সফরসঙ্গীদের গ্রেপ্তার করে সেখানেই বন্দি করে রাখা হয়। আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী সিজিলমাসায়

---

[১] Ref: O'leary de lacky, *History of the Fatimid Khilafat*

আক্রমণ করে তাদের মুক্ত করেন। ইমাম সাঈদ অনুচরবর্গসহ আগলাবি রাজধানী রাক্কাদায় পৌছান। আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী সাঈদ বিন হুসায়নকে সেখানে স্বাগত জানান এবং লোকসমাজে তাকে প্রথমে মাহদী হিসেবে পরিচয় করান। পরে তিনি তাকে 'উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী' উপাধি দিয়ে খলিফা ঘোষণা করেন। ইসমাঈলীয় ফাতেমি শিয়াদের প্রতি অনুরক্ত কাতামা গোত্রসহ উত্তর আফ্রিকার বার্বার জনগোষ্ঠী তাকে খলিফা হিসেবে বরণ করে নেয় এবং তার কাছে বায়াত আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। এভাবে সুদীর্ঘ দু'শতাব্দীরও অধিক সময়ের প্রচেষ্টার ফলে উত্তর আফ্রিকায় প্রথম শিয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে এ খিলাফতটি ফাতেমি খিলাফত নামে পরিচিতি লাভ করে। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীর সাংগঠনিক তৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত এ খিলাফতটি ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুন্নি আব্বাসি এবং স্পেনের সুন্নি উমাইয়া খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুসলিম বিশ্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শাসন করে। এ বংশের মোট খলিফা ছিলেন ১৪ জন। ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে গাজি সালাউদ্দিন আইয়ুবির নেতৃত্বে তুর্কি রাজশক্তির কাছে এদের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

ফাতেমি খলিফাদের বংশ তালিকা
(৯০৯-১১৭১ খ্রি.)

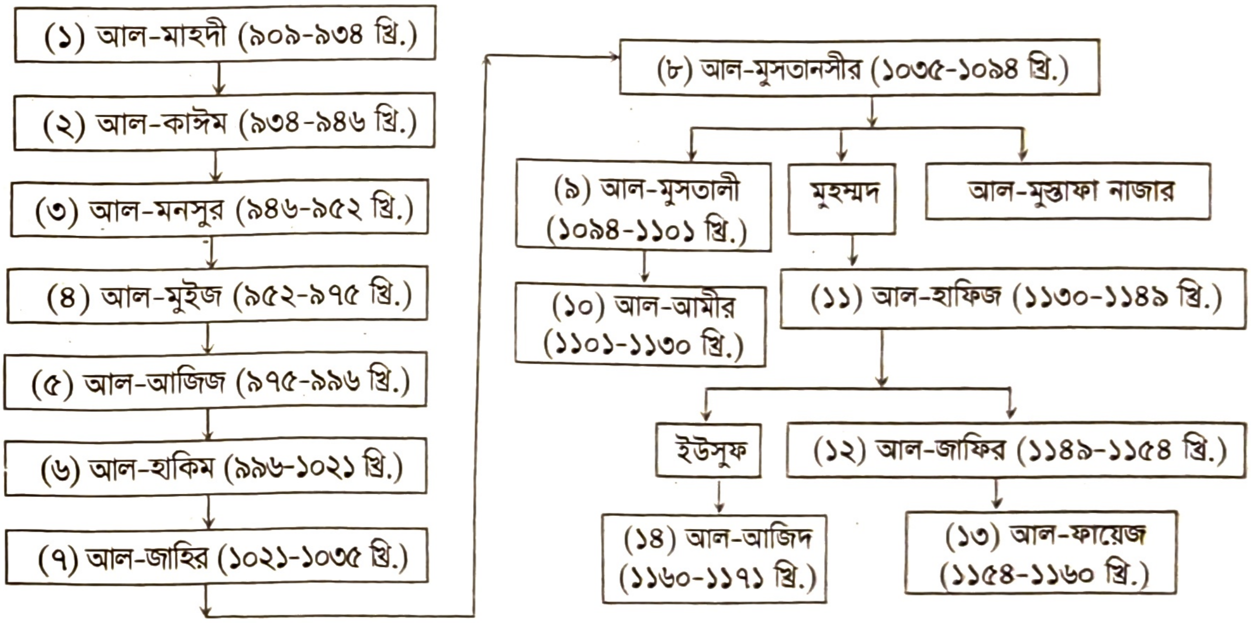
(১) আল-মাহদী (৯০৯-৯৩৪ খ্রি.)
(২) আল-কাঈম (৯৩৪-৯৪৬ খ্রি.)
(৩) আল-মনসুর (৯৪৬-৯৫২ খ্রি.)
(৪) আল-মুইজ (৯৫২-৯৭৫ খ্রি.)
(৫) আল-আজিজ (৯৭৫-৯৯৬ খ্রি.)
(৬) আল-হাকিম (৯৯৬-১০২১ খ্রি.)
(৭) আল-জাহির (১০২১-১০৩৫ খ্রি.)
(৮) আল-মুসতানসীর (১০৩৫-১০৯৪ খ্রি.)
(৯) আল-মুসতালী (১০৯৪-১১০১ খ্রি.)
মুহম্মদ
আল-মুস্তাফা নাজার
(১০) আল-আমীর (১১০১-১১৩০ খ্রি.)
(১১) আল-হাফিজ (১১৩০-১১৪৯ খ্রি.)
ইউসুফ
(১২) আল-জাফির (১১৪৯-১১৫৪ খ্রি.)
(১৪) আল-আজিদ (১১৬০-১১৭১ খ্রি.)
(১৩) আল-ফায়েজ (১১৫৪-১১৬০ খ্রি.)

উৎসঃ *আরব জাতির ইতিহাস, পি.কে. হিট্টি, পৃষ্ঠা-৬১৪*

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত খ্রিষ্টাব্দে ইফ্রিকিয়াতে (উত্তর আফ্রিকা) ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়?
২. উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন কে? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
৩. উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় কোন শিয়া নেতার ভূমিকা ছিল?
৪. 'উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী' উপাধি দিয়ে খলিফা ঘোষণা করা হয় কাকে?
৫. ফাতেমি বংশের কত জন খলিফা ছিলেন?
৬. ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে কার কাছে ফাতেমিদের চূড়ান্ত পতন ঘটে?

উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে ছকে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৩

উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর পরিচয় ও কার্যাবলি (৯০৯-৯৩৪ খ্রি.)
Introduction of Ubaidullah Al-Mahdi and His Activities (909-934 AD)

খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ

উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর প্রকৃত নাম ছিল সাঈদ বিন আল-হুসায়ন। তিনি ছিলেন ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম খলিফা। সৌভাগ্যবশত তিনি আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীর মতো একজন অনুসারী পেয়েছিলেন, যার সহায়তায় ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আল-মাহদী ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন।

খলিফা হিসেবে মাহদীর কার্যাবলি

উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী একজন সুযোগ্য শাসক ও নিষ্ঠাবান সংগঠক ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ ২৬ বছর (৯০৯-৯৩৪ খ্রি.) ফাতেমি খিলাফত পরিচালনা করেন। এ সময় তিনি নিজের ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করা, ফাতেমি খিলাফতের স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা এবং এর সীমানা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াও নানা কার্যাবলি সম্পাদন করেন।

আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীকে প্রাণদণ্ড প্রদান: উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ফাতেমি খিলাফতের প্রথম খলিফা হলেও এ খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীর অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনিই উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রধান কৃতিত্বের দাবিদার। বলা হয়, আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবু মুসলিম খোরাসানির যে অবদান, ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠায় আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীর অবদানও ছিল অসামান্য। তবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর উভয়ই ক্ষমতাসীন খলিফাদের রোষানলে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। অনেকে মনে করেন, উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকে সামনে রেখে তিনিই শাসন কাজ পরিচালনা করবেন। কিন্তু খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার প্রয়াস তাকে বিচলিত করে। ফলে তিনি উবায়দুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। দূরদর্শী খলিফা মাহদী তা বুঝতে পেরে নিজের ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার জন্য তার এক সময়ের মিত্র ও সুহৃদ আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী ও তার ভাই আবুল আব্বাসকে দরবারে ডেকে আনেন এবং তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেন। এভাবেই একজন অসাধারণ প্রতিভাধর নেতার জীবনাবসান ঘটে।

কাতামাদের বিদ্রোহ দমন: এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বার্বার কাতামা গোত্রের সার্বিক সহযোগিতায়ই উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। আর এ অবদানের জন্য স্বাভাবিকভাবেই ফাতেমি খিলাফতে কাতামারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে তারা তা পায়নি। তাছাড়া খলিফা আল-মাহদীর মধ্যেও কোনো অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় না পেয়ে কাতামা গোত্রপতিরা তার প্রতি সংশয়াপন্ন হয়ে ওঠেন। এ অবস্থায় খলিফা কর্তৃক আশ-শিয়ীকে হত্যার ঘটনায় তাদের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ হত্যার প্রতিবাদে কাতামারা কায়রোয়ানে দাঙ্গা শুরু করে। এ বিদ্রোহ আরব-বার্বার বিরোধ ও সংঘর্ষে রূপ নিলে খলিফা আল-মাহদী বহু কষ্টে তা দমন করেন।

নতুন রাজধানী স্থাপন: মাহদী প্রথমে রাক্কাদায় রাজধানী স্থাপন করে কাতামা গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নবপ্রতিষ্ঠিত খিলাফতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। পরবর্তীকালে ৯১৬-৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মাহদী কায়রোয়ানের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মাহদিয়া নগর প্রতিষ্ঠা করে সেখানে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

রাজ্য জয়: সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে মাহদী সিসিলি, মাল্টা, কর্সিকা ইত্যাদি দ্বীপে প্রভুত্ব কায়েম করেন এবং সার্ডিনিয়ায় নৌ অভিযান চালান। তিনি লিবিয়ার ত্রিপোলিসহ মৌরিতানিয়ার অনেক স্থান জয় করেন। খলিফা আল-মাহদীর প্রখ্যাত সেনাপতি আরুবা বিন ইউসুফ ইদ্রিসি বংশের শাসনাধীন মরক্কো আক্রমণ ও জয় করেন। ফলে ফাতেমি খিলাফতের সীমা পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। মাহদী স্পেনের জাতীয়তাবাদী নেতা উমর বিন হাফসুনের সাথে যোগাযোগ করে স্পেন জয়েরও চেষ্টা করেন। ৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে আল-মাহদী আলেকজান্দ্রিয়া দখল করলেও মিসর জয় করতে পারেননি।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

খলিফা আল-মাহদী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাহসী, বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টির অধিকারী ও উচ্চাভিলাষী শাসক ছিলেন। একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তিনি শিয়া ইসমাঈলীয় মতাদর্শ প্রচারের যথাযথ ব্যবস্থা করেন। তার শাসনামলে মদপানসহ অধার্মিক আচরণাদি নিষিদ্ধ করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণ এবং নতুন রাজধানী স্থাপনসহ নানাবিধ প্রশাসনিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি শাসক হিসেবে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দেন। একজন

প্রজাবৎসল শাসক হিসেবেও তার সুনাম রয়েছে। ঐতিহাসিক আস-সুয়ুতির মতে, 'উবায়দুল্লাহ জনসাধারণের জন্য উদার নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তারাও খলিফার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।' খলিফার স্থাপত্যপ্রীতিও উল্লেখ করার মতো। তিনি কায়রোয়ানের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে 'মাহদিয়া' নামক একটি নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছরে এর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। মার্বেল পাথরের জমকালো রাজপ্রাসাদ ও সুশোভিত পুকুরসহ অন্যান্য স্থাপত্যরাজি খলিফার সুরুচির পরিচায়ক।

উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কেবল ফাতেমি খিলাফতের প্রথম শাসকই নয় বরং তিনি এ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসকও ছিলেন। একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবেও তিনি অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার। অন্য কোনো অবদান বিবেচনায় না এনেও যদি কেবল একটি নতুন রাজবংশ ও খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তার অবদানের কথা স্মরণ করা যায়, তাতেই তাকে ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। দীর্ঘ ২৬ বছর রাজত্বের পর খলিফা উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আল-কাঈম (৯৩৪-৯৪৬ খ্রি.)

উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর মৃত্যুর পর নিজের পুত্র আবুল কাসেম আল-কাঈম উপাধি ধারণ করে ৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। আল-কাঈম পিতার মতো রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। সিংহাসনে আরোহণের বছরেই তিনি একটি নৌ অভিযান পাঠিয়ে ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূল ধ্বংস করে জেনোয়া অধিকার করেন এবং লোম্বার্ডির কিছু অংশও আয়ত্তে আনেন। তিনি মিসরের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করে ব্যর্থ হন। ১২ বছর বীরদর্পে রাজত্ব করার পর ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আল-কাঈম মৃত্যুবরণ করেন। তার রাজত্বকালে আবু ইয়াজিদের নেতৃত্বে একটি ব্যাপক খারেজি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, যা তার মৃত্যুর পরও অব্যাহত ছিল।

আল-মনসুর (৯৪৬-৯৫২ খ্রি.)

৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আল-কাঈমের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবু তাহির আল-মনসুর উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আল-মনসুরের উল্লেখযোগ্য কর্ম ছিল খারেজি নেতা ইয়াজিদকে পরাজিত ও নিহত করে খারেজি বিদ্রোহ দমন। তিনি সিসিলি ও ক্যালাব্রিয়ায় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হন। তার রাজত্বে খারেজি বিদ্রোহের সুযোগে স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান আন-নাসির মৌরিতানিয়া দখল করে নেন। আল-মনসুর জনকল্যাণকর কাজের প্রতিও আগ্রহী ছিলেন। তার অন্যতম কল্যাণধর্মী কাজ হলো সুসার উপকণ্ঠে 'আল-মনসুরিয়া' নামে একটি সুদৃশ্য নগরী নির্মাণ। ৩২ বছর বয়সে মনসুর ক্ষমতা লাভ করেন। সাত বছর শাসনকার্য পরিচালনার পর আল-মনসুর ৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফাতেমি খিলাফতের প্রথম খলিফা কে?
২. উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কত বছর ফাতেমি খিলাফত পরিচালনা করেন?
৩. আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীকে প্রাণদণ্ড দেন কে?
৪. উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কোথায় নতুন রাজধানী স্থাপন করেন?
৫. কত খ্রিষ্টাব্দে আল-মাহদী আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন?
৬. সুসার উপকণ্ঠে 'আল-মনসুরিয়া' নামে একটি সুদৃশ্য নগরী নির্মাণ করেন কে?

উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর বিজিত রাজ্যসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।
২. উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ৪

খলিফা আল-মুইজ: ক্ষমতা গ্রহণ, প্রাথমিক সমস্যা ও গৃহীত পদক্ষেপ (৯৫২-৯৭৫ খ্রি.) [Khalifa Al-Muiz: Ascending the Throne, Initial Problems and Steps Taken (952-975 AD)]

আল-মুইজের সিংহাসনে আরোহণ (৯৫২-৯৭৫ খ্রি.)

খলিফা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর ৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র আবু তামিম মা'আদ 'আল-মুইজ লি দিনিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করে ফাতেমি খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন ফাতেমি খিলাফতের চতুর্থ খলিফা। ৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর আল-মুইজ মাহদিয়া নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। রাজপরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আল-মুইজ বাল্যকালে সামরিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। অত্যন্ত মেধাবী আল-মুইজ ছিলেন বহু ভাষায় পারদর্শী। আরবি, নুবিয়ান, বার্বার, প্রাচীন ইতালীয়, গ্রিক ও স্লাভ ভাষায় তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমি খলিফাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা। তার ক্ষমতায় আরোহণের মধ্য দিয়ে ফাতেমি খিলাফতের ইতিহাসে এক নবদিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত গৌরবের শীর্ষ শিখরে আরোহণ করে।

প্রাথমিক সমস্যা ও খলিফার গৃহীত পদক্ষেপ

খলিফা হওয়ার অব্যবহিত পর তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করে বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে সাম্রাজ্যের বিদ্রোহী নেতা, গোত্রপ্রধান এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তারা তার আনুগত্য স্বীকার করেন। ব্রিটিশ পাচ্যবিদ Stanley Lane Poole সত্যই বলেছেন, "চতুর্থ খলিফা আল-মুইজের সিংহাসনারোহণের সাথে সাথে ফাতেমিরা একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।"[২]

মরক্কো বিজয় এবং ক্রিট হস্তচ্যুত: ফাতেমি সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করতে স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমানের উত্তরাঞ্চলে ফ্রাঙ্কদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সুযোগে আল-মুইজ ৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সুদক্ষ সেনাপতি আল-জওহরকে মরক্কো পুনরুদ্ধারে পাঠান। উমাইয়াদের বাধা প্রতিহত করে আল-জওহর মরক্কো দখল করেন। পাশাপাশি ওরান ও বুগিয়ার বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর থেকে উমাইয়া-ফাতেমি সংঘর্ষ চলতে থাকে। উমাইয়ারা ৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি ফাতেমি জাহাজ আটক করলে হাসান বিন আলীর নেতৃত্বে ফাতেমিরা স্পেনীয় উপকূল আক্রমণ করে, অন্যদিকে উমাইয়ারা সুসা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হামলা চালায়। উমাইয়া-ফাতেমি সংঘর্ষের সুযোগে গ্রিকরা ৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ক্রিট অধিকার করে নেয়।

সিসিলি বিজয়: আল-মুইজ ৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি আহমদ ইবনে হাসানের নেতৃত্বে সিসিলি দ্বীপ দখল করেন। মুসলমানদের অধীনে এ দ্বীপ বেশ সমৃদ্ধ হয়েছিল। সেখানে বহু স্কুল-কলেজ ও শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সিসিলির পালেরমোতে নির্মিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয় কর্ডোভা ও বাগদাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। সিসিলি বিজয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক Syed Ameer Ali বলেন, ক্রিট হস্তচ্যুত হলেও সিসিলিতে বাইজান্টাইন শক্তির ধ্বংস সাধন দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ সাধিত হয়েছিল।

মিসর বিজয়: সমকালীন আফ্রিকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ ছিল মিসর। নীল নদের দান নামে খ্যাত এ দেশটি প্রাচীন সভ্যতারও অন্যতম লীলাভূমি। এ মিসর বিজয় খলিফা আল-মুইজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল বলেন, 'মিসর জয় তার (মুইজের) জীবনের লক্ষ্য ছিল এবং মিসরকে সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তর করাই ছিল তার জীবনের স্বপ্ন।' উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীসহ আল-মুইজের পূর্ববর্তী ফাতেমি খলিফারা মিসর জয় করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ওলিয়ারীর বলেন, 'আল-মুইজের পিতা ও পিতামহেরও স্বপ্ন ছিল মিসর জয় করা। এখন আল-মুইজ সে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে ব্রতী হন।' সময় এবং পরিস্থিতি দু'টিই আল-মুইজের অনুকূলে ছিল। এ সময় মিসরের শাসক ছিলেন ইখশিদ বংশীয় কাফুর। তার ২০ বছরের অযোগ্য ও কুশাসনে মিসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

---

[২] With the fourth caliph, AL-Muiz, the Fatimids entered upon a new phase.– Ref : Sir Stanley Lane Poole, *The Moors in Spain*

অবস্থা অতীব শোচনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। যথাসময়ে সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতা পরিশোধ না করতে পারায় সামরিক বাহিনীতেও অরাজক অবস্থা বিরাজমান ছিল। তদুপরি এ সময় দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে মিসরে মহামারি দেখা দেয়। এতে জনজীবনে চরম ভোগান্তি নেমে আসে। পরিস্থিতির উন্নতি বিধানে ইখশিদীয় শাসক কাফুর কোনো সফল পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে অসন্তুষ্ট অভিজাত ও অমাত্যবর্গ পার্শ্ববর্তী ইফ্রিকিয়ার ফাতেমি খলিফা আল-মুইজকে মিসর বিজয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানান। আল-মুইজ এ সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করেননি।

৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল-মুইজ তার বিখ্যাত সেনাপতি জওহর আল-সিকিল্লির সেনাপতিত্বে এক বিশাল বাহিনী মিসর অভিমুখে পাঠান। জওহর তার সহযোগী সেনাপতি ইয়াকুব বিন কিল্লিসের সহায়তায় প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া এবং পরে অনেকটা বিনা বাধাতেই তৎকালীন মিসরের রাজধানী ফুস্তাত দখল করে নেন। সেখানকার জুমা মসজিদে খলিফা আল-মুইজের নাম পাঠ করা হয়। অতঃপর খলিফার নির্দেশে বিজয়ী সেনাপতি জওহর ফুস্তাতের উপকণ্ঠে 'আল-কাহিরা আল-মাহরুসা' নামক একটি নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এ নগরীর কাহিরা নামটিই বর্তমান কায়রো নামে পরিচিতি লাভ করেছে। ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে এ নগরীকে উত্তর আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত ফাতেমি খিলাফতের রাজধানীর মর্যাদা দেওয়া হয়। বর্গাকৃতির এ নগরীর পূর্বদিকে একটি বড় এবং পশ্চিম দিকে একটি ছোট প্রাসাদ খলিফার জন্য নির্মাণ করা হয়। সেনাপতি জওহরের অনুরোধে খলিফা আল-মুইজ ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে আসেন। এখানে তাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানানো হয়।

কাহিরা নগরীতে খলিফার প্রাসাদের দক্ষিণে 'আল-আজহার' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। মহানবি (স)-এর কন্যা বিবি ফাতেমা (রা)-এর উপাধি ছিল জোহরা। তার পুণ্য স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই সম্ভবত মসজিদটির এরূপ নামকরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এ মসজিদসংলগ্ন স্থানে একটি পাঠাগার সংবলিত বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এটিই পরে বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও গৌরবময় আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

অন্যান্য স্থান জয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আনুগত্য লাভ: মিসরের খারেজি, কারামাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায় ফাতেমি শাসন মেনে নেয়। জওহর হেজাজ ও সিরিয়া দখল করে মক্কা ও মদিনা নগরীতে মুইজের নামে শুক্রবারের খুৎবা পাঠের রেওয়াজ চালু করেন। সেনাপতি জওহরের অনুরোধে ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে আল-মুইজ ইফ্রিকিয়া থেকে মিসরে যান। মিসরীয়, সিরীয় ও হেজাজের প্রতিনিধিরা তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। এভাবে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফাতেমি খিলাফতের চতুর্থ খলিফা কে?
২. আল-মুইজ কত খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমি সিংহাসনে বসেন?
৩. কার সময়ে সেনাপতি আহমদ ইবনে হাসান সিসিলি দ্বীপ দখল করেন?
৪. আল-মুইজের বিশ্বস্ত সেনাপতি কে ছিলেন? *[ঢাকা বোর্ড ২০১৭]*
৫. বিখ্যাত সেনাপতি জওহর কত খ্রিষ্টাব্দে মিসর বিজয় করেন?
৬. সেনাপতি জওহর ফুস্তাতের উপকণ্ঠে কী নামে একটি নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. খলিফা আল-মুইজের মিসর বিজয় ছিল ফাতেমি খিলাফতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা— যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করো।
২. প্রাথমিক সমস্যা সমাধানে আল-মুইজের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৫

আল-মুইজের কৃতিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
Achievements and Characteristics of Al-Muiz

মানুষ হিসেবে আল-মুইজ ছিলেন অমায়িক, দয়ালু, মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন, সংস্কৃতিবান এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। আল-মুইজ একজন নিষ্ঠাবান শিয়া মুসলমান ছিলেন। তবে কোনো রকমের ধর্মীয় উগ্রতা বা গোঁড়ামি তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। বস্তুত পরমতের প্রতি তিনি ছিলেন উদার ও সহিষ্ণু। রাজ্যশাসনের ব্যাপারে তিনি ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত বিদ্বেষ দ্বারা কখনো তাড়িত হননি। এ কারণেই তিনি তার রাজস্ব প্রশাসনে সুযোগ্য ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের নিয়োগ প্রদানে ইতস্তত করেননি।

রাজ্য বিজেতা: খলিফা আল-মুইজ একজন সুদক্ষ সমরনেতা ছিলেন। রাজ্য বিজেতা হিসেবেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি নতজানু বৈদেশিক নীতির পরিবর্তে বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করেন। তার শাসনামলে ক্রিট দ্বীপ হস্তচ্যুত হলেও সিসিলি ফাতেমিদের অধিকারে আসে। মরক্কোতেও ফাতেমি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে রাজ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো মিসর বিজয়। মিসরের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় খলিফার গৃহীত পদক্ষেপ ইতিহাসবিদদের প্রশংসা অর্জন করে। বস্তুত আল-মুইজ এমন এক খিলাফতের অধিকারী হয়েছিলেন যার সীমা পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে পূর্বে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

শাসক ও সংগঠক: আল-মুইজ একজন সফল শাসক ও সংগঠক ছিলেন। তিনি দীর্ঘ তেইশ বছর সাফল্যের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বিচক্ষণ শাসক হিসেবে তিনি জওহরের মতো বিশ্বস্ত সেনাপতি ও অমাত্যের সেবা নিশ্চিত করতে সক্ষম হন। বস্তুত জওহর ছিলেন খলিফা আল-মুইজের সম্পাদক ও রাজপ্রতিনিধি। অবশ্য খলিফার কাছে তার মর্যাদা ছিল প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা আরও বেশি। পি. কে. হিট্টি জওহরকে আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীর পর ফাতেমি খিলাফতের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

খলিফা তার কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার জন্য ছয়টি দপ্তর বা বিভাগ চালু করেন। প্রতিটি বিভাগে একজন করে প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এসব কর্মকর্তারা ছিলেন— ১. সাহিবু কালামুল জালিল: এ কর্মকর্তার দায়িত্ব ছিল সরকারি দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রাদি যথাসময়ে খলিফার কাছে উপস্থাপন করা। ২. সাহিবু কালামুল-দাকিক: সৈন্য বিভাগের কার্যাবলি, বৈদেশিক বিষয়াদি এবং বিচার-সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকির দায়িত্বভার এ কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত ছিল। ৩. দায়ী আল-দায়াৎ: ফাতেমি মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা এ কর্মকর্তার প্রধান দায়িত্ব হলেও এ কর্মকর্তাকে বাজার পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের কাজও করতে হতো। ৪. নায়েব সাহেব আল-বার: গৃহস্থারী ও রাজকীয় অতিথিদের পরিচর্যার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। ৫. আফসার খারাজ: রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তা। এবং ৬. কারাবুল-হুজরা: বেতন-ভাতাদি পরিশোধের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা।

সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খলিফা তার সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ এবং প্রদেশসমূহকে আবার জেলায় বিভক্ত করেন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে খলিফা আল-মুইজ- শুরতা বা পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। এ বাহিনীর প্রধান ছিলেন সাহিবুল শুরতা। পুলিশ বাহিনী গুপ্তচরেরও কাজ করত। খলিফা আল-মুইজ নিজে একজন সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন। সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ এবং এর সুরক্ষা ও স্থায়িত্বের প্রয়োজনে তিনি সেনা ও নৌবাহিনী পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করেন।

অর্থ ও রাজস্ব সংস্কারক: অর্থ ও রাজস্ব প্রশাসন পুনর্গঠনেও খলিফা আল-মুইজের বিশেষ অবদান রয়েছে। বিচক্ষণ খলিফা নবদীক্ষিত ইয়াকুব বিন কিল্লিস ও আসুক নামক দুজন সুবিজ্ঞ রাজকর্মকর্তাকে অর্থ ও রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের দায়িত্ব দেন। ইয়াকুব রাজস্ব নির্ধারণে প্রচলিত প্রাচীন রীতি বাতিল করেন। নতুন রীতি অনুযায়ী কর নির্ধারণে যথাসম্ভব উদারতা প্রদর্শন করা হয়। তবে রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। কর ফাঁকি রোধে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কর ব্যবস্থাপনায় নতুন রীতি কার্যকরের ফলে রাষ্ট্রের আয় প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং রাজকোষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। জানা যায় যে, এ সময় কেবল ফুস্তাত নগরী থেকেই দৈনিক ৫০,০০০ থেকে ১,২০,০০০ দিনার কর আদায় হতো। মুইজ ফাতেমি সাম্রাজ্যে প্রচলিত আব্বাসি মুদ্রার পরিবর্তে নতুন মুদ্রা প্রবর্তন করেন।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: খলিফা আল-মুইজ একজন ন্যায়বিচারক ছিলেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য বিচার ব্যবস্থায় খলিফা ছিলেন সর্বোচ্চ পদাধিকারী। তিনি আপিল বিচার সম্পন্ন করতেন। ফাতেমি প্রচারক বা দাঈরা ধর্মীয় বিচারে কাজ পরিচালনা করতেন। খলিফা আল-মুইজের সময় আবু হানিফ ইবনে নুমান ছিলেন প্রধান কাজি।

তিনি ইসলামি আইন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মাজালিস নামক একটি সংকলন গ্রন্থে আইন ও ইতিহাস বিষয়ে তার প্রদত্ত ৮০০টি বক্তৃতা গ্রন্থিত হয়েছে। ইবনে নুমানের প্রচেষ্টায় উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে প্রচলিত সুন্নি মালেকি মাজহাবের অনেক আইন ফাতেমি বিচার ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছিল। ইবনে নুমান 'মাজালিম আদালত' (The Court of the Mazalim) নামে একটি নতুন আদালত প্রবর্তন করেন। আল-মুইজের সময় বাজারে ওজন পরিমাপ তদারকসহ জনসাধারণের নৈতিক জীবনমান উন্নয়নমূলক কাজ তদারকি করতেন মুহতাসিব।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রসার: জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খলিফা আল-মুইজ বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় সে সময় কায়রো জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একটি প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনিই কায়রোর জগদ্বিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। সমকালীন বিশ্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভেষজ বিজ্ঞানী ছিলেন ইহুদি চিকিৎসক মুসা বিন আল-গাযালকে আল-মুইজ ফাতেমি দরবারের প্রধান চিকিৎসক নিয়োগ দেন। আল-মুইজের সময়ে আরবি ভাষায় রচিত বহু পুস্তক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এক্ষেত্রে আলেকেজান্দ্রিয়ার কপটিক যাজক সাঈদ বিন বাতরিক প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ: খলিফা আল-মুইজ একজন সুরুচিবোধসম্পন্ন ও সংস্কৃতিবান মানুষ। তার সময়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু দৃষ্টিনন্দন অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ ও ধর্মীয় ইমারত নির্মাণ করা হয়। তার সময়ে নির্মিত এসব শিল্পকর্মের মধ্যে কায়রোর পূর্ব প্রান্তের 'ফসর-উল-মুইজি' এবং পশ্চিম প্রান্তের 'ফসর-উল-বাহার' প্রাসাদ ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য যে আল-মুইজ কেবল একজন শিল্প-সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, তিনি নিজে একজন খ্যাতনামা স্থপতিও ছিলেন। তিনি কায়রোর বিভিন্ন ভবনের নকশা প্রণয়ন করে নিজের স্থাপত্য জ্ঞানের স্বাক্ষর রাখেন। পূর্বসূরি খলিফাদের সময় মাগরিব অঞ্চলে নির্মিত মাহদিয়া ও মানসুরিয়া নগরীতে আল-মুইজ বেশ কিছু প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। মিসরের কায়রো নগরীকে বলা হতো উৎসবের নগরী। মুইজের সময় এ নগরীতে প্রতি শুক্রবার জনগণের জন্য বিনোদনমূলক উৎসবের আয়োজন করা হতো। এ সময় দুটি ঈদ উৎসব ছাড়াও 'গাদির আল-খুম' নামে শিয়াদের ধর্মীয় উৎসব আয়োজন করা হতো। এছাড়া বসন্তকালীন ও নওরোজ উৎসব মহা ধুমধামের সাথে পালনের রেওয়াজ চালু করা হয়েছিল।

ফাতেমি খলিফাদের মধ্যে আল-মুইজ ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা এর সম্প্রসারণ এবং একে শক্ত ভিত্তি প্রদানের কৃতিত্ব অবশ্যই আল-মুইজের প্রাপ্য। আর এ কারণেই আল-মুইজকে ন্যায়সংগতভাবেই ফাতেমি খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল যথার্থই বলেছেন যে, চতুর্থ খলিফা আল-মুইজের সিংহাসনে আরোহণের ফলে ফাতেমিগণ একটি নব অধ্যায়ে প্রবেশ করে।" ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'তিনি নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্যের মামুন ছিলেন এবং তার শাসনামলে উত্তর আফ্রিকা সভ্যতা ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।' খলিফা আল-মুইজ ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইন্তেকাল করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফাতেমি খিলাফতের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা কে?
২. আল-মুইজ কত বছর সাফল্যের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন?
৩. খলিফা আল-মুইজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি কী?
৪. মিসরে 'আল-আজহার' মসজিদ নির্মাণ করা হয় কার সময়ে? */সকল বোর্ড ২০১৬/*
৫. আল-কাহিরা নগরী বর্তমানে কী নামে পরিচিত?
৬. কোন নগরীকে ফাতেমি খিলাফতের রাজধানী করা হয়?

উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

শাসক হিসেবে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কৃতিত্বের আলোকে একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ৬

খলিফা আল-আজিজের ক্ষমতা গ্রহণ ও কার্যাবলি (৯৭৫-৯৯৬ খ্রি.)
Ascending the Throne and Activities of Khalifa Al-Aziz (975-996 AD)

সিংহাসন লাভ

খলিফা আল-আজিজের ক্ষমতা লাভ ফাতেমি বংশের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল-মুইজের পরলোকগমনের পর তার দ্বিতীয় পুত্র 'আবুল মনসুর 'নিজার আল-আজিজ বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে ফাতেমি সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তবে তিনি আল-আজিজ নামেই ইতিহাসে সমধিক পরিচিত। তার শাসনামল ফাতেমি খিলাফতের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তার শাসনকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক P. K. Hitti যথার্থই বলেছেন, "তার শাসনকালে ফাতেমি সাম্রাজ্য গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে।"[৩]

কার্যাবলি

আল-আজিজ ছিলেন ফাতেমি খিলাফতের ৫ম খলিফা। তাকে খলিফা আল-মুইজের সুযোগ্য উত্তরসূরি বলা হয়। বস্তুত রাজ ক্ষমতা লাভের পর আল-আজিজ তার পিতা আল-মুইজের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেন।

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি: আল-আজিজের রাজত্বকালে সমগ্র সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার কিছু অংশে ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হিজাজ, ইয়ামেনের পর মসুল, আলেপ্পো, হামা শায়যার ও অন্যান্য স্থানেও তার নামে খুৎবা পঠিত হতো। আল-আজিজের সাম্রাজ্য ফোরাত নদীর সীমা থেকে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং আরব ভূমির অধিকাংশ অঞ্চল তার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি এতই বৃদ্ধি পায় যে, ফাতেমি বংশ বাগদাদের আব্বাসি ও কর্ডোভার উমাইয়া বংশের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বিদ্রোহ দমন: শাসনভার গ্রহণ করেই আল-আজিজ সিরিয়া সমস্যার সম্মুখীন হন। এ সময় সিরিয়ার বিদ্রোহী কারামাতিয়ানরা তুর্কি নেতা হাফতাকিনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দামেস্ক থেকে ফাতেমি শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করে। এতে মিশরের নিরাপত্তা ও ফাতেমি রাজবংশের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। পূর্ব দিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আল-আজিজ পূর্ববর্তী খলিফাদের মতো সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। উচ্চাভিলাষী হাফতাকিন, বার্বার ও কারমাতিয়ানদের সহায়তায় সিরিয়ার ফাতেমি প্রতিনিধি ইবন জাফরকে পরাজিত করে দামেস্ক দখল করেন। আল-আজিজ এ সমস্যার সমাধানের জন্য তার প্রধান সেনাপতি জওহর আল-কিল্লিসকে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীসহ হাফতাকিনের বিরুদ্ধে সিরিয়ায় পাঠান। হাফতাকিন তার সমর্থক কারামাতিয়ানদের প্রতিশ্রুত সাহায্য না পেলেও ফাতেমি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে সেনাপতি জওহরকে পিছু হটতে বাধ্য করেন। জওহর এ পর্যায়ে হাফতাকিনের সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্ত ছিল, জওহর তাকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেবেন এবং তার তরবারির নিচ দিয়ে জওহর এবং তার সেনাপতি যাবেন। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী জওহর বাহিনী স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সময় তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা খলিফার পাঠানো বাহিনীর সাথে দেখা হয়। পরবর্তীকালে তারা সম্মিলিতভাবে হাফতাকিনকে পরাজিত ও বন্দি করে কায়রোতে নিয়ে যান। তবে খলিফা-আজিজ হাফতাকিনকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং তার শৌর্য-বীর্যের কথা স্মরণ করে তাকে যথাযথ সম্মাননা প্রদান করেন।

আল-আজিজের শাসনামলে বার্বাররাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বার্বারদের খলিফা মোটেই আস্থাশীল মনে করতেন না। তাই বার্বারদের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য খলিফা বার্বারদের পরিবর্তে তুর্কি বন্দীদের সাহায্যে একটি দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। তিনি এ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন বীরশ্রেষ্ঠ হাফতাকিনকে। আল-আজিজ এভাবে বিদ্রোহী বার্বারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

---

[৩] The Fatimid empire reached its Zenith. – Ref : P. K. Hitti, *History of the Arabs*, pp.619-620

নিরপেক্ষ শাসন নীতি গ্রহণ: আল-আজিজ একজন সুদক্ষ শাসক হিসেবে ইতিহাসবিদদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। রাজকার্য পরিচালনায় তিনি দক্ষ জনবল নিয়োগকে প্রাধান্য দেন। এক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণের মধ্যে কোনো প্রভেদ করতেন না। তার সময় শাসন কাজে নিযুক্তির প্রধান মানদণ্ড ছিল যোগ্যতা। এর ফলে ঈসা বিন-নামর নামে একজন খ্রিষ্টান তার উজির এবং মানাসা নামে একজন ইহুদি উচ্চপদে নিয়োগ পান। এছাড়াও খলিফার একজন রাশিয়ান স্ত্রী এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টান মন্ত্রী রাজকাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অন্যায়ভাবে খলিফা কাউকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না।

খলিফা আল-আজিজের শাসনামলে ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়। তিনিই প্রথম মিসরে আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসী জীবনযাপন করার রীতি প্রবর্তন করেন। পারসিক প্রথায় তার দরবার সুসজ্জিত হয়। সোনালি কাপড়ের পাগড়ি ও স্বর্ণখচিত অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করা হয়। দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের প্রতি খলিফার বিশেষ ঝোঁক ছিল।

রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার: রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধনেও আল-আজিজ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এ ক্ষেত্রে তার রাজস্বমন্ত্রী ইয়াকুব বিন-কিল্লিস তাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। ঐতিহাসিক ওলিয়ারীর মতে, খলিফা অত্যন্ত কঠোর হস্তে দুর্নীতি নির্মূল করেন। তার সময়ে রাজকর্মচারীদের উৎকোচ ও উপহার গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। তিনি রাজকর্মচারীদের, এমনকি গৃহভৃত্যদেরকেও বেতন-ভাতা প্রদানের রেওয়াজ প্রবর্তন করেন। তিনি কর ব্যবস্থারও পুনর্বিন্যাস করেন। তিনি বিনা রসিদে প্রজাসাধারণের কাছ থেকে কর আদায়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তার এ ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন প্রজাসাধারণ রাজস্ব কর্মচারীদের হয়রানি থেকে মুক্তি পান, অন্যদিকে কর আদায়ের পরিমাণ বহু গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজকোষের সমৃদ্ধি অর্জিত হয়।

সেনাবাহিনীর সংস্কার: খলিফা আল-আজিজ সামরিক বাহিনীর সংস্কার সাধন করেছিলেন। তার সময়ে সাম্রাজ্যে কাতামা ও বার্বাররা প্রবল প্রতিপত্তি বিস্তার করে। তাদের দৌরাত্ম্য রোধ এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে তিনি তুর্কি ও নিগ্রোদের সমন্বয়ে একটি নতুন সেনা ইউনিট গঠন করেন। তার আমলে নতুন পোতাশ্রয় নির্মাণ ও যুদ্ধজাহাজ যুক্ত করে নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। ঈসা বিন-নেসতুরিয়াস নামে একজন নৌ অধ্যক্ষ এ কাজে খলিফাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন।

বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন: খলিফা আল-আজিজ তার পিতার মতোই একজন ন্যায়বিচারক ছিলেন। তিনি বিচারকাজের সুবিধার্থে শরিয়াহ ও প্রচলিত আইন-কানুনের সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করেন। দেশের ধর্মীয় ও বিচার সংক্রান্ত কাজ পরিচালনার জন্য তিনি তার পিতার সময়কার প্রধান কাজি নুমানের পরিবারের ওপর দায়িত্বভার প্রদান করেন। তার সময় প্রথমে আলী বিন-নুমান এবং পরে মুহাম্মদ বিন-নুমান প্রধান কাজি হিসেবে বিচার প্রশাসন পরিচালনা করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল-আজিজ ফাতেমি খিলাফতের কততম খলিফা?
২. মিসরে প্রথম আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসী জীবনযাপন করার রীতি প্রবর্তন করেন কে?
৩. আল-আজিজের রাজস্বমন্ত্রী কে ছিলেন?
৪. খলিফা আল-আজিজের সময় কারা সাম্রাজ্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে?
৫. খলিফা আল-আজিজ কার সুযোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন?
৬. আল-আজিজের সময়ে মিসর কোন অঞ্চলের একমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়?

উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সাম্রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে ফাতেমি খলিফা আল-আজিজের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৭

খলিফা আল-আজিজের চরিত্র ও কৃতিত্ব
Character and Achievements of Khalifa Al-Aziz

খলিফা আল-আজিজ একাধারে জ্ঞানী, দানশীল, প্রজারঞ্জক ও শিল্প-সাহিত্যানুরাগী শাসক ছিলেন। তার রাজত্বে মুসলিম-অমুসলিম সবাই সুখ ও সমৃদ্ধিতে জীবনযাপন করত। সে সময়ে সব শ্রেণি ও সম্প্রদায় থেকে কর্মচারী নিয়োগ করা হতো। মানাসা নামক জনৈক ইহুদিকে তিনি উচ্চপদ প্রদান করেন। তিনি যোগ্য ও দক্ষ ইবনে কিল্লিসকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। যিনি তার ১৫ বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বে ফাতেমি খিলাফতকে সুনাম, গৌরব ও ঐশ্বর্যের সুউচ্চ শিখরে নিয়ে যান। ইবনে কিল্লিসের মৃত্যুর পর খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী ঈসা মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বার্বার ও কাতামা গোত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার্থে তুর্কি ও নিগ্রোদের সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন, যা পরবর্তীকালে ফাতেমি বংশের ধ্বংস সাধনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক: আল-আজিজ নিজে একজন কবি ছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি আল-আজহার মসজিদে একটি শিক্ষায়তন যুক্ত করেন। পরবর্তীতে এ শিক্ষায়তনটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এছাড়াও তিনি বহু স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও জনকল্যাণকর কাজ করেছিলেন। আল-আজিজের সময়ে চিকিৎসাক্ষেত্রেও উন্নতি সাধিত হয়। ৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেম থেকে মিসরে আগত চিকিৎসক মুহাম্মদ আল-তামিমী এ সময়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন।

আল-আজিজ ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক হলেও বিলাসিতা ও জাঁকজমকতা পছন্দ করতেন। তিনি স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম অনুরাগী ছিলেন। তার সময়ে নির্মিত সোনালি প্রাসাদ (Golden Palace), মুক্তামঞ্চ (Pearl Pavilion) এবং কারাফা কবরস্থানে তার মায়ের কবরের ওপর নির্মিত সুন্দর মসজিদ তার স্থাপত্য শিল্পানুরাগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি কায়রোতে মসজিদে জামির নির্মাণকাজ শুরু করেন এবং এর কাজ সমাপ্ত করেন খলিফা আল-হাকিম। বর্তমানে মসজিদটি হাকিমের মসজিদ নামে পরিচিত।

খলিফা আল-আজিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

প্রজাবান্ধব শাসক: খলিফা আল-আজিজ ফাতেমি খলিফাদের মধ্যে উজ্জ্বল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুলের মতে, 'আল-আজিজ ফাতেমি খলিফাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী এবং পরোপকারী ছিলেন।' (Aziz was the wisest and most benificient of all the Fatimid caliphs) শত্রুতা নয়, বরং প্রতিপক্ষের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি রক্তপাত এড়িয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও তিনি ক্ষমা করতে পছন্দ করতেন। তার মহত্ত্ব, সদাশয়তা ও উদার মনোভাবের একটি উজ্জ্বল নজির হলো সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন অঞ্চলে ফাতেমিদের জন্য ত্রাসসৃষ্টিকারী বিদ্রোহী হাফতাকিনকে ক্ষমার ঘটনা। তিনি শুধু এ চরম শত্রুকে ক্ষমাই করেননি, পরে তাকে রাজপদে নিয়োগ দিয়ে উদারতার চরম পরকাষ্ঠাও প্রদর্শন করেন।

সকল ধর্মের শাসক: আল-আজিজ একজন নিষ্ঠাবান শিয়া ছিলেন। তবে তার মধ্যে ধর্মীয় উগ্রতা ছিল না। তিনি পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। কোনো ভিন্নধর্ম ও ভিন্ন মতাবলম্বী তার নিপীড়নের শিকার হয়েছে এমন উদাহরণ নেই। শুধু সুন্নি মুসলমানরা নয়, তার সময় ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরাও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত।

বিলাসী শাসক: খলিফা আল-আজিজের ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল। ফাতেমি খলিফাদের মধ্যে তিনিই প্রথম আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন শুরু করেন। পারস্য রীতিতে তার দরবার সুসজ্জিত করা হয়। তিনি কারুকার্যখচিত পোশাক ও সোনালি কাপড়ের পাগড়ি পরিধান করতেন। নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি স্বর্ণখচিত তরবারি আমদানি করেন। তিনি মন্ত্রী ও পরিষদবর্গকেও জমকালো জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করেছিলেন। মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু সংগ্রহ করা খলিফার একটি ব্যক্তিগত শখ ছিল। এ শখ পূরণে তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে বিরল জীবজন্তু, মণিমুক্তা ও হীরা সংগ্রহ করতেন।

ফাতেমিদের পতনে আল-আজিজের দায় ও সার্বিক মূল্যায়ন

ফাতেমি খিলাফত পতনের জন্য খলিফা আল-আজিজ অনেকাংশে দায়ী ছিলেন বলে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন। তাদের মতে, শিয়া ইসমাঈলীয় মতবাদের প্রতি তার বিশেষ সুনজর সুন্নিদের বিক্ষুব্ধ করে। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রতি তার সদাশয়তার নীতিও শেষ পর্যন্ত ফাতেমি খিলাফতের জন্য হিতকর হয়নি। বার্বারদের মোকাবিলায় গঠিত তুর্কি বাহিনীও শেষপর্যন্ত স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। অনেকে মনে করেন, ফাতেমি খিলাফতের অধঃপতন ও অবক্ষয়ে এ বাহিনীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া তার মনোনীত পরবর্তী উত্তরাধিকারী হাকিমের অযোগ্যতা ও খামখেয়ালিপনার ফলে ফাতেমিদের ক্ষমতা ক্রমশ অমাত্য ও অভিজাতদের দখলে চলে যায় এবং একপর্যায়ে খলিফারা তাদের ক্রীড়নকে পরিণত হন। এসব দিক বিবেচনা করে অনেকেই ফাতেমি খিলাফতের পতনে আল-আজিজকে বিশেষভাবে দায়ী করেন। ফাতেমি খিলাফত পতনে খলিফা আল-আজিজের দায় অস্বীকার করা যায় না। তবে এ জন্য তাকে বিশেষভাবে দায়ী করা সমীচীন নয়। বস্তুত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আল-আজিজ ছিলেন ফাতেমি খলিফাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তার সময় ফাতেমি খিলাফত সাফল্যের সর্বোচ্চ সীমায় উন্নীত হয়। এ সময় ফাতেমি খিলাফতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজমান ছিল বলে স্ট্যানলি লেনপুল উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক পি.কে. হিট্টি মনে করেন, আল-আজিজের শাসনকালে মিসরের ফাতেমি খিলাফত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাগদাদের গৌরবকে ম্লান করে দেয়। শুধু তাই নয়, ফাতেমিরা পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে একমাত্র ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র হিসেবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে।[৪]

জেনে রাখো

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইরাকের বর্তমান রাজধানী বাগদাদ নগরীর গোড়াপত্তন করেন আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর। তিনি ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে দজলা (ইউফ্রেটিস) নদীর পশ্চিম তীরে ৪৮ লাখ ৮৩ হাজার দিরহাম ব্যয় করে এ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ নতুন নগরীর নাম দেন দার-আস-সালাম বা শান্তির শহর। অনেকে একে খলিফার নামানুসারে মনসুরিয়া বলেও অভিহিত করে। বর্তমানে এর জনসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ২১ লক্ষ ৬০৪০ জন।

খলিফা আল-আজিজ দীর্ঘ ২২ বছর সগৌরবে রাজত্ব করার পর ৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া অভিযানকালে বিলবায়েস নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। এ মহান খলিফার জীবনাবসানের মাধ্যমে ফাতেমি খিলাফতের গৌরব রবিও অস্তাচলের পথে ধাবিত হতে শুরু করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন ফাতেমি খলিফা ইবনে কিল্লিসকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন?
২. বার্বার ও কাতামা গোত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কাদের সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠন করা হয়?
৩. আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত? */সকল বোর্ড ২০১৭/*
৪. সোনালি প্রাসাদ, মুক্তামঞ্চ কার সময়ে নির্মিত হয়?
৫. কার সময়ে ফাতেমি খিলাফত সাফল্যের সর্বোচ্চ সীমায় উন্নীত হয়?
৬. খলিফা আল-আজিজ কত বছর মিসর শাসন করেন?

উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আল-আজিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে একটি চার্ট তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

ফাতেমিদের পতনে আল-আজিজকে দায়ী করা যৌক্তিক কি না— দলীয়ভাবে আলোচনা করো।

---

[৪] Ref: *History of the Arabs*

পাঠ ৮

খলিফা আল-হাকিম (৯৯৬-১০২১ খ্রি.)
Khalifa Al-Hakim (996-1021 AD)

সিংহাসনে আরোহণ: ফাতেমি খিলাফতের ৬ষ্ঠ খলিফা আবু আলী মনসুর আল-হাকিম বিন আমরিল্লাহ। পিতা আল-আজিজের মৃত্যুর পর আল-হাকিম ৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১১ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আল-হাকিম ইতিহাসে একজন খামখেয়ালি শাসক হিসেবে পরিচিত। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় রাজদণ্ড গ্রহণের পর প্রথম পাঁচ বছর (৯৯৬-১০০১ খ্রি. পর্যন্ত) আল-হাকিম তার অভিভাবক ইবনে আম্মার ও বারজুওয়ানের তত্ত্বাবধানে থেকে শাসন কাজ পরিচালনা করেন। এ সময় তিনি ছিলেন নামেমাত্র শাসক।

খলিফা আল-হাকিমের কার্যাবলি

খলিফার নিজ হাতে ক্ষমতাগ্রহণ: অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় আল-আজিজের সেনাপতি বার্বার কাতামা গোত্রের আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে আম্মার খলিফার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। তবে অচিরেই তিনি উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠেন। তিনি 'আমিনউদ্দৌলাহ' উপাধি ধারণ করে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেন। ইবনে আম্মারের এরূপ ক্ষমতা বর্ধনে রাজদরবারের বারজুওয়ান নামে এক অমাত্য ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। উল্লেখ্য, বারজুওয়ান ছিলেন খলিফা আল-হাকিমের গৃহশিক্ষক এবং রাজদরবারে নিয়োজিত তুর্কি বাহিনীর প্রধান। সুন্নি বারজুওয়ান শিয়া ইবনে আম্মারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তার ইন্ধনে কায়রোতে তুর্কি-বার্বারদের মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হয়। সুযোগ বুঝে বারজুওয়ান ইবনে আম্মারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। পরে তাকে হত্যা করে বারজুওয়ান প্রধানমন্ত্রীর পদ ও খলিফার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। এ পদে তিনি প্রায় তিন বছর বহাল ছিলেন। এসময়ে তার কর্মকুশলতায় ফাতেমি রাজদরবারে তুর্কি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি ক্ষমতার দম্ভে বারজুওয়ান খলিফা হাকিমকে পর্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করতে শুরু করেন। তার ঔদ্ধত্য এমন পর্যায়ে পৌছে যে, তিনি খলিফাকে তাচ্ছিল্যভরে 'সরীসৃপ' (lizard) বলে সম্বোধন করার দুঃসাহস দেখাতে শুরু করেন। এ দিকে আল-হাকিমেরও বয়স বৃদ্ধি পেলে তিনি বারজুওয়ানের এমন আচরণ ও ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে তিনি বারজুওয়ানকে ডেকে এনে বলেন, 'ছোট সরীসৃপ এখন বড় ড্রাগনে পরিণত হয়েছে এবং এখন সে আপনাকে ভক্ষণ করতে চায়।" এরপর খলিফার নির্দেশে আবুল ফজল রায়দান নামক একজন ঘাতক বারজুওয়ানকে হত্যা করেন। O' Leary এর মতে, "বারজুওয়ানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আল-হাকিমের জীবনে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূচনা হয়। এ পর্যায়ে তিনি নিজের সক্ষমতা প্রমাণ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিস্ফুটন ঘটান।"[৫] এবার খলিফা নিজে 'আমিরুল মুমেনিন' উপাধি ধারণ করেন। তিনি মিসর বিজয়ী সেনাপতি জওহরের পুত্র হুসায়নকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। অবশ্য স্পেন থেকে আগত এবং যানাতা গোত্রের সহায়তায় বারকা দখলকারী দরবেশ আবু রাকওয়াকে সমর্থন করায় খলিফা আল-হাকিম হুসায়নকে পদচ্যুত করে আল-ফজলকে সে পদে নিয়োগ দেন। ফজল বিদ্রোহী দরবেশ ও তার অনুসারীদের পরাভূত করে বারকা পুনরুদ্ধার করেন।

আল-হাকিমের গৃহীত খামখেয়ালিপূর্ণ পদক্ষেপ: খলিফা আল-হাকিম জটিল ও রহস্যময় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। নিজ হাতে দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিনি শাসনবিষয়ক কতগুলো বিধান ও নির্দেশনা জারি করেন। এগুলোকে তার খামখেয়ালিপনার দৃষ্টান্ত বলে বিবেচনা করা হয়। ৩৯০ হিজরিতে তিনি দিনের বদলে রাতে হাট-বাজার, অফিস-আদালত চালু রাখা, রাতে অশ্বারোহণে রাজপথ পরিদর্শন প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ৩৯১ হিজরিতে রাতে মহিলাদের বের হওয়া ও দোকান খোলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। খলিফা ৩৯৩ হিজরিতে তিনি রাতে সকল কাজ করা বন্ধ ঘোষণা করেন। একই বছর তিনি গোঁড়া শিয়া সমর্থকে পরিণত হন এবং বহুবিশিষ্ট লোককে হত্যা করেন। কাজী হুসায়েন বিন নুমানকে পদচ্যুত এবং ৩৯৫ হিজরিতে তাকে হত্যা করেন। তিনি ৩৯৫ হিজরিতে বেশকিছু খামখেয়ালি বিধিনিষেধ জারি

---

[৫] Ref: *A Short History of the Fatimid Caliphate* p.132

করেন— ১. বোরকা ব্যতিরেকে মেয়েদের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধকরণ, ২. সূর্যাস্তের পর গৃহের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধকরণ, ৩. কুকুর ও শূকর পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি, ৪. সাধারণ লোককে কায়রো প্রবেশে বাধা, ৫. রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে নগ্নপদে হাঁটার নির্দেশ জারি, ৬. জোহরের নামাজ আদায় করায় বাধাদান ইত্যাদি। এ বছর খলিফা আল-হাকিম প্রথম তিন খলিফাকে (আবু বকর, ওমর ও উসমান (রা)-এর প্রতি অভিসম্পাত দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন। তারা যে জবরদখলকারী এ মর্মে একটি বাণী মসজিদ ও দোকানে ঝুলিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। তিনি সুন্নিদের প্রতি শিয়া মতবাদ গ্রহণের চাপ দেন। সুন্নিরা এতে বিক্ষুব্ধ হয় এবং রাজধানীতে নানা অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম হয়। তার শাসনামলে কোরবানি ছাড়া গরু জবাইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। খলিফা তার প্রণীত আইন ও শাসনবিধি কঠোরভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জনহিতৈষীমূলক কাজ: আল-হাকিমের মধ্যে প্রজাহিতৈষী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রজাসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং দুর্নীতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য রাজকোষ থেকে প্রদত্ত অর্থ ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কালোবাজারি ও খাদ্যশস্যের মজুদদারদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলকব্যবস্থা গ্রহণ করে জনজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখা হয়।

ধর্মীয় নীতি: খলিফা আল-হাকিম গোঁড়া ও উগ্র প্রকৃতির শিয়া ছিলেন। তিনি তার পিতা ও পিতামহের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি পরিত্যাগ করেন। তার সময়ে সুন্নি মুসলমানদের শিয়া মতবাদ গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়া হয়। ফলে সাম্রাজ্যে শিয়া-সুন্নি তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। আল-হাকিম ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রতিও অসিহষ্ণু ছিলেন। ইহুদি ও খ্রিষ্টান রাজকর্মচারীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশ অমান্যকারীদের রাজকার্য থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। এমনকি অনেককে হত্যাও করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সেনাপতি ফাহাদ এবং উজির ইসা বিন-নেস্তোরিয়াসের কথা বলা যায়। সহজে চিহ্নিত করার জন্য খলিফা আল-হাকিম ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কালো বা গাঢ় নীল রঙের পাগড়ি পরার নির্দেশ দেন। তাদের দাস-দাসী ক্রয়, এমনকি তাদের অশ্বারোহণের ওপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। খলিফার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার চরম বহিঃপ্রকাশ হলো ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমের জগদ্বিখ্যাত 'হোলি সেপালকার' (Holy Sepulchre) গির্জা ধ্বংস করা। শুধু তাই নয়, তিনি বহু গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ মনে করেন, জেরুজালেমের গির্জা ধ্বংসের ঘটনা পরবর্তী সময়ে ক্রুসেডের পটভূমি রচনায় ভূমিকা রাখে।

দ্রুজি ধর্মমতের পৃষ্ঠপোষকতা: খলিফা আল-হাকিমের রাজত্বকালে 'দ্রুজি' নামে একটি নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটে। এ মতবাদের প্রবর্তক মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-দারাজি। জাতিতে তিনি ছিলেন পারসিক অগ্নি উপাসক। পরে তিনি শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন। আল-হাকিমের সময় তিনি একটি নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। এ মতবাদ অনুযায়ী দারাজিরা খলিফাকে আল্লাহর অবতাররূপে ঘোষণা করেন। তিনি প্রচার করেন যে, কিয়ামত অতি সন্নিকটে এবং শরিয়ার বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। আল-হাকিম এ মতবাদ দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হন এবং এর প্রচার প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। শিয়াদের এই দ্রুজি শাখাটি বর্তমানে লেবাননে বসবাস করে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক: আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায় বহু মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কীর্তি হলো ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে দারুল-হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা, যা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক লেনপুল দারুল হিকমাকে আল-হাকিমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কাজ বলে অভিহিত করেছেন। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার অনেক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী ইবনে ইউনুস এবং রসায়নবিদ হাসান ইবনে হায়সাম তার দরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন, যেখানে তিনি প্রায়ই একটি নির্জন গৃহে যেতন। ইবনে খালদুনের মতে, তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করার জন্য অথবা উপাসনার জন্য সেখানে যেতেন।

চরিত্র: খলিফা আল-হাকিমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ দেখা যায়। একদিকে তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, অন্যদিকে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। বারজুওয়ান, আবু রাকওয়া এবং ইসা বিন-নেস্তোরিয়াসের হত্যাকাণ্ড তার নিষ্ঠুর ও অমানবিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। অন্যদিকে তার মধ্যে প্রজাহিতৈষণা ও পরোপকারী মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে তিনি পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু হলেও পরে এ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে।

আল-হাকিমের মৃত্যু রহস্য

খলিফা আল-হাকিমের জীবন যেমন নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিল তেমনি তার মৃত্যু বা অন্তর্ধানের বিষয়টিও রহস্যাবৃত। জানা যায়, ১০২১ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি আল-হাকিম একা আল-মুকাত্তাম পাহাড়ে ভ্রমণে যান এবং এর পর আর ফিরে আসেননি। ঐতিহাসিক মুসাব্বিহর মতে, দক্ষিণ মিসরের জনৈক বিদ্রোহী কর্তৃক আল-হাকিম নিহত হয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন, কাতামা গোত্রপতি আবু ইউসুফের ষড়যন্ত্রে খলিফাকে মুকাত্তাম পাহাড়ে হত্যা করা হয়েছিল। আবার তার হত্যার পেছনে তার বোন সিত্তুলমূলকের জড়িত থাকারও অভিযোগ রয়েছে। দ্রুজিদের বিশ্বাস আল-হাকিমের মৃত্যু হয়নি। বরং পাপাচারপূর্ণ পৃথিবীকে নিজের নির্মল ও নিষ্কলুষ মতাদর্শের জন্য অনুপযুক্ত মনে করে অন্যান্য ইমামের মতো তিনিও অন্তর্ধানে গেছেন এবং অনুকূল সময়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। বস্তুত খলিফা আল-হাকিমের মৃত্যু বা অন্তর্ধানের বিষয়ে এখনও কোনো মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল-হাকিম কত বছর বয়সে ফাতেমি সিংহাসনে বসেন?

২. আল-হাকিম কত খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করেন?

৩. কোন ফাতেমি খলিফা খামখেয়ালি শাসক হিসেবে পরিচিত?

৪. দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন কে? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

৫. কত খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠিত হয়?

৬. আল-মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন কে?

উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম যেসব খামখেয়ালিপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

গ. দলীয় কাজ

দুটি দলে বিভক্ত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্টপোষক হিসেবে ফাতেমী খলিফা আল-হাকিমের অবস্থান মূল্যায়ন করো।

পাঠ ৯

ফাতেমি খিলাফতের পতন (১১৭১ খ্রি.)
Fall of the Fatimid Khilafat (1171 AD)

ফাতেমি খিলাফত দীর্ঘ আড়াই'শ বছরেরও বেশি সময় টিকে ছিল। ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবির মাধ্যমে এ খিলাফতের চূড়ান্ত পতন ঘটে। তবে এ বংশের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি শুরু হয়েছিল আল-হাকিমের পর থেকেই। বস্তুত ১০২১ খ্রিষ্টাব্দের পর আরও প্রায় দেড়'শ বছর এ বংশ টিকে থাকে। এ সময় আরও ৮ জন খলিফা ফাতেমি সিংহাসন অলংকৃত করেন বটে, তবে তারা সবাই ছিলেন নামেমাত্র শাসক। এ সময়কালে বদর আল-জামালী এবং তার বংশধর আর্মেনীয় উজিরদের কর্মকুশলতায় ফাতেমিদের চূড়ান্ত পতন কিছুটা বিলম্বিত হয়। তবে ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি তাদের পক্ষে এড়ানো সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিকরা ফাতেমিদের অবক্ষয়, ক্রমাবনতি ও পতনের নানাবিধ কারণ নির্দেশ করেছেন। যেমন—

প্রাকৃতিক নিয়ম: ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে, একটি রাজবংশের স্বাভাবিক কর্মশক্তি ও গৌরব বড়জোর এক'শ বছর বজায় থাকে। এর পর শুরু হয় এর ক্রমাবনতি এবং পরিশেষে পতন। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। ফাতেমিদের ক্ষেত্রেও প্রকৃতির এ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি। বস্তুত ৯০৯-১০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এদের গৌরবকাল এবং এর পরই শুরু হয় অবক্ষয় এবং ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে চূড়ান্ত পতন।

পরবর্তী খলিফাদের দুর্বলতা: খলিফা আল-হাকিমের মৃত্যুর পর আল-জাহির (১০২১-১০৩৫ খ্রি.), আল-মুস্তানসির (১০৩৫-১০৯৪ খ্রি.), আল- মুস্তালী (১০৯৪-১১০১ খ্রি.), আল-আমির (১১০১-১১৩০ খ্রি.), আল-হাফিজ (১১৩০-১১৪৯ খ্রি.), আল-জাফির (১১৪৯-১১৫৪ খ্রি.), আল-ফাইজ (১১৫৪-১১৬০ খ্রি.) এবং আল-আজীদ (১১৬০-১১৭১ খ্রি.) পর্যায়ক্রমে ফাতেমি খিলাফতের সিংহাসন অলংকৃত করেন। তবে এ ৮ জন খলিফার কেউই যোগ্য ছিলেন না। তারা ছিলেন দুর্বল, অযোগ্য ও ব্যক্তিত্বহীন। তাদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার সুযোগে তাদেরকে সামনে রেখে এ সময় উজিরকুলই সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। দুর্ভাগ্যজনক হলো বদর আল-জামালী ও তার আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত কয়েকজন উজির ছাড়া বাকি সকল উজিরই ছিলেন ক্ষমতালোভী ও স্বার্থপর। দুর্বল ও অযোগ্য খলিফা এবং স্বার্থান্ধ ও কুচক্রী মন্ত্রীদের কুশাসনের ফলে ফাতেমি খিলাফতের ক্রমাবনতি ও পতন ঘটে।

অভ্যন্তরীণ গোলযোগ

তুর্কি, বার্বার ও নিগ্রোদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে ফাতেমি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি বিনষ্ট হয়। এ অরাজকতার সুযোগে একের পর এক প্রদেশগুলো স্বাধীন বা হস্তচ্যুত হতে শুরু করে। ১০৪৩ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ফাতেমিদের হস্তচ্যুত হয়। খলিফাদের ক্ষমতা কেবল মিসর ও ইফ্রিকিয়াতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ইসমাঈলীয়দের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি: ফাতেমিরা ছিল শিয়া ইসমাঈলীয় মতবাদে বিশ্বাসী। খলিফা আল-মুস্তানসিরের পর ইসমাঈলীয় আদর্শের সমর্থক শিয়াদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ফলে তারা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। খলিফা আল-আমিরের মৃত্যুর পর একটি বড় জনগোষ্ঠীর সমর্থন প্রত্যাহার করে সুলাহিদ বংশ প্রতিষ্ঠা করায় ফাতেমিরা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

যোগ্য নেতৃত্বের অভাব: ফাতেমি খলিফাগণ বিশেষ করে আল-হাকিম সাম্রাজের বহুযোগ্য সামরিক ও বেসামরিক লোককে হত্যা ও ক্ষমতা থেকে অপসারণ করায় খিলাফতে যোগ্য নেতৃত্বশূন্যতা দেখা দেয়। নেতৃত্বের এ শূন্যতা খিলাফতকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং শেষ পরিণামে এটি খিলাফতের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্র: ফাতেমিদের পতনে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। খলিফা আল-হাকিম প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হন। তার মৃত্যুর পর বোন সিত্তুলমূলক রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। খলিফা মুনতানসিরের মা ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ দাসী। তিনি বালক পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং নিগ্রো ও তুর্কিদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করেন। এ সংঘর্ষ এক পর্যায়ে প্রকট আকার ধারণ করে, যা ফাতেমিদের মেরুদণ্ড চুরমার করে দেয়।

জেনে রাখো

সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ১১৩৭ খ্রিষ্টাব্দে দজলা (টাইগ্রিস) নদীর তীরে অবস্থিত তিকরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কুর্দি জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং সুন্নি মতাদর্শের অনুসারী। তার বাবা ছিলেন কুর্দি নেতা আইয়ুব। তিনি তৃতীয় ক্রুসেডে (১১৮৯-১১৯২ খ্রি.) মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে জয়লাভ করেন, যা তাকে ইসলামের ইতিহাসে আকর্ষণীয় ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। ইসলামের এই বীর যোদ্ধা ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৫৫ বছর বয়সে দামাস্কাসে মৃত্যুবরণ করেন।

তুর্কি সেনাদের ঔদ্ধত্য: মাগরিবি বার্বারদের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য খলিফা আল-আজিজ তুর্কিদের দ্বারা একটি সেনা ইউনিট গঠন করেছিলেন। সাময়িক সময়ের জন্য এ পদক্ষেপ ফাতেমি খিলাফতের জন্য কল্যাণ বয়ে আনলেও পরে এরাই সাম্রাজ্যের জন্য নতুন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তুর্কি প্রহরী দল একসময় সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয় এবং তাদের চরম ঔদ্ধত্য ফাতেমি খিলাফতে রাজনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।

অর্থনৈতিক দুর্বলতা: দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা ফাতেমি খিলাফতের অবক্ষয় ও পতনের অন্যতম কারণ ছিল। আল-আজিজের পর থেকে ফাতেমি খলিফারা আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সাফল্য দেখাতে পারেননি। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের পথে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

দুর্ভিক্ষ ও সালাহউদ্দিনের আক্রমণ

ফাতেমি খিলাফতের শেষদিকে কয়েক বছর যাবৎ ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ দেশের আর্থিক বুনিয়াদ ভেঙে দেয়। প্রজারা করভারে জর্জরিত হয়। ক্রুসেডারদের পুনঃপুন আক্রমণে ফাতেমিদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে ক্রুসেডের কিংবদন্তি বীরযোদ্ধা গাজী সালাহউদ্দিন ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে সর্বশেষ খলিফা আল-আজিদকে সিংহাসনচ্যুত করে মিসর দখল করেন। এভাবে উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর প্রতিষ্ঠিত দু'শতাধিক বছরের পুরনো ফাতেমি বংশের অবসান ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমি খিলাফতের চূড়ান্ত পতন ঘটে?
২. কত খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ফাতেমিদের হস্তচ্যুত হয়?
৩. কোন ফাতেমি খলিফা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হন?
৪. ফাতেমি খিলাফতে রাজনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল কারা?
৫. ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে মিসর আক্রমণ করেন কে?
৬. সর্বশেষ ফাতেমি খলিফা কে?

উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ফাতেমি খিলাফতের দুর্বল শাসকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
২. ফাতেমি খিলাফতের পতনের কারণগুলো চিহ্নিত করে ছক আকারে লেখো।

পাঠ ১০

ফাতেমিদের সময় উত্তর আফ্রিকা এবং মিসরে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ
Development of Civilization and Culture in North Africa and Egypt in the Period of Fatimids

ফাতেমি খিলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়, যা তৎকালীন বিশ্বে বিরল ছিল। এ বংশের শাসকদের মধ্যে অধিকাংশই সুশাসক ছিলেন। উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম সভ্যতা বা সংস্কৃতি বলতে ফাতেমি ও মামলুক সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই বোঝানো হয়। সংস্কৃতিমনা ফাতেমিদের সময় উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় তার কিছু নিদর্শন নিচে তুলে ধরা হলো:

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়

আল-আজহার মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়: খলিফা আল-মুইজের সুযোগ্য সেনাপতি জওহর ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসর জয় করে আল-কাহিরা (কায়রো) নগরীর গোড়াপত্তন করেন। সেনাপতি সেখানে বিবি ফাতেমাতুজ জোহরার স্মরণে ৯৭০ খিষ্টাব্দে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। মসজিদটির নির্মাণে ইট, মর্মর পাথর, কাঠ, পাথর ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। মসজিদটির দেয়াল উত্তর-পশ্চিমে ২৭৮ ফুট, দক্ষিণ-পূর্বে ২৯৭ $\frac{৪}{৩}$ফুট, উত্তর-পূর্বে ২১৬ ফুট এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ২২৩ $\frac{১}{২}$ ফুট ছিল। পরবর্তীকালে খলিফা আল-আজিজ এ মসজিদে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। এ পাঠাগারই পরবর্তীকালে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব লাভ করেছে। আল-আজাহার অর্থ জমকালো। বাস্তবিকই ধর্মীয় দিক থেকে এটি একটি জমকালো ইমারত ছিল। ৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এখানে মহাবিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়। উল্লেখ্য, শুরুতে আল-আজহারে কেবল কুরআন ও ইসলামি আইনশাস্ত্রের পাঠ দেওয়া হতো। কালক্রমে এর পাঠক্রমে আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামি জ্যোতির্বিদ্যা, মুসলিম দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব বিষয়ে পাঠ দানের জন্য দেশি-বিদেশি বিজ্ঞ পণ্ডিতদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান ছিলেন আবু ইয়াকুব নামের একজন পণ্ডিত। ফাতেমি শাসকদের প্রায় সকলেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত জ্ঞান বিতরণ করার পর ধর্মবিরোধী মতবাদ প্রচারের অভিযোগে উজির আল-আফজাল এটি বন্ধ করে দেন। পরবর্তীকালে ৮৮ বছর পর তা আবার খুলে দেওয়া হয়। এরপর এটি দার্শনিক, বিজ্ঞানী, কবিদের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গণ্য করা হয়। বস্তুত মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে এ বিশ্ববিদ্যালয়টির অতুলনীয় অবদান রয়েছে।

দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠা: ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে বিখ্যাত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞানভবন নির্মাণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেন। এটি আব্বাসি শাসনামলে নির্মিত বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছে। শিয়া মতবাদ নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি এখানে হাজির হতেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। এ প্রতিষ্ঠানে কাব্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ তুলনামূলক আইন, তর্কশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান প্রভৃতি চর্চা করা হতো। কুরআন-হাদিস, ফিকাহ ও প্রকৃত বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিয়োজিত ছিলেন। দারুল হিকমার সাথে একটি বিশাল গ্রন্থাগার যুক্ত ছিল। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র ড্রেস কোড ছিল। খলিফা আল-হাকিম এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য তৎকালের বিখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইবনে হায়সামকে এর তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। তিনি প্রায় ১০০ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সাহিত্যচর্চা: ফাতেমি খলিফারা জ্ঞানপিপাসু ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাদের কুতুবখানায় (লাইব্রেরি) আরবদের জ্ঞানের সর্বশাখা এবং সাহিত্যের লক্ষাধিক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। ইবনে মুকলা ও অন্যান্য হস্তলিপিবিশারদদের লিখিত পাণ্ডুলিপির ২৪০০ কুরআন, ৩০টি বড় আরবি অভিধান এবং ইবনে দুবায়দের ১০০টি জামহারা সংগৃহীত ছিল। ফাতেমিদের পৃষ্ঠপোষকতায় চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিদ্যাচর্চায় বিশেষ অবদান রাখেন ইহুদি মুসা বিন আল-সাজ্জান এবং তদীয় পুত্রদ্বয় ইসহাক ও ইসমাঈল। সাঈদ বিন বাতরিক (চিকিৎসক), ঐতিহাসিক আল-কিন্দি, সাহিত্যিক ও কবি ইবনে খাল্লাস এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইবনে হায়সাম ফাতেমিদের দরবার অলংকৃত করে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে শীর্ষ শিখরে উন্নীত করেন। ইবনে হায়সাম 'কিতাবুল মানাজির' নামে একটি বিখ্যাত চক্ষুবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র: ফাতেমি খলিফা মুইজ ছিলেন চিকিৎসাবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষ পারদর্শী। তার শাসনামলে ইহুদি চিকিৎসক মুসা বিন আল-সাজ্জান দুই পুত্রসহ চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ফাতেমি আমলে আরেকজন খ্যাতিমান চিকিৎসক ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার সাঈদ-বিন-বাতরিক। ফাতেমি আমলে ইবনে হায়সাম চক্ষু চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তার চক্ষুবিষয়ক গ্রন্থ 'কিতাব আল-মানাজির' খুবই প্রসিদ্ধ ছিল।

স্থাপত্য, চারু ও কারুশিল্প: অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ায় ফাতেমিরা আল-আজহার ছাড়াও অসংখ্য সৌধ, প্রাসাদ, মসজিদ, মিনার প্রভৃতি স্থাপন করেন। এগুলোর মধ্যে আল-আকসার, আল-সালেহ এবং ইবনে রাজ্জাকের মসজিদ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। প্রসঙ্গত খলিফা আল-মুইজ নির্মিত কায়রোর ফসর-উল-বাহার এবং ফসর-উল-মুইজি প্রাসাদের নাম উল্লেখ করা যায়। এডেসার স্থাপত্য শিল্পীদের নির্মিত কায়রোর বাব-আল-নসর, বাব-আল-ফুতুহ ও বাব-আল-জুবায়দা নামক তিনটি বিরাট তোরণ ফাতেমি স্থাপত্যের সর্বাপেক্ষা স্থায়ী নিদর্শনরূপে বিবেচিত হয়। চারু ও কারুশিল্পেও ফাতেমিরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। হাতির দাঁতের ওপর কারুশিল্প এবং মৃৎশিল্পের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন জাদুঘরে বিদ্যমান। ফাতেমি যুগের দু'জন বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন আল-কাসির ও ইবনে আজিজ। উজির আল-আজুরির পৃষ্ঠপোষকতায় এরা চিত্রচর্চা করেন। চিত্রকলা ছাড়াও ফাতেমি শিল্পীরা রেশমি কাপড়, বুটিদার বস্ত্র, মখমল ও অন্যান্য কাপড়ের মধ্যে স্বর্ণসূতা ব্যবস্থা করে বিভিন্ন ধরনের বয়নকার্য করতে পারতেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং স্থাপত্য ও শিল্পকলা তথা সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে ফাতেমিদের অবদান অতুলনীয়। সুরুচিবোধসম্পন্ন ও সংস্কৃতিবান খলিফা ও উজিরবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ফাতেমি যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে চরম বিকাশ সাধিত হয়, তা পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্ব এমনকি ইউরোপীয় সভ্যতাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফাতেমিরা কোথায় মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল?
২. আল-আজহার মসজিদ নির্মাণ করা হয় কোথায়?
৩. আল-আজহার মসজিদে শিক্ষায়তন যুক্ত করেন কে?
৪. 'আল-আজহার' শব্দের অর্থ কী?
৫. বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি?
৬. কায়রোর দারুল হিকমা কীসের অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছিল?

উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ফাতেমি শাসনামলের বিখ্যাত পণ্ডিতদের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. ফাতেমি; ২. উত্তর আফ্রিকায়; ৩. খলিফা নির্বাচনকে; ৪. খলিফা হযরত আলি (রা)-এর; ৫. ইসমাঈলীয়; ৬. মাগরিব।

পাঠ-২: ১. ৯০৯; ২. উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী; ৩. আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী; ৪. ফাতেমি ইমাম সাঈদ-বিন-আল-হুসায়নকে; ৫. ১৪ জন; ৬. গাজি সালাউদ্দিন আইয়ুবি।

পাঠ-৩: ১. উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী; ২. ২৬ (৯০৯-৯৩৪ খ্রি.); ৩. উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী; ৪. কায়রোয়ানের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে; ৫. ৯১৪; ৬. ফাতেমি খলিফা আল-মনসুর।

পাঠ-৪: ১. আল-মুইজ; ২. ৯৫২; ৩. আল-মুইজ (৯৬৬ খ্রি.); ৪. জওহর আল-সিকিল্লি; ৫. ৯৬৯; ৬. আল-কাহিরা আল-মাহরুসা।

পাঠ-৫: ১. আল-মুইজ; ২. তেইশ; ৩. মিসর বিজয়; ৪. ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সময়; ৫. কায়রো; ৬. আল-কাহিরা।

পাঠ-৬: ১. পঞ্চম; ২. ফাতেমি খলিফা আল-আজিজ; ৩. ইয়াকুব বিন কিল্লিস; ৪. কাতামা ও বার্বাররা; ৫. আল-মুইজের; ৬. ভূমধ্যসাগরীয়।

পাঠ-৭: ১. আল-আজিজ; ২. তুর্কি ও নিগ্রোদের; ৩. মিসরে; ৪. ফাতেমি খলিফা আল-আজিজ; ৫. আল-আজিজের; ৬. ২২।

পাঠ-৮: ১. ১১; ২. ৯৯৬; ৩. আল- হাকিম; ৪. ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম; ৫. ১০০৫; ৬. ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম।

পাঠ-৯: ১. ১১৭১; ২. ১০৪৩; ৩. খলিফা আল-হাকিম; ৪. আল-আজিজের সময়ে গঠিত তুর্কি বাহিনী; ৫. গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবি; ৬. আল-আজিদ।

পাঠ-১০: ১. উত্তর আফ্রিকায়; ২. মিসরে; ৩. ফাতেমি খলিফা আল-আজিজ; ৪. জমকালো; ৫. আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়; ৬. বাগদাদের বায়তুল হিকমা।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ফাতেমি	ইসলামের চতুর্থ খলিফা ও মুহাম্মদ (স)-এর জামাতা হযরত আলি (রা) ও নবিকন্যা ফাতেমা (রা)-এর বংশধররা ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত। ইসলামের একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দল হলো শিয়া। এর দুটি প্রধান উপদল হলো ইছনা আশারিয়া এবং সাবিয়া। সাবিয়া বা সপ্তম ইমামে বিশ্বাসীদের বলা হয় ইসমাঈলীয় শিয়া। এরাই উত্তর আফ্রিকায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে। ইসমাঈলীয়রা নিজেদের নবিকন্যা বিবি ফাতেমা এবং জামাতা হযরত আলি (রা)-এর বংশধর বলে দাবি করে। তাই তাদেরকে ফাতেমি বলা হয়। ফাতেমি খিলাফত ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইসমাঈলীয়দের সহায়তায় উত্তর আফ্রিকায় উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে ৯০৯ সালে ফাতেমি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।
ফাতেমি আন্দোলন	হযরত আলি (রা) ও নবিকন্যা ফাতেমা (রা)-এর বংশধর শিয়ারা শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন করেছিল, তাই ফাতেমি আন্দোলন নামে পরিচিত। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন পারস্যের আওয়াজ ও সিরিয়ার সালামিয়াতে ইসমাঈলীয় শিয়া মতবাদ প্রচারকার্যের কেন্দ্র স্থাপন করে বিভিন্ন স্থানে দাঈ প্রেরণ করেন। ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হলে তার শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী ইসমাঈলীয় মতবাদ প্রচারের দায়িত্ব নেন এবং ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর আফ্রিকায় গমন করেন। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবি শাসক জিয়াদাতুল্লাহকে পরাজিত কর আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী সাঈদ বিন হুসায়নকে উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি ঘোষণা করে ফাতেমি বংশের সূচনা করেন।
দাঈ	'দাঈ' অর্থ প্রচারক। যারা ইসলাম প্রচার করেন, ইসলামি শিক্ষা দেন এবং ইসলামি মতাদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন, তাদেরকে দাঈ বলা হয়। ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার আগে ইমাম জাফর আস-সাদিকের নেতৃত্বে শিয়াদের আন্দোলন সুসংহত হয়। তিনি শিয়া মতবাদ প্রচারের জন্য চারদিকে প্রচারক প্রেরণ করেন। এ প্রচারকদেরকে বিশেষভাবে দাঈ বলা হয়।

সাবিয়া	সাবিয়া হলো শিয়াদের একটি উপদল যারা সাতজন ইমামে বিশ্বাসী। শিয়ারা তাদের ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস সাদিক পর্যন্ত ইমামত নিয়ে মতপার্থক্য করে না। জাফর আস-সাদিক মৃত্যুর আগে পুত্র ইসমাঈলকে ইমাম মনোনীত করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পূর্বে ইসমাঈলের মৃত্যু হলে তিনি তার অপর পুত্র মুসা আল-কাজিমকে ইমাম মনোনীত করেন। কিন্তু শিয়াদের একটি অংশ মুসা আল-কাজিমকে অস্বীকার করে। তারা ইসমাঈলকে সপ্তম ইমাম এবং তার পুত্র মুহম্মদ আল-মাকতুমকে তার উত্তরসূরি মনে করে। তারা এটিও প্রচার করে যে, ইসমাঈলের পর থেকে জাহেরি তথা প্রকাশ্য ইমামত শেষ এবং মুহাম্মদ আল-মাকতুম থেকে বাতেনি বা গুপ্ত ইমামের যুগ শুরু হয়েছে। শিয়াদের এ দলটি সাবিয়া বা সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী বলা হয়।
ইছনা আশারিয়া	শিয়া সম্প্রদায়ের যে দলটি দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী ছিল তারাই হলো ইছনা আশারিয়া। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে কারবালার প্রান্তরে সংঘটিত মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে শিয়াদের উৎপত্তি হয়। এই শিয়ারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একদল হলো ইছনা আশারিয়া আর অন্যদল হলো ইসমাঈলীয়। ইছনা আশারিয়া অর্থ দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী। সুতরাং, শিয়াদের মধ্যে যে দল দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী ছিল তারাই ইছনা আশারিয়া নামে পরিচিত। তাদের মতে, মুহম্মদ আল-মুন্তাজির পুনরায় আবির্ভূত হয়ে সত্য ও ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। মুহাম্মদ আল-মুন্তাজিরের সময়কাল ছিল ৮৭৪–৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
আল-কাহিরা	'আল-কাহিরা' হলো খলিফা আল-মুইজের শাসনামলে (৯৫২-৯৭৫ খ্রি.) মিসরে প্রতিষ্ঠিত ফাতেমি খিলাফতের রাজধানী। আল-কাহিরা অর্থ 'বিজয়িনী'। ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি জওহর ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আফ্রিকার মিসর জয় করেন। বিজয়ের স্মারক হিসেবে তিনি তৎকালীন মিসরের রাজধানী ফুসতাতের উপকণ্ঠে একটি নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এর নাম দেওয়া হয় 'আল-কাহিরা'। কাহিরা শব্দ থেকেই কায়রো (বর্তমান মিসরের রাজধানী) নামের উৎপত্তি। ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে আল-কাহিরা বা কায়রো রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।
আল-আজহার	আল-আজাহার অর্থ জমকালো। খলিফা আল-মুইজের সুযোগ্য সেনাপতি জওহর ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসর জয় করে আল-কাহিরা (কায়রো) নগরীর গোড়াপত্তন করেন। সেনাপতি সেখানে বিবি ফাতেমাতুজ জোহরার স্মরণার্থে ৯৭০ খিষ্টাব্দে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। মসজিদটির নির্মাণে ইট, মর্মর পাথর, কাঠ, পাথর ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। মসজিদটির দেয়াল উত্তর-পশ্চিমে ২৭৮ ফুট, দক্ষিণ-পূর্বে ২৯৭ $\frac{৪}{৩}$ ফুট, উত্তর-পূর্বে ২১৬ ফুট এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ২২৩ $\frac{১}{২}$ ফুট ছিল। পরবর্তীকালে খলিফা আল-আজিজ এ মসজিদে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। এ পাঠাগারই পরবর্তীকালে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব লাভ করেছে। ৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এখানে মহাবিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়।
দারাজি	ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের প্রবর্তিত নতুন ধর্মের অনুসারীদেরকে দারাজি বা দ্রুজ বলা হতো। উদ্ভট ও খামখেয়ালি চিন্তার ধারক আল-হাকিম ইসমাঈলীয় মতবাদের সূত্র ধরে নিজেকে আল্লাহর অবতার মনে করেন। তার ধারণা ছিল তার মধ্যে আল্লাহর নিজের রূপ পরিগ্রহ করেছেন। আর এ ধরনের মতাদর্শে যারা বিশ্বাসী ছিল, তারাই দারাজি বা দ্রুজ নামে পরিচিত ছিল।
দারুল হিকমা	দারুল হিকমা অর্থ বিজ্ঞান ভবন। এটি ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের নির্মিত একটি জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র। খলিফা আল-হাকিম ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রধানত শিয়া মতাদর্শ বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণার জন্য মিসরে এটি নির্মাণ করেন। তবে এ ছাড়াও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু অমূল্য গ্রন্থ এতে সংগৃহীত ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিতরা এখানে জ্ঞানচর্চা এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতেন। বিখ্যাত দার্শনিক এবং চক্ষু ও পদার্থবিজ্ঞানী ইবনে হায়সাম ছিলেন তাদের অন্যতম। বাগদাদের বায়তুল হিকমার (জ্ঞানগৃহ) অনুকরণে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

■ একনজরে ফাতেমি খিলাফতের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি

সময় (খ্রি.)	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
৯০৯	উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে মিসরে ফাতেমি খিলাফতের উত্থান ঘটে। খারিজিদের দমন, রাজ্যবিস্তার ও সামরিক সংস্কার সাধন করে ফাতেমি খিলাফতকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন।
৯৫২	খলিফা আল-মুইজের ক্ষমতারোহণ।
৯৫৫	আল-মুইজের মরক্কো বিজয়।
৯৬১	আল-মুইজের ক্রিট দ্বীপ দখল।
৯৬৬	আল-মুইজের সিসিলিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।
৯৬৯	আল-মুইজের সেনাপতি জওহর মিসর বিজয় করেন।
৯৭৫	আল-মুইজের মৃত্যু। আল-আজিজের সিংহাসনে আরোহণ। সিরিয়া অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, তুর্কি বাহিনী গঠন, আলেপ্পোতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাতেমি প্রভাবকে বিস্তৃত করেন।
৯৯৬	আল-আজিজের পর আল-হাকিমের ক্ষমতারোহণ।
১১৭১	সালাহউদ্দিন আইয়ুবির হাতে ফাতেমিদের পতন ঘটে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ ফাতেমিদের পরিচয় ও উত্থান এবং উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি

প্রশ্ন-১. ফাতেমি কারা?
উত্তর: হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জামাতা আলি (রা) এবং কন্যা ফাতিমা (রা)-এর বংশধররা ফাতেমি নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২. শিয়া সম্প্রদায় কয়ভাগে বিভক্ত?
উত্তর: শিয়া সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত।

প্রশ্ন-৩. সাতজন ইমামে বিশ্বাসী ইসমাঈলীয়রা কী নামে পরিচিত?
উত্তর: সাতজন ইমামে বিশ্বাসী ইসমাঈলীয়রা সাবিয়া নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৪. কত খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়?
[সকল বোর্ড ২০১৬]
উত্তর: ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৫. 'দাঈ' অর্থ কী?
[রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৭]
উত্তর: 'দাঈ' অর্থ প্রচারক।

প্রশ্ন-৬. ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হলেন উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী।

প্রশ্ন-৭. ফাতেমি খিলাফত কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: উত্তর আফিকায় (ইফ্রিকিয়া) ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৮. ফাতেমি ইতিহাসে আশ-শিয়ী (সর্বোত্তম শিয়া) ও মুয়াল্লিম (উপদেষ্টা) হিসেবে পরিচিত ছিলেন কে?
উত্তর: ফাতেমি ইতিহাসে আশ-শিয়ী (সর্বোত্তম শিয়া) ও মুয়াল্লিম (উপদেষ্টা) হিসেবে পরিচিত ছিলেন আবু আব্দুল্লাহ।

প্রশ্ন-৯. কোন বংশের শাসনকে উৎখাত করে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
উত্তর: আগলাবি বংশের শাসনকে উৎখাত করে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রশ্ন-১০. উত্তর আফ্রিকায় আগলাবি বংশের শেষ শাসক কে?
উত্তর: উত্তর আফ্রিকায় আগলাবি বংশের শেষ শাসক ছিলেন জিয়াদাতউল্লাহ।

প্রশ্ন-১১. মিসরে ফাতেমিরা কত বছর রাজত্ব করেন?
উত্তর: মিসরে ফাতেমিরা দুইশত বছর রাজত্ব করেন।

■ ফাতেমি খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আল-মুইজের অবদান

প্রশ্ন-১২. আল-মনসুরের পুত্র আবু তামিম মা'আদ কী উপাধি গ্রহণ করে ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করেন?
উত্তর: আল-মনসুরের পুত্র আবু তামিম মা'আদ 'আল-মুইজ' উপাধি গ্রহণ করে ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করেন।

প্রশ্ন-১৩. ফাতেমি খিলাফতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে?
উত্তর: আল-মুইজ ফাতেমি খিলাফতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক।

প্রশ্ন-১৪. কাকে পাশ্চাত্যের মামুন বলা হয়?
উত্তর: ফাতেমি খলিফা আল-মুইজকে পশ্চাত্যের মামুন বলা হয়।

প্রশ্ন-১৫. 'আল-কাহিরা' অর্থ কী?
উত্তর: আল-কাহিরা অর্থ বিজয়িনী।

প্রশ্ন-১৬. মিসর বিজয়ী সেনাপতির নাম কী? *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]*
উত্তর: মিসর বিজয়ী সেনাপতির নাম জওহর।

প্রশ্ন-১৭. জওহর কে ছিলেন? *[ঢাকা বোর্ড ২০১৭]*
উত্তর: জওহর ছিলেন ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি এবং আল-কাহিরা (কায়রো) নগরীর গোড়াপত্তনকারী।

প্রশ্ন-১৮. উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে কে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন? *[ঢা., দি., সি., য. বোর্ড ২০১৮]*
উত্তর: উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন-১৯. আল-মুইজ কত বছর রাজত্ব করেন?
উত্তর: আল-মুইজ সুদীর্ঘ ২৩ বছর রাজত্ব করেন।

প্রশ্ন-২০. আল-কাহিরা শহরের গোড়াপত্তন করেন কে?
উত্তর: ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি আল-জওহর আল-কাহিরা (বর্তমান কায়রো) শহরের গোড়াপত্তন করেন।

প্রশ্ন-২১. আল-জওহর কার স্মরণে 'আল-আজহার' মসজিদটি নির্মাণ করেন?
উত্তর: আল-জওহর মিসরে বিবি ফাতেমা স্মরনে 'আল-আজহার' মসজিদটি নির্মাণ করেন।

■ মিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে আল-আজিজ ও আল-হাকিমের অবদান

প্রশ্ন-২২. কার শাসনামলকে ফাতেমি খিলাফতের স্বর্ণযুগ বলা হয়?
উত্তর: খলিফা আল-আজিজের শাসনামলকে ফাতেমি খিলাফতের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

প্রশ্ন-২৩. আল-আজিজ কাকে প্রধানমন্ত্রিত্ব দান করেন?
উত্তর: আল-আজিজ ইবনে কিল্লিসকে প্রধানমন্ত্রিত্ব দান করেন।

প্রশ্ন-২৪. ইবনে কিল্লিস কত বছর প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল ছিলেন?
উত্তর: ইবনে কিল্লিস ১৫ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল ছিলেন।

প্রশ্ন-২৫. স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম নিদর্শন সোনালি প্রাসাদ কোন শাসকের আমলে নির্মিত?
উত্তর: স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম নিদর্শন সোনালি প্রাসাদ খলিফা আল-আজিজের শাসনামলে নির্মিত।

প্রশ্ন-২৬. আল-আজিজ কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর: আল-আজিজ ৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন-২৭. আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় মিসরের কায়রোতে অবস্থিত।

প্রশ্ন-২৮. 'আল-মনসুরা' কীসের নাম?
উত্তর: ফাতেমি খলিফা আল-মনসুরের নির্মিত একটি সুরম্য নগরীর নাম 'আল-মনসুরা'।

প্রশ্ন-২৯. আল-হাকিম কত বছর ক্ষমতায় ছিলেন?
উত্তর: আল-হাকিম ২৬ বছর ক্ষমতায় ছিলেন।

প্রশ্ন-৩০. আল-হাকিমের পিতার নাম কী?
উত্তর: আল-হাকিমের পিতার নাম আল-আজিজ।

প্রশ্ন-৩১. কত বছর বয়সে আল-হাকিম ফাতেমি সিংহাসনে আরোহণ করেন?
উত্তর: মাত্র ১১ বছর বয়সে আল-হাকিম ফাতেমি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রশ্ন-৩২. অল্প বয়সের কারণে আল-হাকিমের প্রতিনিধি হিসেবে কে শাসন কাজ পরিচালনা করতেন?
উত্তর: অল্প বয়সের কারণে আল-হাকিমের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন কাজ পরিচালনা করতেন তার পিতার সময়কার প্রাদেশিক শাসনকর্তা বারজুয়ান।

প্রশ্ন-৩৩. কোন খলিফা নিজেকে আল্লাহর অবতার ঘোষণা করেন?
উত্তর: ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম নিজেকে আল্লাহর অবতার ঘোষণা করেন।

প্রশ্ন-৩৪. দারুল হিকমা কে নির্মাণ করেন?
উত্তর: ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম মিসরের কায়রোতে দারুল হিকমা নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন-৩৫. আল-হাকিম কোন পাহাড়ের ওপর মানমন্দির নির্মাণ করেন?
উত্তর: আল-হাকিম মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর মানমন্দির নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন-৩৬. খলিফা আল-হাকিমের দরবারে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কে ছিলেন?
উত্তর: খলিফা আল-হাকিমের দরবারে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন আলী ইবনে ইউনুস।

প্রশ্ন-৩৭. আল-হাকিমের পিতার নাম কী?
উত্তর: আল-হাকিমের পিতার নাম আল-আজিজ।

প্রশ্ন-৩৮. দারাজিরা প্রকাশ্যে আল-হাকিমকে কী বলে ঘোষণা দেয়?
উত্তর: দারাজিরা প্রকাশ্যে আল-হাকিমকে খোদার অবতার বলে ঘোষণা দেয়।

প্রশ্ন-৩৯. ফাতেমি খিলাফতের ইতিহাসে খামখেয়ালি শাসক হিসেবে খ্যাত কে?
উত্তর: ফাতেমি খিলাফতের ইতিহাসে খামখেয়ালি শাসক হিসেবে খ্যাত খলিফা আল-হাকিম।

■ ফাতেমিদের পতনের কারণ

প্রশ্ন-৪০. ফাতেমি খিলাফতের সর্বশেষ খলিফা কে ছিলেন?
উত্তর: ফাতেমি খিলাফতের সর্বশেষ খলিফা ছিলেন আল-আজিদ।

প্রশ্ন-৪১. কার কাছে ফাতেমিদের চূড়ান্ত পতন ঘটে?
উত্তর: ক্রুসেডের কিংবদন্তি বীরযোদ্ধা গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবির কাছে ফাতেমিদের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

প্রশ্ন-৪২. ফাতেমিদের পতনের পর মিসরে কোন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ফাতেমিদের পতনের পর মিসরে আইয়ুবি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ উত্তর আফ্রিকায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ

প্রশ্ন-৪৩. 'আল-আজহার' অর্থ কী?

উত্তর: আল-আজহার অর্থ জমকালো।

প্রশ্ন-৪৪. বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কী?

উত্তর: বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হলো আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্ন-৪৫. আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন কে?

উত্তর: ফাতেমি খলিফা আল-আজিজ আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন-৪৬. দারুল হিকমা কী?

উত্তর: মিসরের কায়রোতে ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানাগারই দারুল হিকমা।

প্রশ্ন-৪৭. মিসরে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা কীসের অনুকরণে তৈরি?

উত্তর: মিসরে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে তৈরি।

প্রশ্ন-৪৮. ফসর-উল-বাহার কী?

উত্তর: ফসর-উল-বাহার হলো ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কায়রোতে নির্মিত একটি প্রাসাদ।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. ফাতেমি কারা? ব্যাখ্যা করো।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো.২০১৮]

উত্তর: ইসলামের চতুর্থ খলিফা ও মুহাম্মদ (স)-এর জামাতা হযরত আলি (রা) ও নবিকন্যা ফাতেমা (রা)-এর বংশধররা ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত।

ইসলামের একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দল হলো শিয়া। এর দুটি প্রধান উপদল হলো ইছনা আশারিয়া এবং সাবিয়া। সাবিয়া বা সপ্তম ইমামে বিশ্বাসীদের বলা হয় ইসমাঈলীয় শিয়া। এরাই উত্তর আফ্রিকায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে। ইসমাঈলীয়রা নিজেদের নবিকন্যা বিবি ফাতেমা (রা) এবং জামাতা হযরত আলি (রা)-এর বংশধর বলে দাবি করে। তাই তাদেরকে ফাতেমি বলা হয়। উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত খিলাফত 'ফাতেমি খিলাফত' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২. উত্তর আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত খিলাফতকে ফাতেমি খিলাফত বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

উত্তর: ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা) ও নবিকন্যা হযরত ফাতেমা (রা) এর বংশধররা উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে এ খিলাফতকে ফাতেমি খিলাফত বলা হয়।

ইসমাইলীয়রাই উত্তর আফ্রিকায় উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে ৯০৯ সালে একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। তারা নিজেদেরকে রাসুল (স)-এর কন্যা বিবি ফাতেমা (রা) এবং জামাতা আলি (রা)-এর বংশধর বলে দাবি করেন। এজন্য তাদের প্রতিষ্ঠিত খিলাফতকে ফাতেমি খিলাফত বলা হয়।

প্রশ্ন-৩. ইসমাঈলীয় কারা? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে শিয়া সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিকের মৃত্যুর পর শিয়া সম্প্রদায় যে দুটি ভাগে বিভক্ত হয় তাদের একটি ইসমাঈলীয় হিসেবে পরিচিত। জাফর সাদিক তার মৃত্যুর পূর্বে পুত্র ইসমাঈলকে ইমামতির দায়িত্ব দেন এবং পিতার মৃত্যুর আগেই ইসমাঈল মৃত্যুবরণ করলে দ্বিতীয় মুসা আল-কাজিমকে ইমামতি দান করা হয়। যারা আল-কাজিমকে ইমাম হিসেবে মেনে নিতে পারেনি তাদের ইসমাঈলীয় বলা হয়।

প্রশ্ন-৪. আবু আব্দুল্লাহ কীভাবে বার্বার কাতামা গোত্রে ইসমাইলীয় মতবাদ প্রচার করেন?

উত্তর: দাঈ বা প্রচারক প্রেরণের মাধ্যমে আবু আব্দুল্লাহ কাতামা গোত্রে ইসমাইলীয় মতবাদ প্রচার করেন।

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যবাসী আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাঈ (প্রচারক) প্রেরণ করেন। এ কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইয়ামেন, বাহরাইন, সিন্ধু, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় ইসমাঈলীয় মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহর মৃত্যুর পর তার শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসায়ন ইসমাইল প্রচারকাজের দায়িত্ব নেন। ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর আফ্রিকায় গিয়ে নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলে ঘোষণা দেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও অনলবর্ষী বক্তা আবু আব্দুল্লাহর যোগ্য পরিচালনা, সুচতুর প্রচারণা ও চরিত্রবলে বার্বার কাতামা গোত্রে ইসমাইলীয় মতবাদ প্রচারিত ও প্রসারিত হয়।

প্রশ্ন-৫. উত্তর আফ্রিকায় শিয়াদের ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর: উত্তর আফ্রিকায় শিয়াদের ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল খিলাফত প্রতিষ্ঠা।

উত্তর আফ্রিকার শিয়ারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ধর্মীয় আন্দোলনের আশ্রয় নেয়। এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও সমর্থক ছিলেন পারস্যবাসী আব্দুল্লাহ বিন মাইমুন। তিনি নবম শতাব্দীর শেষ দিকে ফকির-দরবেশ ও বণিক ছদ্মবেশে উত্তর আফ্রিকায় 'দাঈ' বা প্রচারক পাঠাতে থাকেন। এ প্রচারকদের মাধ্যমে তিনি ইসমাঈলীয় মতবাদের বীজ বপনের মধ্য দিয়ে একটি ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, যেটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পর্যায়ক্রমে উত্তর আফ্রিকায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা।

প্রশ্ন-৬. আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীকে প্রাণদন্ড দেওয়া হয়েছিল কেন?

উত্তর: ফাতেমি বংশের প্রতিষ্ঠাতা উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করার জন্য আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীকে প্রাণদণ্ড দেন।

ইসমাঈলীয় মতবাদে বিশ্বাসী আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী তার অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা, অনলবর্ষী বক্তৃতা দ্বারা উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমিদের শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। তিনিই ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে মাহদীকে 'উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী' উপাধি দিয়ে ফাতেমি খিলাফতে বসান। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকে সামনে রেখে তিনিই শাসন কাজ পরিচালনা করবেন। দূরদর্শী খলিফা মাহদী তা বুঝতে পেরে নিজের ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার জন্য তার এক সময়ের মিত্র ও সুহৃদ আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীকে নির্মমভাবে হত্যা করেন।

প্রশ্ন-৭. আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?

উত্তর: ইফ্রিকিয়ায় (উত্তর আফ্রিকায়) ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখায় আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ পারস্যের আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন পারস্যের আহওয়াজ ও সিরিয়ার সালমিয়াতে প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে আব্বাসি সাম্রাজ্যে শিয়া মতবাদ প্রচারের জন্য প্রচারক (দাঈ) প্রেরণ করেন। তখন তার একজন সুযোগ্য প্রতিনিধি ও শিষ্য ছিলেন আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী। ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহ বিন মায়মুনের মৃত্যুর পর আবু আব্দুল্লাহ ইসমাইলীয় মতবাদ প্রচারকাজের দায়িত্ব নেন। তার অসাধারণ দক্ষতার কারণে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য তিনি ফাতেমিদের ইতিহাসে তিনি আশ-শিয়ী (সর্বোত্তম শিয়া) ও মুয়াল্লিম (উপদেষ্টা) নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৮. কাতামাদের বিদ্রোহ দমন আল-মাহদীর বিদ্রোহ দমনের মধ্যে অন্যতম ছিল কেন?

উত্তর: খলিফা আল-মাহদীর শাসনামলের শক্তিশালী বিদ্রোহ ছিল কাতামাদের বিদ্রোহ। এ কারণেই এ বিদ্রোহ দমন আল-মাহদীর বিদ্রোহ দমনের মধ্যে অন্যতম ছিল।

আফ্রিকার ফাতেমি আন্দোলন ছিল মূলত একটি আরববিরোধী আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে কায়রোয়ান ছিল আরব উপনিবেশ। এখানে বার্বাররা প্রাধান্য লাভ করলে কাতামা ও আরব গোত্রের মধ্যে বিবাদ ও প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে। এ সংঘর্ষে কাতামা গোত্রের প্রায় ১,০০০ লোক নিহত হয়। এ ঘটনায় কাতামারা বিদ্রোহী হয়ে জাব প্রদেশে আলাদা রাজ্য স্থাপন করে। কয়েক জন সেনাপতির পরাজয়ের পর মাহদী নিজ পুত্র কায়েসকে সেখানে পাঠিয়ে এ বিদ্রোহ দমন করেন।

প্রশ্ন-৯. খলিফা আল-মুইজের সিংহাসনারোহণের সাথে সাথে কীভাবে ফাতেমি খিলাফতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: খলিফা আল-মুইজ শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলারক্ষা জনকল্যাণের জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

খলিফা আল-মুইজ সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি তার সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে তিনি সাম্রাজ্যের সকল সমস্যা দূরীকরণ এবং উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে সাম্রাজ্যের বিদ্রোহী নেতাগণ, গোত্রপ্রধানগণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তার আনুগত্য স্বীকার করেন। তার আমলে সাম্রাজ্য সুখ ও সমৃদ্ধির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করে।

প্রশ্ন-১০. আল-মুইজ কীভাবে মিসর বিজয় করেন?

উত্তর: সেনাপতি জওহর ও আল-সেকিল্লির সহায়তায় খলিফা আল-মুইজ ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসর জয় করেন।

মিসর বিজয় ছিল খলিফা আল-মুইজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এটি তার জীবনের স্বপ্ন ছিল। তৎকালীন মিসরীয় শাসক মালিক কাফুরের অযোগ্য ও কুশাসনে অতিষ্ঠ মানুষ আল-মুইজকে মিসর বিজয়ে আমন্ত্রণ জানালে তিনি সেখানে অভিযান প্রেরণ করেন। প্রায় বিনা বাধায় তার সুযোগ্য সেনাপতি জওহর ও আল-সেকিল্লি প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া ও পরে রাজধানী ফুস্তাত দখল করেন। এভাবে আল-মুইজের মিসর জয়ের স্বপ্ন পূরণ হয়।

প্রশ্ন-১১. আল-মুইজকে শ্রেষ্ঠ ফাতেমি খলিফা বলা হয় কেন?

উত্তর: ফাতেমি খিলাফতের ভিত্তি সুদৃঢ়ীকরণ ও এর সার্বিক উন্নয়নে অবদানের জন্য আল-মুইজকে শ্রেষ্ঠ ফাতেমি খলিফা বলা হয়।

আল-মুইজ মিসরে ফাতেমি শাসন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শক্ত হস্তে সব অভ্যন্তরীণ কোন্দল দমন করে সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তার সময়ে মিসর, মরক্কোসহ বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়। তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও অমিত কর্মোদ্যমের ফলে ফাতেমি খিলাফত একটি বিশাল সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। এ কারণেই তাকে শ্রেষ্ঠ ফাতেমি খলিফা বলা হয়।

প্রশ্ন-১২. 'আল-কাহিরা' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

[ঢাকা বোর্ড ২০১৭]

উত্তর: 'আল-কাহিরা' হলো খলিফা আল-মুইজের শাসনামলে (৯৫২-৯৭৫ খ্রি.) মিসরে প্রতিষ্ঠিত ফাতেমি খিলাফতের রাজধানী।

আল-কাহিরা অর্থ 'বিজয়িনী'। ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি জওহর ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আফ্রিকার মিসর জয় করেন। বিজয়ের স্মারক হিসেবে তিনি তৎকালীন মিসরের রাজধানী ফুসতাতের উপকণ্ঠে একটি নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এর নাম দেওয়া হয় 'আল-কাহিরা'। কাহিরা শব্দ থেকেই কায়রো (বর্তমান মিসরের রাজধানী) নামের উৎপত্তি। ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে আল-কাহিরা বা কায়রো রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।

প্রশ্ন-১৩. আল-মুইজের মিসর বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আল-মুইজের মিসর বিজয়ের কারণ হলো মিসরের আমির-উমরাহদেরকে সাহায্য করা এবং নিজ লক্ষ্য পূরণ করা।

আল-মুইজের মিসর বিজয়ের প্রাক্কালে মিসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ইখশিদ বংশীয়

শাসনকর্তা কাফুর এ সময় মিসর শাসন করতেন। তার ২০ বছরের কুশাসনে মিসর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় মিসরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা খলিফা আল-মুইজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাকে মিসর দখল করার আহ্বান জানান। এছাড়া প্রচুর সম্পদে পরিপূর্ণ মিসর জয় করা তার জীবনের একটি লক্ষ্য ছিল। এসব কারণে খলিফা আল-মুইজ মিসর জয় করেন।

প্রশ্ন-১৪. ফাতেমি শাসনামলে ক্রিট দ্বীপ মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয় কেন?

উত্তর: ফাতেমি শাসনামলে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের কারণে ক্রিট দ্বীপ মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়।

মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক তৃতীয় আবদুর রহমান যখন খ্রিস্টানদের সাথে তুমুল যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি জওহর মৌরিতানিয়া দখল করেন। এ সংবাদে বিচলিত হয়ে তৃতীয় আবদুর রহমানের নির্দেশে স্পেনের নৌবহর মুইজের মরক্কোগামী জাহাজ আক্রমণ করে। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে মুইজ সিসিলির অধিপতি হাসান বিন আলীকে স্পেনীয় নৌবন্দর আলমেরিয়া আক্রমণের নির্দেশ দেন। মুসলমানদের এ অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সুযোগে ৯৬১ খ্রিস্টাব্দে গ্রিকরা ক্রিট দ্বীপ দখল করে নেয়।

প্রশ্ন-১৫. মাজালিম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন?

উত্তর: ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের নির্দেশে প্রধান কাজী আবু হানিফ ইবনে নুমান 'মাজালিম আদালত' নামে একটি নতুন আদালত প্রতিষ্ঠা করেন।

খলিফা আল-মুইজ ন্যায়বিচারক ছিলেন। তার সময়ে প্রধান কাজী ইবনে নুমান সুন্নি মালেকি মাজহাবের অনেক আইন ফাতেমি বিচারব্যবস্থায় প্রবর্তন করেন। বিচারব্যবস্থাকে ন্যায় ও সাম্যভিত্তিক করার লক্ষ্যে মাজালিম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রশ্ন-১৬. ফাতেমি খলিফা আল-মুইজকে 'পাশ্চাত্যের-মামুন' বলা হয় কেন?

উত্তর: শিল্প সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদানের জন্য আল-মুইজকে **'পাশ্চাত্যের-মামুন'** বলা হয়।

আল-মুইজের সময়কাল ছিল মিসরে ফাতেমি শাসনকালের স্বর্ণযুগ। আল-মুইজ মিসরে ফাতেমি শাসন সুদৃঢ় করে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন এবং সমৃদ্ধশালী একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, বিজ্ঞান মনস্কতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সৈয়দ আমীর আলী তাকে পাশ্চাত্যের 'মামুন' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন-১৭. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্থাপত্যশিল্পে খলিফা আল-আজিজের অবদান ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্থাপত্যশিল্পের বিকাশে খলিফা আল-আজিজ অসামান্য অবদান রাখেন।

খলিফা আল-আজিজ নিজে একজন কবি ছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি মিসরের আল-আজহার মসজিদে একটি শিক্ষায়তন যুক্ত করেন। এছাড়াও বহু স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও জন কল্যাণকর কাজ করে। তিনি স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম অনুরাগী ছিলেন। তার সময়ে নির্মিত সোনালি প্রাসাদ, মুক্তামঞ্চ এবং কারাফা কবরস্থানে তার মায়ের কবরের ওপর নির্মিত সুন্দর মসজিদ তার শিল্পানুরাগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। খলিফা আল-আজিজের নির্মিত এ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং স্থাপত্যশিল্প ফাতেমিদের গৌরব ও সুনাম বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন-১৮. 'দারুল হিকমা' কী? ব্যাখ্যা করো। */ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো., রা. বো. ২০১৮; দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., সি. বো., ব. বো. ২০১৭; সকল বোর্ড ২০১৬/*

উত্তর: দারুল হিকমা হলো ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের নির্মিত একটি বিজ্ঞানভবন।

ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে বিখ্যাত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞানভবন নির্মাণ করেন। এটি বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা হতো। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি এখানে হাজির হতেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন।

প্রশ্ন-১৯. জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় দারুল হিকমা এর কার্যক্রম কীরূপ ছিল?

উত্তর: শিয়া মতাদর্শ এবং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দারুল হিকমার কার্যক্রম ছিল অসাধারণ।

দারুল হিকমা অর্থ বিজ্ঞান ভবন। খলিফা আল-হাকিম ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত শিয়া মতাদর্শ বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণার জন্য এটি নির্মাণ করেন। তবে এ মতাদর্শ ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি এতে সংগ্রহ করা হয়। দেশ-বিদেশের বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি এখানে হাজির হতেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক ও পদার্থবিজ্ঞানী হাসান ইবনে হায়সাম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নয়ন ও বিকাশে দারুল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

প্রশ্ন-২০. ফাতেমি খিলাফতের পতন ঘটেছিল কেন?

উত্তর: শাসকদের দুর্বলতা, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং দুর্ভিক্ষের কারণে ফাতেমি খিলাফতের পতন ঘটেছিল।

খলিফা আল-হাকিমের মৃত্যুর পর যারা খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা দুর্বল, অযোগ্য ও ব্যক্তিত্বহীন ছিলেন। তারা তুর্কি, বার্বার, নিগ্রোদের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাছাড়া শেষ দিকে কয়েক বছর চরম দুর্ভিক্ষে দেশের আর্থিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়েছিল। এ প্রেক্ষিতে ফাতেমি খিলাফতের পতন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন কে?
ক. ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী খ. আল-মুইজ
গ. আবুল আব্বাস ঘ. মুয়াবিয়া

২. ফাতেমি খিলাফত কত খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ৯০৫ খ. ৯০৬
গ. ৯০৮ ঘ. ৯০৯

৩. ফাতেমি কারা?
ক. হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা)-এর বংশধররা
খ. বনি ইসরাইলরা
গ. সাবিয়া বা ৭ম ইমামে বিশ্বাসীরা
ঘ. ইসনা আসারিয়া বা দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসীরা

৪. ইসলামের চতুর্থ খলিফা কে ছিলেন?
ক. হযরত ওসমান (রা) খ. হযরত আলী (রা)
গ. হযরত ওমর (রা) ঘ. হযরত আবু বকর (রা)

৫. শিয়াদের বিভক্তির কারণ কী ছিল?
ক. খিলাফতের দ্বন্দ্ব খ. ক্ষমতার দ্বন্দ্ব
গ. ইমামতের দ্বন্দ্ব ঘ. আদর্শিক দ্বন্দ্ব

৬. ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় নিচের কে ভূমিকা রাখেন?
ক. মুয়াল্লিম খ. আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী
গ. আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন ঘ. আল-হুসাইন ইসমাঈল

৭. আল-মাহদী কত বছর রাজত্ব করেন?
ক. ২৫ খ. ২৬
গ. ২৭ ঘ. ২৮

৮. ফাতেমি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কে পরিচিত?
ক. আল-কাঈম খ. আল-মুইজ
গ. আল-মনসুর ঘ. আল-মাহদী

৯. আল-মুইজ-এর আসল নাম কী?
ক. আবু তামিম মাদ খ. আবু তাহির
গ. আবুল কাসেম ঘ. আবু আব্বাস

১০. আল-মুইজ কত খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন?
ক. ৯৫১ খ. ৯৫২
গ. ৯৫৬ ঘ. ৯৫৪

১১. আল-মুইজ কত বছর রাজত্ব করেন?
ক. ২২ খ. ২৩
গ. ২৪ ঘ. ২৫

১২. বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি?
ক. অক্সফোর্ড খ. রিয়াদ
গ. আল-আজহার ঘ. হার্ভার্ড

১৩. কায়রো নগরীর গোড়াপত্তন করেন কে?
ক. আল-মাহদী খ. আল-মুইজ
গ. আল-আজিজ ঘ. আল-হাকিম

১৪. আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন কে?
ক. আল-মুইজ খ. আল-আজিজ
গ. আল-হাকিম ঘ. আল-মনসুর

১৫. রাজা 'ক' তার রাজ্যে সকল শ্রেণি ও সম্প্রদায় থেকে কর্মচারী নিয়োগ করতেন। তার সাথে উত্তর আফ্রিকার ফাতেমি কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. আল-মুইজের খ. আল-অজিজের
গ. আল-মনসুরের ঘ. আল-কাঈমের

১৬. আল-হাকিম কোথায় মান মন্দির নির্মাণ করেন?
ক. মুয়াল্লাহতে খ. হেরা পর্বতে
গ. মুকাত্তাম পাহাড়ে ঘ. ওহুদ পর্বতে

১৭. আল-হাকিম কোন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
ক. সুন্নি খ. শিয়া
গ. খারেজি ঘ. দারাজি বা দ্রুজ

১৮. দারুল হিকমা কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হয়?
ক. বাগদাদে খ. কায়রোতে
গ. রোমে ঘ. ইস্তাম্বুলে

১৯. ফাতেমি বংশের পতন ঘটে কত খ্রিষ্টাব্দে?
ক. ১১৭০ খ. ১১৭১
গ. ১১৭২ ঘ. ১১৭৩

২০. ফাতেমিদের পতনের মাধ্যমে কোন বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. আগলাবি বংশ খ. আব্বাসি বংশ
গ. আইয়ুবি বংশ ঘ. উমাইয়া বংশ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২১. উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী আবু আব্দুল্লাহকে হত্যা করে—
i. কৃতঘ্নতার পরিচয় দেন
ii. ক্ষমতাকে কণ্টকমুক্ত করেন
iii. দূরদর্শিতার পরিচয় দেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২২. আল-মাহদীর শাসননীতির বৈশিষ্ট্য ছিল—
i. সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন
ii. বৈদেশিক নীতি সুদৃঢ়ীকরণ
iii. শাসন ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা স্থাপন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৩ ও ২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ আব্বাসি বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেও সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু শাসন প্রবর্তন, রাজ্য বিস্তার করে আল-মনসুর এ বংশের প্রকৃত শাসকের মর্যাদা লাভ করেন। একটি সম্প্রদায় তাকে আল্লাহর অবতার বলে মনে করতেন।

২৩. আব্বাসি খলিফা আল-মনসুর ফাতেমি খিলাফতের কার প্রতিনিধিত্বকারী?
ক. আল-মাহদী খ. আল-মুইজ
গ. আল-আজিজ ঘ. আল-হাকিম

২৪. উক্ত শাসকের সাথে আল-মনসুরের যোগসূত্র রয়েছে—
i. সুষ্ঠু শাসন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে
ii. ধর্মীয় অবস্থানের দিক দিয়ে
iii. সাম্রাজ্যের ভিত শক্তিশালী করার দিক দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
হাসিন আবদুল্লাহ উচ্চ শিক্ষার জন্য মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যান। তিনি জানতে পারেন একজন ফাতেমি খলিফা প্রথম আল-আজহার মসজিদ নির্মাণ করেন, যা পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তাছাড়া ওই শাসকের রাজস্ব নীতিও ছিল জনকল্যাণমুখী ও প্রশংসনীয়।

২৫. উদ্দীপকে কোন ফাতেমি খলিফার কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়েছে?
ক. আল-মাহদী খ. আল-মুইজ
গ. আল-মনসুর ঘ. আল-আজিজ

২৬. উক্ত খলিফার রাজস্ব নীতিও ছিল প্রশংসনীয়, কারণ-
i. এটি ছিল প্রাচীন প্রথামুক্ত
ii. হয়রানিমুক্ত
iii. রাজস্বের পরিমাণ ছিল কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
বিশিষ্ট সমাজসেবক আজাদ সাহেব তার গ্রামে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠাগারে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর হাজার হাজার বই ছিল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনুরাগী পাঠকেরা পাঠাগারে আসত। এ পাঠাগার এলাকায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় ও মেধা বিকাশে অনেক অবদান রাখে।

২৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত পাঠাগারের সাথে ফাতেমি আমলে স্থাপিত কোন প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে?
ক. বায়তুল হিকমা
খ. দারুল হিকমা
গ. বিজ্ঞানাগার
ঘ. মানমন্দির

২৮. উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল—
i. শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা
ii. জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি
iii. ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৯. ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা কে? */সকল বোর্ড ২০১৬/*
ক. জিয়াদাতউল্লাহ
খ. আবু আব্দুল্লাহ
গ. আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন
ঘ. ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী

৩০. উত্তর আফ্রিকায় সহজে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার কারণ কী? */সকল বোর্ড ২০১৫/*
ক. সেখানে তারা পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল বলে
খ. শিয়া অধ্যুষিত এলাকা ছিল তাই
গ. স্পেনের সহযোগিতা পেয়েছিল বলে
ঘ. আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীর প্রচারণার ফলে

৩১. 'আল-আজহার' মসজিদটি কোন খলিফার সময়ে নির্মিত হয়? */সকল বোর্ড ২০১৬/*
ক. আল-কাইম খ. আল-মনসুর
গ. আল-মুইজ ঘ. আল-আজিজ

৩২. আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত? */সকল বোর্ড-২০১৭/*
ক. স্পেন খ. বাগদাদ
গ. মদিনা ঘ. মিসর

৩৩. দারুল হিকমা কে প্রতিষ্ঠা করেন? */সকল বোর্ড-২০১৮/*
ক. আল-মনসুর খ. আল-মুইজ
গ. আল-আজিজ ঘ. আল-হাকিম

৩৪. আল-হাকিম কর্তৃক দারুল-হিকমা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য— *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক. জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা
খ. শিয়া মতবাদ প্রচার করা
গ. সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা
ঘ. সুষ্ঠুভাবে রাজস্ব আদায়

উদ্দীপকটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
মির্জা গালিব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সকল অভ্যন্তরীণ কোন্দল দমন করে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তার শাসনকালে সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। *[সকল বোর্ড-২০১৮]*

৩৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত মির্জা গালিবের সাথে ফাতেমি খিলাফতের কোন খলিফার কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়?
ক. ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী
খ. আল-মুইজ
গ. আল-আজিজ
ঘ. আল-হাকিম

৩৬. উক্ত খলিফার শাসনকাল ছিল—
i. শান্তিপূর্ণ
ii. বিদ্যাচর্চায় সমৃন্ধ
iii. আড়ম্বরপূর্ণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৭ ও ৩৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফরিদ তার শিক্ষকের কাছ থেকে জানল যে, একজন শাসক ঘোষণা করেন যে, দিনে কাজকর্ম করা যাবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে, আর রাতে অফিস-আদালত ও বেচাকেনা চলবে। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

৩৭. ফরিদ তার শিক্ষকের বক্তব্যে ইতিহাসের কোন খলিফার কথা জানতে পারল?
ক. আল-মনসুর খ. আল-মুইজ
গ. আল-হাকিম ঘ. আল-আজিজ

৩৮. উক্ত শাসক উদ্ভট মানসিকতার অধিকারী হলেও তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—
i. জ্যোতির্বিদ্যার
ii. সাহিত্যকর্মের
iii. ব্যাকরণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩৯ ও ৪০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
পিতার মৃত্যুর পর ফায়সাল অল্প বয়সে রংপুরের জমিদার নিযুক্ত হন। তার জমিদারি ছিল নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। তবে তিনি জ্ঞানী-গুণীদের যথেষ্ট সমাদর করতেন এবং গবেষণা কাজে উৎসাহ দিতেন। তিনি ছিলেন বিশেষ একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি দুর্বল। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

৩৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদারের সাথে কোন ফাতেমি খলিফার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়?
ক. আল-মাহদী খ. আল-মুইজ
গ. আল-হাকিম ঘ. আল-হাদি

৪০. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার মতো উক্ত খলিফার কাজে প্রধানত প্রকাশ পেয়েছিল—
i. বিদ্যোৎসাহিতা
ii. ধর্মীয় প্রচারণা
iii. যশ-খ্যাতি অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ক	২	ঘ	৩	ক	৪	খ	৫	গ	৬	খ	৭	খ	৮	খ	৯	ক	১০	খ	১১	ক	১২	গ
১৩	খ	১৪	খ	১৫	খ	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	খ	২০	গ	২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	খ
২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ঘ	৩১	গ	৩২	ঘ	৩৩	ঘ	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	ক
৩৭	গ	৩৮	ঘ	৩৯	গ	৪০	ঘ																

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফাতেমি আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দাও।
২. ক্রিট দ্বীপ মুসলমানদের হস্তচ্যুত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।
৩. আল-মুইজের মিসর বিজয় সম্পর্কে লেখো।
৪. আল-কাহিরা নগরী সম্পর্কে ধারণা দাও।
৫. খলিফা আল-হাকিমের ক্ষমতা গ্রহণ সম্পর্কে লেখো।
৬. খলিফা আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন— ব্যাখ্যা করো।
৭. ফাতেমিদের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ব্যাখ্যা করো।
৮. দারুল হিকমার কার্যাবলি বর্ণনা করো।
৯. আল-আজহার মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
১০. খলিফাদের দুর্বলতা ফাতেমি খিলাফতের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল— ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দক্ষিণ আফ্রিকার একটি উপজাতির নেতা সিবাই নিজেকে আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছু অলৌকিক বাণী দ্বারা জনগণকে তার কাছে টানার চেষ্টা করেন। তিনি তার শিষ্যদের বলতে থাকেন যে, পৃথিবী পাপ-পঙ্কিলতায় ভরে গেছে। এ পাপ পঙ্কিলতা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য অতি শীঘ্রই একজন পরিত্রাণকারীর আবির্ভাব ঘটবে। তিনি পাহাড়ের এক গুহা থেকে বেরিয়ে জনসান্নিধ্যে আসবেন এবং পাপ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করবেন।

ক. মিসর বিজয়ী প্রথম মুসলিম সেনাপতির নাম কী?
খ. দারুল হিকমার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত উপজাতি নেতা সিবাইর কর্মকাণ্ডের সাথে উত্তর আফ্রিকার কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই খিলাফতের নামকরণের তর্ক-বিতর্ক বিশ্লেষণ করো।

২. 'ক' রাজ্যের ধর্মীয় নেতা মি. এন্থনি যখন জনসম্মুখে আসেন তখন সবাই অবাক। তিনিও তো তাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ। অথচ একদল পুরোহিত বলে আসছিল যে তিনি মানুষ নন বরং দেবতা। পুরোহিতদের বলা এসব কাহিনি যখন তার গোচরে আসে তখন তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দেন। অতঃপর জনগণকে সাথে নিয়েই তিনি 'ক' রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। *[ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. ২০১৯]*

ক. আল-আজহার মসজিদ নির্মাণ করেন কে?
খ. দারুল হিকমা কী?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. এন্থনি'র সাথে কোন ফাতেমিয় ধর্মীয় নেতার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমিয় খিলাফত প্রতিষ্ঠায় উক্ত ধর্মীয় নেতার অবদান মূল্যায়ন করো।

৩. বঙ্গোপসাগরের নিঝুম দ্বীপে একজন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটে। উক্ত দ্বীপের অধিবাসীরা অত্যন্ত সাহসী ও দুর্ধর্ষ হলেও তারা ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস করত। আগন্তুক সে ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে স্থানীয় অধিবাসীদেরকে তার পক্ষে আনতে সক্ষম হন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্বীপটির নেতৃত্ব গ্রহণ করে সুপরিকল্পিতভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত আধ্যাত্মিক ব্যক্তি সেখানে একটি যুগোপযোগী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।
[রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৮]

ক. দাঈ শব্দের অর্থ কী?
খ. দারুল হিকমা বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত আগন্তুকের সাথে ফাতেমি খিলাফতের কোন ব্যক্তির মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত ব্যক্তির চেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিই কালক্রমে অধিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হন— মূল্যায়ন করো।

৪. ওসমানীয় বংশের প্রথম শাসক ওসমান। ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইয়েনি শহর বিজয় করে সেখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ওসমান নিকোমেডিয়ার কুয়ুন, হিসার, আক হিসার, কালোলিমনি প্রভৃতি অঞ্চল বিজয় করেন। এছাড়া তিনি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন। আর বুরসা নগরী অবরোধের জন্য তিনি সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এভাবে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক বিন্যাস, সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন করে ওসমান এ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত হয়েছেন।

ক. ফাতেমি কারা?
খ. দারুল হিকমার কার্যক্রম কীরূপ ছিল?
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে কোন ফাতেমি শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের শাসকের মতো 'উক্ত শাসক তার বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন— বিশ্লেষণ করো।

৫. আব্বাসি আন্দোলনকে বিপ্লবে পরিণত করার সেরা কারিগর ছিলেন আবু মুসলিম নামে আরব বংশোদ্ভূত এক পারসিক মাওয়ালি। ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মার্চ তিনি খোরাসানের রাজধানী মার্ভে বিদ্রোহ ঘোষণা করে খোরাসান দখল করে তিনি সেখানে আব্বাসিদের কালো পতাকা উত্তোলন করেন। পরবর্তী সময়ে উমাইয়া শাসক ইয়াজিদকে পরাজিত করে তিনি কুফা দখল করেন। ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ নভেম্বর তিনি আবুল আব্বাসকে কৃষ্ণবস্ত্রে আচ্ছাদন করে কুফার মসজিদে এনে তাকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। তবে এ সেনাপতি করুণ মৃত্যুর শিকার হয়েছিলেন, যা ইসলামের ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ক. আল-কাইম কত খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেন?
খ. সাবিয়া বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকটি ফাতেমি শাসনামলের কার অবদানের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত সেনাপতিও কি অনরূপ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন? যৌক্তিক উত্তর দাও।

৬. সাফাভি শাসক শাহ আব্বাস ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করে বিদ্রোহ দমনে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি কিজিলবাস সম্প্রদায় ও উজবেকদের পরাজিত করেন। কাজাহার দখল, কাশগড়, বাদাখশান, বলখ, প্রভৃতি বিজয় করে তিনি সামরিক যোগ্যতার প্রমাণ দেন। ১৫৯৭ সালে তিনি তুর্কিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে আজারবাইজান, দিয়ের বকর, নজফ প্রভৃতি অঞ্চল বিজয় করেন। নিজের নামে তিনি বন্দর আব্বাস প্রতিষ্ঠা করেন। সেনাবাহিনীর সংস্কার, সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করে এ শাসক শুধু তার বংশের নয় বরং তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদা লাভ করেন।

ক. ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কোথায় রাজধানী স্থানান্তর করেন?

খ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক হিসেবে খলিফা আল-আজিজ কীরূপ অবদান রাখেন?

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে কোন ফাতেমি খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে উক্ত শাসকের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করো।

৭. সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদের স্বপ্ন ছিল কনস্টানটিনোপল জয় করা। তিনি তার শাসনামলের শুরু থেকে উক্ত স্থান জয় করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। অবশেষে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও নগর প্রতিরক্ষার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এক অভিনব কৌশলের মাধ্যমে তিনি কনস্টানটিনোপল বিজয় করেন।

ক. ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কে ছিলেন?

খ. ইসমাঈলীয় কারা? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে দ্বিতীয় মুহম্মদের মতো আল-মুইজের কোন স্থান দখলের স্বপ্ন ছিল? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কনস্টানটিনোপাল বিজয়ের কারণটি ছাড়াও উক্ত স্থান বিজয়ে আল-মুইজের আরও কিছু কারণ ছিল— ব্যাখ্যা করো।

৮. আফনান সুদীর্ঘ ২৩ বছর কৃতিত্বের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তার 'চিম্বুক' রাষ্ট্রটিকে স্বর্ণময় করে তোলেন। তিনি ছিলেন তার রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। বিদ্রোহ দমন, রাজ্য বিজয়, শাসন ব্যবস্থার সংস্কার, রাজস্ব বিভাগের পুনর্বিন্যাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার অবদান অপরিসীম। দূরদর্শী ও মেধাবী এ শাসক অনেক রাজ্য জয় করেন। তবে 'চেতন নগর' রাজ্য জয় ইতিহাসের পাতায় তাকে স্মরণীয় করে রেখেছে। তার সেনাপতি সোহরাব সেখানে একটি সুন্দর নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে আফনান সেখানে তার রাজধানী স্থানান্তর করেন। */ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮/*

ক. উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে কে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন?

খ. দারুল হিকমা কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসক কর্তৃক 'চেতন নগর' রাজ্য জয়ের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কোন দেশ বিজয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসককে যদি তার বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক বলা যায়, তাহলে আল-মুইজকে উত্তর আফ্রিকা ও মিসরের ফাতেমি খিলাফতের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে অভিহিত করার যৌক্তিকতা তুলে ধরো।

৯. দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশ ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর নাসির উদ্দিন কুবাচা ও তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের বিদ্রোহ দমন করে লাহোর ও মুলতান অধিকার করেন। এছাড়া তিনি রণথম্ভোর, জালোর, গোয়ালিয়র, ভিলসা, মালব, বাদাউন, বেনারস, দোয়াব প্রভৃতি অঞ্চল বিজয় করে তার রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। বঙ্গে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল তার সবচেয়ে বড় সাফল্যজনক বিজয়। সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার চালু করতে ইলতুৎমিশ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন।

ক. খলিফা আল-হাকিম কত খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেন?

খ. 'আল-হাকিম ছিলেন খামখেয়ালিপনা শাসক'— কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে কোন ফাতেমি খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের শাসকের মতো উক্ত শাসকও তার বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মর্যাদা অর্জন করেছিলেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

১০. মুঘল সম্রাট আকবর সুশাসনের জন্যে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর জোর দেন। পুরো সাম্রাজ্যকে তিনি প্রদেশ, বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ভাগ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কেন্দ্র থেকে এসব অফিসে প্রেরণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর বেতন বৃদ্ধি করেন।

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী সিংহাসনে আরোহণ করেন?

খ. ফাতেমি কারা? ব্যাখ্যা করো।

গ. মুঘল সম্রাট আকবরের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন ফাতেমি খলিফার কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত ফাতেমি শাসকের কর্মকাণ্ড বর্তমানকালে কতটুকু গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও।

১১. স্পেনের উমাইয়া শাসক তৃতীয় আবদুর রহমানের ক্ষমতারোহণের পর স্পেনীয় মুরদের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটে। রাজত্বের প্রথম দিকেই সেভিল ও ক্যারাথিনের বিদ্রোহ দমন করে তিনি ব্যাপক সমর সফলতার পরিচয় দেন। পরবর্তীতে উমর বিন হাফসুনকে দমন করে তিনি স্পেনের মুসলিম শাসনকে আরও সুদৃঢ় করেন। এছাড়া তিনি ইছিজা, জেইন, এনভিরা, ও টলেডো বিজয় করে নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তার রাজত্বের উল্লেখযোগ্য সমর বিজয় ছিল মেরিডা প্রদেশ বিজয়। এভাবে সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করে এ শাসক তার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদা লাভ করেছেন।

ক. ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কত খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেন?

খ. মাজালিম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটি বিশ্লেষণপূর্বক আল-মুইজের কৃতিত্ব অনুসন্ধান করো।

১২. মিসরের মামুলক সুলতান কালাউন ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করে নিজেকে একজন প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একজন প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবে তিনি বহুমুখী জনকল্যাণকর কাজ করেছিলেন। জনগণের কষ্ট রোধকল্পে তিনি কায়রোতে মেরিস্থান নামে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। তার রাজত্বকালে মুসলিম ও অমুসলিম সবাই সুখে সমৃদ্ধিতে দিনাতিপাত করত। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও তাঁর প্রশাসনে উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে তাঁর হাসপাতাল সংলগ্ন ল্যাবরেটরি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল। তবে রাজ্যবিস্তারে তেমন কোনো কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে না পারলেও বৈদেশিক রাজন্যবর্গের সাথে কূটনৈতিক ভাব বিনিময় হয়েছিল।

ক. উত্তর আফ্রিকায় আগলাবীয় শেষ শাসক কে ছিলেন?

খ. রাজ্য বিস্তারে খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর ভূমিকা কীরূপ ছিল?

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে কোন ফাতেমি খলিফার আংশিক মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "উক্ত শাসকের অনেক কর্মই উদ্দীপককে সমর্থন করে না"— বিশ্লেষণ করো।

১৩. ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরির রাজত্বকালে বুঁরবো সাম্রাজ্য গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে। আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও এ সময় বুঁরবো বংশের রাজত্ব কায়েম হয়। তার অধীনে সাম্রাজ্যের সবাই সুখে ও শান্তিতে জীবনযাপন করত। মানুষের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্সের যাতায়াত ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। প্রশাসন ব্যবস্থার সুদৃঢ়করণে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার পৃষ্ঠপোষকতা করে তিনি চিরদিনের জন্য ফরাসি জাতির হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন।

ক. খলিফা আল-হাকিম কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

খ. আল-মুইজ কীভাবে মিসর বিজয় করেন?

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে ফাতেমি শাসক আল-আজিজের কর্মকাণ্ডের মিল কোথায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উক্ত শাসকের অবদান বিশ্লেষণ করো।

১৪. রোমান সম্রাট অগাস্টাস সিজারের রাজত্বকালে রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন পণ্ডিত এ সময় রোমে অবস্থান করে দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও ভূগোল বিষয়ক নানা গ্রন্থাবলি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। এছাড়া স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে তিনি নির্মাণ করেন অনেকগুলো অট্টালিকা। কলোসিয়ামের নাট্যশালা এ সময়কার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি। এমনকি রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও জনহিতকর কার্যাবলিতেও তার অবদান ছিল দীপ্তিমান।

ক. ফাতেমি খিলাফতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন?

খ. মাজালিম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন?

গ. অগাস্টাস সিজারের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন ফাতেমি খলিফার মিল পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "উদ্দীপকের শাসকের মতো উক্ত শাসকও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও প্রজারঞ্জক কার্যাবলি সম্পাদন করেছিলেন"— মতামত দাও।

১৫. আব্বাসি খলিফা আল-মামুন ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দ্বার উন্মোচন করেন। জ্ঞানের বিকাশের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটিতে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ ব্যুরো এ তিনটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশি-বিদেশি বহু পণ্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণা করতেন। উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আল-মামুন কোনো খামখেয়ালিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তিনি ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, কিন্তু নতুন কোনো ধর্মমত প্রবর্তন করেননি।

ক. আল-আজিজের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

খ. আল-মুইজকে ফাতেমি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন?

গ. খলিফা আল-মামুনের সাথে ফাতেমি শাসক আল-হাকিমের কোন কর্মকাণ্ডের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'উক্ত খলিফার কর্মকাণ্ড অনেকাংশেই উদ্দীপকের খলিফার কর্মকাণ্ডের বিপরীত'— মতামত দাও।

১৬. পিতার মৃত্যুর পর গৃহশিক্ষক আসিফের তত্ত্বাবধানে নাবালক মুর্তজা সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অল্প দিনেই আসিফ লোভী ও ক্ষমতালিপ্সু হয়ে উঠলে তাকে গুপ্তচর মারফৎ হত্যা করে মুর্তজা নিজ হাতে পরিপূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। মুর্তজা তার রাজ্যে প্রশাসনিক কাজকর্ম রাতে করার সিদ্ধান্ত নেন। দোকানপাট, স্কুল মাদ্রাসাসহ সকল প্রতিষ্ঠান রাতে খোলা রাখার নির্দেশ দেন। আর দিনে সকলকে আরাম করতে বলেন। নির্জন গৃহে তিনি একাকী থাকতে পছন্দ করতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ও জনকল্যাণে তিনি অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। *[ঢাকা বোর্ড ২০১৭]*

ক. জওহর কে ছিলেন?

খ. 'আল-কাহিরা' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের মুর্তজার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে কোন ফাতেমি খলিফার ক্ষমতা গ্রহণের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের মুর্তজার মতোই উক্ত খলিফাও বিচিত্র সব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন— উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো।

১৭. ১৯৫৯ সালে ক্ষমতা দখল করে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো রাজ্যের উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রাজধানী হাভানায় প্রতিষ্ঠা করেন ন্যাশনাল লাইব্রেরি। এখানে প্রতিষ্ঠা করেন একটি নোটারি বিভাগ যেখানে বিভিন্ন ভাষার মূল্যবান গ্রন্থাদি স্পেনিশ ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও মার্কসীয় দর্শন, বিজ্ঞান চর্চা, গণিতের উন্নতি সাধনে এ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হয় অনেক পণ্ডিতকে। যারা নিরলসভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে কাজ করছেন। তিনি প্রশাসন ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজান। তবে সম্পদের রাষ্ট্রীয়করণে তিনি কোন খামখেয়ালিপনার অনুসরণ না করে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতেই সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এমনকি জনগণের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও ধর্মানুশীলনেও তিনি কোনো হস্তক্ষেপ করেননি।

ক. 'আশ-শিয়ী' শব্দের অর্থ কী?

খ. আল-হাকিম দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেন?

গ. উদ্দীপকে কোন ফাতেমি শাসকের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়াবলির কিছু দিক উক্ত শাসকের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না— মতামত দাও।

১৮. একদল জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য এখানে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

ক. কায়রো নগরী প্রতিষ্ঠা করেন কে?

খ. আল-মুইজকে শ্রেষ্ঠ খলিফা বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংস্কার কর্মকাণ্ডের সাথে ফাতেমি খিলাফতের কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ফাতেমি খিলাফতে সাংস্কৃতিক উন্নয়নে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অবদান এশিয়াটিক সোসাইটির তুলনায় বেশি ছিল— বিশ্লেষণ করো।

১৯. স্পেনে মুসলিম শাসনামলে বার্বার, সিরীয়, সুদানি, হিমারীয় প্রভৃতি গোত্রীয় দ্বন্দ্ব স্পেনের মুসলিম শাসনব্যবস্থার পতনকে বেগবান করেছে। আর শেষের দিকের শাসকদের অদক্ষতা ও বিলাসিতা এবং সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা ও সৈন্যদের মধ্যকার অনৈক্য এ পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। অর্থনৈতিক সংকটও স্পেনে মুসলিম শাসনের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। এসব এছাড়া উমর বিন হাফসুনের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্পেন থেকে মুসলমান শক্তিকে চিরতরে পতনের দিকে ধাবিত করে।

ক. খলিফা আল-হাকিম কত বছর রাজত্ব করেন?

খ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আল-আজিজ কীরূপ অবদান রাখেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে ফাতেমি বংশের পতনের অভ্যন্তরীণ কারণের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিতে বর্ণিত কারণেই উক্ত বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটেছিল'? মতামত দাও।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২০. ফাতেমি শাসক আল-আজিজ একধারে জ্ঞানী, দানশীল, প্রজারঞ্জক ও শিল্প সাহিত্যানুরাগী শাসক। একটি শিক্ষায়তন যুক্ত করেন, এছাড়া বহু স্কুল-কলেজ মাদ্রাসা ও পূর্ত কাজ করেছিলেন। তিনি স্থাপত্য শিল্পেরও অন্যতম অনুরাগী ছিলেন। তার সময়ে নির্মিত সোনালী প্রাসাদ, মুক্তমঞ্চ এবং কারাফা কবরস্থানে তার মায়ের কবরের ওপর নির্মিত সুন্দর মসজিদ তার স্থাপত্য শিল্পের অনুরাগের অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমনকি বিদ্রোহ দমন, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সংহতি বিধানে ও প্রশাসন সুদৃঢ়করণে তিনি অনন্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৭*

ক. আরসালান শব্দের অর্থ কী?
খ. গৃহযুদ্ধে আল-আমিনের ব্যর্থতার কারণ বুঝিয়ে লিখ।
গ. উদ্দীপকের সাথে সেলজুক সুলতান মালিক শাহের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য দেখাও।
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে উক্ত শাসকের রাজ্য বিস্তার নীতি ও প্রশাসনিক নীতি বিশ্লেষণ কর।

২১. রাশিয়ার শাসক অ্যানা তার খামখেয়ালিপনার জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১৭৩০ থেকে ১৭৪০ সালের মধ্যে তিনি রাজ্য শাসনে অনেক উদ্ভট নিয়ম চালু করেছিলেন। তিনি তার পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে না করায় রাজকুমারকে বরফের ঘরে বাসর রাত কাটাতে বাধ্য করেছিলেন। তবে তিনি শিল্পানুরাগী ছিলেন। শিল্পকলা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তার শাসনামলে স্থাপত্য শিল্পেরও বিকাশ ঘটেছিল। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৭*

ক. স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা কে?
খ. ফাতেমি খিলাফতের পতন ঘটেছিল কেন?
গ. উদ্দীপকে রাশিয়ার শাসকের সাথে মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো।
ঘ. রাশিয়ার শাসক অ্যানাকে খলিফা আল-হাকিমের প্রতিনিধিত্বকারী বলা যায় কি? তোমার মতামত দাও।

২২. জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি বিখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠান। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশি ভাষার অনেক মূল্যবান গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। ফলে দেশের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৭*

ক. ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
খ. হারুন-অর-রশীদ ইসলামের ইতিহাসে এত বিখ্যাত কেন?
গ. বাংলা একাডেমির কাজের সাথে আব্বাসি যুগের কোন সংস্থার কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদানের কথাই মনে করিয়ে দেয়— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

২৩.

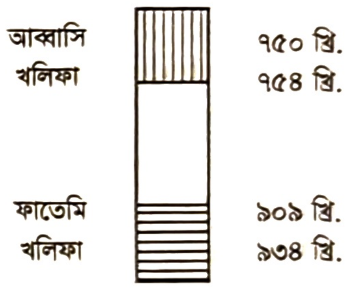

চিত্র: আব্বাসি ও ফাতেমি দুজন খলিফার সময়কাল

◀ সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৭

ক. 'আস-সাফ্‌ফাহ' কার উপাধি ছিল?
খ. 'আল-কাহিরা' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সময়কালের দু'জন খলিফার মধ্যকার মিল খুঁজে বের করো।
ঘ. ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লেখিত সময়কালের খলিফার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো।

২৪. আব্বাসি খলিফা আল-মনসুর তার সিংহাসনকে কণ্টকমুক্ত করার জন্য খোরাসানের শাসনকর্তা আবু মুসলিমকে হত্যা করেন। তিনি তাবারিস্তান ও গীলান অধিকারের পর দায়লাম অধিকার করেন। খলিফা মনসুরের চিরস্মরণীয় গৌরবময় কীর্তি একটি নতুন নগরী স্থাপন। তার নাম অনুসারে এ বাগদাদ নগরীর নাম রাখা হয় মনসুরীয়া এবং নতুন নগরীতে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৭*

ক. আব্বাসি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল কোথায় ছিল?
খ. খলিফা আল-হাকিমের ধর্মীয় নীতি কীরূপ ছিল?
গ. আব্বাসি খলিফা আল-মনসুরের শাসনের সাথে ফাতেমি খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর শাসনের মিল ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উপরের দুইজন শাসকের মধ্যে তোমার মতে কোন শাসক অধিক কৃতিত্বের দাবিদার? যুক্তিসহ মতামত করো।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ (Reference Books)

১. A. M. A. Shushtery, *Outlines of Islamic Culture*, Printed at the Bangalore Press, Bangalore City, India, 1938

২. Carl Brockelmann, *History of the Islamic Peoples*, Routledge & Kegan Paul Limited, First Published in Germany, 1939, Reprinted London 1950

৩. J. J. Saunders, *The History of the Mongol Conquests*, Routledge & Kegan Paul Limited, Henley and Boston, London, 1971

৪. *The Cambridge History of Islam*, vol. IA, (The Central Islamic Lands from pre-Islamic Times to the First World War), Edited by. P. M. Holt, Ann K. S. Lambton and Bernard Lewis, Cambridge University Press, First Published 1970, Reprinted 1995

৫. S. A. Q. Husaini, *Arab Administration*, Sh. Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore (Pakistan), First Edition 1949, Fifth Impression 1966

৬. *A Literary History of Persia*, volume I, (First Published 1902, Reprinted 1928), III, By Edward. G. Browne, Cambridge University Press, First Published 1902, Reprinted 1976

৭. *The Legacy of Islam*, Edited by Thomas Arnold and Alfred Guillaume, Oxford University Press, London, First Published 1931, Reprint 1968

৮. Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, Cambridge at the University Press, London, 1957

৯. Adam Mez, *The Renaissance of Islam*, Trans. By S. K. Bakhsh and D. S. Margoliouth, *The Renaissance Des* Islam, The Renaissance of Islam, Patna, 1937

১০. P. K. Hitti, *History of the Arabs,* Macmillan, 1960

১১. Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, Delhi, September, 1977, Kitab Bhawan

১২. S. M. Imamuddin, *Arabic Writings and Arab Libraries,* London: Ta-Ha Publishers,1983

১৩. M. Kabir, *The Buwayhid Dynasty of Baghdad,* Calcutta: Iran Society,1964,

১৪. Reinhart Dozy, *Spanish Islam: A History of the Moslems in Spain,* Trans by. Francis Griffin Stokes, Karachi, 1978

১৫. K. D. Bhargava, *A Survey of Islamic Culture and Institutions,* Allahabad, 1981

১৬. Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, London (Reprint), 1961

১৭. W.M. Watt, *Muhammad At Mecca,* Oxford, 1953

১৮. O' Leary De Lacy, *A Short History of the Fatimid Khalifate*, London, 1923

১৯. S. Khuda Baksh, *Contributions to the History of Islamic Civilization*, Vol. II, Calcutta, 1930

২০. D. B. Macdonald, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory,* London, 1903

২১. William Muir, *The Caliphate, its Rise, Decline and Fall*

২২. C. E. Bosworth , *Islamic Survey; The Islamic Dynasties*

২৩. M. Ahsanullah, *History of the Islamic World*

২৪. ড. গোলাম কিবরিয়া ভুঁইয়া, *উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে মুসলিম শাসনের ইতিহাস,* ঢাকা, ২০০৩

২৫. গাজী শামসুর রহমান, *ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮২

২৬. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি,* ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্থান, ২০০১

২৭. এ বি এম হোসেন, *আরব স্থাপত্য,* ঢাকা, ১৯৯৩

২৮. আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ,* রাজশাহী, ১৯৭৯

পরিশিষ্ট

এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

সকল বোর্ড ২০১৮

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র বিষয় কোড | ২ | ৬ | ৭ |

সময় — ৩০ মিনিট **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: — সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. **'আরব' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?**
(ক) জলাশয় (খ) জনপদ
(গ) মরুভূমি (ঘ) মালভূমি

২. **ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?**
(ক) এক (খ) দুই
(গ) তিন (ঘ) চার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রুদ্র প্রকৃতিতে বেঁচে থাকা, ক্ষিপ্র গতিতে যাতায়াত, যুদ্ধ, অভিজাত জীবনযাপন প্রভৃতি আরব সমাজে নির্ভর করতো একটি প্রাণীর মালিকানার উপরে।

৩. **উদ্দীপকে যে প্রাণীটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো—**
(ক) উট (খ) ঘোড়া
(গ) গাধা (ঘ) খচ্চর

৪. **মানুষের জীবনে উক্ত প্রাণীর যে প্রভাব ছিল—**
i. যুদ্ধজয়
ii.. কৃষিকাজ
iii. যাতায়াত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. **প্রাক-ইসলামি সমাজকে কলুষিত করেছিল আরবদের—**
i. ব্যাভিচার
ii. কন্যা শিশুকে হত্যা
iii. শেখতন্ত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. **মুসলমানরা প্রথম হিজরত করেন কোথায়?**
(ক) আবিসিনিয়া (খ) মদিনা
(গ) তায়েফ (ঘ) নজদ

৭. **মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদিনায় হিজরত মুসলমানদের জীবনে যে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছিল তা হলো—**
i. মর্যাদা প্রতিষ্ঠা
ii. উম্মাহ গঠন
iii. রাষ্ট্রগঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮ ও ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রহিম, রাম, ও জন একটি ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করেন। রহিম যে হারে ভূমি কর দেন: রাম ও জন তার চেয়ে একটু বেশি ভূমি কর দেন। সামরিক করের বিনিময়ে রাম ও জন, ইসলামি রাষ্ট্রে যুদ্ধ অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকলেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রহিমের যুদ্ধে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল।

৮. **রহিমের প্রদেয় ভূমি করের নাম কী?**
(ক) জিজিয়া (খ) উশর
(গ) খারাজ (ঘ) যাকাত

৯. **রাম ও জন যুদ্ধে যাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পায় যে কর পরিশোধের কারণে, তা হলো—**
(ক) খারাজ (খ) জিজিয়া
(গ) আল্-ফে (ঘ) উশর

১০. **ইয়ামামার যুদ্ধে সেনাপতি কে ছিলেন?**
(ক) মুনজির (খ) আবু ওবায়দা
(গ) খালিদ বিন ওয়ালিদ (ঘ) ওসামা

১১. **রিদ্দা যুদ্ধের কারণ হলো—**
i. স্বধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ
ii. ভণ্ড নবিদের আবির্ভাব
iii. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
কৌশলপূর্ণ পশ্চাদগমন দূরদর্শী নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। একজন মহাপুরুষ তাঁর জীবনে এরূপ একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে সুদূরপ্রসারী ও রণচাতুর্যপূর্ণ বিজয় অর্জন করেন।

১২. **উদ্দীপকে ঘটনাটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?**
(ক) হিলফুল ফুযুল (খ) আকাবার শপথ
(গ) মদিনা সনদ (ঘ) হুদায়বিয়ার সন্ধি

১৩. **উক্ত ঘটনার সুদূরপ্রসারী ফলাফল হলো—**
i. দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধাবস্থার অবসান
ii. মহাবিজয়
iii. আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪. **খিলাফত কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?**
(ক) ধর্মীয় ও রাজনৈতিক
(খ) রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক
(গ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক
(ঘ) ধর্মীয় ও নৈতিক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজা নাফিস একজন ভৃত্যসহকারে উটের পৃষ্ঠে চড়ে তার সেনাপতি কর্তৃক অবরুদ্ধ শহরের দিকে রওয়ানা হন। পালাক্রমে তিনি ও তার ভৃত্য উটের পৃষ্ঠে চড়ে শহরে উপস্থিত হলেন, শহরে প্রবেশকালে তখন রাজা উটের রশি টানছিলেন আর ভৃত্য উটের পৃষ্ঠে বসা।

১৫. **উদ্দীপকের ঘটনাটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত?**
(ক) জেরুজালেম অধিকার
(খ) খ্রিস্টান ও মুসলমানদের যুদ্ধ বিরতি
(গ) জেরুজালেম এর নিরাপত্তা
(ঘ) খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সন্ধি চুক্তি

১৬. **উক্ত ঘটনাটিতে হযরত ওমর (রা)-এর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশিত হয়েছে—**
i. ন্যায়বিচার
ii. মানবতাবোধ
iii. সাম্যবাদিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭. **হযরত ওসমান (রা) কে হত্যার পেছনে যে কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো—**
i. কুরাইশ-অকুরাইশ দ্বন্দ্ব
ii. গণতন্ত্রের অপব্যবহার
iii. খলিফার সরলতা ও উদারতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. **হযরত আলী (রা) কত বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন?**
(ক) ৬ বছর (খ) ৮ বছর
(গ) ১০ বছর (ঘ) ১২ বছর

১৯. **উমাইয়া আমলে কাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়?**
(ক) অনারবদের (খ) হিমারীয়দের
(গ) আরবদের (ঘ) মুদারীয়দের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
করিম সাহেবের চার ছেলে ধারাবাহিকভাবে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়।

২০. **করিম সাহেবের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার মিল পাওয়া যায়?**
(ক) আবদুল মালিক (খ) আল-ওয়ালিদ
(গ) সুলাইমান (ঘ) হিশাম

২১. নিচের কারা উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সেনাপতি ছিলেন?
i. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ
ii. তারিক বিন জিয়াদ
iii. মুসা বিন নুসায়ের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. কোন উমাইয়া খলিফাকে 'সাধুপুরুষ' বলা হয়?
ক মুয়াবিয়া
খ আব্দুল মালিক
গ আল ওয়ালিদ
ঘ ওমর বিন আব্দুল আজিজ

২৩. আবুল আব্বাসের 'আস-সাফফাহ' উপাধি গ্রহণ করার কারণ হলো—
i. বিরোধীদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার
ii. বিরোধীদের অনুগত করা
iii. বিরোধীদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. খলিফা আল মনসুর একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হওয়া সত্ত্বেও অকৃত্রিম বন্ধু আবু মুসলিম এর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের কারণ—
ক নিজের ও বংশের নিরাপত্তা শঙ্কা
খ ব্যক্তিস্বার্থ
গ অর্থনৈতিক কারণ
ঘ অনৈসলামিক কার্যকলাপ

২৫. মুসা বিন নুসাইর নিচের কোন অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন?
ক উত্তর আফ্রিকা
খ মধ্য আফ্রিকা
গ দক্ষিণ আফ্রিকা
ঘ দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা

২৬. যে সংকীর্ণ জলরাশি দুটি বৃহৎ জলরাশিকে সংযুক্ত করে এবং দুটি ভূমিকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে বলে—
ক উপদ্বীপ খ প্রণালী
গ হ্রদ ঘ অন্তরীপ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
মির্জা গালিব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সকল অভ্যন্তরীণ কোন্দল দমন করে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তার শাসনকালে সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

২৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত মির্জা গালিবের সাথে ফাতেমি খিলাফতের কোন খলিফার কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়?
ক ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী
খ আল মুইজ
গ আল আজিজ
ঘ আল হাকিম

২৮. উক্ত খলিফার শাসনকাল ছিল—
i. শান্তিপূর্ণ
ii. বিদ্যাচর্চায় সমৃদ্ধ
iii. আড়ম্বরপূর্ণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. স্পেনে ফকিহ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল—
ক ক্ষমতা দখল
খ ধর্মের বিশুদ্ধতা
গ উমাইয়াদের বিতাড়ন
ঘ স্পেনীয়দের স্বার্থ রক্ষা

৩০. দারুল হিকমা কে প্রতিষ্ঠা করেন?
ক আল মনসুর খ আল মুইজ
গ আল আজিজ ঘ আল হাকিম

উত্তর																														
	১	গ	২	গ	৩	খ	৪	খ	৫	ক	৬	ক	৭	ঘ	৮	গ	৯	খ	১০	গ	১১	ক	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	ক
	১৬	গ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	গ	২০	ক	২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	ক	২৬	খ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	ঘ

ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট ও যশোর বোর্ড ২০১৮

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিষয় কোড ২ ৬ ৭

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ সম্প্রতি উত্তরায়ন রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলে একটি প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। ইতিহাসবিদগণ মনে করেন যে, এটি খুব উন্নত সভ্যতা ছিল। প্রাপ্ত উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করে তারা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ঐ সভ্যতার মানুষ লেখাপড়া জানত এবং তারা একটি বিশেষ ধরনের লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে। চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা এ লিখন পদ্ধতি কয়েকটি ধাপে বিকশিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। তারা বসবাসের জন্য সুন্দর বাড়ি-ঘর তৈরি করেনি, কিন্তু ধর্মীয় কারণে সুন্দর স্থাপত্য শিল্প, ভাস্কর্য, চারুকলা প্রভৃতির উদ্ভাবন ও প্রসার ঘটায়। তাদের সকল কর্মে দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

ক. কে মিসরকে নীল নদের দান বলেছেন? ১
খ. মিসরকে নীল নদের দান বলা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সভ্যতার লিখন পদ্ধতির সাথে প্রাচীন মিশরীয়দের উদ্ভাবিত লিখন পদ্ধতির সাদৃশ্য কতটুকু? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মিশরীয়দের সকল অবদানে ধর্মের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ বেশ কিছু দিন ধরে 'জাহান ডিপার্টমেন্টাল স্টোর' এর সেলসম্যান রূপা কাজে আসছে না। কারণ জানার জন্য মিসেস নাজমা জাহান রূপার বাসায় আসেন। কাজে না আসার কারণ জানতে চাইলে রূপা কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলে যে, তার স্বামীর সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণে সে অসুস্থ। সে মিসেস নাজমা জাহানকে আরও বলে যে, তার মদ্যপ স্বামী তার দুই কন্যাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সমাজে নারীদের কোনো অধিকার নেই। মিসেস নাজমা জাহান এসব শুনে খুব ব্যথিত হন। তিনি সমাজে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও যথাযথ মর্যাদার সাথে বসবাসের জন্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এতে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

ক. প্রাক-ইসলামি আরবের শ্রেষ্ঠ কবি কে ছিলেন? ১
খ. উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত করুণ ঘটনাটি প্রাক-ইসলামি আরবের সামাজিক অবস্থার কোন দিকটিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'মিসেস নাজমা জাহানের চিন্তা-চেতনায় নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স)-এর নির্দেশনা ও আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে।' বক্তব্যটি সমর্থন কর কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩.▶ 'ক' রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী করিমশাহ তার দেশের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। সকল শ্রেণি, পেশা, দল ও সম্প্রদায়ের সমান অধিকার উক্ত শাসনতন্ত্রে নিশ্চিত করা হয়। সকলের ভালোবাসা, সহযোগিতা ও আন্তরিকতায় 'ক' রাষ্ট্রটিকে একটি আদর্শ, শক্তিশালী ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রত্যয় উক্ত শাসনতন্ত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়। ঐ শাসনতন্ত্রের চেতনায় কালক্রমে 'ক' একটি কার্যকর ও পরাক্রমশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো উক্ত শাসনতন্ত্রটিকে তাদের জন্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এবং একে অনুসরণ করে।

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করেন? ১

খ. নাখলার খণ্ডযুদ্ধকে বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের শাসনতন্ত্রটি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কোন কর্মের আদর্শিক প্রতিফলন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের মতো মহানবি (স)-এর উক্ত পদক্ষেপটিই ছিল শক্তিশালী মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ এভারগ্রিন কলেজের শিক্ষার্থীরা সুন্দরবনে বেড়াতে যায়। অধ্যক্ষ তাদেরকে শ্রেণিশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে থাকতে বলেন এবং কোনো অবস্থাতেই তাদের অনুমতি ব্যতীত শিক্ষার্থীদেরকে বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। ব্যাপক আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী শ্রেণিশিক্ষকদের না জানিয়ে বনে প্রবেশ করে এবং বাঘের শিকারে পরিণত হয়। এ দুঃখজনক ঘটনাটি ভ্রমণের আনন্দ কেড়ে নেয় এবং শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি করে। সবাই আপনজন হারানোর বেদনা নিয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে। শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে বড়দের নির্দেশ সর্বদা পালনীয়। এ শিক্ষা তাদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে।

ক. বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সেনাপতি কে ছিলেন? ১

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকটি ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষার্থীদের মতো উক্ত যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাই কি মুসলমানদেরকে অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত করেছিল? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫.▶ তমালতলা জেল পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে আজাদ সাহেব তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, তিনি অন্যায়ের প্রতিকার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। আবেগঘন ভাষণে তিনি আরও বলেন যে, তার কোনো ভুল হলে জনগণ যেন তার ভুল ধরিয়ে দেন। বক্তৃতায় সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেও তিনি ব্যাপক বাধার সম্মুখীন হন। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি সহনীয় মাত্রায় কিছু কর ধার্য করলে একদল লোক কর দিতে অস্বীকার করে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সকল অপশক্তির মোকাবিলা করে জেলায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

ক. বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন? ১

খ. খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চেয়ারম্যান সাহেবের উদ্বোধনী বক্তৃতায় খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার ভাষণের আদর্শ পরিলক্ষিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'যাকাত বিরোধী আন্দোলন দমাতে উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের চেয়ে খলিফাকে আরও বেশি দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হয়েছিল।' বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৬.▶ ফতেহনগর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান লিয়াকত সাহেব প্রশাসনের সর্বত্র গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শাসনকার্যে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য তিনি রাষ্ট্রের শিক্ষিত, বিজ্ঞ ও যোগ্য নাগরিকদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। পরিষদ রাষ্ট্রপ্রধানকে দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। প্রশাসন ছাড়াও রাষ্ট্রপতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজস্ব ও কর ব্যবস্থায় বহুবিধ সংস্কার সাধন করেন। মানুষ তার সুফল ভোগ করছে।

ক. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গৃহযুদ্ধ কোনটি? ১

খ. হযরত উসমান (রা) কীভাবে মদিনার পানীয় জলের অভাব দূর করেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপদেষ্টা পরিষদের সাথে খলিফা ওমরের (রা) প্রতিষ্ঠিত মজলিশ-উশ-শুরার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত রাজস্ব ও কর ব্যবস্থাপনা হযরত ওমরের (রা) রাজস্ব ব্যবস্থার আংশিক চিত্র।' বক্তব্যটি কি সমর্থন কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭.▶ জনাব রশিত হাবিবি সেঞ্চুরি গ্রুপ অব কোম্পানির এমডি নিযুক্ত হয়ে কোম্পানিকে দুর্নীতিমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কোম্পানিতে অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্ত ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের পদত্যাগ করার আদেশ দেন। কোম্পানির স্বার্থে সবাই পদত্যাগ করলেও একজন কর্মকর্তা পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়। অধিকন্তু তার অধিকারে রক্ষিত সরকারি সম্পত্তি ফেরৎ দিতে বললে তিনি রাগান্বিত হন এবং এমডি এর আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকে। একপর্যায়ে উভয়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে কোম্পানির সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় এবং কোম্পানি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ক. হযরত আলি (রা)-এর পিতার নাম কী? ১

খ. মুয়াবিয়া (রা)-কে আরব বিশ্বের প্রথম রাজা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে সংঘটিত কোন যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের মতো উক্ত যুদ্ধ ইসলামের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ 'প্রত্যয়' ক্রিকেট অঙ্গনে একটি উদীয়মান ও শক্তিশালী ক্রীড়া সংঘ। সম্প্রতি তালাত আজিজ ক্রীড়া সংঘের নেতৃত্ব লাভ করেছে। তার নেতৃত্বে প্রত্যয় ক্রীড়া সংঘ দেশে ও দেশের বাইরে একের পর এক শিরোপা অর্জন করে চলছে। তালাত আজিজের দলে আছে বিশ্ববরেণ্য কিছু ক্রিকেটার। তালাত আজিজের দূরদর্শী নেতৃত্বে ও বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়দের চোখ ধাঁধানো নৈপুণ্যে প্রত্যয় ক্রীড়া সংঘটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষদের হারিয়ে মূল্যবান ও মর্যাদাসম্পন্ন শিরোপা ছিনিয়ে আনছে। অবশ্য সংঘের পূর্ববর্তী অধিনায়ক রাহাত আলীর অবদানও এক্ষেত্রে কম নয়। তিনি একটি প্রশিক্ষিত, সুসংগঠিত ও সুনিপুণ দল এবং অনুকূল পরিবেশ তালাত আজিজের হাতে তুলে দিয়ে যান।

ক. উমাইয়া সাধু কে? ১

খ. আবদুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তালাত আজিজের সাথে উমাইয়া শাসক আল ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের মিলের ক্ষেত্র কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সময় ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের রাহাত আলী এবং উমাইয়া শাসক আবদুল মালিকের অবদান অভিন্ন।' উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করো। ৪

৯.▶ আশালতা রাজ্যের রাজা সুমন চৌধুরী সকলের নিকট রূপকথার রাজা বলে পরিচিত। তিনি অন্যায়কারীদের প্রতি যেমন কঠোর, তেমনি গরিব- দুঃখীদের প্রতি ছিলেন উদার ও মহানুভব। তিনি ধর্মের বিধি-বিধান শতভাগ আন্তরিকতার সাথে পালন করতেন। অসহায় ও দুঃস্থদের তিনি অকাতরে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি রাত্রিকালে ছদ্মবেশে রাজধানী ও রাজধানীর বাইরে পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। দেশের বাইরেও তিনি বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে তিনি সহাবস্থান ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন।

ক. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. 'নহরে জোবায়দা' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের মানবিক গুণাবলিকে আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করো। ৩

ঘ. 'পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে উদ্দীপকের শাসকের চেয়ে উক্ত আব্বাসি খলিফা ছিলেন আরও বিখ্যাত।' উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ একটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করে সাজিদ মহা সংকটে পতিত হন। বয়সে নবীন হলেও এ কিশোর দূরদর্শী শাসক সকল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে দেশকে শক্তিশালী ও সুসংহত করেন। তার দক্ষ পরিচালনায় দেশ কৃষি, শিল্প, সাহিত্যসহ সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে।

তার রাজধানী ছিল তিলোত্তমা নগরী। তিনি রাজধানীতে তার স্ত্রী জিনাতের নামে 'জিনাত প্রাসাদ' নির্মাণ করেন। একে বলা হতো যুগের বিস্ময়। তার নির্মিত প্রাসাদ, গৃহ, অট্টালিকা, উদ্যান প্রস্রবণ প্রভৃতির সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ করত।

ক. মুসলিম শাসনামলে স্পেনের রাজধানীর নাম কী ছিল? ১

খ. কাকে, কেন 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত 'জিনাত প্রাসাদের' সাথে স্পেনে তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক নির্মিত কোন প্রাসাদের সামাঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত তিলোত্তমা নগরীর আলোকে কর্ডোভা নগরীর সমৃদ্ধি মূল্যায়ন করো। ৪

১১.▶ আফনান সুদীর্ঘ ২৩ বছর কৃতিত্বের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তার 'চিম্মুক' রাষ্ট্রটিকে স্বর্ণময় করে তুলেন। তিনি ছিলেন তার রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। বিদ্রোহ দমন, রাজ্য বিজয়, শাসন ব্যবস্থার সংস্কার, রাজস্ব বিভাগের পুনর্বিন্যাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার অবদান অপরিসীম। দূরদর্শী ও মেধাবী এ শাসক অনেক রাজ্য জয় করেন। তবে 'চেতন নগর' রাজ্য জয় ইতিহাসের পাতায় তাকে স্মরণীয় করে রেখেছে। তার সেনাপতি সোহরাব তথায় একটি সুন্দর নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে আফনান তথায় তার রাজধানী স্থানান্তর করেন।

ক. উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে কে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. দারুল হিকমা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসক কর্তৃক 'চেতন নগর' রাজ্যে জয়ের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কোন দেশ বিজয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসককে যদি তার বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক বলা যায়, তাহলে আল-মুইজকে উত্তর আফ্রিকা ও মিশরের ফাতেমি খিলাফতের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে অভিহিত করার যৌক্তিকতা তুলে ধরো। ৪

রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ড ২০১৮

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিষয় কোড | ২ | ৬ | ৭ |

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ তিনদিকে সমুদ্র বেষ্টিত সিঙ্গাপুর দেশটি একটি অনুর্বর অঞ্চল। একসময় শহরের কিছু লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও গ্রামের লোকদের পশুপালন বা মাছ শিকার ছাড়া অন্য কোনো কাজের উপায় ছিল না। জীবন-জীবিকার জন্য তারা চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা ও লুটতরাজ করতে বাধ্য হতো।

ক. 'জাজিরা' অর্থ কী? ১

খ. উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সিঙ্গাপুরের সাথে প্রাচীন আরবের ভৌগোলিক অবস্থার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রাক-ইসলামি আরবের অধিবাসীদের ওপর ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব মূল্যায়ন করো। ৪

২.▶ মিয়ানমার শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অত্যাচার, নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও ঘরবাড়ি পোড়ানোর শিকার হয়ে প্রায় ৬ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। সরকার মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা দিয়ে সহযোগিতা করছে। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীও তাদের ত্রাণ বিতরণ করছে।

ক. মদিনার পূর্বনাম কী? ১

খ. 'মিরাজ' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মদিনার মুহাজির ও আনসার সম্প্রদায়ের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৩.▶ সিন্ধু নদের তীরে প্রাচীনকালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাই সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত। এটি ছিল কৃষিভিত্তিক নগর সভ্যতা। নগরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা, ঘরবাড়ির চিহ্ন দেখে অনুমান করা হয় সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা পরলৌকিক জীবন সম্পর্কে ধারণা রাখত না। সুখ-সমৃদ্ধ পার্থিব জীবনই তাদের আরাধ্য ছিল।

ক. পিরামিড কী? ১

খ. হায়ারোগ্লিফিক্স কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনসাধারণের সাথে উক্ত সভ্যতার জনসাধারণের জীবনপ্রণালীর তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৪.▶ নিজ এলকায় শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীল বজায় রাখার স্বার্থে এবং চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হানাহানি ও লুটতরাজ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে রহমতপুর এলাকার কয়েকজন যুবক ঈমান চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি সমিতি বা সংঘ গড়ে তোলেন। তাদের এই উদ্যোগ সফল হয়।

ক. কত সালে মক্কা বিজয় হয়েছিল? ১

খ. 'বায়তুল মাল' কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সমিতি প্রাচীন আরবের কোন সংগঠনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমিতির কার্যাবলি সম্পাদনে মহানবি (স)-এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করা। ৪

৫.▶ আরব বসন্তের ঢেউ মিশরের বয়োবৃদ্ধ প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করে। নতুন শাসক শক্তি ও শাসনে যোগ্যতার পরিচয় দিলেও কূটকৌশললে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে যান এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে কঠিন পরিণতি ভোগ করেন।

ক. 'আসাদুল্লাহ' কার উপাধি? ১

খ. কাকে, কেন জুন্নরাইন বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আরব বসন্তের সাথে খলিফা উসমান (রা) বিরোধী আন্দোলনের মিল কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নতুন শাসকের শাসনের আলোকে হযরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যকার দ্বন্দ্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৬.▶ মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খান বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। তার দক্ষ ও দুর্ধর্ষ সেনাপতিদের নিপুণতায় তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। পরবর্তীতে মোঙ্গলগণ মধ্য এশিয়া, বাগদাদ ও ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান পরিচালনা করে।

ক. উমাইয়াদের শেষ খলিফা কে ছিলেন? ১

খ. মুয়াবিয়া (রা)-কে আরবের প্রথম রাজা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চেঙ্গিস খানের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার তিনজন সেনাপতির কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶ গাজান খান সিংহাসনে আরোহণ করে পূর্বসূরিদের সকল অন্যায় নীতি পরিহার করেন। ধর্মপ্রাণ এই শাসক শাসককার্যে পূর্ণ ইসলামি রীতিনীতি পুনঃস্থাপন করেন। রাজস্ব ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করে তিনি অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেন।

ক. ডোম অব দি রক কী? ১

খ. কাকে কেন, রাজেন্দ্র বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উক্ত খলিফার শাসন নীতি ছিল জনকল্যাণমুখী'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ ইতিহাসখ্যাত বাদশা হাসান প্রজাদের জন্য অন্তঃপ্রাণ ছিলেন। তার স্ত্রী ও তীর্থযাত্রীদের পানির কষ্ট দূর করার জন্য দূরাঞ্চল হতে পানি আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বাদশাহ তার পার্শ্ববর্তী প্রতাপশালী শত্রু সাম্রাজ্যের অধিপতিকে বারবার যুদ্ধে পরাজিত করেও তাকে ক্ষমা করে দেন।

ক. আব্বাসিদের রাজধানী কোথায় ছিল? ১

খ. আব্বাসি কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের নারীর সাথে আব্বাসি কোন মহীয়সী নারীর কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের শাসক ও আব্বাসি খলিফা হারুন অর রশীদ-এর শাসন বৈশিষ্ট্য একই রূপ'— মূল্যায়ন করো। ৪

৯.▶ জমিদার রাহাত লস্করের পূর্বপুরুষদের একসময় উপকূলব্যাপী জমিদারি ছিল। কিন্তু উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা, প্রজা অসন্তোষ, পারিবারিক অসন্তোষ ও কলহ প্রভৃতি কারণে তা ছোট হতে হতে একসময় একটি গ্রামকেন্দ্রিক জমিদারিতে পরিণত হয়। তবে রাহাত লস্কর জমিদার হয়ে ব্যতিক্রমী একটি লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করে শত্রুকে কঠোর হাতে দমন এবং মিত্রকে আলিঙ্গন করার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে পূর্বপুরুষদের সমস্ত এলাকাই পুনরুদ্ধার করেন। তিনি নিজেকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ক. মুজারিব কারা? ১

খ. ইসলামের ইতিহাসে কর্ডোভা এত বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রাহাত লস্করের সাথে স্পেনের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ মধ্য এশিয়ার প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে উসমান যে রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন দিনে দিনে তার উত্তরসূরিদের হাতে তা বিশাল সাম্রাজ্য পরিণত হয়। এই বংশের সুলতান ২য় মুহাম্মদ বায়জান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয় করেন এবং সেখানে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন।

ক. মিশর বিজয়ী ফাতেমীয় সেনাপতির নাম কী? ১

খ. ফাতেমীয় কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ওসমানের সাথে কোন ফাতেমীয় খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের ২য় মুহাম্মদের মতো ফাতেমীয় খলিফা আল-মুইজ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন'— মূল্যায়ন করো। ৪

১১.▶ মালয়েশিয়ার আনোয়ার ইব্রাহিম ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদের রানিংমেট। তথাপি সন্দেহবশত একটি তুচ্ছ ঘটনাকে অজুহাত করে মাহাথির তাকে চিরতরে ক্ষমতার বাইরে পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে মাহাথিরের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা লোপ পায়।

ক. খায়জুরান কে ছিলেন? ১

খ. 'বায়তুল হিকমাহ' কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আনোয়ার ইব্রাহিমের সাথে বার্মাকি পরিবারের কোন সদস্যের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বার্মাকি পরিবারের পতনের কারণ মূল্যায়ন করো। ৪

সকল বোর্ড ২০১৯

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র

বিষয় কোড | ২ | ৬ | ৭ |

সময় — ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: — সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. কোন উমাইয়া শাসককে রাজেন্দ্র বলা হয়?
(ক) মুয়াবিয়া (খ) আব্দুল মালিক
(গ) আল-ওয়ালিদ (ঘ) হিশাম

২. কুব্বাতুস সাখরা কে নির্মাণ করেন?
(ক) মুয়াবিয়া (খ) আব্দুল মালিক
(গ) আল-ওয়ালিদ (ঘ) হিশাম

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইব্রাহিম একজন মহান শাসক ছিলেন। ধর্মভীরু মুসলিম শাসক হলেও পর ধর্মের প্রতি তিনি খুবই সহনশীল ছিলেন। তিনি অমুসলিমদের উপর থেকে করের বোঝা কমিয়ে দেন।

৩. উদ্দীপকের শাসক নিচের কোন শাসকের প্রতিচ্ছবি?
(ক) মুয়াবিয়া
(খ) আব্দুল আজিজ
(গ) আল-ওয়ালিদ
(ঘ) ওমর বিন আব্দুল আজিজ

৪. উক্ত শাসককে বলা যায়—
i. প্রজাবৎসল
ii. ন্যায়পরায়ণ
iii. ধর্মনিরপেক্ষ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. কত খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ নগরী ধ্বংস হয়?
(ক) ৭৫০ (খ) ৯০৬
(গ) ১২৫০ (ঘ) ১২৫৮

৬. হযরত আবুবকর (রা) কোরআন সংগ্রহে উৎসাহিত হলেন কেন?
(ক) ভন্ড নবিদের উৎপাত বৃদ্ধি পাওয়ায়
(খ) কোরআনের আয়াত ভুলে যাওয়ার ভয়ে
(গ) কোরআনের অনেক হাফেজ শহিদ হওয়ায়
(ঘ) রাষ্ট্রীয় কার্যে কোরআনের আইন প্রয়োগ করতে

৭. কোন মুসলিম সেনাপতি স্পেন জয় করেন?
(ক) তারিক বিন জিয়াদ
(খ) মুহাম্মদ বিন কাসিম
(গ) ওকবা বিন নাফি
(ঘ) কুতাইবা বিন মুসলিম

৮. কাদের শাসনামলে সেলজুকদের উত্থান ঘটে?
(ক) উমাইয়াদের (খ) আব্বাসিদের
(গ) ফাতেমিদের (ঘ) অটোমানদের

৯. 'ফেরাউন' কাদের উপাধি ছিল?
(ক) রাজাদের (খ) দেব-দেবীদের
(গ) ধর্মযাজকদের (ঘ) বীরসেনাদের

১০. পিরামিড তৈরির মূল উদ্দেশ্য কী?
(ক) রাজাদের সন্তুষ্টি
(খ) মমি সংরক্ষণ
(গ) সৌন্দর্য বৃদ্ধি
(ঘ) দেবতাকে খুশি করা

১১. ভুজি কে ছিলেন?
(ক) মিশরীয় সম্রাট (খ) সুমেরীয় সম্রাট
(গ) ব্যাবিলনীয় সম্রাট (ঘ) পারস্য সম্রাট

১২. ইসলামপূর্ব আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে ছিলেন?
(ক) আনতারা
(খ) ইমরুল কায়েস
(গ) যুহাইর বিন আবি সালমা
(ঘ) লাবিদ বিন রাবিয়া

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

নড়াইলের প্রত্যন্ত গ্রামে জনগণকে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্যে মিজান সাহেব প্রচুর অর্থ ব্যয়ে একটি আধুনিক পানির প্লান্ট স্থাপন করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন।

১৩. মিজান সাহেবের কাজে কোন খলিফার কাজের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়?
(ক) হযরত আবুবকর (রা)
(খ) হযরত ওমর (রা)
(গ) হযরত ওসমান (রা)
(ঘ) হযরত আলী (রা)

১৪. উক্ত খলিফার কাজে—
i. জনকল্যাণের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়
ii. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়
iii. নিজের সুনাম বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. মদিনা সনদের মাধ্যমে মুসলিমরা অর্জন করেছিল তাদের—
i. ধর্মীয় স্বাধীনতা
ii. সামাজিক অধিকার
iii. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সালমা একটি যুদ্ধের ঘটনা শুনছিল। যেখানে বন্দিদের প্রতি ভাল আচরণ করা হয়েছিল এবং মুক্তিপণের মাধ্যমে তাদের অনেককে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

১৬. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটির ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের মিল আছে?
(ক) বদরের যুদ্ধ (খ) ওহুদের যুদ্ধ
(গ) খন্দকের যুদ্ধ (ঘ) মুতার যুদ্ধ

১৭. বন্দিদের প্রতি উক্ত যুদ্ধের শিক্ষা হচ্ছে—
i. মানবিক আচরণ করা
ii. সহজ শর্তে মুক্তি দেয়া
iii. সারাজীবন বন্দি রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. জুমাতুল জন্দলের সালিশ বৈঠকের ফলে—
i. মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট হয়
ii. খলিফার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়
iii. খারিজিদের উৎপত্তি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. মহানবি (স) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ৫৬০ (খ) ৫৬৫
(গ) ৫৭০ (ঘ) ৫৭৫

২০. কোন পর্বতের গুহায় মহানবি (স)-এর নিকট ওহি নাযিল হয়?
(ক) সাফা (খ) হেরা
(গ) মারওয়া (ঘ) সওর

২১. মহানবি (স) কোথায় বিদায় হজের ভাষণ দেন?
(ক) কাবা চত্বরে (খ) মীনায়
(গ) সাফা পর্বতে (ঘ) আরাফাতে

২২. উমাইয়া শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—
i. সাম্রাজ্য বিস্তার
ii. জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ
iii. স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

* [নোট: সঠিক উত্তর i ও iii]

২৩. হযরত ওমর কত খ্রিস্টাব্দে খিলাফত লাভ করেন?
(ক) ৬৩২ (খ) ৬৩৪
(গ) ৬৪৪ (ঘ) ৬৫৬

২৪. মুসলিম রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম কোন শাসক আদমশুমারি করেছিলেন?
(ক) হযরত আবুবকর (রা)
(খ) হযরত ওমর (রা)
(গ) মুয়াবিয়া
(ঘ) আব্দুল মালিক

২৫. বয়স্কদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন?
(ক) হযরত আবুবকর (রা)
(খ) হযরত ওমর (রা)
(গ) হযরত ওসমান (রা)
(ঘ) হযরত তালহা (রা)

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দলের সংকটময় মুহূর্তে সাকিব দলনেতা নির্বাচিত হয়ে দলে শৃঙ্খলা আনার লক্ষ্যে পূর্ব নির্বাচিত কমিটি প্রধানকে পদত্যাগ করতে বলেন। অনেকে তার আহ্বানে সাড়া দিলেও কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেন।

২৬. সাকিবের পদক্ষেপটি কোন শাসকের গৃহীত পদক্ষেপের অনুরূপ?
(ক) হযরত ওসমান (রা)
(খ) হযরত আলী (রা)
(গ) মুয়াবিয়া
(ঘ) হিশাম

২৭. উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মুসলিম সাম্রাজ্যে দেখা দেয়—
i. অনৈক্য
ii. রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ
iii. ভ্রাতৃবিরোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

২৮. কোন খলিফাকে 'উমাইয়া সাধু' বলা হয়?
(ক) মুয়াবিয়া
(খ) আব্দুল মালিক
(গ) সুলায়মান
(ঘ) ওমর বিন আব্দুল আজিজ

২৯. ইয়ামামার যুদ্ধে কোন ভণ্ড নবি নিহত হন?
(ক) আসাদ আনসি
(খ) মুসাইলামা
(গ) তোলায়হা
(ঘ) সাজাহ

৩০. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজধানীর নাম কী ছিল?
(ক) টলেডো
(খ) কর্ডোভা
(গ) সিউটা
(ঘ) গ্রানাডা

উত্তর	১	(খ)	২	(খ)	৩	(ঘ)	৪	(ঘ)	৫	(ঘ)	৬	(গ)	৭	(ক)	৮	(খ)	৯	(ক)	১০	(খ)	১১	(খ)	১২	(খ)	১৩	(গ)	১৪	(গ)	১৫	(ক)
	১৬	(ক)	১৭	(ক)	১৮	(ঘ)	১৯	(গ)	২০	(খ)	২১	(ঘ)	২২	*	২৩	(খ)	২৪	(খ)	২৫	(ক)	২৬	(খ)	২৭	(ঘ)	২৮	(ঘ)	২৯	(খ)	৩০	(ক)

ঢাকা, দিনাজপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বোর্ড ২০১৯

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিষয় কোড ২ ৬ ৭

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶

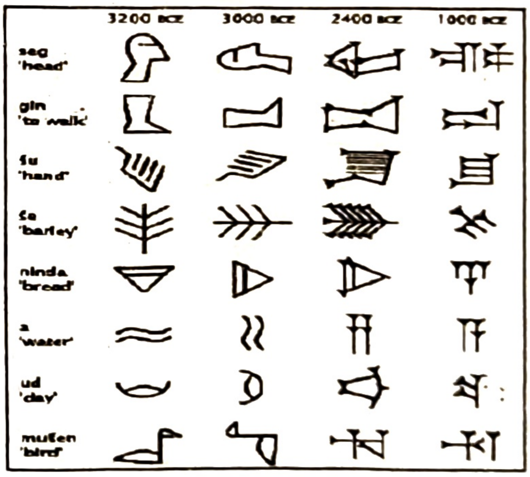

ক. পিরামিড কি? ১
খ. মিসরকে নীল নদের দান বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্র কোন সভ্যতার স্বাক্ষর বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

২.▶ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ মেলায় ক্রেতা, বিক্রেতা, দর্শনার্থী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হন। উন্মুক্ত মঞ্চে প্রতিদিন আবৃত্তি, সঙ্গীত, প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর সাহিত্যকর্মের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

ক. আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ কী? ১
খ. হানিফ সম্প্রদায় কারা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলা একাডেমি পুরস্কারের সাথে প্রাক-ইসলামি যুগের কোন পুরস্কারের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের মেলাটির মতো 'উকাজ মেলাও' সাহিত্যনির্ভর ছিল? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩.▶ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ দক্ষিণ সুদান। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়ে। এ নিয়ে সরকারপ্রধান রাষ্ট্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংবিধান রচনা করেন। এর ফলে সকলের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ক. আনসার শব্দের অর্থ কী? ১
খ. মোহাজের কারা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংবিধান প্রণয়নের সাথে মহানবি (স) কর্তৃক গৃহীত কোন পদক্ষেপের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দক্ষিণ সুদানের মত মহানবি (স)-এর গৃহীত ব্যবস্থা মানবাধিকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—মূল্যায়ন করো। ৪

৪.▶ শাসন ক্ষমতা লাভের পর মি. রহিমকে অনেক সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর সময় ভণ্ড ধর্ম প্রচারকদের উদ্ভব, করবিরোধী আন্দোলন ও স্বধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ রাষ্ট্রে ধর্ম ব্যবস্থার উপর আঘাত হানে। তিনি সাহস ও দৃঢ়তার সাথে এ জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন। বিশ্বস্ততার জন্য তাঁকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ক. 'যুন্নুরাইন' কার উপাধি? ১
খ. খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের মি. রহিমের সাথে তোমার পঠিত ইসলামের ইতিহাসের কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তোমার পঠিত শাসককে কি ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়। আইনসভাটি দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। উচ্চকক্ষের নাম হাউজ অব কমন্স। মূলত হাউজ অব কমন্সে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অপরদিকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হাউজ অব লর্ডসের সদস্যগণ দেশের সার্বিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে সুচিন্তিত মতামত দেন।

ক. আতিক শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'যুন্নুরাইন' বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আইনসভার সাথে হযরত ওমর (রা) প্রবর্তিত কোন পরিষদের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত পরিষদের কার্যাবলি পর্যালোচনা করো। ৪

৬.▶ সুলতানি ও মুঘল আমলে ভারতে ফার্সি ভাষায় সরকারি কার্যক্রম চলত। কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। শাসনক্ষেত্রে ব্রিটিশরা ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করে। এরই প্রেক্ষিতে তারা ভারতে ইংরেজি শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। অফিস-আদালতসহ সবখানে ইংরেজি ভাষা চালু করা হয়। অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসায় তারা ইংরেজি সংস্কৃতি চালু করে।

ক. উমাইয়া খিলাফতের পতন হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? ১

খ. মুয়াবিয়া (রা)-কে কেন আরবদের প্রথম রাজা বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে খলিফা আব্দুল মালিকের কোন সংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পদক্ষেপ আব্দুল মালিকের আরবীয়করণ নীতির প্রতিচ্ছবি— মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶ চেঙ্গিস খান শুধু তার নিজস্ব বীরত্বে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে পারেননি। দক্ষ সেনাপতির রণনিপুণতাই তাঁর সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতির প্রধান কারণ ছিল। তাছাড়া সাম্রাজ্য বিস্তার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে তিনি 'উত্তরাঞ্চল' ও 'দক্ষিণাঞ্চল' নামক দুটি প্রধান উইংয়ে বিভক্ত করে সেখানে দুইজন দক্ষ প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন। তারা দুজনই পরস্পর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রাজ্য বিস্তার করতেন। তবে এদের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রতিনিধি মেজু খান ছিলেন খুবই নৃশংস।

ক. কুব্বাতুস সাখরা কোথায় অবস্থিত? ১

খ. সোলায়মানকে 'আশীর্বাদের চাবি' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মেজু খানের সাথে খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলের কোন প্রাদেশিক গভর্নরের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চেঙ্গিস খানের মতো খলিফা আল ওয়ালিদও মূলত দক্ষ সেনাপতিদের কারণে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে সক্ষম হয়েছিলেন— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ বাদশা নাসিরউদ্দিন বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। তাঁর কোনো দাস-দাসী ছিল না। তিনি ব্যক্তিগত ও সাংসারিক প্রয়োজনে সরকারি কোষাগার থেকে কোনো অর্থ খরচ করতেন না। কুরআন শরিফ নকল ও টুপি সেলাই করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রশাসনিক কাজের চেয়ে তিনি ধর্মীয় কার্যাবলিকে অধিক গুরুত্ব দিতেন।

ক. উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী কোথায় ছিল? ১

খ. কুব্বাতুস সাখরা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাদশাহ নাসিরউদ্দিনের সাথে উমাইয়া খিলাফতের কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো উক্ত শাসকের নীতিসমূহ উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী ছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯.▶ পবন চৌধুরী মরিচপাশা গ্রামের জমিদার পরিবারের সন্তান। তিনি উচ্চশিক্ষিত ও পৈতৃকসূত্রে বিশাল সম্পদের অধিকারী। এলাকার মানুষের শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশ-বিদেশের বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করে তিনি এটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তাঁর এই গ্রন্থাগারের সুনাম শুনে দূর-দূরান্ত থেকে বহু জ্ঞানপিপাসু মানুষ এখানে ছুটে আসেন। তিনি এই গ্রন্থাগার পরিচালনায় প্রচুর টাকা খরচ করেন।

ক. আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১

খ. 'রাওয়ান্দিয়া' সম্প্রদায় কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পবন চৌধুরীর সাথে আব্বাসি বংশের কোন খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার শাসনামলকে কি ইসলামের 'অগাস্টান যুগ' বলে অভিহিত করা যায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০.▶ আজমপুরের খান বংশের ব্যবসায়ী দাউদ খান তালুকদার বংশের হান্নান সাহেবের নিকট এক সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে জমিদারি হারান। বিজয়ী হান্নান সাহেব খান বংশের লোকদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালান। তাঁর অত্যাচার থেকে কোনোক্রমে রেহাই পেয়ে খান বংশের সন্তান কবির মাহমুদ মাতুলালয়ে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে ভাগ্যান্বেষণে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজনগরে স্বাধীন জামদারি প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. স্পেন কোন মহাদেশে অবস্থিত? ১

খ. চার্লস মার্টেল কে ছিলেন? ২

গ. উদ্দীপকের কবির মাহমুদের সাথে স্পেনের কোন উমাইয়া শাসকের মিল রয়েছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

১১.▶ 'ক' রাজ্যের ধর্মীয় নেতা মি. এন্থনি যখন জনসম্মুখে আসেন তখন সবাই অবাক। তিনিও তো তাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ। অথচ একদল পুরোহিত বলে আসছিল যে তিনি মানুষ নন বরং দেবতা। পুরোহিতদের বলা এসব কাহিনি যখন তার গোচরে আসে তখন তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দেন। অতঃপর জনগণকে সাথে নিয়েই তিনি 'ক' রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন।

ক. আল আজহার মসজিদ নির্মাণ করেন কে? ১

খ. দারুল হিকমা কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. এন্থনি'র সাথে কোন ফাতেমি ধর্মীয় নেতার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় উক্ত ধর্মীয় নেতার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

রাজশাহী, যশোর ও বরিশাল বোর্ড ২০১৯

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিষয় কোড ২ ৬ ৭

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ মোহনপুর এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে সবসময় হানাহানি, সংঘাত লেগেই থাকে। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একজন করে নির্বাচিত মেম্বার রয়েছে। নিজ ওয়ার্ডে না হলেও ফসল কাটা, মাছ ধরা, পশুপালন ইত্যাদি নিয়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আন্তঃকলহ লেগেই থাকে। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা নারীদের। পুরুষরা তাদের অভিশাপ ও বোঝা মনে করে।

ক. ইয়েমেন শব্দের অর্থ কী? ১

খ. হানিফ কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ওয়ার্ড ব্যবস্থার সাথে প্রাচীন আরবের কোন প্রথার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রাচীন আরবের নারীদের অবস্থা মূল্যায়ন করো। ৪

২.▶ সিন্ধু নদের তীরে প্রাচীনকালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাই সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত। এটি পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা। নগরের ঘরবাড়ি, ড্রেনেজ ব্যবস্থার চিহ্ন দেখে অনুমান করা হয় এই সভ্যতার নাগরিকরা পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে ধারণা রাখত না। সুখ-সমৃদ্ধ পার্থিব জীবনই তাদের আরাধ্য ছিল।

ক. হিলফুল ফুজুল অর্থ কী? ১

খ. হায়ারোগ্লিফিক্স কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনসাধারণের সাথে উক্ত সভ্যতার জনসাধারণের জীবন প্রণালীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামকে ধারণ করে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমিতে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বই প্রকাশনা ও বিক্রয় ছাড়াও আলোচনাসভা, কবিতা পাঠ, সেমিনার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একুশে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে।

ক. 'জাজিরাতুল আরব' অর্থ কী? ১
খ. উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে প্রাচীন আরবের কোন মেলার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উক্ত মেলা প্রাচীন আরবের সাংস্কৃতিক মিলনমেলা"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ নিজ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে এবং চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হানাহানি প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে রসুলপুর এলাকার কয়েকজন যুবক একটি সমিতি গঠন করেন। তাদের এই মহৎ উদ্যোগ সফল হয় এবং এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

ক. কত সালে মহানবি (স) নবুয়তপ্রাপ্ত হন? ১
খ. বায়তুল মাল কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সমিতি প্রাচীন আরবের কোন সংগঠনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সংগঠনের কার্যাবলি সম্পাদনে মহানবি (স) এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ বার্মার শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অত্যাচার, নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ঘরবাড়ি ও ফসল পোড়ানোর শিকার হয়ে ৬ লক্ষ রোহিঙ্গা প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। সরকার মানবিক কারণে এই সকল রোহিঙ্গাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা দিয়ে তাদের সহযোগিতা করেছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংগঠন তাদেরকে সাহায্য প্রদানে এগিয়ে এসেছে।

ক. মদিনার পূর্ব নাম কী? ১
খ. মজলিশ-উশ-সূরা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের রোহিঙ্গাদের সাথে মুহাম্মদ (স) সময়কার কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনায় মুহাজির ও আনসারদের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৬.▶ অটোমান সুলতান মহামতি সুলায়মান একজন শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য বিস্তারকারী শাসক ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য কৃষ্ণসাগর হতে তিউনিসিয়া এবং ভিয়েনা হতে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুনীতির দায়ে তার জামাতাকেও তিনি শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। এমনকি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তিনি নিজ পুত্রকে ফাঁসি দেন। তিনি অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিতেন।

ক. কত খ্রিস্টাব্দে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১
খ. ভন্ডনবি কারা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে খোলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার প্রতিফলন লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত খলিফার ন্যায়বিচার উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খান বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। তার দক্ষ সেনাপতিদের রণনিপুণতায় তিনি বিশাল ভূখণ্ডের অধিকারী হন।

ক. উমাইয়াদের প্রথম খলিফা কে? ১
খ. ডোম অব দি রক কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত খলিফার তিনটি মহাদেশে অভিযান বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ সুলতান নাসিরউদ্দিন একজন মহান শাসক ছিলেন। ধর্মভীরু শাসক হলেও পরধর্মের প্রতি তিনি কখনই বিদ্বেষ পোষণ করতেন না বরং খুবই সহনশীল ছিলেন। তিনি অমুসলিমদের উপর হতে করের বোঝা কমিয়ে দিয়ে নানারকম সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন।

ক. উমাইয়াদের শেষ খলিফার নাম কী? ১
খ. 'রাজেন্দ্র' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সুলতানের কর্মকাণ্ড কোন উমাইয়া খলিফার কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উক্ত খলিফা উমাইয়া বংশের পতনের জন্য কতটুকু দায়ী?' তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ অটোমান সুলতান আব্দুল হামিদের ক্ষমতারোহণের পশ্চাতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন সেনাপতি ফুয়াদ পাশা। পরবর্তীতে ফুয়াদ পাশার সাহসিকতা, জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা সুলতানের ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে সুলতান কৌশলে তাকে হত্যা করেন।

ক. আব্বাসিদের শেষ খলিফার নাম কী? ১
খ. আব্বাসি কারা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে কোন আব্বাসীয় খলিফার কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আব্বাসীয়দের ক্ষমতারোহণের পশ্চাতে উক্ত সেনাপতির অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

১০.▶ একদল জ্ঞানী, পণ্ডিত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ গঠিত হয়। দেশি-বিদেশি জ্ঞানচর্চার জন্য এখানে গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ, অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠান নতুন গবেষকদের জন্য প্রচুর সহায়তা করে থাকে।

ক. বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. 'নহরে জুবাইদা' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে আব্বাসি কোন প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

১১.▶ শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যান্ড ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো অর্থনৈতিকভাবে অনেক সমৃদ্ধ দেশ। শিক্ষাদীক্ষায়ও আজ তারা অনেক অগ্রগামী। এমন একটা সময় ছিল যখন তারা ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করত না। বর্তমানে সেখানে বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে সারাবিশ্ব হতে ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে মেধাবী শিক্ষার্থী, গবেষকরা এসে জ্ঞানচর্চা করেন।

ক. কুরাইশদের বাজপাখি কাকে বলা হয়? ১
খ. দারুল হিকমাহ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে স্পেনের ৩য় আব্দুর রহমানের শাসনকালের কোনো মিল আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভার অবস্থান মূল্যায়ন করো। ৪

সকল বোর্ড ২০২১

সেট: ক **ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র** বিষয় কোড ২ ৬ ৭

সময় — ৩০ মিনিট **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: — সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. নিচের কোনটি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান?
(ক) খিলাফত (খ) মসজিদ
(গ) নির্বাচন কমিশন (ঘ) দরবার

২. খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়কাল কোনটি?
(ক) ৬৩০—৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ
(খ) ৬৩২—৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ
(গ) ৬৩২—৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ
(ঘ) ৬৩২—৬৬২ খ্রিষ্টাব্দ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে ভারতের মমতা ব্যানার্জি একাই সরকারের ভিত কাঁপিয়ে তোলেন। সরকার তাকে রাজধানী দিল্লি থেকে সরিয়ে দূরবর্তী প্রদেশে অবস্থানে বাধ্য করলেও জনগণের মধ্যে তার প্রভাব শক্তিশালী রূপ নেয়।

৩. মমতা ব্যানার্জির মতো কোন মুসলিম সাধক খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে তার মতবাদ দিয়ে সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন?
(ক) আবুজর আল গিফারি (রা)
(খ) আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা)
(গ) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা)
(ঘ) মুহম্মদ ইবনে আবু বকর (রা)

৪. উদ্দীপকের ভারত সরকারের মতো খলিফার কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পেয়েছিল—
i. সরকারের দুর্বলতা
ii. সাধকের মতবাদের যৌক্তিকতা
iii. সরকারের অসহিষ্ণুতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. খিলাফত শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
(ক) Representative (খ) Represent
(গ) Leadership (ঘ) Ruler

৬. রিদ্দার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ—
i. ইসলামকে রক্ষা
ii. ভণ্ড নবিদের দমন
iii. ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. 'যুন্নুরাইনের' সাথে সম্পর্কিত—
i. হযরত ওসমান (রা)
ii. হযরত রোকেয়া (রা)
iii. হযরত কুলসুম (রা)
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮ ও ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফুলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইমতিয়াজ সাহেব গভীর রাতে এলাকার মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখতে বের হন এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করেন। তিনি তার কাজের জন্য কোনো বেতন-ভাতা নেন না।

৮. ইমতিয়াজ সাহেবের কাজের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার আদর্শ ফুটে উঠেছে?
(ক) খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এর
(খ) খলিফা হযরত উমর (রা) এর
(গ) খলিফা হযরত উসমান (রা) এর
(ঘ) খলিফা হযরত আলী (রা) এর

৯. উক্ত খলিফা দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি ছিলেন—
i. কঠোর
ii. দয়ালু
iii. সহানুভূতিশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০. কোন রমণী নবুয়ত দাবি করেন?
(ক) সাবিহা (খ) সালেহা
(গ) রুকাইয়া (ঘ) সাজ্জাহ

১১. কোরআন ও হাদিসের সকল বাণী আমরা—
i. নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করব
ii. যাচাই-বাছাইয়ের পর বিশ্বাস করব
iii. সত্য জেনে আমল করব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের ছক চিত্রটি দেখে ১২ ও ১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

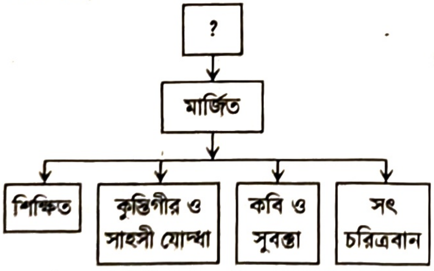

১২. উপরে উল্লিখিত গুণাবলি কোন খলিফার মধ্যে লক্ষ করা যায়?
(ক) হযরত আবু বকর (রা)
(খ) হযরত ওমর (রা)
(গ) হযরত ওসমান (রা)
(ঘ) হযরত আলি (রা)

১৩. হযরত ওমর ফারুক (রা) এর চরিত্রে কোনটির সংমিশ্রণ ঘটেছিল বলে তুমি মনে কর?
(ক) কোমলতা ও সরলতা
(খ) সাম্য ও কঠোরতা
(গ) কোমলতা ও কঠোরতা
(ঘ) নির্মলতা ও সরলতা

১৪. হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে অর্জিত হয়—
i. মদিনা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি
ii. দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের অবসান
iii. শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের ইসলাম গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

নায়ানপুর গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন বংশের লোকদের মধ্যে কলহ-বিবাদ লেগেই থাকে, যা কখনো কখনো চরম আকার ধারণ করে। এরূপ অবস্থা দেখে রফিক সাহেব তার বন্ধুদের নিয়ে গ্রামে একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫. রফিক সাহেবের প্রতিষ্ঠিত শান্তিসংঘের সাথে মিল রয়েছে—
(ক) হিলফুল ফুজুলের
(খ) হুদায়বিয়ার সন্ধির
(গ) মসলিস-উস-শুরার
(ঘ) বাইতুল মালের

১৬. উক্ত সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল—
i. রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করা
ii. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা
iii. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭. হযরত মুহাম্মদ (স) এর বিদায় হজের ভাষণ গুরুত্বপূর্ণ—
i. ইসলামি রাজনীতি ও সমাজনীতি বিবৃত হওয়ায়
ii. মানবজীবনের আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতিফলন থাকায়
iii. মানবজীবনের জাগতিক শিক্ষার প্রতিফলন থাকায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বলার কারণ—
i. মুহাম্মদ (স) এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা
ii. দশ বছর যুদ্ধ বিরতি
iii. কুরাইশদের সদিচ্ছা প্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. ওয়ারাকা বিন নওফেল কোন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন?

ⓚ ইসলাম ⓚ ইহুদি

ⓖ খ্রিষ্টান ⓖ একেশ্বরবাদ

২০. সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান কোনটি?

ক মদিনা সনদ

খ ব্রিটেন আইন

গ আমেরিকান আইন

ঘ ফ্রান্সের আইন

২১. হিলফুল ফুজুলের উদ্দেশ্য ছিল—

i. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা

ii. ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা

iii. নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদের সেবা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও iii খ i ও ii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ কোনটি?

ক ওহুদের যুদ্ধ খ খন্দকের যুদ্ধ

গ বদরের যুদ্ধ ঘ মুতার যুদ্ধ

২৩. হিলফুল ফুজুল নামক সংঘ কত সালে গঠিত হয়?

ক ৫৯০ খ ৫৯২

গ ৫৯৪ ঘ ৫৯৬

২৪. আরব দেশকে জাজিরাতুল আরব বলা হয় কেন?

ক এটি একটি দ্বীপ হওয়ার জন্য

খ মরুভূমির জন্য

গ তিন দিকে স্থল বেষ্টিত হওয়ার জন্য

ঘ তিন দিকে জল বেষ্টিত হওয়ার জন্য

২৫. 'দার-আল-নাদওয়া' কী?

ক মন্ত্রণা প্রাসাদ

খ মন্ত্রণা সভা

গ অভ্যর্থনা সভা

ঘ কাবাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ পরিষদ

২৬. ইয়েমেনকে 'সুখী আরব' বলা হয়, কারণ—

i. উর্বর ভূমি হওয়ার কারণে

ii. ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার কারণে

iii. কৃষিকাজে বিখ্যাত হওয়ার কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. মিশরকে নীল নদের দান বলা হয়, কারণ—

i. এর তীরে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল

ii. এর মাধ্যমে কৃষিকাজে উন্নতি ঘটে

iii. নদীপথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

পবিত্র আরব ভূখণ্ড হচ্ছে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। এটি তিনটি মহাদেশের মিলনস্থলে অবস্থিত। এদেশের মাটি পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা। তাই পবিত্র কুরআনে আরবের একটি নগরীকে উম্মুল কুরা বলা হয়েছে।

২৮. উল্লিখিত 'উম্মুল কুরা' কোন নগরকে বলা হয়েছে?

ক মদিনা খ মক্কা

গ ব্যাবিলন ঘ ইস্তাম্বুল

২৯. আরব ভূমি অবস্থিত—

i. ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের মিলনস্থলে

ii. আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের মিলনস্থলে

iii. আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের মিলনস্থলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয় করেন?

ক ৬২৯ খ ৬৩০

গ ৬৩১ ঘ ৬৩২

উত্তর	১	ক	২	খ	৩	ক	৪	খ	৫	ক	৬	ক	৭	ঘ	৮	খ	৯	খ	১০	ঘ	১১	খ	১২	খ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	গ	২০	ক	২১	ক	২২	গ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	খ

ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও যশোর বোর্ড ২০২১

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিষয় কোড | ২ | ৬ | ৭ |

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতাগুলোর অন্যতম। এটি একটি নগরভিত্তিক সভ্যতা। এদের লিখন পদ্ধতি ছিল চিত্রভিত্তিক। সিন্ধু সভ্যতা নগরভিত্তিক হলেও তাদের ছিল উন্নত কৃষি ব্যবস্থা। যব, গম, তুলাসহ নানা রকম ফসল তারা উৎপন্ন করত। উন্নত ফসল উৎপাদনের জন্য তারা জমিতে বাঁধ দিত। বন্যার পানিকে সংরক্ষণ করে কাজে লাগাত। আবার নালা কেটে জলসেচের মাধ্যমে পানি এনে ফসলের মাঠে সরবরাহ করত।

ক. ইতিহাসের জনক কে? ১

খ. উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সিন্ধু সভ্যতার লিখন পদ্ধতির সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার লেখনির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সিন্ধু সভ্যতার কৃষি ব্যবস্থা মিশরীয় সভ্যতার কৃষি ব্যবস্থারই প্রতিচ্ছবি'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶ ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে জানা যায় যে, এক সময় ভারতে মেয়েদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। সতীদাহ তথা স্বামীর সাথে সহমরণসহ ঘৃণ্য কিছু প্রথা বিদ্যমান ছিল। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির মালিকানা থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। বলতে গেলে নারীদের সামাজিক কোনো মর্যাদাই ছিল না। কন্যা সন্তানের প্রতি তাদের অনাগ্রহ এবং ঘৃণা ছিল। এমনকি বর্তমান যুগেও ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে দেখা যায় যে, কন্যা সন্তানের ভ্রূণ হত্যা করা হয়।

ক. আল মালা কী? ১

খ. আরব দেশকে 'জাজিরাতুল আরব' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে নারীর যে চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন দেশের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সে যুগের নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দাও। ৪

৩.▶ মিয়ানমারের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ ও বাড়িঘর পোড়ানোর শিকার হয়ে প্রায় দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। মূলত ধর্মীয় কারণেই রোহিঙ্গা মুসলিমরা তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ সরকার মানবিক কারণে ঐ সকল শরণার্থীদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা দিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছে।

ক. 'মিরাজ' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'হানিফ সম্প্রদায়' কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনাটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ আধুনিক সিঙ্গাপুর রাষ্ট্র এক সময় মালয়েশিয়ার সাথে সংযুক্ত ছিল। পরবর্তীতে তারা মালয়েশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ সময় সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন অনৈতিক কাজ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এ সকল চুরি-ডাকাতিসহ অন্যান্য কাজের অপবাদ থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য কতিপয় যুবক ঐক্যবদ্ধ একটি সমিতি গঠন করেন এবং উক্ত সমিতি কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে। এতে অল্প সময়ের মধ্যে সিঙ্গাপুর একটি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ও সভ্য জাতিতে পরিণত হয়।

ক. আরব দেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত? ১
খ. হযরত মুহাম্মদ (স)-কে 'আল-আমিন' বলা হতো কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমিতি গঠনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সমিতির কর্মসূচিগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর মধ্য এশিয়া থেকে বারবার বিতাড়িত হয়ে ভারতবর্ষে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১২ হাজার সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল বাহিনী নিয়ে ভারতের শেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদির ১,২০,০০০ সৈন্যের মোকাবিলা করেন। ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বিপুল সৈন্য থাকা সত্ত্বেও সুলতান লোদি বাবরের হাতে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর বাবর আরো কয়েকটি যুদ্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুদের পরাজিত করে ভারতে মুঘল শাসনের সূচনা করেন।

ক. মদিনার পূর্ব নাম কী ছিল? ১
খ. 'আকাবার শপথ' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন যুদ্ধের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য— মহানবি (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়'— ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ United Nations General Assembly ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করে। এ সনদে উল্লিখিত ধারাসমূহে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের সহজাত মর্যাদা, সমান অধিকার ও সমতা রক্ষার কথা বলা হয়। তা ছাড়া এ সনদে বিশেষভাবে বিশ্বের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এবং সকল বর্ণ ও ধর্মের মানুষের সমমর্যাদার কথা বলা হয়েছে— যা বিশ্ব-মানবের সকলকে একই সূত্রে গ্রথিত করে। এভাবে এ সনদ বিশ্ব মানবতার মুক্তির ম্যাগনাকার্টা হিসেবে বিশ্ব বিবেককে সচেতন করে তোলে।

ক. 'হিজরত' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. মুহাজির ও আনসার কারা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সনদের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সনদের সাদৃশ্য আছে? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. উক্ত সনদে পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ ইসরাইলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিন ও জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী আবদেল সালাম আল মাজলির মধ্যে ১৯৯৪ সালে ২৬ অক্টোবর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে উভয় দেশ পরবর্তীতে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না— এ শর্তে একমত হয়। আর এ চুক্তি দ্বারা উভয় দেশের জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং এক দেশ হতে অন্য দেশের উপর কোনো আঘাত আসবে না বা এক দেশ দ্বারা অন্য দেশের কোনো ক্ষতি হবে না বলে একমত হয়। তাছাড়া এ চুক্তি দ্বারা এক দেশ অন্য দেশকে আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবে বলে ঐকমত্য পোষণ করে। তবে আলজাজিরা নিউজ চ্যানেলের এক নিউজ বিশ্লেষণে বলা হয় যে, এ উক্তি ছিল জর্ডানের পরোক্ষ বিজয়।

ক. কত সালে ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১
খ. খন্দকের যুদ্ধে মহানবি (স) পরিখা খনন করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চুক্তির সাথে মহানবি (স)-এর গৃহীত কোন সন্ধি বা চুক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সন্ধিকে পবিত্র কুরআনে মহাবিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে কেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪

৮.▶ আব্বাসি বংশের ৩য় খলিফা আল মাহ্দী ৭৭৫ সালে বাগদাদের খলিফা হওয়ার পর বহুমুখী বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। তাঁর শাসনামলে কদাকার খর্বাকৃতি হাশিম বিন হাকিম (মুকান্না) নিজেকে আল্লাহর অবতার বলে মিথ্যা নবুয়তের দাবি করেন। এ ভণ্ড নবির যথেষ্ট অনুসারী ছিল। তারা সাদা কাপড় ব্যবহার করত বলে তাদেরকে 'মুবায়িদ' বলা হতো। তাছাড়া বাগদাদের পূর্ব দিকে 'মুহাম্মির' নামক আর এক দল ভণ্ড লোকের উদ্ভব হয়। তাদের 'জিন্দিক' বলা হতো। পারস্যের কেহ কেহ আবার যাকাত দিতেও অস্বীকার করে। খলিফা মাহ্দী কঠোর হস্তে সকল ভণ্ড নবি এবং ভণ্ড ধর্মীয় নেতাদেরকে দমন করেন এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের যাকাত দিতে বাধ্য করেন।

ক. মহানবি কত সালে খায়বার জয় করেন? ১
খ. মুতার যুদ্ধে মহানবি (স) পর্যায়ক্রমে তিনজন সেনাপতির নাম ঘোষণা করেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের খলিফা আল মাহ্দীর কার্যক্রমের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন খলিফার কার্যক্রমের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত খলিফার বিদ্রোহ দমনে গৃহীত পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ দিল্লির সুলতান নাসির উদ্দীন অত্যন্ত ধার্মিক ও প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। তিনি জনগণের দুঃখ লাঘব করার জন্য রাতে ছদ্মবেশে পথে-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা দেখতেন। সুলতান নিজেই আটার বস্তা মাথায় নিয়ে প্রজাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন। আবার কখনও তাঁর স্ত্রী হতদরিদ্র গরিব প্রসূতি মায়েদের সেবায় ধাত্রী হিসেবে সহযোগিতা করতেন। তাদের ঘরে কোনো কর্মচারী ছিল না। নিজেই রাঁধুনির কাজ সেরে নিতেন। তদুপরি সুলতান সরকারের কোষাগারের অর্থ গ্রহণ না করে টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

ক. 'খলিফা' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'খোলাফায়ে রাশেদিন' কাদের বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দিল্লির সুলতান নাসির উদ্দীনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহান খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রজাদের কল্যাণে উক্ত খলিফার গৃহীত পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করো। ৪

১০.▶ যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের অবসানকল্পে গেটিসবার্গে এক বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ সাধনের ঘোষণা দেন। তিনি এ ভাষণে বর্ণ বৈষম্য উচ্ছেদের ঘোষণা করেন এবং তিনি বলেন, "আজ থেকে কেউ কৃষ্ণাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গের দোহাই দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পারবে না।" দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

ক. কত সালে মহানবি (স) মক্কা বিজয় করেন? ১
খ. ভণ্ড নবি কারা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিংকনের ভাষণ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ভাষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ভাষণ ছিল মানবজাতির মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ দলিল— উক্তিটির বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ জনাব আবছার সাহেব চিলমারী নামক পৌর অঞ্চলের মেয়র নির্বাচিত হয়ে জনগণের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রশাসনিক কাজের গতি বৃদ্ধি করার জন্য কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে কিছু কিছু নিয়োগকৃত কর্মকর্তা মেয়রের নিকটতম আত্মীয় ছিল। বেশ কিছুদিন পর মেয়র-বিরোধী কতিপয় ব্যক্তি অর্থ আত্মসাৎ ও স্বজনপ্রীতিসহ কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করে এলাকায় বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে গোলযোগকারীরা মেয়রের বাসভবন ঘেরাও করে তাঁকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করে। এতে এলাকায় গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

ক. 'ফারুক' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. মজলিশ উস-শুরা বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের হত্যাকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন খলিফার হত্যাকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উক্ত খলিফার হত্যাকাণ্ডের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী'— উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

সিলেট ও বরিশাল বোর্ড ২০২১

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিষয় কোড ২ ৬ ৭

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ তিনদিকে সমুদ্রবেষ্টিত কোরিয়া উপদ্বীপ একটি অনুর্বর অঞ্চল। একসময় শহরের কিছু লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও গ্রামের লোকদের পশুপালন বা মাছ শিকার ছাড়া অন্য কোনো কাজের উপায় ছিল না। জীবন-জীবিকার জন্য তারা চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা ও লুটতরাজ করতে বাধ্য হতো।

ক. 'জাজিরাতুল আরব' অর্থ কী? ১
খ. উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কোরিয়া উপদ্বীপের সাথে তোমার পঠিত কোন অঞ্চলের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব মূল্যায়ন করো। ৪

২.▶ পদ্মা নদী রাজশাহী জেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। এ নদীকে বলা হতো রাজশাহীর দুঃখ। প্রতি বছরই নদীর পানিতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হতো রাজশাহী শহরসহ আশপাশের গ্রামগুলো। অতঃপর সরকার বাঁধ দিয়ে নদী শাসনের ব্যবস্থা করে। পদ্মা নদীতে বাঁধ দেওয়ায় রাজশাহী শহরসহ আশপাশের গ্রামগুলো বন্যামুক্ত হয় এবং পরিকল্পিত বরেন্দ্র সেচ প্রকল্প চালু হওয়ায় স্থানীয় কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে; যা স্থানীয় সংস্কৃতি ও স্থাপত্য কলার বিকাশে ভূমিকা রাখে।

ক. মিশরীয় লিখন পদ্ধতির নাম কী? ১
খ. প্যাপিরাস কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সভ্যতার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৩.▶ আফগানিস্তান মধ্য এশিয়ার যুদ্ধকবলিত একটি দেশ। এদেশটি বিভিন্ন উপজাতি সমন্বয়ে গঠিত। উপজাতি গোত্রগুলোর মধ্যে গিলজাই, মুহাম্মদ, সাদোজাই প্রভৃতি খুব প্রভাবশালী। উপজাতিগুলো নিজ গোত্রের স্বাধীনতা, সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে যতটা আন্তরিক, অন্য গোত্রের প্রতি ততটা শত্রুভাবাপন্ন। তারা জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে গোত্রীয় স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। গোত্রীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হয়। একবার সংঘর্ষ শুরু হলে তা গৃহযুদ্ধে রূপ নেয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।

ক. হায়ারোগ্লিফিক কী? ১
খ. হানিফ সম্প্রদায় কারা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ইসলাম-পূর্ব আরবের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত যুগের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করো। ৪

৪.▶ আয়াতুল্লাহ আলী খোমিনী ইরানে ইসলামি আদর্শ প্রচার শুরু করলে শাসকগোষ্ঠী তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়। তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন শুরু হয়। অতপর খোমিনী মাতৃভূমি ইরান ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী দেশে গমন করেন। সেখান থেকেই তিনি তাঁর প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। অবশেষে ১৯৭৯ সালে তিনি দেশে ফিরে স্বৈরাচারী শাসক রেজা শাহর পতন ঘটিয়ে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন এবং তিনি কোনো প্রতিশোধ না নিয়ে সকলকে ক্ষমা করে দেন।

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স) মৃত্যুবরণ করেন? ১
খ. বায়তুর-রিদওয়ান কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মহানবি (স)-এর জীবনের কোন ঘটনার সাথে খোমিনীর মাতৃভূমি ত্যাগের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনার গুরুত্ব নিরূপণ করো। ৪

৫.▶ স্বাধীনতা লাভের পর মালয়েশিয়ার সরকারপ্রধান রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। নাগরিকদের সামাজিক, রাজনৈতিক, দলীয় ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষা এবং সকল রাজনৈতিক দল তথা সম্প্রদায়কে একটি স্বাভাবিক পরিবেশে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ফলে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

ক. মদিনার পূর্বনাম কী ছিল? ১

খ. হিজরত ও দেশত্যাগের মধ্যে পার্থক্য কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. সংবিধান প্রণয়নে উদ্দীপকের সরকারপ্রধান মহানবি (স) এর কোন কর্মকাণ্ডকে অনুসরণ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সরকার প্রধান কর্তৃক লিখিত সংবিধান প্রণয়ন অপেক্ষা মহানবি (স) কর্তৃক গৃহীত কর্মকাণ্ড অধিক তাৎপর্যপূর্ণ— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ অটোমান সুলতান বায়েজিদ অঙ্গোরার প্রান্তরে তৈমুর লঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মোকাবিলা করেন। যুদ্ধে বায়েজিদের অনেক সৈন্য বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং কিছু সৈন্য গনিমতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেওয়ায় তৈমুরীয় বাহিনীর কাছে বায়েজিদ পরাজিত হন। তৈমুরীয় বাহিনী বিজয় অর্জন করলেও তারা স্থায়ী কোনো শাসন এশিয়া মাইনরে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এবং তা অটোমান তুর্কিদেরকেই চরম শিক্ষাদান করেছে, যা তাদের ভবিষ্যতে সচেতন করে তুলেছিল।

ক. বদরের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১

খ. বিদায় হজ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন যুদ্ধের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করো। ৪

৭.▶ আক্কাশ আলী তাঁর এলাকার পথভ্রষ্টকারী মানুষের অত্যাচারের কারণে আপন লোকজন নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। বেশ কিছুদিন পরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তারা নিজ এলাকায় ফিরে আসতে চাইলে তাঁর এলাকার সমাজপতিরা প্রতিরোধ করে দাঁড়ায়। ফলে তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলশ্রুতিতে আক্কাশ আলী নিজেকে আবার নিজ এলাকার নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ক. 'ফাতহুম মুবিন' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'মেরাজ' কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে চুক্তির কথা বলা হয়েছে তার সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন চুক্তির মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত চুক্তি 'ইসলামের সুস্পষ্ট বিজয়'— তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

৮.▶ জয়পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল মান্নান সরদারের মৃত্যুর পর ইউনিয়নবাসী জনাব শরিফুল ইসলাম সাহেবকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। শরিফুল সাহেব চেয়ারম্যান হয়ে অনেক সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। এ সময় কিছু ভণ্ডপির ও ইউনিয়নের কর দিতে অস্বীকারকারীগণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটান। কিন্তু চেয়ারম্যান শরিফুল সাহেব অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন।

ক. 'খিলাফত' শব্দটির অর্থ কী? ১

খ. মজলিস-উস-শুরা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শরিফুল সাহেবের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন খলিফার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৯.▶ মহামতি সুলাইমান একজন শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য বিস্তারকারী ছিলেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করে পূর্বে কৃষ্ণসাগর থেকে পশ্চিমে তিউনিসিয়া এবং উত্তরে ভিয়েনা থেকে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি সাম্রাজ্যে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্নীতির দায়ে তার জামাতাকেও তিনি শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিতেন।

ক. ইসলামের প্রথম খলিফার নাম কী? ১

খ. 'খুলাফায়ে রাশেদিন' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মহামতি সুলাইমানের সাথে তোমার পঠিত কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করো। ৪

১০.▶ সম্রাট হুমায়ুন ছিলেন একজন সরলমনা ও প্রজাবৎসল শাসক। তিনি সবসময় রক্তপাত এড়িয়ে যেতেন। তার এই সরলতার সুযোগ নিয়ে একদল বিপথগামী জনতা তার বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ এনে বিদ্রোহ শুরু করে। তিনি এ বিদ্রোহ কঠোরহস্তে দমন না করায় তা ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে বিদ্রোহীদের হাতেই তিনি নির্মমভাবে নিহত হন।

ক. কাকে 'যুন্নুরাইন' বলা হয়? ১

খ. বায়তুল মাল কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সম্রাটের সাথে ইসলামের কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার ওপর আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তোমার মতামত যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ জনাব শামসুল হক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের শাসকের নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের বরখাস্ত করেন। ইলিয়াস নামক গভর্নর ব্যতীত সকল গভর্নর তার নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখান। তাছাড়া গভর্নর ইলিয়াস সাহেব পূর্বের শাসনকর্তার সময়ে যেসব সরকারি সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন নতুন শাসনকর্তা তা রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে উক্ত শাসনকর্তা ও গভর্নর ইলিয়াসের মধ্যে এক সংঘর্ষ শুরু হয়।

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১

খ. খারেজি কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংঘর্ষ দ্বারা তোমার পঠিত কোন সংঘর্ষের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত যুদ্ধের ফলাফল মূল্যায়ন করো। ৪

সকল বোর্ড ২০২২

সেট: ক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র

বিষয় কোড ২ ৬ ৭

সময় — ২০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান — ১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: — সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যে কোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. সর্বপ্রথম রাজকীয় টাকশাল নির্মাণ করেন কে?
(ক) মুয়াবিয়া
(খ) আবদুল মালিক
(গ) আল ওয়ালিদ
(ঘ) ওমর বিন আবদুল আজিজ

২. আবদুল মালিকের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য সংস্কারসমূহ হলো—
i. আরবি মুদ্রা চালুকরণ
ii. আরবি লিপির উৎকর্ষ সাধন
iii. কুরআন সংকলন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মুঘল সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লাভের জন্য উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব তীব্র গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। আর এ সংঘাতের ফলস্বরূপ সকল ভাইদের পরাজিত করে এবং নিজ পিতাকে বন্দি করে আওরঙ্গজেব মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাট হন।

৩. উদ্দীপকের সম্রাটের সাথে কোন আব্বাসি খলিফার মিল রয়েছে?
(ক) আল মনসুর (খ) হাদী
(গ) মাহদী (ঘ) হারুন অর রশীদ

৪. উক্ত আব্বাসি খলিফার পুত্রদের মধ্যে সংঘাতের ফলে—
i. আরব জাতীয়তাবাদের পতন ঘটে
ii. পারস্যবাসীর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়
iii. সৎ, জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তির খিলাফত লাভ ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. নহরে জোবায়দা কেন খনন করা হয়?
(ক) শিক্ষা বিস্তারের জন্য
(খ) হজ যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য
(গ) হজ যাত্রীদের পানির কষ্ট লাঘবের জন্য
(ঘ) মক্কাবাসীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের জন্য

৬. আরবের 'জোয়ান অব আর্ক' উপাধি কার?
(ক) খায়জুরানের (খ) জোবায়দার
(গ) লায়লার (ঘ) বুরানের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রুবেল ও রাকিব দুই ভাই। দুই ভাইয়ের মধ্যে রুবেল অত্যন্ত সৎ জ্ঞানী, ধার্মিক, মার্জিত ও চরিত্রবান। অপরদিকে রাকিব অসৎ অকর্মণ্য, আমোদপ্রিয়, বিলাসী ও দায়িত্বহীন স্বভাবের।

৭. উদ্দীপকটিতে আব্বাসি কোন খলিফাদ্বয়ের সাথে তাদের সাদৃশ্য রয়েছে?
(ক) আবুল আব্বাস ও আল মনসুর
(খ) হাদী ও হারুন অর রশীদ
(গ) আল মামুন ও আল আমিন
(ঘ) মুহাম্মদ ও ওয়াসিফ

৮. বাগদাদ নগরী কে এবং কত খ্রিষ্টাব্দে ধ্বংস করেন?
(ক) চেঙ্গিস খান— ১২৫৫ খ্রি.
(খ) টুলি খান— ১২৫৬ খ্রি.
(গ) মঙ্গু খান— ১২৫৭ খ্রি.
(ঘ) হালাকু খান— ১২৫৮ খ্রি.

৯. চূড়ান্তভাবে পারস্য বিজয় অর্জিত হয় কোন যুদ্ধের মাধ্যমে?
(ক) বুয়ায়েবের যুদ্ধ
(খ) কাদিসিয়ার যুদ্ধ
(গ) জালুলার যুদ্ধ
(ঘ) নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ

১০. হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে—
i. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়
ii. সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে
iii. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তার রাজধানী দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করেন। কারণ দেবগিরি ছিল সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে।

১১. উদ্দীপকে সুলতানের ন্যায় খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফা রাজধানী মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তর করেন?
(ক) হযরত আবু বকর (রা)
(খ) হযরত ওমর (রা)
(গ) হযরত উসমান (রা)
(ঘ) হযরত আলি (রা)

১২. উক্ত খলিফার রাজধানী স্থানান্তরের কারণ—
i. কুফাবাসীর সমর্থন
ii. সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল
iii. খলিফার উচ্চাকাঙ্ক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩. গনী শব্দের অর্থ কী?
(ক) দানশীল (খ) বিশ্বাসী
(গ) ধনী (ঘ) দয়ালু

১৪. হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ—
i. স্বজনপ্রীতি
ii. বিলাসিতা
iii. বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইসলাম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার জনাব জহিরুল ইসলাম। তার মৃত্যুর পর তার সন্তানগণ পর্যায়ক্রমে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

১৫. ইসলাম সাহেবের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে?
(ক) আবদুল মালিক (খ) আল ওয়ালিদ
(গ) সুলায়মান (ঘ) হিশাম

১৬. উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী কোথায় স্থাপিত হয়?
(ক) কুফা (খ) মদিনা
(গ) দামেস্ক (ঘ) বাগদাদ

১৭. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন?
(ক) ৬১৯ (খ) ৬২০
(গ) ৬২২ (ঘ) ৬২৪

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব বাবুল একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। তিনি প্রতি বছর তার যাবতীয় খরচ শেষে বছরান্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ শরিয়া মোতাবেক ফকির-মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করেন।

১৮. বাবুল সাহেবের কাজে মহানবি (স)-এর রাজস্ব ব্যবস্থার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
(ক) যাকাত (খ) খারাজ
(গ) জিজিয়া (ঘ) আল ফাই

১৯. উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে—
i. সম্পদ বৃদ্ধি পায়
ii. গরিবরা ধনী হয়
iii. ধনী-গরিব বৈষম্য লাঘব হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২০. হযরত আবু বকর (রা) কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) হাশিম গোত্রে (খ) খাযরাজ গোত্রে
(গ) তায়িম গোত্রে (ঘ) উমাইয়া গোত্রে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
দক্ষিণ ভারতে কল্পনা রানী নামে একজন ভণ্ড গুরু-মা'র আবির্ভাব ঘটে। সে কৌশলে বিভিন্ন কারিশমা প্রদর্শন করে সরল সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে প্রতারিত করতো।

২১. উদ্দীপকের কল্পনা রানীর সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ভণ্ড নারীর মিল রয়েছে?
(ক) মুসায়লামা (খ) তোলায়হা
(গ) সাজাহ্ (ঘ) আসাদ আনসি

২২. মিসরীয় সম্রাট বা রাজাদের উপাধি ছিল—
(ক) ফারাও (খ) ইখনাটন
(গ) আমেন (ঘ) ওসিরিস

২৩. সুমেরীয়দের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি 'জিগুরাত' ছিল—
i. ধর্ম মন্দির
ii. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
iii. চিকিৎসালয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৪ ও ২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
চিলির স্বৈরশাসক অগাস্টো পিনোশের শাসনামলে দেশে অন্যায়-অত্যাচার, কলহ-বিবাদ, হত্যা-গুম এবং নারীদের লাঞ্ছনা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন সমাজ ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে কলুষিত করেছিল।

২৪. আলোচ্য উদ্দীপক কোন যুগের সামাজিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?
(ক) প্রাগৈতিহাসিক যুগের
(খ) ঐতিহাসিক যুগের
(গ) পাথরের যুগের
(ঘ) জাহেলিয়া যুগের

২৫. তোমার পঠিত উক্ত যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো—
i. বর্বর জীবনযাপন
ii. উন্নত সংস্কৃতির ধারক
iii. অজ্ঞতা ও নিষ্ঠুরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬. আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ কী?
(ক) গোঁড়ামির যুগ
(খ) প্রগতির যুগ
(গ) কলির যুগ
(ঘ) অন্ধকারাচ্ছন্নতার যুগ

২৭. প্রাক-ইসলামি আরবে মক্কায় 'আল মালা' গঠনের উদ্দেশ্য ছিল—
i. গোত্রীয় ভারসাম্য রক্ষা করা
ii. মক্কার প্রশাসনিক ব্যবস্থা তদারক করা
iii. শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার আদেশ তাঁর সেনাপতি মীরজাফর আলী খান পালন না করায় নবাব ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট পরাজিত হন।

২৮. উদ্দীপকের উক্ত ঘটনা মহানবি (স)-এর কোন যুদ্ধকে মনে করিয়ে দেয়?
(ক) বদরের যুদ্ধ
(খ) উহুদের যুদ্ধ
(গ) খন্দকের যুদ্ধ
(ঘ) নাখলার যুদ্ধ

২৯. উক্ত যুদ্ধের ফলে—
i. মুসলমানদের ইমানি শক্তির পরীক্ষা হয়
ii. মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়
iii. আত্মঅহংকারের উচিত শিক্ষা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল আমিন বলা হয়, কারণ তিনি—
(ক) আমানত রক্ষা করতেন ও সর্বদা সত্য কথা বলতেন
(খ) কর্তব্যনিষ্ঠায় অটুট ছিলেন
(গ) সৎ রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতা ছিলেন
(ঘ) অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতেন

উত্তর	১	(খ)	২	(ক)	৩	(ঘ)	৪	(ক)	৫	(গ)	৬	(গ)	৭	(গ)	৮	(ঘ)	৯	(খ)	১০	(ঘ)	১১	(ঘ)	১২	(ক)	১৩	(গ)	১৪	(খ)	১৫	(ক)
	১৬	(গ)	১৭	(গ)	১৮	(ক)	১৯	(খ)	২০	(গ)	২১	(গ)	২২	(ক)	২৩	(ক)	২৪	(ঘ)	২৫	(ঘ)	২৬	(ঘ)	২৭	(ঘ)	২৮	(খ)	২৯	(খ)	৩০	(ক)

ঢাকা, রাজশাহী ও যশোর বোর্ড ২০২২

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিষয় কোড | ২ | ৬ | ৭ |

সময় — ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ ফয়সাল শীতের ছুটিতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেড়াতে গেল। সেখানে সে বিভিন্ন কৃষিদ্রব্য, উৎপাদন পদ্ধতি এবং স্থানীয় লোকের কষ্টসহিষ্ণুতা ও তাদের আতিথেয়তা দেখে বিস্মিত হয়। পাহাড়ি এলাকার চাষাবাদ পদ্ধতির সাথে তার নিজ এলাকা বরিশাল অঞ্চলের অনেক অমিল খুঁজে পায়। সে আরও লক্ষ করলো মানুষের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবারসহ সবকিছুই যেন এলাকাভিত্তিক আলাদা-আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

ক. জাহেলিয়া শব্দের অর্থ কী? ১
খ. জাজিরাতুল আরব বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত অঞ্চলের সাথে আরবের ভূ-প্রকৃতির যে অঞ্চলের মিল আছে তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত অবস্থার ন্যায় আরবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও সে দেশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে— মূল্যায়ন করো। ৪

২.▶ গোমতী নদীর তীরবর্তী রাস্তা অনেক উঁচু এবং প্রশস্ত। এর কারণ হলো পূর্বে বর্ষাকালে গোমতী নদীতে পানি বেড়ে গিয়ে আশেপাশের এলাকায় প্লাবন সৃষ্টি করত। এতে চাষাবাদের সমস্যা হতো এবং ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যেত। অনেক সময় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করত। তাই সরকার নদীর তীরে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করে এলাকাবাসীর দুর্দশা লাঘব ও কৃষির উন্নয়নের ব্যবস্থা করেছেন। কুমিল্লা শুধু কৃষির জন্যই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও বিখ্যাত। কুমিল্লার খাদি দেশে-বিদেশে পরিচিত। কুটির শিল্প, মৃৎ শিল্পসহ ছোট ছোট অনেক কলকারখানাও এখানে রয়েছে।

ক. মিসরীয় লিখন পদ্ধতির নাম কী? ১
খ. প্যাপিরাস কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের গোমতী নদীর সাথে মিসরীয় সভ্যতার কোন নদীর সামঞ্জস্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সভ্যতার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৩.▶ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি বই মেলার আয়োজন করে। উক্ত মেলায় বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকদের লেখা নতুন নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ছোট ছোট শিশু-কিশোর ও কবি সাহিত্যিকরা বিভিন্ন কবিতা, সাহিত্য আবৃত্তি করেন। ঐখানে সর্বস্তরের জনতার ঢল নামে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিকদেরকে অমর একুশে পদক বা পুরস্কার প্রদান করেন।

ক. প্রাক-ইসলামি আরবের একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের নাম কী? ১
খ. কিউনিফর্ম বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কবি-সাহিত্যিকদের পুরস্কার প্রাক-ইসলামি যুগের কোন পুরস্কারের অনুরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের মেলায় প্রাক-ইসলামি যুগের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পূর্ণ প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ আব্রাহাম লিংকন পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তিদের একজন। আমেরিকা যখন দাস-ব্যবস্থা নিয়ে মারাত্মক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত তখন তিনি দাস মুক্তির শপথ নিয়ে শত প্রতিকূলতার মধ্যে আমেরিকাকে সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি গণতন্ত্র বলতে সাধারণের ইচ্ছা, মানবাধিকার ও জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন বলে মনে করতেন। মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ সামনে রেখে তিনি আমেরিকাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ক. খন্দকের যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল? ১
খ. ওমরাতুল কাযা বা মুলতবি হজ কী? ২
গ. মহানবি (স)-এর কোন সংস্কারের সাথে আব্রাহাম লিংকনের সংস্কারের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মহানবি (স)-এর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিংকনের রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ যশোধর সিং অভিনেতা এবং শরীর চর্চাবিদ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এমনিতেই তার অনেক অনুসারী ছিল। তারপরও ধর্মকে ব্যবহার করে আরও মর্যাদা ও অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তিনি 'ক' অঞ্চলে ডেরা খুলে বসেন। নিজে ধর্মগুরু সেজে কাল্পনিক ধর্ম বিশ্বাসের মিথ্যা লোভ দেখিয়ে প্রচুর ভক্ত ও অর্থের মালিক হন। কিন্তু তার এহেন কার্যকলাপ রাষ্ট্র ধর্মের জন্য হুমকি মনে করে সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। একই সাথে অন্যান্য ধর্ম ব্যবসায়ীদেরও সরকার সমূলে দমন করে।

ক. বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন? ১
খ. গ্রন্থাকারে কুরআন লিপিবন্ধ করার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের মতো ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ীর আবির্ভাব কোন খলিফার আমলে প্রকট আকার ধারণ করেছিল? বুঝিয়ে লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের তুলনায় রিদ্দা আন্দোলন ছিল আরও ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ ভ্রান্তিবিলাসী আরব বসন্তের ঢেউ মিসরের বয়োবৃদ্ধ প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কিন্তু জনগণ নতুন যাকে শাসক নিয়োগ করে তিনি সেনাপ্রধানের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। ফলে নতুন শাসক শক্তি ও শাসনে যোগ্যতার পরিচয় দিলেও কূটকৌশলে বিরোধীদের কাছে হেরে যান এবং অল্প সময়ের মধ্যে কঠিন পরিণতি ভোগ করেন। সেনাপ্রধান খোলস ছেড়ে প্রেসিডেন্টের পদ দখল করেন।

ক. 'আসাদুল্লাহ' কার উপাধি? ১
খ. 'শিয়া' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাসহ লেখো। ২
গ. মিসরের প্রেসিডেন্টের পরিণতির সাথে হযরত উসমান (রা)-এর পরিণতির সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের নিরিখে হযরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যকার দ্বন্দ্বের পরিণতি মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶ চেঙ্গিস খান শুধু তার নিজস্ব বীরত্বে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে পারেননি। তার দক্ষ সেনাপতিদের রণনিপুণতাই তার সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতির প্রধান কারণ ছিল। তাছাড়া সাম্রাজ্য বিস্তার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তার বিশাল সাম্রাজ্যকে তিনি উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল নামক দুইটি প্রধান উইং-এ বিভক্ত করে সেখানে দুইজন দক্ষ প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন। তারা দুইজনই পরস্পর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রাজ্য বিস্তার করতেন। তবে এদের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রতিনিধি মঙ্গু খান ছিলেন খুবই নৃশংস।

ক. সর্বপ্রথম কোন খলিফা মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করেছিলেন? ১
খ. হিমারীয়-মুদারীয় দ্বন্দ্বের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের মঙ্গু খানের সাথে প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলের কোন প্রাদেশিক গভর্নরের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চেঙ্গিস খানের মতো খলিফা প্রথম ওয়ালিদও মূলত দক্ষ সেনাপতিদের কারণে খিলাফতের সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ স্পেনীয়রা কৃষিপ্রধান দেশ ব্রাজিল দখল করে সেখানে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্পেনিশ চালু করে। তাছাড়া খ্রিষ্টানদের কৃষিজমি ক্রয় বন্ধ ঘোষণা করে এবং তাদের উপর যে কর রেয়াত প্রচলিত ছিল তা রহিত করে। ফলে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে জনগণের যে রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল সেসব থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

ক. খলিফা আবদুল মালিক কোন বংশের শাসক ছিলেন? ১
খ. সংক্ষেপে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকে দাপ্তরিক ভাষা প্রচলনের মতো খলিফা আবদুল মালিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে স্পেনের গৃহীত পদক্ষেপের আলোকে খলিফা আবদুল মালিকের রাজস্ব সংস্কার আলোচনা করো। ৪

৯.▶ প্রাচীন রুশ দেশীয় একজন রাজা প্রজাহিতৈষী ছিলেন। তার মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়ে দেশের অভ্যন্তরে একদল মানুষ তাকে ঈশ্বরের সাথে তুলনা করতে থাকে। এতে রাজা বিব্রতবোধ করেন। উক্ত আচরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে রাজা তাদের বন্দি করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের আচরণ ও কর্মকাণ্ডে রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাদের বন্দি করার ফলে রাজা বড় ধরনের বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়। এর ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা প্রশমিত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক. বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. খলিফা আল মামুনের 'জ্ঞানমনোস্ক' কর্মকাণ্ডের একটি উদাহরণ দাও। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে খলিফা আল মনসুরের শাসনামলের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার আলোকে বলা যায় রুশ দেশীয় রাজার মতো আল মনসুরও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দ্বারা মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন— বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ নাদির শাহ প্রজাদের সুবিধার্থে যে খাল খনন করেছিলেন তা আমাতুন বিবির খাল নামে পরিচিত। নাদির শাহের রাজ্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মানুষের মুখে মুখে। প্রজাদের প্রতি তার দরদ বিশ্ববাসী জেনে যায়। তার পার্শ্ববর্তী শক্তিধর রাজ্যের শাসক মানিক চাঁদ একবার তার রাজ্য আক্রমণ করলে নাদির শাহ এমন দাঁতভাঙা জবাব দেন যে, মানিক চাঁদ তার আনুগত্য স্বীকার করে কর প্রদানে বাধ্য হন।

ক. খায়জুরান কে ছিলেন? ১

খ. 'বার্মাকি' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের আমাতুন বিবির খাল-এর সাথে খলিফা হারুন অর রশীদের রাজত্বকালের কোন জনহিতকর কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নাদির শাহের সাথে মানিক চাঁদের সংঘর্ষের মতোই হারুন অর রশীদ পার্শ্ববতী শাসকের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে ছিলেন— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ একদল জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য এখানে প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি নতুন নতুন গবেষণার কাজেও পৃষ্ঠাপোষকতা দিয়ে থাকে। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় নতুন গবেষণায় প্রতিষ্ঠানটি যথাযথ সহযোগিতা দিতে অক্ষম।

ক. খলিফা আল মামুনের স্ত্রীর নাম কী ছিল? ১

খ. আল মামুনের প্রতি পারসিকদের সমর্থনদানের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডের সাথে আল মামুনের কোন প্রতিষ্ঠানের সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. আব্বাসি খিলাফতে শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে আল মামুন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির অবদান এশিয়াটিক সোসাইটির তুলনায় বেশি ছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বোর্ড ২০২২

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিষয় কোড | ২ | ৬ | ৭ |

সময় — ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ হোয়াংহো নদীর তীরে চীন সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়। হোয়াংহো নদীকে চীনের দুঃখ বলা হলেও এ নদী অধিবাসীদের জীবনে বিশাল ভূমিকা রাখে। নদীর উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ করায় গ্রামগুলো বন্যামুক্ত হয় এবং পরিকল্পিত সেচ প্রকল্প চালু করায় কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। চীনারা তাদের রাজাদের মৃতদেহ মমি করে রাখার জন্য ত্রিকোণাকার ঘর নির্মাণ করে সেখানে সংরক্ষণ করে। বর্তমানে যা কঠোর নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষিত আছে।

ক. প্যাপিরাস কী? ১

খ. মিসরীয় লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের হোয়াংহো নদীর সাথে মিসরের নীলনদের কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মিসরের ফারাও রাজাদের সমাধি সংরক্ষণের বিবরণ দাও। ৪

২.▶ রাশিদা বেগম 'বাংলাদেশ নারী অধিকার' নামক সংগঠনের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশে এমন একটি সময় ছিল যখন কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। একজন পুরুষ একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখতে পারত। তাদের কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল না। তারা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত। এসব সংঘর্ষ 'ভারতীয়দের দিন' নামে পরিচিত। তারা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে বিশ্বাসী ছিল।

ক. 'ইয়েমেন' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রাশিদা বেগমের বক্তব্যে কোন সমাজের নারীর অবস্থা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত যুগের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করো। ৪

৩.▶ সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ হংকং। স্বাধীনতার লাভের পর দেশটির নেতা রাষ্ট্রের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কিত ৪৭টি ধারার সমন্বয়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন, যা রাষ্ট্রে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

ক. মদিনার পূর্বনাম কী? ১

খ. 'হিলফুল ফুজুল' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংবিধানের সাথে মহনবি (স) কর্তৃক গৃহীত কোন পদক্ষেপের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মহানবি (স) কর্তৃক গৃহীত সংবিধানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ লাবন্য তার পাঠ্যবই থেকে একজন সাহাবির জীবনী পাঠ করেছে। তিনি ছিলেন বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ব্যক্তি। তিনি অনেক বেশি নবি ভক্ত ছিলেন। তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়ে থাকে।

ক. রিদ্দার যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১

খ. 'মজলিশ-উস-শূরা' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ইসলামের ইতিহাসে লাবন্যের পঠিত সাহাবির অবস্থান নিরূপণ করো। ৩

ঘ. 'উক্ত সাহাবিকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়'— তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ ঘুরির মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দীন আইবেক সুলতান হিসেবে মনোনীত হন। তিনি দেশ জয়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করেন। তিনি শুধু একজন বিজেতাই ছিলেন না বরং একজন সফল প্রশাসকও ছিলেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন করে একটি শক্তিশালী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। মূলত তার শাসনামলেই ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন পূর্ণতা লাভ করে।

ক. উষ্ট্রের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১

খ. 'বায়তুল মাল' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের মিল রয়েছে? বাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শাসকের চেয়ে উক্ত খলিফা ছিলেন আরও অধিকতর সফল প্রশাসক— উক্তিটিকে তুমি কি সমর্থন কর? যুক্তিসহ তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ বাদশা সরফরাজ খান ছিলেন একজন সরলমনা ও প্রজাবৎসল শাসক। তিনি সবসময় অহেতুক রক্তপাত এড়িয়ে যেতেন। তার এ সরলতার সুযোগ নিয়ে একদল বিপথগামী জনতা তার বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ এনে বিদ্রোহ শুরু করে। তিনি এ বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন না করায় আস্তে আস্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ক. মহানবি (স) কাকে 'সাইফুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন? ১

খ. হযরত আবুজার গিফারি (রা)-কে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বাদশাহর সাথে ইসলামের কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার ওপর আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তোমার মতমত যুক্তির আলোকে তুলে ধরো। ৪

৭.▶ পলাশীর যুদ্ধ বাংলার ভাগ্যাকাশে এক চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। ১৭৫৭ সালে সংঘটিত এ যুদ্ধে মীরজাফরের শঠতাপূর্ণ আচরণে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ঘটে। এ যুদ্ধে মীরমদন, মোহনলাল যখন প্রাণপণ লড়াই করে নবাবের বিজয়কে সুনিশ্চিত করে তোলেন, তখনই মীরজাফর নবাবকে যুদ্ধ বন্ধ করতে পরামর্শ দেন। নবাব মীরজাফরকে বিশ্বাস করে যুদ্ধ বন্ধ করার ঘোষণা দেন। মীরজাফরের এ বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের পরাজয় ঘটে। ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে।

ক. কাকে আরববিশ্বের প্রথম রাজা বলা হয়? ১

খ. খলিফা সুলাইমানকে 'আশীর্বাদের চাবি' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত যুদ্ধের সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের যুদ্ধের মতো উক্ত যুদ্ধের ফলেও ইসলামের এক নতুন শাসনব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়? যৌক্তিক মত দাও। ৪

৮.▶ বাংলাদেশের ফুটবল জগতে আবাহনী স্পোর্টিং ক্লাব অত্যন্ত সুপরিচিত। ক্লাবটি আবির্ভূত হয়ে একের পর এক শিরোপা জিততে শুরু করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নামকরা কয়েকজন অভিজ্ঞ ও চৌকশ খেলোয়াড়ের হাত ধরে দেশি-বিদেশি শিরোপা জয় করতে সক্ষম হয়। বর্তমান অধিনায়কের দূরদর্শী নেতৃত্বে ও বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়দের চোখ ধাঁধানো নৈপুণ্যে আবাহনী স্পোর্টিং ক্লাবটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষদের হারিয়ে মূল্যবান ও মর্যাদাসম্পন্ন শিরোপা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। অবশ্যই এসব জয়ের পেছনে বর্তমান অধিনায়কের চেয়ে পূর্বের অধিনায়কের ভূমিকাও কম নয়। কেননা বর্তমান অধিনায়ক একটি সুসংগঠিত দল পেয়েছিলেন।

ক. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. কাকে এবং কেন 'রাজেন্দ্র' বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বর্তমান অধিনায়কের সাথে কোন অর্থে খলিফা আল ওয়ালিদের মিল করা যেতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "আল ওয়ালিদের আগের খলিফা সাম্রাজ্য বিজয়ের পথকে সহজ করে দিয়েছে"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ জনাব শাহজাহান খান কলাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, সদাশয় ও জনদরদী ব্যক্তি এবং চারিত্রিক দিক দিয়ে ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ। ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধকে হৃদয়ে ধারণ করতেন। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তিনি গরিব জনগণের বিভিন্ন খাজনা মওকুফ করেন এবং কর ব্যবস্থার সংস্কার করে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন। ভিন্ন মতাবলম্বীদের শাসনকার্যে নিয়োগ করে তিনি এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে? ১

খ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিখ্যাত ছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন উমাইয়া খলিফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উক্ত খলিফার শাসননীতি ছিল জনকল্যাণমুখী'— বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ প্রাচীন বুশ দেশীয় একজন প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। তার মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়ে দেশের অভ্যন্তরে একদল মানুষ তাকে ঈশ্বরের সাথে তুলনা করতে থাকেন। এতে রাজা বিব্রতবোধ করেন। উক্ত আচরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে রাজা তাদের বন্দি করেন। তাদের বন্দি করার ফলে রাজা বড় ধরনের দুর্যোগের হাত হতে রক্ষা পায়। এর ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক. আব্বাসি খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে কত সালে? ১

খ. 'বায়তুল হিকমা' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বুশ দেশীয় রাজার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার আলোকে বলা যায় বুশ দেশীয় রাজার মতো উক্ত শাসকও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দ্বারা মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ হযরত উমর ফারুক (রা) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। প্রজাবৎসল, জনদরদি এ খলিফা জনগণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য রাতের বেলা ছদ্মবেশে মদিনা শহরে ঘুরে বেড়াতেন। জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি বিধানে তিনি নিরলস কাজ করেছেন। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ তার অন্যতম অবদান। আমিরুল মুমেনিন হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত।

ক. খলিফা আল-মনসুর কোথায় রাজধানী স্থানান্তর করেন? ১

খ. আবু মুসলিম ইতিহাসে এত বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের খলিফার গুণাবলির সাথে আব্বাসি কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রকাশিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও উক্ত খলিফা নানা গুণের অধিকারী ছিলেন— তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

সকল বোর্ড ২০২৩

সেট: ঘ

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র

বিষয় কোড | ২ | ৬ | ৭ |

সময় — ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য:— সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. হযরত ওমর (রা) ইসলামের কততম খলিফা ছিলেন?
(ক) ১ম (খ) ২য়
(গ) ৩য় (ঘ) ৪র্থ

২. 'জুন্নুরাইন' কোন খলিফাকে বলা হয়?
(ক) হযরত আবু বকর (রা)
(খ) হযরত ওমর (রা)
(গ) হযরত ওসমান (রা)
(ঘ) হযরত আলি (রা)

৩. খিলাফত নিয়ে হযরত আলি (রা)-এর সাথে কার দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল?
(ক) হযরত আমর ইবনুল আস
(খ) হযরত আবু মুসা আল আশয়ারি
(গ) হযরত মুয়াবিয়া (রা)
(ঘ) ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
গ্রামপ্রধান নির্বাচন নিয়ে দুটি পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে উভয়পক্ষ সদলবলে শালিস বৈঠকে বসে। এতে এক পক্ষের কিছুসংখ্যক লোক অন্যপক্ষের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তে অসন্তোষ ও ক্ষুব্ধ হয়ে বৈঠক ত্যাগ করে উভয়পক্ষের অসন্তোষ বিরোধী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

৪. উদ্দীপকের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সাথে নিচের কোন সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য রয়েছে?
(ক) খারেজি (খ) মাওয়ালি
(গ) শিয়া (ঘ) উমাইয়া

৫. উদ্দীপকের মতো দ্বন্দ্বের জেরে অনুষ্ঠিত 'দুমাতুল জন্দলের' শালিস বৈঠক ছিল—
i. দুরভিসন্ধিমূলক
ii. প্রহসনমূলক
iii. সমঝোতামূলক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. কারবালার যুদ্ধের প্রধান কারণ কী?
(ক) খারেজিদের দমন
(খ) শিয়াদের আধিপত্য বিস্তার
(গ) হুসাইন (রা)-এর সরলতা
(ঘ) ইয়াজিদের অবৈধ মনোনয়ন

৭. খাঁটি আরবি মুদ্রা প্রথম প্রবর্তন করেন কোন খলিফা?
(ক) হযরত ওমর (রা)
(খ) হযরত মুয়াবিয়া (রা)
(গ) আবদুল মালিক বিন মারওয়ান
(ঘ) উমর ইবনে আবদুল আজিজ

৮. খলিফা প্রথম ওয়ালিদ কোন ৩টি মহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করেছিলেন?
(ক) এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা
(খ) ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া
(গ) আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকা
(ঘ) অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, এশিয়া

৯. খলিফা দ্বিতীয় ওমরকে 'পঞ্চম খলিফা' বলা হয় কেন?
(ক) ৪র্থ খলিফার পরে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলে
(খ) উমাইয়া খিলাফতের ৫ম খলিফা ছিলেন বলে
(গ) তিনি পঞ্চম বার খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে
(ঘ) খুলাফায়ে রাশেদিনের নীতি অনুসরণ করেন বলে

১০. ইসলামে নওমুসলিমরা কী নামে পরিচিত?
(ক) অনারব (খ) খারেজি
(গ) শিয়া (ঘ) মাওয়ালি

১১. খলিফা আবুল আব্বাস 'আস-সাফ্ফাহ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন কেন?
(ক) নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার জন্য
(খ) ধর্মপরায়ণতার জন্য
(গ) উমাইয়াদের প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্য
(ঘ) দীর্ঘতম খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
সম্রাট শার্লিমান প্রজাদের জন্য যেমন হাসপাতাল, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ করেছেন তেমনি সাম্রাজ্য সুরক্ষার জন্য শক্তিশালী শত্রুকেও ছেড়ে কথা বলেননি। তিনি প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা দেখার জন্য ছদ্মবেশেও ভ্রমণ করতেন।

১২. উদ্দীপকের সম্রাট শার্লিমানের সাথে কোন আব্বাসি খলিফার সামঞ্জস্য রয়েছে?
(ক) আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ
(খ) আবু জাফর আল-মনসুর
(গ) হারুন-অর-রশিদ
(ঘ) আল-মামুন

১৩. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ড বিচারে উক্ত আব্বাসি খলিফাকে অভিহিত করা যায়—
i. রাখাল রাজা হিসেবে
ii. প্রজাহিতৈষী শাসক হিসেবে
iii. মহানুভব খলিফা হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

১৪. খলিফা আল-মামুন ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?
(ক) জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য
(খ) ধর্মপরায়ণতার কারণে
(গ) শাসন সুদৃঢ়করণের জন্য
(ঘ) প্রজাহিতৈষী কর্মকাণ্ডের জন্য

১৫. বায়তুল হিকমাহ কী?
(ক) উপাসনালয় (খ) জ্ঞানগৃহ
(গ) দরবারগৃহ (ঘ) মন্ত্রণালয়

১৬. আরবের বেশিরভাগ অঞ্চল—
(ক) মরুভূমি (খ) পর্বত সংকুল
(গ) জলাভূমি (ঘ) উর্বর

১৭. কোন প্রাণীকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়?
(ক) ঘোড়া (খ) দুম্বা
(গ) উট (ঘ) মেষ

১৮. মিসরকে 'নীল নদের দান' বলার কারণ কী?
(ক) বাণিজ্যে সমৃদ্ধির জন্য
(খ) দেশটি নীল-নদ থেকে উত্থিত বলে
(গ) মিসর নীল নদের তীরে অবস্থিত বলে
(ঘ) নদীর দুই তীরকে প্লাবিত করে উর্বর করার জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজা বারেস নিজেকে দেবতার অবতার বলে প্রচার করেন এবং জনগণ যাতে তাকে অকুণ্ঠ সমর্থন দান করে সেজন্য তিনি নিজেকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা দেন।

১৯. কোন প্রাচীন সভ্যতার রাজা উদ্দীপকের মতো কর্মকাণ্ড করেছিলেন?
(ক) মিসরীয় (খ) সুমেরীয়
(গ) হেলেনীয় (ঘ) রোমান

২০. এ ধরনের ঘোষণায় জনমনে কীসের সঞ্চার হয়?
(ক) শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা
(খ) ভয় ও সম্ভ্রম
(গ) আনুগত্য ও আন্তরিকতা
(ঘ) দম্ভ ও অহংকার

২১. লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রধান কারণ কী?
(ক) কলমের আবিষ্কার
(খ) কাগজের আবিষ্কার
(গ) শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনে
(ঘ) হিসাব-নিকাশ রাখার জন্য

২২. ঐতিহাসিকদের মতে, জাহিলিয়া যুগের পরিসীমা কত?
(ক) ১ বছর (খ) ১০ বছর
(গ) ১০০ বছর (ঘ) ১০০০ বছর

২৩. কয়টি ঝুলন্ত কবিতাকে 'আস্-সাবউল মুয়াল্লাকাত' বলা হয়?
(ক) ৫টি (খ) ৭টি
(গ) ৯টি (ঘ) ১১টি

২৪. হযরত মুহাম্মদ (স) কত খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত প্রাপ্ত হন?
(ক) ৫৭০ খ্রি. (খ) ৫৯৫ খ্রি.
(গ) ৬১০ খ্রি. (ঘ) ৬২২ খ্রি.

২৫. 'হিলফুল ফুযুল' গঠনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
(ক) শান্তি প্রতিষ্ঠা
(খ) ক্ষমতা দখল
(গ) নিজেদের প্রচার
(ঘ) যুবকদের সংগঠিত করা

২৬. হিজরতের পর মদিনাবাসী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কীভাবে গ্রহণ করেছিল?
(ক) আনন্দচিত্তে (খ) দ্বিধান্বিত মনে
(গ) সন্দেহের দৃষ্টিতে (ঘ) শত্রুভাবাপন্ন হয়ে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ইকবাল সাহেবের মৃত্যুর পর পরিচিতজনরা বলাবলি করতে থাকল যে, 'তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন, কারো হক নষ্ট করেননি, নিজ ধর্ম পালনে কখনো গাফেলতি করেননি।'

২৭. ইকবাল সাহেবের জীবনে হযরত মুহাম্মদ (স) এর কোন নির্দেশনার প্রতিফলন দেখা যায়?
(ক) হিলফুল ফুযুল-এর
(খ) বায়াত-আর-রিদওয়ানের
(গ) মদিনা সনদ-এর
(ঘ) বিদায় হজ-এর ভাষণের

২৮. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উক্ত নির্দেশনা মানব জাতির জন্য ছিল—
(ক) পরিপূর্ণ জীবনবিধান
(খ) আংশিক জীবনবিধান
(গ) একপেশে বিধি-বিধান
(ঘ) শুধু মুমিনদের প্রতি আহ্বান

২৯. 'খলিফা' শব্দের অর্থ কী?
(ক) রাজা (খ) সুলতান
(গ) আমির (ঘ) প্রতিনিধি

৩০. হযরত আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন?
(ক) প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে
(খ) শিশু ইসলামকে রক্ষা করেছিলেন তাই
(গ) ইসলামের জন্য অনেক সম্পদ দান করেছিলেন বলে
(ঘ) 'সিদ্দিক' উপাধি প্রাপ্তির জন্য

উত্তর	১	খ	২	গ	৩	গ	৪	ক	৫	ক	৬	ঘ	৭	গ	৮	ক	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	গ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	খ
	১৬	ক	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	খ	২১	খ	২২	গ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	খ

ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, সিলেট বোর্ড ২০২৩

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিষয় কোড | ২ | ৬ | ৭ |

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ নদীভাঙানের শিকার হয়ে একদল মানুষ ঘরবাড়ি, ফসলি জমি হারিয়ে নাখালপাড়ার বস্তিতে আশ্রয় নেয়। বাজারে মাল ওঠানামা, হোটেল কর্মচারী, পত্রিকা বিক্রি, ফুল বিক্রি, রিকশা-ভ্যান চালানো ইত্যাদি কাজ করে তারা অতি কষ্টে দিনযাপন করছিল। একদিন হঠাৎ উৎখাত হয়ে তারা শ্যামলির বস্তিতে আশ্রয় নেয়। শুরু হয় নতুন সংগ্রাম। এভাবে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তায় তাদের দিন কাটে।

ক. কাকে 'শেখ' বলা হতো? ১

খ. উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনজীবনের সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের কোন জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনগোষ্ঠীর সাথে উক্ত জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ ইরানের রেজা শাহ পাহলভী ইরানকে একটি আধুনিক সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর জোর দেন। তিনি কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন- জমি চাষের জন্য ট্রাকটর আমদানি করেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাঁধ দেন, খাল খনন করেন, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার করেন। তিনি নাগরিক জীবনকে নিরাপদ করা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করেন এবং প্রয়োজনে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করেন।

ক. কোন অঞ্চলে সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল? ১

খ. মেসোপটেমীয় অঞ্চলকে সভ্যতার লীলাভূমি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষির উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থার সাথে সুমেরীয় সভ্যতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সুমেরীয় সভ্যতায় আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করো। ৪

৩.▶ ফাহিম তার সমমনা বন্ধুদের নিয়ে 'অন্বেষা সংঘ' গড়ে তোলে। এই সংঘ যুবকদের নানামুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলে। ইভটিজিং, মাদক সেবন প্রতিরোধ করা, রাস্তা মেরামত, জলাশয় পরিষ্কার, পথশিশুদের খাবার ও পাঠদান, বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন তাদের লক্ষ্য। অনিষ্টকারীদের দমন ও নিপীড়িতদের সাহায্য দানই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ক. 'মোহাজেরিন' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'The Public Register of The Arabs' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংগঠনটিতে মহানবি (স)-এর গঠিত কোন সংগঠনের প্রভাব পড়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সংগঠনের কার্যক্রম সমাজে কী প্রভাব ফেলবে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা-নরসিংদী মহাসড়কে বড় বড় গাছ কেটে ফেলে রাখা হয়েছিল। ভারী কিছু লোহার পিলারও ফেলে রাখা হয়েছিল। যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে সাময়িক কষ্ট হলেও অপশক্তির সরাসরি হামলা থেকে একটি বৃহত্তর জনপদকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একদল লোক স্বাধীনতার বিরোধিতা করে মূল জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এরা রাজাকার নামে পরিচিত।

ক. বদরের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল? ১

খ. উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের মূল কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে মহানবি (স)-এর সময়ে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধের কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মহানবি (স)-এর সাথে ভিন্নমত পোষণকারী দলের কর্মকাণ্ড উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার রক্ষা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জনমত ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে একটি সংবিধান রচিত হয়। এতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সংরক্ষিত হয়। এই সংবিধান অনুসারেই রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে।

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয় হয়েছিল? ১

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সংবিধান প্রণয়নের সাথে মহানবি (স)-এর প্রণীত কোন ব্যবস্থাপনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাষ্ট্রের সংহতি, শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের জন্য সংবিধানের ভূমিকা উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে মানুষকে শোষণ করা, মানুষের শক্তিকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার আকাঙ্ক্ষা থেকে ধর্মীয় দল ও মতের জন্ম হয়। অনেক ব্যক্তি ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে নিজেকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করে। মানুষ তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, তাদের ভক্তি করে এবং অনুসরণ করে। মানুষ নিজের আয়-উপার্জন থেকে সরকারকে কর দেওয়ার বিষয়ে সবসময়েই অনিহা প্রকাশ করে। ইতিহাসে কর না দেওয়ার দাবিতে অনেক বিদ্রোহের পরিচয় পাওয়া যায়।

ক. বায়তুল মাল কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. মজলিশ-উস-শুরা গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কর মওকুফের দাবিতে হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে যে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ হয়েছিল তা পর্যালোচনা করো। ৪

৭.▶ আরশাদ মিয়া একটি সিরামিক ইন্ডাস্ট্রির কর্ণধার। তার বিরুদ্ধে দুটি মারাত্মক অভিযোগ তোলা হয়। তিনি তার আপনজনদেরকে প্রতিষ্ঠানের আয়ের একটি বিরাট অংশ অন্যায়ভাবে দান করেছেন। আরও অভিযোগ ওঠে যে, তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে একতরফাভাবে নিজ আত্মীয়স্বজনকে নিয়োগ দিয়েছেন। ফলে অনেক যোগ্য লোক চাকরি পায়নি। অনেককে আবার জোরপূর্বক চাকরিচ্যুত করা হয়।

ক. উষ্ট্রের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১

খ. কোন খলিফাকে জুন্নুরাইন বলা হয় এবং কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আরশাদ মিয়ার কর্মকাণ্ডের সাথে খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আরশাদ মিয়ার বিরুদ্ধে আনীত স্বজনপ্রীতির অভিযোগের সাথে হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৮.▶ রাজা প্রথম জর্জ ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের সূচনা করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পরই তিনি রাজতন্ত্র সুদৃঢ়করণের স্বার্থে সংস্কারমূলক কার্যক্রমে হাত দেন। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রশাসনকে ঢেলে সাজান। এছাড়া স্কটল্যান্ড, উস্টারশায়ার, ম্যানচেস্টার প্রভৃতি কান্ট্রিতে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্ষেত্র বিশেষে উদারতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেখালেও একজন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ কূটনীতিক হিসেবে তিনি রাজতন্ত্রের জাঁকজমকতা ও আড়ম্বরতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

ক. মুসলিম নৌ-বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা কোন খলিফা? ১
খ. 'জিজিয়া' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাজা প্রথম জর্জের শাসন নীতির সাথে খলিফা হযরত মুয়াবিয়ার (রা) শাসন নীতির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে খলিফা হযরত মুয়াবিয়ার (রা) প্রশাসনিক সংস্কারের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করো। ৪

৯.▶ ইলখানি সুলতান গাজান খান একজন প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। তিনি জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে সকল প্রকার অন্যায় কর নিষিদ্ধ করেন। তার শাসন নীতি ছিল প্রজাকল্যাণ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা। তিনি অত্যন্ত ন্যায়বান, সচ্চরিত্রের অধিকারী, পরিশ্রমী শাসক ছিলেন সত্য, তবে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরোধিতা, বহুজাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রের দুর্বলতা, ইলখানিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব ইত্যাদি কারণে ইলখানি সাম্রাজ্যটি খুব স্থায়ী হয়নি।

ক. কত সালে উমাইয়া খিলাফতের পতন হয়? ১
খ. কোন উমাইয়া খলিফাকে আশীর্বাদের চাবি বলা হতো এবং কেন? ২
গ. গাজান খানের শাসন নীতির সাথে কোন উমাইয়া খলিফার শাসন নীতির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কারণগুলোর আলোকে উমাইয়া খিলাফতের পতনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ চেঙ্গিস খান অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ নিষ্ঠুর ব্যক্তি ছিলেন। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি অনেক সময় অমূলক সন্দেহের বশবর্তী হয়েও তার অনেক কাছের বিশ্বস্ত মানুষকে হত্যা করেছেন। এজন্য রাজবংশ ও সাম্রাজ্য দুর্বল হয়েছে। চেঙ্গিস খানের উত্তর পুরুষ কুবলাই খান সাম্রাজ্য শাসনের সুবিধার পাশাপাশি রাজধানীর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে রাজধানী কারাকোরাম থেকে পিকিং-এ স্থানান্তর করেন এবং নতুন রাজধানীকে বিভিন্নভাবে সজ্জিত করেন।

ক. সহস্র আরব্য রজনীর নায়ক কে? ১
খ. আবুল আব্বাসকে 'আস-সাফ্ফাহ' বলা হয় কেন? ২
গ. চেঙ্গিস খানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে কোন আব্বাসি খলিফার চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "কুবলাই খান ও খলিফা আল-মনসুরের রাজধানী স্থানান্তরের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন"— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'আলোকিত সাহিত্য পরিষদ' গঠিত হয়। দেশি-বিদেশি প্রচুর গ্রন্থের সমাবেশ রয়েছে এখানে। এখানে গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ, অনুবাদ ও গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠান ভালো লেখক ও নতুন গবেষকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, আর্থিক অনুদান ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করে থাকে।

ক. মানমন্দির কী? ১
খ. নহরে জুবাইদার বিবরণ দাও। ২
গ. উদ্দীপকের সাহিত্য পরিষদের সাথে খলিফা আল-মামুনের কোন প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সহযোগিতা ছাড়াও আল-মামুন তার গবেষকদের গবেষণাকর্মে আর কী কী উদ্যোগ নিয়েছিলেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

দিনাজপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর, বরিশাল বোর্ড ২০২৩

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিষয় কোড ২ ৬ ৭

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ আফ্রিকার উত্তরাংশে বিশাল অংশ জুড়ে সাহারা মরুভূমি অবস্থিত। এর পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর, উত্তরে আটলাস পর্বত ও ভূমধ্যসাগর এবং তার দক্ষিণে নাইজার উপত্যকা অবস্থিত। অঞ্চলটি অতি উষ্ণ ও বেশির ভাগ অঞ্চলই অনুর্বর। অধিবাসীর অধিকাংশই যাযাবর। তারা ছাগল, ভেড়া, উট পালন করে এবং পানির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। যাযাবর ও পণ্য বাহকেরা যাতায়াতের জন্য উট ব্যবহার করে।

ক. কাদের বেদুইন বলা হয়? ১
খ. আসাবিয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাহারা মরুভূমির সাথে তোমার পঠিত কোন অঞ্চলের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা পর্যালোচনা করো। ৪

২.▶

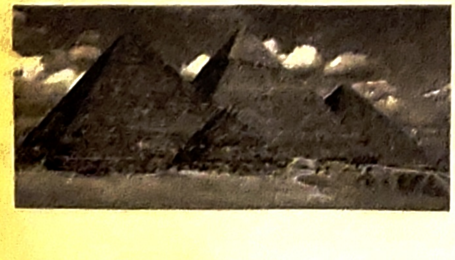

ক. 'ফারাও' কোন রাজাদের উপাধি ছিল? ১
খ. হায়ারোগ্লিফিক্স কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সভ্যতার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৩.▶ রসুলপুর স্কুলে প্রতিবছর সাহিত্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্বরচিত কবিতা, গল্প, ছড়া, প্রবন্ধ পাঠ করে। বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত লেখকগণকে পুরস্কার দেওয়া হয় এবং তাদের লেখনীসমূহ সুন্দর হস্তাক্ষরে দেয়াল পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর উক্ত দেয়াল পত্রিকা স্কুলের লাইব্রেরিতে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহিত হয়। এতে অনেক কবি- সাহিত্যিকের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।

ক. প্রাচীন আরবে গোত্র প্রধানদের কী বলা হতো? ১
খ. 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাহিত্য মেলার সাথে প্রাচীন আরবের কোন মেলার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সাহিত্য চর্চায় উক্ত মেলার অবদান নিরূপণ করো। ৪

৪. ▶ হযরত ইব্রাহীম (আ) ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইরাকের বাবেল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐশীবাণী প্রাপ্ত হয়ে তিনি সেখানে একটি নতুন ধর্মমত এবং আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার শুরু করেন। কিন্তু বাবেলের শাসক মূর্তি পূজারি নমরুদ এর বিরোধিতা শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত শাস্তিস্বরূপ হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যার চেষ্টা করে। আল্লাহর রহমতে তিনি অগ্নি থেকে রক্ষা পান এবং নিজ মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে সিরিয়া গমন করেন। তিনি আল্লাহর ইবাদত করার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করেন এবং আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করতে থাকেন।

ক. মিরাজ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১
খ. মক্কা বিজয়কে 'রক্তপাতহীন বিজয়' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের হযরত ইব্রাহীম (আ) এর সাথে তোমার পঠিত কোন মহান ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তোমার পঠিত উক্ত মহান ব্যক্তির জন্মভূমি ত্যাগকে কি 'মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা' হিসেবে অভিহিত করা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. ▶ দীর্ঘ আলোচনার পর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে ১৯১৯ সালে মিত্র শক্তি ও জার্মানির মধ্যে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাসে যা ভার্সাই সন্ধি নামে পরিচিত। এ সন্ধিতে এমন কতগুলো শর্ত আরোপ করা হয়, যা জার্মানির জন্য ছিল অসম ও অবমাননাকর। তারপরও জার্মানি শান্তির জন্য সকল শর্ত স্বীকার করে চূড়ান্ত পরাজয় মেনে নেয়।

ক. মুহাম্মদ শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'নাখলার খণ্ড যুদ্ধ' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ভার্সাই সন্ধির সাথে তোমার পঠিত কোন সন্ধির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ঘটনার গুরুত্ব নিরূপণ করো। ৪

৬. ▶ গাজান খান পারস্যের ইলখানি শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ইলখানি বংশের এক সংকটময় মুহূর্তে সিংহাসনে বসেন। স্বীয় প্রতিভা, সাহস, দক্ষতা ও সাংগঠনিক শক্তিবলে তিনি পারস্যের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। যে সমস্ত বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল, তিনি সেগুলো কঠোর হস্তে দমন করে আসন্ন বিপদের হাত থেকে ইলখানি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। এজন্য তাকে ইলখানি সাম্রাজ্যের 'রক্ষাকারী' বলে অভিহিত করা হয়।

ক. গনিমত কী? ১
খ. 'মজলিশ-উশ-শুরা' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের গাজান খানের সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৭. ▶ রায়পুর জেলা পরিষদের প্রশাসক নির্বাচিত হয়ে সেলিম চৌধুরী তার জেলায় কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেন। এদের মধ্যে কয়েকজন যোগ্য হলেও তারা ছিলেন প্রশাসকের নিকটআত্মীয়। কিছু দিন পর কতিপয় ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, কোষাগারের অর্থ আত্মসাৎ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারসহ বেশ কিছু অভিযোগ উত্থাপন করে। বিশেষ মহলের উস্কানিতে বিদ্রোহীরা এক পর্যায়ে প্রশাসকের বাসভবন অবরোধ করে এবং সেই সাথে উত্তেজিত জনতা তাকে আক্রমণ করে। ফলে রায়পুরের অধিবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এবং সংঘাতের বীজ রোপিত হয়।

ক. 'আসাদুল্লাহ' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. খারেজি কারা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার পরিণতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. ▶ মেনেস প্রাচীন মিসরের শক্তিশালী ফারাও ছিলেন। তিনি মিসরের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে নিজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকোষকে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করতেন। তিনি প্রথম মিসরে নৌবাহিনীর পত্তন করে গ্রিকদের অনেক দ্বীপাঞ্চল নিজ রাজভুক্ত করেছিলেন। মিসরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন তার ভগ্নিপতি। তার শাসনকাল ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ধর্ম-কর্মে একনিষ্ঠ হলেও তিনি ছিলেন কুটিল চরিত্রের অধিকারী। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি যে কোনো জঘন্য কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। তার একমাত্র পুত্র ছিল পাপাসক্ত, অত্যাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং অকর্মণ্য। মেনেস মৃত্যুকালে তার পাপাসক্ত ছেলেকে মিসরের সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকার নিযুক্ত করেন।

ক. উমাইয়া সাধু পুরুষ কে ছিলেন? ১
খ. রাজেন্দ্র বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ফারাও মেনেসের সাথে তোমার পঠিত কোন উমাইয়া খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার পুত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করো। ৪

৯. ▶ উত্তর আফ্রিকার এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন মিস্টার হান্টার। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি সংকটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন। তিনি রাজ্যে বহুবিধ শাসন সংস্কার করে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি রাজ্যের সরকারি দপ্তরে তার নিজ মাতৃভাষাকে বাধ্যতামূলক করেন। এছাড়াও তিনি নিজ মাতৃলিপির উৎকর্ষ সাধন, নির্দিষ্ট মানের ধাতব মুদ্রার সংস্কার এবং প্রচলন, ডাক বিভাগের উন্নয়ন, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করেন। উত্তর আফ্রিকার শাসকদের মধ্যে মিস্টার হান্টারই শ্রেষ্ঠত্বের আসন অর্জন করে চির ভাস্বর হয়ে আছেন।

ক. আরবদের প্রথম রাজা কে ছিলেন? ১
খ. সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের মিস্টার হান্টারের সাথে তোমার পঠিত কোন উমাইয়া খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার সংস্কারসমূহ পর্যালোচনা করো। ৪

১০. ▶ রোমান রাজা ফিউডাল খুবই ধার্মিক ছিলেন। তবে রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি খুবই নৃশংস ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে ভেবে তিনি তার প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করলে সেনাপতির সমর্থকদের দ্বারা যে বিদ্রোহ দেখা দেয় রাজা তাও অতি কঠোর হাতে দমন করেন। তার ধার্মিকতার সুযোগে একদল প্রজা তাকে প্রভু বলে পূজা করতে এলে এক মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়। সৌভাগ্যক্রমে রাজা সবকিছু মোকাবিলা করতে সক্ষম হন।

ক. বাগদাদ নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১
খ. খলিফা মনসুর কর্তৃক আলী বংশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের রাজা ফিউডালের মতো খলিফা আল-মনসুর তার কোন সেনাপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সেনাপতির বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার ফলাফল আলোচনা করো। ৪

১১. ▶ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব স্বীয় ভ্রাতাদের সাথে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুশাসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করাই ছিল তার শাসনামলের অন্যতম লক্ষ্য। তার সময়কাল ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কারণ তার সময়েই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করে। শিক্ষা, শিল্পকলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য মুঘল ইতিহাসে তার রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

ক. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
খ. আবুল আব্বাসকে 'আস-সাফ্ফাহ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন আব্বাসি খলিফার কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তোমার পঠিত উক্ত খলিফার আমলে সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম-দর্শন এবং বিজ্ঞান চর্চার কার্যক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

বি. দ্র. ২০২৪ সালের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র বিষয়টির এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

সকল বোর্ড ২০২৫

সেট: ক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

বিষয় কোড ২ ৬ ৭

সময় — ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: — সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. কোন প্রাণীকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়?

(ক) উট (খ) দুম্বা
(গ) ঘোড়া (ঘ) গাধা

২. আরব গোত্রে 'শেখ' কীভাবে নির্বাচিত হতেন?

(ক) রক্তের ভিত্তিতে
(খ) বংশ বিচারে
(গ) যোগ্যতার ভিত্তিতে
(ঘ) অর্থ-বিত্ত বিচারে

৩. নীল নদ কোন দেশে অবস্থিত?

(ক) আরব (খ) মিসর
(গ) পারস্য (ঘ) সিরিয়া

৪. 'হায়ারোগ্লিফিক' কী?

(ক) পর্বতমালা (খ) মরুঝড়
(গ) চিত্রশিল্প (ঘ) লিখন পদ্ধতি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জেলা পরিষদে প্রতিনিধি পাঠানোর উদ্দেশ্যে গুয়াটন গ্রামের বয়স্ক লোকেরা একত্রে বসে এমন একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করলেন— যিনি বয়স, প্রজ্ঞা ও দৈহিক সৌন্দর্যে সব থেকে এগিয়ে ছিলেন।

৫. কোন প্রয়োজনে আরবের লোকেরা উদ্দীপকের মতো করে নেতা নির্বাচন করত?

(ক) বাণিজ্য অভিযানে
(খ) যুদ্ধাভিযানে
(গ) গোত্র প্রধান নির্বাচনে
(ঘ) উকাজ মেলা পরিচালনায়

৬. উদ্দীপকের মতো নেতা নির্বাচনে আরবদের কোন চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটত?

(ক) সহনশীলতা (খ) গণতন্ত্রমনা
(গ) স্বাধীনচেতা (ঘ) মানবিকতা

৭. প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে কোন সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যায় অধিক ছিল?

(ক) পৌত্তলিক (খ) ইহুদি
(গ) খ্রিস্টান (ঘ) হানিফ

৮. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর 'আল আমিন' উপাধি প্রাপ্তির কারণ, তাঁর—

i. বিশ্বস্ততা
ii. আমানতদারিতা
iii. সত্যবাদিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯. হিলফুল ফুজুল গঠনের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মূলত কোন গুণটির প্রকাশ ঘটেছে?

(ক) সাহসিকতা (খ) নেতৃত্বগুণ
(গ) মানবিকতা (ঘ) গোত্রপ্রীতি

১০. মদিনায় হিজরতের পথে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গী কে ছিলেন?

(ক) হযরত আবু বকর (রা)
(খ) হযরত উসমান (রা)
(গ) হযরত আলি (রা)
(ঘ) হযরত হামযা (রা)

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশে ফ্যাসিস্টকে উৎখাত করতে তরুণ ছাত্র সমাজ ও বিক্ষুব্ধ জনতা সরকারের পেটোয়া বাহিনীর অত্যাধুনিক অস্ত্র-গুলির মুখে ঢিল ছুড়ে প্রতিরোধ করেছিল। তাদের এই অভিনব ও অভাবনীয় প্রতিরোধ-অভ্যুত্থান ফ্যাসিস্টকে পালাতে বাধ্য করেছিল।

১১. উদ্দীপকে ফ্যাসিস্ট উৎখাতের প্রক্রিয়ার সাথে মক্কা আক্রমণকারী কোন শত্রুর উৎখাতের মিল রয়েছে?

(ক) আবরাহা (খ) আবু জেহেল
(গ) আবু সুফিয়ান (ঘ) ইবনে উবাই

১২. উদ্দীপকে অস্ত্রের মুখে ঢিল ছোড়ার সাথে মক্কা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কোন কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য রয়েছে?

(ক) বন্যায় শত্রুপক্ষের ভেসে যাওয়া
(খ) আরবদের গোত্রপ্রীতির প্রতিফলন
(গ) হস্তী বাহিনীর পা কাদায় আটকে যাওয়া
(ঘ) আবাবিল পাখির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর নিক্ষেপ

১৩. 'মদিনা' শব্দের অর্থ কী?

(ক) পাহাড় (খ) গ্রাম
(গ) শহর (ঘ) মরুভূমি

১৪. 'খিলাফত' কী?

(ক) উত্তরাধিকারিত্ব (খ) প্রতিনিধিত্ব
(গ) রাজত্ব (ঘ) শিষ্যত্ব

১৫. ভণ্ড নবিদের উত্থানের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

(ক) ধর্ম প্রচার
(খ) ইসলাম অবমাননা
(গ) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
(ঘ) স্বার্থ হাসিল

১৬. 'বায়তুল মাল' কী?

(ক) বিচারালয়
(খ) রাষ্ট্রীয় কোষাগার
(গ) উপাসনালয়
(ঘ) রাজস্ব দপ্তর

১৭. মুসলমানদের বিলাস-ব্যসনের প্রথম বিরোধিতাকারী সাহাবির নাম কী?

(ক) হযরত উসমান (রা)
(খ) হযরত আলি (রা)
(গ) হযরত মুয়াবিয়া (রা)
(ঘ) হযরত আবুজর গিফরি (রা)

১৮. সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলি (রা)-এর পরাজয়ের কারণ কী?

(ক) মুয়াবিয়া (রা)-এর কুটকৌশল
(খ) আলি (রা)-এর নমনীয়তা
(গ) সেনাপতির দুর্বলতা
(ঘ) প্রতিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা

১৯. দুমাতুল জন্দলের শালিস বৈঠকের ফলে ইসলামে কোন দলটির উদ্ভব হয়?

(ক) শিয়া (খ) খারেজি
(গ) সুন্নি (ঘ) ফাতেমি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২০ ও ২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

পতিত সরকার নিজেদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতার একমাত্র মালিক মনে করত। ফলে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র ভেঙে পড়ে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। কর্তৃত্ববাদী প্রশাসন বিরোধী মতকে নিষ্পেষণ করে। বিক্ষুব্ধ মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

২০. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকার ব্যবস্থার সাথে ইসলামে প্রথম কোন শাসক বংশের সাজুয্য দেখা যায়?

(ক) কুরাইশ (খ) উমাইয়া
(গ) আব্বাসি (ঘ) ফাতেমি

২১. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসন-মানসিকতার মতো পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে খিলাফতে—

i. অসন্তোষ দেখা দেয়
ii. খিলাফতের মর্যাদা নষ্ট হয়
iii. অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২২. সর্বপ্রথম কোন খলিফা খাঁটি আরবি মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন?

(ক) হযরত মুয়াবিয়া (রা)
(খ) আবদুল মালিক
(গ) ১ম ওয়ালিদ
(ঘ) ২য় ওমর

২৩. কাউন্ট জুলিয়ান মুসলমানদেরকে স্পেন জয়ের আহ্বান জানিয়েছিলেন কেন?

(ক) নিজে রাজা হওয়ার জন্য
(খ) ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে
(গ) মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের ভয়ে
(ঘ) কন্যা ফ্লোরিন্ডার শ্লীলতাহানীর অপমানে

২৪. ওমর বিন আবদুল আজিজকে 'উমাইয়া সাধু' বলার কারণ কী?

(ক) উমাইয়াদের স্বার্থ রক্ষার জন্য
(খ) দেখতে সাধুর মতো ছিলেন বলে
(গ) আব্বাসিদের বিরোধিতার কারণে
(ঘ) খুলাফায়ে রাশেদিনের অনুসরণের জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর দেশে 'আয়না ঘরের' সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যেখানে বিরোধী মতের লোকদের ধরে এনে আটক, নির্যাতন ও গুম করে রাখা হতো এবং অধিকাংশকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হতো।

২৫. উদ্দীপকের 'আয়না ঘরের' মতো ব্যবস্থা সেলজুক শাসনে একটি সম্প্রদায় করত, সম্প্রদায়টির নাম কী?

ⓚ খারেজি ⓚh শিয়া

ⓖ অ্যাসাসিন ⓖh জালাইয়ারি

২৬. উদ্দীপকের মতো কর্মকাণ্ডের দ্বারা উক্ত সম্প্রদায় কীসের প্রকাশ ঘটাতে সচেষ্ট ছিল?

ⓚ প্রতিহিংসার

ⓚh স্বার্থপরতার

ⓖ অসহিষ্ণুতার

ⓖh অসচেতনতার

২৭. বার্মাকিদের পতনের প্রধান কারণ কী?

ⓚ খলিফার রোষানল

ⓚh নিজেদের বিত্ত-বৈভব

ⓖ জন আকাঙ্ক্ষা

ⓖh অধিক অহমিকা

২৮. কোন খলিফা ইতিহাসে 'রূপকথার রাজা' নামে খ্যাত?

ⓚ আবুল আব্বাস আস্-সাফফাহ

ⓚh আবু জাফর আল-মনসুর

ⓖ হারুন-অর-রশীদ

ⓖh আল-মামুন

২৯. 'বায়তুল হিকমা' কী?

ⓚ প্রাসাদ ⓚh গবেষণাগার

ⓖ উপাসনালয় ⓖh হাসপাতাল

৩০. 'ক্রুসেড' কী?

ⓚ ধর্মযুদ্ধ ⓚh সম্প্রদায়

ⓖ স্মৃতিসৌধ ⓖh যুদ্ধ জাহাজ

উত্তর	১	ক	২	গ	৩	খ	৪	ঘ	৫	গ	৬	খ	৭	ক	৮	ঘ	৯	খ	১০	ক	১১	ক	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ঘ
	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	খ	২০	খ	২১	ঘ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ক

ঢাকা, দিনাজপুর, কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫

সেট: ০৪ **ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি** বিষয় কোড | ২ | ৬ | ৭ |

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ অথৈদের সমাজে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের ক্ষমতা নারীর জন্য সংরক্ষিত। পুরুষদের সুনির্দিষ্ট অধিকার থাকলেও তারা নিয়ন্ত্রিত হয় নারীদের দ্বারা। তারা কঠিনভাবে ধর্ম-কর্মে বিশ্বাসী। মৃত্যুর পরে যে জীবন আছে এবং সে জীবনে বেঁচে থাকা বা সুখ-শান্তিতে কাটানোর জন্য মৃতদেহের সাথে সমাধিতে তারা রসদাদি এমনকি ব্যবহার্য জিনিসপত্রও দিয়ে দিত।

ক. মিসরকে কীসের দেশ বলা হয়? ১

খ. মিসরকে নীল নদের দান বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অথৈদের পরিবারের সাথে প্রাচীন মিসরীয়দের পরিবারের সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অথৈদের সমাজের মানুষের ধর্মচিন্তা প্রাচীন মিসরীয়দের ধর্মচিন্তার অনুরূপ ছিল কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

২.▶ জাভা দ্বীপে তখন কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। অধিবাসীরা রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করে বসবাস করত। নিজেদের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচন করে তারা পরিষদে পাঠাত। আর এভাবে সমাজের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত পরিষদ দ্বীপের প্রধান শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা দেখভাল করতেন। দ্বীপবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো ছিল না। কষ্টসাধ্য কিছু পেশার বাইরে অধিবাসীদের আয়ের উৎস ছিল সীমিত। বছরের নির্দিষ্ট একটি সময়ে দ্বীপের সৌন্দর্য দর্শনে আসা বাইরের দেশের পর্যটকদের ঘিরে কিছু মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করত।

ক. 'আস-সাবউল মুয়াল্লাকাত' কী? ১

খ. 'বেদুইন' কারা? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের জাভা দ্বীপের পরিষদ গঠনের সাথে প্রাক-ইসলামি মক্কার শাসন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জাভাবাসীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আলোকে আরবদের অর্থনৈতিক অবস্থা মূল্যায়ন করো। ৪

৩.▶ শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। মায়ানমারের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শাসকগোষ্ঠী নির্যাতন, ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে তাদের বিতাড়িত করে। ফলে উপায়ান্তর না পেয়ে তারা দলে দলে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশ তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে জীবন-জীবিকা ও নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করে। এমনকি জন্মভূমিতে যাতে ফিরে যেতে পারে সেজন্যও সহায়তা অব্যাহত রেখেছে।

ক. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত প্রাপ্ত হন? ১

খ. হযরত আলি (রা) হযরত মুহাম্মদ (স)-এরও পরে হিজরত করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. বাংলাদেশে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের সাথে মদিনায় হিজরতকারী মুসলমানদের সামঞ্জস্য খুঁজে বের করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর তুলনায় মদিনায় হিজরতকারী মুসলমানরা অনেক বেশি সমাদৃত ও অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন— ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ ৫ আগস্ট ২০২৪-বাংলাদেশের মানুষ অন্যরকম এক বিজয় দেখল। স্বৈরাচার বিরোধী অসংখ্য মানুষের ঢল ক্ষমতাসীনদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করল অথচ দু'বছর আগেও মানুষ ভাবতে পারেনি যে, এমনটা সম্ভব। রাষ্ট্র ৩—৪ দিন সরকারবিহীন থাকল। তারপরও বিজয়ীদের পক্ষ থেকে কোনো রক্তপাত হলো না, ধ্বংসলীলা হলো না, বরং জীবন-সম্পদ রক্ষায় সকলে স্বতঃস্ফূর্ত এগিয়ে এলো। সর্বত্র বিজয় ও মানবতার পতাকা পতপত করে উড়তে থাকল।

ক. 'ফাতহুম মুবিন' অর্থ কী? ১

খ. খালিদ বিন ওয়ালিদ বিখ্যাত কেন? সংক্ষেপে লেখো। ২

গ. সংখ্যা-বিচারে উদ্দীপকের বিজয়ী দলের সাথে মক্কা বিজয়ী মুসলমানদের সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মক্কা বিজয়-পরবর্তী বিজয়ী মুসলমানদের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ বিগত সরকার পরপর তিনটি একতরফা নির্বাচনে নিজেদেরকে নির্বাচিত দাবি করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। অথচ সঠিকভাবে জনরায় নিলে তারা নির্বাচিত হতে পারতো না। ফলে তাদের বিরুদ্ধে দেশের অধিকাংশ মানুষ ক্ষুব্ধ ছিল। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতা করেছে। অথচ ইতিপূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত তিনটি সুষ্ঠু নির্বাচনে নির্বাচিত সরকার নির্বিঘ্নে দেশ পরিচালনা করেছে।

ক. ইসলামের প্রথম খলিফার নাম কী? ১

খ. খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত একতরফা নির্বাচনের সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচনের পার্থক্য নির্ণয় করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মতোই খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন অনুষ্ঠানে জনরায় প্রতিফলিত হয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে ব্যাখ্যা দাও। ৪

৬.▶ ঘটনা ১: ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর তৎকালীন সরকার প্রধান অসৎ উদ্দেশ্যে হেফাজতের লোকজন কুরআন পুড়িয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন।

ঘটনা ২: রেজাশাহ পাহলভী ইমাম খোমেনিকে তাঁর স্বৈরাচারী শাসনের জন্য হুমকি মনে করে ফ্রান্সে নির্বাসনে পাঠান। কেননা, ইমাম খোমেনি গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষার জন্য জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলনের ডাক দেন।

ক. হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকাল লেখো। ১

খ. 'যুন্নুরাইন' উপাধি কাকে এবং কেন দেওয়া হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে ওসমান (রা)-এর জীবনের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ইমাম খোমেনির জীবন ও কর্মের সাথে হযরত আবুজর গিফারি (রা)-এর জীবন ও কর্মের বৈসাদৃশ্যসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ যোগ্যতম একজন সাধু যখন একটি শহরে এসে ক্ষমতাসীনদের রোষানলে পড়ে নিহত হন তখন ঐ শহরে তাঁর ভক্ত শ্রেণির অধিকাংশ তাঁকে ত্যাগ করেন। অথচ শাসক বদল হলে পরবর্তীতে এই ভক্ত শ্রেণি ঐ সাধু ব্যক্তির নামে দল গঠন করে এবং হত্যার প্রতিশোধ নেয়। নতুন শাসক উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাদের কঠোর হাতে দমন করেন। শাসক নিজ বংশের ক্ষমতা স্থায়ীকরণ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে সমগ্র দেশে একই মুদ্রা ও একই ভাষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। তিনি রাজস্ব নীতিতেও পরিবর্তন এনে রাজকোষ সমৃদ্ধ করেন।

ক. ইসলামের ইতিহাসে কাকে 'রাজেন্দ্র' বা 'Father of kings' বলা হয়? ১

খ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকের ভক্ত শ্রেণির সাথে কুফার 'অনুশোচনাকারী' দলটির সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নতুন শাসকের কর্মকাণ্ডের আলোকে খলিফা আবদুল মালিকের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করো। ৪

৮.▶ একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্মুখ সময়ে আমাদের সেনাবাহিনীর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। অথচ স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার সেই সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে রাখে। অন্যদিকে দেশ গঠনে কিছু উদারনৈতিক কার্যক্রম অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে এবং ভুল অর্থনীতির মারপ্যাচে দিনে দিনে দেশ তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়। ফলে দেশের পতনের জন্য সকলে সেই ১ম সরকারকেই দায়ী করে।

ক. কে বায়তুল মালকে মুসলমানদের সম্পদ বলে ঘোষণা করেন? ১

খ. "মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করার জন্য নবিকে পাঠানো হয়েছে— খতনা করানোর জন্য নয়"— কথাটি খলিফা দ্বিতীয় ওমর কোন প্রেক্ষিতে বলেছিলেন? ব্যাখ্যাসহ লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বাংলাদেশের প্রথম সরকারের গৃহীত সেনাবাহিনীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি খলিফা দ্বিতীয় ওমরের খিলাফত কালেও প্রদর্শিত হয়েছিল— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাষ্ট্র পরিচালনায় উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপের মতো খলিফা ২য় ওমরও কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন বলেই উমাইয়া খিলাফতের পতন তরান্বিত হয়েছিল— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৯.▶ জুলাই বিপ্লবে আন্দোলনকারীদের অভিনব কিছু কৌশলের মধ্যে একটি ছিল ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার লাল করা। এতে সরকার আরও তটস্থ হয়ে নৃশংস হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। এক যাত্রাবাড়িতেই ছাত্র-জনতার অসংখ্য লাশ পড়ে। পুলিশবাহিনী খুঁজে খুঁজে এদের হত্যা করে। সরকারের এই নৃশংসতা শুধুই নিজের দম্ভ ও ক্ষমতা প্রদর্শন ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মানসে।

ক. 'আস্-সাফ্ফাহ' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'আহলে বায়াত' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'প্রোফাইল পিকচার লাল' করার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন কাজটি আস্-সাফ্ফার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে উমাইয়া যুবকরা করেছিল? ব্যাখ্যাসহ লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নৃশংসতার আলোকে আস্-সাফ্ফার কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ আবদুর রহমান সিংহাসন আরোহণ করে আম জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সচেষ্ট হন। কে কোথায় অন্নহীন-বস্ত্রহীন হয়ে পড়ে আছে, নিজে গিয়ে তার সাহায্য করে আসতেন। শক্তিমত্তায়ও তিনি পরাক্রমশালী ছিলেন। পার্শ্ববর্তী চিরশত্রু রাষ্ট্র তাঁর দেশ আক্রমণ করলে তিনি বীরবিক্রমে তা প্রতিহত করেন। শত্রু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে তার দাঁতভাঙা জবাব দেন। কিন্তু এই চিরশত্রুকে তিনি একাধিকবার বাগে পেয়েও বারবার ক্ষমা করে দেন।

ক. খলিফা হারুন-অর-রশীদের মায়ের নাম কী? ১

খ. নহরে জুবাইদা'র পরিচয় সংক্ষেপে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের আবদুর রহমানের মতো প্রজাবাৎসল্যের উদাহরণ খলিফা হারুন-অর-রশীদের বেলায়ও প্রযোজ্য— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আবদুর রহমানের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি গৃহীত যুদ্ধনীতির আলোকে খলিফা হারুন-অর-রশীদের গৃহীত নীতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ ইবনে আম্মার খলিফা মুতাসিমের প্রধান উজির ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। বন্ধুর মতো তাঁরা একসাথে ঘুরে বেড়াতেন। ইবনে আম্মারের বদান্যতা অনেক সময় খলিফাকেও ছাপিয়ে যেত। জনসাধারণ খলিফার চেয়ে উজিরের দরবারে যেতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। কিন্তু একবার ইবনে আম্মারের কিছু কর্মকাণ্ড খলিফার মান-সম্মানের বিরুদ্ধে গেলে তিনি আম্মারকে বরখাস্ত করেন। আম্মারের আত্মীয়-স্বজন যারা রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন তাদেরকেও বরখাস্ত ও এদের সকলের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ক. 'বার্মাক' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'জাফরি প্রাসাদ' সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের ইবনে আম্মারের সাথে খলিফা হারুন-অর-রশীদের কোন উজিরের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. ইবনে আম্মারের পরিবারের দুর্দশার আলোকে খলিফা হারুন-অর-রশীদের খিলাফতে বার্মাকি পরিবারের পরিণতি পর্যালোচনা করো। ৪

ময়মনসিংহ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, বরিশাল বোর্ড ২০২৫

সেট: ০২ **ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি** বিষয় কোড | ২ | ৬ | ৭ |

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ ঘটনা ১: রাকিব সাহেব তাঁর সন্তানদের উপদেশ দিলেন যে, তোমরা শ্রমিকের মজুরি ইনসাফের ভিত্তিতে যথাসময়ে প্রদান করবে। বাড়ির কাজের লোকদের প্রতি সদাচরণ করবে।

ঘটনা ২: জামিল সাহেব তার স্ত্রীর সাথে প্রায়শই খারাপ আচরণ করেন। তিনি মেয়েকে একজন অযোগ্য পাত্রের সাথে বিয়ে দিয়ে পণ হিসেবে অনেক টাকা-পয়সা নেন এবং নিজের বিলাসিতায় উক্ত অর্থ ব্যয় করেন।

ক. বদর যুদ্ধে কতজন মুসলমান শহিদ হয়েছিলেন? ১

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাকিব সাহেবের কথার সাথে মহানবি (স)-এর চরিত্রের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জামিল সাহেবের চরিত্রে মহানবি (স)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোন কোন দিকটি অনুপস্থিত? বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন 'ম্যাগনাকার্টা' দলিলে স্বাক্ষর করেন। রাজার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য সামন্তরা রাজাকে বন্দি করে এবং উক্ত দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। ফলে জনগণের অধিকার বহুলাংশে রক্ষা পায়। রাজা স্থানীয় প্রধানদের সম্মতি ব্যতীত সম্পদ ও সম্পত্তি হস্তগত করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। জনগণের সাধারণ অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়।

ক. তাবুক অভিযান কত সালে প্রেরিত হয়েছিল? ১

খ. হুনায়নের যুদ্ধের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ম্যাগনাকার্টা'-এর সাথে মহানবি (স) প্রদত্ত কোন সংবিধানের কতটুকু সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মহানবি (স)-এর সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্যের বৈপরীত্য পর্যালোচনা করো। ৪

৩.▶ ঘটনা ১: বাংলাদেশে অসংখ্য মাজার রয়েছে। এই মাজারগুলোতে ভণ্ড সাধু ও সেবকরা মাজারে শায়িত পিরের আদি ভৌতিক ও অতিলৌকিক ক্ষমতার গুণকীর্তন প্রকাশ করে বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জন করে। মূলত এটিই হলো ধর্ম-ব্যবসা।

ঘটনা ২: জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও দেশের মানুষের সমস্যা, দেশের আর্থিক ও জনকল্যাণমূলক সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ক. খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়কাল লেখো। ১

খ. 'রিদ্দা আন্দোলন' কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মাজারকেন্দ্রিক ভণ্ড সাধু-সেবকদের সাথে খলিফা আবু বকর (রা)-এর শাসনামলের কোন গোষ্ঠীর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা ২-এর আলোকে 'মজলিশ-উশ-শূরার' গঠন ও কার্যপরিধির বৈপরীত্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ নিকোপলিশের যুদ্ধ মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এ যুদ্ধে সুলতান বায়েজিদ পরাজিত হলে তাকে ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হতে হতো। এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ওসমানীয়দের গোটা ইউরোপ বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। নিকোপলিশের যুদ্ধের পর বলকান অঞ্চলের ওয়ালেচিয়া, স্টাইরিয়া, হাঙ্গেরি, মোবিয়াসহ অধিকাংশ রাজ্য ওসমানীয় সুলতান বায়েজিদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ক. সেতুর যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল? ১

খ. জেরুজালেম জয়ে খলিফা ওমর (রা)-এর মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছিল— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. খলিফা ওমর (রা)-এর শাসনামলের কোন যুদ্ধ নিকোপলিশের যুদ্ধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে খলিফা ওমর (রা)-এর পারস্য বিজয়ের ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব নির্ধারণ ও রাজস্ব আদায়ের জন্য 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ড' গঠন করেছে। বোর্ডের প্রধানকে বলা হয় 'চেয়ারম্যান'। রাজস্ব বোর্ডের প্রধান কাজ হলো সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করা, হিসাব সংরক্ষণ করা এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করা। রাজস্বের প্রধান খাতগুলো হলো আয়কর, ভ্যাট, আমদানি ও রপ্তানি কর, বাণিজ্য কর, সেবা করসহ অন্যান্য খাত।

ক. খলিফা ওমর (রা) তাঁর সাম্রাজ্যকে কতটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন? ১

খ. বায়তুল মাল কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. খলিফা ওমর (রা) সাম্রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের জন্য বাংলাদেশের 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের' আদলে কোন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে খলিফা ওমর (রা)-এর রাজস্ব ব্যবস্থা পর্যালোচনা করো। ৪

৬.▶ ঘটনা ১: ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর তৎকালীন সরকারপ্রধান অসৎ উদ্দেশ্যে হেফাজতের লোকজন কুরআন পুড়িয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন।

ঘটনা ২: রেজাশাহ পাহলভী তার স্বৈরাচারী শাসনের জন্য ইমাম খোমেনিকে হুমকি মনে করে ফ্রান্সে নির্বাসনে পাঠান। কেননা, ইমাম খোমেনি গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষার জন্য জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলনের ডাক দেন।

ক. হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকাল লেখো। ১

খ. 'যুন্নুরাইন' উপাধি কাকে এবং কেন দেওয়া হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে ওসমান (রা)-এর জীবনের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ইমাম খোমেনির জীবন ও কর্মের সাথে হযরত আবুজর গিফারি (রা)-এর জীবন ও কর্মের বৈসাদৃশ্যসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ ইলখানি সুলতান গাজান খান গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা এবং দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ডাক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেন। তিনি সরকারি পত্রাবলি প্রস্তুত ও প্রেরণের জন্য একটি পৃথক দপ্তর সৃষ্টি করেছিলেন। মূলত সরকারি পত্রাদির জাল প্রতিরোধ করার জন্যই তার ব্যবস্থা কার্যকর ছিল।

ক. কোন খলিফা সর্বপ্রথম মুসলিম নৌ-বাহিনী গঠন করেন? ১
খ. দিওয়ান-আল-খারাজ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কোন উমাইয়া খলিফা গাজান খানের ন্যায় ডাক বিভাগ গঠন করেছিলেন? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আমির মুয়াবিয়ার রাষ্ট্রীয় পত্রাদি সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার প্রচলন করেন। ফলে ভারতের মুসলমানদের বৃহদাংশ ইংরেজি না জানার কারণে চাকরি হারান। মুদ্রার ক্ষেত্রেও তারা প্রচলিত মুদ্রা বাতিল করে নতুন উপনিবেশিক মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করেন।

ক. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কে ছিলেন? ১
খ. খলিফা আবদুল মালিককে 'রাজেন্দ্র' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ব্রিটিশ মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কারের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার সংস্কার কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে খলিফা আবদুল মালিকের ভাষা সংস্কারের উদ্দেশ্য ও ফলাফলের বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করো। ৪

৯.▶ তৈমুর লং একজন ভাগ্যাহত ভবঘুরে থেকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে আত্মবিকাশ করেন। তিনি মধ্য এশিয়া-পারস্য থেকে কৃষ্ণসাগরের তীর পর্যন্ত জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি সমকালীন বিশ্বের নয়টি রাজ্যের ২৭ জন নৃপতিকে পরাজিত করেছিলেন। তিনি শুধু একজন বিজেতাই ছিলেন না, একজন সাহিত্য ও শিল্পকলারও অনুরাগী ছিলেন। তিনি চাগতাই-তুর্কি ভাষায় তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মুলফুজাত-ই-তৈমুরী' রচনা করেন।

ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম কে ছিলেন? ১
খ. খলিফা আল-ওয়ালিদের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতিরা নিগৃহীত হয়েছিলেন কেন? ২
গ. তৈমুর লং-এর কর্মকাণ্ডের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? বুঝিয়ে লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী উক্ত উমাইয়া খলিফার জীবনকীর্তির বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা করো। ৪

১০.▶ উসমানীয় সাম্রাজ্যের মহাসংকটকালে কুপ্রিলি পরিবারের অভ্যুদয় ঘটে। এই পরিবার প্রতিভাবান কয়েকজন রাজনীতিবিদের জন্ম দেয়। কুপ্রিলি উজির পরিবারের কর্মতৎপরতায় সাম্রাজ্যে স্থায়িত্ব ও শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং ভঙ্গুর সাম্রাজ্য উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। এই উজির পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্মদ কুপ্রিলি। তিনি আলবেনিয়ার কুপ্রিল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তার প্রতিষ্ঠিত পরিবার 'কুপ্রিলি উজির' নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদ স্বজনপ্রীতি করে কারা মোস্তফাকে উজির নিয়োগ করলে ১৬৫৬ সাল থেকে চলে আসা কুপ্রিলি উজির পরিবারের শাসনকালের অবসান ঘটে ১৬৮১ সালে।

ক. সম্রাজ্ঞী আইরিন কে ছিলেন? ১
খ. খলিফা হারুন-অর-রশীদের বাইজান্টাইন নীতির বর্ণনা দাও। ২
গ. কুপ্রিলি উজির পরিবারের সাথে আব্বাসিয় কোন উজির পরিবারের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আব্বাসিয় উক্ত উজির পরিবারের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের একটি চিত্র অঙ্কন করো। ৪

১১.▶ চেঙ্গিস খান একজন রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর-প্রকৃতির শাসনকর্তা ছিলেন। এ জন্য তার উপাধি ছিল 'জগতের ত্রাস' বা 'বিশ্বত্রাস'। তিনি মোঙ্গল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তিনি ছিলেন ওয়াদা ভঙ্গকারী শাসক। তিনি বিজিত রাজ্যের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালাতেন। অন্যদিকে, মধ্য এশিয়ার আরেকজন শাসক শাহরুখ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ক. আব্বাসিয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার নাম লেখো। ১
খ. আব্বাসিয় আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তার পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকের চেঙ্গিস খানের চরিত্রের সাথে কোন আব্বাসিয় খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. খলিফা আল-মামুনের কর্মকাণ্ড শাহরুখের কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফল—যথার্থতা বিচার করো। ৪

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবইসমূহ

আবশ্যিক বইসমূহ

- বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

প্রথম পত্রের বইসমূহ

বিজ্ঞান শাখা

- **পদার্থবিজ্ঞান** প্রথম পত্র • **রসায়ন** প্রথম পত্র • **জীববিজ্ঞান** প্রথম পত্র • **উচ্চতর গণিত** প্রথম পত্র
- **উচ্চতর গণিত সমাধান** প্রথম পত্র • **গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান** প্রথম পত্র • **গাণিতিক রসায়ন** প্রথম পত্র

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

- **ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা** প্রথম পত্র • **হিসাববিজ্ঞান** প্রথম পত্র • **ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা** প্রথম পত্র
- **উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন** প্রথম পত্র

মানবিক শাখা

- **পৌরনীতি ও সুশাসন** প্রথম পত্র • **সমাজকর্ম** প্রথম পত্র • **সমাজবিজ্ঞান** প্রথম পত্র • **ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি** প্রথম পত্র
- **ভূগোল** প্রথম পত্র • **ইসলাম শিক্ষা** প্রথম পত্র • **যুক্তিবিদ্যা** প্রথম পত্র • **ইতিহাস** প্রথম পত্র • **অর্থনীতি** প্রথম পত্র

ঐচ্ছিক

- **মনোবিজ্ঞান** প্রথম পত্র • **গার্হস্থ্য বিজ্ঞান** প্রথম পত্র • **কৃষিশিক্ষা** প্রথম পত্র • **পরিসংখ্যান** প্রথম পত্র

দ্বিতীয় পত্রের বইসমূহ

বিজ্ঞান শাখা

- **পদার্থবিজ্ঞান** দ্বিতীয় পত্র • **রসায়ন** দ্বিতীয় পত্র • **জীববিজ্ঞান** দ্বিতীয় পত্র • **উচ্চতর গণিত** দ্বিতীয় পত্র
- **উচ্চতর গণিত সমাধান** দ্বিতীয় পত্র • **গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান** দ্বিতীয় পত্র • **গাণিতিক রসায়ন** দ্বিতীয় পত্র

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

- **ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা** দ্বিতীয় পত্র • **হিসাববিজ্ঞান** দ্বিতীয় পত্র • **ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা** দ্বিতীয় পত্র
- **উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন** দ্বিতীয় পত্র

মানবিক শাখা

- **পৌরনীতি ও সুশাসন** দ্বিতীয় পত্র • **সমাজকর্ম** দ্বিতীয় পত্র • **সমাজবিজ্ঞান** দ্বিতীয় পত্র • **ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি** দ্বিতীয় পত্র
- **ভূগোল** দ্বিতীয় পত্র • **ইসলাম শিক্ষা** দ্বিতীয় পত্র • **যুক্তিবিদ্যা** দ্বিতীয় পত্র • **ইতিহাস** দ্বিতীয় পত্র • **অর্থনীতি** দ্বিতীয় পত্র

ঐচ্ছিক

- **মনোবিজ্ঞান** দ্বিতীয় পত্র • **গার্হস্থ্য বিজ্ঞান** দ্বিতীয় পত্র • **কৃষিশিক্ষা** দ্বিতীয় পত্র • **পরিসংখ্যান** দ্বিতীয় পত্র

ব্যবহারিক বইসমূহ

- **ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান** প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • **ব্যবহারিক রসায়ন** প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • **ব্যবহারিক জীববিজ্ঞান** প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
- **ব্যবহারিক উচ্চতর গণিত** প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • **ব্যবহারিক ভূগোল** প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • **ব্যবহারিক গার্হস্থ্য বিজ্ঞান** প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
- **ব্যবহারিক কৃষিশিক্ষা** প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
www.akkharpatra.com

BNS 2507-02-04-1015-8
2507020410158